জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ,
সাম্রাজ্যবাদ ও দাসত্বের উত্তরাধিকার

এম, এ, খান

বাংলা অনুবাদের ভূমিকা

ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস হচ্ছে জিহাদ। এ জিহাদের মাধ্যমে মদিনা থেকে তার বিজয়ী রূপে আত্মপ্রকাশ, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা। জিহাদের তাৎপর্য বাস্তবে হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মের নামে যুদ্ধ এবং আরব আধিপত্য ও সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ। জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আরব রাষ্ট্রের প্রসারের সঙ্গে ঘটেছে ধর্মের নামে পাইকারীভাবে পরের সম্পদ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন ও আত্মসাৎকরণ, নারী ধর্ষণ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে 'কাফের' বা 'সত্য প্রত্যাখ্যনকারী' আখ্যায়িত করে আক্রমণ ও পরাজিত করে বন্দি ও দাসকরণ। এভাবে ইসলামে ধর্মের নামে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, আরব সাম্রাজ্যবাদ এবং দাস ব্যবস্থার যে ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার গড়ে উঠেছে তাকে এ গ্রন্থে লেখক অজস্র তথ্যের সাহায্যে উদ্ঘাটিত করেছেন।

জিহাদের উপর বিপুলভাবে তথ্যসমৃদ্ধ এ অসাধারণ গ্রন্থ 'জিহাদ : জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও দাসত্বের উত্তরাধিকার' M. A. Khan-এর লেখা 'Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery' (iUniverse, Inc; New York, Bloomington) নামক ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। যেহেতু জিহাদের সঙ্গে ইসলাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং বাঙালি পাঠকদের নিকট জিহাদকে আলাদাভাবে ইসলাম শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয় না সেহেতু গ্রন্থের নাম অনুবাদের সময় ইসলামি জিহাদ নামকরণ না করে শুধু জিহাদ করা হয়েছে।

বঙ্গানুবাদে ভাষাগত প্রাঞ্জলতা ও অর্থগত সহজবোধ্যতা আনয়নের খাতিরে অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিকতায় ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাংলা সংকলণটি ইংরেজী সংকলণ থেকে সামান্য সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত।

আমার ধারণা এ অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ উপলব্ধিতে বিপুলভাবে সহায়তা করে বাঙালি জাতির জাগরণ ও উত্থানে উলেখ্য ভূমিকা রাখবে।

তারিখঃ ১ ডিসেম্বর, ২০১০

শামসুজ্জোহা মানিক

সহ-লেখক, আর্যজন ও সিন্ধু সভ্যতা

সম্পাদক, বঙ্গরাষ্ট্র (www.bangarashtra.org & www.bangarashtra.net)

পাঠকের মন্তব্য

'কোরানের উপর গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার ভিত্তিতে লেখক যথার্থরূপে দেখিয়েছেন যে ইসলাম – বিশেষ করে ইসলামের জিহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধের মতবাদ – দ্ব্যর্থহীনভাবে অমুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও ক্রীতদাসকরণ এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি সাম্রাজ্যবাদী ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। তারপর নবি মুহাম্মদের আদি জীবনী (সিরা) ও হাদিসের উপর ব্যাপক গবেষণার ভিত্তিতে তিনি দেখান যে, আল্লাহর সেসব চিরন্তন ও অবশ্য করনীয় নির্দেশগুলো কীভাবে নবি নিজে প্রয়োগ করেছিলেন জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও ক্রীতদাসকরণ এবং আরবাঞ্চলে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রচুর ইসলামের ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে পুস্তকটি আরো দেখিয়েছে, কীভাবে মুসলিমরা জিহাদের এ আদর্শ নমুনা বা কর্মকান্ডগুলোকে বর্ধিত করে যুগ যুগ ধরে চলমান রেখেছে আজ পর্যন্ত। লেখক ভবিষ্যতবাণী করেছেন যে, আগামী দশকগুলোতে ইসলামি জিহাদ খুব সম্ভবত ক্রমান্বয়ে জোরদার ও উগ্রতর হয়ে উঠবে, যা মানবজাতির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, বিশেষত অমুসলিম ও পশ্চিমা বিশ্বের জন্য।

মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্ব ইসলামি উগ্রবাদীদের কাছ থেকে যে ক্রমবর্ধমান সাংঘাতিক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তার সঠিক অনুধাবনে এ বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

— ইব্‌নে ওয়ারাক, '*আমি কেন মুসলিম নই*' গ্রন্থটির লেখক

'এটি একটি অবশ্যই পঠিতব্য বই – খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিখিত – যা জিহাদের সহিংস সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতির উপর আলোকপাত করেছে। জিহাদ হলো ইসলামের প্রধান মতবাদ, যার প্রতিষ্ঠা সম্ভব কেবলই অমুসলিম, এমনকি মুসলিমদেরও মানবিক অধিকার পদদলিত করার বিনিময়ে।'

— ননি দারবিশ, '*নাউ দে কল মি ইনফিডল*' গ্রন্থটির লেখিকা

'আমার কাছে এ বইটি চমৎকার মনে হয়েছে। এটা এমন একটা বই, যা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবারই পড়া উচিত... 'ইসলামিক জিহাদ' গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে ঐতিহাসিক তর্থে পূর্ণ, যা ইসলাম ও ইসলামের নবি সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক ও চলমান সত্যতার সঠিক আলোচনা করেছে। এসব কিছু বইটিকে অবশ্য পঠিতব্য করে তুলে তাদের জন্য, যারা চলমান ইসলামি জিহাদ ও সন্ত্রাসের পিছনের চালিকা শক্তিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে চায়।'

— সামি আল্‌রাবা, অধ্যাপক ও '*ভেইল্ড এ্যাট্রোসিটিজ*' গ্রন্থটির লেখক

'বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদী আন্দোলনের ইতিহাস, প্রকৃতি ও হুমকি অনুধাবনে বর্তমানে যে গুরুত্বপূর্ণ ও বর্ধনশীল গবেষণা চলছে, এ গ্রন্থটি তাতে একটি বিশেষ সংযোজন মনে হচ্ছে।'

— মারভিন বেন্ডল, অধ্যাপক (জেইমস কুক ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া) ও লেখক

এম. এ. খানের এ বইটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সহজবোধ্য ও মনোযোগ আকর্ষণকারী। একবার পড়া শুরু করলে পাঠকরা বইটি শেষ করার আগ্রহ বোধ করবে। বইটি পড়ুন এবং অনুধাবন করতে পারবেন ইসলামি জিহাদীরা যা করছে তার কারণ কি! উপমহাদেশের (ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান) পাঠকরা, বিশেষত মুসলিমরা, হতবাক হয়ে যাবেন এটা অনুধাবন করে যে, তাদের পূর্ব-পুরুষরা কী ভয়ানক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য-এশিয়া থেকে আগত মুসলিম হানাদারদের হাতে... এ পুস্তকটি আজকের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের জন্য অবশ্য পঠিতব্য বর্ধনশীল ইসলামি উগ্রতা সম্পর্কে তাদের নিস্পৃহতা ছুড়ে ফেলতে।'

— আবুল কাসেম, ইসলামের গবেষক, সমালোচক ও লেখক

লেখকের ভূমিকা

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় মুসলিম সন্ত্রাসীদের অবিশ্বাস্য ভয়ানক আক্রমণ (৯/১১ আক্রমণ) শুধু সমগ্র বিশ্বের গতিপথকেই ঘুরিয়ে দেয়নি, সেটা পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলিমদের জীবনধারা ও মানসিকতাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে। এ ঘটনার ফলশ্রুতিতে তারা ধর্মীয় দিক থেকে ব্যাপক সমালোচনা ও ঝামেলার সম্মুখীন হয়। পশ্চিমা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রথমবারের মতো ইসলামের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে বিশ্বব্যাপী বর্ধনশীল মুসলিম উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসীদের জিহাদের নামে ঘটনকৃত সকল অপকর্মে ধর্মীয় উন্মাদনা দানের জন্য। হঠাৎ করে ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ জোর নেতিবাচক প্রচারণা পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিমদেরকে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা ও লজ্জার মধ্যে ফেলে দেয়।

৯/১১ আক্রমণ ঘটার পূর্বেই আমিও ছিলাম প্রায় এক দশক ধরে পাশ্চাত্যে বসবাসকারী এক মুসলিম, যাকে সে মানসিক যন্ত্রণা ও লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও আমার জন্ম ও লালন-পালন হয় রক্ষণশীল ইসলামি পরিবেশে, পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবে আমি বেড়ে উঠি উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জীবনে হিন্দু ও শিখরা ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবী: আমি তাদের মাঝে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম, কেননা তারা ছিল উদার, সহজগামী ও বিণীত মনের এবং কম ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করার পূর্বেই আমি সকল ধর্মীয় আচার-কর্ম ছেড়ে দিয়েছিলাম; সেগুলো আমাকে কোনোক্রমেই আকর্ষণ করতো না।

৯/১১ আক্রমণ ঘটার সময় আমি পুরোপুরি অনুধাবণ করতে পেরেছিলাম যে, ধর্মীয় আনুষ্ঠিকতা, যেমন নামাজ, রোজা ও হজ্জ্ব ইত্যাদি সবকিছু অর্থহীন। মনে করতাম আমি পুরস্কৃত হবো কঠোর পরিশ্রমের জন্য, বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কাজের জন্য – অলস মুর্খের মতো কিছু ধর্মীয় আচার জীবনভর অনুকরণের জন্য নয়, যা কারো কোনোই উপকারে আসে না। অমুসলিমরা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু-বান্ধবী; মুসলিম সহকর্মীদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে আমি হারাম খাদ্য খেতাম, মাদকদ্রব্য পান করতাম পরিমিত পরিমাণে।

আমার এ উদার মনোভাব ও আচার-আচরণ সত্ত্বেও সৎভাবে বলতে গেলে, আমি সেসব মুসলিমদের বাইরে ছিলাম না, যারা ৯/১১ আক্রমণকে ন্যায্য ভেবেছিল – যদিও আমার মনে হয়েছিল যারা আক্রমণটিতে মারা যায়, তারা ছিল নিষ্পাপ। আমার এরূপ ধারণার কারণ ছিল যে, মুসলিম সমাজ সর্বজনীনভাবে আমেরিকাকে ইসলামের চরম শত্রু বলে চিত্রিত করে, বিশেষ করে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতে আমেরিকার ইসরাইল-মুখী অবস্থান নেওয়ার কারণে। মুসলিমরা ধারণা করে যে, আমেরিকার ইসরাইলকে সহায়তা প্রদান ফিলিস্তিনিদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নিপীড়ন ও দুঃখ-দুর্দশা বয়ে আনছে। কাজেই মুসলিমরা ৯/১১ আক্রমণকে ব্যাপকভাবে ন্যায্য ভেবেছিল, কেননা এ আক্রমণ অত্যাচারী মহাশক্তিকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে; এবং এতটা সামান্য মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আমিও সেরূপই ভেবেছিলাম।

এটা বেখাপ্যা মনে হতে পারে যে, ইসলামের কোনো তোয়াক্কা না করলেও তখনো আমি ইসলামকে একটা সত্য ও ভাল ধর্ম বলে বিশ্বাস করতাম। আমি মনে করতাম ইসলামী জিহাদের নাম তুলে অপকর্ম ঘটনকারী মুসলিম সন্ত্রাসীরা ছিল বিপথগামী, যারা ইসলামের বা জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে। তবে পশ্চিমা বার্তা-মাধ্যম যখন ৯/১১ আক্রমণসহ বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরিত হয়ে পড়া মুসলিম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করে ইসলামের সমালোচনায় ক্রমশ মুখর হয়ে উঠে, আমি তাদের অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহ, যেমন কোরান, হাদিস ও নবির জীবনী পড়তে শুরু করি, যা আমার ৩৫ বছর বয়সের জীবনে পূর্বে কখনো পড়িনি। সেগুলো পড়তে গিয়ে আমি হতচকিত হয়ে পড়ি। জীবনভর আমি শুনে এসেছি: নবি মুহাম্মদ ছিলেন একমাত্র আদর্শ মানুষ, তিনি ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু ও ন্যায়বান, ইসলাম হলো সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ধর্ম, এবং আমি তার সবকিছু বিশ্বাস করে এসেছি। অথচ কোরানকে মনে হয় অমুসলিমদের বিরুদ্ধে লাগামহীন যুদ্ধের এক ঘোষণাপত্র (ম্যানিফেস্টো) তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরে বাধ্য করতে ও গণহারে ক্রীতদাস বানাতে অথবা জঘন্যভাবে নির্যাতিত ও অবমানিত জিম্মি প্রজা হিসেবে বশীভূত করতে। নবি মুহাম্মদ বিশেষত তার জীবনের ও নবিত্বের শেষ দশ বছরে আর যাই হোক শান্তি-প্রিয়, দয়াশীল ও ন্যায় ব্যক্তি ছিলেন না।

তারপর ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে আমার উৎসুক্য বেড়ে যায়। বিগত বছরগুলোতে আমি ব্যাপক গবেষণা করেছি ইসলামি ধর্মীয় মতবাদ এবং নবি মুহাম্মদ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের উপর। ইসলামের সে ইতিহাস হলো জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদ ও ধ্বংসাত্মক ক্রীতদাসত্ব চর্চার এক নির্মম কাহিনী। এটা মানব জাতির উপর নিপতিত নির্মমতার এক বিরল কাহিনী এবং তার সব কিছুই করা হয়েছিল ইসলামি ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদের নামে, যা ইসলামের ভিত্তি স্থাপনকারী কেন্দ্রীয় মতবাদ। সে নির্মম কাহিনী, যার সাথে বর্তমান যুগের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই পরিচিতি সামান্য, তা এ পুস্তকটির বিষয়বস্তু।

এম. এ. খান
১৫ অক্টোবর ২০০৯

লেখকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

প্রথমত আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে আমার স্ত্রীর প্রতি, এ বইটি লিখা-কালীন তার অনুপ্রেরণা ও ধৈর্যশীল আত্মত্যাগের জন্য; তার সহায়তা ব্যতীত বইটি লিখা সম্ভব হতনা।

বইটি মানবিক ও অতিমানবিক পন্ডিত ও গ্রন্থকারদের কৃতকর্মের ভিত্তিতে রচিত; কাজেই এর বেশীরভাগ অবদানের কৃতিত্ব তাদের উপর ন্যস্ত। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো কোরানের লেখক আল্লাহ; হাদিস সংগ্রহকারক আল-বুখারী, আবু মুসলিম ও আবু দাউদ; নবি মুহাম্মদের জীবনী লেখক ইব্নে ইসহাক ও আল-তাবারী; এবং মোহাম্মদ ফেরিস্তা, ইবনে বতুতা, এইচ. এম. এলিয়ট ও জে. ডাউসন, জহরলাল নেহরু, কে. এস. লাল, জাইল্স মিল্টন, বার্নার্ড লুইস, ভি. এস. নৈপুল, জি. ডি. খোস্লা, পি. কে. হিট্টি, এম. উমরুদ্দিন, এন্ড্রু বস্টম, আর. এম. ইটন, *বাহারিস্তান-ই-শাহী* ও *আল-বেরুনী'স ইন্ডিয়া*।

আমি কোনো অংশেই কম ঋণী নই আমার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী আবুল কাসেম, মোহাম্মদ আজগর, সাঈদ কামরান মির্জা, শের খান, মুমিন সালিহ, সি. লী, উয়ার্নার ম্যাকেনজি ও আরো অনেকের কাছে, যারা আমাকে ব্যাপক প্রেরণা দিয়েছে বইটি সম্পন্ন করণে। বিশেষ ধন্যবাদের দাবীদার হলো সি. লী, যে তার সংগ্রহকৃত বইয়ের ভাণ্ডারটি আমাকে ব্যবহার করতে দেয়, যা আমার গবেষণায় খুবই সহায়ক হয়েছে।

বইটিতে আলোচিত বিষয়গুলোর আবেদন সার্বজনীন, যদিও ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে প্রধানত ভারতবর্ষ থেকে, বিশেষত দু'টি কারণে: প্রথমত, ভারতে ইসলামি শাসনকালের বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তৎকালীন মুসলিম ইতিহাসবিদদের লেখা থেকে; দ্বিতীয়ত, বইটির পরিসর ছোট রাখার জন্য। তবে বইটি পাঠের সময় পাঠকদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ভারতে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিম শাসকদের আচরণ ছিল সবচেয়ে নমনীয়; অন্যত্র তা ছিল আরো জঘন্য, কদাচিৎ ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন স্পেনে)।

এম. এ. খান
১৫ অক্টোবর ২০০৯

সূচিপত্র

জিহাদ-২ জিহাদ-৩ জিহাদ-৪

জিহাদ-৫ জিহাদ-৬ জিহাদ-৭

জিহাদ-৮ জিহাদ-৯ জিহাদ-১০

জিহাদ-১১ জিহাদ-১২ জিহাদ-১৩

জিহাদ-১৪ জিহাদ-১৫ জিহাদ-১৬

জিহাদ-১৭ জিহাদ-১৮ জিহাদ-১৯

এম, এ, খান (লেখক পরিচিতি)

প্রাক্তন মুসলমান হিসাবে আত্মঘোষণাকারী এম, এ, খান একজন মুক্তচিন্তাবিদ এবং উদারনৈতিক মানবতাবাদী। তিনি সাংবাদিকতায় মাস্টার ডিগ্রিধারী এবং স্বউদ্যোগে গবেষণা ও লেখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। লেখক বিদেশ থেকে পরিচালিত ইংরেজি ওয়েব সাইট ইসলাম ওয়াচ (www.islam-watch.org)-এর সম্পাদক।

প্রকাশকের ভূমিকা

ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস হচ্ছে জিহাদ। এই জিহাদের মাধ্যমে মদিনা থেকে তার বিজয়ী রূপে আত্মপ্রকাশ, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা। জিহাদের তাৎপর্য বাস্তবে হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মের নামে যুদ্ধ এবং আরব সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ। জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আরব রাষ্ট্রের প্রসারের সঙ্গে ঘটেছে ধর্মের নামে পাইকারীভাবে পরের সম্পদ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন ও আত্মসাৎকরণ, নারী ধর্ষণ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে 'কাফের' বা 'সত্য প্রত্যাখ্যনকারী' আখ্যায়িত করে আক্রমণ ও পরাজিত করে বন্দী ও দাসকরণ। এভাবে ইসলামে ধর্মের নামে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, আরব সাম্রাজ্যবাদ এবং দাস ব্যবস্থার যে ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার গড়ে উঠেছে তাকে এই গ্রন্থে লেখক অজস্র তথ্যের সাহায্যে উদ্ঘাটিত করেছেন।

জিহাদের উপর বিপুলভাবে তথ্যসমৃদ্ধ এ অসাধারণ গ্রন্থটি M. A. Khan-এর লেখা Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery নামক ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। যেহেতু জিহাদের সঙ্গে ইসলাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং বাঙালি পাঠকদের

নিকট জিহাদকে আলাদাভাবে ইসলাম শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয় না সেহেতু গ্রন্থের নাম অনুবাদের সময় ইসলামি জিহাদ নামকরণ না করে শুধু জিহাদ করা হয়েছে।

আমার ধারণা এই অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ উপলব্ধিতে বিপুলভাবে সহায়তা করে বাঙালি জাতির জাগরণ ও উত্থানে উল্লেখ্য ভূমিকা রাখবে।

শামসুজ্জোহা মানিক
সহ-লেখক, আর্যজন ও সিন্ধু সভ্যতা
সম্পাদক, বঙ্গরাষ্ট্র (www.bangarashtra.org
& www.bangarashtra.net)

অধ্যায় - ১

জিহাদ সম্পর্কে বিতর্ক

'প্রত্যেক মুসলিমকে বছরে অন্তত একবার অবশ্যই জিহাদে যেতে হবে... দুর্গের ভিতরে যদি নারী এবং শিশুরাও থাকে, তবুও তাদের বিরুদ্ধে ভারী পাথর বা তীর নিক্ষেপের যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে কিংবা ডুবিয়ে মারা যেতে পারে।' -- (ইমাম আল গাজ্জালী, মোহাম্মদের পরে যিনি ইসলামের সর্বোচ্চ পণ্ডিত)

'শক্তি প্রয়োগে অথবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রত্যেককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা ও মুসলিম মিশনের সর্বজনীনতার কারণে (এর প্রসারের জন্য) যুদ্ধে যাওয়া মুসলিমদের ধর্মীয় দায়িত্ব।' -- (ইবনে খালদুন, দ্য মুকাদ্দিমা, নিউইয়র্ক, পৃষ্ঠা ৪৭৩)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১'র মর্মান্তিক হামলা বিশ্বে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে, যা বহুদিন অব্যাহত থাকবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধের নামে আল-কায়েদা ও তার সমমনা মুসলিম দলগুলোর বেপরোয়া হিংস্রতা ইসলামিক-অনৈসলামিক উভয় বিশ্বকেই নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও আচারসর্বস্ব ইসলামের পুনরুত্থানের একটা জোয়ার বয়ে চলছে। উভয় প্রবণতাই পশ্চিমা ও অন্যত্র ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশসমূহের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক হুমকি। হিংস্র জিহাদী দলগুলো বিশ্বব্যাপী ইসলামি ধর্মীয় আইন (শরীয়া)-ভিত্তিক কঠোর ইসলামি শাসন কায়েমের লক্ষ্যে বেপরোয়া হিংস্রতা, মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা চালানোর মাধ্যমে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়। বর্তমানে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের যে অহিংস জোয়ার চলছে, মুসলিমদের মধ্যে তার একটা ব্যাপক আবেদন রয়েছে এবং তারাও ঠিক একই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, তবে ভিন্ন পন্থায়। পশ্চিমা সমাজের রীতি ও সামাজিক আচরণ – যেমন বাক স্বাধীনতা, বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে মেলামেশা এবং সমকামিতা ইত্যাদি – যা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত, সেগুলোকে ক্রমশ দমনের দাবির মাধ্যমেও তারা সেখানে শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে চলছে।

২০০৬ সালের এক জরীপে দেখা যায়, শতকরা ৪০ ভাগ ব্রিটিশ মুসলিমরা শরীয়া আইন দ্বারা শাসিত হতে চায়। পক্ষান্তরে, শতকরা ৬০ ভাগ মুসলিম নিজস্ব সম্প্রদায়ের আইনগত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির জন্য শরীয়া কোর্ট দেখতে চায়। 'সেন্টার ফর সোশ্যাল কোহিশন ইন দ্য ইউ.কে.'-র সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মুসলিম ছাত্রদের শতকরা ৪ ভাগ ইসলামকে রক্ষা ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য 'হত্যাকাণ্ড' (আল-কায়েদা ইত্যাদি পরিচালিত) সমর্থন করে; ৩২ ভাগ মনে করে ইসলামের রক্ষায় হত্যাকাণ্ড ন্যায়সঙ্গত। ব্রিটেনে শতকরা ৪০ ভাগ মুসলিম চায় শরীয়া আইন প্রবর্তন; এর বিরোধিতা করে ৩৭ ভাগ। বিশ্বব্যাপী মুসলিম খিলাফত শাসন প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে প্রায় ৩৩ ভাগ; এ ধারণার বিরোধী মাত্র ২৫ ভাগ।[১] সমীক্ষায় এও জানা যায় যে, মুসলিমদের মধ্যে উগ্রবাদ ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং তরুণ মুসলিমরা ধর্মীয়ভাবে তাদের পিতামাতার প্রজন্মের চেয়ে বেশি মৌলবাদী। বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ জনসংখ্যার মাত্র ৩.৫ ভাগ মুসলিম হলেও তারা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে বেসরকারিভাবে শরীয়া আইনের ব্যাপক চর্চা করে চলছে। অবস্থা এ রকম যে, ক্যান্টারবেরির আর্চ-বিশপ রোয়ান উইলিয়ামস্ ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বলেন: *ব্রিটেনে শরীয়া আইনের প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী*। তিনি একে বৈধ করে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।[২]

মুসলিম গণদাবির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার তালাক, আর্থিক বিবাদ, এমন কি অভ্যন্তরীণ সহিংসতার ব্যাপারগুলো মীমাংসায় একটি বৈধ শরীয়া আদালত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছে। 'দ্য ডেইলি মেইল' জানায়, গত গ্রীষ্ম পর্যন্ত এ আদালত ১০০টিরও বেশি মামলা নিষ্পত্তি করেছে বলে দাবি করেছে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে তারা ৬টি অভ্যন্তরীণ সহিংসতার ফৌজদারি মামলাও নিষ্পত্তি করেছে। আদালতটি ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক ছোট ছোট মামলা হাতে নেওয়ার আশা পোষণ করে।[৩] এটা যুক্তরাজ্যে শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাপ।

ইসলামিক 'জিহাদ' কিংবা 'ধর্মযুদ্ধ'-এর অর্থ হলো আল্লাহর পথে লড়াই করা, যা কোরানের বহু আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্বয়ং ইসলামের ধর্মতত্ত্বে সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে ২:১৯৩ নং আয়াতে।[৪] কোরানে জিহাদ সম্পর্কে ২০০-টিরও বেশি ঐশীবাণী (আয়াত) রয়েছে। বর্তমান সময়ের সহিংস জিহাদের সুবিখ্যাত নায়ক ওসামা বিন লাদেন অবিশ্বাসীদের (অমুসলিমদের) বিরুদ্ধে তার জিহাদী প্রচারণার যে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হলো:[৫]

> মুসলিম ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য: '*আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অনন্তকাল ঘৃণা ও শত্রুতা বিরাজ করবে।*' সুতরাং (মুসলিমদের) অন্তরে (অমুসলিমদের প্রতি) একটা প্রচন্ড বিদ্বেষমূলক শত্রুতা রয়েছে। আর এ প্রচণ্ড শত্রুতা অর্থাৎ লড়াই নিবৃত্ত হবে যদি অবিশ্বাসীরা ইসলামের কর্তৃত্বের কাছে নত হয়, অথবা যদি তাদের

---

১. Gardham D, *Muslim students back killing in the name of Islam,* Telegraph (UK) 27 July 2008

২. *Sharia Law in UK in `unavoidable'*, BBC, News, 7 February 2008.

৩. Matthew Hickley, *Islamic sharia courts in Britain are now 'legally binding'*, Dailymail1, 15 September 2008.

৪. Quran 2:190: *Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress limits; for Allah loveth not transgressors* (trs, Yusuf Ali).

৫. Raymond Ibrahim, *the tow Faces of Al Qaeda*, Chronicle Review, 21 September 2007.

> শরীর থেকে রক্তঝরা বন্ধ হয়ে যায়, অথবা যদি মুসলিমরা সে সময় দুর্বল ও অসমর্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন সময় যদি (মুসলমানদের) হৃদয় থেকে এ ঘৃণা অন্তর্হিত হয়, সেটা হবে স্বধর্ম ত্যাগের শামিল। অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে নবির প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণীর সত্যিকার মর্মকথা হচ্ছে: '*ও নবি! অবিশ্বাসী ও ভণ্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; তাদের প্রতি নির্মম হও। তারা দুর্ভাগা, তাদের স্থান নরকে।*' অতএব এটাই হচ্ছে অবিশ্বাসী ও মুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের মূল ভিত্তি। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুসলিম পরিচালিত যুদ্ধ, বিদ্বেষ এবং ঘৃণাই আমাদের ধর্মের ভিত্তি। আমরা একে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার ও দয়া বলেই মনে করি।

অপরদিকে জিহাদের ধর্মীয় ভিত্তি যে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের এ একমুখী ও লাগামহীন বিদ্বেষ, সে মতবাদের বিরোধিতা করেন অনেকে। বহু মধ্যপন্থী মুসলিম ও ইসলামের পন্ডিত বলেন যে, আল-কায়েদা ও তার সমমনা ইসলামি দলগুলোর দ্বারা সংঘটিত বেপরোয়া সহিংস কর্মকাণ্ডকে অবশ্যই জিহাদ বলা যায় না। তাঁরা মনে করেন, জিহাদ হলো শান্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, সহিংসতার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। প্রেসিডেন্ট বুশের মত তাঁরাও মনে করেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং এর সাথে সহিংসতার কোন সম্পর্ক নেই। অনেক অমুসলিম ইসলামি পণ্ডিতও দাবি করেন যে, ইসলামের ইতিহাসের উৎকর্ষ বা বিশুদ্ধতার চিহ্ন হলো সহনশীলতা, শান্তি ও সমতা, যা খ্রিষ্টানরা তাদের মুসলিম (যেমন স্পেনে) ও অন্যান্য অখ্রিষ্টান প্রজাদের (যেমন ইউরোপ ও আমেরিকার প্যাগান ও ইহুদি) প্রতি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ব্রাসেল্সে ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ ইস্ট-ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট আয়োজিত একটি সন্ত্রাসবিরোধী সম্মেলনে বক্তারা দাবি করেন যে, আল-কায়েদার সহিংসতা থেকে 'জিহাদ' শব্দটিকে আলাদা করতে হবে। কারণ অধিকাংশ মুসলিমের মতে 'জিহাদ' মানে আধ্যাত্মিক একটা সংগ্রাম। অপশক্তির দ্বারা 'জিহাদ' শব্দটির আরও ছিনতাই হোক, সেটা তা তাঁরা চান না। সম্মেলনে ইরাকি পণ্ডিত শেখ মোহাম্মদ আলী বলেন, '*নিজ আত্মার ভিতরের সকল অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই হলো জিহাদ; ইসলামে কোনো জিহাদী সন্ত্রাসবাদ নেই।*'

জিহাদ দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার অথবা জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক কিছু করার জন্য সংগ্রাম হতে পারে – এ কথার উপর জোর দিয়ে পাকিস্তানের জয়েন্ট চীফস অব আর্মি স্টাফের সাবেক চেয়ারম্যান জেনারেল এহসান উল হক বলেন: '*সন্ত্রাসবাদীদেরকে জিহাদী বলে আখ্যায়িত করা হল ইসলামের উপলব্ধির ঘাটতির প্রতিফলন*' অথবা দুর্ভাগ্যবশত, '*একটি ইচ্ছাকৃত অপব্যবহার*'।[৬] ৯/১১'র পর থেকে আল-কায়েদা জিহাদের নামে কোরাস গাওয়া শুরু করার পর মুসলিম তথা অনেক অমুসলিম পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ জিহাদের অহিংস ধারণার সপক্ষে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ড্যানিয়েল পাইপ্স জিহাদ অর্থের ইতিবাচক চিত্র সম্পর্কে সে সব পণ্ডিতদের বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, যা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।[৭]

জিহাদ সম্পর্কে হার্ভার্ড ইসলামিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জায়েদ ইয়াসিন (বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত) ২০০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান অনুষ্ঠানে 'মাই আমেরিকান জিহাদ' শিরোনামে এক বক্তৃতায় বলেন, '*জিহাদের সত্য ও বিশুদ্ধ রূপ, যা সকল মুসলিম কামনা করে, তা হলো নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও যা সঠিক, যা ন্যায়সঙ্গত, তা-ই করা। নিজস্ব নৈতিক আচরণের জন্য এটা একটি ব্যক্তিগত সংগ্রাম।*' সে অনুষ্ঠানে হার্ভার্ডের ডীন মাইকেল শিনাজেল, ইসলাম ধর্মের উপর বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, জিহাদকে ন্যায় বিচারকে এগিয়ে নেওয়া এবং নিজেদেরকে ও সমাজকে জানার জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে জিহাদ সম্পর্কে ইয়াসিনের ব্যাখ্যাকে স্বীকৃতি দেন। এবং হার্ভার্ড ইসলামিক সোসাইটির উপদেষ্টা প্রফেসর ডেভিড মিটেন সত্যিকারের জিহাদকে মুসলিমদের সহজাত প্রবৃত্তিকে জয়, ঈশ্বরের পথ অনুসরণ ও সমাজে ভাল কাজ করার সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনেকেই জিহাদের এ ধারণা প্রচার করছেন। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জো এলডার জিহাদকে '*ধর্মীয় সংগ্রাম হিসাবে দেখেন, যা ধর্মের গভীর ব্যক্তিগত সংগ্রামকে ঘনিষ্ঠরূপে প্রতিফলিত করে।*' ওয়েলস্লি কলেজের অধ্যাপক রোক্সেন ইউবেন-এর কাছে জিহাদের অর্থ হল '*আবেগ প্রতিহত করা ও একজন শ্রেয়তর মানুষে পরিণত হওয়া*'। এদিকে জর্জিয়া-সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পার্সেলস্ জিহাদকে দেখেন '*নিজের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামরূপে*'। আর্মস্ট্রং আটলান্টিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নেড রিনালডুক্সি'র কাছে জিহাদের লক্ষ্য হলো, '*ভিতরে ভাল মুসলিম হওয়া ও বাহিরে একটা ন্যায় সমাজ সৃষ্টি করা*'। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফরিদ ইসেক-এর কাছে জিহাদের অর্থ '*বর্ণবাদ প্রতিরোধ ও নারী অধিকারের জন্য কাজ করা*'। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ব্রুস লরেন্স-এর কাছে জিহাদের অর্থ হল '*একজন ভাল ছাত্র, একজন ভাল সহকর্মী, একজন ভাল ব্যবসায়িক অংশীদার হওয়া। সর্বোপরি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা*'। তাঁর মতে, এমন কি অমুসলিমরাও জিহাদের নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা করতে পারে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অন্যায়পূর্ণ পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে জিহাদের উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে।

জিহাদের এ অহিংস ও মঙ্গলমুখী ধারণার বিরুদ্ধে আল-কায়েদাসহ অসংখ্য মৌলবাদী ইসলামি দল উল্লসিত চিত্তে দাবি করে যে, অবিশ্বাসীদের, বিশেষ করে পশ্চিমা ও পশ্চিম-ঘেঁষা মিত্র ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সরকারের, বিরুদ্ধে তাদের পরিচালিত সহিংস কর্মকাণ্ডই হলো জিহাদ। অনেক সময় তারা তাদের যুক্তির সপক্ষে কোরান থেকে উদ্ধৃতি ও নবি মোহাম্মদের জীবনের উদাহরণ তুলে ধরে। স্পষ্টতঃ জিহাদের এ উগ্রবাদী মতবাদের ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য বা অস্বীকৃতি রয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভুল ধারণা বশত হোক বা নাই হোক, সহিংস ইসলামি দলগুলো 'আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধের' অকাট্য বিশ্বাসে ভবিষ্যতে নারী-শিশুসহ নিরীহ মানুষের উপর সহিংসতা ও সন্ত্রাস অব্যাহত রাখবে। এজন্য মানব জীবন ও সমাজ ভোগ করবে অবর্ণনীয় ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ। আজকের বিশ্বে প্রতিটি জাতির মধ্যে মুসলিমরা যে যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে উচ্চ জন্মহারের কারণে ও অতি-জনবহুল ইসলামি বিশ্ব থেকে জনপ্রবাহ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে, জনসংখ্যার বর্তমান প্রবণতা অনুযায়ী, মুসলিমরা চলতি শতাব্দীর মধ্যভাগেই অনেক পশ্চিমা দেশে প্রধান ধর্মীয়

---

৬. *What is jihad? Language still hinders terror fight*, Reuters, 20 Feb, 2008.
৭. Pipes D (2003) *Militant Islam Reaches America*, WW Norton, New York, p. 258-68

সম্প্রদায় হতে পারে। আর বর্তমান সহিংস মৌলবাদী উত্থানের জৌলুস যদি মুসলিমদের মধ্যে অব্যাহত থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সহনশীল সভ্য বিশ্বের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে পারে। বিশ্বের আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে সকল জাতিকে এসব মৌলবাদী ইসলামি দলগুলোর আদর্শ ও কর্মকাণ্ডকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে সামরিক ও আদর্শিক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে।

বিশ্বব্যাপী, বিশেষত মুসলিম দেশগুলিতে, জিহাদের নামে জঙ্গি মুসলিমদের দ্বারা যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, তার প্রেক্ষাপটে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, এবং সেজন্যে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেরই 'জিহাদের প্রকৃত অর্থ' অনুধাবন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। জিহাদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি ব্যতীত কর্তৃপক্ষ ও জনগণের পক্ষে জিহাদের নামে মুসলিমদের মাঝে গড়ে ওঠা উত্তরোত্তর সহিংস প্রবণতার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার অসম্ভব।

এ বইটি জিহাদের প্রকৃত অর্থ কী পাঠকদের সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য সামান্য একটা প্রয়াস মাত্র। এতে নবি মোহাম্মদের জীবনী আলোচিত হয়েছে, যেভাবে তিনি খোদার (আল্লাহর) নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাদেশ গ্রহণ করেন পবিত্র কোরানে সন্নিবেশিত করার জন্যে। বইটি ব্যাখ্যা করবে কখন ও কী পরিস্থিতিতে আল্লাহ ইসলামি ধর্মতত্ত্বে জিহাদের ধারণা সংযোজন করেন। কোরান, খাঁটি নবুয়তি ঐতিহ্য ও নবি মোহাম্মদের মূল জীবনীর ভিত্তিতে বইটি প্রদর্শন করবে ইসলামের নবি কিভাবে জিহাদের মতবাদ প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ তেইশ বছরে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকালে (৬১০-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) । এভাবে জিহাদের ধর্মীয় ভিত্তি ও নবি-কর্তৃক স্থাপিত তার কৌশলগত নকশা উপলব্ধির পর ইসলামের কর্তৃত্বকালে মুসলিমরা কিভাবে যুগ যুগ ধরে জিহাদের আদর্শ প্রয়োগ করেছে – এ বইয়ে তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠালগ্নে নবি মোহাম্মদ আল্লাহ'র মতবাদরূপে জিহাদের ব্যাপক ব্যবহার করেন, যার মাধ্যমে জিহাদী তত্ত্বের তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক কর্মধারা প্রতিষ্ঠা করে যান। তা হলো:

১. ইসলাম প্রচারের জন্য সহিংসতার প্রয়োগ

২. ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ

৩. ইসলামি দাসত্ব

এ বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে জিহাদ-তত্ত্বের এ কর্মধারাগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য আলোচিত হবে।

অধ্যায় - ২

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস

নিচে বর্ণিত মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা এই পুস্তকের মর্মবাণী বুঝতে সহায়ক হবে।

মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, ইসলাম হলো নবি ইব্রাহিমের অনুসারীদের সর্বশেষ একেশ্বরবাদী ধর্ম। ইসলামের খোদা বা ঈশ্বর হলেন আল্লাহ, যিনি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরও ঈশ্বর। আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর পথ-নির্দেশনা প্রচারের জন্য আদম ও হাওয়া-কে সৃষ্টির পর থেকে পর্যায়ক্রমে এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বা নবি প্রেরণ করেছেন। পয়গম্বর বা নবিগণের এ পরম্পরায় আদম প্রথম, মোহাম্মদ সর্বশেষ। সর্বশেষ নবি মোহাম্মদ সব নবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সর্বকালে মানবজীবনের সর্বোচ্চ পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ। সর্বশেষ ও সর্বসেরা এ নবি ঈশ্বরের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ 'কোরান' আনয়ন করেন এবং ঈশ্বরের চূড়ান্তকৃত ধর্ম 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বর-প্রেরিত আগের ধর্মবিশ্বাসগুলো, যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম, ইসলামের তুলনায় অসম্পূর্ণ ও হীনতর। অন্যসকল ধর্মকে বাতিল ও প্রতিস্থাপন করার জন্য ইসলামধর্ম প্রেরণ করেছেন এ দাবি করে আল্লাহ কোরানে বলেন: '*তিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রেরিত নবি (মোহাম্মদ)-কে পথ-নির্দেশ ও (একমাত্র) সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে অন্যসকল ধর্মের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন*' (কোরান ৪৮:২৮)।[৮]

ইসলাম দাবি করে যে, সময়ের সাথে ইহুদিরা তাদের ধর্মশাস্ত্রকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করেছে (কোরান ২:৫৯)। সুতরাং এটা বাতিল ও পরিত্যাজ্য। এ ব্যাপারে খ্রিষ্ট ধর্মশাস্ত্র কিছুটা ভাল মূল্যায়ন পেয়েছে: এটা এখনও বৈধ, যদিও ইসলামের চেয়ে হীনতর। কোরান দাবি করে যে, খ্রিষ্টানরা তাদের মূল ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ ভুলে গেছে (কোরান ৫:১৪) এবং এর উপদেশ তারা ভুল বুঝেছে। যেমন তারা ভ্রান্তভাবে যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র মনে করে (কোরান ৫:৭২, ১১২:২, ১৯:৩৪-৩৫, ৪:১৭১)। কোরান এটাও দাবি করে যে, খ্রিষ্টানরা ভুলবসত যিশুকে তিনজনের একজন, অর্থাৎ 'ট্রিনিটি' বা তিন ঈশ্বর-এর একজন বলে গণ্য করে (কোরান ৫:৭৩, ৪:১৭১)। খ্রিষ্টানরা যদিও ভুলভাবে ধর্মচর্চা করে, তবুও আল্লাহ তাদের ধর্মকে বাতিল করেন নি, তবে আশা করেছেন যে ইসলামের দ্বারা পরিণামে তা বাতিল হয়ে যাবে (কোরান ৪৮:২৮)। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কেমন করে ইহুদিরা তাউরাত (ওল্ড টেস্টমেন্ট) বিকৃত করেছে, কিংবা কীভাবে খ্রিষ্টানরা বাইবেল (নিউ টেস্টমেন্ট)-এর

[৮]. The Quranic reference has been included in the parenthesis within the text. Quran 48:28 stands for Quranic chapter 48, Verse 28. One of the three most acceptable translations of the Quran, hosted by the University of Southern California (http://www. usc. edu/dept/MSA/quran/), has chosen for linguistic clarity.

অংশবিশেষ ভুলে গেছে বা ভুল বুঝেছে – আল্লাহ সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য কিংবা সেসব অংশগুলো সংশোধনের জন্য নবি মোহাম্মদকে না পাঠিয়ে, মোহাম্মদের নেতৃত্বে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান!

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুটো প্রাথমিক ভিত্তির উপর: প্রথমত কোরানে ধারণকৃত স্বর্গীয় বা দৈববাণী এবং দ্বিতীয়ত নবির ঐতিহ্য ও বাণী, যাকে হাদিস বা সুন্নাহ বলা হয়। দৈববাণী হলো মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের নিজস্ব বার্তা, যা আরবি কোরানে অপরিবর্তিত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। মোহাম্মদ-কর্তৃক ইসলামধর্ম প্রচার ও বিস্তার কালে (৬১০-৬৩২ সাল) আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহক জিব্রাইলের মারফৎ অল্প অল্প করে তাঁর প্রত্যাদেশগুলো মোহাম্মদের নিকট পৌঁছে দেন। মোহাম্মদ ছিলেন একজন নিরক্ষর মানুষ। প্রত্যেকবার জিব্রাইল ঈশ্বরের ঐশীবাণী নিয়ে এসে মোহাম্মদকে তা পড়ে শোনাতেন, যতক্ষণ না মোহাম্মদের তা মুখস্ত হতো। অতঃপর মোহাম্মদ ঈশ্বরের বাণীসমুহ নির্ভুল রাখার জন্য তাঁর শিক্ষিত শিষ্যদের দ্বারা লিখিয়ে রাখতেন ও তাঁর কিছু প্রিয় শিষ্যদের দ্বারা সেগুলো মুখস্ত করাতেন। নবির মৃত্যুর পর ঐসব প্রত্যাদেশ পুস্ত কাকারে সংকলিত করা হয়, যা 'কোরান' নামে পরিচিত। সুতরাং কোরানে ধারণকৃত বিষয়সমূহ হলো মানবজীবনকে, যেভাবে ঈশ্বর কামনা করেন, ঠিক সেভাবে পরিচালিত করার জন্য তাঁর নিজের বাণী। সেরূপ জীবন যাপনকারী একজন বিশ্বাসী মৃত্যুর পর আল্লাহর স্বর্গে গমন করে সেখানে তাঁর অসীম অনুগ্রহ উপভোগের সুযোগ পাবে।

ইসলামের দ্বিতীয় উপাদান – বলতে গেলে ইসলাম ধর্মের অপর অর্ধাংশ – হলো নবির প্রথাগত ঐতিহ্য: অর্থাৎ নবি মোহাম্মদের কথা ও কর্মকাণ্ডসমূহ, যাকে সমষ্টিগতভাবে হাদিস বা সুন্নাহ বলা হয়। ঈশ্বর-প্রেরিত অগণিত নবির মধ্যে যেহেতু মোহাম্মদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও মানবীয় পূর্ণতার মূর্ত প্রতীক, সুতরাং স্বর্গে আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জনের জন্য মুসলিমদেরকে, তথা মানবজাতিকে, নবির মত নিষ্পাপ বা নিখুঁত জীবন-যাপন করতে হবে। আর তার একমাত্র উপায় হলো নবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা।

ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা নবি মোহাম্মদের মতো জীবন অতিবাহিত করতে পারবে, তাঁরা কোন নরকযন্ত্রণা ভোগ না করে সরাসরি স্বর্গে (বেহেস্তে) প্রবেশ করবে। কিন্তু কোন মুসলিমের পক্ষে মোহাম্মদের নিষ্পাপ জীবনের সমকক্ষ হওয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং অধিকাংশ মুসলিমকে প্রথমে কিছুকাল ইসলামের নরক বা দোযখের ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হতে হবে। তাদের নরকবাসের সময়কাল নির্ধারিত হবে পার্থিব জীবনে তারা কী পরিমাণ পাপ করেছে তার উপর। অতঃপর তারা স্বর্গে গমন করবে অনন্তকালের জন্য।

মুসলিমদের মধ্যে আর একটিমাত্র দল নরকের আগুনে দগ্ধ না হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। এরা হল তাঁরা যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করবে, অর্থাৎ তাঁরা যখন জিহাদ বা পবিত্র ধর্মযুদ্ধে মারা যাবেন (কোরান ৯:১১১; তৃতীয় অধ্যায়ে আরো দেখুন)। অতএব নবি মোহাম্মদের জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশে কিংবা পরিচালনায় যুদ্ধ করতে গিয়ে যে শত শত মুসলিম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী যে লাখ লাখ মুসলিম ইসলামের পবিত্র যুদ্ধে মারা গেছেন এবং এখনও মারা যাচ্ছেন বা ভবিষ্যতে মারা যাবেন – তাঁরা সরাসরি ইসলামের স্বর্গে পদার্পণ করবেন। অন্যান্য মুসলিমরা, যারা স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে, তাদেরকে আলাহ-কর্তৃক সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসের পর 'শেষ বিচারের দিন' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ ঐদিন আল্লাহ নির্ণয় করবেন স্বর্গে গমনের আগে কতকাল তাদেরকে নরকে কাটাতে হবে।

সুতরাং মুসলিমদের মাঝে নবি মোহাম্মদের জীবনের, অর্থাৎ তাঁর কথা ও কর্মকাণ্ডের, সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমকক্ষ হওয়ার একটা সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। মুসলিম জীবনের অপর পরম আকাঙ্ক্ষাটি হলো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ইসলামের পবিত্র যুদ্ধে শহীদ হওয়া, বিশেষত ইসলামের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য অমুসলিম-নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড দখলের জন্য যেসব যুদ্ধ। ইসলামের শুরুতে বিকাশমান মুসলিম সম্প্রদায় মদীনায় নবি মোহাম্মদ পরিচালিত জিহাদ-পেশায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল। সে সকল যুদ্ধে লুণ্ঠিত মালামালের (ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত) উপর নির্ভর করেই তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতো (তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)।

নবুয়তীর তেইশ বছরকাল ধরে মোহাম্মদ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। সকল পরিস্থিতিতে – তা হোক যুদ্ধে কোন সঙ্কট, যুদ্ধ-বন্দিদের বিষয়ে কোন সমস্যা কিংবা পরিবারের কোন বিবাদ মীমাংসা – জীবনের পদে পদে আল্লাহ মোহাম্মদকে পরিচালিত করতেন। নবির সকল কাজকর্মে আল্লাহ অবিরাম নজর রাখতেন। যখনই মোহাম্মদ কোন ভুল করতেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ হাজির হতেন পরামর্শ দিতে বা সে ভুল সংশোধন করতে। এরূপে নবুয়তীকালে মোহাম্মদের প্রতিটি কথা ও কাজ ছিল স্বর্গীয় বা দিব্য ভাবে পরিচালিত, অর্থাৎ দিব্য প্রকৃতির। কাজেই 'সহি মুসলিম' (a collection of prophetic tradition)-র অনুবাদক ও বিশিষ্ট পণ্ডিত আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী সুন্নতকে স্বর্গীয় সৃষ্টি বলে দাবি করে বলেন: '*...কোরান ও সুন্নতের উপদেশাবলি কোন মানব শক্তি থেকে উদ্ভূত নয়, এর সবই ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট; সুতরাং এগুলো সকল বস্তুগত ও ইহলৌকিক বিবেচনার উর্ধ্বে।*'[৯] এ কারণে ইসলামে নবির সুন্নতসমূহ ধর্মগ্রন্থ কোরান-বহির্ভূত কিন্তু আধা-স্বর্গীয় হিসেবে বিবেচিত, যা মুসলিমদেরকে অতি সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে হবে।

মুসলিমদের জন্য নবি মোহাম্মদের জীবনের সমকক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কেবল একটা সূত্রবদ্ধ সিদ্ধান্ত নয়। আল্লাহ কোরানের নির্দেশ প্রতিপালনের সাথে সাথে নবিকে অনুসরণ করতেও বারবার মুসলিমদেরকে নির্দেশ করেছেন। কোরানে বারংবার বলা হয়েছে: আল্লাহকে (অর্থাৎ কোরানকে) এবং তাঁর প্রেরিত নবিকে (অর্থাৎ সুন্নতকে) মেনে চলো (কোরান ৩:৩২; ৪:১৩,৫৯,৬৯; ৫:৯২; ৮:১,২০,৪৬, ৯:৭১; ২৪:৪৭, ৫১-৫২,৫৪,৫৬; ৩৩:৩৩; ৪৭:৩৩; ৪৯:১৪; ৫৮:১৩; ৬৪:১২)। কাজেই ইসলাম ধর্মে কোরানের নির্দেশাবলি ও সুন্নত হলো প্রায় সমমানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাহোক ইসলামের কিছু আধুনিক ও সুশিক্ষিত কৈফিয়তদাতা, শুধু বিরোধিতার কারণে হোক কিংবা অজ্ঞতার কারণে, আল্লাহর সুস্পষ্ট সতর্কবাণী সত্ত্বেও সুন্নতকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট। তার কারণ হাদিসে বর্ণিত নবির কিছু কিছু সুন্নত বা কার্যকলাপ আধুনিক চেতনা ও মূল্যবোধের কাছে অগ্রহণযোগ্য, এমনকি ঘৃণ্য। তারা কোরানকে ইসলামের একমাত্র সংবিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এখানে উল্লেখ্য যে, নবি মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিতগণের দ্বারা কোরানের

---

৯. *Sahih Muslim by Imam Muslim*, Translated by Siddiqi AH, Kitab Bhavan, New Delhi, 2004 edition, Vol. I, p. 210–11, note 508.

বাণীর সঙ্গে যথাযথ মিল রেখে সুন্নত সংকলিত হয়েছিল, এবং তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের বিশেষজ্ঞ (উলেমা)-দের দ্বারা স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

'শরীয়া' বা 'পবিত্র ইসলামি আইন' হলো ইসলামের আরেকটি অপরিহার্য উপাদান। শরীয়া আইন ইসলামের পৃথক কোন উপাদান নয়, বরং তা কোরান ও সুন্নত থেকেই উদ্ভূত।

মোহাম্মদ ঈশ্বরের বাণীসমূহ তার শিষ্যদের মাধ্যমে খণ্ডে খণ্ডে লিপিবদ্ধ ও মুখস্ত করালেও তিনি সেগুলোকে পুস্তকাকারে সংকলিত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এখন যে কোরানকে আমরা চিনি, তা ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমানের শাসনামলে (৬৪৪-৬৫৬ সাল) সঙ্কলিত করা।

একইভাবে আল্লাহ বারংবার মুসলিমদের বলেছেন, নবি মোহাম্মদকে অনুসরণ করতে তবুও মোহাম্মদ কিন্তু তাঁর কাজ ও অবদান সম্বলিত জীবনী – যা বিশ্ব ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মুসলিমদেরকে অনুসরণ করতে হবে – তা লিখে কিংবা অন্যদের দ্বারা লিখিয়ে রেখে যাওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। স্পষ্টতঃ ইসলামের খোদাও মোহাম্মদকে তাঁর (খোদার) বাণীসমূহ একটা পুস্তকে (অর্থাৎ কোরান) একত্রিত করতে অথবা নবি মোহাম্মদের আত্মজীবনী (অর্থাৎ সুন্নত) লিখে রেখে যাওয়ার নির্দেশ দিতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ ইসলাম ধর্মের এ দু'টি মৌলিক উপাদান মুসলিমদেরকে সর্বকালে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

নবি মোহাম্মদের মৃত্যুর পর কয়েকজন বুদ্ধিমান মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর নবির এ দুর্বলতাগুলো উপলব্ধি করেন ও তা পূরণ করতে সচেষ্ট হন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম ধর্মকে অবিকৃত ও আদি অবস্থায় রাখতে হলে স্বর্গীয় বাণী ও সুন্নতের পদ্ধতিগত বিন্যাস জরুরি। সুতরাং আল্লাহর পূর্বেকার ধর্মগ্রন্থ 'গস্‌পেল' ও 'তোরা' (বাইবেল ও তাউরাত)'র ক্ষেত্রে ঘটা বিকৃতির মতো একই রকম বিকৃতি এড়ানোর জন্য তাঁরা মোহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় দুই দশক পর আল্লাহর দৈববাণীগুলো একত্রিত করে কোরান সংকলন করেন।

অতঃপর অভিজ্ঞ ইসলামিক পণ্ডিতদের দু'টো ধারা ইসলামকে সঠিক পথে রাখার নিমিত্তে পৃথক দু'টো বিশাল কার্য-প্রকল্পে নিয়োজিত হয়।

প্রথম প্রকল্পটি ছিল নবির সুন্নত একত্রিত করা। ৭৫০ সালের দিকে ধার্মিক মুসলিম পণ্ডিত ইবনে ইসহাক কর্তৃক নবির প্রথম জীবনী সংকলনের মধ্য দিয়ে তা শুরু হয়। তারপর থেকে বহু বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ও গবেষক নবির জীবনের ওপর অনেক দুঃসাধ্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার কাজে নিয়োজিত হন। অগণিত মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তাঁরা হেজাজ থেকে সিরিয়া, পারস্য, মিসর তথা আরবের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং নবির হাজার হাজার কথা, কাজ ও উপদেশ একত্রিত করেন। এদের মধ্যে ছয়জন অত্যন্ত মেধাবী ও দক্ষ হাদিস সংকলক রয়েছেন, যাঁদের সংকলিত হাদিস খাঁটি বা সহি হিসেবে স্বীকৃত:

১. আল-বুখারী (৮১০-৮৭০) সংগ্রহ করেছেন ৭২৭৫টি খাঁটি হাদিস, যাকে বলা হয় 'সহি বুখারী'।
২. মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ (৮২১-৮৭৫), বুখারীর একজন শিষ্য, সংগ্রহ করেছেন ৯২০০টি খাঁটি হাদিস, যাকে 'সহি মুসলিম' বলা হয়।
৩. আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৮) সংগ্রহ করেছেন ৪৮০০টি খাঁটি হাদিস, যাকে 'সুনান আবু দাউদ' বলা হয়।
৪. আল-তিরমিযী (মৃত্যু ৮৯২)।
৫. ইবনে মাজা (মৃত্যু ৮৮৬)
৬. ইমাম নাসাই (জন্ম ২১৫ হিজরী)।

সুন্নত সংকলনের সময়কালে আবির্ভাব ঘটে আরেকটি ধারার অতিশয় মেধাবী ইসলামি পণ্ডিতগণের। তাঁরা কোরানের বাণী ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের প্রয়োজনীয় আইনসমূহ সুনির্ধারিতভাবে সূত্রবদ্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে চারজন বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিতের উদ্যোগে চারটি প্রধান ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইসলামিক আইনশাস্ত্র (জুরিসপ্রুডেন্স) বা 'ফিকাহ্' নামে পরিচিত। তাঁরা হলেন:

১. ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হানাফি' আইনশাস্ত্র। দক্ষিণ এশিয়া, তুরস্ক, বলকান অঞ্চল, চীন এবং মিসরের মুসলিমরা এ ধারার অনুসারী।
২. ইমাম মালিক বিন আনাস (৭১৫-৭৯৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মালিকী' আইনশাস্ত্র। উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা এবং কয়েকটি আরব দেশের মুসলিমরা এ মতের অনুসারী।
৩. ইমাম আল শাফী (৭৬৭-৮২০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'শাফী' আইনশাস্ত্র। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মিসর, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া ও ইয়েমেনের মুসলিমরা এ সম্প্রদায়ের অনুসারী।
৪. ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বাল (৭৮০-৮৫৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হাম্বালী' আইনশাস্ত্র। সৌদি আরব ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মুসলিমরা এর অনুসারী।

বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের মতে 'ফিকাহ্' হলো: *'আলাহর বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান, যা ব্যক্তির কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত – যারা নিজে থেকেই ইসলামে কোনটা অবশ্যকরণীয় (ওয়াজিব), কোনটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম), কোনটা গ্রহণযোগ্য (মানদিউব), কোনটা অননুমোদিত (মাকরূহ), অথবা কোনটা শুধু অনুমতি-প্রাপ্ত (মুবাহ্) সে ব্যাপারে আইন মেনে চলতে বাধ্য'*।[১০]

চারটি প্রধান ইসলামি আইনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁদের ছাত্ররা ইসলামি আইন ও অনুশাসন সংক্রান্ত একটি সারসংক্ষেপ তৈরির জন্য তিন শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অসাধারণ গবেষণা চালান, সামগ্রিকভাবে তাকে পবিত্র ইসলামি আইন বা 'শরীয়া' বলা হয়। ইসলামের এ আইনশাস্ত্র গুলোর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও মৌলিক পার্থক্য একেবারেই নগণ্য।

---

১০. Levy R (1957) *The Social Structure of Islam*, Cambridge University Press, U.K., p. 150

ইসলামের খোদা আল্লাহ পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত জীবনবিধানরূপে সমগ্র মানবজাতির জন্য 'ইসলাম' উপস্থাপন করেছেন (কোরান ৫:৩)। অর্থাৎ ইসলাম হলো আল্লাহর প্রত্যাশানুযায়ী মানব জীবনযাপনের জন্য একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনবিধান। সুতরাং ইসলামি ধর্মবিধানে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সম্ভাব্য ঘটনা, পরিস্থিতি ও কর্মের জন্য একটি সমাধান বা দিকনির্দেশনা রয়েছে। জীবনের প্রতিটি অবস্থায় অনুসরণের জন্য শরীয়া'য় রয়েছে একটি স্বর্গীয় আইন, কর্মপ্রণালী ও অনুশাসন – হতে পারে তা খাদ্যগ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ, যৌনকর্ম, নামাজ আদায়, যুদ্ধ করা অথবা অন্য যে কোন বিষয়ে।

মুসলিম জীবনের সকলক্ষেত্রে শরীয়া আইন পরিব্যাপ্ত – হোক সে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক। ইসলামে আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক বা জাগতিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলাম হলো মানবজাতির ইহজাগতিক সমস্যার 'একের ভিতর সব' সমাধান। তুর্কির মুসলিম পণ্ডিত ড. সেদাত লেসিনার দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন: *'ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাও বটে।'*[১১] ভারতের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এম. উমরউদ্দিন বলেন, ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক অবিভাজ্য। তিনি দাবি করেন: *'সাধারণ অর্থে ইসলাম একটি ধর্ম নয়। ধর্মের কারবার শুধু মানুষের অন্তরের চেতনাকে নিয়ে – যার সাথে সামাজিক কর্মকান্ডের কোন যৌক্তিক সম্পর্ক নেই – এমন ধারণা ইসলামে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, সর্বোপরি ইসলামে তা ঘৃণিত।'*[১২] ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন মানবজীবনের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে – এ যুক্তির ওপর জোর দিয়ে তিনি আরো বলেন: *'ইসলাম সবকিছুকে আলিঙ্গন করে, একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যাতে মানবকর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তর ও মানবিক আচরণের প্রতিটি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত।'*

সংক্ষেপে কোরান ও সুন্নত হলো ইসলামের দু'টো প্রাথমিক সংবিধান। এ দু'টো প্রাথমিক উৎস থেকেই উদ্ভব ঘটেছে শরীয়া আইনের। কোরান, সুন্নত ও শরীয়া আইন একত্রে ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি রচনা করে। এগুলো সকল স্থানে, সর্বকালে ও সকল সমাজে মুসলিম জীবন-যাপনের জন্য অপরিহার্য ও পূর্ণাঙ্গ পথপ্রদর্শক।

অধ্যায় - ৩

নবি মোহাম্মদের জীবন ও জিহাদের জন্ম

'আমি বিজয়ী হয়েছি সন্ত্রাসের মাধ্যমে।' - (নবি মোহাম্মদ, বুখারী ৪:৫২:২২০)
'মোহাম্মদ হলেন মানবচরিত্রের মহিমান্বিত আদর্শ।' - (আল্লাহ, কোরান ৬৮:৪, ৩৩:২১)

অনেক মুসলিম মনে করে যে, সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীতে সর্বশেষ পয়গম্বর হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মানবজাতির কাছে আল্লাহর চুড়ান্ত ধর্মমত প্রচারের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ মোহাম্মদকে সৃষ্টি করেছিলেন। ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি কথা রয়েছে যে, মোহাম্মদকে জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করেন: *'সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ কোন জিনিসটি সৃষ্টি করেন।'* উত্তরে নবি বলেন: *'আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর নিজের আলো থেকে তোমাদের নবির আলো সৃষ্টি করেন।'*[১৩]

নবি মোহাম্মদের জীবন ছিলো সর্বকালের পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত জীবন (ইনসান-ই কামিল)। তাঁর জীবন ছিলো নৈতিক উৎকর্ষ ও পুণ্যে পরিপূর্ণ, অনৈতিকতা ও পাপ বিবর্জিত। তাঁর চরিত্রে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের ভাল দিকগুলো সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল – হোক তা তাঁর যৌন নৈতিকতা, দয়ামায়া বা অন্য কোন ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, খারাপ বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আদৌ ছিল না; থাকলেও তা ছিল সবচেয়ে নগণ্য মাত্রায়।

তিনি ছিলেন অভ্রান্ত ও নিষ্পাপ, যেহেতু আল্লাহ নিজেই তাঁকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেছিলেন। কোরানে বলা হয়েছে: *'আমরা (আলাহ) কি তোমার (মোহাম্মদের) বক্ষ প্রসারিত করে সেখান থেকে সমস্ত ভার (পাপ) অপসারিত করি নি?'* (কোরান ৯৪:১-২)। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু, নির্দোষ, সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমাশীল এবং সর্বাধিক মহানুভব ও সৎ। অপরদিকে, তাঁর চরিত্রে আদৌ কোন নিষ্ঠুরতা বা বর্বরতা ছিল না। আল্লাহ নিজেই এ সত্যতা জ্ঞাপন করেন এভাবে: *'এবং আমরা (আল্লাহ) পৃথিবীর প্রতি অনুকম্পা করে তোমাকে (মোহাম্মদকে) পাঠিয়েছি'* (কোরান ২১:১১৭)।

'নৈতিক বিশুদ্ধতার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে' একথা বলে নবি মোহাম্মদ স্বয়ং গর্ব করতেন। ইসলামের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও পুনরুজ্জীবনবাদী ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু ১১১১) – নবি মোহাম্মদের পর যাঁকে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয় – তাঁর বিবেচনায় *'জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবি ছিলেন একজন আদর্শ, সর্বোচ্চ উৎকর্ষতায় বিশুদ্ধ বা পরিপূর্ণ মানুষ।'* নবির ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশালত্ব বা মহত্ত্ব সম্বন্ধে গাজ্জালী আরও লিখেন:

> প্রেরিত মহাপুরুষ সর্বদাই আল্লাহর কাছে আনত চিত্তে তাঁকে সর্বোচ্চ নৈতিক গুণাবলী ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি ছিলেন অসামান্য নম্রতার প্রতীক এবং মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে মহৎ, সাহসী, ন্যায়বান ও ধার্মিক। ...নির্যাতিতরূপে, স্বামী হিসেবে, নেতা ও বিজয়ীরূপে নবি নৈতিক আচরণের যে উচ্চমান প্রদর্শন করে গেছেন, তা তাঁর আগে বা পরে কেউ কখনও পারেনি।[১৪]

---

১১. Laçiner S, *The Civilisational Differences As a Condition for Turkish Full-Membership to the EU*; Turkish Weekly, 9 Feb. 2005

১২. Umaruddin M (2003) *The Ethical Philosophy of Al-Ghazzali*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, p. 307

১৩. Haddad GF, *The First Thing That Allah Created Was My Nur*, Living Ialam website: http://www.livingislam. org/fiqhi/fiqha-e30.html

১৪. Umaruddin, p. 66-67.

অতএব নবি মোহাম্মদ হলেন মানবজাতির কাছে মঙ্গল, ন্যায়বিচার ও দয়ার সর্বোচ্চ মূর্ত প্রতীক। জীবনে তিনি যা কিছু করেছেন, সেটাই ছিল সবচেয়ে উত্তম; মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সবার সাথে তিনি যে আচরণ করে গেছেন, তা ছিল সবচেয়ে ন্যায্য ও ক্ষমাশীল। এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে নবি মোহাম্মদের জীবন – বিশেষ করে আরবের অমুসলিম মূর্তিপূজক, ইহুদি ও খ্রিষ্টান, বারবার তিনি যাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন – তাদের সঙ্গে তাঁর আচরণ আলোচনা করা হবে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মুসলিমরা তর্কাতীতভাবে বিশ্বাস করে যে এসব লোকদের সঙ্গে মোহাম্মদের আচরণ (নীচে বর্ণিত) সর্বক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে সুন্দর, ন্যায্য ও ক্ষমাশীল।

এ অধ্যায়ে মোহাম্মদ-কর্তৃক ইসলাম প্রতিষ্ঠাকালীন জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ যেসব প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা হবে। অধ্যায়টি পাঠ করে পাঠকগণ জিহাদের সত্যিকার অর্থ (আল্লাহ-কর্তৃক যেরূপে প্রকাশিত হয়েছিল) এবং জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ ও তার বাস্তব প্রয়োগ – যা নবি মোহাম্মদ আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন – তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

জন্ম ও শৈশব জীবন (৫৭০-৬১০ খ্রিষ্টাব্দ)

নবি মোহাম্মদ ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে (সি ৫৬৭-৭২) আরবের মরুশহর মক্কার কোরাইশবংশের একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কোরাইশরা ছিল তৎকালীন মক্কা নগরীর প্রধান গোষ্ঠী। তৎকালে মক্কা মরু উপত্যকার একটি কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত ছিল, যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল দু'টি প্রধান বাণিজ্য পথ। এর একটি হিমায়ারকে যুক্ত করেছিল প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার সাথে; অন্যটি সংযুক্ত করেছিল ইয়েমেন, পারস্য উপসাগর ও ইরাককে। এ কৌশলগত অবস্থানের কারণে মক্কা ভারত মহাসাগর (পূর্ব আফ্রিকাসহ) ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যাতায়াতকারী মরু-বাণিজ্য কাফেলাগুলোর ট্রানজিটপয়েন্টরূপে কাজ করত। মক্কার মধ্য দিয়ে মিশর, সিরিয়া, রোম, বাইজেন্টাইন, পারস্য ও ভারতীয় বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহের মধ্যে বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী চলাচল করতো।

এভাবে মক্কা হয়ে উঠেছিল তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি ব্যস্ত কেন্দ্র ও মরুভূমির বাণিজ্য কাফেলাগুলোর জন্য পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের নিয়মিত থামার বা বিশ্রামের স্থান। ফলে এ অঞ্চলের দুই বৃহৎ শক্তি, পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, মক্কার নেতাদের সাথে মিত্রতা করে মক্কাকে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রনে রাখতে চেষ্টা করত।[১৫]

কুসাই বিন কিলাব ছিলেন প্রথম কুরাইশ, যিনি মক্কার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান করায়ত্ব করেন। তিনি ৪৫০ সালের দিকে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সমর্থনে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে আঁতাত করে তৎকালীন মক্কার শাসকগোষ্ঠী খুজায়া'-দের ক্ষমতাচ্যুত করে মক্কায় কুরাইশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কা শাসন ও পবিত্র কা'বা ঘরের প্রশাসনের জন্য সামরিক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রের বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে, তিনি ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ কা'বা ঘর পুণর্নির্মাণ ও বিশালকৃত করেন, যা এর আগের শাসকদের আমলে ছিল অবহেলিত। তিনি কা'বার পুনর্গঠন ও পুননির্মাণ করে তার ভেতরে আল-লাত, আল-উজ্জা ও আল-মানাত নামক নাবাতাইয়ানদের তিন দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আরব পৌত্তলিক ধর্মমতে এ তিন দেবী ছিল তাদের ঈশ্বর (হুবাল বা আল্লাহ)-এর কন্যা।

মোহাম্মদের পিতামাতাকে প্রতিনিয়ত অভাবের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হতো। পিতা আব্দুল্লাহর মৃত্যুর সময় তাঁর মা আমিনা তাঁকে গর্ভে নিয়ে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এরপর তাঁর মায়ের অভাব-অনটন আরও প্রকট হয়ে উঠে। মক্কার উচ্চবিত্তদের (যেমন কুরাইশ) মধ্যে তৎকালে নবজাতককে বেতনভুক্ত পালক মায়ের কাছে রেখে লালন-পালনের একটা নিয়ম ছিল।[১৬] পালক মাকে বেতন দিতে অসমর্থ তাঁর মা এক সপ্তাহ বয়সের শিশু মোহাম্মদকে হালিমা নামের এক বেদুইন মহিলার কাছে অর্পণ করেন।[১৭] হালিমা তার একই বয়সের নিজ ছেলের সঙ্গে মোহম্মদকে লালন-পালনের দায়িত্ব নিয়ে চলে যায়।

হালিমা অতঃপর চার বছর বয়সী মোহাম্মদকে প্রথম মক্কায় ফিরিয়ে আনে তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করানোর জন্য। এ সম্পর্কে কথিত আছে যে, মোহাম্মদকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করায় হালিমার পরিবারের ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। কাজেই তাঁরা মোহাম্মদকে বড় না হওয়া পর্যন্ত রাখতে চায়। সে মোতাবেক মোহাম্মদের পালক মাতাপিতা পুনরায় তাঁকে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন একদিন হালিমা মোহাম্মদকে মক্কায় এনে আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেয়। জানা যায়, হালিমা মোহাম্মদকে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তাঁকে নিয়ে সংঘটিত একটি অলৌকিক কাহিনী ব্যক্ত করে। বলা হয়, "*ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি মোহাম্মদের কাছে আসে ও তাঁকে মাটিতে শোয়ায়। তারা তাঁর বুক চিড়ে ফেলে এবং (কিছু) অনুসন্ধান করে।*"[১৭ক] পরবর্তীতে আল্লাহ এ ঘটনাটিকে মোহাম্মদের পাপ মুছে ফেলে পবিত্রকরণের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেন (কোরান ৯৪:১-২)। এ দাবীর সত্যতার সমর্থনস্বরূপ জানা যায়, মোহাম্মদ তাঁর কাঁধের দুই অস্থির মাঝখানে একটি চিহ্ন নিয়ে ফেরেন। পরবর্তীতে এ চিহ্নকে তাঁর '*নবুয়তির সিলমোহর*' হিসেবে বর্ণনা করা হয় (সহি বোখারী ৪:৭৪১, তিরমিযি ১৫২৪)।

আমিনা অতি যত্নের সাথে মোহাম্মদকে লালন পালন করেন। কিছুকাল পরে তিনি মোহাম্মদকে মদীনায় নিয়ে আসেন। মদীনার অবস্থান মক্কা থেকে ২১০ মাইল উত্তরে, ১০ থেকে ১২ দিনের পথ। মোহাম্মদের প্রমাতামহী মদীনায় খাজরাজ বংশের মেয়ে হওয়ায় এ বংশের সঙ্গে মোহাম্মদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মদীনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে তাঁর মা মারা যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। তাঁর প্রিয় দাদা আবদ-আল মুত্তালিব মারা যাবার পর চাচা আবু তালিব কিশোর মোহাম্মদের লালন-পালন করেন। যাহোক তাঁকে কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হয় অতি অল্প বয়সে। কিশোর বয়সেই তিনি মেষ পালকের কাজ করতেন এবং গবাদি পশু চারণ করে একাকী নিঃসঙ্গ সময়

---

[১৫]. Walker B (2002) *Foundation of Islam*, Rupa & Co, New Delhi, p.37
[১৬]. Muir W (1894) *The Life of Mahomet*, London, p. 129-30
[১৭]. Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad*, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p. 71.
[১৭ক]. Ibid, p. 71-72.

কাটাতেন। মোহাম্মদের বয়স যখন পঁচিশ, তখন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলাব্যবসায়ী চল্লিশ বছর বয়স্কা খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এটা তাঁর ভাগ্যে নাটকীয় পরিবর্তন আনে ও তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এর আগে খাদিজা মোহাম্মদকে তার ব্যবসা দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত করেছিল। ব্যবসা লাভজনকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে অচিরেই তিনি খাদিজার মন জয় করেন। পনেরো বছরের কম বয়সী তরুণ, মেধাবী ও সামর্থ্যবান যুবক মোহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খাদিজা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।[১৮]

ওয়ারাকা বিন নওফেল নামে খাদিজার এক বয়স্ক চাচাত ভাই ছিল। তার ধর্মীয় বিশ্বাসে কোন দৃঢ়তা ছিল না। প্রথমে তিনি একেশ্বরবাদে আকৃষ্ট হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন, পরে খ্রিষ্টান হন।[১৯] ওয়ারাকা ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। হাদিসে বলা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে তিনি আরবি ভাষায় 'গস্‌পেল' পড়তেন (বুখারী ৪:৬০৫)। ওয়ারাকার সাথে খাদিজার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় খাদিজাও একেশ্বরবাদের, বিশেষ করে খ্রিষ্টান ধর্মের, দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ সময় পর্যন্ত মোহাম্মদ কুরাইশদের বহুঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক ধর্মের সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। কিন্তু বিবাহের পর খাদিজা ও ওয়ারাকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পর মোহাম্মদ পৌত্তলিকতা চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন এবং একেশ্বরবাদী ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠেন। জানা যায়, বিয়ের অল্প কিছুদিন পর মোহাম্মদ মক্কার নিকটবর্তী হীরা পর্বতের একটি গুহায় ধ্যান করার জন্য বছরের একটা সময় অতিবাহিত করা শুরু করেন। এ গুহাতেই প্রতি রমজান মাসে তাঁর দাদা ধ্যানমগ্ন থাকতেন। মক্কার একেশ্বরবাদী 'হানিফ' সম্প্রদায়ের (নিচে দেখুন) লোকদের মধ্যে পর্বতের গুহায় এরূপ ধ্যানমগ্ন হওয়ার একটা রীতি ছিল। মুসলিমরা বিশ্বাস করেঃ ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্তির আশায় মোহাম্মদ ধ্যানস্থ হয়ে এ গুহায় সময় কাটাতেন এবং এরূপে পনের বছর ধ্যান করার পর তিনি নতুন ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

ইহুদি ধর্মেও সিনাই পর্বতের গুহায় মুসা নবির ধ্যানমগ্ন হওয়ার একই রকম কাহিনী প্রচলিত। জানা যায়, মুসা নবি সেখানে ঈশ্বর (জেহোবা/ইয়াওয়ে)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ঐ কাহিনীর দ্বারা মোহাম্মদ অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন। ইসলামি সাহিত্যে কিছু নজির রয়েছে যা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মোহাম্মদ গুহায় একা সময় কাটাতেন না সব সময়; কখনও কখনও তাঁর স্ত্রী খাদিজা এবং ওয়ারাকাও সঙ্গ দিতেন। ইসলামি সাহিত্য আরো জানায় যে, ওয়ারাকার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে মোহাম্মদ তাঁর ধ্যানমগ্নতার শেষ দিকে ও নবুয়তির প্রথম দিকে মাঝে মাঝেই ইহুদি রাব্বি ও খ্রিষ্টান যাজকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ধারণা করা হয় যে, ধ্যানমগ্নতার বছরগুলোতে মোহাম্মদ জনচক্ষুর অন্তরালে হীরা পর্বতের গুহায় একেশ্বরবাদী ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে নিজেকে পরিচিত করেন। হয়তোবা এর উদ্দেশ্য ছিলঃ মক্কার পৌত্তলিকদের মাঝে ইব্রাহিমপন্থী একত্ববাদী ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করা।

নবুয়তীর মক্কা পর্ব (৬১০-৬২২)

উপরোক্ত পটভূমিতে ও হীরা পর্বতের গুহায় পনের বছর ধ্যান করার পর (৪০ বছর বয়সে, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ) মোহাম্মদ একদিন দাবি করেন যে, এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর থেকে কিছু বার্তা শুনেছেন তিনি।[২০] এ ঘটনা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা ও ওয়ারাকা। তাঁরা আপাতঃ বিভ্রান্ত মোহাম্মদের মনে এই বলে প্রত্যয় আনেন যে, একটা নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য স্বর্গীয় দূত বা ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। ওয়ারাকা মোহাম্মদকে বলেন: *'নবুয়তির রীতি অনুযায়ী এটা সেই ফেরেশতা, যাঁকে ঈশ্বর মুসার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। ঐশীবাণী পাওয়া পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি, তবে আমি তোমাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবো'* (বোখারী ৪:৬০৫)। যাহোক ওয়ারাকা কখনই ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং খ্রিষ্টানরূপেই মারা যান।

মোহাম্মদ তাঁর একেশ্বরবাদী ঈশ্বরের নাম দেন আল্লাহ, যা ছিল আরব পৌত্তলিক ধর্মের প্রধান দেবতার নাম।[২১] এ অঞ্চলে ঈশ্বর বুঝাতে সাধারণত এ নামটিই ব্যবহৃত হতো। তাঁর স্বর্গীয় মিশন জনসমক্ষে প্রচারের আগে তিন বছর মোহাম্মদ তাঁর সঙ্গী-সাথী ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে গোপনে তাঁর কথিত ঐশীবাণী প্রচার করেন। স্থানীয় পৌত্তলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী কা'বা ঘর বিবেচিত হতো 'ঈশ্বরের ঘর' রূপে। কিন্তু মোহাম্মদের ঐশীবাণী দাবি করে যে, কা'বা তাঁর ঈশ্বরেরই 'পবিত্র স্থান', যা স্থাপন করেছিলেন ইহুদিদের আদি পিতা ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল। ইসলামে উভয়েই অতি মর্যাদাশীল নবি বলে গণ্য। তিনি শুরুতে তাঁর নতুন ধর্মকে 'ইব্রাহিমের ধর্ম' বলে অভিহিত করেন এবং মক্কার বহুঈশ্বরবাদীদেরকে পৌত্তলিকতা ছেড়ে তাঁর ধর্মমত অনুসরণের আহ্বান জানান। মোহাম্মদ কীভাবে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে তাঁর ধর্ম অনুসরণের আহবান জানান ও কা'বাকে তাঁর ঈশ্বরের নিজস্ব ঘর বলে দাবি করেন, এখানে তা উদ্ধৃত হলো :

> এরপর যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কল্পনা করবে, তারা হবে নীতি লংঘনকারী। বলো, "আলাহ সত্যভাষী। *সুতরাং ইব্রাহিমের সত্যধর্ম অনুসরণ করো। তিনি পৌত্তলিকদের মধ্যেকার ছিলেন না"।* দেখো, প্রথম পবিত্রস্থান (কা'বা) মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট করা হয় বেক্কায় (মক্কা), একটি মহিমান্বিত স্থান, জনগণের জন্য একটি দিক-নির্দেশক; যেখানে রয়েছে সুস্পষ্ট স্মৃতিস্মারক (আল্লাহর দিক নির্দেশনার); *'এটা সেই স্থান যেখানে ইব্রাহিম প্রার্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন;* এবং যে-ই এখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এবং আল্লাহর উদ্দেশে এ ঘরের দিকে তীর্থ করা মানবজাতির কর্তব্য। এবং তার

---

[১৮]. It should be noted here that widowed khadijah was looking for an able agent to run her businesses. Her nephew, named Khuzaima, once met Muhammad when he was on a business trip overseas with his uncle, Abu Taleb. Khuzaima spotted Muhammad's business talent, which he had mastered while accompanying his uncle's trade-caravans to various destinations since the age of twelve. Khuzaima later introduced him to Khadijah for employing him to run her businesses.

[১৯]. Ibn Ishaq, p. 83

[২০]. Ibid, p. 111

[২১]. Muhammad's father's name was Abdullah, meaning slave of Allah.

জন্য, যে ঐ স্থানাভিমুখে পথ খুঁজে পায়। আর যে অবিশ্বাস করে (তাকে জানতে দাও): দেখ! আল্লাহ সকল সৃষ্ট জীব থেকে স্বাধীন।' (কোরান ৩:৯৪-৯৭)

এ ধরনের দৈববাণী স্বাভাবিকভাবেই মক্কার ধর্মপ্রাণ কোরাইশদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তাদের অধিকাংশই মোহাম্মদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে। তারা কিছুতেই কা'বার তত্ত্বাবধানের ভার মোহাম্মদের হাতে তুলে দেয়নি। বলা হয় যে, প্রায় ১৩ বছর মক্কায় প্রচার চালানোর পর ৬২২ সালের জুন মাসে মোহাম্মদ মক্কার কোরাইশদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময়কালে মোহাম্মদ অল্পসংখ্যক, মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ জনকে ইসলামে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন। মদিনায় নিজেকে নিরাপদ করার পর পরবর্তী আট বছরব্যাপী তিনি কোরাইশদের জীবনযাত্রা ও ধর্ম ধ্বংস করার এক নির্মম কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেন। ৬৩০ সালে তিনি মক্কা দখল করে কা'বার সকল মূর্তি ধ্বংস করেন। পরিশেষে তিনি মক্কার পৌত্তিলিকদেরকে মৃত্যু হুমকি দিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন।

এবার আমরা মোহাম্মদের মক্কা ত্যাগ এবং কোরাইশদের নির্মমতা ও অসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত কিছু জনপ্রিয় কাহিনী বিশ্লেষণ করব।

মোহাম্মদকে কি মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল?

মুসলিমরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে যে, ৬২২ সালে কোরাইশরা মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরকে জোর-পূর্বক মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেন। ফলে তাঁরা মদীনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'হিজরত' নামে পরিচিত। এ কাহিনী অনুসারে, নবী মোহাম্মদকে হত্যা করতে কোরাইশরা লোক পাঠায়। এ ষড়যন্ত্রের খবর মোহাম্মদ কারো মারফত জানতে পেয়ে তাঁর অতি-বিশ্বস্ত অনুসারী আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে পালান। খুনিরা ধাওয়া করলে তাঁরা মক্কা থেকে প্রায় এক ঘন্টার পথ 'থর' পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। ধাওয়াকারীরা সে গুহার কাছে এলে দেখতে পায় যে, গুহার মুখে কবুতর ইতিমধ্যে বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছে। পরন্তু একটা মাকড়সা গুহার প্রবেশ পথে তৎক্ষণাৎ জাল বিস্তার করে। ঐ মুহূর্তে গুহাটিতে কোন মানুষ প্রবেশ করা অসম্ভব ভেবে ধাওয়াকারীরা ফিরে যায়। অতঃপর মোহাম্মদ ও আবু বকর রাতের অন্ধকারে গুহা থেকে বেরিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করেন এবং ১২ দিন পর মদীনায় পৌঁছান। এ গল্প ইসলামী লোক-গাঁথায় ও সাহিত্যে মোহাম্মদকে রক্ষায় ঈশ্বরের এক অলৌকিক কাজ রূপে পেশ করা হয়েছে।

মোহাম্মদকে হত্যার জন্য কোরাইশদের এ উদ্যোগ ইসলামী সাহিত্যে একটা পরিচিত কাহিনী হলেও কয়েকটি কারণে এর সত্যতা প্রমাণ করা দুরূহ। প্রথমতঃ মক্কায় ধর্মপ্রচারকালে মোহাম্মদ অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করেন কয়েকবার। মোহাম্মদ-কর্তৃক মক্কার বিদ্যমান ধর্ম, প্রথা ও রীতিনীতির অপমান বা অমর্যাদার ফলে ৬১৫ সালের দিকে মক্কাবাসীরা তাঁর নবুয়তী কার্যকলাপের বিরোধী হয়ে উঠে, যা তাঁর ধর্মপ্রচার অনেকটা দুরূহ করে তোলে। এ সময় মোহাম্মদের শিষ্যদেরকে তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নিজস্ব পরিবারের লোকেরা প্রলুব্ধ করতে থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামি ইতিহাসবিদ আল-তাবারি জানান: কোরাইশরা এ সময় কিছু মুসলিমকে পৌত্তলিক ধর্মে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়, *"যা ইসলামী সম্প্রদায়কে আন্দোলিত করে তুলে"*। আল-তাবারি লিখেছেন নব-মুসলিমরা তাদের আগের ধর্মে ফিরে যেতে পারে এ ভয়ে মোহাম্মদ তাঁর শিষ্যদেরকে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) অভিবাসিত হওয়ার নির্দেশ দেন।[২২] এ নির্দেশের পর পরিবারের চাপে উদ্বিগ্ন প্রায় এক ডজন শিষ্য স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ছোট ছোট দলে গোপনে আবিসিনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে। ৬১৬ সালে আবার এরকম আরেকটি অভিবাসন জোয়ার আসে। বিভিন্ন হিসাব মতে, মোহাম্মদের ৮২ থেকে ১১১ জন শিষ্য আবিসিনিয়ায় অভিবাসিত হয়েছিলেন। এ স্বনির্বাসিত শিষ্যরা মক্কায় ও পরে মদীনায় ফিরে আসেন ৬ মাস থেকে ১৩ বছরের মধ্যে। স্বনির্বাসিতদের মধ্যে কয়েকজন আবিসিনিয়ায় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। মোহাম্মদ তাঁর শিষ্যদের আবিসিনিয়া যেতে নির্দেশ করেন শুধুমাত্র তাদেরকে পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্যই নয়, সেখানে একটা নির্বিঘ্ন আশ্রয়স্থল খুঁজে পাওয়ার জন্যেও। কেননা ভবিষ্যতে মক্কায় তাঁর মিশন ব্যর্থ হলে বা তাঁর অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে উঠলে, তাঁর নিজেরও অন্যত্র আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

মোহাম্মদ কোরাইশদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও রীতি-নীতির প্রতি মর্যাদাহানি ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার অব্যাহত রাখলে উত্যক্ত কোরাইশরা ৬১৭ সালে তাঁর অনুসারীদেরকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে তাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। দু'বছর পর (৬১৯ সালে) এ অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়। অবরোধ প্রত্যাহার হলেও মোহাম্মদের ধর্মপ্রচার প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে; কেননা প্রকাশ্য প্রচারণা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে অন্যত্র একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থানের সন্ধানে তিনি ৬১৯ সালে তা'য়েফ গমন করেন। মোহাম্মদ কোরানে ইতিপূর্বে তা'য়েফীদের প্রধান দেবী আল-লাত'কে অবমানিত করেছিলেন; তথাপি তা'য়েফবাসীরা মোহাম্মদের আগমনে বাধা দেয় নি। তা'য়েফের জনগণকে তিনি তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামে যোগ দেওয়ার আহবান জানান। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি মক্কার কোরাইশদের বিরুদ্ধে তা'য়েফীদেরকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলার চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য যে, কোরাইশ ও তা'য়েফীদের মধ্যে ভাল ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সেখানে দশ দিন অবস্থানকালে মোহাম্মদ তা'য়েফী নেতাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে ও কোরাইশ-বিরোধী উদ্দেশ্য সফল করতে চেষ্টা করেন। ইবনে ইসহাক তাঁর তা'য়েফ মিশন সম্পর্কে বলেন: "*নবী তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি জন্মভূমি মক্কায় তাঁর বিপক্ষীদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদন জানান।*" কিন্তু তা'য়েফে তার দ্বিমুখী উদ্দেশ্য – তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিতকরণ ও কোরাইশদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র – দু'টোই ব্যর্থ হয়। মক্কায় ফেরার পর কোরাইশদের শত্রুতা আরো বেড়ে

[২২]. Al- Tabari (1988) *The History of Al-Tabari*, Trs. WM Watt and MV McDonald, State University of new York Press, Vol. VI, p.45.

যেতে পারে, এ আশঙ্কায় মোহাম্মদ তা'য়েফ থেকে ফেরার আগে সেখানে যেসব আলোচনা হয়েছে তা গোপন রাখার জন্য তা'য়েফবাসীদেরকে অনুরোধ করেন।[২৩]

এ খবর কোন না কোন উপায়ে মক্কায় পৌঁছে যায়। তবুও কোরাইশরা তাঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেনি এবং মক্কায় ফেরার পর তাঁকে কোনরকম বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়নি।

যাহোক, ৬১৯ সালে স্বেচ্ছায় মোহাম্মদের তা'য়েফে আশ্রয় গ্রহণের প্রয়াস ও আবিসিনিয়ায় দুই-দুই বার তাঁর শিষ্যদেরকে প্রেরণ, এটা অবিশ্বাস্য করে তুলে যে কোরাইশগণ কর্তৃক হত্যার চেষ্টার কারণে তিনি মদীনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়; নিম্নে বর্ণিত ৬২০ সালের প্রথমদিকে মোহাম্মদের মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের অতিশয় আগ্রহ কোরাইশ-কর্তৃক তাঁকে হত্যার দাবীকে আরও অবিশ্বাস্য করে তোলে।

মক্কায় মোহাম্মদের মিশন স্থবির হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় ৬২০ সালে কা'বায় তীর্থকালে (হজ্জ) মোহাম্মদ মদীনার কয়েকজন তীর্থযাত্রীর কাছে তাঁর ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন এবং তাদের ছয়জন ইসলাম গ্রহণ করে। মোহাম্মদ মক্কায় তাঁর ধর্মপ্রচারে অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে মদীনায় অভিবাসিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের কাছে জানতে চান, সেখানে তারা তাঁকে রক্ষা করতে পারবে কিনা।[২৪] কিন্তু নতুন ধর্মান্তরিতরা তাঁকে নিরাশ করে; কেননা মদীনায় তখন দু'টো গোষ্ঠীর মধ্যে চরম বিবাদ চলছিল। তারা তাঁকে খানিকটা সুবিধাজনক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলে। পরবর্তী বছরের তীর্থকালে আগের বছরের ধর্মান্তরিতদেরসহ মোট বার জন মদীনার তীর্থযাত্রী 'আকাবা' নামক স্থানে মোহাম্মদের সাথে গোপনে সাক্ষাত করে। এ সাক্ষাতে তারা ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, যা ইসলামী ঐতিহ্যে 'প্রথম আকাবার শপথ' হিসেবে পরিচিত।[২৫] মোহাম্মদ মদীনার শিষ্যদেরকে নতুন ধর্মের নিয়মকানুন শিখানোর জন্য মুসাব ইবনে ওমা'য়ার নামক মক্কার এক অনুসারীকে তাদের সঙ্গে মদীনায় প্রেরণ করেন। মদীনায় মোহাম্মদের ধর্ম প্রসারের চেষ্টায় মুসাব খুবই সফল হয়। পরবর্তী তীর্থকালে (৬২২) পঁচাত্তর জন ইসলাম-গ্রহণকারী মদীনার নাগরিক (তিয়াত্তর জন পুরুষ, দুইজন নারী) মুসাবের সঙ্গে মক্কায় আসে ও আকাবায় পুনরায় একটি গোপন বৈঠক করে। মোহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস তাঁর সঙ্গে এ গুপ্ত বৈঠকে এসেছিলেন। মোহাম্মদের মদীনায় স্থানান্তরের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে আল-আব্বাস বলেন: *'যদিও মক্কায় নবির আত্মীয়স্বজন ও শিষ্যরা তাঁকে রক্ষা করবে, কিন্তু তিনি (মোহাম্মদ) তোমাদের (মদীনার ধর্মান্তরিতদের) কাছ থেকে নিরাপত্তা পছন্দ করছেন। তোমরা যদি সমাধানে আসতে পার এবং তাঁকে রক্ষায় সমর্থ হও, তাহলে শপথ কর। কিন্তু তোমাদের সামর্থ্য সম্পর্কে যদি সামান্য সন্দেহ থাকে, তাহলে সে পরিকল্পনা বাতিল কর।'* এর উত্তরে মদীনার শিষ্যরা বলে: *'আপনি যা বললেন আমরা শুনেছি। আপনি বলুন, হে নবি এবং আপনি নিজেই ঠিক করুন আপনার প্রভুর জন্য আপনি কী চান।'* এরপর মোহাম্মদ মুখ খুলেন ও এই বলে শেষ করেন যে: *'আমি তোমাদের আনুগত্য কামনা করি এ ভিত্তিতে যে, যেভাবে তোমরা তোমাদের (নিজস্ব) নারী ও শিশুদের রক্ষা করো, আমাকেও ঠিক সেভাবে রক্ষা করবে।'* এ কথায় আল বারা নামক মদীনাবাসী শিষ্য নবির হাত টেনে নিয়ে বলেন: *'তাঁর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমরা আপনাকে রক্ষা করবো যেভাবে আমাদের নারীদেরকে রক্ষা করি। আমরা আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করছি। আমরা যোদ্ধার জাতি। আমাদের হাতে রয়েছে অস্ত্র, যা পিতা থেকে পুত্রের হাতে সমর্পিত হয়েছে।'* ইমলামে 'আনসার' বা 'সাহায্যকারী' হিসেবে পরিচিত মদীনার ধর্মান্তরিতদের এ শপথকে 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ' বলা হয়।[২৬]

এ ঘটনাটি সুস্পষ্ট করে যে, ৬২২ সালের সে সময়ও মোহাম্মদ মক্কায় কোনো আসন্ন বিপদের সম্মুখীন ছিলেন না। অথচ এর দু'বছর আগেই, অর্থাৎ ৬২০ সালের প্রথম দিকে, তিনি মদীনায় অবস্থান নেয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। ৬২২ সালে মদীনায় স্থানান্তরের কয়েক মাস পূর্বেই তিনি মদীনার শিষ্যদের কাছ থেকে সেখানে নিজস্ব নিরাপত্তার ব্যাপারে শপথ আদায় করেন। সুতরাং প্রশ্ন জাগে: *যখন তিনি কোন রকম বিপদের সম্মুখীন না হয়েও অতিশয় আগ্রহী ছিলেন মদীনায় অবস্থান নেওয়ার জন্যে, যেখানে তাঁর ধর্মপ্রচারের অগ্রগতিও হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল – এমতাবস্থায় মদীনায় গমনের জন্য কি তাঁকে কোরাইশদের দ্বারা মক্কা থেকে বিতাড়িত হওয়ার দরকার পড়ে?* তদুপরি ৬২২ সালের মে মাসের শেষ দিকে তাঁর মক্কা ত্যাগের আগে এপ্রিলের শুরুতে তিনি শিষ্যদেরকে মদীনায় গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং তারা ছোট ছোট দলে দুই মাসেরও বেশী সময় ধরে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়। মোহাম্মদ ও তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকর এবং তাদের পরিবার সর্বশেষে মক্কা ত্যাগ করেন। এ পটভূমিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনাযোগ্য:

১. মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য মোহাম্মদের প্রবল আগ্রহ ও সেখানে অবস্থানকালীন তাঁকে রক্ষার জন্য মদীনার শিষ্যদের কাছ থেকে শপথ আদায়ের উদ্দেশ্য কী ছিল?

২. নিজের মক্কা ত্যাগের পূর্বে দু'মাস ধরে তিনি শিষ্যদেরকে মদীনায় পাঠালেন কেন?

৩. মক্কায় একাকী তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন, যখন সেখানে তাঁর ধর্মপ্রচার স্থবির হয়ে গিয়েছিল?

নির্ভুল ও কর্তৃত্বপূর্ণ ইসলামি সূত্র থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের এ প্রেক্ষাপটে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মোহম্মদ আপন আগ্রহেই মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অতএব মক্কা থেকে তাঁকে বহিষ্কার বা হত্যা চেষ্টার প্রয়োজন পড়েনি। এ পর্যন্ত কোরাইশরা দীর্ঘ তের বছর তাঁর দ্বারা তিরস্কার, বিরক্তি, সামাজিক ও পারিবারিক বিবাদ সহ্য করেছে। এরপর যখন তিনি নিজের ইচ্ছাতেই মক্কা ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন, সেটা ছিল কোরাইশদের জন্য বড় একটা স্বস্তির খবর। তদুপরি মোহাম্মদ মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগের পরেও তাঁর শিষ্য (পরবর্তীতে জামাই) আলি, আবু বকরের স্ত্রী ও কন্যা আয়েশা (তখন মোহাম্মদের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ) আরো কয়েকদিনের জন্য মক্কায়

---

২৩. Ibn Ishaq, p. 192-93.

২৪. Muir, p.114

২৫. Ibn Ishaq, p.198-99

২৬. Ibn Ishaq, p. 204, Muir, p. 129-130.

থেকে যায়। কিন্তু এদের কাউকেই কোরাইশরা কোন রকম ক্ষতি কিংবা হয়রানি করে নি। এমন কি তাদেরকে কোন প্রশ্নের সম্মুখীনও হতে হয়নি।

ইসলামি ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক জানান: *'কোরাইশরা দেখলো যে মোহাম্মদ তাঁর বংশের বাইরে (মদীনায়) অনুসারী পেয়েছে; সুতরাং তারা এখন আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত নয়।'* অতঃপর তারা তাঁকে লৌহ-শিকলে বন্ধী করার, বা মক্কা থেকে বিতাড়িত করার, কিংবা হত্যা করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে এবং শেষ উপায়টি অবলম্বন করে।[২৭] কিন্তু এটা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয় যে, যদি নিষ্ঠুর কোরাইশরা তাঁকে হত্যার জন্য এতটাই নাছোর হতেন, তাহলে তারা অন্তত পেছনে থেকে যাওয়া আলি এবং মোহাম্মদ ও আবু বকর-এর পরিবারকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতো। মোহাম্মদের মক্কা থেকে সফলভাবে পলায়নের পর তাঁর শিষ্য তালহা মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন এমনভাবে যেন কিছুই ঘটেনি। ফিরে এসে তিনি মোহাম্মদ ও আবু বকরের পরিবারকে মক্কা থেকে নিয়ে যান।[২৮]

কোরাইশরা যে মোহাম্মদকে হত্যা করতে কিংবা বিতাড়িত করতে চেয়েছিল – উপরোক্ত বিষয়-বিবেচনাগুলো তা অবিশ্বাস্য করে তোলে। পরন্তু অন্যত্র মোহাম্মদের এক ভাষ্য আমাদেরকে জানায় যে, আল্লাহ স্বয়ং মদীনায় মোহাম্মদের মিশনের সফলতার দৃশ্য দেখেছিলেন ও তাঁকে সেখানে গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ বলেন: *'আমি (আলাহ-কর্তৃক) আদিষ্ট হয়েছিলাম এমন একটি শহরে অভিবাসিত হতে, যে শহর অন্যান্য শহরকে গ্রাস (জয়) করবে, এবং যাকে বলা হয় ইয়াথ্রিব, এবং যা হলো মদীনা ('মদীনাত-উল-নবী' অর্থাৎ নবীর আবাস)'* (বোখারী ৩:৯৫১)।

পরবর্তীতে আল্লাহ এক আয়াতে (কোরান ২:২১৭) মোহাম্মদ ও তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি কোরাইশদের ব্যবহার সম্পর্কে বলেন: *'আলাহর পথে আসতে বাধা প্রদান করা, তাঁকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে প্রবেশে বাধা প্রদান ও তাঁর সদস্যদেরকে বিতাড়িত করা আল্লাহর দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ।'* এখানে আল্লাহ স্পষ্টতঃই জানাচ্ছেন যে, মক্কাবাসীরা কেবলমাত্র মোহাম্মদের ধর্ম বিশ্বাস অগ্রাহ্য, ইসলাম গ্রহণে অন্যদেরকে (সাধারণত নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে) বাঁধা প্রদান ও মোহাম্মদের সম্প্রদায়কে কা'বা ঘরে ঢুকা নিষেধ করেছিল। কোরাইশরা মোহাম্মদকে বা অন্য কোন মুসলিমকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, একথা আল্লাহ কোথাও উল্লেখ করেননি। এ বাণীতে 'সদস্যদের বিতাড়িত করা' বলতে আল্লাহ সম্ভবত এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোরাইশরা ইসলাম গ্রহণ না করায় মোহাম্মদ তাঁর ধর্মপ্রচারে সফলতা পাওয়ার জন্য অন্যত্র (মদীনায়) গমনে বাধ্য হয়।

বদর'এর যুদ্ধে মোহাম্মদ নিজেও একই ব্যাখ্যার স্বীকৃতি দেন। এ যুদ্ধে কোরাইশরা পরাজিত হওয়ার পর মুসলিমরা যখন তাদের মৃতদেহ আচারহীনভাবে গণকবরে নিক্ষেপ করছিল, তখন মোহাম্মদ মৃতদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন: *"হে নরকের বাসিন্দারা, তোমরা তোমাদের নবির দুর্বিনীত স্বজন। যখন অন্যেরা (মদীনাবাসীরা) বিশ্বাস করেছে, তখন তোমরা আমাকে মিথ্যুক বলেছো; তোমরা যখন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো, অন্যেরা বুকে তুলে নিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো, আর অন্যেরা আমার পক্ষে যুদ্ধ করেছে।"*[২৯] এখানেও নবি কোরাইশ কর্তৃক তাঁকে হত্যার কথা উল্লেখ করেন নি। এখানে যে লড়াই বা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তা তাঁর মদীনায় অভিবাসিত হওয়ার পরের যুদ্ধ, যা তিনি নিজেই শুরু করেন। কেননা এর আগে কোরাইশ ও মুসলিমদের মাঝে কোন যুদ্ধ হয়নি এবং সেযুদ্ধে মোহাম্মদের পক্ষ মদীনাবাসীদের যোগ দেওয়ার কোনই সুযোগ ছিল না।

মোহাম্মদকে হত্যা করার জন্য কোরাইশ-উদ্যোগের কাহিনীটি ছিল খুব সম্ভবত নবির এক মিথ্যে প্রচারণা – এ আশায় যে, এটা মদীনায় পৌঁছানোর পর সেখানকার জনগণের তাঁর প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণে, অথবা মদীনাবাসীদেরকে (বিশেষ করে তাঁর অনুসারীদেরকে) কোরাইশদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে ও ক্ষেপিয়ে তুলতে সহায়ক হবে। মদীনায় অবস্থান নেওয়ার পরপরই কোরাইশদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক জিহাদ শুরু সে সম্ভাবনাকে সমর্থন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, তিন বছর আগে ঠিক একইভাবে তিনি কোরাইশদের বিরুদ্ধে তা'য়েফীদের মাঝে শত্রুভাব গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস করেন।

মক্কাবাসীরা কি নিষ্ঠুর ছিলেন?

মুসলিম সমাজের কথোপকথনে মক্কার কোরাইশদের সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয়, তাতে মনে হয় কোরাইশরা ছিল অতিশয় বর্বর। বলা হয় তারা নবীর উপর প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা আরোপ করেছিল। এক মুসলিম আমাকে লিখেছে যে, মক্কায় কোরাইশরা *'দীর্ঘ ১৩ বছরে অনেক মুসলিমকে মেরে ফেলে। লোমহর্ষক উপায়ে নির্যাতন করে কোরাইশরা তাদেরকে হত্যা করে।'*[৩০] মুসলিমরা কোরাইশদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ ব্যবহার করে মোহাম্মদের সহিংস অভিযান ও মক্কা দখল এবং তাদের ধর্ম বিনষ্ট করার অজুহাত হিসেবে। কোরান ও সুন্নত-এ কোরাইশদেরকে অসভ্য, নিষ্ঠুর নির্যাতনকারী ও আল্লাহর শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বার বার। এমন কি মক্কায় অবস্থানকালে মোহাম্মদ নিজেও তাদেরকে শয়তান ও পাপী বলে আখ্যায়িত করেন, *'যারা সর্বোচ্চ পাপের অনুরক্ত'* (কোরান ৫৬:৪৬) এবং 'হতভাগ্য', যাদেরকে ঘনঘন *'অগ্নিকুণ্ডে ও ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হবে'* (কোরান ৫৬:৪১-৪২)। মোহাম্মদ মক্কার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে শুধু দোষারোপই করেন নি, তাদের বিরুদ্ধে ইহলৌকিক শাস্তিরও হুমকি দেন এভাবে: *'দোষীদের সাথে আমরাও তদ্রূপ আচরণ করবো। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর অভিশাপ নেমে আসবে'* (কোরান ৭৭:১৮-১৯)। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সঠিক বা সত্যভাষী এবং ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মিথ্যুক, পাপী ও মিথ্যা-সৃজনকারী

---

[২৭]. Ibn Ishaq, p. 121-122
[২৮]. Muir, p. 165
[২৯]. Ibn Ishaq, p. 306
[৩০]. Islamic literature records no incidence of death; no Muslim died in anti- Islam violence during Muhammad's stay in Mecca.

বলে আখ্যায়িত করেন এবং মক্কার পৌত্তলিকদেরকে নরকের অনন্ত অগ্নিকুণ্ড ন্যস্ত করেন। নিচে আল্লাহর প্রথম দিককার আয়াতগুলোর মধ্যে থেকে এধরনের কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হল:

> 'যাঁরা বিশ্বাস করে এবং ধৈর্যশীলতা (দৃঢ়তা ও আত্মসংযম), করুণা ও দয়া পোষণ করে, তাঁরা তাদের মধ্যে গণ্য হবে যাঁরা (ঈশ্বরের) দক্ষিণ হস্তের সঙ্গী। কিন্তু যারা আমাদের ইশারাকে (ঐশীবাণী) অস্বীকার করে... তারা চির অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হবে' (কোরান ৯০:১৭-২০)।
>
> 'যারা আল্লাহর বাণী বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে পথ নির্দেশনা দিবে না; তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। ...তারা মিথ্যা রচনাকারী; তারা মিথ্যাবাদী' (কোরান ১৬:১০৪-১০৫)।

যাহোক, মুসলিমরা দাবি করে যে, কোরাইশরা মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি অমানবিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল। মুসলিম সমাজে এধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল হলেও, তা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। অসহায় উষর মরু পরিবেশে ও সে সময়ের কঠোর অভাব-অনটনের মুখে মক্কাবাসীরা ছিল খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভের আশায় তারা ঈশ্বরের পবিত্রঘর কা'বায় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা কা'বাকে আরব ও আশেপাশের দেশগুলোর পৌত্তলিকদের জন্য সর্বোচ্চ ধর্মীয় শ্রদ্ধার বস্তু ও তীর্থকেন্দ্রে পরিণত করেছিল। আজকের মুসলিমরা কা'বাকে যতটা শ্রদ্ধা করে, তৎকালে পৌত্তলিকরাও তাই করতো। মোহাম্মদ শুধু কা'বাকে ভিত্তিহীনভাবে তাঁর নিজের ঈশ্বরের পবিত্রঘর বলেই দাবী করেন নি, তাঁর বাণী পৌত্তলিক ধর্মকে মিথ্যা বলেও অভিহিত করেছিল।

এ ধরনের অপমানকর মন্তব্য ও স্পর্ধিত দাবী সত্ত্বেও কোরাইশরা মোহাম্মদ ও তাঁর সম্প্রদায়কে ১৩ বছর মক্কায় বসবাস করতে দেয়। মোহাম্মদ মক্কায় প্রথম সাত বছর – অর্থাৎ যতদিন না তাঁর ঐশীবাণী কোরাইশদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ও অপমানকর হয়ে উঠে – ততদিন প্রায় স্বাধীনভাবে তাঁর ধর্ম প্রচার করতে পেরেছিলেন। মক্কাবাসীরা কা'বার প্রতি মোহাম্মদের দাবির বিরোধী ছিল এবং পরবর্তিতে তাঁর কথাবার্তা ও ঐশীবাণীগুলো ক্রমান্বয়ে অপমানকর হয়ে উঠায় তাঁর প্রচারকার্য অনেকটা অসম্ভব করে তুলেছিল, কিন্তু তারা তাঁর বা তাঁর শিষ্যদের উপর চড়াও হয়ে কাউকে হত্যা বা আহত করেছে, এমন কোন নজির নেই।

মুসলিম দাসদের উপর কোরাইশদের নির্যাতনের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা রয়েছে; এর কারণ তারা মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে কোরাইশদের ধর্মবিশ্বাসকে অপমানিত করেছিল। কিন্তু তা কখনোই মারাত্মক বা জীবনের প্রতি হুমকিদায়ক ছিল না। এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে যে, কোরাইশরা তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে মোহাম্মদের দলে যোগ দিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল (কখনো কখনো ঘরে তালাবদ্ধ রেখে)।

নিম্নে বর্ণিত মুসলিম উপাখ্যানবিদদের কিছু সাক্ষ্য বা বিবৃতিও প্রমাণ করে যে, কোরাইশদের প্রতি মোহাম্মদের প্রকাশ্য শত্রুভাবাপন্নতা দেখানো ও অপমানকর গালিবাজী সত্ত্বেও, কোরাইশরা তাঁর প্রতি উল্লেখযোগ্য সহনশীলতা দেখিয়েছিল। আল-জুহরি লিপিবদ্ধ করেন:

> (শুরুতে) তিনি (মোহাম্মদ) যা বলেছেন অবিশ্বাসী কোরাইশরা তাঁর বিরোধিতা করেনি। একত্রে বসে থাকা তাদের পাশ দিয়ে (মোহাম্মদের) যাবার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে তারা বলত: "*আব্দুল মুত্তালিবের গোত্রের এ যুবকটি স্বর্গীয় বাণী পেয়েছে বলে দাবী করে!*" যতদিন আল্লাহ তাদের ঈশ্বরকে আক্রমণ করেনি, ততদিন তারা এ রকমই বলতো..., এবং পরে তিনি (আল্লাহ) যখন ঘোষণা করেন যে, তাদের পিতাগণ যারা অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা সবাই নরকে পতিত হয়েছে, তারপরে তারা নবিকে ঘৃণা ও তাঁর প্রতি শত্রুতা শুরু করে।[৩১]

মোহাম্মদের স্বর্গীয় বার্তা কোরাইশদের ধর্ম, দেবতা এবং রীতি ও প্রথার বিরোধী ও অবমাননাকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ইসলাম গ্রহণের আহ্বানকে তারা খুবই ভদ্রোচিতভাবে প্রত্যাখান করত। তার একটা উদাহরণ হলো: একদিন মোহাম্মদের চাচা আবু তালিব একটা স্থান অতিক্রম করার সময় দেখলেন যে, তাঁর পুত্র আলি মোহাম্মদের সঙ্গে নামাজ পড়ছে। তিনি আলির কাছে জানতে চান সে মোহাম্মদের সঙ্গে কি করছে। এ সময় নবি উত্তর দিলেন: '*সে (আলি) তাঁকে প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের শিক্ষার অনুকরণ করছে*' এবং তিনি আবু তালিবকেও তা অনুসরণের আহ্বান জানান। এ আহ্বান পেয়ে বৃদ্ধ আবু তালিব উত্তর দিলেন যে, তিনি পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারবেন না কিংবা তিনি এমন প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন না, যে ক্ষেত্রে 'তাঁর পশ্চাৎদেশকে মাথার উপর স্থাপন করতে হয়' (নামাজের সিজদার সময়)।[৩২]

তাদের দেবতা ও পূর্ব-পুরুষদের প্রতি মোহাম্মদের নিন্দাপূর্ণ ভাষা ও অপবাদ সম্পর্কে কোরাইশদের যে প্রতিক্রিয়া ছিল, তা মোহাম্মদের শিষ্য আমর ইবনে আল আ'স-এর ভাষ্যস্বরূপ বাইহাকি তার 'প্রুফ অব প্রফেসি' ('নবুয়তীর প্রমাণ') বইটিতে লিপিবদ্ধ করেন। আ'স বলেন:

> একদিন কা'বায় সমবেত পৌত্তলিকদের মাঝে আমি উপস্থিত ছিলাম। তারা আল্লাহর নবি সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। তারা বলে: '*আমরা এর পূর্বে কখনোই কারো কাছ থেকে এরকম কিছু সহ্য করিনি, যা এ লোকটির কাছ থেকে সহ্য করছি। সে আমাদের পিতৃগণকে অপবাদ দিচ্ছে, আমাদের ধর্মের সমালোচনা করছে এবং আমাদের জনগণকে বিভক্ত করছে, আর আমাদের দেবতাদের অপমান করছে। এ লোকটার কাছ থেকে আমাদেরকে এরূপ যন্ত্রনাদায়ক বিষয় সহ্য করতে হচ্ছে।*' নবি তখন কাছেই ছিলেন এবং তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি উত্তরে বলেন: '*হে কোরাইশগণ! আমি অবশ্যই সুদসহ এর পরিশোধ নেবো।*'[৩৩]

একথা সত্য যে, কোরাইশরা তাদের পৈতৃক ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে ও মোহাম্মদের ধর্মের বিরোধিতা করে। অথচ তারা তাঁর ধর্ম প্রচারের ৬ষ্ঠ বছরের শেষ দিকেও মোহাম্মদকে কা'বা-গৃহে প্রবেশে বাধা দেয়নি। সালমান রুশদীর উপন্যাসের প্লট 'স্যাটানিক ভার্সেস' (কোরান ৫৩:১৯-২০)-এর নাটকীয় ঘটনায় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। আল-তাবারি'র ইতিহাস অনুসারে দু'টি তথাকথিত 'শয়তানের ঐশীবাণী' ('স্যাটানিক ভার্স')-তে মোহাম্মদ পৈত্তলিকদের আল-লাত, আল-উজ্জা ও আল-মানাত দেবীদেরকে পূজার যোগ্য বলে স্বীকার করে নেন।

---

৩১. Sharma SS (2004) *Califs and Sultans: Religions Idology and Political Praxis*, Rupa & Co, New Delhi, p. 63; Muir, p. 63

৩২. Glubb JB (Glubb Pasha, 1979) *The Life and Times of Mohammad*, Hodder & Stoughton, London, p. 98

৩৩. Sharma, p. 63-64

পরবর্তিতে মোহাম্মদ যখন তাঁর এ ভুল বুঝতে পারেন, তখন আল্লাহ *শয়তান মোহাম্মদের মুখে এ ঐশীবাণী দু'টো তুলে দিয়েছিল*, এ ছুতায় তা পরিত্যাগ করেন (কোরান ৫৩:২১-২২)।[৩৪] এ ঘটনাটি ঘটে ৬১৬ সালে যখন কা'বা ঘরের মধ্যে মোহম্মদ কোরাইশ নেতাদের সঙ্গে এক সমন্বয় বৈঠক করছিলেন।[৩৫] ৬২৮ সালে হুদাইবিয়ার সন্ধিতে কোরাইশরা আবারও মোহাম্মদ ও তাঁর অনুগামীদেরকে তীর্থ (ওম্‌রা) পালনের জন্য প্রতিবছর তিন দিন কা'বা ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয় (নীচে দেখুন)। এখন চলুন আমরা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে একই রকম একটা কল্পিত পরিস্থিতি বিবেচনা করি:

> মনে করুন, মক্কার যেকোন সম্প্রদায়ের অথবা সৌদি আরবের বাইরের অথবা বিশ্বের যেকোন স্থানের এক লোক মক্কায় গিয়ে সেখানে সমবেত একদল মুসলিমের সামনে ঘোষণা দিলেন যে, তিনি সত্যিকারের ঈশ্বরের নিকট থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন যে, তিনিই সত্যিকারের প্রেরিত বার্তাবাহক; ইসলাম মিথ্যা; কা'বা তারই ঈশ্বরের পবিত্র ঘর; মুসলিমদের উচিৎ তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার নতুন ধর্ম গ্রহণ করা।

এ তথাকথিত নতুন নবির ভাগ্যে কী ঘটবে, তা অনুধাবণ করা কারো পক্ষেই কঠিন হবে না। স্পষ্টতঃই সে লোকটিকে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হতে পারে। বাস্তবত যদি কেউ যে কোনো মুসলিম দেশের একটি প্রধান মসজিদে গিয়ে প্রকাশ্যে এরূপ দাবী করে, বর্তমানকালের জাতিসংঘ সনদে মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও তাকে ইসলামের ঈর্ষাপরায়ন অনুসারীদের হাতে একই ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। এ উদাহরণ থেকে আজকের মুসলিম এবং সেই তথাকথিত 'বর্বর' যুগের মক্কার কথিত হতভাগ্য ও দুর্বৃত্ত পৌত্তলিকদের মধ্যে সহিংস প্রবণতার তুলনা করা খুবই সহজ। মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অবিরাম অপমানকর উক্তি ও তাদের পবিত্র মন্দিরের উপর অধিকার দাবি সত্ত্বেও তারা দীর্ঘ তের বছর মোহাম্মদকে তাদের মধ্যে বাস করতে দেয়; তারা তাঁর উপর কোনরূপ শারিরীক নির্যাতন করেনি। মোহাম্মদের নবুয়তী কার্যকলাপ কোরাইশদের জীবন ও ধর্মের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল স্যার উইলিয়ম মুইর তা ব্যক্ত করেন এভাবে: *"তাদের তীর্থ মন্দির, মক্কার গৌরব ও আরবের সমগ্র অঞ্চলের তীর্থকেন্দ্র অবজ্ঞাত বা অর্থহীন হয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কায় বিপন্ন হয়ে পড়ে।"*[৩৬]

তবুও কোরাইশরা মোহাম্মদকে কা'বায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। অথচ আজকের দিনেও অমুসলিমদের জন্য মুসলিম দেশের যে কোন মসজিদে (কা'বা দূরে থাক) পরিদর্শনের জন্যও প্রবেশ নিষেধ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত অমুসলিমদের জন্য মুসলিমদের দু'টি পবিত্র স্থান মক্কা এবং মদীনা নগরীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকজন অমুসলিম ফরাসী নাগরিক মদীনার নিকটবর্তী একটি নিষিদ্ধ সীমার মধ্যে ঢুকে পড়ার কারণে খুন হয়।[৩৭] এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের অসহিষ্ণু শিক্ষা সপ্তম শতাব্দীর আরব দেশের অত্যন্ত সহিষ্ণু ও সভ্য জনগণকে অতিশয় গোঁড়া ও খুনী জাতিতে পরিণত করেছে। এ রকম অসহিষ্ণুতা ও ধর্মান্ধতা আজ শুধু আরব দেশেই নয়, গোটা বিশ্বের সকল স্থানের মুসলিমরা তার উত্তরাধিকার বহন করে চলছে। আর মোহাম্মদ সপ্তম শতকের মক্কার সেই সহিষ্ণু ও সুসভ্য জনগণকে নিষ্ঠুর, দুর্বৃত্ত ও দুর্ভাগা বলে আখ্যায়িত করেন, যে ধারণা আজকের মুসলিমরাও পোষণ করে।

আজও বহু দেশের মুসলিমরা প্রকাশ্যে ইসলামত্যাগীদের হত্যা করে, যদিও সমস্ত মুসলিম দেশ জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছে, যা সবাইকে পছন্দমত ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। কিন্তু সপ্তম শতকের মক্কার পৌত্তলিকরা কখনোই মোহাম্মদ কিংবা মক্কার অনেক মুক্ত নাগরিক – যারা পৈতৃক ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল – তাদের কোনই ক্ষতি করেনি। স্পষ্টতই, আজকের মুসলিমরা মক্কার সেসব কোরাইশদের চেয়ে অনেক বেশী অসহিষ্ণু, নিষ্ঠুর ও অসভ্য।

মক্কাবাসীদের অনুকরণযোগ্য সহিষ্ণুতা

মোহাম্মদের সময়ে মক্কার সমাজ অবশ্যই পারস্য, সিরিয়া, মিশর ও ভারতের মত অধিক অগ্রসর ও সভ্য সমাজের তুলনায় পশ্চাৎপদ ও আভিজাত্যহীন ছিল। মক্কাবাসীরা ছিল একটা গভীর ধর্মপ্রাণ সম্প্রদায়। মক্কার সে সমাজের লক্ষণ ছিল অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা, সঙ্গতিপূর্ণতা ও সহবাস – বিদ্বেষপরায়ণতা বা অসহিষ্ণুতা নয় – যদিও ইসলামে তাদেরকে অযৌক্তিকভাবে বর্বর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কা'বা যদিও মক্কার পৌত্তলিকদের শ্রদ্ধেয় 'ঈশ্বরের ঘর' ও ভক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল, তথাপি তারা সে ঘরকে একান্তই তাদের নিজস্ব বলে মনে করতো না। বরং তারা ঐ অঞ্চল ও প্রতিবেশী দেশসমূহের, যেমন দক্ষিণ আরব, মেসোপটেমিয়া, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং দূরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতীক ও প্রতিমা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিল তাদের সে পবিত্র ধর্মমন্দিরে।[৩৮] মক্কা যেহেতু ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং বহু দূরবর্তী অঞ্চলের বণিকদের কিছু সময়ের জন্য অবস্থান বা বিশ্রামের স্থান, মক্কার লোকেরা ঐসব বণিকদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি ছিল খুব অমায়িক। তারা বিদেশীদেরকে নিজ নিজ ধর্মীয় দেব-দেবীর মূর্তি কা'বা ঘরে স্থাপনের অনুমতি দিত, যাতে করে বিদেশীরা সেখানে অবস্থানকালে স্ব-স্ব ধর্মাচার ভক্তির সাথে পালন করতে পারে। বিভিন্ন দেশ ও ধর্মবিশ্বাস থেকে আনিত ঐসব মূর্তিগুলো পবিত্র কা'বা ঘরে মোট ৩৬০টি প্রস্তর-মূর্তি হিসেবে বৃত্তাকারে সজ্জিত ছিল।

---

[৩৪]. Al-Tabari, Vol. VI, p. 107

[৩৫]. Ibid, p. 165-67; Muir, p. 80

[৩৬]. Muir, p. 62

[৩৭]. Globe and Mail (Canada), *Gunmen slay 3 frenchmen in Saudi Arabia*, 26 Feb. 2007.

[৩৮]. Walker, p. 44

এমন কি ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের প্রতীক হিসেবে ইব্রাহিম ও ইসমাইলের ছবি এবং মেরীর কোলে শিশু যীশুর প্রতিচ্ছবিও কা'বা ঘরে স্থান লাভ করেছিল।

মোহাম্মদ মক্কা দখলের দিন পবিত্র কা'বায় স্থাপিত সকল মূর্তি ধ্বংসের নির্দেশ দেন। তুর্কীর মুসলিম ইতিহাসবিদ ইমেল এসিন জানান, মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও ইসমাইলের প্রতিচ্ছবি ধ্বংসেরও অনুমোদন দেন, কিন্তু তিনি নিজ হস্ত দিয়ে যীশু ও মেরীর প্রতিচ্ছবিটি আড়াল করে তা রক্ষা করেন।[৩৯] পৌত্তলিকতা চর্চার কারণে যদিও ইহুদী ও খৃষ্টানরা পৌত্তলিক কোরাইশদের সতত নিন্দা করতো, তবুও কোরাইশরা কা'বা গৃহে খৃষ্টান ও ইহুদীদের প্রতীককে স্থান দিয়েছিল।

মোহাম্মদের সময়ে সিরিয়ার কিছু বণিক মক্কায় খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করত, যাদেরকে কোরাইশদের পক্ষ থেকে কোন রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।[৪০] সে সময় কিছু সংখ্যক মক্কাবাসী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণও করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এবং ওসমান ইবনে হুবেরিথ। মক্কায় এদের অবস্থান ছিল যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ (নীচে দেখুন)। কোরাইশরা তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের দ্বারা নানা রকম অপমান সত্ত্বেও মুসলিমদেরকে কা'বায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি ভারতীয় হিন্দু, যারা ভিন্ন রকমের প্রতিমা-পূজা করতো, তারাও কা'বা ঘরে ঢুকতে পারতো। বলা হয় যে, ভারতীয় বণিকরা পাথরের দেবী-মূর্তি আল-মানাত'কে কা'বা ঘর থেকে অলক্ষ্যে নিয়ে এসে ভারতের সোমনাথ মন্দিরে স্থাপন করেছিল। কা'বা থেকে এক সময় মূর্তিটি হারিয়ে যায় বলে জানা যায়। সোমনাথ মন্দিরে পরবর্তীকালে আল-মানাত খুবই জনপ্রিয় দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ধার্মিক মুসলিম বিজয়ী বীর গজনীর সুলতান মাহমুদ কা'বার পৌত্তলিকতার এ সর্বশেষ সাক্ষীটি নিশ্চিহ্ন করতে ১০২৪ সালে সোমনাথ আক্রমণ করেন। হিন্দুদের অতীব শ্রদ্ধাস্পদ এ মূর্তিটি রক্ষার চেষ্টায় প্রায় ৫০,০০০ হিন্দু সুলতান মাহমুদের তরবারির নীচে প্রাণ দেয়।[৪১]

এসব ঘটনা বিচার করলে দেখা যায়, সেকালের পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা স্পষ্টতঃই আজকের মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশী সহনশীল, অমায়িক ও সভ্য ছিল। মোহাম্মদ কোরাইশদের ধর্ম, দেব-দেবী ও রীতিনীতির ব্যাপক অবমাননা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও, তারা তাঁকে তেরটি বছর ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করে। কোরাইশরা তাঁর প্রতি একটিমাত্র নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল; সেটা হলো দুই বছরের জন্য (৬১৭-৬১৯ সাল) মোহাম্মদের সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ, যা এ ধরণের অবস্থা মুকাবেলায় আজকের যুগেও সভ্য আচরণ হিসেবে গণ্য।

সুতরাং সে সময়ে মক্কার সমাজ সহজ-সরল, আভিজাত্যহীন ও পশ্চাৎপদ হওয়া সত্ত্বেও, করুণা, সহনশীলতা, অমায়িকতা ও অহিংসার বিচারে সপ্তম শতাব্দীর মক্কার পৌত্তলিকরা আজকের মাপকাঠিতেও ছিল খুবই সভ্য মানুষ। মোট কথা, চৌদ্দ শত বছর ধরে মুসলিমদের দ্বারা অত্যন্ত ঘৃণ্য হিসেবে চিহ্নিত হলেও, মক্কার পৌত্তলিকরা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সহিষ্ণু ও সভ্য মানুষ ছিল।

মোহাম্মদের মক্কা-বিরোধী কর্মকাণ্ড ও যুদ্ধাভিযান (৬২৩-৬৩০)

নবি মোহাম্মদের মদীনায় অবস্থান গ্রহণ তাঁর নবুয়তি কর্মে সফলতার আশির্বাদ বয়ে আনে। এ সফলতা ছিল খুবই প্রত্যাশিত; কেননা ইতিমধ্যে মুসাব বিন ওমায়ার মোহাম্মদের অনুপস্থিতিতেও অনেক মদীনাবাসীকে ইসলামের পতাকাতলে আনতে পেরেছিল। মোহাম্মদ মদীনায় পৌঁছাতেই তাঁর প্রতীক্ষারত শিষ্যদের দ্বারা বীরোচিত সংবর্ধনা লাভ করেন। মদীনার জনগণ ছিল পৌত্তলিক ও ইহুদী। তাদের মধ্যে ইহুদীরা ছিল অধিকতর ধনী ও প্রভাবশালী। অল্পদিনের মধ্যেই মদীনার পৌত্তলিক গোত্রের অধিকাংশ নাগরিক তাঁর ধর্মে যোগ দেয়।

জিহাদের বীজ বপন

ইবনে ইসহাক জানান, মদীনায় অবস্থান গ্রহণের প্রথম বর্ষের মধ্যে মোহাম্মদ সেখানকার গোত্রগুলোর সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা পরবর্তীতে সুবিখ্যাত 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ চুক্তিপত্রে কিছু শর্তবিশেষ মোহাম্মদের সহিংস আশাবাদ ব্যক্ত করে, বিশেষ করে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে। এমন দু'টি শর্ত হলো:[৪২]

১. কোন অবিশ্বাসীর মৃত্যুর (মুসলিমের দ্বারা) জন্য কোন বিশ্বাসীকে (মুসলিমকে) মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, কিংবা কেউ (মদীনাবাসীদের মধ্যে) মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সমর্থন দিতে পারবে না।
২. বহু-ঈশ্বরবাদীরা (মদীনার) কোন কোরাইশ বা তার সম্পদ নিজেদের হেফাজতে নিতে পারবে না, কিংবা মুসলিমদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করতে পারবে না।

সনদটির এ শর্তদুটি পরিষ্কার করে তুলে যে, মোহাম্মদ তাঁর পৈতৃক শহর মক্কার কোরাইশদের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান চালানোর জন্যই মদীনায় পৌঁছেছিলেন, যা তিনি অচিরেই শুরু করে দেন। মোহাম্মদ প্রথমে প্রায় ছয় মাস ধরে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য একটা বাসস্থান গড়ে তুলেন। এভাবে মদীনায় স্থায়ী হওয়ার পর পরই তিনি কোরাইশদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কাজে নেমে পড়েন।

---

৩৯. Esin E (1963) *Mecca the Blessed, Medina the Radiant*, Elek, London, p. 109

৪০. Tagher J (1998) *Christians in Muslim Egypt: A Historical study of the Relation Between Copts and Muslims from 610 to 1922*, Trs. Makar RN, Oros Verlag, Altenberge, p. 16

৪১. Sharma, p. 144-45.

৪২. Ibn Ishaq, p. 231-33; Watt WM, *Muhammad in Medina*, OXford University press, Karachi, 2004 imprint, p. 221-25

এটা অনুমান করা যায় যে, মোহাম্মদের শিষ্যরা শুরুতে তার সহিংসকার্যে জড়িত হওয়ার বিরোধী ছিল। তখন মোহাম্মদের সাহায্যে আল্লাহ আসেন সহিংসতা উদ্দীপ্তকারী ঐশীবাণী নিয়ে মুসলিমদেরকে জিহাদ বা পবিত্রযুদ্ধে প্ররোচিত করতে – প্রথমত কোরাইশদের বিরুদ্ধে, পরবর্তিতে সমস্ত অমুসলিমদের বিরুদ্ধে। মোহাম্মদের অনিচ্ছুক শিষ্যদের বুঝানোর জন্য আল্লাহ যুদ্ধকে ধর্মীয় কাজ বলে অনুমোদন করে ঐশীবাণী পাঠান: *'আল্লাহর জন্য যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু সীমা লংঘন করো না; কারণ আল্লাহ সীমা লংঘণকারীদের পছন্দ করেন না'* (কোরান ২:১৯০)। এ ঘটনার আগে মুসলিম ও কোরাইশদের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় নি। তবে মক্কায় কোরাইশরা মোহাম্মদের ধর্মপ্রচারের বিরোধিতা করেছিল, যাকে আল্লাহ বা মোহাম্মদ 'যুদ্ধ' হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। উপরোক্ত আয়াতে সম্ভবত একেই কোরাইশ-কর্তৃক মোহাম্মদের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' বলা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে কোরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সহিংস যুদ্ধ স্বর্গীয় অনুমোদন পায়।

এরপরও যেসব শিষ্য বিনা উস্কানিতে কোরাইশদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িত হওয়ার বৈধতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, আল্লাহ তাদের জন্যও বিষয়টি সহজ করে দেন। তিনি প্রত্যাদেশ পাঠান: *'তোমরা তাদেরকে যেখানে পার হত্যা কর, এবং তাদেরকে বিতাড়িত কর সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বিতাড়িত করেছে। কারণ দাঙ্গা ও নিপীড়ন হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট'* (কোরান ২:১৯১)। উপরোক্ত বর্ণনায়, কোরাইশরা যেহেতু মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ও তাকে বহিষ্কার করে 'হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট' অপরাধ করেছে, সুতরাং ন্যায়বিচারের খাতিরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধতারও উর্ধ্বে। কাজেই কোরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে নৈতিকতা নিয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়, কারণ সে যুদ্ধ কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে। যতক্ষণ না ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (অর্থাৎ ইসলাম) কর্তৃত্বকর হচ্ছে, আল্লাহ তাঁদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এভাবে: *'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না দাঙ্গা বা নিপীড়ন নিশ্চিহ্ন হয়, এবং ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস জয় লাভ করে'* (কোরান ২:১৯৩)। অন্য আলোচনায় যাওয়ার আগে এ ঐশীবাণীগুলোতে উল্লেখিত 'দাঙ্গা বা নিপীড়ন' বলতে কী বুঝায় তা ক্ষতিয়ে দেখা যাক।

দাঙ্গা ও অত্যাচার-নিপীড়ন: কোরানের ২:১৯৩ নং আয়াতে সন্নিবেশিত 'দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও অত্যাচার-নিপীড়ন' শব্দ সমষ্টিকে (অন্য আয়াতে 'পীড়ন বা নিষ্ঠুরতা'র কথাও রয়েছে) আরবীতে বলা হয় 'ফিৎনা'। এখানে 'ফিৎনা' প্রতিমা-উপাসনা বা পুতুল-পূজা অর্থে – অর্থাৎ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে কোরাইশদের প্রতিমা উপাসনায় লেগে থাকাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু অমুসলিম ও পশ্চিমা পাঠকদের ব্যাপারে সজাগ আধুনিক মুসলিম পন্ডিতরা 'ফিৎনা'র ইংরেজী তরজমায় এক ধরণের অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। এসব অস্পষ্ট অনুবাদে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের বহু অনারব পণ্ডিত বলে মনে করেন। কেবলমাত্র কতকগুলো কঠোর শর্ত – যেমন দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা, নিপীড়ন অথবা নিষ্ঠুরতা – ইত্যাদির ভিত্তিতে ইসলামে সহিংস জিহাদ বা হত্যা সমর্থিত নিপীড়ন বা নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো মহৎ কাজ কে অপছন্দ করে?

কিন্তু কোরানের ভাষায় দাঙ্গা, নিপীড়ন বা নিষ্ঠুরতার সঠিক অর্থ কী তা অনুধাবনের জন্য এ পরিভাষাগুলোর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আরবীতে 'ফিৎনা'র ('আল-ফাসাদ'ও) অর্থ হলো মতবিরোধ অথবা একটা দল বা গোত্রের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি, আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বা অবাধ্যতা দেখানো, অথবা সরকার বা কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিপ্লব বা যুদ্ধ করা কিংবা ঐরূপ বিষয়। এক্ষেত্রে কোরাইশরা ছিল মক্কার প্রশাসনের কর্তৃত্বকারী আর মোহাম্মদের সম্প্রদায় ভিন্ন মতাবলম্বী বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী। এ অবস্থায় কেবলমাত্র মোহাম্মদই মক্কায় 'ফিৎনা' সৃষ্টি করতে পারেন, কোরাইশরা নয়।

তাহলে এক্ষেত্রে নবি ও আল্লাহ কিভাবে কোরাইশদেরকে 'ফিৎনা' সৃষ্টির দোষে দোষী করতে পারেন? এর কারণ হয়তো এই যে, কোরানের ২:১৯৩ নং আয়াত (৮:৩৯ নং আয়াতও) অনুযায়ী, কোরান সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ-কর্তৃক আইন ও ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ সনদরূপে প্রেরিত, যা অবশ্যই অন্যান্য ধর্মের তথা সমগ্র মানবজাতির উপর কর্তৃত্ব করবে। সুতরাং একে প্রত্যাখ্যান বা ইসলামের বিরোধিতা করা – যেমনটি কোরাইশরা করেছিল মোহাম্মদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান ও তার বিরোধিতা করে – তা মোহাম্মদ ও আল্লাহর বিচারে 'ফিৎনা' সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। কোরানের ২:২১৭ নং আয়াতেও আল্লাহ 'ফিৎনা'র ঠিক অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: *'আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেওয়া, তাঁকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে প্রবেশে বাঁধা দেওয়া এবং এর সদস্যদেরকে বিতাড়িত করা আল্লাহর দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। ...দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং নিপীড়ন হত্যার চেয়েও নির্মম।'* সুতরাং ইসলাম ধর্মকে কেবলমাত্র প্রত্যাখ্যান করলেই তা আল্লাহ ও তাঁর নবির দৃষ্টিতে 'দাঙ্গা, নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা' সমতুল্য এবং 'হত্যার চেয়ে নির্মম' বলে বিবেচিত।

পাঠকগণ অবশ্যই মনে রাখবেন যে, পৌত্তলিক কোরাইশদের শুধু এটুকু অপরাধের কারণে মোহাম্মদ তাদের উপর চড়াও হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান চালিয়েছিলেন, যা নীচে বর্ণিত হয়েছে। তদুপরি কোরাইশ ও অন্যান্য আরব পৌত্তলিকদের সঙ্গে মোহাম্মদ তাঁর আচরণের যে আদর্শ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, মুসলিমরা আদর্শগতভাবে সর্বকালে বিশ্বের সকল পৌত্তলিক বা প্রতিমা-উপাসকদের প্রতি ঠিক সেরূপ আচরণ প্রয়োগ করবে।

আল্লাহ পুনরায় আরেকটি আয়াতে মুসলিমদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন সকল অমুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য: *'যুদ্ধ অব্যাহত রাখ যতক্ষণ না হৈচৈ-বিশৃঙ্খলা অথবা নিপীড়ন বিলুপ্ত হয় এবং ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তারা যা করে আল্লাহ সবই দেখেন'* (কোরান ৮:৩৯)। মনে হয় এ আয়াতগুলো মোহাম্মদের অন্ততঃ কিছুসংখ্যক শিষ্যকে সহিংস জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট ছিল না। অহিংস ব্যক্তি-চেতনার কারণে তারা কোরাইশ কিংবা অন্য কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর আল্লাহ নতুন এক আয়াত পাঠান যা যুদ্ধ বা জিহাদে অংশগ্রহণকে সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক ধর্মীয় বা পবিত্র কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা দেয়, সেটা তারা পছন্দ করুক বা না করুক: *'যুদ্ধ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অথচ তোমরা তা অপছন্দ কর। কিন্তু এটাও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছো, যা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর। আর তোমরা এমন কিছুকে ভালোবাসছো, যা তোমাদের জন্য অমঙ্গলকর। কিন্তু আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জান না'* (কোরান ২:২১৬)।

মনে হয় যে, শুরুতে মোহাম্মদের শিষ্যরা যুদ্ধে লিপ্ত হতে অস্বীকার করেছিল এ যুক্তিতে যে, আল্লাহ যুদ্ধের অনুমোদন দেন নি। এরপর যখন স্বর্গ থেকে কাঙ্খিত অনুমোদনটি এল, তখনও কিছু অহিংস ও দুর্বল চিত্তের শান্তিবাদি শিষ্য সহিংস জিহাদে জড়ানোর ব্যাপারে দ্বিধা পোষণ করে। তারা ব্যাপক রক্তপাত ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত ছিল। আল্লাহ মোহাম্মদের সেসব ভীরু শিষ্যদেরকে উদ্দেশ্য করে আরেকটি নতুন প্রত্যাদেশ পাঠান: *'...(হে মোহাম্মদ) কিছু বিশ্বাসী বলেছিল: কেন (কোরানে) একটা অধ্যায় প্রকাশ হয়নি (যুদ্ধের জন্যে)? তারপর যখন একটি চূড়ান্ত অধ্যায় প্রকাশিত হলো যাতে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তারপরও দেখ যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত; তারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছা যাবে; তাদের প্রতি আল্লাহর ধিক্কার!'* (কোরান ৪৭:২০)।

শুরুতে মোহাম্মদের অধিকাংশ শিষ্যই ছিল সমাজের নিচুস্তর থেকে আসা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ। যেহেতু তারা মূলতঃ একটা অহিংস ও শান্তিপূর্ণ সমাজ থেকে আসা, সুতরাং তারা তখনও পর্যন্ত সহিংস জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ছিল নৈতিকভাবে দ্বিধান্বিত, কেননা তাতে নির্দোষ মানুষ মারা যেতে পারে। এবং বদর যুদ্ধে যখন সত্যি সত্যি অনেক মক্কাবাসী মারা যায় (নিচে দেখুন), তখন তাদের সে দ্বিধা প্রকট হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় আল্লাহ মোহাম্মদের অনুসারীদের মনের এ নৈতিক দ্বিধা দূর করতে জিহাদী কর্মকাণ্ডে ঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন একটি নতুন আয়াত পাঠানোর মাধ্যমে: *'অতএব তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তোমরা যখন (শত্রুকে) আঘাত করেছো, তোমরা তা করনি, স্বয়ং আল্লাহ তা করেছেন। এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণকে তাঁর উৎকৃষ্ট পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ অবশ্যই সব শোনেন ও জানেন।'* (কোরান ৮:১৭)।

আরো দেখা যায় যে, মোহাম্মদের মক্কাবাসী কিছু শিষ্য কোরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বা শত্রুতা দেখাতে বিশেষ অনীহা প্রকাশ করেছিল, কারণ কোরাইশরা ছিল মোটের উপর তাদেরই পারিবারিক সদস্য, আত্মীয় ও গোত্রের লোক। তাদেরকে বুঝানোর জন্য আলাহ্‌ নতুন আয়াত নাজিল করেন, যাতে তিনি মুসলিমদের অবিশ্বাসী আত্মীয়-স্বজনকে শত্রু আখ্যা দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উৎসাহিত করেন। যেমন আল্লাহ বলেন: *'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের প্রতি সাবধান হও...'* (কোরান ৬৪:১৪)।

অনুমান করা যায় যে, এরপর জিহাদী যুদ্ধের আয়োজন করতে যখন অর্থ-সামগ্রীর প্রয়োজন হলো, আল্লাহ তখন সুদে-আসলে পুষিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলিমদেরকে তাদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ জিহাদে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ বলেন: *'তোমাদের সামর্থে যতটা পার যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখ, যাতে তোমরা আতঙ্কিত করতে পার আল্লাহ ও তোমাদের শত্রু এবং অচেনা পিছুকারীদেরকে। তোমরা আল্লাহর পথে যা ব্যয় করবে, তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দেওয়া হবে, এবং তোমরা কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না'* (কোরান ৮:৬০)।

বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র পুরোপুরি ফেরৎ পাওয়ার আশায় মোহাম্মদের শিষ্যরা তাদের ধনসম্পদ ও সঙ্গতি জিহাদে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। আল্লাহ অতঃপর অন্যান্য পুরস্কারের সাথে তাদের সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন এভাবে: *'...কী কারণে তোমরা আল্লাহর জন্য ব্যয় করছো না? ...যে আল্লাহকে ঋণ দেবে, তা হবে চমৎকার ঋণ। কেননা আল্লাহ উদারহস্তে অন্যান্য পুরস্কারসহ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন'* (কোরান ৫৭:১০-১১)।

এরপরও মোহাম্মদের কিছু অনুসারী তাদের সঙ্গতি বা সম্বল আল্লাহর জন্য জিহাদে ব্যয় করার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক ছিল বলে মনে হয়। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সতর্কবাণী পাঠান এভাবে: *'ভেবে দেখ, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণ স্বভাবের। কিন্তু যারা কৃপণতা করছে, তারা কেবল তাদের আত্মাকে বিসর্জন দিচ্ছে'* (কোরান ৪৭:৩৮)।

এ আয়াতগুলো ছিল মুসলিমদেরকে মক্কার কোরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা সহিংস ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে আল্লাহর প্রথম দিককার মিনতি বা অনুমতি। এ স্বর্গীয় অনুমোদন বা স্বীকৃতি পেয়ে মোহাম্মদ মদীনায় স্থানান্তরের মাত্র আট মাস পর ৬২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মদীনার কাছাকাছি পথ দিয়ে গমনরত একটি কোরাইশ বাণিজ্য-কাফেলার উপর প্রথম জিহাদী আক্রমণের হুকুম দেন। এ আক্রমণের কারণ ছিল দু'টো: কোরাইশদের মালামাল লুণ্ঠন ও হয়রানি করা। কিন্তু আক্রমণটি ব্যর্থ হয়। এর পরবর্তী মাসগুলোতে আরও দু'টো আক্রমণের আদেশ দেন তিনি। সে হামলা দু'টোর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তারপর মদীনায় গমনের প্রায় বার মাস পর মোহাম্মদ নিজে হামলার নেতৃত্ব নেন। পরবর্তী কয়েকমাস তিনি স্বয়ং তিন-তিনটি হামলা পরিচালনা করলেও তা ব্যর্থ হয়।[৪৩]

নাখলায় হামলা

৬২৪ সালের জানুয়ারি মাসে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস-এর নেতৃত্বে নবি আট সদস্যের এক হামলাকারী দলকে মক্কার এক কাফেলায় হামলা করার জন্য নাখলা নামক একটি স্থানে পাঠান। নাখলার অবস্থান ছিল মদীনা থেকে নয় দিনের এবং মক্কা থেকে মাত্র দুই দিনের পথ। তাদেরকে পাঠানোর সময় মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে দুই দিনের পথ পাড়ি দিওয়ার আগে না খুলতে নির্দেশ দেন। যথাসময়ে আব্দুল্লাহ চিঠিটি খুলে দেখে যে তাতে লেখা রয়েছে: *'তোমরা যখন আমার এ চিঠি পড়বে, এগিয়ে যেতে থাকবে যতক্ষণ মক্কা ও আল-তা'য়েফের মাঝামাঝি নাখলায় না পৌঁছুবে। সেখানে কোরাইশদের (কাফেলার) জন্য অপেক্ষা করবে।'*[৪৪]

---

৪৩. Muir, p. 225-228
৪৪. Ibn Ishaq, p. 287; Muir, p. 208-209

আব্দুল্লাহ ও তার দল সে নির্দেশ মান্য করে নাখলায় পৌঁছায়। এটা ছিল ওমরাহ'র (অর্থাৎ কা'বায় গৌণ তীর্থ পালনের) সময়। আগন্তুক কাফেলা যাতে সন্ত্রস্ত না হয় তার জন্য এক মুসলিম হামলকারী তার মাথা কামিয়ে নেড়া করে নেয়, যাতে কাফেলার কোরাইশরা ধারণা করবে যে এরা ওমরাহ্ করে ফিরছে। কাফেলাটি নাগালের মধ্যে আসার সাথে সাথে হামলাকারী মুসলিমরা তাদের উপর চড়াও হয়। এ আক্রমণে কাফেলার একজন নিহত হয়, দুজন হামলাকারীদের হাতে ধৃত হয় এবং আরেকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা কাফেলার প্রচুর মালামাল ও দুই বন্দিকে মদীনায় নিয়ে আসে। এটা ছিল পবিত্র রজব মাস, বছরের চারটি পবিত্র মাসের মধ্যে একটি এবং প্রচলিত আরব প্রথা অনুযায়ী এ মাসে যুদ্ধ ও রক্তপাত ছিল নিষিদ্ধ। এ সহিংস ঘটনা যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাদের এ প্রথাকে ভঙ্গ করায় মদীনার লোকদের মধ্যে, এমন কি মোহাম্মদের কিছু শিষ্যের মাঝেও, হতাশা ও হৈচৈ সৃষ্টি করে, যা নবিকে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেয়। প্রথমে তিনি এ অপকর্মের দায়দায়িত্ব সংঘটনকারীদের কাঁধে চাপিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেন। আবদুল্লাহ ও তার সহযোগী হামলাকারীরা এতে হৃদয়-ভগ্ন হয়ে পড়ে, যা দেখে (পাছে তা ভবিষ্যতে এরূপ হামলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অনীহা সৃষ্টি করে) নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এ নিষিদ্ধ রক্তপাত সমর্থন করে আল্লাহ এগিয়ে আসেন নবিকে উদ্ধারের জন্যে: *'তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে লড়াই সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলো: এক্ষেত্রে লড়াই করা গুরুতর অপরাধ, কিন্তু আল্লাহর চোখে তার চেয়েও গুরুতর হলো আল্লাহর পথে আসতে বাঁধা দেওয়া, তাঁকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে প্রবেশে বাঁধা দেওয়া এবং তাঁর সদস্যদের বিতাড়িত করা। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও নিপীড়ন হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট। পারলে তারা তোমাকে তোমার বিশ্বাস থেকে না ফেরানো পর্যন্ত যুদ্ধ থামাবে না'* (কোরান ২:২১৭)। আল্লাহ এ আয়াতটির সমাপ্তি টানেন মুসলিমদের মাঝে যারা এ ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল এবং মোহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারত, তাদের প্রতি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে: *'...এবং যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বিশ্বাস থেকে ঘুরে দাঁড়ায় ও অবিশ্বাসীরূপে মারা যায়, তাহলে তাদের এ জীবন ও পরকাল নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারা আগুনের সঙ্গী হয়ে সেখানে বাস করবে'* (কোরান ২:২১৭)। এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলামে কোরাইশ ও যে কোন প্রত্যক্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন কারণে যুদ্ধ বা হত্যাকাণ্ড স্বর্গীয়ভাবে ন্যায়সঙ্গত হয়। নবী আবদুল্লাহকে 'আমীর-উল-মুমেনিন' বা 'বিশ্বাসীদের সেনাপতি' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এটা বিবেচনায় আনা দরকার যে, এ সার্থক হামলা ও লুণ্ঠনের আগে মোহাম্মদের সম্প্রদায় প্রচণ্ড অর্থ-কষ্টে ভুগছিল। সুতরাং রক্তঝরা এ সফল হামলা মোহাম্মদের সম্প্রদায় ও তাঁর ধর্ম প্রচারে একটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে; কেননা এ হামলা তাদেরকে প্রচুর লুটের মালামাল এনে দেয় তাদের অভাব ও দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য। আল্লাহ মুসলিমদের লুণ্ঠনের মালামাল স্বর্গীয়ভাবে আইনসঙ্গত বা বৈধ করে দেন এক আয়াত নাজিল করে: *'এখন তোমরা যা জয় করেছো তা বৈধ ও যথার্থ হিসেবে ভোগ কর এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য অব্যাহত রাখ'* (কোরান ৮:৬৯)। যুদ্ধে লুণ্ঠিত ও আটক মালামাল বণ্টনের ব্যাপারেও আল্লাহ আয়াত পাঠান (কোরান ৮:৪১)। সে মোতাবেক মোহাম্মদ তাঁর নিজের হিস্যা হিসেবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাখেন; অবশিষ্ট শিষ্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। দু'বন্দীর মুক্তিপণ হিসেবে আরও অর্থ আসে।[৪৫] এ ঘটনা থেকে শুরু হয় অমুসলিম কাফেলা বা সম্প্রদায়ের ধনসম্পদ লুণ্ঠন মোহাম্মদের সম্প্রদায়ের জীবনযাপনের উৎসরূপে গ্রহণ।

সুবিখ্যাত বদরের যুদ্ধ

পরবর্তীতে মোহাম্মদের নবুয়তি মিশনের সবচেয়ে বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদী হামলার সুযোগ আসে এর দুই মাস পর ৬২৪ সালের মার্চ মাসে। মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে সিরিয়া থেকে ফিরছিল বিপুল মালামালসহ কোরাইশদের এক বিশাল কাফেলা। মোহাম্মদ এ কাফেলা লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেন যে, নবি যখন শুনতে পেলেন আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে ফিরছেন, তখন তিনি মুসলিমদের ডেকে বললেন: *"'একটি কোরাইশ কাফেলা মালামাল নিয়ে ফিরছে। তাদের আক্রমণ করতে চলো। সম্ভবত ঈশ্বর এগুলো শিকার হিসেবে তোমাদেরকে দিবে।' তাঁর ডাকে জনগণের কেউ উৎসাহে আবার কেউ উদাসীনভাবে সাড়া দেয়,*[৪৬] *কারণ তারা ভাবতে পারে নি যে নবি (আবারও) যুদ্ধে যাবেন।'"*[৪৭] আবু সুফিয়ানের কাছে মোহাম্মদের আক্রমণের পরিকল্পনার খবর পৌঁছে যায়। তিনি এক বার্তাবাহককে মক্কায় পাঠিয়ে দেন কাফেলাটি রক্ষার্থে উদ্ধারবাহিনী পাঠানোর জন্য। ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান মোহাম্মদের বাহিনীকে এড়ানোর জন্য গমনপথ পরিবর্তন করে লোহিত সাগরের তীর বরাবর দ্রুত অগ্রসর হয়ে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যায়। কিন্তু কাফেলাটিকে রক্ষা ও মোহাম্মদের লুণ্ঠনকারী দলকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে একটা উদ্ধার দল মক্কা ত্যাগ করেছিল। মোহাম্মদ কাফেলাটিকে হঠাৎ আক্রমণ করার জন্য বদর নামক একটি জলপূর্ণ মরুদ্যানের নিকট ওঁৎ পেতে থাকেন। সেখানে অবস্থান নিয়ে নিজস্ব লোকদের জন্য তাঁবুর কাছাকাছি ব্যবহার উপযোগী একটি পানির কূপ রেখে বাকী কূপগুলো বালি-ভর্তি করে নষ্ট করে ফেলেন। তিনি জানতেন না যে আবু সুফিয়ান ইতিমধ্যে কাফেলা নিয়ে পালিয়ে গেছে। তিনি মক্কার উদ্ধার বাহিনীর আগমনের ধ্বনি শুনে মনে করেন যে আবু সুফিয়ানের কাফেলাই আসছে।

রমজান মাসের ১৭ তারিখে মক্কার বাহিনী যখন বদরে পৌঁছে, উত্তপ্ত মরুভূমিতে বেশ কয়েকদিনের কষ্টকর ভ্রমণে তারা ছিল ভীষণ ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। কিন্তু মোহাম্মদ সব কূপ ধ্বংস করায় তাদের তৃষ্ণা মেটাবার কোন পথ ছিল না। মক্কার পক্ষে যোদ্ধা ছিল মোট ৭শ' (কারো কারো মতে এক হাজার); মোহাম্মদের সাথে ছিল মাত্র ৩৫০ জন আক্রমণকারী। পরদিন খুব ভোরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। সংখ্যাগত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তৃষ্ণাকাতর মক্কার সেনারা দ্রুত নিহত হতে থাকে ও এক পর্যায়ে তারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পিছুপদ হতে বাধ্য হয়। তাদের ৫০ জন

---

৪৫. Ibn Ishaq, p. 286-88

৪৬. It becomes obvious that even at this time, more than a year after Jihad or holy war was sanctioneed by Allah, many followers of muhammad were still reluctant to engage in violence.

৪৭. Ibn Ishaq, p.289

প্রাণ হারায় ও সমসংখ্যক বন্দী হয়। মোহাম্মদের দল মাত্র ১৫ জন যোদ্ধা হারায়। কয়েকজন বন্দীকে মোহাম্মদের নির্দেশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৪৮]

বদর যুদ্ধের অসাধারণ সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে নবি অবিলম্বে মদীনার বানু কায়নুকা নামক ইহুদী গোত্রকে আক্রমণ ও নির্বাসিত করেন (নিম্নে বর্ণিত)।

সর্বনাশা ওহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের অবিশ্বাস্য বিজয় মোহাম্মদ ও তাঁর সম্প্রদায়ের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করে তোলে। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, ঈশ্বর তাদের পক্ষে সামিল হয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে জয়ী হতে সাহায্য করছেন। আল্লাহ নিজেও এক আয়াত নাজিলের মাধ্যমে নিশ্চতয়া দেন যে, বাস্তবিকই তিনি ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত পাঠিয়ে মুসলিমদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করছেন যাতে করে ২০ জন শক্তিশালী মুসলিম যোদ্ধা ২০০ প্রতিপক্ষ যোদ্ধাকে বিনাশ করতে পারে (কোরান ৮:৬৬)। মোহাম্মদ শীঘ্রই মক্কার আরও তিনটি কাফেলার উপর হামলা চালিয়ে বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন।

এ অবস্থায় মোহাম্মদের প্রতি মক্কার কোরাইশরা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তাদের জীবনধারণের প্রধান উপায় বাণিজ্য-কর্ম অনেকটা অসম্ভব করে তোলায় শেষ পর্যন্ত তারা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রতিকার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৬২৫ সালের ২৩'শে মার্চ আবু সুফিয়ানের সেনাধ্যক্ষে মক্কার ৩,০০০ লোকের এক যোদ্ধাবাহিনী মদীনার নিকটবর্তী ওহুদ নামক স্থানে মোহাম্মদের নেতৃত্বাধীন ৭০০ মুসলিম যোদ্ধার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংখ্যার দিক দিয়ে দুর্বল মুসলিম বাহিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ যুদ্ধে মোহাম্মদ পাথরের আঘাতে একটা দাঁত হারান ও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মুসলিমরা ৭৪ জন যোদ্ধাকে হারায়; মক্কার পক্ষে নিহত হয় মাত্র ১৯ জন।

আগে আল্লাহ ও মোহাম্মদ যেহেতু নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন ফেরেশতাদের সহায়তায় ২০ জন মুসলিম যোদ্ধা প্রতিপক্ষের ২০০ যোদ্ধাকে বিনাশ করবে, এ সর্বনাশা যুদ্ধে ব্যাপক জীবনহানি তাঁর শিষ্যদের মাঝেও তাঁর নবুয়তির দাবীর সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের জন্ম দেয়। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ বা শত্রুভাবও সৃষ্টি হয়। বিরোধীরাও, বিশেষ করে ইহুদি ও ইসলামের সুবিখ্যাত মোনাফেক আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই (নিম্নে দেখুন, কেন সে মোনাফেক ছিল), মোহাম্মদকে অপদস্থ করতে এরাও ঘটনাকে ব্যবহার করে তাঁর নবুয়তির ব্যাপারে সন্দেহ ছড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তাঁকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেন আবারো। আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো আয়াত নাজিল করেন তাঁর নবুয়তির ব্যাপারে সন্দেহ ও বিদ্বেষ দূর করতে (কোরান ৩:১২০-২০০)। আল্লাহ ফেরেশ্তা পাঠিয়ে প্রতিপক্ষকে বিনাশে মুসলিমদের সহায়তার যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে বিষয়ে অভিযোগের ব্যাপারে তাদের দৃঢ়তা ও ধৈর্যের অভাবের কারণে এ ভড়াডুবি হয়েছে বলে সমস্ত দোষ আল্লাহ মোহাম্মদের শিষ্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। আল্লাহ প্রত্যাদেশ পাঠান: "*(হে মোহাম্মদ) তুমি বিশ্বাসীদের বলেছিলে: এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা (বিশেষভাবে) পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, যদি তোমরা দৃঢ় থাকতে ও সঠিক কাজটি করতে (অর্থাৎ পিছুপদ না হতে), তখন শত্রুরা দ্রুতবেগে তোমাদের উপর চড়াও হলেও, তোমাদের প্রভু তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ ঘটাত*' (কোরান ৩:২২৪-২৫)।

আল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, তিনি সত্যি সত্যিই এর আগে বদরের যুদ্ধে মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছিলেন, যখন তারা পরাজয়ের আশঙ্কা করছিল; আর সেজন্যে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ বলেন: '*মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে দুটো দল বদরের যুদ্ধে কাপুরুষতা পোষণ করছিল। কিন্তু আল্লাহ সেখানে তাদের রক্ষক হিসেবে কাজ করেন; কাজেই বিশ্বাসীদের (সর্বদা) আল্লাহর উপর আস্থা রাখা উচিত। আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, যেখানে তোমরা ছিলে (তুলনামূলকভাবে) হতভাগা নগণ্য শক্তি। অতএব আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারো*' (কোরান ৩:১২২-২৩)। মোহাম্মদের নির্দেশ না মানায় ওহুদের যুদ্ধে পরাজয় হয়, এ দোষে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে দোষী করে আল্লাহ বলেন: '*তোমরা পাহাড়ে উঠছিলে সবকিছু উপেক্ষা করে, যদিও তোমাদের পিছন থেকে নবি তোমাদেরকে ডাকছিলেন (যুদ্ধ চালিয়ে যেতে)। সুতরাং তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে শোক দেন তাঁর (নবির) শোকের জন্যে। (হয়তোবা তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য) যাতে করে তোমরা যা থেকে বঞ্চিত হয়েছো অথবা যা (নির্মমতা) তোমাদের উপর পতিত হলো, তার জন্য বিমর্ষ না হও*' (কোরান ৩:১৫৩)।

আল্লাহ মোহাম্মদ-পূর্ববর্তী নবি ও তাদের শিষ্যদের উদাহরণ উপস্থাপন করেন যারা আল্লাহর পথে কখনও দুর্বলতা প্রদর্শন না করে দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ করে গেছেন। তিনি মোহাম্মদের অনুসারীদেরও সেরূপ করার জন্য আহ্বান জানান এভাবে: '*কত নবি ও তাদের অসংখ্য ঈশ্বরভক্ত শিষ্য আল্লাহর পথে লড়াই করে গেছেন। কিন্তু তারা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে ভীষণ সর্বনাশের মুখে পড়লেও কখনোই সাহস হারান নি, না দেখিয়েছেন দুর্বলতা কিংবা মেনেছেন হার। আল্লাহ দৃঢ়চিত্ত ও সাহসীদের ভালোবাসেন*' (কোরান ৩:১৪৬)।

ওহুদের যুদ্ধে যারা প্রাণ হারিয়েছিল আল্লাহ তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে একটা প্রত্যাদেশ পাঠান শান্ত্বনা দিতে যে, বাস্ত বে তারা মরেনি, মৃত্যুর ভাবাবেশে আছে মাত্র এবং তারা স্বর্গে গমন করে সেখানে আনন্দ করছে। আল্লাহ বলেন: '*যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না। না, তারা তাদের প্রভুর পাশে চিরস্থায়ী হয়ে বেঁচে আছে। তারা আল্লাহর অসীম কৃপার মধ্যে আনন্দ করছে।*

---

৪৮. Ibd, p. 289-314; Walker, p. 119-20

যারা পিছনে পড়ে আছে ও যারা এখনও তাদের সাথে (স্বর্গসুখে) যোগ দেয়নি, তাদের জন্যও রয়েছে (শহীদের) গৌরব; তাদের কোন ভয় নেই বা আফসোস করারও কিছু নেই' (কোরান ৩:১৬৯-৭০)।

যাহোক, ওহুদের যুদ্ধের পাঁচ মাস পর ৬২৫ সালের আগষ্ট মাসে মোহাম্মদ মদীনার বানু নাদের নামক ইহুদী গোত্রের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে নির্বাসনে পাঠান (নিম্নে বর্ণিত)।

কিন্তু সর্বনাশা ওহুদের যুদ্ধে কোরাইশদের দ্বারা মোহাম্মদ বড় রকমের একটা শিক্ষা পেয়ে মক্কার কাফেলার উপর হামলা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখেন। কোরাইশরা ওহুদের যুদ্ধে এ বড় বিজয়ের পর মোহাম্মদকে পুনরায় আক্রমণ করতে আসে নি। মোহাম্মদ যেহেতু তাদের বাণিজ্য-কাফেলার উপর হামলা বন্ধ করে রাখে, সে কারণে তারা সম্ভবত ভেবেছিল যে সে বড় শিক্ষা পেয়েছে এবং তাদের জন্য আর হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। ইতিমধ্যে মোহাম্মদ তাঁর ধর্মান্তরিত শিষ্য সংখ্যা ও বস্তুগত সামর্থ্য বৃদ্ধি করে (বানু কায়নুকা ও বানু নাদের ইহুদি গোত্রের কাছ থেকে হস্তগত ধনসম্পদ দ্বারা) তাঁর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সময় নেন। প্রায় এক বছর বিরতির পর ৬২৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আবার মক্কার কাফেলার উপর আক্রমণ শুরু করেন। মালামালপূর্ণ কাফেলার উপর ক্রমবর্ধমান হারে সফল হামলায় লুণ্ঠিত ধনসম্পদ, উট ও দাস ইত্যাদির মালিক হয়ে মুসলিমরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ সময় মোহাম্মদ তাঁর লুণ্ঠনকারী দলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য নিকটবর্তী অমুসলিম গোত্রগুলোকে তাঁর হামলায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রন জানান। কিছু অমুসলিম গোত্র তাঁর লুণ্ঠন দলে যোগ দেয়, সম্ভবত দু'টো কারণে: ১) লুণ্ঠনের মালামালের প্রতি লোভ, ২) মোহাম্মদের হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা। ইতিমধ্যে মোহাম্মদ মদীনার দুটো শক্তিশালী ইহুদী গোত্রকে আক্রমণ করে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, যা স্পষ্ট করে তুলে যে তাঁর ডাকে সাড়া না দিলে সেসব অমুসলিম গোত্রগুলো মোহাম্মদের তরফ থেকে সত্যি সত্যি বিপদের মুখে পড়তে পারত।

খন্দক-এর যুদ্ধ

মক্কার কাফেলার উপর পুনরায় আক্রমণ শুরু করার অর্থ দাঁড়ায় যে, কোরাইশদের উপর মোহাম্মদের হুমকি তখনও শেষ হয় নি। অতএব আবু সুফিয়ান মোহাম্মদের হুমকি চিরতরে শেষ করার জন্য ৬২৭ সালের এপ্রিল মাসে আরো একটা পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। তিনি প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলোকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানালে বানু ঘাতাফান, বানু সুলেম ও বানু আসাদ সহ অনেকগুলো গোত্র – যারা মোহাম্মদের আক্রমণে ইতিমধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল – আবু সুফিয়ানের ডাকে সাড়া দেয়। আবু সুফিয়ানের পিছনে প্রায় ১০,০০০ যোদ্ধার (কারো কারো মতে ৭,০০০) এক বিশাল বাহিনী সমবেত হয়। সে সময় মোহাম্মদ বড়জোর ৩,০০০ যোদ্ধা সমেবেত করতে পারতেন। সুতরাং তাঁর সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠে।

ভাগ্যক্রমে মোহাম্মদ ইতিমধ্যে সালমান নামে খ্যাত পারস্যের এক শিষ্য পেয়েছিলেন, যিনি মোহাম্মদকে মদীনায় তাঁর বাসস্থানের চতুর্দিকে খন্দক বা পরিখা খননের পরামর্শ দেন। শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্যে পরিখা খনন ছিল পারস্যে একটা প্রচলিত কৌশল, যা আরবরা জানতো না। মোহাম্মদ ধারণাটা লুফে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের বাসস্থানের চতুর্দিকে একটি গভীর খন্দক খননের নির্দেশ দেন। সব মুসলিমকে খন্দকের ভিতরে একত্রিত করে বাড়িঘরের বাইরের দেয়াল পাথর দ্বারা শক্ত করা হয়। আক্রমণকারী কোরাইশরা মুসলিমদের বাসস্থানের চারিদিকে অবরোধ আরোপ করে। কিন্তু মোহাম্মদের এ কৌশল তাদের কাছে অপরিচিত হওয়ায় তারা খন্দকটি পার হতে ব্যর্থ হয়। প্রায় ২০ দিনব্যাপী অবরোধের (কেউ কেউ বলেন প্রায় এক মাস) পর মক্কা বাহিনী অবরোধ তুলে নেয়। অবরোধকালে তেমন কোন যুদ্ধ হয়নি; এতে মোহাম্মদের পক্ষের মাত্র পাঁচজন ও মক্কার পক্ষের তিনজনের প্রাণহানি ঘটে।

সালমান ছিলেন জরথুষ্ট্রবাদ (অগ্নি-উপাসনা) থেকে ধর্মান্তরিত একজন খৃষ্টান যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। সালমানের পরামর্শে এ যাত্রা রক্ষা পাওয়ায় তার সম্প্রদায় বা দেশবাসীর প্রতি মোহাম্মদ পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ তাদের জ্ঞানের গভীরতারও প্রশংসা করেন।[৪৯]

কোরাইশরা অবরোধ তুলে নেয়ার পরপরই মোহাম্মদ মদীনার সর্বশেষ ইহুদী গোত্র বানু কুরাইজা'কে আক্রমণ করেন কোরাইশদেরকে সহযোগিতা করার অভিযোগে। বানু কোরাইজা আত্মসমর্পণ করলে মোহাম্মদ তাদের পুরুষদের সবাইকে হত্যা করেন, এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে কব্জা করেন (নিম্নে বর্ণিত হয়েছে)।

মক্কা জয় ও কা'বা দখল

৬২৮ সালের মধ্যে মোহাম্মদ মদীনার সব শক্তিশালী ইহুদী গোত্রকে উচ্ছেদ বা নিশ্চিহ্ন করেন। আশেপাশের অনেক গোত্রকেও হুমকি অথবা আক্রমণের দ্বারা আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করেন। তিনি তখন পৈত্রিক শহর মক্কা ও সেখানে অবস্থিত কা'বা দখলের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। নবুয়তি মিশনের শুরু থেকেই তিনি কা'বার উপর দাবি পেশ করে এসেছেন। তদুপরি বছরের পর বছর মদীনায় মুসলিমরা প্রতিবার নামাজের সময় কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। কাজেই কা'বা তাঁর ধর্মীয় মিশনের পবিত্রতম প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর দখল ছিল তাঁর জন্য বৃহত্তম পুরস্কার। কা'বার একটা বড় অর্থনৈতিক গুরুত্বও ছিল (যেমনটা আজকে সৌদিদের জন্য), কারণ ওমরাহ্ ও হজ্জ্ব-এর তীর্থকেন্দ্র হিসেবে আরবদের কাছে এটা ছিল রাজস্ব আয়ের এক লোভনীয় উৎস। অধিকন্তু আল্লাহ ইতিমধ্যে কোরানে কোরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদী সংগ্রাম ও তাদের পরাজিত করার জন্য যথেষ্ট প্ররোচনা দিয়েছেন। কাজেই মক্কাকে বশীভূত করা মোহাম্মদের নবুয়তি কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

---

৪৯. Ibid, p. 121-22; Ibn Ishaq, p. 456-61; Muir, p. 306-14.

হুদাইবিয়ার সন্ধি: ৬২৮ সালের মার্চ মাসে (অর্থাৎ খন্দক যুদ্ধের এক বছর ও মদীনায় স্থানান্তরের ছয় বছর পর) মোহাম্মদ তাঁর পৈত্রিক শহর মক্কার দিকে অগ্রসরে সাহসী ও উৎসাহী হয়ে উঠেন। তাঁর অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য আশেপাশের গোত্রগুলোকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে তাঁর এ আহ্বানে তেমন সাড়া মেলেননি। ১,৩০০ থেকে ১,৫২৫ জন মুসলিম যোদ্ধার এক সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে ওমরাহ্‌'র সময় মোহাম্মদ মক্কার দিকে অগ্রসর হন। কোরাইশরা মোহাম্মদের আগমনের খবর জানতে পেয়ে তাঁর মক্কায় প্রবেশ রুখতে শপথ গ্রহণ করে। কেননা মোহাম্মদ ইতিমধ্যে বহুবার তাদের জন্য ভয়াবহ রক্তপাত, অবমাননা ও অভাব-অনটন বয়ে এনেছিল। কোরাইশদের এ প্রতিজ্ঞার খবর পেলে মোহাম্মদ সামনে অগ্রসর না হয়ে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু গাড়েন। তিনি মক্কায় বার্তা পাঠান যে, তিনি কেবল শান্তিপূর্ণভাবে ওম্‌রাহ করতে এসেছেন এবং তা করার পর মদীনায় ফিরে যাবেন। মোহাম্মদ ওম্‌রাহ করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন আর কোরাইশরাও তাঁর মক্কায় প্রবেশ রুখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু মোহাম্মদের সাথে সামরিক সংঘর্ষের ফলাফল বিবেচনা করে কোরাইশরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে তাঁর সঙ্গে আপসের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকষির একটা পর্যায়ে মোহাম্মদের জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান মক্কা শিবিরে যান আলোচনার জন্য। ওসমানের সেখান থেকে ফিরতে কিছুটা দেরী হচ্ছিল। ইতিমধ্যে মোহাম্মদের শিবিরে গুজব রটে যে ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে। এ রটনায় মোহাম্মদ অনতিবিলম্বে তাঁর বাহিনীকে একটা বাবলা গাছের নিচে সমবেত করে একে একে সবাইকে *'জীবন দিয়ে ওসমানের পাশে দাঁড়ানো'*র শপথ করান। এ শপথটি ইসলামের পঞ্জিকায় 'বৃক্ষের শপথ' নামে পরিচিত। মোহাম্মদ তাঁর অনুসারীদেরকে এমন মাত্রায় ধর্মীয় আবেগে উত্তেজিত করেছিলেন যে, তারা তাৎক্ষণিক মক্কার শিবির আক্রমণের জন্য আত্মঘাতি হয়ে উঠেছিল। ঠিক এ মুহূর্তে ওসমান মক্কার শিবির থেকে ফিরে আসে, যা একটা ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয় এড়াতে সহায়ক হয়। ওসমান চুক্তি বা সন্ধির শর্তগুলো চূড়ান্ত করে ফিরেছিলেন, যার ভিত্তিতে দু'পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিখ্যাত 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। এতে উল্লেখ থাকে যে, উভয় পক্ষ দশ বছরের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানি বন্ধ করবে। সন্ধির শর্তমতে, মোহাম্মদের দল এবারের জন্য কা'বা দর্শন না করেই মদীনায় ফিরে যাবে, কিন্তু পরবর্তী বছর থেকে তারা প্রতিবছর তিনদিন কা'বায় তীর্থ করতে পারবে।[৫০]

এখানে উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদের এ মক্কা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল মক্কা দখল, কিন্তু কোরাইশদের মাঝে আপোষহীন প্রতিরোধের দৃঢ়তা দেখে তিনি সুর বদলিয়ে 'শান্তিপূর্ণ ওমরাহ্‌' করতে আসার ধুঁয়া তুলেন। এ বিষয়ে ইবনে ইসহাক লিখেছেন: *'নবির সঙ্গীরা নিঃসন্দেহে মক্কা দখলের জন্য মদীনা থেকে বের হয়েছিল; কারণ মোহাম্মদ স্বপ্নে দেখেছিলেন সেটাই। কিন্তু যখন তারা দেখলো যে আপস-মীমাংসা হচ্ছে ও মোহাম্মদ তা মেনে নিচ্ছেন, তখন তারা এমন হতাশ হয়ে পড়ে যে, যেন মৃত্যুও তার চেয়ে শ্রেয় ছিল।'*[৫১]

কোরাইশদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার প্রত্যাশায় এসে মোহাম্মদ বিনীতভাবে সন্ধি করায় কিছু মুসলিম ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে। এর মধ্যে রক্ত-পিপাসু ওমর ছিলেন একজন। যাহোক, মোহাম্মদ তাদের আশ্বস্ত করতে চান এ মর্মে যে, আল্লাহর নির্দেশে তিনি চুক্তিটি করেছেন, যা তাঁর দলের জন্য শুভ পরিণাম বয়ে আনবে। মোহাম্মদের শিষ্যদের বুঝানোর জন্য আল্লাহও দায়িত্বপূর্ণ হয়ে গোটা একটা সুরা নাজেল করেন, যা হল কোরানের অধ্যায় ৪৮ বা 'সুরা আল-ফাত' ('বিজয়')। আল্লাহ এতে বলেন যে, পরিস্থিতির বিচারে সন্ধিটি ছিল খুবই সঠিক ও বিজয়ের সমতূল্য, এবং চূড়ান্ত বিজয় আসছে অচিরেই।

মোহাম্মদের হুদাইবিয়া চুক্তিভঙ্গ

সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করতে মোহাম্মদের দল খুব বেশি সময় নেয় নি। আবু বাশির নামক মোহাম্মদের শিষ্য শীঘ্রই জনৈক কোরাইশকে হত্যা করে। এরপর সে প্রায় সত্তর জন মুসলিমকে নিয়ে একটা লুণ্ঠনকারী রাহাজান দল গঠন করে, যা মোহাম্মদ জেনেও না জানার ভান করেন। তারা মক্কার কাফেলাগুলো আক্রমণ করত এবং কাফেলার কাউকে জীবিত রাখতো না। আবু বাশিরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইবনে ইসহাক লিখেছেন: *'অতঃপর আবু বশির বহুদূর চলে যায় সাগর তীরবর্তী ধূল-মারওয়া অঞ্চলের আল ইস নামক স্থানের রাস্তায় না থামা পর্যন্ত। কোরাইশরা সাধারণত এ পথ দিয়েই সিরিয়ায় যাতায়াত করতো। প্রায় সত্তর জন ঐক্যবদ্ধ রাহাজান কাফেলাগুলোর ওপর হানা দিয়ে প্রত্যেককে হত্যা করতো ও তাদের সামনে যারাই পড়তো সবগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতো।'*

এ বর্বরতায় অসহায় কোরাইশরা মোহাম্মদ-কর্তৃক হুদাইবিয়া চুক্তির শর্ত মেনে চলার আশাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং মোহাম্মদের কাছে মিনতি করে যে, তিনি যেন অন্তত 'আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে' মক্কার কাফেলার উপর হামলা বন্ধ করেন। এ অনুরোধের পর মোহাম্মদ তাঁর হামলাকারীদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নেন। মোহাম্মদের কয়েকজন মহিলা শিষ্য, যাদেরকে স্ব-স্ব পরিবারের লোকেরা আটকে রেখেছিল, মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসে এ সময়। সন্ধির শর্ত মোতাবেক তাদেরকে মক্কায় ফেরৎ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু কোরাইশরা যখন তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে লোক পাঠায়, মোহাম্মদ তাদেরকে ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন।[৫২]

সন্ধি ছুঁড়ে ফেলে মোহাম্মদের মক্কা আক্রমণ

হুদাইবিয়া সন্ধি স্বাক্ষরের দুই বছর পর মুসলিম বাহিনী কোরাইশদের পরাজিত করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলে, মোহাম্মদ দশ বছর মেয়াদি সন্ধিটি ছুঁড়ে ফেলে মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি কোরাইশদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের

---

[৫০]. Muir, p. 353-59; Ibn Ishaq, p. 500-05
[৫১]. Ibn Ishaq, p. 505
[৫২]. Ibn Ishaq, p. 507-09; Muir, p. 364-65

প্রস্তুতিকালে মোহাম্মদ আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে থাকেন: '*হে আল্লাহ, কোরাইশদের চোখ-কান নষ্ট করে দাও, যাতে করে আমরা আকস্মিকভাবে তাদেরকে তাদের দেশে আক্রমণ করতে পারি।*'[৫৩] ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ১০,০০০ সৈনিকের একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

অজেয় মুসলিম বাহিনী রাত্রিকালে মক্কার নিকটবর্তী 'মার আল-জাহরান' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। রাতের অন্ধকারে প্রত্যেক মুসলিম সেনা মশাল জ্বালিয়ে কোরাইশদের ভীতিগ্রস্ত করতে চায় যে, কী এক বিশাল মুসলিম বাহিনী তাদের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান নিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে মুসলিম শিবিরে যোগ দেওয়া মোহাম্মদের চাচা আল-আব্বাস এ দৃশ্য দেখে নিজে থেকে বলে উঠেন: '*হায় দুর্ভাগা কোরাইশ! তারা যদি এসে রক্ষা করতে অনুরোধ করার আগেই আল্লাহর নবি তাঁর বাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, তা হবে কোরাইশদের চিরসমাপ্তি।*'[৫৪] সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে এবার আমরা অনুসন্ধান করে দেখি সত্যিকারভাবে কারা সন্ধিটি ভঙ্গ করেছিল।

সত্যি সত্যি কারা হুদাইবিয়া সন্ধি ভঙ্গ করেছিল?

ইসলামি পণ্ডিত ড্যানিয়েল পাইপ্‌স – যিনি ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দেওয়ার কারণে মুসলিমদের দ্বারা অতিশয় ঘৃণিত – দাবী করেন যে, মোহাম্মদ হুদাইবিয়া চুক্তিটি ভঙ্গ করেন নি, কোরাইশরা করেছিল। তিনি লিখেন: '*মোহাম্মদের জন্য চুক্তিটি ছুঁড়ে ফেলা কৌশলগতভাবে সঠিক ছিল, কেননা কোরাইশরা, কিংবা অন্তত তাদের মিত্ররা, প্রকৃতপক্ষে চুক্তিটি ভঙ্গ করেছিল।*'[৫৫] চুক্তিটি ভাঙ্গনের ব্যাপারে তিনি মুসলিমদের ধারণার সাথে একমত যে, মক্কাবাসীরাই চুক্তিটি ভঙ্গ করেছিল।[৫৬]

কোরাইশ-কর্তৃক হুদাইবিয়া চুক্তিভঙ্গের এ অভিযোগ বা দাবী তৃতীয় পক্ষের দুই গোত্রের মধ্যে চলমান বিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। গোত্র দুটি হলো বানু বকর ও বানু খুজা'য়া। বানু বকর কোরাইশদের ও বানু খুজা'য়া মোহাম্মদের মিত্র ছিল।

আল তাবারি জানায়, মোহাম্মদ দৃশ্যপটে আসার আগেই মালিক বিন আব্বাদ নামক বানু বকর গোত্রের এক বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে মরুপথে গমনকালে বানু খুজা'য়াদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা তাকে হত্যা করে মালামাল নিয়ে নেয়। এর প্রতিশোধ নিতে বানু বকর বানু খুজা'য়ার একজনকে হত্যা করে। এরপর মোহাম্মদ দৃশ্যপটে আসেন এবং বানু খুজা'য়া মোহাম্মদের মাওলা বা মিত্রতে পরিণত হয়। বিরোধটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণে বানু খুজা'য়া বানু বকরের নেতৃস্থানীয় তিন ভাই সালমা, কুলথুম ও ধুয়াইবকে হত্যা করে। এর প্রতিশোধে বানু বকর মুনাব্বি নামক বানু খুজা'য়ার একজনকে হত্যা করে। রাতের অন্ধকারে কয়েকজন কোরাইশও নাকি এ হত্যাকাণ্ডে বানু বকরকে সহযোগিতা করেছিল।[৫৭]

এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে, পাইপ্‌সের মতো পন্ডিতদের মতে, কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধি ভঙ্গ করেছিল; সুতরাং চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মোহাম্মদের মক্কা আক্রমণ বৈধ ছিল।

এখানে যে বিষয়টি অবজ্ঞা করা হয়েছে তা হলো, বকর-খুজা'য়া গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বিবাদটি বাঁধিয়েছিল খুজা'য়া গোত্র। খুজা'য়ারা বানু বকরকে দুইবার আক্রমণ করে চারজনকে হত্যা করে। বানু বকরও বানু খুজা'য়াকে দুইবার আক্রমণ করে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মাত্র, উস্কানিমূলকভাবে নয়। এবং বানু বকর তাদের দ্বিতীয় আক্রমণের পরও তারা বানু খুজা'য়ার মাত্র দুইজনকে হত্যা করে। অর্থাৎ মোহাম্মদের মিত্ররা অতিরিক্ত দুইজনকে হত্যা করেছিল।

আরেকটি বিষয় অবজ্ঞা করা হয়েছে যে, দু'বছর আগে মোহাম্মদের মক্কা দখলের বা কা'বায় প্রবেশের প্রচেষ্টা – যার ফলে হুদাইবিয়া চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় – তার কোনই অধিকার ছিল না। আর এক্ষেত্রে পাইপ্‌স সম্পূর্ণরূপে আরও বিস্মৃত হয়েছেন যে, মোহাম্মদ প্রথম সুযোগেই ও অনেক আগেই সন্ধির শর্ত ভেঙ্গেছিলেন, যেমন বারংবার কোরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণ, লুণ্ঠন ও বেশ কিছু কোরাইশকে হত্যা করে। আর এটা কিছুতেই বোধগম্য নয় যে, তাঁর মিত্র বানু খুজা'য়ার পক্ষে প্রতিশোধ নিতে বানু বকরকে আক্রমণ না করে মোহাম্মদ কোরাইশদের আক্রমণ করলেন কেন? মোহাম্মদ বড়-জোর বানু বকরের বিরুদ্ধে বানু খুজা'য়ার আক্রমণে সাহায্যার্থে আসতে পারতেন, কিন্তু কোনোক্রমেই বা কোনো যুক্তিতেই মক্কা দখলের চেষ্টা করতে পারেন না।

এবার মোহাম্মদের মক্কা আক্রমণের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ছিলেন নবির শ্বশুরদের মধ্যে একজন। তিনি মুসলিমদের আগমনের খবর শুনে রাতের অন্ধকারে মোহাম্মদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মক্কা আক্রমণ থেকে বিরত করার আশায়। পথিমধ্যে ভাই আল আব্বাসের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের দেখা হয়ে যায়। আল আব্বাস তাকে রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যান। সামনে ওমর আল খাত্তাব (পরে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা) তাদের রাস্তায় এসে পড়ে। আবু সুফিয়ানকে সে দেখে

৫৩. Ibn Ishaq, p. 544
৫৪. Ibid, p. 547
৫৫. Pipes (2003), p. 185
৫৬. The Taking of Makkah, Ministry of Hajj (Saudi Arabia), http:// www.hajinformation. com/main/b2109.htm
৫৭. Al-Tabari, Vol. VI, p. 160-62

হুঙ্কার দিয়ে উঠে: *"আবু সুফিয়ান, ঈশ্বরের শত্রু! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যিনি কোন চুক্তি ছাড়াই তোমাকে এখানে এনেছেন।"* অতঃপর *'আমি তার মাথা বিচ্ছিন্ন করবো'* – এই বলে ওমর তলোয়ার আনতে দৌঁড় মারে।[৫৮]

আল আব্বাস আবু সুফিয়ানকে দেওয়া রক্ষার প্রতিশ্রুতির কথা বলে ওমরকে মারাত্মক কিছু করা থেকে নিবৃত্ত করেন এবং মোহাম্মদের সমীপে তাকে হাজির করেন। মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে পরদিন সকালে তাঁর সামনে হাজির করার নির্দেশ দেন। পরদিন সকালে আবু সুফিয়ানকে মোহাম্মদের কাছে আনলে নবি তাকে বলেন: *'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা ঈশ্বর নাই, তা স্বীকার করার এটাই কি মোক্ষম সময় নয়?'* মোহাম্মদ যে একজন নবি, একথা আবু সুফিয়ান কখনই বিশ্বাস করেন নি। যখন তিনি ইতস্ততঃ করছিলেন, ক্রোধান্বিত মোহাম্মদ চিৎকার করে বলেন: *'অভিশাপ তোমাকে আবু সুফিয়ান! আমিই ঈশ্বরের প্রেরিত নবি; তা স্বীকার করার এটাই কি মোক্ষম সময় নয়?'* এ কথায় আবু সুফিয়ান উত্তর দেন: *'এ ব্যাপারে এখনও আমার কিছু সন্দেহ রয়েছে।'* আবু সুফিয়ানের জীবন সমূহ বিপন্ন দেখে আল আব্বাস এগিয়ে এসে জোরের সঙ্গে আবু সুফিয়ানকে বলেন: *'শির হারাবার আগে শীঘ্রই আনুগত্য স্বীকার করো এবং বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ও মোহাম্মদ আল্লাহর নবি।'* আবু সুফিয়ানের তা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এরপর আল আব্বাস আবু সুফিয়ানের লোকদের জন্য কিছু করার নিমিত্তে মোহাম্মদকে অনুরোধ করেন। মোহাম্মদ তখন বলেন: *"আবু সুফিয়ানের বাড়িতে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে নিজের ঘরে তালা দিয়ে থাকবে সে নিরাপদ, এবং যে মসজিদে (কা'বা) প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।"*[৫৯]

মক্কায় ফিরে আবু সুফিয়ান তাঁর জনগণের কাছে মোহাম্মদের মক্কায় প্রবেশে বাঁধা দানের অসারতা – যা নিশ্চিত পরাজয় ও ভড়াডুবি আনবে – তা ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করার উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন: *'অস্‌লিম তস্‌লিম'* – অর্থাৎ *'যদি রক্ষা পেতে চাও, তাহলে মুসলিম হয়ে যাও।'* যারা পৌত্তলিক ধর্ম ধরে রাখতে চায় তাদেরকে তিনি নিজ নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকতে অথবা তাঁর (আবু সুফিয়ানের) বাড়িতে আশ্রয় নিতে বলেন।

পরদিন সকালে মোহাম্মদের বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে। মক্কার একটি অবাধ্য দল, যারা খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সম্মুখে পড়ে, তারা সামান্য প্রতিরোধ দেখানোর চেষ্টা করে। এদের যারা খালেদের নাগালের মধ্যে আসে, তারা সবাই জীবন হারায়। যারা জীবন বাঁচাতে পাহাড়ে পালাচ্ছিল, খালেদ তাদের পিছু ধাওয়া করেন।

মক্কা করায়ত্ত করার পর মোহাম্মদ কা'বা ঘরে রক্ষিত সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করার আদেশ দিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন – *'(এখন) সত্য এসেছে, মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে: কারণ মিথ্যা (স্বভাবতঃই) নির্মূল হতে বাধ্য'*[৬০] – যা আল্লাহ পরবর্তিতে একটা আয়াত হিসেবে কোরানে সন্নিবেশিত করেছেন (কোরান ১৭:৮১)। মোহাম্মদ কা'বার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শত শত বছর ধরে গভীর ভক্তি ভরে কোরাইশরা যে মূর্তিগুলোকে পূজা করে এসেছে, সেগুলোকে ছড়ি উঁচিয়ে এক এক করে ধ্বংসের ইঙ্গিত দেন, আর সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কোরাইশদের দেবতা 'কাঠের ঘুঘু'টিকে মোহাম্মদ নিজে ধ্বংস করেন।

মক্কা দখল ও কা'বা লুণ্ঠনের পর মোহাম্মদ মক্কা থেকে দুই দিনের পথ নখলার আল-উজ্জা মন্দিরের মূর্তিগুলো ধ্বংসের জন্য খালেদ বিন ওয়ালিদকে পাঠান।[৬১] আম'র নামে মোহাম্মদের এক শিষ্য হুদেইল গোত্রের পূজিত 'সুওয়ার' মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলে। মদীনার একদল মুসলিম কোদেইদ-দের পূজিত বিখ্যাত দেবী আল-মানাতের মন্দিরটি ধ্বংস করে। এ মুসলিমরা দেবী আল-মানাতের ভক্ত ছিল ইসলাম গ্রহণের আগে।[৬২] মোহাম্মদের মক্কা দখলের দিন অনেক পৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

এবার মক্কা বিজয়ের ঘটনায় কোরাইশদের সাথে মোহাম্মদের আচরণ সম্পর্কে মুসলিমদের কিছু জনপ্রিয় দাবির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা যাক।

মক্কাবাসীদের প্রতি মোহাম্মদের অভাবিত ক্ষমা প্রদর্শন

মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে মুসলিমরা মোহাম্মদ বা ইসলামের অমায়িকতা, শান্তিপ্রিয়তা ও ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি দাবি করে থাকেন:

১. মুসলিমবাহিনী বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করেছিল, যা কোরাইশরা স্বাগত জানিয়েছিল।
২. কোন রকম বল প্রয়োগ ছাড়াই কোরাইশরা স্বেচ্ছায় বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল।
৩. কোরাইশদেরকে হত্যা না করে মোহাম্মদ তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের এক অনন্য নজির স্থাপন করেন।

শান্তিপূর্ণভাবে মোহাম্মদের মক্কায় প্রবেশ: দশ বছর মেয়াদী হুদাইবিয়া সন্ধি দুই বছর পরই ছুঁড়ে ফেলে মোহাম্মদের মক্কা আক্রমণ সত্ত্বেও মুসলিমদের কাছে মোহাম্মদের মক্কা বিজয় একটা শান্তিপূর্ণ ঘটনা। ঐ দুই বছর সময়কালেও মোহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যরা বারংবার চুক্তির শর্ত সাংঘাতিকভাবে লংঘন করেছিল।

মক্কায় মোহাম্মদের বিনা বাধায় প্রবেশের দাবির ব্যাপারে এটা বুঝতে কষ্ট হবে না যে, তাঁকে প্রবেশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কী ভয়াবহ ঘটনা ঘটত। মক্কা আক্রমণের আগে আবু সুফিয়ানের কাছে মোহাম্মদের দাবি কী ছিল? দাবিটি ছিল: *ইসলাম গ্রহণ কর, নইলে তোমার শির মাটিতে গড়াগড়ি যাবে* – এটা নয় কি? মক্কার একটা দল বোকামি করে যখন খালেদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, তখন তাদের পরিণতি কী হয়েছিল: খালেদের বাহিনীর তরবারির খাদ্য নয় কি?

---

[৫৮]. Ibn Ishaq, p. 547
[৫৯]. Ibid, p. 547-48
[৬০]. Ibid, p. 552
[৬১]. Ibid, p. 565
[৬২]. Muir, p. 412

সুতরাং মুসলিমরা শান্তিকামী ও ভালোবাসার যোগ্য হওয়ার কারণে কোরাইশরা তাদেরকে মক্কায় ঢুকতে দেয় নি; বরং মুসলিমরা কোরাইশদের তুলনায় অনেক শক্তিশালী ও মরিয়া হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা তাদেরকে বাঁধা দিতে সাহস পায় নি। মদীনার দুর্ভাগা ইহুদি গোত্রগুলোর পরিণতির কথা মক্কাবাসীর মাথায় তখনও জাগ্রত ছিল। মদীনার বানু কুরাইজা ইহুদি গোত্রকে মোহাম্মদ কী ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেছিলেন – সে কথা মোহাম্মদের মক্কায় প্রবেশের সময় নিশ্চয়ই মক্কাবাসীর স্মরণে ছিল।

মক্কাবাসীর স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ

বলা হয় মোহাম্মদের মক্কা দখলের দিন বিপুল সংখ্যক মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল – জুলুম বা মৃত্যুর ভয়ে নয়, ইসলামের শান্তির বাণীতে মুগ্ধ হয়ে। যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠেঃ দু'বছর আগে মোহাম্মদ যখন মক্কায় অভিযান চালায়, তখন কেন তারা ইসলাম গ্রহণ করল না? কেন তারা মোহাম্মদকে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য মরণপণ প্রতিরোধের শপথ করেছিল, যা তাঁকে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সাক্ষরে বাধ্য করে?

তদুপরি, ঐ দুই বছরে মোহাম্মদ কোরাইশদের সাথে এমন কোনো সহৃদয়পূর্ণ আচরণ করেন নি, যার কারণে কোরাইশরা তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে ও বিপুল সংখ্যায় ইসলামে যোগ দিতে পারেন। বরঞ্চ সুযোগ আসতেই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মোহাম্মদের শিষ্যরা একের পর এক কোরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা আক্রমণ করে সেগুলো লুণ্ঠন ও কাফেলার লোকদের হত্যার মাধ্যমে কোরাইশদের উপর চরম ভোগান্তি আনয়ন করে। পরন্তু তিনি দশ বছর মেয়াদি সন্ধিটি আট বছর আগেই ছুঁড়ে ফেলে মক্কা আক্রমণ করেন। কোনো উস্কানি ছাড়াই মোহাম্মদ ঐ দু'বছর কালে বিভিন্ন অমুসলিম গোত্র – যেমন খাইবার, বানু সোলেইম, বানু লেইথ, বানু মুরা, ধাত আত্লাহ্, মুতাহ ও বানু নাদজ-সহ আরও কিছু গোত্রের উপর সহিংস হামলা চালিয়েছিলেন।[৬৩] আবু সুফিয়ানকে সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতে হয়েছিল মোহাম্মদের তলোয়ারের ডগা থেকে তার মস্তক বাঁচাতে নয় কি? পরিশেষে, মক্কাবাসীর কাছে আবু সুফিয়ানের বার্তা ছিলঃ *'অসলিম তসলিম' – অর্থাৎ যদি রক্ষা পেতে চাও তবে মুসলিম হও*। নিজেদের রক্ষার জন্য তাদের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা ছিলঃ প্রথমত, ইসলাম গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত, মসজিদ (কা'বা) অথবা আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করা। এ উদাহরণগুলো স্পষ্ট করে তুলে যে, ইসলামের শান্তিপূর্ণতা বা মোহাম্মদের শান্তিকামী ও সহৃদয় মনোভাব ও আচরণ সেদিন কোরাইশদেরকে বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেনি।

মোহাম্মদের অতুলণীয় ক্ষমা প্রদর্শনঃ মক্কা জয়ের দিন আত্মসমর্পণকারী মক্কাবাসীদের গণহারে মেরে না ফেলে ক্ষমা করে দেওয়াকে মুসলিমরা মোহাম্মদের অসাধারণ বদান্যতা ও ক্ষমাশীলতা রূপে চিত্রিত করে। মুসলিমরা এটাকে নবির শত্রুর প্রতি নজিরহীন দয়ার নমুনা হিসেবে তুলে ধরে। মুসলিমরা বলতে চায় যে, ইতিহাসে কোনো নেতা তাঁর প্রবল শত্রুর প্রতি এমন ক্ষমা ও ধৈর্য কখনোই প্রদর্শন করে নি। *কিন্তু মোহাম্মদ বা যে কোন ন্যূনতম বিবেকবান ব্যক্তি কি মক্কাবাসীদের গণহারে খুন করতে পারে, যখন তারা মক্কা দখলে বাঁধা না দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে এবং তাদের নেতা (আবু সুফিয়ান) ইতিমধ্যে মোহাম্মদের ধর্ম ও নবিত্ব মেনে নিয়েছিল?* তদুপরি মুসলিমদের মক্কায় অগ্রসরে বাঁধা না দিলে তাদেরকে আঘাত করবে না বলে মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

এটা সুস্পষ্ট যে, প্রাথমিকভাবে যখন মোহাম্মদ দীর্ঘ তের বছর মক্কায় তাঁর ধর্ম প্রচার করেন, তখন কোরাইশরা কখনোই তাঁর প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখায় নি। মোহাম্মদ কর্তৃক মক্কাবাসীদের শত শত বছরের আচরিত ধর্ম ও প্রথার বিরোধিতা ও অবমাননা সত্ত্বেও তারা তাঁর সঙ্গে আচরণে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করেনি। বরং মোহাম্মদই মক্কার কোরাইশদের বহু বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণের সূত্রে তাদের সাথে অনেক রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মোহাম্মদ একের পর এক মক্কার বাণিজ্য কাফেলা হামলা ও লুণ্ঠন করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিধ্বস্ত করায় কোরাইশরা ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির ও অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়। সর্বোপরি কোরাইশরা ছিল মোহাম্মদসহ মক্কা থেকে মদীনায় গমনকারী মুসলিমদের পিতামাতা, ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজন। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম মানুষটিও কি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের – যারা ইতিমধ্যেই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অন্যায়ভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছে – তাদের উপর তরবারি চালাতে পারবে?

মুসলিমদের চিন্তা-চেতনায়, এমন কি আজকের মুসলিমদেরও ধারণা যে, মোহাম্মদ কোরাইশদের প্রতি কখনোই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন নি। সব মুসলিমের কাছে মোহাম্মদের প্রতি কোরাইশদের স্পষ্ট প্রতীয়মান সভ্য ও ধৈর্যশীল আচরণ এমন ক্ষমাহীন অপরাধ ছিল যে, মক্কা দখলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবাইকে হত্যা করে নির্মূল করা উচিত ছিল।

পরন্তু সেদিন মোহাম্মদের মক্কা দখল আদৌ রক্তপাতহীন ছিল না। খালেদ বিন ওয়ালিদ তাদেরকে কচুকাটা করেছিল, যারা তাকে প্রতিরোধ করার সাহস দেখিয়েছিল। তদুপরি মোহাম্মদ মক্কার দশ বা বার জন নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, কারণ তারা এর আগে ইসলাম ত্যাগ করেছিল অথবা তাঁর ধর্মের সমালোচনা বা উপহাস করেছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের কয়েকজন মক্কার প্রভাবশালী পরিবারের লোক হওয়ায়, তাদের পরিবার-পরিজনের অনুরোধে ক্ষমা পেয়ে যায়। পরিশেষে মাত্র চারজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এদের মধ্যে দুইজন ছিল গায়িকা, যারা মোহাম্মদকে উপহাস করে গান রচনা করেছিল।[৬৪] মোহাম্মদের কারণে অবর্ণনীয় যাতনা, অপমান, দুর্ভোগ, রক্তক্ষয় ও অভাব-অনটন ভোগ সত্ত্বেও কোরাইশরা মোহাম্মদের প্রতি যথেষ্ট মানবিক আচরণ প্রদর্শন করেছিল; কাজেই কোন বিবেকবান বিচারেই মক্কার কোন ব্যক্তিই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পাওয়ার মত অপরাধ করে নি, বিশেষতঃ যখন তারা তাদের মাতৃভূমিকে বিনাশর্তে মোহাম্মদের হাতে তুলে দিয়েছিল।

তদুপরি সেদিন মক্কা করায়ত্ত করার পরও মোহাম্মদ বর্বর নিষ্ঠুরতা অব্যাহত রাখে। কা'বা ধ্বংস করার পর নবি খালেদ বিন ওয়ালিদকে প্রতিবেশী গোত্রগুলোর আনুগত্য আদায়ের জন্য পাঠান। খালেদ জাজিমা (জাধিমা) গোত্রের কাছে পৌঁছে তাদেরকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বলে। ইবনে ইসহাক লিখেছেনঃ *তারা অস্ত্র সমর্পণ করার সাথেসাথেই খালিদ তাদের হাত পিছনে বেঁধে তাদেরকে হত্যা করা শুরু করে।*[৬৫] গোত্রটি

৬৩. Ibid, p. 392-93

৬৪. Ibid, p. 410-11; Walker, p. 319

৬৫. Ibn Ishaq, p. 561

ইতিমধ্যেই মোহাম্মদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। সে ভিত্তিতে খালেদের সহগামী মদীনার ও মক্কার কিছু শিষ্য গোত্রটির বাকি লোকদের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, জাজিমা গোত্র কখনোই মোহাম্মদ বা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য কোন সমস্যা ঘটায়নি। তথাপি তাদের উপর এরূপ নিষ্ঠুরতাকে 'চরম বর্বরতা' ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

মক্কা দখল করার পর যেরূপ নির্দয়ভাবে তিনি কোরাইশদের দেবমূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেন ও সমালোচকদের মৃত্যুদণ্ড দেন, খালিদ যেভাবে মক্কার লোকগুলোকে হত্যা করে নিজস্ব মাতৃভূমি রক্ষার্থে সামান্য বাঁধা দেওয়ায় এবং জাজিমা গোত্রের লোকদেরকে খালেদ যেরূপ নির্মমভাবে হত্যা করে – এ ঘটনাগুলো মোহাম্মদের মক্কা দখলের দিনটিকে চরম নির্যাতনের দিন হিসেবে চিহ্নিত করে; কোনক্রমেই দয়া, ক্ষমা ও বদান্যতার দিন হিসেবে নয়।

ইসলামের নবি ভয় দেখিয়ে বা সহিংসতা ও আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে আরব অঞ্চলের অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রের উপর বিজয় বা আনুগত্য অর্জন করেন। আলোচনা সংক্ষেপ রাখার জন্য সে ঘটনাগুলো এ বইয়ে সংযোজিত করা হবে না। তবে ইসলাম ধর্মমতে, কোরাইশদের সাথে মুখোমুখিতায় নবির যে প্রতিক্রিয়া ও আচরণ ছিল, তা পৌত্তলিকদের প্রতি মুসলিমদের আচরণের একটা আদর্শ নকশা হিসেবে বিবেচিত, এবং আদর্শগতভাবে মুসলিমদের পক্ষ থেকে সেটা সর্বকালে বিশ্বের সকল প্রতিমা-পূজকদের উপর প্রয়োগযোগ্য।

ইহুদিদের সঙ্গে মোহাম্মদের আচরণ

মোহাম্মদের মিশনের উপর ইহুদি প্রভাব

ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের দ্বারা যুবক মোহাম্মদ যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। সম্ভবত এ দু'টো ধর্মের প্রভাব মক্কার বহুঈশ্বরবাদী জনগণের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ববাদ প্রচারের লক্ষ্যে তাঁকে নিজস্ব নবুয়তির মিশন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মোহাম্মদ যখন মাত্র ১২ বছরের তরুণ, তখন চাচা আবু তালিবের সঙ্গে তিনি ব্যবসার উদ্যোগে সিরিয়া যেতেন (প্যালেস্টাইনের পাশ দিয়ে), যা তাঁকে ইহুদিদের ধর্ম বিশ্বাস এবং প্রথা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে ধারণা অর্জনে সহায়তা করে।[৬৬] মক্কাতেও আবদাইস বিন সালোম নামের জনৈক জ্ঞানী ইহুদি রাব্বী'র সাথে তাঁর বন্ধুস্বরূপ সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে যে, উক্ত ইহুদি রাব্বি মোহাম্মদকে ইহুদি ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনাতেন ও ইহুদি রীতিনীতি ব্যাখ্যা করতেন। ইবনে ইসহাক লিখিত মোহাম্মদের জীবনীতে দেখা যায় যে, তিনি মাঝে মাঝেই *বেথ হা-মিদ্রাস*'এ যেতেন। বেথ হা মিদ্রাস ছিল মক্কায় বাইবেল শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান। মুসলিম আলোচক আল বাদাউল বর্ণনা করেছেন যে, এক ইহুদি তাউরাতে বর্ণিত প্রাচীন ইতিহাস মোহাম্মদের কাছে বর্ণনা করতেন। এমনকি মোহাম্মদ ইহুদি ধর্ম-মন্দির 'সিনাগগ'-এও যেতেন বলে জানা যায়। এ রাব্বী পরে ইসলাম গ্রহণ ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নাম নেয় বলে জানা যায়। ধারণা করা হয় তিনিই কোরান-এর ৪৬:১ নং আয়াতে বর্ণিত সাক্ষী, যাতে তিনি কোরান ও ইহুদি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সঙ্গতির সত্যতা জ্ঞাপন করেন। এ আয়াতটিতে ইহুদিদেরকে মোহাম্মদের নতুন ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে।[৬৭]

৬২২ সালে মোহাম্মদ যখন মদীনায় গমন করেন তখন সেখানে কয়েকটি ইহুদি ও বহুঈশ্বরবাদী গোত্র বসবাস করতো। বহুঈশ্বরবাদীদের তুলনায় ইহুদিরা ছিল অধিকতর ধনী ও প্রভাবশালী। এ সত্যতা প্রকাশ করে বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত আবুল আলা মওদুদী (মৃত্যু ১৯৭৯) লিখেছেন: '*অর্থনৈতিকভাবে ইহুদিরা আরবদের চেয়ে অনেক প্রভাবশালী ছিল। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের মতো অধিকতর সভ্য ও সাংস্কৃতিকভাবে অনেকটা অগ্রসর দেশ থেকে স্থানান্তরিত হওয়ায় অনেক কলাকৌশল তাদের আয়ত্তে ছিল, যা আরবদের ছিল না। তারা বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কও গড়ে তুলেছিল।*'[৬৮] ইহুদিরা মোহাম্মদের মদীনায় স্থানান্তরে বিরোধিতা করে নি সম্ভবত দুটো কারণে: প্রথমত, মোহাম্মদ পৌত্তলিকতা উৎপাটনের নিমিত্তে বহুঈশ্বরবাদীদের মধ্যে একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস প্রচার করছিলেন, যা ইহুদিরাও কামনা করত; দ্বিতীয়ত, এ সময়ে ইহুদি ধর্মের প্রতি মোহাম্মদ বা তাঁর ধর্ম বন্ধুভাবাপন্ন বা অনুকূল ছিল। এ পর্যন্ত কোরানে রচিত আয়াতে ইহুদি ও তাদের ধর্মগ্রন্থকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। মদীনায় অবস্থানের শুরুর দিকে মোহাম্মদ ইহুদি ও তাদের ধর্মগ্রন্থের প্রচুর প্রশংসা করতে থাকেন। এ পর্যায়ে তিনি তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখেন ও অনেক ইহুদি প্রথা – যেমন রোজা রাখা, ছুন্নত দেওয়া (মুসলমানি), নামাজ বা মোনাজাত করার সময় ইহুদিদের পবিত্র শহর জেরুজালেমের দিকে মুখ রাখা ইত্যাদি – গ্রহণ করেন (নীচে দেখুন)।

ইহুদিদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য মোহাম্মদের আহ্বান

মদীনায় মোহাম্মদের ধর্ম প্রচারে বহুঈশ্বরবাদীরা অধিক সংখ্যায় তাঁর ইসলামে যোগ দেয়। কিন্তু সম্পদশালী ইহুদিদেরকে তিনি ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন তেমন সুবিধা করে উঠতে ব্যর্থ হন। ফলে ইসলামের প্রতি নিরাবেগ ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ ঐশীবাণী প্রেরণ শুরু করেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ এ সময় ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাউরাতে বর্ণিত 'জেনেসিস' বা 'সৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত নাজেল করেন (কোরান ২:৩০-৩৮)। এছাড়াও আলাহ তাউরাতে উক্ত মুসা ও 'বনি ইসরাইলের সন্তান'-দের (অর্থাৎ ইহুদিদের) নিয়েও আয়াত নাজেল করেন (কোরান ২:২৪০-৬১)। অতঃপর আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের (একেশ্বরবাদী সাবিয়ানদেরকেও) তাঁর (আল্লাহর) কৃপা লাভের জন্য নিজেদের ধর্মগ্রন্থ অনুসরণের পাশাপাশি কোরানকে বিশ্বাস করায় উদ্বুদ্ধ করতে আয়াত পাঠান। আল্লাহ বলেন: '*যারা কোরান বিশ্বাস করবে, এবং যারা ইহুদি ধর্মগ্রন্থ, খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ ও সাবিয়ান ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করবে, আল্লাহ তা*

---

৬৬. Ibn Ishaq, p. 79-81; Muir, p. 21

৬৭. Walker, p. 180-81

৬৮. Maududi AA (1993) *Historical Background to Surah Al-Hashr,* In *Towards Understanding the Quran*, (Trs. Ansari ZI), Markazi Maktaba Islamic Publishers, New Delhi.

রোজ কেয়ামত বিশ্বাস করবে এবং যা সঠিক তা করবে, প্রভুর কাছ থেকে তারা তাঁর পুরস্কার পাবে। তাদের কোন ভয় নেই বা তাদেরকে দুঃখিত হতে হবে না' (কোরান ২:৬২, আরও দেখুন ২২:১৭)।

মোহাম্মদকেও তাদের নবি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ ইহুদিদেরকে (খ্রিষ্টানদেরকেও) অনেকবার সরাসরি অনুরোধ করেছেনঃ '*হে ধর্মগ্রন্থের অনুসারীরা (ইহুদি ও খ্রিষ্টান)! এতদুদ্দেশ্যে বার্তাবাহক আসা বিরতির পর নিশ্চয়ই আমাদের (আল্লাহর) বার্তাবাহক (মোহাম্মদ) তোমাদের কাছে এসে (ধর্মের) ব্যাখ্যা প্রদান করছে, যাতে তোমরা বলতে না পারো সুসংবাদদাতা বা সতর্ককারী আমাদের কাছে আসেনি কেন। সুতরাং সত্যি সত্যি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী তোমাদের কাছে এসেছে। এবং আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান*' (কোরান ৫:১৯)। কিন্তু ইহুদিদেরকে মোহাম্মদের ধর্মে আনয়নে আল্লাহর সকল প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।

ইসলামে ইহুদি মতবাদের শুভ আলোকপাত

মোহাম্মদের উপর ইহুদি মতবাদের প্রভাব বাস্তবে কোরানের উপরও প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কোরানে ইহুদি ধর্মকে কোরাইশদের পৌত্তলিকতার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। আদিপিতা আব্রাহাম, তাঁর পুত্র ইসমাইল, মুসা নবি, রাজা ডেভিড (দাউদ) এবং সলোমন (সোলাইমান) – ইহুদি ধর্মতত্ত্বের এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকেই ইসলামের নবিদের মধ্যে মর্যাদাশীল অবস্থান পেয়েছেন। এমনকি মোহাম্মদ মুসা নবিকে নিজের চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন (বুখারী ৪:৬২০: '*মুসার উপরে আমাকে মর্যাদা দিওনা*')।

মোহাম্মদের নবুয়তি কার্যক্রমের প্রথম দিকে রচিত কোরানের ঐশীবাণী ও তাঁর ব্যক্তিগত চালচলন ইহুদি ধর্মের প্রতি বেশ শুভ পরায়ণ ছিল। জানা যায় যে তিনি নাকি বলেছিলেনঃ '*একজন ইহুদি বা খ্রিষ্টানের প্রতি যে অন্যায় করে, শেষ বিচারের দিন সে আমাকে ফরিয়াদি রূপে দেখতে পাবে।*' তাঁর প্রাথমিক চালচলন দেখে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধুমাত্র পৌত্তলিক আরবদের মাঝে একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন, যা হবে বিদ্যমান একেশ্বরবাদী ইহুদি ও খ্রিষ্ট ধর্মের একটা অংশবিশেষ। কাজেই কোরানের প্রথম দিককার আয়াতগুলো ইহুদিদের মর্যাদা ও শ্রদ্ধাশীল রূপে চিহ্নিত করেছে: '*এবং নিশ্চয়ই আমরা বনি ইসরাইলের সন্তানদেরকে (ইহুদিদেরকে) ধর্মগ্রন্থ (তাউরাত) এবং জ্ঞান ও দৈববাণী প্রদান করেছি, তাদেরকে যা কিছু ভাল তা দিয়েছি এবং তাদেরকে সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি*' (কোরান ৪৫:১৬)। ইহুদি ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে কোরান বলেঃ এতে '*ঈশ্বরের পথ-নির্দেশ ও (জ্ঞানের) আলো রয়েছে*' (কোরান ৫:৪৪) এবং '*এটা ঈশ্বরের আশির্বাদ ও সঠিকপন্থিদের পথ নির্দেশক*' (কোরান ৬:১৫৩-৫৪)। কোরান ফিলিস্তিন (জেরুজালেম)-কে বহুস্থানে 'পবিত্র ভূমি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শুরুতে মোহাম্মদ জেরুজালেমকে তাঁর নতুন ধর্মের কেন্দ্ররূপে দেখেন। জেরুজালেম থেকেই তিনি বেহেশ্তে উত্থিত (মিরাজ) হয়েছিলেন। মদীনায় স্থানান্তরের পর মোহাম্মদ জেরুজালেমকেই মুসলিমদের নামাজ বা প্রার্থনার কিবলা বানিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ ইহুদিদের দাতব্য প্রথা 'যাকাত' নকল করেন এবং একে একটা আরামাইক বা সিরীয় (ইহুদিদের পবিত্র ভাষা) নাম দেন; যাকাতকে তিনি ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটির মর্যাদা দেন। ইহুদিদের প্রথার অনুসরণে তিনি শুকরের মাংস খাওয়া হারাম করেন, প্রবর্তন করেন আনুষ্ঠানিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা (ওজু) এবং তাদের 'সাবাথ' পালনের অনুকরণে শনিবারকে (পরে শুক্রবার-এ পরিবর্তিত) বানান 'সাপ্তাহিক নামাজ'-এর দিন। ইহুদি প্রথা ও চর্চার অনুসরণে মোহাম্মদ 'আশুরা'-র উপবাস বা রোজা চালু করেন, যাকে পরে তিনি রমজান মাসের রোজার প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। রোজাও ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। ইহুদি প্রথার অনুসরণে তিনি মুসলিমদের জন্যও চালু করেন লিঙ্গ মুন্তন বা লিঙ্গের মাথার চামড়া কাটার নিয়ম, যাকে 'সুন্নত দেওয়া' বা 'মুসলমানী' বলা হয় (আবু দাউদ ৪১:৫২৫)।[৬৯] শুরুতে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধির জন্য ইহুদিদের ব্যবহৃত 'নবি' শব্দটি ব্যবহার করে নিজেকে নবি বলে আখ্যায়িত করেন।

ইহুদিদের প্রতি মোহাম্মদের তিক্ততা

ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহ ও মোহাম্মদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। কোরানে ইহুদি ধর্মগ্রন্থ ও রীতিনীতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তা বহুক্ষেত্রে বেঠিক ও বিকৃত ছিল। যেমন কোরান ৭:১৫৭ নং আয়াতে দাবি করে যে, মোহাম্মদ ছিলেন ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের বংশধর, এবং তিনিই সে মেসিয়াহ্, যার আগমন পূর্বঘোষিত হয়েছে তাউরাতে। এ নতুন দাবিটি কোরানের পূর্বরচিত আয়াতে ঘোষিত দাবির বিরোধী, কেননা পূর্ববর্তি আয়াত সুস্পষ্টরূপে বলেছে যে, কেবলমাত্র বনি ইসরাইলের সন্তানদের উপর (কোরান ৪৫:১৬), এবং বিশেষভাবে ইসহাক ও ইয়াকুব-এর বংশধরদের উপর, নবুয়তি প্রদান করা হবে (কোরান ২৯:২৭)। মোহাম্মদ ছিলেন একজন আরব, ইসরাইলি নয়; নবি ইসমাইলের সাথে যুক্ত তাঁর পারিবারিক বংশধারা নবি ইসহাক ও ইয়াকুব-এর বংশধারা থেকে ভিন্ন। কোরানের এ ভাষ্য ও সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতার কথা উল্লেখ করে ইহুদি রাব্বী'রা খুব সহজেই তাঁর নবুয়তির দাবি খণ্ডন করেন।

ইব্রাহিম ----> ইসহাক ----> ইয়াকুব ----> (নবিত্ব অর্পণের বংশধারা)
ইব্রাহিম ----> ইসমাইল ----> মোহাম্মদ (নবিত্ব বহির্ভূত বংশধারা)

অধিকন্তু, ইসমাইল ছিলেন ইব্রাহিমের এক অবৈধ সন্তান। ইসমাইলের জন্ম হয়েছিল হাজেরা নাম্মী এক উপপত্নী বা দাসীর গর্ভে; আর হাজেরা ছিল একজন মিশরীয়, ইহুদিদের মত 'সেমিটিক' জাতির নয়। সুতরাং ইসমাইল ছিলেন ঈশ্বর ও আব্রাহামের মধ্যেকার চুক্তিবহির্ভূত। বাইবেলও তাঁকে 'অমার্জিত ও হিংস্র' হিসেবে বর্ণনা করেছে (জেনেসিস ১৬:১২)।

সুতরাং পূর্বরচিত কোরানের আয়াত ও ইহুদিবাদ উভয়ই ইসমাইলের বংশধরদের, যেমন মোহাম্মদের, উপর ইহুদিদের ঈশ্বরের নবিত্ব অর্পনের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। পরন্তু কোরান হিব্রু বা সিরীয় ভাষার মতো পবিত্র ভাষায় নাজিল হয় নি। কোরান নাজিল হয় আরবিতে, যা

[৬৯]. References of hadiths (or Sunnah) from the authentic sources, namely Sahih Bukhari, Sahih Muslim and Sunan Abu Dawud, have been included in the parentheses within the text.

ইহুদিদের দৃষ্টিতে ছিল কবি ও মদখোরদের ভাষা। তদুপরি ইহুদিরা কোরানে বর্ণিত তাউরাতের ঘটনাবলি সম্পর্কে অনেক ভুল বের করে নবিকে ইহুদি ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অভিহিত করে, যদিও তাঁর প্রত্যাদেশ দাবি করেছিল যে মোহাম্মদের নবিরূপে আগমন ঘটেছিল তাউরাতের সত্যতা প্রমাণ করতে এবং কোরান ছিল তাউরাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন মোহাম্মদ ও কোরান দোষারোপ করে যে, ইহুদিরা 'এজরা' বা 'ওজায়ের'-কে ঈশ্বরের পুত্র বলে (কোরান ৯:৩০); কিন্তু ইহুদিরা কখনোই এমন দাবি করে নি, যা তারা সহজেই খণ্ডন করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইহুদিরা মোহাম্মদের তথাকথিত দৈববাণীকে বিকৃত, ভ্রমাত্মক ও কোন কোন ক্ষেত্রে অবুদ্ধিমত্তাসুলভ আখ্যায়িত করে তাঁর নবুয়তির দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইহুদিদের সঙ্গে মোহাম্মদের এ তিক্ততাপূর্ণ যুক্তিতর্ক ও মতবিরোধ বিরূপ আকার ধারণ করে ৬২৩ সালের অক্টোবর মাসের দিকে – অর্থাৎ মোহাম্মদের মদীনা আগমনের এক বছর পর ও বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে। ইহুদিদের (এবং খ্রিষ্টানদেরও) ইসলামে প্রলুব্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে ক্রুদ্ধ আল্লাহ তাদেরকে ইসলামে আনয়নের প্রচেষ্টার সমাপ্তি টানেন এ প্রত্যাদেশ পাঠিয়েঃ '*তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না। বলুন: আল্লাহর পথ নির্দেশই সত্য। এ সত্যজ্ঞান তোমাদের কাছে আসার পর যদি তোমরা তাদের ইচ্ছাকে অনুসরণ করো, তাহলে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে কোন অভিভাবকত্ব বা সহায়তা পাবে না*' (কোরান ২:১২০)।

এরপর থেকে ইহুদিদের প্রতি আল্লাহর সুর ও মোহাম্মদের মনোভাব বদলাতে শুরু করে। ইহুদিদের ধর্মগুরু বা আদিপিতা ইব্রাহিম (আব্রাহাম) এখন হয়ে গেলেন 'মুসলিম' ও মোহাম্মদের নবিত্বের অগ্রদূতঃ '*আব্রাহাম না ছিলেন ইহুদি, না ছিলেন খ্রিষ্টান; কিন্তু তিনি ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন সঠিক ও তাঁর ইচ্ছা সমর্পিত ছিল আল্লাহর সমীপে (অর্থাৎ ইসলামে)*' (কোরান ৩:৬৭)। নবুয়তির বংশতালিকা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দূর করতে ও মোহাম্মদের নবিত্বের দাবিকে বৈধতা দিতে আল্লাহ অনেকগুলো আয়াত নাজিল করে ইব্রাহিম-ইসমাইলের বংশ পরম্পরার সম্পূর্ণ নতুন বংশলতিকা তৈরি করেন। বনি ইসরাইলের সন্তানদের উপর থেকে ধর্মীয় ও নবিত্বের চুক্তি সরিয়ে এনে তা আরব-বংশীয় মোহাম্মদের উপর ন্যস্ত করার জন্য আল্লাহ এখন নতুন একটি চুক্তি সৃষ্টি করলেন আব্রাহাম ও ইসমাইলের সঙ্গে – যাঁরা মক্কায় আলাহর পবিত্র ঘর কা'বা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে দাবি করে। মোহাম্মদের নবুয়তির কার্যক্রম যেহেতু আরব-কেন্দ্রিক ছিল, ইসরাইল-কেন্দ্রিক নয় – এ বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আল্লাহ এখন দাবী করেন যে, তিনি আসলে কা'বাকে কেন্দ্র করে তাঁর ধর্মের জন্য আশির্বাদ প্রদান করেছিলেন (কোরান ২:১২৬-৩০)। এক গুচ্ছ নতুন আয়াতের মাধ্যমে (৩:৬৭, ২:১২৬-৩০) আল্লাহ ইব্রাহিমপন্থি ধর্মের একটা সম্পূর্ণ নতুন ধারা সৃষ্টি করেন, যা হবে মক্কা-কেন্দ্রিক, ইসরাইল-কেন্দ্রিক নয়; এবং নবিত্বের সন্ধি ইব্রাহিম-ইসমাইল বংশলতিকা অনুসরণ করবে, ইসাহাক বা ইয়াকুবের বংশলতিকা নয়। অর্থাৎ ইসলাম হলো সেই আদি ধর্ম, যা আল্লাহ আব্রাহাম-ইসমাইল'এর বংশধারা কর্তৃক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং আরব নবি মোহাম্মদ আসেন আল্লাহর ইচ্ছাকৃত সে প্রকৃত ধর্মকে সঠিকরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।

ইহুদি ধর্মগ্রন্থ তাউরাতকে পূর্বে আল্লাহ তাঁর 'স্বর্গীয় পুস্তক' বা 'আসমানি কেতাব' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যাতে ছিল তাঁর 'পথনির্দেশনা ও জ্ঞানালোক' (কোরান ৫:৪৪) এবং সত্যানুসারীদের জন্য আল্লাহর আশির্বাদ ও পথনির্দেশনা (কোরান ৬:১৫৩-৫৪)। সে তাউরাত এখন হয়ে গেল ইহুদিদের দ্বারা বিকৃত (কোরান ২:৭০)। এর আগে ইহুদিরা ছিল আল্লাহর সবচেয়ে 'অধিকার বা সুবিধাপ্রাপ্ত' মানুষ (কোরান ৪৫:১৫); এখন তারা হয়ে গেল 'বিশ্বাসীদের (মুসলিম) প্রতি সর্বাধিক শত্রুতা প্রদর্শনকারীতে' (কোরান ৫:৮২)। মোহাম্মদ নিজেকে এখন 'নবি'র পরিবর্তে 'রসুল' (বার্তাবাহক) আখ্যায়িত করতে শুরু করেন। তাঁর ধর্মের একটা নতুন কেন্দ্র উদ্ভাবনের পর আল্লাহ এখন প্রত্যাদেশ পাঠালেন নামাজের দিক জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে পরিবর্তন করতে (কোরান ২:১৪৪)। মোহাম্মদ 'সাবাথ' বা 'সাপ্তাহিক নামাজের দিন' শনিবার থেকে শুক্রবার (জুম্মা)-এ পরিবর্তিত করেন, এবং ইহুদিদের আশুরা'র উপবাস পরিবর্তন করে মক্কার 'হানিফ' সম্প্রদায়ের প্রথা অনুযায়ী মাসব্যাপী রমজানের রোজার রীতি চালু করেন। এ ছাড়াও মোহাম্মদ অন্যান্য ইহুদি প্রথা ও চর্চা, যা তিনি মদীনায় পৌঁছানোর পর গ্রহণ করেছিলেন, তা পরিবর্তন বা পরিমার্জিত করেন। এবার ইহুদিরা তাঁকে বাঁচাল বা অদৃঢ় মনের মানুষ হিসেবে অভিযুক্ত করে; নামাজের সময় পৌত্তলিকদের অন্ধভক্তির কেন্দ্রবিন্দু কা'বা মন্দিরে রক্ষিত 'কালোপাথর'-এর দিকে মুখ ফেরানোর উপহাসে মোহাম্মদকে উপহাসিত করে।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের সহিংসতা

মদীনায় মোহাম্মদের প্রত্যাদেশ সম্পর্কে ইহুদিদের ক্ষুরধার সমালোচনা – যার কোনো জবাব ছিল না তাঁর কাছে – তা তাঁর ধর্মপ্রচারকে উত্তরোত্তর অস্বস্তিকর করে তোলে, সম্ভবত হুমকি হয়েও দাঁড়ায়। ৬২৪ সালের গোড়ার দিকে কোরাইশদের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে বিজিত এবং বাণিজ্য-কাফেলার উপর ধারাবাহিক হামলা ও লুণ্ঠনের বিপুল মালামালে বলীয়ান মোহাম্মদ এখন অবাধ্য ও সমস্যা সৃষ্টিকারী ইহুদিদের উপর তলোয়ার উঠান। বদরের বিজয়ে স্পর্ধিত মোহাম্মদ মদীনার সবচেয়ে সম্পদশীল ইহুদি গোত্র 'বানু কাইনুকা'র লোকদেরকে তাদের বাজারে জড়ো করে এ অশুভ হুঁশিয়ারী দেনঃ "*হে ইহুদিরা, সাবধান হয়ে যাও, অন্যথায় ঈশ্বর তোমাদের উপর সমুচিত প্রতিশোধ নিবে, যা কোরাইশদের উপর (বদরে) পতিত হয়েছিল। মুসলিম হয়ে যাও। তোমরা জান যে আমি ঈশ্বর-প্রেরিত একজন নবি।*"[৭০] মোহাম্মদের এ অশুভ ইঙ্গিতপূর্ণ হুমকিকে অবজ্ঞা করলে ইহুদিদেরকে অচিরেই চড়া মূল্য দিতে হয়।

বানু কাইনুকার উপর হামলা: মুসলিমরা দাবি করে যে, এ হুমকির পর ৬২৪ সালের এপ্রিলে বানু কাইনুকার এক তরুণ একদিন এক মুসলিম মহিলাকে উত্যক্ত করে। সেখানে উপস্থিত এক মুসলিম ঐ উত্যক্তকারীকে হত্যা করে। তার প্রতিশোধে সে মুসলিমও জনৈক ইহুদি দ্বারা

[৭০]. Ibn Ishaq, p. 363

খুন হয়।[৭১] দু'পক্ষের এ ঝগড়ার ছুতা ধরে মোহাম্মদ সমগ্র বানু কাইনুকা সম্প্রদায়কে ঘেরাও করেন। পনের দিন ঘেরাও বা অবরোধের পর ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করলে মোহাম্মদ তাদেরকে হত্যার জন্য বেঁধে ফেলার আদেশ দেন। এ পর্যায়ে খাজরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই হস্তক্ষেপ করেন। ওবাই ইসলাম গ্রহণ করলেও মোহাম্মদের কর্মকাণ্ডের প্রতি তার আনুগত্য ছিল সন্দেহজনক। ওবাই মোহাম্মদকে অনুনয় করেন: *"ঈশ্বরের দোহাই, এ ৭০০ জন মানুষের মস্তক কি এক সকালেই তুমি ছিন্ন করতে চাও?"* আবদুল্লাহ মিনতি করেন: *"হে মোহাম্মদ, আমার মক্কেলদের উপর দয়া করো।"* উল্লেখ্য যে, বানু কাইনুকা আব্দুল্লাহর গোত্রের মিত্র ছিল। নবি তাঁর মিনতি উপেক্ষা করার চেষ্টা করলে, আব্দুল্লাহ তাঁর আলখিল্লার কলার ধরে জিদের সঙ্গে বলেন: *"ঈশ্বরের দোহাই, আমার মক্কেলদের প্রতি সদয় আচরণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়বো না।"* তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আরও বলেন: *"আমিও একজন মানুষ, পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে।"*[৭২]

আব্দুল্লাহ একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন, আর তাঁর এ হুঁশিয়ারীতে মোহাম্মদ বুদ্ধিমানের মতো বন্দিদেরকে হত্যা না করে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণাদি সংগে নেয়া নিষিদ্ধ করে মোহাম্মদ মদীনা ত্যাগের জন্য তিন দিন সময় দেন। ইহুদিরা চলে যাওয়ার পর মোহাম্মদ তৎক্ষনাৎ তাদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ দখল করেন, এবং তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত 'পবিত্র লুণ্ঠন সামগ্রী' ('গনিমা' বা 'গনিমতের মাল') হিসেবে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বণ্টন করেন।

প্রায় এ সময়েই তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপের সমালোচনাকারীদের হত্যার নির্দেশ দেন। হতভাগ্যদের মধ্যে ছিলেন ১২০ বছর বয়সী কবি আবু আফাক, যিনি মোহাম্মদের সহিংস কার্যকলাপের নিন্দা করে কবিতা লিখেছিলেন। আরেকজন হতভাগী ছিলেন পাঁচ সন্তানের জননী মহিলা কবি আসমা বিন্‌তে মারওয়ান, যিনি মোহাম্মদের আবু আফাককে হত্যাসহ অন্যান্য সহিংস কার্যকলাপের নিন্দা করে কবিতা লিখেছিলেন। তৃতীয় হতভাগা ছিলেন ইহুদি কবি কা'ব ইবনে আশরাফ, যিনি মোহাম্মদের বদর যুদ্ধের নৃশংসতার নিন্দা করে ও কোরাইশদেরকে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে কবিতা লিখেছিলেন।[৭৩]

ইবনে ইসহাকের মতে, এ সময় মোহাম্মদ ইহুদিদেরকে হত্যার জন্য এক সাধারণ বা খোলা অনুমোদন দেন এই বলে: *"ইহুদিদের হত্যা করো, যারা তোমাদের ক্ষমতার মধ্যে পড়বে।"* এরপর ইহুদি থেকে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাঈসা নামক এক মুসলিমের সামনে দিয়ে সুনাইনা নামক জনৈক ইহুদি যাবার সময় মুহাঈসা হতভাগ্য সুনাইনাকে হামলা করে মেরে ফেলে। মুহাঈসার পরিবারের সাথে সুনাইনার সামাজিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল, এবং তার দ্বারা তাদের পরিবার উপকৃত ছিল। এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটিকে হত্যার ক্ষোভে রাগান্বিত মুহাঈসার বড় ভাই হুয়াঈসা তার মুখোমুখি হলে বলে: *"তুই ঈশ্বরের শত্রু! তুই তাকে হত্যা করেছিস, অথচ তোর পেটের খাদ্য আসে তার সম্পদ থেকে।"* ছোট ভাই এ কথায় হুশিয়ারি ইঙ্গিত করে উত্তর দেয়: *"ওই ব্যক্তিকে হত্যার জন্য যিনি আমাকে আদেশ করেছেন, তিনি তোমাকে হত্যার আদেশ দিলে আমি তোমার মাথাও ছিন্ন করতাম।"* ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, এরূপ বর্বরোচিত মানসিকতা ও অঙ্গীকার, যা মোহাম্মদের ধর্ম ছোট ভাইয়ের মনে সঞ্চারিত করেছিল, তাতেও অনুপ্রাণিত হয়ে বিস্মিত হুয়াঈসা চিৎকার করে বলে উঠে: *"ঈশ্বরের দোহাই! যে ধর্ম তোকে এ শিক্ষা দিতে পারে, তা বিস্ময়কর!"* এবং এরপর সেও একজন মুসলিম হয়ে যায়।[৭৪]

বানু নাদির-এর উপর হামলা

মদীনার ইহুদিদের উপর মোহাম্মদের পরবর্তি নিষ্ঠুরতা ঘটে ৬২৫ সালের আগস্ট মাসে। সর্বনাশা ওহুদের যুদ্ধের পর একদিন মোহাম্মদ তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য আবু বকর, ওমর ও আলিকে নিয়ে বানু নাদির নেতার বাড়িতে যান। বানু নাদিরের একটি মিত্র গোত্রের একজনকে মোহাম্মদের জনৈক শিষ্য হত্যা করেছিল, এবং সে ঘটনার মধ্যস্থতার নিমিত্তে তিনি নাদির গোত্রপতির কাছে এসেছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে মোহাম্মদ তাঁর শিষ্যদেরকে *'তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করতে বলে হঠাৎ উঠে পড়েন ও মদীনায় ফিরে আসেন,'* লিখেছেন ইবনে ইসহাক।[৭৫] দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও মোহাম্মদ ফিরে না আসায় তাঁর সঙ্গীরা চলে যান। ইবনে ইসহাক জানান, মোহাম্মদ পরে বানু নাদিরের উপর অভিযোগ তোলেন যে, ছাদের উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে তারা মোহাম্মদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল (কৌতুহলের বিষয় হলো সেখানে অপেক্ষমান তাঁর শিষ্যদের কেউই ছাদের উপর কাউকে দেখতে পাননি)। তিনি অতঃপর নাদির গোত্রের উপর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে তাদেরকে নির্বাসিত হয়ে ইহুদিপল্লী খালি করার আদেশ দেন। কোনো কোনো সমালোচক নাদির গোত্রের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের শত্রুতা বা রাগের কারণ হিসেবে ওহুদ যুদ্ধের আগে মক্কার আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। যাহোক, কোরানে এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা হলো: *"আল্লাহ তাদের বিতাড়নের রায় দিয়েছেন... কারণ তারা আল্লাহ ও তার প্রেরিত নবির কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে – এবং আল্লাহকে বাধা দিলে, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দেন'* (কোরান ৫৯:৩-৪)। অর্থাৎ নাদির গোত্রের ইসলাম প্রত্যাখ্যান বা এর সমালোচনা ছিল তাদের উপর মোহাম্মদের আক্রমণের কারণ।

কোরানে আব্দুল্লাহ বিন ওবাইকে একাধিকবার হিপোক্রিট বা ভণ্ড আখ্যা দিয়ে নিন্দা করা হয়েছে। ওবাই বানু নাদিরের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগের নিন্দা করেন ও তাদের পক্ষে যুদ্ধ করারও হুমকি দেন, যা আল্লাহ কোরানে উল্লেখ করেছেন এভাবে: *"ভণ্ডটি (বানু নাদিরকে) বলে: তোমরা বিতাড়িত হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাবো... আর তোমরা যদি (যুদ্ধে) আক্রান্ত হও, আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা বাস্তবিকই মিথ্যাচারী"* (কোরান ৫৯:১১)।

---

৭১. Muir, p. 241
৭২. Ibn Ishaq, p. 363-64; Walker, p. 184
৭৩. Ibn Ishaq, p. 675-76, 367
৭৪. Ibn Ishaq, p. 369
৭৫. Ibid, p. 437

আব্দুল্লাহর সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে ইহুদিরা মোহাম্মদের মদীনা ত্যাগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে মোহাম্মদ তাদের আক্রমণ করে দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখেন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, তাদেরকে দ্রুত আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে নবি তাদের সমস্ত পাম গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এতে বানু নাদির মোহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে বলে: *'মোহাম্মদ, তুমি নিজেই যথেচ্ছা বা খেয়ালখুশি বশত ধ্বংসকান্ড নিষিদ্ধ করেছো ও যারা তা করে তাদেরকে নিন্দা করেছো। তাহলে তুমি কেন আমাদের পাম গাছ কাটছো ও পুড়িয়ে ধ্বংস করছো?'*[৭৬] শেষ পর্যন্ত নির্বাসনে যেতে দেওয়ার শর্তে তারা আত্মসমর্পণ করে। মোহাম্মদ তাদের তরবারি, বর্ম ও হেলমেটসহ ধনসম্পদ, বাড়িঘর ও খামারগুলো দখল করে তাঁর শিষ্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

বানু কোরাইজা-র হত্যাকাণ্ড

ইহুদিদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের সবচেয়ে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে বানু কোরাইজা ইহুদি গোত্রের উপর ৬২৭ সালের এপ্রিল মাসে। এটা ঘটে খন্দক যুদ্ধের পর পরই, যে যুদ্ধে মক্কার বাহিনী মদীনায় মুসলিমদেরকে ব্যর্থ আক্রমণ করেছিল। মোহাম্মদ বানু কোরাইজাকে আক্রমণ করে তাদেরকে আবাসস্থলের ভিতর প্রায় এক মাস আটকে রেখে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

ইসলামি সূত্রগুলো দাবি করে যে, খন্দক যুদ্ধের সময় কোরাইশরা বানু কোরাইজার সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা তাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে ঐ সুদীর্ঘ অবরোধের গোটা সময়টা কোরাইজা গোত্রটি ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বস্তুতঃ বানু কোরাইজা খন্দক খননের জন্য মোহাম্মদকে কোদাল-খন্তি ধার দিয়ে সহযোগিতা করেছিল, যা মোহাম্মদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করে। অথচ কোরাইশরা অবরোধ তুলে নেয়ার পরই মোহাম্মদ বানু কোরাইজার বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি ও চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ তোলেন (সম্ভবত তাদের মাঝে কোন চুক্তি বিদ্যমান ছিল না[৭৭])। আল্লাহ এ অভিযোগটি কোরানে উপস্থাপন করেছেন এভাবে: *'এবং তিনি (আল্লাহ) ধর্মগ্রন্থভুক্ত লোকদেরকে (অর্থাৎ বানু কোরাইজাকে) এনেছে (বন্দি হিসেবে), যারা নিজেদের আবাসস্থল থেকে তাদেরকে (কোরাইশদের) সমর্থন করেছিল, এবং তাদের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছে'* (কোরান ৩৩:২৬)। আয়াতটি বলছে যে, বানু কোরাইজা গোত্রের লোকেরা তাদের আবাসস্থলের ভিতরে থেকেই কোরাইশদেরকে যুদ্ধে সহায়তা করেছিল, যে কারণে আল্লাহ তাদেরকে বন্দি করেছে ও তাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আবাসস্থলের ভিতরে থেকেও বানু কোরাইজা কীভাবে কোরাইশদেরকে যুদ্ধে সহায়তা করতে পারে এটা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

মোহাম্মদ বানু কোরাইজাকে আক্রমণ করলে আবদুল্লাহ বিন ওবাই এবারও মোহাম্মদের নিন্দা করেন। কিন্তু এ সময় তিনি ছিলেন মৃত্যু নিকটবর্তি এবং তাঁর পক্ষের অধিকাংশ লোক মোহাম্মদের দলে যোগ দেওয়ায় তাঁর সামাজিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কাজেই মোহাম্মদ এখন সহজেই তাঁকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন। অবরুদ্ধ থাকাকালে বানু কোরাইজা কাইনুকা বা নাদির গোত্রের মতো নির্বাসনে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, যা মোহাম্মদ প্রত্যাখ্যান করেন। আত্মসমর্পণের পর তিনি তাদের সমস্ত সাবালক, মোট ৮০০ থেকে ৯০০, পুরুষকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। পুরুষাংগের পাশে জন্মানো লোমের ভিত্তিতে তাদের সাবালকত্ব যাচাই করা হয়।[৭৮] কোরাইজা গোত্রের শিশু ও নারীদেরকে দাস হিসেবে আটক করা হয় এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘরবাড়ি যথারীতি বাজেয়াপ্ত করে মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা হয়। ইসলামের ঈশ্বর নিম্নোক্ত প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এ নিষ্ঠুর বর্বরতার স্বর্গীয় অনুমোদন দেন: *'(তাদের) কতককে তোমরা হত্যা করেছো ও কতককে করেছো বন্দি। এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তাদের ভূমি, বাড়িঘর, ধন-সম্পদ ও খামারের... অধিকারী করেছেন। আল্লাহ সর্বদা সবকিছু করতে সক্ষম '* (কোরান ৩৩:২৬-২৭)।

যাহোক, এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বাজারের কাছে একটা পরিখা খনন করা হয়। সেখানে মোহাম্মদের উপস্থিতিতে হাত বাঁধা অবস্থায় সে ৮০০-৯০০ বন্দিকে একে একে পরিখার ধারে এনে তরবারির আঘাতে মস্তক ছিন্ন করে কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। মোহাম্মদ নিজে দুই ইহুদি নেতার শিরচ্ছেদ করেন। এ দৃশ্য চলে সকাল থেকে সারাদিন এবং মশাল জ্বালিয়ে রাত্রি পর্যন্ত। ক্যারন আর্মস্ট্রং ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের ভুল ধারণা সংশোধনের লক্ষ্যে অবিরাম প্রচারণা চালানোর জন্য মুসলিমদের কাছে অতি প্রিয়। কিন্তু এ নৃশংস গণহত্যা তার মনেও এমন মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, একে তিনি ইহুদিদের উপর জার্মানের নাৎসিদের নিষ্ঠুরতার সাথে তুলনা করেন।[৭৯] এ নির্মম হত্যাকাণ্ডকে ইহুদিদের উপর 'ফার্স্ট হলোকাস্ট' বা 'প্রথম হত্যাযজ্ঞ' আখ্যায়িত করা যায়।

এক ইহুদি নারী, যার স্বামীকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল, সে তার স্বামীর হত্যাকারীদের দাসী হয়ে বেঁচে থাকার পরিবর্তে স্বামীর মত মৃত্যু কামনা করে। মোহাম্মদ তার দাবি মঞ্জুর করলে সে সহাস্যবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেয়। মোহাম্মদের যুবতী স্ত্রী আয়শা বানু কোরাইজার হত্যাযজ্ঞ সচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি বলতেন: সে বীরাঙ্গনার মৃত্যুকালীন হাস্যিপূর্ণ মুখখানি সব সময় যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠে।

৭৬. Ibid

৭৭. Watt WM (1961) *Islam and the Integration of Society*, Routledge & Kegan Paul; London, p. 19. *Indeed, there existed no treaty at all. The Constitution of Medina, which is peddled as the treaty in question by Muslims was never signed by any Jewish tribes. According to Montgomery Watt, whose books on Islam are widely published in Pakistan, there were nine contracting parties in this document and they were the Muslims and Arab Pagan tribes, who had become essentially Muslim by converting to Islam in large numbers after Muhammad's arrival in Medina*.

৭৮. Abu-Dawud 38:4390: Narrated Atiyyah al-Qurazi: "*I was among the captives of Banu Qurayzah. They (the Companions) examined us and those who had begun to grow hair (public) were killed and those who has not were not killed...*"

৭৯. Armstrong K (1991) *Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam*, Gollanz, London, p. 207.

ইবনে ইসহাক জানান: *'আয়েশা প্রায়শঃই বলতেন, 'শীঘ্রই তাকে হত্যা করা হবে জানা সত্ত্বেও সেই নারীর উচ্ছ্বল তেজ ও সশব্দ হাসির কথা আমাকে যে কী বিস্মিত করেছিল, তা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না।''*[৮০]

আল জাবীর নামক আরেক বৃদ্ধ ইহুদি, যিনি ইতিপূর্বে কয়েকজন মুসলিমের জীবন রক্ষা করেছিলেন, তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষমার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তাঁর প্রিয়জনরা সবাই যখন মৃত্যুবরণ করলো তখন তাঁর আর বেঁচে থাকার সাধ নেই। ইবনে ইসহাক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে: *'পরিবার ও সন্তান-সন্ততিবিহীন বৃদ্ধের জীবনে চাওয়া-পাওয়ার আর কী থাকতে পারে?'* তা শুনে মোহাম্মদ চীৎকার করে উঠেন: "*হ্যাঁ, তুমিও তাদের সঙ্গে নরকের আগুনে যাবে*", এবং তার শিরচ্ছেদের হুকুম দেন।[৮১]

নবি পবিত্র লুণ্ঠনের মালরূপে প্রাপ্ত বানু কোরাইজার ধনসম্পদের এক-পঞ্চমাংশ নিজের হিস্যারূপে রেখে অবশিষ্ট তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। একই ভাবে বন্দি নারী ও শিশুদের ভাগ করা হয়। নারী বন্দিদের মধ্যে সুন্দরী তরুণীরা মুসলিমদের যৌনদাসীরূপে গৃহীত হয়। মোহাম্মদ নিজে রায়হানা নাম্নী এক সুন্দরী তরুণীকে তাঁর যৌনদাসী হিসেবে গ্রহণ করেন। বন্দি পুরুষদের হত্যার ঐ রাতেই তিনি রায়হানাকে বিছানায় নিয়ে সহবাস করেন। ভবিষ্যতে যুদ্ধের প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহের জন্য কিছু বন্দিকে অন্যত্র বিক্রি করা হয়। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: *'অতঃপর নবি বানু কোরাইজার কিছুসংখ্যক বন্দি নারীসহ সা'দ বিন জায়েদ আল-আনসারীকে নাজদ'এ পাঠান। আনসারী ঘোড়া ও অস্ত্রের বিনিময়ে তাদেরকে বিক্রি করে দেন।'*[৮২]

খাইবার ইহুদিদের উপর হামলা

বানু কোরাইজাকে নির্মূলের সাথে মদীনা ইহুদিমুক্ত হয়ে যায়। এবার মোহাম্মদের নজর পড়ে মদীনার বাইরে খাইবারের ইহুদিদের উপর। খাইবার ছিল আরব উপদ্বীপ অঞ্চলের আরেকটি শক্তিশালী ইহুদি অধ্যুষিত শহর, যার অবস্থান মদীনা থেকে প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে সিরিয়ার পথে। বিশেষ করে তিনি মদীনা থেকে খাইবারে নির্বাসিত বানু নাদির গোত্রের ইহুদিদের উপর ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কারণ তাদের নেতা আবু রফি মদীনার বিরুদ্ধে খন্দকের যুদ্ধে কোরাইশদের মিত্র বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং আবু রফি ও তার সম্প্রদায়ের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে হবে।

কোরাইজাকে নির্মূলের অল্পকাল পরে ৬২৭ সালে মোহাম্মদ আলির নেতৃত্বে খাইবারের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ অভিযানে কিছু গবাদি পশু ও ঘোড়া ছিনিয়ে আনা ব্যতীত তেমন সফলতা আসেনি। অতঃপর মোহাম্মদ আবু রফিকে হত্যার জন্য একদল গুপ্ত হত্যাকারী পাঠান। হত্যাকারীরা রাতের অন্ধকারে বন্ধুবেশে আবু রফির বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে খতম করে মদীনায় ফিরে এলে নবি আনন্দ-উল্লাসে চীৎকার করে উঠেন: "তোমরা সফল হয়েছো!" "আর আপনিও, হে নবি" – উত্তরে বলে খুনিরা।[৮৩] আরো একটা হত্যা মিশন পাঠানো হয় খাইবারের নেতা ওজেইর (ইউসিয়ের)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ সময় ইহুদিরা সতর্ক থাকায় পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

অতঃপর নবি ৬২৮ সালের জানুয়ারি মাসে খাইবারের নেতার সাথে আলোচনার জন্য প্রকাশ্যে তিরিশ জন মুসলিম প্রতিনিধি পাঠান। তারা খাইবারে পৌঁছে ওজেইরকে নিশ্চয়তা দেয় যে, *'মোহাম্মদ তাকে খাইবারের শাসনকর্তা বানাবেন এবং তার সাথে বিশেষ সম্মানজনক আচরণ করবেন। তারা আল্লাহর নামে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।'* এ নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ওজেইরের নেতৃত্বে খাইবারের তিরিশ জনের একটি প্রতিনিধিদল মদীনার দিকে যাত্রা করে। মরুপথে ভ্রমনকালে প্রতিটি উটের পিঠে একজন মুসলিমের পিছনে একজন ইহুদি বসে। খাইবার থেকে কিছুদূর আসার পর মুসলিমরা ইহুদিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে হত্যা করে; মাত্র একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনা মোহাম্মদের কাছে যখন বর্ণনা করা হয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেন: "*নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমাদেরকে পাপীষ্ঠদের মাঝ থেকে (নিরাপত্তার সাথে) প্রেরণ করেছেন।*"[৮৪]

পরবর্তিতে ৬২৮ সালের মে মাসে মোহাম্মদ নিজে ১,৬০০ যোদ্ধার শক্তিশালী একটি বাহিনীর নেতৃত্বে খাইবার অভিযানে যাত্রা করেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত গোপনতার সাথে খাইবার পৌঁছান। ইবনে ইসহাক জানান: খাইবারের লোকেরা সকালে কাজের জন্য টুকরি-কোদাল নিয়ে বের হলেই নবি ও তাঁর বাহিনীকে দেখতে পায়। "*মোহাম্মদ তাঁর বাহিনী নিয়ে এসেছে*" বলে চিৎকার করতে করতে তারা লেজ গুটিয়ে পালায়। "আল্লাহু আকবর! খাইবার ধ্বংস হয়েছে" বলে নবি খাইবার আক্রমণ করেন।[৮৫] রক্তাক্ত যুদ্ধে মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। যুদ্ধে তিরানব্বই জন ইহুদি প্রতিরোধকারী ও উনিশ জন জিহাদী মারা যায়। ইহুদি নেতা আবু রফিকে হত্যার পর তার তরুণ নাতি কিনানা বানু নাদিরের নেতা হয়েছিলেন। সুরক্ষার জন্য তাঁদের ধনসম্পদ তিনি একটা গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মোহাম্মদ এক দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক ইহুদির কাছ থেকে কিনানার গুপ্ত সম্পদের কথা জানতে পান। গুপ্ত সম্পদের তথ্য বের করার জন্য মোহাম্মদ বুকে আগুন রেখে কিনানাকে নির্যাতন করেন। ইতিমধ্যে গুপ্ত সম্পদের খোঁজ পাওয়া যায়। এরপর কিনানাকে হত্যা করা হয়।

যুদ্ধে জয়লাভের পর খাইবার যোদ্ধাদের (যুদ্ধ করতে সমর্থ এমন বয়সের লোকদের) হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদের দাসদাসী হিসেবে বন্দি করা হয় (বোখারী ২:১৪:৩৮)। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: খাইবারের নারীদেরকে মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া

---

৮০. Ibn Ishaq, p. 465; also Walker, p. 185-86
৮১. Ibn Ishaq, p. 466
৮২. Ibid, p. 465
৮৩. Muir, p. 348
৮৪. Ibid, p. 349
৮৫. Ibn Ishaq, p. 511; also see Bukhari 2:68

হয়।[৮৬] নারীবন্দিদের মধ্যে তিনজন অসাধারণ সুন্দরী তরুণী ছিল: কিনানার সতর বছর বয়স্কা স্ত্রী সাফিয়া ও তার দুই অবিবাহিত চাচাত বোন। জানা যায় যে সাফিয়া মোহাম্মদের জিহাদী শিষ্য দিহাইয়া বিন খলিফা আল-কালবি'র ভাগে পড়ে। কিন্তু আরেক জিহাদী মোহাম্মদের কাছে এসে সাফিয়ার অসাধারণ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করে বলে যে, কেবলমাত্র আল্লাহর নবিই তার যোগ্য হতে পারে। একথা শুনে মোহাম্মদ সাফিয়াকে নিজের হস্তগত করতে চান (মুসলিম ৮:৩৩২৯, বোখারী ৫:৫১২)। মুসলিমে বলা হয়েছে: *"আনাস বলেছেন: যুদ্ধের মালামালের মধ্যে সাফিয়া দিহাইয়ার ভাগে পড়ে এবং আল্লাহর নবির উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করে তারা বলে, 'আমরা এ পর্যন্ত তার মতো সুন্দরী নারী বন্দিদের মাঝে কখনও দেখিনি।"* আবু দাউদ জানান, একথা শুনে মোহাম্মদ দিহাইয়া ও সাফিয়াকে তাঁর সম্মুখে হাজির করার নির্দেশ দেন। সাফিয়াকে দেখে নবি দিহাইয়াকে বলেন: *"বন্দিদের মধ্য থেকে অন্য একজন দাস-তরুণীকে গ্রহণ করো।' নবি সাফিয়াকে মুক্ত করে দেন ও তাকে বিয়ে করেন'* (আবু দাউদ ১৯:২৯৯২)। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: *'মোহাম্মদ সাফিয়াকে তাঁর পিছনে অবস্থান নিতে বলেন ও নিজের আলখেল্লা তার গায়ে জড়িয়ে দেন, যাতে মুসলিমরা বুঝে যে তিনি নিজের জন্য তাকে পছন্দ করেছেন।'*[৮৭] দিহাইয়া সাফিয়ার দুই চাচাত বোনকে নিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে বাধ্য হয় (মুসলিম ৮:৩৩২৯)।

এ অভিযানে বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ মোহাম্মদ তাঁর যোদ্ধাদের মধ্যে যথারীতি বিতরণ করে দেন। তিনি আত্মসমর্পণকৃত বাকি ইহুদিদেরকে খাইবার থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন (বোখারী ৩:৫৩১)। কিন্তু বাজেয়াপ্তকৃত জমি চাষবাসের জন্য মুসলিমদের জনবল যথেষ্ট ছিল না। এক হাদিসে বলা হয়েছে: *'জমিতে কাজ করার জন্য তাদের যথেষ্ট শ্রমিক বা কর্মী ছিল না'* (আবু দাউদ ১৯:৩০০৪)। সুতরাং মোহাম্মদ দু'টো শর্তে তাদেরকে খাইবারে থাকার অনুমতি দেন: প্রথম, *'আমাদের যতদিন খুশি ততদিন তোমাদের থাকতে দিব'* (বোখারী ৩:৫৩১) এবং দ্বিতীয়, উৎপাদিত দ্রব্যের (ফল এবং সবজি) অর্ধাংশ কর হিসেবে মুসলিমদেরকে দিতে হবে (বোখারী ৩:৫২১-২৪)।

খাইবারের ঘটনায় আতঙ্কিত ফাদাক-এর ইহুদি গোষ্ঠী তাদের জমির উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ সমর্পণের শর্তে মোহাম্মদের আনুগত্যের প্রস্তাব দেয়। এরপর আরবের কামুস, ওয়াটিহ্, সোলেলিম ও ওয়াদি আল-কোরা প্রভৃতি ইহুদি শহরগুলোকে বশীভূত হতে বাধ্য করা কিংবা নির্বাসিত করা হয়। মৃত্যুর আগে মোহাম্মদ সমগ্র আরব অঞ্চল থেকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন। ইবনে ইসহাকের মতে, মৃত্যুশয্যায় নবি নির্দেশ দেন যে: *'দুটো ধর্মকে আরব উপদ্বীপে স্থান দেওয়া ঠিক হবে না।'*[৮৮] এর ফলে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ৬৩৮ সালে খাইবারের সব ইহুদিকে বহিষ্কার করেন ও তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে (মৃত্যু ৬৪৪ সালে) আরব উপদ্বীপে কোন ইহুদি ও খ্রিষ্টান অবশিষ্ট ছিল না (বোখারী ৩:৫৩১, আবু দাউদ ১৯:৩০০১)।[৮৯]

খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মোহাম্মদের আচরণ

অধ্যাপক এডোয়ার্ড সাইদ দুঃখ করে বলেন: *'মধ্য যুগের অধিকাংশ সময় ধরে ও রেনেসাঁর প্রথমার্ধে ইউরোপে ইসলামকে মনে করা হতো ভ্রষ্ট, ঈশ্বর-নিন্দুক ও অস্পষ্ট একটা দানবীয় ধর্ম।'*[৯০] পাইপ্স লিখেছেন: *'খ্রিষ্টানরা অনেককাল ধরে ইসলামকে তাদের নিজস্ব ধর্ম থেকে উদ্ভূত বিপথগামী এক আন্দোলন হিসেবে দেখেছে।'*[৯১] ইগনাজ গোল্ডজিহার দাবি করেন: *"মোহাম্মদ কোনও নতুন ধারণা বা আদর্শের ঘোষণা দেন নি... তাঁর বার্তা ছিল ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম বা সূত্র থেকে গ্রহণকৃত ধর্মীয় আদর্শ ও নিয়ম-কানুনের যোগবিশেষ মাত্র।"*[৯২] কোরান নিজেই ইসলামে ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাবের কথা স্বীকার করে; তদুপরি পৌত্তলিক, জরথুষ্ট্রবাদ, সাবিয়ান এবং ইসলামপূর্ব অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস ও শাস্ত্রীয় আচার ইসলাম ধর্মে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্যামুয়েল জুয়েমার বলেন : ইসলাম কোন (নতুন) উদ্ভাবন নয়, বরং পুরনো ধারণার সংমিশ্রণ মাত্র।[৯৩] ইসলাম বিদ্যমান ধর্ম, বিশেষত খ্রিষ্ট ও ইহুদিবাদ থেকে গৃহিত ধারণাসমূহের মিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত – এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে নবি মোহাম্মদের সম্পর্ক ও আচরণের বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা করা হবে, যা পাঠকদের ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কে এ দাবিগুলো হৃদয়ঙ্গম বা যাচাই করতে সহায়ক হবে। এ আলোচনা পরিষ্কার করে তুলবে বিশেষত খ্রিষ্টধর্ম কীভাবে মোহাম্মদের ধর্মের ধারণা ও মিশনকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছিল, এবং কীভাবে খ্রিষ্টান ধর্ম ও এর অনুসারীদের প্রতি তাঁর মনোভাব ও ধর্মের সুর ইসলাম উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়।

মোহাম্মদের নবিত্ব ও ধর্মের উপর খ্রিষ্টান প্রভাব

অষ্টম শতকের খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ দামেস্কের জন (মৃত্যু ৭৪৯)-এর মতে, মোহাম্মদের ধর্ম ছিল খ্রিষ্টান ধর্মেরই একটি ভ্রান্ত রূপ। তিনি লিখেছেন: *'সম্ভবত এক এরিয়ান (আর্য) মংক বা মঠাধ্যক্ষের মাধ্যমে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট-এর সাথে পরিচিতি লাভের পর মোহাম্মদ তাঁর*

---

৮৬. Ibn Ishaq, p. 515
৮৭. Ibid
৮৮. Ibid, p. 525
৮৯. Muir, p. 381
৯০. Said EW (1997) *Islam and the west In Covering Islam: How the Media and Experts Determine How We See the Rest of the World*, Vintage, London, p. 5-6
৯১. Pipes D (1983) *In the Path of God*, Basic Books, New York, p. 77
৯২. Goldziher I (1981) *Introduction to Islamic Theology and Law*, Trs. Andras & Ruth Hamori, Princeton, p. 4-5
৯৩. Zwemer S (1908) *Islam: A Challenge to Faith*, New York, p. 24

নতুন ধর্ম সম্প্রদায়কে সংগঠনে সচেষ্ট হন।' জার্মান দার্শনিক কুসা'র নিকোলাস (মৃত্যু ১৪৬৪) খ্রিষ্টধর্মের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নেস্টোরিয়ান নামক এক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাসসমূহের ছাপ খুঁজে পান কোরানে।[৯৪]

ইসলামি সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম খ্রিষ্টানধর্মের সাথে মোহাম্মদের যোগাযোগ ঘটে বাহিরা নামক এক বিজ্ঞ নেস্টোরিয়ান মঠাধ্যক্ষের মাধ্যমে। বার বছর বয়সে (কারো কারো মতে নয় বছর বয়সে) চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনকালে তিনি বাহিরার সান্নিধ্যে আসেন। এ যাত্রাকালে সিরিয়ার খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মোহাম্মদ প্রথম খ্রিষ্টান ধর্ম, প্রথা ও ধর্মীয় আচার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করেন। মুসলিম কাহিনীগুলো বলে যে, মোহাম্মদের ধর্মীয় আলোচনায় খুব আগ্রহ দেখে বাহিরা ভীষণ অভিভূত হন এবং তিনি নাকি মোহাম্মদের মধ্যে আগামী এক নবির ছায়া দেখতে পান।[৯৫] বাহিরা নাকি মোহাম্মদকে কিছু খ্রিষ্টান মতবাদ ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান দেন, এবং বাইবেলের কিছু অনুপ্রেরণাদায়ক অংশ পড়ে শোনান। বাহিরার কাছে বাইবেলের জ্ঞান লাভের ঘটনা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেন: '*সেখানে তিনি জ্ঞান লাভ করেন একটা পুস্তক থেকে যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে।*'[৯৬] মোহাম্মদ পরে সেসব হজমকৃত জ্ঞান কোরানে প্রবিষ্ট করেন, যাতে করে আরবরা সত্যিকার একেশ্বরবাদের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের নিকট থেকে ঐশীবাণী পাওয়ার আগে মোহাম্মদ সম্ভবত ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। ইসলামি সাহিত্যে বেশ কিছু নজির আছে যা থেকে ধারণা করা যায় যে, মোহাম্মদ তাঁর নিজের নবিত্বের মিশন শুরু করার আগে খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মগ্রন্থের সাথে নিজেকে ভালভাবে পরিচিত করে নিয়েছিলেন এবং ঐ দু'ধর্মের মৌলিক বা কেন্দ্রীয় ধারণা 'ঈশ্বরের একত্ব' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। খ্রিষ্টধর্মের সাথে তাঁর প্রথম ঘনিষ্ঠতা ঘটে পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজার সঙ্গে বিয়ের পর। খাদিজার খ্রিষ্টান চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের মাধ্যমে খ্রিষ্টতত্ত্ব সম্পর্কে ছিল খাদিজার ঘনিষ্ঠতা। ওয়ারাকা এমনকি বাইবেলের 'গসপেল'-এর একটা অংশ আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: '*ওয়ারাকা খ্রিষ্টানত্বের সাথে নিজেকে জড়িত করেন এবং পুরোপুরি পাণ্ডিত্য অর্জন না করা পর্যন্ত খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।*'[৯৭] উপরে বলা হয়েছে যে, তিনিই প্রথম মোহাম্মদকে নিশ্চয়তা দেন যে তিনি জিব্রাইলের মারফত ঈশ্বরের ঐশীবাণী পেয়েছেন এবং মোহাম্মদকে নবিত্বের মিশন শুরু করেন উদ্বুদ্ধ করতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। খাদিজার এক দাস জায়েদ বিন হারিথা, যাকে মোহাম্মদ পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও সিরিয়ার এক খ্রিষ্টান ছিলেন।

পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজার বাণিজ্য কাফেলার দায়িত্বভার নিয়ে মোহাম্মদ সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রা কালে সেখানে তিনি আরেক নেস্টোরিয়ান মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বলা হয়, নাস্তর বা নেস্তুর নামক এ মঠাধ্যক্ষ নাকি মোহাম্মদকে এক নবি হিসেবে আলিঙ্গন করেন।[৯৮] অন্যত্র মুসলিম লেখক হুসাইন বলেন যে, মোহাম্মদ একসময় প্রত্যেক বিকেলে তাউরাত ও ইন্জিল (গস্পেল) শ্রবণের উদ্দেশ্যে এক খ্রিষ্টানের কাছে যেতেন।[৯৯] ইসলামের সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, ওয়ারাকা ও খাদিজা মোহাম্মদকে মক্কাবাসী এক খ্রিষ্টান মংক-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এমন এক খ্রিষ্টান মংক ছিলেন আদ্দাস, যিনি বর্তমান ইরাকের নিনেভ থেকে এসে মক্কায় বসবাস করছিলেন। খাদিজা মোহাম্মদকে একবার আদ্দাসের কাছে নিয়ে যান, যিনি দীর্ঘ আলোচনায় নবিদের কাছে ঐশীবাণী আনয়নে ফেরেশ্‌তা জিব্রাইলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে মোহাম্মদের অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগাযোগের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন বেঞ্জামিন ওয়াকার।[১০০] জনৈক তামিম আল দা'রি ছিলেন এক খ্রিষ্টান। কেয়ামতের দিন বিশ্ব ধ্বংস ও পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তিনি মোহাম্মদকে ধারণা দেন। আব্দুল কাইস গোত্রের কাইস ছিলেন আরেক খ্রিষ্টান, যার বাড়িতে মোহাম্মদ প্রায়ই যেতেন। পেশায় তলোয়ার প্রস্তুতকারী জাবরা নামক এক তরুণ গ্রিক খ্রিষ্টান মক্কায় বাস করতেন। তাউরাত ও যিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং মোহাম্মদ প্রায়শঃ তার বাড়িতে যেতেন। মোহাম্মদ আবু তাখিবা নামক জনৈক গ্রিক খ্রিষ্টানের বাড়িতেও যেতেন মাঝে মাঝে। আবু রোকাইয়া নামক তামিম খ্রিষ্টগোত্রের এক ব্যক্তি সততার জন্য বিশেষ খ্যাত ছিল। স্বার্থহীনতা ও ধর্মে আত্মোৎসর্গের কারণে তাকে '*জনগণের মঠাধ্যক্ষ বা মংক*' উপাধি দেয়া হয়েছিল। মোহাম্মদ তাঁর সান্নিধ্যেও আসেন ও পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মোহাম্মদের সমসাময়িকরা মনে করতেন যে ইয়ামামার জনৈক রহমান তাঁকে কিছু খ্রিষ্টান ধারণা দিয়েছিলেন। ইবনে ইসহাক জানান যে, ইয়ামামার জনৈক রহমানের সাথে মোহাম্মদের যোগাযোগ ছিল। অন্যান্য আলোচকরা রহমানকে মুসাইলিমা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মুসাইলিমা ছিলেন নবিত্ব দাবিকারী ইয়ামামার এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর মুসাইলিমা ইসলামের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এরপর মুসলিম ও মুসাইলিমার অনুসারীদের মধ্যে কয়েকটি রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও পরিশেষে মুসাইলিমা নিহত হয় (পরে আলোচিত)।

বহিরাঞ্চলের খ্রিষ্টানদের সঙ্গেও মক্কার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। আরব অঞ্চলের কয়েকটি খ্রিষ্টান গোত্র মক্কায় বাণিজ্যিক ডিপো স্থাপন করে সেখানে তাদের প্রতিনিধি রেখেছিল। ওয়াকার জানান: সাহ্‌ম কোরাইশ গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 'ইজ্‌ল' ও জুহ্‌রা কোরাইশ গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 'ঘাসান' ছিল এমন দুটো খ্রিষ্টান গোত্র, যারা কা'বার আঙ্গিনায় বাণিজ্য ডিপো স্থাপনের সুবিধা পেয়েছিল। ওয়াকার আরও জানান: এছাড়াও মক্কায় খ্রিষ্টানদের একটা ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী জনসংখ্যা ছিল – যারা ছিল আরব ও বহিরাগত, দাস ও মুক্ত মানুষ এবং আবিসিনিয়া, সিরিয়া,

---

৯৪. Walker, p. 188
৯৫. Al-Tabari, Vol. 6, p. 45
৯৬. Ibn Ishaq, p. 79-81
৯৭. Ibid, p. 99
৯৮. Muir, p. 21
৯৯. Walker, p. 190
১০০. Ibid, p. 190-91

ইরাক বা প্যালেস্টাইন থেকে আসা। তারা শিল্পী, রাজমিস্ত্রি, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও খোদাইকরের কাজ করতো। কোন কোন মুসলিম উপাখ্যান লেখকরা মক্কায় একটা খ্রিষ্টান কবরস্থানের উপস্থিতির কথাও লিখেছেন।[১০১]

মনিবাদের প্রভাবঃ মনিবাদ ছিল পারস্যের একতাবা'য় মনি (মৃত্যু ২৭৬) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত খ্রিষ্ট, জরথুষ্ট্রবাদ ও বৌদ্ধ ধারণার সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি বিপথগামী ধর্ম সম্প্রদায়। মোহাম্মদের সময় এই মতবাদ হিরা'য় (মেসোপটেমিয়ায়) বেশ প্রসার লাভ করে। মক্কার সঙ্গে হিরা'র জোরদার বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকায় মনিবাদ নিঃসন্দেহে মক্কাতেও পৌঁছেছিল। মনি নিজেকে প্যারাক্লিট বা দৈব-সত্তা যিশু যার আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন – তা বলে দাবি করতেন। মনি দাবি করেন তিনিই সর্বশেষ নবি ও সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত। মনি বলতেন যিশু ক্রুশবিদ্ধ হননি; তাঁর পরিবর্তে অন্য একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়। মনিবাদের এ মৌলিক বিশ্বাসগুলো অবশ্যই মোহাম্মদকে প্রভাবিত করেছিল এবং ইসলামে সে তত্ত্বগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

নেস্টোরিয়ান প্রভাবঃ নেস্টোরিয়াবাদ হল নেস্টোরিয়া (মৃত্যু ৪৫১) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরেকটি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। নেস্টোরিয়া ছিলেন কনস্টানটিনোপলের

(ইস্তাম্বুলের) বিশপ। মোহাম্মদের সময় নেস্টোরিয়াবাদ পারস্যে প্রসার লাভ করে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। উপরে নেস্টোরিয়ান সন্ন্যাসী বা মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে মোহাম্মদের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নেস্টোরিয়ানরা ছিলেন আচারসিদ্ধ, বিশুদ্ধতাবাদী এবং যিশু ও তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার প্রতিমা বা প্রতিচ্ছবি প্রদর্শনের বিরোধী, যে ধারণাগুলো ইসলামে গভীর রেখাপাত করেছে। এর প্রতিফলন ঘটে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে একটি ডেনিস পত্রিকায় মোহাম্মদের প্রতিচ্ছবি প্রকাশকে কেন্দ্র করে। এর প্রতিবাদে মুসলিমরা ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্যাপক সহিংস বিক্ষোভ করে যাতে অনেক প্রাণহানি ঘটে। ইসলামে জীবন্ত প্রাণীর ছবি অঙ্কন, বিশেষ করে নবি মোহাম্মদের মূর্তি বা ছবি নিষিদ্ধ।

খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের প্রভাব

ওই সময়ের যোগী বা তপস্যাকারী খ্রিষ্টান ভিক্ষুরাও মোহাম্মদের ধর্মীয় চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইসলামিক ও পৌত্তলিক ইতিহাসবিদদের তথ্যমতে, ঐ সময় খ্রিষ্টান মংক বা ভিক্ষুরা মিশর, এশিয়া মিনর (বর্তমান তুরস্ক), সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও আরবের সড়কপথের ধারে ধারে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও আশ্রম গড়ে তুলেছিল। তারা নিজেদেরকে ভালো কাজে, দাতব্য কর্মে এবং দরিদ্র, রোগী ও শিশু, বিশেষত এতিম নারী শিশুদের পরিচর্যায় উৎসর্গ করেছিল। রাত্রিকালে পরিশ্রান্ত বাণিজ্য-কাফেলা ও পর্যটকরা এসব সন্ন্যাসীর মঠগুলোতে যাত্রাবিরতি করতো। সন্ন্যাসীরা পথচারীদেরকে আশ্রয় ও আতিথ্যের সাথে স্বাগত জানাতো। মোহাম্মদ যেহেতু এ অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রচুর যাতায়াত করতেন, তিনি অবশ্যই সে আশ্রমের সাথে পরিচিত ছিলেন ও তাঁদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে মংক বাহিরা কর্তৃক কিশোর মোহাম্মদ নানা সুখাদ্যে আপ্যায়িত হয়েছিলেন।[১০২] বুঝা যায় যে, এসব মঠবাসী খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরা মোহাম্মদের মনে দারুণ ইতিবাচক রেখাপাত করেছিল, যার কারণে কোরানে তিনি তাঁদের জীবনধারার সম্মানজনক স্বীকৃতি দেন এভাবেঃ

১. "ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করোঃ তোমাদের পিতামাতার, পরিবারের, এতিম শিশুদের, পথচারীদের ও অভাবীদের সাহায্যার্থে" (কোরান ২:২১৫)।
২. "পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম শিশু, অভাবী, প্রতিবেশী ও ভ্রমণকারীদের প্রতি দয়া পরবশ হও" (কোরান ৪:৩৬)।

খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের থেকে মোহাম্মদ ইসলামের আরেকটি প্রধান বিষয় গ্রহণ করেন, তা হলো প্রার্থনা বা নামাজের অনুষ্ঠানাদি। যৌনতা বর্জনকারী খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরা দিনে বেশ কয়েকবার প্রার্থনায় রত হতেন। তাঁদের শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রার্থনা বা নামাজের ভঙ্গি বা অঙ্গবিন্যাস ছিলঃ দুই হাত একত্র করে দাঁড়ানো, আনত হওয়া, হাঁটুতে ভর দিয়ে নত হওয়া ও গোড়ালির উপর বসা। মোহাম্মদ নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীদের অনুকরণে ইসলামের নামাজের রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। সি. জে. আর্চার-এর লেখা *'মিস্টিক এলিমেন্ট ইন মোহাম্মদ'* (১৯২৪) অনুযায়ী, খ্রিষ্টান ভিক্ষুরা শেষ রাত্রির দিকে নামাজ বা প্রার্থনায় রত হতেন এ বিশ্বাসে যে, *'ঘুমের চেয়ে প্রার্থনা বা নামাজ ভাল।'*[১০৩] ভোরবেলায় নামাজের জন্য মুসলিমদের আহ্বানের 'আযান'-এ বাক্যটি সংযোজন করা হয়েছে। এসব খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের জীবনধারা, যেমন তাদের ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাদের বদান্যতা ও দাতব্য কর্মের প্রতি মোহাম্মদ এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে সেগুলো কোরানে উল্লেখ করেনঃ *'ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের মধ্যে (খ্রিষ্টান) একটা সাধু বা ন্যায়পরায়ণ দল রয়েছে; তারা রাত্রিকালে আল্লাহর বাণী আবৃত্তি করে ও (ঈশ্বরকে) ভক্তি করে, ভাল কাজে নিযুক্ত ও খারাপ কাজে থেকে বিরত হয়; তারা ভাল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পরস্পরের সাথে হাত মেলায়; তারা ভালদের মধ্যে'* (কোরান ৩:১১৩-১৪)। কিন্তু নবুয়তির মিশন শুরুর আগেই বিবাহ করে সংসার জীবনে জড়িত হয়ে পড়ায় মোহাম্মদ পরে সন্ন্যাসবাদের নিন্দা করেন। তিনি বলেনঃ *সন্ন্যাসবাদ ঈশ্বর নির্দেশিত নয়, খ্রিষ্টানদের উদ্ভাবন মাত্র* (কোরান ৫৭:২৭)।

মক্কায় খ্রিষ্টানত্ব প্রবর্তনে উসমান ইবনে হুয়ারিথ-এর প্রয়াস

এখানে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ বিশেষ দাবি রাখে। তিনি হলেন উসমান ইবনে হুয়ারিথ (হুবেরিখ), যিনি ছিলেন মক্কার এক প্রভাবশালী নেতা ও মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজার চাচাত ভাই। ইবনে ইসহাক জানান, উসমান বহুঈশ্বরবাদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কা'বায় ঘটাপূর্ণ

১০১. Ibid, p. 180
১০২. Al-Tabira, Vol. VI, p. 44-45; Ibn Ishaq, p. 80
১০৩. Walker, p. 62

পৌত্তলিকতার চর্চায় ত্যক্ত হয়ে হুয়ারিথ বাইজেনটাইন সাম্রাটের দরবারে (ইস্তাম্বুলে) যান ও খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হয়।[১০৪] মোহাম্মদের নবিত্ব শুরুর প্রায় পাঁচ বছর আগে, ৬০৫ সালে, উসমান মক্কায় ফিরেন। মক্কার বহুঈশ্বরবাদ সংস্কারের লক্ষ্যে বাইজেনটাইন সম্রাটের আশীর্বাদের সূত্রে উসমান নগরীর গভর্নর পদ দাবি করেন। কিন্তু মক্কার শাসকদের বিরোধিতার মুখে তাকে সিরিয়ায় পলায়ন করতে হয় ও পরে সেখানে তিনি খুন হন।[১০৫]

ওকায মেলায় কিস ইসনে সাইদা'র ধর্মোপদেশঃ জানা যায় যে, মোহাম্মদ মক্কার নিকটবর্তী ওকাযে বার্ষিক মেলায় ধর্মোপদেশের সভাগুলোতে যোগ দিতেন। ওকায মেলায় কিস ইবনে সাইদার ('কিস' অর্থ 'যাজক') সঙ্গে মোহাম্মদের সাক্ষাত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইসলামি সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে যে, মোহাম্মদের নবিত্ব শুরুর কিছুকাল আগে নাজরানের আইয়াদ গোত্রের বিশপ কিস ইবনে সাইদা মেলায় ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি 'প্রায় ভাবাবিষ্ট' হয়ে তৎকালীন আরব কবিতার ধরনে ধর্মীয় বক্তব্য দিতেন, কোরানের প্রথম দিককার সুরাগুলোর ধরনের সাথে যার মিল রয়েছে। তার একটি ধর্মোপদেশ ছিল এরূপঃ

> হে জনগণ, কাছে এসো / এবং শোন ও ভয় করো / সংকেতসমূহ অনুধাবনের জন্য / অস্বীকার করার জন্য নয় / নক্ষত্রসমূহ উঠে ও অস্ত যায় / সাগর কখনও না শুকায়।
> এবং উপরে ছাদের ন্যায় আকাশ / নীচে শুয়ে আছে ধরিত্রী / বৃষ্টি ঝড়ে / গাছপালা খায় / নারী ও পুরুষের বিয়ে হয়।
> সময় চলে যাচ্ছে, সময় পালিয়ে গেছে / ও মরণশীলরা, বলোঃ / গোত্রগুলো আজ কোথায় / যারা এক সময় অবাধ্যতা দেখিয়েছিল / ঈশ্বরের নিয়মের / আজ তারা কোথায়?
> নিশ্চয়ই আল্লাহ দেন / আলো তাদেরকে যারা চায় সুপথের জীবন।

অতঃপর বিশপ মানবিক নশ্বরতা, ঈশ্বরের বদান্যতা ও আগামী 'শেষ বিচারের দিন' সম্বন্ধে প্রচারে প্রবৃত্ত হন। মোহাম্মদ তাঁর ধর্মোপদেশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেন ও গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এটা মোহাম্মদের মন ও আত্মাকে আলোড়িত করে তুলে যে সম্পর্কে বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল-জাহিজ (মৃত্যু ৮৬৯) এক হাদিসে লিখেন যেঃ মোহাম্মদ কী স্বচ্ছতার সাথে স্মরণ করতেন "সে *দৃশ্যটি, মানুষটি, তাঁর আলঙ্কারিক ভাষা ও প্রত্যয় উৎপাদক বার্তা।*" কয়েক বছর পর যখন আইয়াদ গোত্রের প্রতিনিধিরা মক্কা সফরে আসেন, মোহাম্মদ তাঁদের কাছে কিস সাইদা সম্পর্কে জানতে চান। তাঁরা জানান যে, তিনি ৬১৩ সালের দিকে মারা গেছেন। এ খবরে মোহাম্মদ গভীর দুঃখ প্রকাশ করে ও কিস সাইদার প্রতি দয়ার মনোভাব নিয়ে বলেনঃ *"তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি 'প্রকৃত সর্বজনীন ধর্মবিশ্বাস' প্রচার করতেন।"*[১০৬]

ওকায মেলায় ইহুদি ধর্ম প্রচারকরাও ধর্মোপদেশ দিতেন। উভয় ধর্মের প্রচারকগণ আরব গোত্রগুলোর প্রতি রাগ দেখাত, পৌত্তলিকতা চর্চার জন্য তাদেরকে ধিক্কার দিত ও নরকের আসন্ন ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয় দেখিয়ে হুঁশিয়ার করত। মোহাম্মদ সে মেলায় যেতেন এবং খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মপ্রচারকদের বক্তব্য শুনতেন। খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের পরস্পরের মাঝে বৈরিভাব থাকলেও, ধর্ম দুটোর মধ্যে সাদৃশ্য – যেমন উভয় ধর্মে একটিমাত্র ঈশ্বর, উভয়েরই আসমানী কিতাব ও নিজস্ব নবি, উভয়েরই পৌত্তলিকতার নিন্দা এবং অবশ্যই তাদের ধর্মোপদেশে নরকে আসন্ন শাস্তির ভয় ইত্যাদি – তরুণ মোহাম্মদের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করত।

মোহাম্মদের ধর্মে অন্যান্য বিশ্বাস ও উপকথার প্রভাব

মোহাম্মদের নবুয়তি মিশনের ভিত্তি সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট ধারণার জন্য আমরা এখানে কিছুটা প্রসঙ্গের বাইরে যাব অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস, প্রথা ও উপকাহিনীর আলোচনায়, যা প্রেরণা যুগিয়েছিল ও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল মোহাম্মদের ধর্মতত্ত্বকে সূত্রবদ্ধ করতে।

হানিফদের প্রভাবঃ এক্ষেত্রে হানিফ সম্প্রদায়ের জায়েদ ইবনে আমর-এর প্রভাব উল্লেখের দাবি রাখে। 'হানিফ' ছিল সিরীয় খ্রিষ্টান শব্দ, যার অর্থঃ যে ব্যক্তি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছে। মোহাম্মদের সময়ে আরবে এ শব্দটা অনেক ক্ষেত্রে ইহুদি, খ্রিষ্টান, জরথুষ্ট্রবাদী ও সাবিয়ান একেশ্বরবাদীদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হতো। মক্কায় এ শব্দটি যারা বিশেষতঃ খ্রিষ্টান ও ইহুদি প্রভাবে পৌত্তলিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল বা পৌত্তলিকতাকে একেশ্বারবাদে সংস্কারের চেষ্টা করছিল, তাদেরকে বুঝাত। ইবনে ইসহাক মক্কার 'হানিফ'দের বিশ্বাস সম্পর্কে বলেনঃ[১০৭]

> তারা বিশ্বাস করতো যে, তাদের লোকেরা পিতা ইব্রাহিমের ধর্মকে কলুষিত করেছে; এবং পাথর (অর্থাৎ কা'বার কালোপাথর)-এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণের কোন মূল্য নেই; এটা না পায় শুনতে, না পায় দেখতে, না পারে সাহায্য করতে। তারা বলতোঃ "*নিজেদের জন্যে একটা ধর্ম খোঁজ; কারণ ঈশ্বরের দোহাই! তোমাদের ধর্ম কোন ধর্ম নয়।*" সুতরাং তারা পথে বেরিয়ে পড়ে ইব্রাহিমের ধর্ম হানিফিয়া'র খোঁজে।

জায়েদ ছিলেন মোহাম্মদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের চাচা। তিনি নিজেকে ইব্রাহিমের ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করতেন ও তাঁর গোত্রের পৌত্তলিকতা চর্চাকে নিন্দা করে কবিতা লিখতেন। তিনি নারী-শিশু হত্যার নিন্দা করতেন। প্রতি বছর রমজান মাসে তিনি হীরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন হতেন।

৫৯৫ সালের দিকে মোহাম্মদ (বয়স ২৪-২৫) পথিমধ্যে জায়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কথার ফাঁকে মূর্তিদেবীকে উৎসর্গ করা একটা প্রাণীর মাংস দেন। জায়েদ সে মাংস নিতে অস্বীকার করে মোহাম্মদকে মূর্তিপূজা করার জন্য ধমক-ধামকি দেন ও পৌত্তলিক ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা খাদ্য খাওয়ার জন্য তিরস্কার করেন। পরে মোহাম্মদ বলেনঃ *'এর পর আমি কখনও জেনেশুনে কোনও মূর্তিকে স্পর্শ করিনি বা তাদের*

---

১০৪. Ibn Ishaq, p. 99
১০৫. Walker, p. 66
১০৬. Ibid, p. 90
১০৭. Ibn Ishaq, p. 99

উদ্দেশ্যে কোনও পশু উৎসর্গ (কোরবানি) করিনি।' জায়েদ কা'বা প্রাঙ্গনে বসে বসে প্রার্থনা করতেন: "*হে ঈশ্বর! আমি জানিনা কিভাবে তুমি পূজিত হতে চাও। জানলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পূজা করতাম।*" জনগণের বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি এ ব্যাপারে রাব্বী ও মঠাধ্যক্ষদের প্রশ্ন করার জন্য প্রথমে সিরিয়ায় ও পরে ইরাকে যান। ৬০৮ সালে মক্কায় ফেরার পথে তিনি গুণ্ডাদের হাতে নিহত হন।[১০৮]

মোহাম্মদ জায়েদের মতবাদ ও রীতিনীতি দ্বারা এমন প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি সেগুলো পরবর্তিতে ইসলামে অঙ্গীভূত করেন। বস্তুতঃ মোহাম্মদ শুরুতে তাঁর শিষ্যদেরকে হানিফ[১০৯] বলে আখ্যায়িত করতেন। কোরান এ ব্যাপারে বলে যে, মোহাম্মদ কেবল ইব্রাহিমের মৌলিক ও বিশুদ্ধ ধর্ম (একেশ্বরবাদ) প্রচার করছেন (কোরান ২১:৫১), যিনি বহুঈশ্বরবাদী ছিলেন না (কোরান ১৬:১২৩)। অর্থাৎ ইব্রাহিম ছিলেন একজন হানিফ ।[১১০] কোরানের পরবর্তি এক আয়াতে (৩:৬৭) তিনি 'মুসলিম' শব্দটি সন্নিবেশ করেন, এবং তখন থেকে ইব্রাহিম হয়ে যান একজন মুসলিম ও হানিফ (অর্থাৎ বহুঈশ্বরবাদী নন)।

মোহাম্মদের ধর্মানুসারে তাঁর আপন পিতামাতা ও প্রিয় চাচা আবু তালিব সহ সকল অমুসলিম দোজখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। অথচ ব্যতিক্রমীভাবে তিনি জায়েদের উপর ঈশ্বরের ক্ষমার কথা বলেন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, মোহাম্মদকে যখন প্রশ্ন করা হয়: "*জায়েদের জন্য কি আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করব?*" তিনি উত্তর করেন: "*হ্যাঁ, কারণ তিনি সমস্ত মানুষের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হবেন।*"[১১১] নবি আরও বলেন: "*তিনি জান্নাতগামীদের একজন। আমি তাঁকে সেখানে দেখেছি।*"[১১২] এ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মোহাম্মদ ও তাঁর ধর্মমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জায়েদ বিন আমর (এবং সাধারণভাবে হানিফ তত্ত্বের)-এর বিরাট প্রভাব ছিল।

অন্যান্য একেশ্বরবাদের প্রভাব: স্পষ্টতঃই মোহাম্মদের ধর্মমত সূত্রবদ্ধ করেন খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল। আরব অঞ্চলে আরও একেশ্বরবাদী ধর্মমত বিদ্যমান ছিল, যেমন পারস্যের অগ্নিপূজক 'জরথুষ্ট্রবাদ' (অর্থাৎ পার্শী) ও নক্ষত্রপূজক 'সাবিয়ানবাদ' এবং সেগুলোও মোহাম্মদকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি সেসব ধর্মের কিছু কিছু চিন্তাধারা ও আইন ইসলামে অঙ্গীভূত করেছেন। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি, কোরান সাবিয়ানদেরকেও আসমানী কিতাবভুক্ত মানুষরূপে উল্লেখ করেছে এবং জরথুষ্ট্রবাদী (মাজদা/মেজিয়ান)-দের প্রতিও আনুকূল্য প্রকাশ করেছে (কোরান ২২:১৭)। তিনি জরথুষ্ট্রবাদের বেহেস্ত ও দোযখের ধারণা ইসলামে অঙ্গীভূত করেন। কোরানে ৭১:১৫ নং আয়াতে 'নক্ষত্রের উপর শপথ' সুস্পষ্টরূপে সাবিয়ান ধর্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট করে।

বহুঈশ্বরবাদের প্রভাব: ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বড় কেন্দ্র কা'বার সান্নিধ্যে লালিত মোহাম্মদের ভেতরেও ধর্মানুরাগ গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। যে বহুঈশ্বরবাদী ধর্ম ও প্রথার মাঝে তিনি বেড়ে উঠেন, সেগুলোর চিহ্নও তাঁর নতুন ধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'হজ্জ' ও 'ওমরাহ্' ছিল কা'বায় বহুঈশ্বরবাদী তীর্থযাত্রীদের ধর্মীয় আচার, যা তিনি সামান্য পরিবর্তন করে ইসলামে অঙ্গীভূত করেন। যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ শুধু এইটুকু পরিবর্তন করেছেন যে, এখন পশু উৎসর্গ (কোরবানি) করা হয় অদৃশ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে, যা এর আগে পৌত্তলিকরা উৎসর্গ করতো মূর্তিদেবদেবীর উদ্দেশ্যে।

মোহাম্মদের জীবনকেন্দ্রিক ঘটনাসমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষন স্পষ্ট করে তোলে যে, তৎকালে বিদ্যমান একেশ্বরবাদে "একটিমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা" তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাসী ও প্রচারকদের সাথে আলাপ-আলাচনা ও সান্নিধ্য তাঁর মনকে একেশ্বরবাদে অনুপ্রাণিত করেছিল। এসব ধর্মে ঈশ্বরের কঠোর বিচার এবং নরকে ভয়ঙ্কর শাস্তির ধারণা নিশ্চয়ই মৃত্যু পরবর্তি ঈশ্বরের শাস্তির ভয়ে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। কোরাইশদের পৌত্তলিক বিশ্বাসে এমন ভয়ঙ্কর বিচার ও শাস্তির ধারণা ছিল না। মোহাম্মদের নবুয়তি শুরুর মাত্র পাঁচ বছর আগে মক্কার বহুঈশ্বরবাদকে খ্রিষ্ট ধর্মের একত্ববাদে রূপান্তর করতে হুয়ারিথের ব্যর্থ মিশনটিও অবশ্যই মক্কার পথভ্রষ্ট পৌত্তলিকদের মাঝে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় তাঁকে সুদৃঢ় প্রেরণা দিয়েছিল।

ইসলামে খ্রিষ্টান ধারণা

স্পষ্টত মোহাম্মদ খ্রিষ্টধর্ম দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করার আগে সম্ভবত খ্রিষ্টধর্মে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন; কোরানে খ্রিষ্টধর্মের অনেক ধারণা আল্লাহর ঐশীবাণীরূপে অনুকৃত হওয়া সেটা প্রতীয়মান করে। নবি স্পষ্টতঃই খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা বা নামাজের প্রচলিত ধরণ বা রীতি নকল করেছিলেন। ৬১৫ সালে মোহাম্মদ যখন তাঁর কয়েকজন অনুসারীকে আবিসিনিয়ায় বসবাসের জন্য পাঠান, তখন সেখানকার খ্রিষ্টান রাজা তাদেরকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। আল তাবারির মতে, ওসব পরবাসীরা পরে জানান: "*আমরা আবিসিনিয়ায় গেলে উত্তম আতিথেয়তা সহকারে আশ্রয় পাই। আমাদের ধর্ম চর্চায় নিরাপত্তা ছিল*"এবং "*কোনরকম কটু কথা শুনতে হয়নি বা কোনরূপ নির্যাতন ভোগ করতে হয়নি।*"[১১৩] এ ঘটনা মোহাম্মদের মনে স্পষ্টতঃ খ্রিষ্টানত্ব সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল, যা বুঝা যায় এরপর থেকে প্রেরিত আল্লাহর আয়াতগুলোতে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশে। এ প্রবণতা মোহাম্মদের মদীনায় স্থানান্তর হওয়ার এক বছর পর পর্যন্ত বলবত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, কোরানে আল্লাহ যিশুকে সম্বোধন করে বলেন: '*তোমাকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে আমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাবান করব*' (কোরান ৩:৫৫)। কোরান এটাও বলে যে, খ্রিষ্টানরা অহঙ্কারমুক্ত ও মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত

১০৮. Ibid, p. 99-103, Walker, p. 89
১০৯. Those not Polytheists in Mecca were called Hanif.
১১০. Ibn Ishaq, p.100
১১১. Ibn Ishaq, p. 100
১১২. Walker, p. 90
১১৩. Al-Tabari, Vol. VI, p. 99

বন্ধু ভাবাপন্ন' (কোরান ৫:৮২), যা মুসলিম পরবাসীদের প্রতি আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজার সহানুভূতি ও আতিথেয়তার বিষয়টি ইঙ্গিত করে। ৬৩০ সালের জানুয়ারিতে মক্কায় বিজয়োল্লসিত প্রবেশের পর মোহাম্মদ সমস্ত পুতুল ভেঙ্গে ফেলার এবং দেয়াল ও স্তম্ভে অঙ্কিত শিল্পকর্ম বা ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময় আব্রাহাম ইসমাইলের প্রতিচ্ছবি ভেঙ্গে ফেলা হয়। কিন্তু যিশুকোলে মেরীর (মরিয়মের) প্রতিচ্ছবিটির উপর নিজের হাত রেখে নবি তা রক্ষা করেন।

কোরানে বাইবেল সদৃশ পংতি: মোহাম্মদ খ্রিষ্টান আচার ও ধারণাসমূহ শুধু আত্মস্থই করেননি, তিনি বাইবেলের কিছু অংশ প্রায় অপরিবর্তিত বা ঈষৎ পরিবর্তিন করে কোরানে সংযোজন করেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:[১১৮]

১. '*ন্যায়বানরাই পৃথিবীর অধিকারী হবে*' (কোরান ২১:১০৫); এ আয়াতটি সরাসরি বাইবেল থেকে গৃহীত (সাল্ম ৩৭:২৯)
২. মার্ক-এর গস্‌পেল একটি আয়াতে বলে: '*ধরিত্রী নিজের জন্য নিজ থেকেই ফল আনয়ন করে; প্রথমে পত্র, অতঃপর মঞ্জুরী বা শিষ ও তারপর সেই মঞ্জুরী থেকে পূর্ণাঙ্গ শস্য*' (মার্ক ৪:২৪)। কোরানে এর উপস্থাপনা হয়েছে এভাবে: 'ওগুলো *হলো বীজ যা থেকে অঙ্কুর জন্মায়, অতঃপর মঞ্জুরির মধ্যে তাকে এবং তার বৃদ্ধিকে ঋজু করে এবং বৃন্তের উপর বেড়ে উঠে*' (কোরান ৪৮:২৯)।
৩. যিশু বলেছেন: '*একটি উটের সুঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ একজন ধনী ব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশের তুলনায় সহজ হবে*' (ম্যাথিয়ু ১৯:২৪)। কোরান বলে: '*স্বর্গের দুয়ার খুলবে না তাদের জন্য যারা আমাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়; সুঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ তাদের স্বর্গ গমনের চেয়ে সহজতর হবে।*' (কোরান ৭:৪০)।
৪. বাইবেল বলে: '*শেষ বিচারের দিন সমগ্র নভোমণ্ডল গড়াতে গড়াতে (কাগজের) বেলুনাকার ধারণ করবে*' (ঈসাঃ ৩৪:৪)। কোরান বলে: '*সেদিন আমরা (অর্থাৎ আল্লাহ) আসমান-জমিনকে সঙ্কুচিত করব একটা কাগজের বেলুনাকারে*' (কোরান ২১:১০৪)।
৫. বাইবেল বলে: '*যেখানে দুই বা তিন ব্যক্তি মিলিত হয়, আমিও তাদের মধ্যে থাকি*' (ম্যাথিয়ু ১৮:২০)। কোরান বলে: '*তিন ব্যক্তি গোপনে একত্রিত হতে পারে না, কারণ ঈশ্বর সেখানে হন চতুর্থ (ব্যক্তি)*' (কোরান ৫৮:৭)।
৬. বাইবেল বলে: '*যিশু আরো অনেক কিছুই করে গেছেন, তার সবকিছু লিখা হলে আমার ধারণা সমগ্র পৃথিবীও সে বইটি ধারণ করতে পারবে না*' (জন ২১:২৫)। কোরান বলে: '*সমুদ্রের সব পানিও যদি কালি হতো, তাও ঈশ্বরের বাণী লিপিবদ্ধ করতে অপর্যাপ্ত হতো*' (কোরান ১৮:১০৯)।

ইসলামে গৃহীত খ্রিষ্টান পরিভাষা বা শব্দাবলি

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো পরিভাষাও প্রচলিত খ্রিষ্ট ধর্মীয় পরিভাষা থেকে ধারকৃত। 'ইসলাম' (মুসলিমও)-এর অর্থ 'ঈশ্বরের কাছে নত হওয়া' যার উদ্ভব সেমিটিক স্‌ল্‌ম (SLM) শব্দ থেকে, যা খ্রিষ্ট ধর্মে 'ঈশ্বরের কাছে উসর্গন' অর্থে ব্যবহৃত হতো। 'কোরান' শব্দটির উদ্ভব আরামাইক বা সিরীয় শব্দ 'কেরানা' থেকে, যা তৎকালীন খ্রিষ্টান প্রথানুযায়ী গীর্জায় (চার্চে) ধর্মানুষ্ঠানে 'পবিত্র গ্রন্থ পাঠ' অর্থে ব্যবহৃত হত। 'সূরা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে খ্রিষ্টধর্মে ব্যবহৃত আরামাইক শব্দ 'সুত্‌রা' থেকে, যার অর্থ ছিল ধর্মগ্রন্থের অংশ বিশেষ। 'আয়াত' (aya) অর্থ 'ভার্স' বা 'চিহ্ন' (sign), এবং সেটিও খ্রিষ্টান প্রথা থেকে নেয়া হয়েছে। ইসলামের আরও কতকগুলো পরিভাষা সে সময় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা ব্যবহার করতো।

কোরানে যিশু এবং বাইবেলের প্রতি সুদৃষ্টি: কোরান যিশু ও বাইবেলকে যথেষ্ট মর্যাদার আসন দিয়েছে, যার কিছু ধারণা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। কোরান বলে যে, '*ঈশ্বর মানবজাতির জন্য করুণার নিদর্শনরূপে যিশুকে প্রেরণ করেন*' (কোরান ১৯:২১)। কোরান বলে যে, গস্‌পেল ('ইভান্‌জেল' থেকে 'ইন্‌জিল') একটি স্বর্গীয় পুস্তক, যা যিশুর উপর নাজিল করা হয় এবং যারা একে অনুসরণ করে তাদের অন্তরে ঈশ্বরের করুণা বা অনুকম্পা বর্ষিত (কোরান ৫৭:২৭)। কোরান খ্রিষ্টান গস্‌পেল বা যিশুর উপদেশাবলিকে মানবজাতির দিক নির্দেশক হিসেবে নিশ্চিত করেছে (কোরান ৩:৩), যা সত্য ধারণ করে (কোরান ৯:১১১) এবং আলোক ও পথ নির্দেশ দেয় (কোরান ৫:৪৬)। কোরান কুমারীমাতা মেরীকে (মরিয়মকে) অত্যন্ত সম্মানিত নারীরূপে গণ্য করে। বিশ্বের সকল নারীর উপরে মেরীকে স্থান দিয়ে কোরান বলে: *তিনি ঈশ্বর কর্তৃক বিশুদ্ধ হয়েছিলেন* (কোরান ৩:৩৭) এবং সে বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছিলেন (কোরান ৬৬:১২)। মেরী ছিলেন একজন সাধিকা নারী (কোরান ৫:৫৭)। ঈশ্বর তাঁর গর্ভে নিজের তেজ বা সত্ত্বা অন্তর্হিত করেছিলেন (ফু দিয়ে) যিশুকে সৃষ্টির জন্যে; সুতরাং যিশুর জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরের সৃজনশীল কর্মরূপে এক অকলঙ্ক কুমারী নারীর গর্ভে ও তাঁর কুমারীত্ব অটুট রেখে (কোরান ১৯:২১, ২১:৯১)। কোরান ঘোষণা করে: '*যারা গস্‌পেল (যিশুর ধর্মোপদেশ) অনুসরণ করবে তারা আসমান ও জমিন উভয়েরই প্রাচুর্য্য ভোগ করবে*' (কোরান ৫:৬৯)।

ইসলামে কোনও নূতনত্ব নেই: উপরোক্ত আলোচনা এটা স্পষ্ট করে তুলে যে, বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাধারা ও ধর্মচর্চা – যেমন খ্রিষ্টান, ইহুদি, জরথুষ্ট্রবাদ, হানিফি, পৌত্তলিক এবং প্রচলিত উপকথা ও পৌরাণিক কাহিনী, যা মোহাম্মদের সময় আরবে প্রচলিত ছিল – তার সবগুলোই কোরানে স্থান পেয়েছে, তা অবিকৃতভাবেই হোক কিংবা পরিবর্তিতরূপে। বস্তুতঃ হোক ইসলাম আল্লাহ-প্রেরিত ঐশীবাণীতে সৃষ্ট কিংবা মোহাম্মদ কর্তৃক উদ্ভাবিত – কিন্তু এতে প্রায় কোনই নতুনত্ব নেই। ইসলামে সংযোজিত এমন মতবাদ, আচার বা চর্চা খুবই কম, যা সে সময়ে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-প্রথা ও জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী বা উপকাহিনীগুলোতে বিদ্যমান ছিল না। আল্লাহ ও মোহাম্মদ কেবল বিদ্যমান ধারণা, চিন্তাধারা ও চর্চাসমূহ ইসলামে অঙ্গীভূত করেছেন। এই ক্ষেত্রে ইগ্‌নাস গোল্ডজিহার ও স্যামুয়েল জুয়েমারের মত বিজ্ঞ

[১১৮]. Ibid, p. 93

পণ্ডিতদের মতামত যে *মোহাম্মদ কোনও নতুন ধারণার জন্ম দেন নি, বরং তিনি বিদ্যমান ধারণা ও চর্চাসমূহের মিশ্রণে ইসলাম সংকলন করেছিলেন* – সেটা সঠিক প্রতীয়মান হয়। এর সাথে একমত হয়ে ইব্নে ওয়ারাক লিখেন:

> মোহাম্মদ কোন মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন না; তিনি কোন নতুন নৈতিক তত্ত্ব দেননি, বরং তিনি কেবল বিদ্যমান সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে ধার করেছিলেন। ইসলাম যে (অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে) সারগ্রহণে সংকলিত তা দীর্ঘদিন স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি মোহাম্মদও জানতেন ইসলাম কোন নতুন ধর্ম ছিল না, বরং কোরানে বিধৃত তথাকথিত প্রত্যাদেশ পূর্বে বিদ্যমান ধর্মগ্রন্থসমূহের সত্যতা জ্ঞাপন মাত্র। নবি সব সময় ইহুদি, খৃষ্টান ও অন্যান্য মহান ধর্মসমূহের সঙ্গে সম্বন্ধের দাবি করেন।[১১৫]

খ্রিষ্টধর্ম স্পষ্টতঃই মোহাম্মদের ধর্মপ্রচারকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছিল, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মক্কার পৌত্তলিকতাকে সংস্কার করা। খ্রিষ্টান মতবাদ ও চর্চাসমূহ ইসলামে সবচেয়ে বেশী অঙ্গীভূত হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন খ্রিষ্টানরা যে ইসলামকে তাদের ধর্ম থেকে উদ্ভূত পথভ্রষ্ট এক ধর্ম মনে করতেন, সেটা যথার্থই ন্যায়সঙ্গত ছিল।

কোরানে খ্রিষ্টানবাদের নিন্দা

কোরানের মোট ১১৪টা সুরা বা অধ্যায়ের মধ্যে প্রায় ২০টি প্রেরিত হয়েছিল মোহাম্মদের নবুয়তির প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে। এ আয়াতগুলোতে খ্রিষ্টতত্ত্বের উল্লেখ খুব কম। কেবল ৬১৫ সালে মোহাম্মদ তাঁর কিছু শিষ্যকে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত আবিসিনিয়ায় পাঠানোর সামান্য আগে থেকে শুরু করে ও এর পরে রচিত আয়াতগুলোতে বাইবেলের তত্ত্ব ও কাহিনীসমূহের সত্যতা ঘোষণা করতে থাকেন। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকে তাঁর মদীনায় স্থানান্তরের অল্পকাল পর পর্যন্ত।

এটাও একটা কারণ হতে পারে যে, মোহাম্মদ যখন দেখলেন মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁর ধর্মের পতাকাতলে আসবে না, তখন তিনি দৃষ্টি ফেরালেন খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের প্রতি – এ বিশ্বাসে যে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিলে ও তা কোরানে সংযোজিত করলে তারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হতে পারে। আবিসিনিয়ায় স্বাগত ও আতিথেয়তা প্রাপ্ত মুসলিম শরণার্থীদের ভবিষৎ নিরাপত্তা বজায় রাখতেও আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ রাখা একটা কৌশলগত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবিসিনিয়ার সঙ্গে কোরাইশদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। বলা হয় যে, কোরাইশরা আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজার নিকট একটা প্রতিনিধিদল পাঠায় সেখানে আশ্রিত মুসলিমদের বহিষ্কার বা মক্কায় ফেরৎ পাঠানোর অনুরোধ করে। তারা রাজার কাছে অভিযোগ করে যে, মুসলিমরা একটা বিপথগামী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করছে। রাজা কোন ব্যবস্থা নেয়ার আগে তাদের ধর্মীয় পথভ্রষ্টতার প্রমাণ চান। মুসলিম শরণার্থীদেরকে রাজ দরবারে ডেকে তাদের ধর্মীয় মতবাদের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাদের মুখপাত্র জাফর ধূর্ততার সাথে 'সূরা মরিয়ম' থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনায়। এ সূরায় খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাসের সত্যতা জ্ঞাপনপূর্বক কুমারীমাতা মেরি, জন দ্য বাপটিস্ট ও যিশুর অলৌকিক জন্মের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাজা এতে সন্তুষ্ট হয়ে মুসলিম শরণার্থীদেরকে বহিষ্কার করতে অস্বীকার করেন।[১১৬]

কোরানে বেশ কয়েক বছর ধরে খ্রিষ্টধর্মের সত্যতা জ্ঞাপন করে তাদেরকে ইসলামে আহবান করলেও খ্রিষ্টানরা (ইহুদিরাও) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় তাঁর ধর্মে যোগ দেয় নি। মদীনায় পুনর্বাসিত হওয়ার পর প্রায় এক বছর পর্যন্ত মোহাম্মদ খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের ইসলামে আনয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। বরঞ্চ তাঁর আয়াতগুলোতে তাদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক ভুল থাকায় তারা মোহাম্মদকে হয়রানি করতে শুরু করে (ইহুদিদের কর্তৃক হয়রানির আলোচনা হয়েছে উপরে)। তারা মোহাম্মদের বিশিষ্ট সমালোচক ও জ্বালাতনকারী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তাদের প্রতি তাঁর মনোভাব কঠোর হতে শুরু করে। খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্ম থেকে প্রচুর ধার করা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণে তাদের উদাসীনতার কারণে তিনি এখন তাদের নিন্দা করতে দ্বিধা করেন না। তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে তাদের ধর্মগ্রন্থ ভুল বুঝা কিংবা বিস্মৃত হওয়ার অভিযোগ তুলেন (কোরান ৫:১৪)। 'ট্রিনিটি' তত্ত্ব সম্পর্কে আপন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে (তিনি মনে করতেন খ্রিষ্টানরা 'তিন ঈশ্বরে' বিশ্বাস করে) তিনি খ্রিষ্টানদের আক্রমণ করেন: '*অবশ্যই তারা নাস্তিক, যারা বলে যে ঈশ্বর তিনজনের মধ্যে তৃতীয়*' (কোরান ৫:৭৩); এবং পরামর্শ দেন: '*সুতরাং আলাহ ও তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহককে বিশ্বাস করো এবং তিন (ঈশ্বর)-এর কথা বলো না*' (কোরান ৪:১৭১)।

ইহুদিদের চিন্তাধারার মত মোহাম্মদ এবার যিশুর ঐশ্বরিকতা ও পুনরুত্থানের তত্ত্ব অস্বীকার করেন। কোরান বলেঃ '*যিশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন না, কারণ ঈশ্বর জন্ম দেন না*' (কোরান ১১২:৩)। আরেক আয়াত বলে: '*সন্তান জন্ম দেওয়া আল্লাহর মহানত্বের সঙ্গে মানানসই নয়*' (কোরান ১৯:৩৬)। আল্লাহ আরো বলেন: '*ঈশ্বরের সন্তান থাকা তাঁর গৌরবকে হীন করে*' (কোরান ৪:১৭১)। ইবনে ইসহাক একটা কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যেক্ষেত্রে মোহাম্মদ দু'জন খ্রিষ্টধর্ম যাজককে ঈশ্বরের পুত্র আছে এমন বিশ্বাস করায় তিরস্কার করেন। তখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করেন: ''*তাঁর পিতা কে ছিলেন, মোহাম্মদ?*'' তিনি নিজে ছিলেন কুমারীমাতা মেরীর গর্ভে যিশুর জন্মের সত্যতা জ্ঞাপনকারী। তাদের এ আকস্মিক ও কঠিন প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর না পেয়ে তিনি নীরব থাকেন।[১১৭] প্রশ্নটার একটা যোগ্য উত্তর যোগাতে তাঁর সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং পরে একটা আয়াত নাজিল হয় এ সম্পর্কে, যাতে বলা হয়: '*ঈশ্বর যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ যখন একটা বিষয়ে ভাগ্যলিপি করেন, তিনি তা সৃষ্টি করেন যখন ইচ্ছা তখন; যখন তিনি কোনও পরিকল্পনা করেন, শুধু বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়*' (কোরান ৩:৪৭)।

কোরান এখন খ্রিষ্টানদের উপর – যারা বলে যিশু ঈশ্বরের পুত্র – আল্লাহর অভিশাপ বা গজব কামনা করে (কোরান ৯:৩০)। মোহাম্মদ যিশুর ক্রুশবিদ্ধতার সত্যতা প্রত্যাখান করেন। যেমন কোরান বলে: '*তারা তাঁকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি*'; বরং '*আল্লাহ তাঁকে নিজের*

---

[১১৫]. Ibn Warraq (1995) *Why I am not a Muslim*, Prometheus Books, New York, p. 34

[১১৬]. Walker, p. 109

[১১৭]. Ibid, p. 199

কাছে তুলে নেন' আপাতদৃষ্টে ক্রুশবিদ্ধকালে (কোরান ৪:১৫৭-৫৮)। এ ধারণা নকল করা হয়েছে মনিবাদ থেকে, যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বুঝা উচিৎ যে, মানবজাতির পাপের জন্য যদি যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা অস্বীকার করা হয়, তাহলে খ্রিষ্টান ধর্ম তার দাবীকৃত মহত্ত্বের বিরাট অংশ হারিয়ে ফেলে।

খ্রিষ্টানদের প্রতি মোহাম্মদের শত্রুতা

খ্রিষ্টানদের দ্বারা তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রত্যাখান ও সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে মোহাম্মদ খ্রিষ্টান ধর্মের অনেক মতবাদের শুধু নিন্দা করেই শান্ত থাকেন নি। খ্রিষ্টান যাজক বা সন্ন্যাসীরা, যারা মোহাম্মদের ধর্মে যোগ দিতে খ্রিষ্টানদেরকে নিরুৎসাহিত করছিলেন, তারা এখন লোভী ও জনগণের সম্পদগ্রাসী বলে মোহাম্মদ তাদেরকে নিন্দা করেন। যেমনটা কোরান বলছে: *'(খ্রিষ্টান) সন্ন্যাসীরা বেপরোয়াভাবে মানবজাতির সম্পদ গ্রাস করে ও 'আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর পথে ব্যয় না করে যারা সোনা-রূপা জমায়, তাদেরকে (হে মোহাম্মদ!) যন্ত্রণাময় ধ্বংসের খবর দাও'* (কোরান ৯:৩৪)।

আল্লাহ তাঁর সত্যধর্ম (ইসলাম) প্রসারে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় খ্রিষ্টানদের নিন্দা শুরু করে তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করেন (কোরান ৯:৩০)। খ্রিষ্টানদের প্রতি আল্লাহর মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং নতুন প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে মুসলিমদের মাঝে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে শুরু করেন: *'হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা তাদেরকে অভিভাবক করো না, যারা তোমাদের আগে ধর্মগ্রন্থ পেয়েছে (খ্রিষ্টান, ইহুদি) ...যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও, আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে স্থির থাকো'* (কোরান ৫:৫৭)। আল্লাহ এখন খ্রিষ্টানদেরকে সত্য লংঘনকারী বলে অভিশাপ দিয়ে নরকে প্রেরণ করেন, যেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে (কোরান ৫:৭৭, ৯৮:৬)।

ইসলামের ধূর্ত পণ্ডিতরা সাধারণত কোরানে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি অনুকূল আয়াতগুলো উল্লেখ করে ইসলামকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অত্যন্ত মিত্র ভাবাপন্ন প্রমাণ করতে। স্পষ্টতঃ ঐ আয়াতগুলো পরিকল্পিতভাবে রচিত হয়েছিল খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে তাদেরকে ইসলামে যোগ দেওয়ার ও মোহাম্মদকে নবি হিসেবে মেনে নেওয়ার আহ্বান করতে। কিন্তু তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে আল্লাহর বেপরোয়া প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন তিনি অনেকগুলো বিদ্বেষপূর্ণ ও হিংসা-উত্তেজক আয়াত স্বর্গ থেকে প্রেরণ করেন, যা ঐ সব পণ্ডিতরা কখনও উল্লেখ করে না। এমন কিছু বিদ্বেষপূর্ণ আয়াতের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

১. ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা দেবমূর্তি ও মিথ্যা দেবদেবীতে বিশ্বাসী। (কোরান ৪:৫১)
২. 'ওরা (খ্রিষ্টান ও ইহুদি) তারাই, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন।' (কোরান ৪:৫২)
৩. আল্লাহ খ্রিষ্টানদের মাঝে বিদ্বেষ ও ঘৃণা জাগ্রত করেছেন। (কোরান ৫:১৪)
৪. ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট। (কোরান ৫:৫৩)
৫. খ্রিষ্টানরা দোযখের আগুনে পুড়বে। (কোরান ৫:৭২)
৬. ট্রিনিটির ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা ভ্রান্ত, যার জন্যে তারা কঠিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। (কোরান ৫:৭৩)
৭. খ্রিষ্টান, ইহুদি বা অবিশ্বাসীদের অভিভাবক নিযুক্ত কোরো না। (কোরান ৫:৫৭)
৮. ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের বন্ধু রূপে গ্রহণ কোরো না। যদি তোমরা তা করো, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের একজন মনে করবে। (কোরান ৫:৫১)
৯. খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা পথভ্রষ্ট। আলাহ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। (কোরান ৯:৩০)
১০. ধনী ও লোভী খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের জন্য ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে। (কোরান ৯:৩৪)
১১. ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা সীমা লংঘনকারী। (কোরান ৫:৫৯)
১২. অপকর্ম হলো ইহুদি রাব্বী ও খ্রিষ্টান যাজকদের পারদর্শিতা। (কোরান ৫:৬৩)
১৩. আল্লাহ মোহাম্মদের উপর যা নাজিল করেছেন খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের তা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। না করলে আল্লাহ তাদেরকে বানর বা উল্লুকে পরিণত করবেন, যেমনটা তিনি করেছিলেন সাবাথ ভঙ্গকারীদের ক্ষেত্রে। (কোরান ৪:৪৭)
১৪. খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও যতদিন না অপমানে নত হয়ে তারা বশ্যতা কর (জিজিয়া) দেয়। (কোরান ৯:২৯)

মৃত্যুশয্যায় মোহাম্মদের খ্রিষ্টানবিরোধী বিদ্বেষ

খ্রিষ্টানদের প্রতি নবি মোহাম্মদের বিদ্বেষ তাঁর মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অন্তিম শয্যায় উপনীত নবি সারারাত যন্ত্রণায় ও বিলাপে চিৎকার করতে থাকেন। যন্ত্রণাকাতরদেরকে মোহাম্মদ যেভাবে সান্ত্বনা দিতেন, সেই সুরে স্ত্রী আয়শা তাঁকে বলেন: *"হে নবি! যদি আমাদের মধ্যে কেউ এ রকম বিলাপ করতো তখন আপনি নিশ্চয়ই তাকে তিরস্কৃত করতেন।"* তিনি উত্তর করেন: *"কিন্তু আমি জ্বরের আগুনে দ্বিগুণ যন্ত্রণায় পুড়ছি।"*[১১৮] পরদিন সকালে যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেলে তিনি প্রায় অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর অপর এক স্ত্রী উম্মে সালমা আবিসিনিয়ার একটি ঔষধের মিশ্রণ খাওয়ানোর পরামর্শ দেন, যা তিনি সেখানে নির্বাসিত থাকাকালে শিখেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা হুশ ফিরে পেয়ে মোহাম্মদ তাঁকে যা পান করানো হয়েছে তার ব্যাপারে সন্দিহান হন ও ঘরে উপস্থিত সব মহিলাকে সেটা খাওয়ানোর নির্দেশ দেন। তাঁর উপস্থিতিতে প্রত্যেক মহিলার মুখে ঔষধটি ঢেলে দেওয়া হলো।

আবিসিনিয়ার ঔষধের এ আলোচনা শেষ পর্যন্ত গড়ায় আবিসিনিয়ার বিষয়ে আলোচনায়। তাঁর দুই স্ত্রী উম্মে সালমা ও উম্মে হাবিবা ওই দেশে নির্বাসিতা ছিলেন। তাঁরা সেখানকার সুন্দর মরিয়ম ক্যাথেড্রাল বা গীর্জা এবং তার দেয়ালের বিস্ময়কর ছবির কথা বলেন। তাঁদের

[১১৮]. Ibid, p. 141

কথাবার্তা শুনে ক্রোধোন্মত্ত মোহাম্মদ চিৎকার করে উঠেন: "*হে প্রভু! ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধ্বংস করো। প্রভুর ক্রোধ তাদের উপর প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠুক। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম না থাকুক।*"[১১৯] নবির এ অন্তিম ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন আরব ভূখণ্ড থেকে সকল খ্রিষ্টান ও ইহুদির বিতাড়নের মাধ্যমে।

খ্রিষ্টান শাসকদের কাছে মোহাম্মদের হুমকিপত্র

৬২৮ সালে, যখন মোহাম্মদ মক্কা দখলের মত শক্তিও অর্জন করে উঠেন নি, তখন তিনি ইয়ামামা, ওমান ও বাহরাইনের রাজাদের কাছে তাঁর নবুয়তির ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দূত মারফত চিঠি পাঠান। বাহরাইন ও ওমান থেকে তিনি তেমন কোন আশ্বাস পান নি। ইয়ামামার খ্রিষ্টান প্রধান ও তৎকালে সে অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তি হাউদা ইবনে আলী মোহাম্মদের নবুয়তির ভাগ চান। হাউদার উত্তর পেয়ে মোহাম্মদ তাঁকে অভিশাপ দেন ও এক বছর পর হাউদা মারা যান। ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তিনি অন্যান্য বিদেশী শাসকদের কাছেও পত্র পাঠান: যেমন রোমের (ইস্তাম্বুলের) সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে এবং ঘাসানিথের যুবরাজ সপ্তম হারিথ ও মিশরের খ্রিষ্টান গভর্নরের কাছে। রোম ও ঘাসান শাসকরা তিরস্কারের সাথে সে পত্রকে 'এক পাগলের বার্তা' আখ্যা দেন। মিশরের রোমান গভর্নরও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু মোহাম্মদের কাছে উপহার স্বরূপ দুই পরম সুন্দরী দাস-বালিকাসহ তাঁর পত্রের বন্ধুত্বপূর্ণ উত্তর দেন। নবি যৌন-দাসীরূপে মিশরীয় সুন্দরী খ্রিষ্টান তরুণী মারিয়াকে তাঁর হেরেমের অন্তর্ভূক্ত করেন।

খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের যুদ্ধাভিযান

পরবর্তিতে মুসলিমরা ক্ষমতাবান হলে, যেসব খ্রিষ্টান শাসক মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণের আহ্বান-পত্র প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের সবার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধাভিযান চালান। কিন্তু মিশরীয় গভর্নরের কাছ থেকে সুন্দরী মারিয়াকে উপহার পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ায়, তিনি কখনোই মিশর আক্রমণ করেন নি, যদিও তাঁর মৃত্যু পর ইসলামের শাসকরা মিশর আক্রমণ করে।

৬২৯ সালের সেপ্টেম্বরে মোহাম্মদ সিরিয়ার সীমান্তবর্তী মুতায় ৩,০০০ জিহাদীর একটা শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। মোহাম্মদ তাঁর কমাণ্ডারদের প্রথমে খ্রিষ্টানদেরকে ইসলামে আহ্বান করার নির্দেশ দেন। তারা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাতে বলেন। খ্রিষ্টানরা মুসলিম হামলাকারীদের মুকাবিলার জন্য এক বিশাল বাহিনী সমাবেত করেছিল। এ যুদ্ধে মুসলিমরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধান দুই মুসলিম সেনানায়ক জায়েদ ও জাফর নিহত হন। কেবলমাত্র খালিদ বিন ওয়ালিদের কুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে অবশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধারা জীবন বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হয়।[১২০]

৬৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোহাম্মদ আমর বিন আ'স-এর নেতৃত্বে ওমানের খ্রিষ্টান শাসকদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও কর দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এক বাহিনী পাঠান। তাদের কয়েকটি গোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করে। মাজুনা গোত্রকে খ্রিষ্টধর্ম চর্চার অনুমতি দেওয়া হয় তাদের অর্ধেক জমিজমা ও ধনসম্পদ মুসলিমদের হাতে সমর্পণের শর্তে। একই মাসে হিমিয়ারের খ্রিষ্টান যুবরাজের কাছে তিনি পত্র পাঠান তাকে ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করে প্রয়োজনীয় টাইদ্ (প্রদেয় বাৎসরিক ফসল ও নবজাত পশুর এক দশমাংশ) ও কর দেবার দাবি জানিয়ে। অস্বীকার করলে তাদেরকে আল্লাহর শত্রু আখ্যায়িত করা হয়। তাদেরকে নিজস্ব ভাষা ত্যাগ করে আরবি ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। জীবন বাঁচাতে যুবরাজ ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২১]

৬৩০ সালের অক্টোবর মাসে মোহাম্মদ সিরিয়ার বাইজেন্টাইন সীমান্তে আক্রমণের জন্য ৩০,০০০ ঘোড়া ও পদাতিক মুসলিম যোদ্ধা সমবেত করেন। দুই বছর আগে সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও সিরিয়ার ঘাসানিদ যুবরাজ মোহাম্মদের ইসলাম গ্রহণের বার্তাপত্র প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সিরিয়া সীমান্তের কাছে তাবুক-এ পৌঁছে মোহাম্মদ সেখানে তাঁবু গাড়েন। তিনি আশেপাশের ক্ষুদ্র নৃপতিদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন এই বলে: *হয় ইসলাম গ্রহণ করো নতুবা 'জিজিয়া' কর দাও।* আইলা খ্রিষ্টান গোত্রের যুবরাজ ইওহানা (জন) ইবনে রুবা তার জনগণের উপর মোহাম্মদের আক্রমণ এড়াতে জিজিয়া কর দেওয়ার শর্তে একটা চুক্তি সম্পাদন করেন। মোহাম্মদ তাবুক-এ কুড়ি দিন অবস্থানকালে ছোট ছোট কয়েকটি সম্প্রদায়কে বশীভূত করেন। এরপর মোহাম্মদ তাঁর এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য সিরিয়া আক্রমণের চিন্তা করেন। এ সময় মোহাম্মদের কাছে গুপ্ত খবর আসে যে, এক বিশাল গ্রিক বাহিনী মোহাম্মদের বাহিনীকে মুকাবিলা করতে সীমান্তে সমবেত হয়েছে। এ খবরে তাঁর বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর ভীতিগ্রস্ত যোদ্ধাদের চাপে পিছুপদ হতে হয়।

তাবুকে অবস্থানকালে মোহাম্মদ খালেদ বিন ওয়ালিদকে দুমা মরুদ্যানটি বশীভূত করতে পাঠান। দুমার শাসক ছিলেন কাল্ব গোত্রের আরব খ্রিষ্টান যুবরাজ ওকাইদির বিন আব্দুল মালিক। ওকাইদির ও তার ভাই শিকারে বের হলে পথিমধ্যে খালেদ বিন ওয়ালিদ ওঁৎ পেতে থেকে তাদেরকে আক্রমণ করে: ওকাইদিরের ভাই নিহত হয় এবং ওকাইদিরকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। ওকাইদিরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে প্রথাগত কর প্রদানের জন্য একটা চুক্তি স্বাক্ষর করান। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ওকাইদির বিদ্রোহ করেন। তার অবাধ্যতা ও ধর্মত্যাগের প্রতিশোধ নিতে খালেদ বিন ওয়ালিদ পুনরায় দুমা আক্রমণ করে এবং তার সম্প্রদায়কে পরাস্থ করে ওকাইদিরকে হত্যা করে।

[119]. Ibid, p. 142: also Ibn Ishaq, p. 523
[১২০]. Ibn Ishaq, p. 532-40; Muir, p. 393-95.
[১২১]. Walker, p. 204-05

খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মোহাম্মদের আচরণ

খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মোহাম্মদের ব্যবহারের মানদণ্ড আচ করা যায় ৬৩১ সালে কিছু খ্রিষ্টান প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা ও আচরণের ধরন বিচার করে। ৬৩০ সালে মক্কা দখলের পর গোটা আরবাঞ্চলের আতঙ্কিত গোত্রগুলো প্রতিনিধিদল পাঠাতে থাকে মদীনায় – মোহাম্মদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বনি হানিফা গোত্রের এক প্রতিনিধিদল আসে ফেব্রুয়ারীতে (৬৩১)। তাদের সঙ্গে নবির কী আলোচনা হয়েছিল তা পরিষ্কার নয়। ফিরে যাবার আগে নবি তাদেরকে তাঁর অভিসিঞ্চণের অবশিষ্ট জলপূর্ণ এক পাত্র তাদের দিয়ে আদেশ করেন : তারা তাদের চার্চ ভেঙ্গে ফেলে সে জলপাত্রের পানি ছিটিয়ে দেওয়ার পর যেন সেস্থানে একটা মসজিদ নির্মাণ করে। এক মাস পর আংশিক খ্রিষ্টান তাগলিব গোত্রের ষোল সদস্যের স্বর্ণের ক্রস (ক্রুশ) পরিহিত এক প্রতিনিধিদল মদীনায় মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মোহাম্মদ তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা তাদের ধর্ম ধরে রাখতে পারবে, কিন্তু তাদের সন্তানদেরকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত (বাপটাইজ) করতে পারবে না।[১২২] তার অর্থ হলো, ওই সন্তানরা মুসলিমদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেল। সে বছরে নেজরানের ১৪ সদস্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল মোহাম্মদের কাছে আসেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন কিন্দা গোত্রের আব্দুল মাসিহ্, বকর গোত্রের বিশপ আবু হারিথা ও অভিজাত দাইয়ান পরিবারের এক প্রতিনিধি। মোহাম্মদ তাদেরকে কোরানের একটি অংশ পড়ে শোনালে ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা মেনে নেয় যে, তাঁর লোকদের জন্য তাঁর একটি বার্তা আছে। তিনি তখন তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন, যা তাঁরা প্রত্যাখান করেন। উভয়পক্ষ প্রচুর যুক্তি-তর্ক করে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। শেষে মোহাম্মদ দু'পক্ষের মধ্যে পরস্পরকে অভিশাপ দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দেন, এ মর্মে যে মিথ্যাবাদী পক্ষের জনগণের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে। কিন্তু খ্রিষ্টান দলটি এরূপ নীচ কাজে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়।[১২৩] আল্লাহ কোরানে এ ঘটনাটির বর্ণনা করেছেন এভাবে: '*তোমার কাছে যে জ্ঞানবার্তা এসেছে তা নিয়ে যারা তোমার সাথে তর্ক করে, তাদেরকে বলো: এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের এবং আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নিকটজনদের ও তোমাদের নিকটজনদের ডাকি; অতঃপর আমরা প্রার্থনায় রত হই ও মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর গজবের জন্য প্রার্থনা করি*' (কোরান ৩:৬১)।

যাহোক বিদায় নেয়ার আগে মোহাম্মদ প্রতিনিধিদলকে নিশ্চয়তা দেন যে, তাদের ধর্মচর্চায় বাঁধা দেওয়া হবে না, তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না এবং তাদের ভূমি ও ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে না। কিন্তু পরে ঐ বছরই মোহাম্মদ নেজরানের জনগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দিতে খালিদকে পাঠান। নিষ্ঠুর গণহত্যাকারী হিসেবে খ্যাত খালিদের অভিযানের খবর শুনে তাদের অনেকেই নতি স্বীকার করে। কিন্তু অন্যান্য সীমান্তে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের চাপ থাকায় খালিদকে অন্যত্র মনোযোগ দিতে হয়। ফলে মোহাম্মদের মৃত্যু পর্যন্ত নেজরানের অধিকাংশ লোকই খ্রিষ্টান রয়ে যায়। পরে খলিফা ওমর আরবাঞ্চল থেকে অবশিষ্ট খ্রিষ্টানদের বিতাড়িত করতে নতুন অভিযান শুরু করেন। এ নতুন আক্রমণের মুখে ধ্বংসের ভয়ে নাজরান গোত্রের অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। ৬৩৫ সালে ওমর তাদের অনেক বিশিষ্ট নাগরিক, ধর্মপণ্ডিত ও নেতাদের নির্বাসনে পাঠান।[১২৪]

৬৩২ সালে নবি প্যালেস্টাইন সীমান্তে একটা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণকালে হঠাৎ করে অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকে অন্যান্য ধর্মানুসারীদের উচ্ছেদ করতে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরবর্তি খলিফাগণ কাঁধে তুলে নেন। মুসলিম বাহিনী প্রথমে গোটা আরবের লোকদের শক্তি প্রয়োগে ধর্মান্তরিত করতে ব্রতী হয়। এরপর তাদের নজর পরে মধ্য এশিয়ার খ্রিষ্টান গোত্রগুলোর উপর। মধ্য এশিয় ইয়ামামার মুসাইলিমা নাকি মোহাম্মদের নবুয়তি শুরুর আগেই প্রত্যাদেশিত হয়ে একটা মূলতঃ খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করছিলেন। তিনি মোহাম্মদকে নবি স্বীকৃতি দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি বিদ্বেষ এড়াতে নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের আবেদন জানান। মুসাইলিমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মোহাম্মদ উত্তরে লিখেন: '*ঈশ্বরের নবি মোহাম্মদের নিকট থেকে মিথ্যুক মুসাইলিমার প্রতি... পৃথিবীটা ঈশ্বরের। তাঁর ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কে এর উত্তরাধিকারী হবে এবং অবশ্যই সে হবে প্রকৃত ধার্মিকরা।*'[১২৫]

জানা যায়, মুসাইলিমা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন; তাঁর অনুসারীদের শক্তি মোহাম্মদের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। আবু বকর মুসাইলিমার বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন, কেননা ইতিমধ্যে মুসাইলিমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নতুন ধর্ম ইসলামের প্রভাব অনেকটা হ্রাস করছিল। ইয়ামামার প্রথম যুদ্ধে মুসাইলিমার অনুসারীদের কাছে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। ৬৩৪ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধে মুসলিমরা এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে যে, মদীনায় খুব কম বাড়িই ছিল যেখান থেকে বিলাপ শোনা যায় নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, এ যুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট কোরান মুখস্তকারী মোহাম্মদের ৩৯ জন প্রধান সঙ্গী (সাহাবা) নিহত হন। এর কয়েক মাস পর ৬৩৪ সালে আবু বকর ভয়ঙ্কর খালেদের নেতৃত্বে মুসাইলিমাকে উৎখাত করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। দুপক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটে আকরাবায়, পরে যা 'গার্ডেন অব ডেথ' বা 'মৃত্যু বাগিচা' নামে খ্যাত হয়। মুসাইলিমাসহ তাঁর দশ হাজার যোদ্ধা নিহত হয় এবং অবশিষ্ট লোকদের সবাইকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়।[১২৬] এরপর আরবাঞ্চলে খ্রিষ্ট ধর্মানুসারীদের আর কোন উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল না।

---

১২২. Muir, p. 458
১২৩. Ibid, p. 458-60
১২৪. Walker, p. 207
১২৫. Ibn Ishaq, p. 649
১২৬. Ibid, p. 209

মোহাম্মদ কর্তৃক স্বীকৃত ইসলামে অমুসলিমদের অবস্থান বা মর্যাদা

অমুসলিমদের সাথে মোহাম্মদের আচরণের উপর ভিত্তি করে এখন আমরা আরব উপদ্বীপের পৌত্তলিক, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে তিনি যে মর্যাদা দিয়েছিলেন, তা মূল্যায়ন করতে পারি।

ইসলামে পৌত্তলিকদের অবস্থান

নবি মোহাম্মদ মক্কার পৌত্তলিকদের মাঝে দীর্ঘ তের বছর ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করে বেশীদূর অগ্রসর হতে ব্যর্থ হন। মক্কার অধিকাংশ লোক তাঁর বার্তা প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু তাঁর বার্তা মক্কাবাসীদের প্রচলিত ধর্ম, প্রথা ও পূর্বপুরুষদের প্রতি ঘৃণাব্যাঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও এবং কা'বাকে তাঁর ঈশ্বরের মালিকানাধীন দাবি করলেও, মক্কাবাসীদের কাছ থেকে তাঁকে কখনো সহিংস বিদ্বেষের মুখোমুখি হতে হয়নি। কোরাইশরা তাঁর উপর কেবল একটিমাত্র শত্রুতার নজির স্থাপন করেছিল – যেটা ছিল মোহাম্মদের সম্প্রদায়ের উপর দুই বছরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবরোধ আরোপ – যা অনেকটা সভ্য ও ভদ্রোচিত পন্থা। মক্কার পৌত্তলিকরা মোহাম্মদের বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ও কার্যকলাপের মুখে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল। মক্কায় তাঁর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সার্থকতার কোন আশা না দেখে ও মদীনায় তাঁর অনুপস্থিতিতেই ইসলামের ভাল অগ্রগতি দেখে তিনি ৬২২ সালে মদীনায় পাড়ি জমান। আল্লাহ পরে মক্কাবাসীর ইসলাম প্রত্যাখ্যানকে 'বিশৃংখলা সৃষ্টি ও নিপীড়ন' আখ্যা দিয়ে তাকে 'হত্যার চেয়েও সাংঘাতিক' বিবেচনা করেন। তাদের ইসলাম প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ মক্কাবাসীদেরকে আক্রমণ ও হত্যার অনুমোদন দেন (কোরান ২:১৯০-৯৩)। মক্কাবাসীকর্তৃক আল্লাহর নতুন ধর্ম প্রত্যাখ্যান তাঁর দৃষ্টিতে এতটাই গর্হিত ও ক্ষমার অযোগ্য ছিল যে, তিনি প্রত্যাখ্যানকারীদের হত্যা করা মুসলিমদের জন্য অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেন – সেটা মুসলিমরা পছন্দ করুক বা নাই করুক (কোরান ২:২১৬)। আল্লাহ মক্কার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের হত্যা করাকে বৈধ করেন, এমনকি যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও, যেমন ঘটেছিল নাখলায় ইসলামের প্রথম সফল জিহাদী হামলা ও হত্যাকাণ্ড (কোরান ২:২১৭)।

নাখলার বিতর্কিত, অথচ সফল, রক্তাক্ত জিহাদের পর বেশ কয়েকটি বড় আকারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় মদীনার মুসলিম ও মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে: যেমন বদরের যুদ্ধ (৬২৪), ওহুদের যুদ্ধ (৬২৫) ও খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭)। এসব সংঘাত বা যুদ্ধের পরিণাম হিসেবে ৬৩০ সালে মোহাম্মদ মক্কা বিজয়ে সক্ষম হন। তিনি কোরাইশদের পবিত্র দেব-মন্দির কা'বা দখল করে তাতে স্থাপিত দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ ধ্বংস করেন। এভাবে তিনি কা'বাকে ইসলামের ঈশ্বর আল্লাহর পবিত্র ঘরে রূপান্তরিত করেন।

সেদিন যদিও অনেক পৌত্তলিক ইসলাম গ্রহণ করে, মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে যারা পৌত্তলিকতা চর্চা অব্যাহত রাখতে চায়, তাদেরকে মোহাম্মদ অনুমতি দিয়েছিলেন। এ ছাড়পত্র এক বছর টিকে থাকে। ৬৩১ সালের পরবর্তী হজ্জ্ব পালনের সময় আল্লাহ হঠাৎ বেশ কয়েকটি আয়াত নাজিল করেন – যেমন আয়াত ৯:১-৫, বিশেষত আয়াত ৯:৫ – যাতে পৌত্তলিকদের ইসলাম গ্রহণ বা মৃত্যু, এ-দুইয়ের একটি বেছে নেয়ার নির্দেশের মাধ্যমে মূর্তিপূজা নির্মূল করা হয়। আয়াত ৯:৫ বলে: '*অতঃপর যখন পবিত্র মাস গত হবে, পৌত্তলিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দি করবে ও আটক করবে এবং তাদের জন্য সর্বত্র ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি অনুশোচিত হয় ও (আল্লাহর) উপাসনায় লিপ্ত হয়, এবং গরীবদের প্রাপ্য (যাকাত) দান করে, তাহলে তাদের পথ মুক্ত করে দাও।*'

এ নির্দেশের ফলে মোহাম্মদের জীবদ্দশাতেই আরব দেশ থেকে মূর্তিপূজা নির্মূল করা হয়। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু – এ দুটোর একটি বেছে নেওয়া মূর্তিপূজক, পৌত্তলিক, প্রাণীবাদী ও নাস্তিকদের প্রতি ইসলামের আদর্শ বিধান।

ইসলামে ইহুদিদের মর্যাদা

নবি মোহাম্মদ প্রাথমিক অবস্থায় ইহুদিদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও তাকে নবি হিসেবে মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। তারা তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তিনি তাদের উপর কঠোর হয়ে উঠেন। বদরের যুদ্ধে অভূতপূর্ব বিজয়ের পরপরই তিনি প্রথম মদীনার ইহুদি গোত্র বানু কাইনুকা-কে আক্রমণ করেন। তারা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে মোহাম্মদ তাদেরকে হত্যা করতে চান। আল-তাবারি লিখেছেন: '*তাদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছিল এবং মোহাম্মদ তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।*'[১২৭] কিন্তু ইসলামে ঘোষিত সুবিখ্যাত ভণ্ড আব্দুল্লাহ বিন ওবাই-এর জোর হস্তক্ষেপে মোহাম্মদ ইহুদিদেরকে গণহত্যা করা থেকে বিরত হতে বাধ্য হন। তৎপরিবর্তে তিনি গোটা কাইনুকা গোত্রটিকে পৈত্রিক বাড়ি-ঘর থেকে নির্বাসনে পাঠান।

পরবর্তি বছর এক ভূয়া অজুহাতে মোহাম্মদ মদীনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী বানু নাদিরকে আক্রমণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন ওবাই তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী নেতা ছিলেন। তিনি ইহুদিদের পক্ষে যুদ্ধ করারও হুমকি দেন। এমতাবস্থায় নবি আবারো তাদেরকে হত্যা না করে নির্বাসনে পাঠান। এর দু'বছর পর মোহাম্মদ যখন মদীনার সর্বশেষ ইহুদি গোষ্ঠী বানু কোরাইজাকে আক্রমণ করেন, তখন দূর্বল হয়ে পড়া আব্দুল্লাহর নিন্দাকে অগ্রাহ্য করে মোহাম্মদ তাঁর মূল পরিকল্পনায় ফিরে যান – যা তিন বছর আগে তিনি বানু কাইনুকা গোত্রের উপর প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি সাবালক সমস্ত ইহুদিকে হত্যা করেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস বানান। বানু কোরাইজা ইহুদিদের আটককৃত ধনসম্পদ এবং নারী ও শিশুদেরকে তাঁর শিষ্যদের মাঝে বিতরণ করে দেন। নারীদের মধ্যে যারা তরুণী ও সুন্দরী ছিল, তাদেরকে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নবি ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য কিছু বন্দি নারীকে বিদেশে বিক্রি করে দেন।

---

[১২৭]. Al-Tabari, Vol. VII, p. 86

মোটকথা, ইহুদিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে মোহাম্মদ একের পর এক তাদের গোত্রগুলোকে আক্রমণ করেন ও তাদের সাবালক পুরুষদের হত্যা এবং নারী-শিশুদের দাস বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। মোহাম্মদের দৃষ্টিতে এটাই হয়ে দাঁড়ায় ইসলামে ইহুদিদের মর্যাদার চূড়ান্ত বিধিলিপি।

ইসলামে খ্রিষ্টানদের মর্যাদা

মক্কা ও মদীনায় সে আমলে খ্রিষ্টানদের উপস্থিতি খুব বেশি ছিল না। সুতরাং খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মোহাম্মদের সে রকম কোন তিক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ছিল না, যেমনটা ছিল পৌত্তলিক ও ইহুদিদের সঙ্গে। যাহোক, খ্রিষ্টানদের প্রতি তাঁর আচরণের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাহরাইন, ওমান, মিশর, সিরিয়া ও বাইজেন্টাইনের খ্রিষ্টান শাসকদের কাছে পাঠানো কয়েকটি চিঠিতে। এখানে দু'টো চিঠির পর্যাপ্ত আলোচনা হবেঃ তার একটা ৬৩০ সালে ওমানের খ্রিষ্টান রাজার কাছে এবং অপরটি তাবুক অভিযানের সময় আইলা গোষ্ঠির খ্রিষ্টান যুবরাজের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। বর্তমান ওমান সরকারের ওয়েবসাইটে ওমানের খ্রিষ্টান রাজার কাছে পাঠানো মোহাম্মদের ঐ পত্রের একটা কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে।[১২৮] তাতে লিখিত হয়েছেঃ

> ঈশ্বর মুসলিমদের মক্কায় প্রবেশে ক্ষমতায়িত করার পর ইসলাম কর্তৃত্বকর শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠে এবং ভীতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়... অতঃপর নবি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ওমানের দুই রাজা আল জুলান্দার পুত্র জাফর ও আব্দসহ প্রতিবেশী রাজা ও শাসকগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অগ্রাধিকার দেন। ইতিহাস পুস্তক আমাদের বলে যে, নবি ওমানের জনগণকে বার্তা পাঠান এবং সে সঙ্গে আল জুলান্দার পুত্রদ্বয় জাফর ও আবদ'এর কাছে সামরিক পাহারায় একটি চিঠি আনেন আমর বিন আল আস, যাতে তিনি লিখেছিলেন: '*পরম দয়ালু ও করুণাময় ঈশ্বরের নামে, মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর কাছ থেকে আল জুলান্দার পুত্রদ্বয় জাফর ও আবদ'এর নিকট এ পত্র। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা সঠিক পথ বেছে নেয়। ইসলাম গ্রহণ কর, তাতে তোমরা নিরাপদ থাকবে। আমি ঈশ্বরের বার্তাবাহক সমগ্র মানবজাতির কাছে। এতদ্বারা আমি সব জীবিতদের সতর্ক করছি যে, অবিশ্বাসীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা রাজা হিসেবে বহাল থাকবে, কিন্তু ইসলাম থেকে বিরত থাকলে তোমরা রাজত্ব হারাবে এবং আমার ঘোড়াগুলো তোমাদের এলাকায় প্রবেশ করবে আমার নবিত্ব প্রমাণের নিমিত্তে।*'

৬২৮ সালের এ চিঠিটি খ্রিষ্টানদেরকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে। তা না করলে তাদেরকে ইসলামের ক্রোধ মোকাবেলা করতে হবে, যার অর্থ যুদ্ধ, মৃত্যু ও ধ্বংস, এবং তার সাথে নারী শিশুদের দাসত্ব বরণ – যেমনটি ঘটেছিল মোহাম্মদের তরফ থেকে বানু কোরাইজা গোত্রের ভাগ্যে।

৬৩০ সালের অক্টোবরে আইলা গোত্রের যুবরাজের কাছে প্রেরিত চিঠিতে নবি লিখেনঃ '*হয় (ইসলামে) বিশ্বাস কর, নতুবা জিজিয়া কর দাও। তোমরা জান জিজিয়া কি জিনিস? যদি তোমরা ভূমি ও সমুদ্র পথে নিরাপত্তা চাও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর নবিকে মেনে নাও। কিন্তু তাঁদেরকে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্ট করলে, আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নেব না, যতক্ষণ না তোমাদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ হবে এবং ছোটদের বন্দি ও বড়দের হত্যা করবো। কারণ আমি আল্লাহর সত্যিকার নবি।*'[১২৯]

এ চিঠির ভাষা অনুযায়ী, দুই বছরের মধ্যে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মোহাম্মদের আচরণের ধরন কিছুটা পাল্টে যায়। এর আগে তাদেরকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিলঃ *ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু (সে সাথে তাদের নারী শিশুদের দাস করা)*। এখন তাদের জন্য তৃতীয় আরেকটা পথ খুলে যায়, সেটা হল মোহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে 'জিজিয়া' কর প্রদান। বানু কোরাইজা ইহুদিদের গণহত্যার প্রায় দেড় বছর পর ৬২৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে খাইবারের ইহুদিদেরকে একই রকম উপায় দেওয়া হয়েছিল। খাইবারের ইহুদিদের পরাজিত করার পর তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাসরূপে নিয়ে যাওয়া হয়। ইহুদিদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল, তাদেরকে জমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ বশ্যতা-কর হিসেবে মুসলিমদেরকে দিতে বাধ্য করা হয়। এবং যতদিন মুসলিমরা চায় ততদিন তারা সে জমিতে বসবাস ও তা চাষ করার সুযোগ পাবে। পরে আল্লাহ এ নতুন দৃষ্টান্তকে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের প্রতি মুসলিমদের আচরণের চূড়ান্ত বিধানরূপে লিপিবদ্ধ করেন কোরানের ৯:২৯ নং আয়াতে (প্রত্যাদেশিত ৬৩১ সালে): '*যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে না, যা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ হিসেবে মানে না, কিংবা সত্য ধর্মকে (ইসলামকে) গ্রহণ করে না – তারা গ্রন্থপ্রাপ্ত (ইহুদি, খ্রিষ্টান) হলেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাও যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে ও বিনীত হয়ে 'জিজিয়া' প্রদান করবে।*'

ইসলামে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত 'গ্রন্থভুক্ত লোক' বলে বিবেচনা করা হয়। তথাপি তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, মুসলিমদেরকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে হবে যতদিন না তারা পরাজিত হয় এবং কর্তৃত্বকারী ইসলামের কাছে অপমান ও বশ্যতার প্রতীকরূপে মাথা নত করে 'জিজিয়া কর' না দেয়। এ ডিক্রীর দ্বারা (৯:২৯) আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে আক্রমণের খোলা নির্দেশ দেন। তাদেরকে পরাজিত করার পর মুসলিমরা তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস বানাতে পারবে, যেভাবে নবি বানু কোরাইজা ও খাইবারের ইহুদিদের ক্ষেত্রে করেছিলেন। যদি পরাজিত ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা স্বেচ্ছায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় এবং অবমাননাকর জিজিয়া কর, ভূমি কর ও অন্যান্য বশ্যতা কর দিতে রাজী হয়, তাহলে তাদেরকে 'ওমরের চুক্তি'র শর্তানুযায়ী নিদারুণ অনেকগুলো অক্ষমতা নিয়ে ইসলামের শাসনতলে বেঁচে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে (পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন)।

এর প্রায় এক বছর পর মোহাম্মদের মৃত্যুর আগে মনে হয় তিনি আবার মত পরিবর্তন করেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের তৎকালীন ইসলামি ভূখণ্ড আরবাঞ্চল থেকে বহিস্কারের নির্দেশ দেন এই বলেঃ '*দু'টি ধর্মকে আরব উপদ্বীপে থাকতে দেওয়া যাবে না।*' একইভাবে আরব ভূখণ্ড থেকে ইতিমধ্যেই পৌত্তলিকদের নির্মূল করা হয়েছিল। একটা হাদিস এ ব্যাপারে বলেঃ '*ওমর বিন আল-খাত্তাব কর্তৃক*

---

[১২৮]. This document has now been removed from the Oman Government Website (http://www.mofa.gov.om/oman/discoveroman/omanhistory/OmanduringIsla). Wikipedia preserves a copy of it at http://www.wikiislam.com/ wiki/ Quotations— on— Islam# Official— Oman— Site.

[১২৯]. Muir, p. 402

বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর নবিকে বলতে শুনেছেন, 'আমি আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিতাড়িত করবো এবং সেখানে মুসলিম ছাড়া আর কেউ থাকবে না'' (মুসলিম ১৯:৪৩৬৬)। সে মোতাবেক খলিফা ওমর আরব উপদ্বীপকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান মুক্ত করেন (বুখারী ৩:৩৯:৫৩)।

ইসলাম পৌত্তলিক অ্যানিমিস্ট (প্রাণীবাদী) ও নাস্তিক শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যু – এ দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার সম্মতি দেয়। কিন্তু খ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরকে চরম অবমানিত ও শোষিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপনের অনুমতি দেয়। উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদের সময়ে বিশ্ব জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশ ছিল ভারত, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় বসবাসকারী পৌত্তলিক বা বহুঈশ্বরবাদী। এসব জনগণের অনেকেই, বিশেষ করে ভারত ও চীনের জনগণ, প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে তুলেছিল মূল্যবান ও সৃজনশীল সভ্যতা। অথচ ইসলাম ধর্মের আগমনের সাথে তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে অথবা হত্যা করে ভয়ঙ্কর দোযখের আগুনে প্রেরণ করা হবে তৎকালীন একটা সংস্কৃতিহীন পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দ্বারা, যারা তখন পর্যন্ত মানবতার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে নি।

মোহাম্মদের জিহাদ ও এর ফলাফল

নবি মোহাম্মদের জিহাদ, অর্থাৎ আল্লাহর পথে তাঁর সংগ্রাম বা লড়াই, স্পষ্টতঃই তাঁর সকল কর্মকাণ্ড – হোক তা শান্তিপূর্ণ, ধৈর্যপূর্ণ অথবা সামরিক – যা তিনি আরবদের মাঝে ইসলাম প্রচারে ও ইসলামের ভৌগলিক বিস্তারে প্রয়োগ করেন, তার সবই অন্তর্ভূক্ত। মোহাম্মদের মদীনায় পুনর্বাসনের পর যখন ইসলামে জিহাদের মতবাদ প্রবেশ করে, তখন থেকে নবি তাঁর ক্ষুদ্র অনুসারী দলকে ক্রমে ক্রমে আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে শক্তিধর সামরিক বাহিনীতে পরিণত করেন। আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সংগ্রাম বা জিহাদের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল একটা শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, মদীনায় উদীয়মান একটি খিলাফত। তাঁর যুগান্তর সৃষ্টিকারী নবিত্ব কালে মোহাম্মদ স্পষ্টভাবে জিহাদী কর্মকাণ্ডের তিনটি দৃষ্টান্ত বা ধারা স্থাপন করে যান। সেগুলো হলোঃ

১. অবিশ্বাসীদেরকে, বিশেষতঃ বহুঈশ্বরবাদীদেরকে, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ।

২. সাম্রাজ্যবাদঃ ইসলামি শাসন কায়েমের জন্য বহুঈশ্বরবাদী, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ভূমি বা দেশ দখল।

৩. ক্রীতদাসত্ব ও দাস-ব্যবসাঃ উদাহরণস্বরূপ, বানু কোরাইজার নারী ও শিশুদের দাস বানানো ও তাদের কিছু সংখ্যককে বিক্রি করা।

নবি মোহাম্মদ আল্লাহর কড়া তত্ত্বাবধানে জিহাদের এসব প্রতিরূপ মডেল বা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবির মৃত্যুর পর মদীনা খিলাফত থেকে ইসলামের পবিত্র বীর বা জিহাদীরা ইসলামের প্রসার ও বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে আরবাঞ্চলের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ঈশ্বর নির্দেশিত জিহাদ অভিযানকে অগ্রগামী করতে মুসলিম যোদ্ধারা অতি সতর্কতার সাথে নবী কর্তৃক স্থাপিত জিহাদের আদর্শ কর্মধারা তিনটির পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে যুগে যুগে।

ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ করার জন্য নবি তাঁর অনুসারীদেরকে এতটাই উৎসর্গকৃত ও সাহসী করে তুলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে মুসলিম জিহাদীরা বিশাল শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য দখল করে নেয় এবং সে সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সাম্রাজ্য বাইজেনটিয়ামে তাৎপর্যপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় অনুপ্রবেশ ঘটায়। মোহাম্মদের মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য বা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে, যা আরব দেশ থেকে ঝড়ের গতিতে বিস্তৃত হয়ে পূর্বে ট্রান্সক্সিয়ানা ও সিন্ধু থেকে শুরু করে মিশর ও উত্তর আফ্রিকার সবটুকু জয় করে পশ্চিমে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যায়। মোহাম্মদ কর্তৃক স্থাপিত জিহাদের আদর্শ কর্মধারা তিনটি ইসলামের পরবর্তি ইতিহাসকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা পরবর্তি অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হবে।

অধ্যায় – ৪

ইসলামের বিস্তার :

শক্তির জোরে না শান্তিপূর্ণ উপায়ে?

'অতএব পবিত্র মাসগুলো অতিক্রান্ত হলে পৌত্তলিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, এবং তাদেরকে বন্দি ও অবরোধ করো, এবং তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রত্যেক স্তরে ওঁৎ পেতে থাকো; কিন্তু তারা যদি অনুশোচিত হয় ও প্রার্থনা (নামাজ) চালিয়ে যায় এবং দরিদ্র কর বা যাকাত প্রদান করে (অর্থাৎ তারা মুসলিম হয়ে যায়), তাদের রাস্তা মুক্ত করে দাও; নিশ্চয়ই আলাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।' -- (কোরান ৯:৫)

'জিহাদের বাধ্যবাধকতার ভিত্তি হলো মুসলিম প্রত্যাদেশের সর্বজনীনতা। ঈশ্বরের কথা ও ঈশ্বরের বার্তা সমগ্র মানবজাতির জন্য; যারা এসব গ্রহণ করেছে তাদের কর্তব্য হলো, যারা তা গ্রহণ করেনি তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদেরকে বশীভূত করতে অবিরাম সংগ্রাম (জিহাদ) করে যাওয়া। এ বাধ্যবাধকতা সময় স্থানের উর্ধ্বে। এটা ততদিন চলবে যতদিন না গোটা বিশ্ব ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামি শক্তির কাছে নত হয়।' -- (বার্ণার্ড লুইস, *দ্য পলিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ অব ইসলাম*, পৃঃ ৭৩)

'ইসলামের বিস্তার ঘটে সামরিক পন্থায়। মুসলিমদের মাঝে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দেওয়ার একটা ঝোঁক রয়েছে এবং আমাদের সেটা করা উচিত নয়। ইসলামের বিস্তারের জন্য তোমাকে অবশ্যই লড়াই করতে হবে – এটা কোরানেরই নির্দেশ।' -- (ডঃ আলী ইসা ওসমান, ইসলামি পণ্ডিত, ফিলিস্তিনি সমাজবিদ ও জাতিসংঘের 'রিলিফ এ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি অন এডুকেশন'-এর উপদেষ্টা, *দ্য মুসলিম মাইন্ড*, পৃঃ ৯৪)

ইসলামের বিস্তারে প্রাথমিক যুদ্ধসমূহ

ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছিল সহিংসতার মাধ্যমে নাকি শান্তিপূর্ণ প্রচারকার্যের (দাওয়া) মাধ্যমে, এ প্রশ্নে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছে, যা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে ইন্টারনেট অনুসন্ধান করলে বহু ইসলামপন্থি লেখকের প্রচুর নিবন্ধ, মন্তব্য বা পুস্তক চোখের সামনে হাজির হয়, যার মাধ্যমে তারা ইসলামের বিস্তৃতিতে সহিংসতার প্রয়োগকে শক্তভাবে অস্বীকার করতে চান। যাহোক নবি মোহাম্মদ কর্তৃক ইসলামের প্রতিষ্ঠা (ইতিমধ্যে আলোচিত) ও তার পরবর্তী ইতিহাসে (এ বইয়ে আলোচিত হবে) অসংখ্য রক্তক্ষয়ী লড়াই ও যুদ্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যা হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। সে আলোচনায় যাবার আগে প্রতিষ্ঠাকালীন বছর ও দশকগুলোতে ইসলামের রক্তাক্ত ইতিহাসের দিকে প্রথমে একটু নজরপাত করা যাক।

ধার্মিক ইসলামি ইতিহাসবিদদের দ্বারা লিখিত নবি মোহাম্মদের জীবনীতে মদীনায় বসবাসকালীন তাঁর জীবনের শেষ ১০ বছরে নবি কর্তৃক পরিচালিত বা নির্দেশিত ৭০ থেকে ১০০টি ব্যর্থ বা সফল আক্রমণ, লুণ্ঠন-অভিযান ও যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৭ থেকে ২৯টিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নিচে নবির পরিচালিত বা নির্দেশিত প্রধান প্রধান অভিযান ও যুদ্ধসমূহের একটি তালিকা দেওয়া হলো:

৬২৩ সাল – ওয়াদ্দানের যুদ্ধ
৬২৩ " – সাফওয়ানের যুদ্ধ
৬২৩ " – দুল-আশিরের যুদ্ধ
৬২৪ " – নাখলার যুদ্ধ
৬২৪ " – বদরের যুদ্ধ
৬২৪ " – বানু সালিমের যুদ্ধ
৬২৪ " – ঈদ-উল-ফিতর ও যাকাত-উল-ফিতরের যুদ্ধ
৬২৪ " – বানু কাইনুকার যুদ্ধ
৬২৪ " – সাউইক-এর যুদ্ধ
৬২৪ " – ঘাতফানের যুদ্ধ
৬২৪ " – বাহরানের যুদ্ধ
৬২৫ " – ওহুদের যুদ্ধ
৬২৫ " – হুমরা-উল-আসাদের যুদ্ধ
৬২৫ " – বানু নাদিরের যুদ্ধ
৬২৫ " – ধাতুর-রিকার যুদ্ধ
৬২৬ " – বাদরু-উখরার যুদ্ধ
৬২৬ " – দুমাতুল-জান্দালের যুদ্ধ
৬২৬ " – বানু মুস্তালাক নিকাহ'র যুদ্ধ
৬২৭ " – খন্দকের যুদ্ধ
৬২৭ " – আহজাব'এর যুদ্ধ
৬২৭ " – বানু কোরাইজার যুদ্ধ
৬২৭ " – বানু লাহিয়ানের যুদ্ধ
৬২৭ " – ঘাইবা'র যুদ্ধ
৬২৭ " – খাইবারের যুদ্ধ
৬২৮ " – হুদাইবিয়া অভিযান
৬৩০ " – মক্কা বিজয়
৬৩০ " – হুনসিনের যুদ্ধ
৬৩০ " – তাবুকের যুদ্ধ

৬৩২ সালে নবি মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর শ্বশুর আবু বকর ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হন। ইসলামের ধর্মীয় প্রসার ও আওতা সম্প্রসারণে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অব্যাহত থাকে:

৬৩৩ সালে – ওমান, হাদ্রামাউত, কাজিমা, ওয়ালাজা, উলেইস ও আনবারের যুদ্ধ
৬৩৪ সালে – বসরা, দামাস্কাস ও আজ্নাদিনের যুদ্ধ

৬৩৪ সালে খলিফা আবু বকর মারা যান। নবির অপর এক শ্বশুর ও সহচর ওমর আল-খাত্তাব দ্বিতীয় খলিফা হন। তাঁর পরিচালনাধীনে ইসলামের ভূখণ্ড বিস্তারে যুদ্ধবিগ্রহ জোরদার হয়ে উঠে:

৬৩৪ সালে – নামারাক ও সাকাতিয়ার যুদ্ধ
৬৩৫ সালে – সেতু (ব্রিজ), বুওয়াইব, দামাস্কাস ও ফাহ্‌ল-এর যুদ্ধ
৬৩৬ সালে – ইয়ারমুক, কাদিসিয়া ও মাদাইনের যুদ্ধ
৬৩৭ সালে – জালুলার যুদ্ধ
৬৩৮ সালে – ইয়ারমুকের যুদ্ধ, জেরুজালেম ও জাজিরা বিজয়
৬৩৯ সালে – খুজইজিস্তান বিজয় ও মিশর আক্রমণ
৬৪১ সালে – নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধ
৬৪২ সালে – পারস্যের রেই-এর যুদ্ধ
৬৪৩ সালে – আজারবাইজান বিজয়
৬৪৪ সালে – ফারস ও খারান বিজয়

খলিফা ওমর ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ৬৪৪ সালে খুন হলে নবির এক জামাতা ও সহচর ওসমান পরবর্তী খলিফা হন এবং ইসলামের বিস্তারে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে:

৬৪৭ সালে – সাইপ্রাস দ্বীপ বিজয়
৬৪৮ সালে – বাইজেনটাইনের বিরুদ্ধে অভিযান
৬৫১ সালে – বাইজেনটাইনের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধ
৬৫৪ সালে – উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম

খলিফা ওসমানও খুন হন ৬৫৬ সালে। নবির কন্যা ফাতিমার স্বামী আলি পরবর্তী খলিফা হন। মোহাম্মদের মৃত্যুর দুই দশক পরবর্তী এ সময়ে আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব মুসলিম সম্প্রদায়কে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে। এ সময় ইসলামের ভিতরে দলাদলি ও যুদ্ধ শুরু হয়, যেমন আলি ও নবির স্ত্রী আয়েশার মধ্যে সংঘটিত 'উটের যুদ্ধ' এবং আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত সিফিনের যুদ্ধ। এর ফলে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনেকটা নিস্তেজ হয়ে যায়। খলিফা আলীর অধীনে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মাত্র দু'টি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়:

৬৫৮ সালে – নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধ
৬৫৯ সালে – মিশর বিজয়

৬৬১ সালে বিষাক্ত ছুরির আঘাতে আলি খুন হন। আলির খুন সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফাদের রাজত্ব বা খলিফায়ে রাশেদীনের যুগের সমাপ্তি টানে। এরপর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে উমাইয়া বংশ ক্ষমতায় আসে এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয়যুদ্ধ পুনরায় জোরদার হয়ে উঠে:

৬৬২ সালে – মিশর ইসলামের শাসনাধীনে আসে
৬৬৬ সালে – মুসলিমদের দ্বারা সিসিলি আক্রান্ত হয়
৬৭৭ সালে – কনস্টান্টিনোপল অবরোধ
৬৮৭ সালে – কুফার যুদ্ধ
৬৯১ সালে – দ্বার-উল-জালিক-এর যুদ্ধ
৭০০ সালে – উত্তর আফ্রিকায় সামরিক অভিযান
৭০২ সালে – দ্বার-উল-জামিরার যুদ্ধ
৭১১ সালে – জিব্রাল্টার আক্রমণ ও স্পেন বিজয়
৭১২ সালে – সিন্ধু বিজয়
৭১৩ সালে – মুলতান বিজয়
৭১৬ সালে – কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ
৭৩২ সালে – ফ্রান্সের টুর-এর যুদ্ধ
৭৪০ সালে – নোবল-এর যুদ্ধ
৭৪১ সালে – উত্তর আফ্রিকার বাগদৌরার যুদ্ধ
৭৪৪ সালে – আইন আল জুর-এর যুদ্ধ
৭৪৬ সালে – রূপার ঠুঁঠার যুদ্ধ
৭৪৮ সালে – রেই'এর যুদ্ধ
৭৪৯ সালে – ইসপাহান ও নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধ
৭৫০ সালে – জাব-এর যুদ্ধ
৭৭২ সালে – উত্তর আফ্রিকার জানবি'র যুদ্ধ
৭৭৭ সালে – স্পেনের সারাগোসার যুদ্ধ।

এ সময়কালে অনেক ক্ষুদ্র ও ব্যর্থ অভিযান চালানো হয়, যেগুলো এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় খলিফা ওমরের শাসনকালে ৬৩৬ সালে ভারত সীমান্ত আক্রমণ শুরু করা হয়েছিল। ভারতে ইসলামের স্থায়ী পদাঙ্ক স্থাপনের জন্য আট দশক ধরে বহুবার উদ্যোগ নেয়ার পর অবশেষে সাফল্য মেলে ৭১২ সালে যখন মোহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন। এ দীর্ঘ তালিকার সাথে আমরা পরবর্তী

শতাব্দীতে বিভিন্ন সীমান্তে যুদ্ধের উপর আরো একটি দীর্ঘ তালিকা যুক্ত করতে পারি, যেমন ১০০০ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারত আক্রমণ শুরুর পর যতদিন মুসলিমরা ভারতের ক্ষমতায় ছিল ততদিন যুদ্ধবিগ্রহ ও সহিংসতা বিক্ষিপ্তভাবে চলমান থাকে। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (শাসনকাল ৬৬১-৮০) পাঁচ বছর ধরে (৬৭৪-৭৮) কনস্টান্টিনোপল অধিকারের চেষ্টা করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি ব্যর্থ আক্রমণ পরিচালনা করেন। পরে ৭১৬ সালে কনস্টান্টিনোপল অধিকারের প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, যাতে মুসলিমরা অবর্ণনীয় ক্ষতি ভোগ করে। পরবর্তী শতাব্দী জুড়ে কনস্টান্টিনোপল দখলের জন্য আরও চেষ্টা চালানো হয়। অবশেষে ১৪৫৩ সালে খ্রিষ্টান ধর্মের এ লোভনীয় কেন্দ্রস্থলটি মুসলিমদের কব্জায় আসে।

অমুসলিমদের বিরুদ্ধে নবি মোহাম্মদ ও তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ ও অন্যান্য মুসলিম শাসক কর্তৃক আক্রমণাত্মক রক্তাক্ত ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ তালিকা সত্ত্বেও মুসলিমরা ওসব রক্তঝরানো নৃশংসতা সম্পর্কে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে দেখাতে সক্ষম যে, মোহাম্মদ একজন শান্তিকামী মানুষ ছিলেন এবং দুনিয়াভর অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ইসলাম ধর্মের শান্তিপ্রিয়তা ও ন্যায়পরায়ণতায় আকৃষ্ট হয়ে। এ অধ্যায়ে মুসলিমদের এ যুক্তিগুলোর বিস্তারিত আলোচনা হবে, প্রধানত মধ্যযুগের ভারতে মুসলিম শাসকদের অধীনে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির আলোকে। এটা বিশেষ উল্লেখ্য যে, ভারতে ইসলামের হানাফী মাহজাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা ইসলামের চারটি প্রধান আইনশাস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে উদার ও নমনীয়। কেবলমাত্র এ শাস্ত্রটি মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিকদেরকে কোরান (৯:৫) প্রদত্ত মৃত্যু অথবা ইসলাম গ্রহণের বিধানটি লংঘন করে তাদেরকে ইসলামের শাসনাধীনে জিম্মি'র মর্যাদায় উন্নীত করে ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ জীবনধারণের অধিকার দিয়েছে।

ইসলামের প্রসারে কোরানের নির্দেশ ও নবি স্থাপিত আদর্শ

নবি মোহাম্মদের নবিত্বের মক্কার অধ্যায়টির সঙ্গে কোনো অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত ছিল না, যদিও তাঁর বার্তা মক্কারবাসীর ধর্ম, প্রথা ও পূর্বপুরুষ সম্পর্কে অপমানকর ছিল। প্রথম দিকে তাঁর দল খুব ছোট থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিবৃতির মধ্যে মোহাম্মদ তাঁর ভবিষ্যত সহিংসতার ইচ্ছা প্রদর্শন করেন। ইতিমধ্যে উল্লেখিত নবির এক বিবৃতি – '*হে কোরাইশরা! আমি অবশ্যই সুদসহ তোমাদের উপর এর পরিশোধ নেবো*' – সুস্পষ্টরূপে তাঁর ভবিষ্যত সহিংসতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। নবুয়তির প্রথম পাঁচ বছরে রচিত কিছুসংখ্যক আয়াতও কোরাইশদেরকে ইহলৌকিক শাস্তি প্রদানের কথা বলে। যেমন কোরান ৭৭:১৬-১৭ তাদেরকে ধ্বংস করার হুমকি দেয়। কোরান ৭৭:১৮ কোরাইশদের হুমকি দেয়: '*এভাবে আমরা অপরাধীদেরকে শায়েস্তা করবো।*' কিন্তু এ পর্যায়ে এসব ইহলৌকিক শাস্তি আসবে আল্লাহর কাছ থেকে। ৬১৯ সালে নবি যখন অন্যত্র আশ্রয়ের খোঁজে তা'য়েফে যান, সেখানেও তিনি কোরাইশদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি তা'য়েফবাসীদেরকে মক্কার কোরাইশদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও নবির পক্ষে যুদ্ধ করার প্ররোচনায় সচেষ্ট হন।

মোহাম্মদ মদীনায় স্থানান্তরের পূর্বে 'আকাবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায়' তিনি সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে তাঁর সহিংসতার ইচ্ছাটি প্রকাশ করেন। এ অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞায় তিনি মদীনার শিষ্যদের কাছ থেকে রক্ত দিয়ে নবির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এ প্রতিজ্ঞার কী প্রয়োজন ছিল? মক্কা ও মদীনার মত আরব শহরগুলোতে বিদেশ থেকে জনগণ আসতো, ব্যবসা স্থাপন করতো, এমনকি শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপ্রচারও করতো। মোহাম্মদ যদি মদীনায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্যই যেতেন, কেউ তাঁকে ক্ষতি করতে আসতো না। এক বছর আগে তিনি মুসাবকে মদীনায় পাঠালে সেখানে সে সক্রিয়ভাবে ইসলাম প্রচার করে বহু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে। এর জন্য মদীনার লোকদের কাছ থেকে তাকে কোনরকম শত্রুতামূলক ব্যবহার ভোগ করতে হয়নি। অতএব মোহাম্মদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি ইতিমধ্যেই মদীনায় পৌঁছে সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: প্রথমত কোরাইশদের বিরুদ্ধে; অতঃপর সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক পর্যায়ে আল্লাহর বিশুদ্ধ ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে (পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন)।

নবির মদীনায় স্থানান্তরের পরপরই তাঁর কর্মকাণ্ডের ধারা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। আকাবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে নবি কর্তৃক অবিশ্বাসী বিশ্বের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল তা অচিরেই শুরু হয়ে যায়। মোহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যদেরকে কোরাইশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরায় উদ্বুদ্ধ করতে জিহাদী আয়াতগুলো শীঘ্রই আল্লাহর নিকট থেকে নেমে আসতে থাকে। কোরাইশদের বিরুদ্ধে শাস্তি এখন থেকে নির্দিষ্ট হবে মোহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের হাত দিয়ে, আল্লাহর হাত দিয়ে নয় এবং এ যুদ্ধকালে যারা মারা যাবে তারা পরবর্তী জীবনে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে। সুতরাং আল্লাহ বলেন: '*এরূপে (তোমরা আদেশ প্রাপ্ত): কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি (তোমাদেরকে লড়াই করতে দিচ্ছেন) তোমাদের পরীক্ষার জন্য (আল্লাহর প্রতি ভক্তির)। যারা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে নিহত হবে, তারা কখনও তাদের কর্মফল হারাবে না*' (কোরান ৪৭:৪)।

বিন ওমর বর্ণিত এক হাদিসে নবি নিজে এ ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ অকপট। আল্লাহর নবি বলেন: "*আমি আল্লাহ কর্তৃক জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত, যতক্ষণ না তারা ঘোষণা করছে যে আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা পাওয়ার অধিকার নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর নবি। এবং সঠিকভাবে নামাজ আদায় করে ও বাধ্যতামূলক বা দাতব্য প্রদান করে। যদি তারা তা পালন করে, তাহলে আমার নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হবে এবং তারপর আল্লাহ তাদের হিসাব নিবেন*" (বুখারী ১:২৪)।

মোহাম্মদ যখন ইন্তেকাল করেন তখন মক্কা ও মদীনা অবিশ্বাসী শূন্য করা হয়েছিল। কোরানের ৯:৫ নং আয়াত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ – এর শর্ত দিয়ে নবি ইতিমধ্যে নব-প্রতিষ্ঠিত আরবের ইসলামি রাষ্ট্র থেকে মূর্তি-উপাসনা সম্পূর্ণ নির্মূল করেছিলেন। অবশিষ্ট কিছু ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তখনো আরব উপদ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে থেকে গিয়েছিল। নবির মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুযায়ী ওসব ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহিষ্কার করে। কিন্তু আরব ভূখণ্ডের বাইরে ইসলাম-বিজিত দেশগুলোতে তাদেরকে নিজ নিজ ধর্মসহ বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়, যদিও অবমানিত ও শোষিত 'জিম্মি' প্রজারূপে।

কোরানের নির্দেশ অনুসারে নবি-স্থাপিত ইসলাম বিস্তারের আদর্শ নমুনায় মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে পৌত্তলিক বা মূর্তি-উপাসকদের ধর্মান্তরিত করা হয়। ইহুদিদের ক্ষেত্রে নবি তাদেরকে আক্রমণ ও জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করার রীতি প্রতিষ্ঠা করেন, যেমনটা করেছিলেন বানু কাইনুকা ও বানু নাদিরের ক্ষেত্রে। বানু কোরাইজার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের সাবালক পুরুষদের সবাইকে হত্যা করেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস বানানোর মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করে মুসলিম বানান। খাইবারের ইহুদিদের পরাজিত করে তাদের নারী-শিশুদেরকে দাসরূপে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরুষদের মধ্যে যুদ্ধের পর যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদেরকে জমি চাষবাসের সুযোগ দেওয়া হয় উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বশ্যতা কর রূপে মুসলিমদের দেওয়ার শর্তে। তারা তাদের জমি ভোগ করবে যতদিন না মুসলিমরা তা চাষবাসের জন্য যথেষ্ট মুসলিম শ্রমিকের ব্যবস্থা করতে পারে।

খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে, নবি যখন খ্রিষ্টান রাজা ও যুবরাজদের কাছে দূত পাঠান, তিনি দাবি করেন যে, হয় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক, নইলে তাঁর যোদ্ধাদের নৃশংসতা মোকাবেলা করুক। অন্য এক ঘটনায় তিনি খ্রিষ্টানদের আদেশ করেন তাদের সন্তানদেরকে ব্যাপটাইজ না করার জন্য, যাতে করে সেসব সন্তানরা ইসলামে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কোরানের ৯:২৯ নং আয়াতটিতে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে শেষ পর্যন্ত 'জিম্মি' প্রজার মর্যাদা দেওয়া হয়। তাদেরকে মুসলিমরা আক্রমণ করে পুরুষদেরকে হত্যা করতে পারবে, পারবে তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে কব্জা করতে এবং অবশিষ্টরা নিজস্ব ধর্মচর্চাসহ বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে, যদি তারা অবমাননাকর জিম্মি প্রজার জীবন মেনে নেয় (নিচে ওমরের চুক্তি দেখুন)।

মক্কায় মোহাম্মদের ১৩ বছর নবিত্বকালে তিনি প্রায় ১৫০ জনকে ধর্মান্তর করতে পেরেছিলেন, যা ছিল অনেকটা শান্তিপূর্ণ। কিন্তু মদীনায় তাঁর নবিত্বের শেষ ১০ বছর ছিল অত্যন্ত সংঘাত ও সহিংসতাপূর্ণ। এ সময় তিনি অমুসলিম বাণিজ্য কাফেলার উপর লুণ্ঠন অভিযান ও তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ প্রক্রিয়ায় বিধর্মীদেরকে গণহারে হত্যা, উচ্ছেদ ও দাসত্বকরণ অথবা মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।

মোহাম্মদের নবিত্বের মক্কা পর্বটা ছিল পুরোপুরি ব্যর্থ। সুতরাং তাঁর নবিত্বের মদীনাস্থ সহিংস অধ্যায়টি, যা ইসলামকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়, তা হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের বিস্তারে নবির প্রধান প্রক্রিয়া। এখানে উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ ইসলাম প্রচারে ভবিষ্যতে সহিংসতা প্রদর্শন করবেন এমন ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন মক্কায় অবস্থানকালেই, যখন তিনি ছিলেন সামরিকভাবে অতিশয় দুর্বল। তখন তাঁর সম্প্রদায় সামরিকভাবে সবল হলে মক্কাতেই তিনি সহিংসতা শুরু করে দিতে পারতেন। কোরান ও আল-বুখারী হাদিসের অনুবাদক এবং মদীনার ইসলামিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ মুহসিন খান এ সম্ভাবনার সাথে একমত। তিনি বলেন: '*প্রথমে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, তারপর অনুমোদন পায় এবং পরে একে বাধ্যতামূলক করা হয়।*'[১] কেন স্বর্গ থেকে জিহাদের অনুমতি ধীরে ধীরে আসে, সে বিষয়ে ডঃ সোবিহ-আস-সালেহ মধ্যযুগের মেধাবী মিশরীয় ধর্মবিশারদ ইমাম জালালুদ্দিন আল-সুয়ুতির (মৃত্যু ১৫০৫ সাল; তিনি 'ইবনে আল কুতুব' বা 'পুস্তকের সন্তান' নামে সর্বিশেষ পরিচিত) উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে: "*মুসলিমরা শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমোদন বিলম্ব করা হয়েছিল। যখন তারা দুর্বল ছিল তখন তাদেরকে ধৈর্যধারণ করে সহ্য করার আদেশ দেওয়া হয়।*"[২] ডঃ আস-সালেহ মিশরের আরো এক বিখ্যাত মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্রবিদ আবু বকর আজ-জারকাশি (মৃত্যু ১৪১১)'র মতামত যুক্ত করেন: "*সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ মোহাম্মদের দুর্বল অবস্থায় পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তাঁর (মোহাম্মদ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে। কারণ তিনি যদি এ দুর্বল অবস্থায় যুদ্ধের আদেশ দিতেন, তাহলে তা অত্যন্ত বিপর্যয়কর ও অসুবিধাজনক হতো। কিন্তু ইসলাম যখন শক্তিশালী হয়ে উঠে, তখন তিনি নবিকে নির্দেশ করেন যা পরিস্থিতির সাথে মানানসই ছিল – অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ অনুসারীদেরকে স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হতে অথবা বশ্যতা কর দিতে, আর পৌত্তলিকদেরকে মুসলিম হতে কিংবা মৃত্যুর স্বাদ বরণ করতে।*"[৩]

সুতরাং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সতর্কতার সাথে রচিত স্বর্গীয় বাণী বা আয়াত দ্বারা প্ররোচিত সহিংসতাই ছিল নবি মোহাম্মদের ইসলাম প্রচার ও মদীনায় একটি উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাণশক্তি। সহিংস জিহাদ হলো ইসলামের প্রাণ, যার বিনা ইসলাম হয়তোবা সপ্তম শতাব্দীতেই মৃত্যুবরণ করতো। নবির ইসলাম বিস্তারের এ আদর্শ প্রক্রিয়া বা রূপরেখা তাঁর উত্তরাধিকারী মুসলিম খলিফা ও শাসকবর্গ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গ্রহণ ও তার বাস্তব প্রয়োগ করেন। ইসলামের কর্তৃত্বের শেষকালেও অটোম্যান জিহাদীরা বলকান ও পূর্ব ইউরোপকে সহিংস জিহাদের আগুনে বিধ্বস্ত করছিল; এবং ১৬৮৩ সালে তারা দ্বিতীয়বারের জন্য ইউরোপ ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। একই সময়ে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব (রাজত্ব ১৬৫৮-১৭০৭) ভারতকে সহিংস জিহাদের ধ্বংসযজ্ঞে জর্জরিত করছিল হাজার হাজার হিন্দু ধর্মমন্দির ধ্বংস এবং হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিমদেরকে জবরদক্তিমূলকভাবে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে (নিচে আলোচিত)।

ইসলাম বিস্তারে যুদ্ধের বিষয়ে মুসলিম পন্ডিতদের ভাষ্য

মুসলিমদের জন্য রক্তের বন্যা বহানো ইসলামের যুদ্ধের বিশাল তালিকা উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, বিশেষত সমালোচকরা যখন 'ইসলাম তরবারির দ্বারা বিস্তৃত' বলে সমালোচনা করে। এসব যুদ্ধের অনেকগুলোই সংঘটিত হয় ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল

---

১. Khan M. M. (1987) Introduction, in the *Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari*, Kitab Bhavan, New Delhi, Vol, I, P. XXVI

২. Sobhy as-Saleh (1983) *Mabaheth Fi 'Ulum al-Qur'an*, Dar al-'llm Lel-Mayayeen, Beirut, p. 269

৩. Ibid, p. 270

দূরে। কেউ যদি মুসলিমদের দাবি অনুযায়ী বিশ্বাস করে যে, এসব অগণিত যুদ্ধ ছিল ইসলামের পক্ষ থেকে আত্মরক্ষামূলক, তাকে হতে হবে চরম বা উপহাসমূলকভাবে বিশ্বাসপ্রবণ। আরব উপদ্বীপের মুসলিম জন্মভূমি কখনোই পারস্য, স্পেনীয় বা ভারতীয়দের আক্রমণের শিকার হয়নি। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানিতে এক বক্তৃতায় পোপ বেনেডিক্ট ১৩৯১ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট ও এক মুসলিম পণ্ডিতের মধ্যে ঘটিত এক আলোচনার[৪] উল্লেখ করে ইসলামের সহিংস স্বভাবের কথা বলায় মুসলিম বিশ্ব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে। তারা এমন সহিংসতা ও বর্বরতা শুরু করে দেয় যে, বেশ কয়েকটি গীর্জায় অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করা হয় এবং বেশ কিছু লোক মারা যায়। ব্রিটেনের (সোমালিয়ারও) মোল্লারা নবিকে অপমান করার অভিযোগে পোপকে হত্যার হুমকিও দেয়।[৫] এ ঘটনায় মুসলিমরা যে লাগামহীন বর্বরতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, তা কেবল ইসলাম সম্পর্কে পোপের অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণ করে।

এধরনের অভিযোগে একদিকে অধিকাংশ মুসলিম সহিংস প্রতিবাদে লিপ্ত হয়, অপরদিকে ইসলামি পণ্ডিতরা সে অভিযোগ খণ্ডাতে কলম তুলে নেয়। আজকের প্রভাবশালী মুসলিম পন্ডিত ডঃ শেখ ইউসুফ আল-কারাদাউই, যাকে লন্ডনের মেয়র কেন্ লিভিংস্টোন ইসলামি বিশ্বে শান্তি ও উদারতার কণ্ঠস্বর হিসেবে আলিঙ্গন করেন, তিনি পোপের মন্তব্যের নিন্দা করেন এভাবে:

> পোপ ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরান ও নবি মোহাম্মদের হাদিস না পড়ে, বাইজেন্টাইন সম্রাট ও পারস্যের মুসলিম বুদ্ধিজীবীর মধ্যেকার আলোচনার উদ্ধৃতিকে যথেষ্ট মনে করে ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্যটি করেছেন... নবি মোহাম্মদ যে কেবলমাত্র অপকর্ম ও অমানবিকতা এনেছেন পৃথিবীতে, যেমন তরবারির দ্বারা ইসলামের বিস্তার, এমন কথা বলা কার্যত মিথ্যা অপবাদ বা খাটি অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়।[৬]

অপর এক মেধাবী ইসলামি পন্ডিত হলেন ডঃ জাকির নায়েক, যিনি *ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন* (মুম্বাই, ভারত)-এর প্রেসিডেন্ট। ইসলামের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও যুক্তিবাদী কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি মুসলিম বিশ্বে বিশেষ সমাদৃত। আল-কারাদাউই এবং জাকির নায়েক উভয়েই সহিংসতার মাধ্যমে ইসলাম বিস্তারের অভিযোগের ব্যাখ্যা দিয়ে একে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মাঝে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত 'ব্যাপক ভুল ধারণা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে ইসলামের এ দুই বিখ্যাত পণ্ডিতের যুক্তি আলোচিত হবে। নবি মোহাম্মদ ও তাঁর পরবর্তী ইসলামের খলিফাগণ যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আল-কারাদাউই চারটি কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন:[৭]

১. ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা
২. বিদেশী শাসকদের অত্যাচার দমন
৩. অত্যাচারী শাসকের নিপীড়নের হাত থেকে দুর্বল দেশগুলোকে মুক্ত করা
৪. অত্যাচার-নিপীড়ন দূর করা

ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক বিদেশী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে সুবিজ্ঞ আল-কারাদাউই লিখেছেন:

> ...মদীনার উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র তার সার্বভৌমত্ব প্রদর্শনই করতে হয়নি, সমগ্র মানবজাতির কাছে ক্ষমাশীলতা ও ন্যায় বিচারের এবং তা চর্চা করার জন্য একটা আদর্শের বার্তাও পৌঁছাতে হয়েছে। এরূপ পরিবর্তন করতে চাওয়া যে কোন রাষ্ট্রকে সে সময়ের বৃহৎ শক্তিবর্গের (বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য) শত্রুতা ও আক্রমণের মুখে স্বাভাবিকভাবেই পড়তে হতো। এ শক্তিগুলো উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রকে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে দেখেছে। তারা (মুসলিমরা) বিশ্বাস করতো, এটা দুই দলের মধ্যে অনিবার্যরূপে একটা সংঘাত সৃষ্টি করবে। সুতরাং মুসলিমরা সে সময়ে, আজ যাকে বলা হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, তা গ্রহণ করার মতো অবস্থানে ছিল, যাতে করে তারা যেসব দেশের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের আদর্শ ও স্বার্থে ভিন্নতা রয়েছে, প্রতিবেশী সেসব দেশের সম্ভাব্য হুমকির বিরুদ্ধে নিজেদের ভূখণ্ডকে রক্ষা করতে পারে।

আল-কারাদাউই কোন্ ইসলামিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন, তা নির্দিষ্ট করেননি। প্রথমতঃ মদীনায় ইসলামিক রাষ্ট্র এল কোথা থেকে? সেখানে নবি কি শরণার্থী ছিলেন না? একজন শরণার্থী বসতিস্থাপনকারী হিসেবে মদীনার উপর নবির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কী দাবি থাকতে পারে?

মদীনায় নবির ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ছাড় দিয়ে চলুন দেখি তিনি কী উপায়ে সে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেন! বানু কাইনুকা ইহুদিরা কি মুসলিমদের উপর কোন হামলা করেছিল, যা মোহাম্মদকে কোনরূপ সুযোগ না দিয়ে ৬২৪ সালে তাঁর ঘাড়ে ইহুদি সম্প্রদায়টির উপর প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়? উল্লেখ্য যে, বানু কাইনুকার উপর মোহাম্মদের এ আক্রমণটি ঘটে মদীনার পৌত্তলিক ও ইহুদিরা দয়া পরবশ হয়ে সেখানে তাঁকে আশ্রয় দানের মাত্র দেড় বছর পর।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মোহাম্মদ বানু কাইনুকা ইহুদি সম্প্রদায়কে আক্রমণ করেন এক ইহুদী বালকের দুষ্টুমি করে এক মুসলিম মহিলাকে উত্যক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এজন্য এক মুসলিম ঐ ছেলেটিকে হত্যা করে। পরবর্তীতে ইহুদিরাও সে মুসলিমকে হত্যা করে।

---

৪. Pope quoted Emperor Manuel II Palaeologus (1391): "*Show me just what Muhammad brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith be preached*."

৫. Doughty S and Medermott N (2006) *The Pope must die, says Muslim*, Daily Mail (UK), 18 September.

৬. Islam Online, *Muslim Insist on Pope's Apology*, 15 Sept, 2006; http://www.islamonline.net/English/News/2006-09/15/01.shtml

৭. Yusuf Al-Quradawi (2007) *The Truth about the Spread of Islam*, Islam Online website, 06 Aug.

এ অজুহাতে নবি গোটা বানু কাইনুকা গোত্রকে আক্রমণ করে তাদের সবাইকে গণহারে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন, যদি ভণ্ড আব্দুল্লাহ হস্তক্ষেপ না করত। যদিও এ ঘটনাটিকে বানু কাইনুকার বিরুদ্ধে মোহাম্মদের আক্রমণের কারণ বলা হয়, কিন্তু ইব্‌নে ইসহাক ও আল-তাবারি লিখিত মোহাম্মদের জীবনীতে এ আক্রমণের জন্য খুবই নিছক একটা কারণের (যা কোন কারণই নয়) কথা বলা হয়েছে। আল-তাবারি আল-জুহুরি উদ্ধৃত জিব্রাইলের মোহাম্মদের কাছে আনা একটি আয়াতের কথা উল্লেখ করেন, যাতে বলা হয়েছে: "*কোনও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতার ভয় কর, তাহলে একইভাবে তাদের প্রতি তাদের চুক্তি ছুড়ে মার*" (কোরান ৮:৫৮)। মোহাম্মদ তখন বলেন: "*আমি বানু কাইনুকাকে ভয় পাই*" এবং এটা বলে '*ঈশ্বরের বার্তাবাহক তাদের দিকে অগ্রসর হন।*'[৮]

স্পষ্টতঃ এ বর্ণনাটি যদি বানু কাইনুকাকে আক্রমণের সত্যি কারণ হয়, তাহলে সে আক্রমণের জন্য মোহাম্মদের আদৌ কোন ভিত্তি ছিলনা। অথচ কেবলমাত্র ভণ্ড আব্দুল্লাহ বিন ওবেই-এর জোর হস্তক্ষেপ আত্মসমর্পণকারী ইহুদিদের সবাইকে গণহত্যা, যা ছিল মোহাম্মদের মূল পরিকল্পনা, তা থেকে রক্ষা করে এবং তাদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নবিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এমনকি উত্যক্ত করার ঘটনাটি সত্য হলেও, এ সামান্য ঘটনায় উত্যক্তকারী বালকটিকে কোন বিচারেই হত্যা করা যায় না। এ সামান্য ঘটনায় গোটা ইহুদি গোত্রকে আক্রমণের জন্য নবির সে সিদ্ধান্ত, ন্যায়বিচারের ন্যূনতম মানের পর্যায়েও পড়ে না। আর ইহুদি গোত্রটির সবাইকে হত্যার পরিকল্পনা এবং সেটা কার্যকর করতে না পেরে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিস্কার করা ছিল চরম বর্বরতা।

মোহাম্মদ একইভাবে ৬২৫ সালে বানু নাদির ও ৬২৭ সালে বানু কোরাইজা গোত্রকে আক্রমণ করেন। পুনরায় প্রশ্ন উঠে: বানু নাদির ইহুদিরা কি মুসলিম বা তাদের রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করেছিল, যা মোহাম্মদকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণে বাধ্য করে? বানু নাদিরের উপর আক্রমণের কারণ ছিল নাদির নেতার বাড়িতে ছাদের উপর থেকে পাথর ছুড়ে তাঁকে হত্যার চক্রান্ত, যা ছিল এক নিতান্তই অবাস্তব বা ভূয়া অভিযোগ, যে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত শিষ্যদেরও কোনই ধারণা ছিলনা। এ ভিত্তিহীন অভিযোগ উদ্ভাবন করে তিনি বানু নাদিরকে আক্রমণ করেন ও নির্বাসনে পাঠান। বানু কোরাইজা ইহুদিরাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কিছুই করেনি। কিন্তু মোহাম্মদ তাদের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি ভঙ্গের ভূয়া অভিযোগ তোলেন। অথচ কথিত চুক্তি সম্ভবত কখনো বিদ্যমান ছিল না (ইতিমধ্যে আলোচিত)। বানু কোরাইজা ইহুদিদের নৃশংসভাবে হত্যা ছিল ৬২৪ সালে বানু কাইনুকার বিরুদ্ধে তাঁর মূল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মাত্র। আব্দুলাহর হস্তক্ষেপে তিনি সে পরিকল্পনা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মোহাম্মদ ৬২৫ সালে তখনো ক্ষমতাশালী আব্দুল্লাহ বানু নাদিরের পক্ষে যুদ্ধ করার হুমকি দিলে তিনি নাদির গোত্রকে নির্বাসনে পাঠানোর মনস্থ করেন। ৬২৭ সালে বানু কোরাইজার উপর আক্রমণের সময় মোহাম্মদ দুর্বল আব্দুল্লাহর নিন্দা উপেক্ষা করেন। দুই-দুই বার হতাশার পর এবার ইহুদিদেরকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে নবি ইহুদিদের প্রতি তাঁর মূল পরিকল্পনা কার্যকর করেন। আব্দুল্লাহ ছিলেন এক হৃদয়বান, ন্যায়বান মানুষ। অথচ তিনি কোরান, সুন্নত ও অন্যান্য ইসলামি লেখায় হিপোক্রিট বা ভণ্ড হিসেবে বারংবার নিন্দিত হয়েছেন।

মোট কথা, প্রথমতঃ মোহাম্মদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনোই অধিকার ছিল না মদীনায়, যেখানকার লোকেরা তাঁর বিপদের সময় বসবাসের জন্য অনুগ্রহপূর্বক তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। অথচ তিনি মদীনায় তাঁর ইসলামিক রাষ্ট্রের বীজ বপন করেন মদীনার জনগণের, বিশেষ করে ইহুদি জনগোষ্ঠীর, উপর চরম নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা প্রয়োগ করতঃ তাদেরকে গণহারে নির্বাসনে পাঠিয়ে, হত্যা করে ও দাস বানিয়ে।

শক্তিশালী পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দু'টোর কাছ থেকে মদীনাস্থ ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতা সম্পর্কিত আল-কারাদাউইর উদ্ধৃতি একটা ভিত্তিহীন মিথ্যা উদ্ভাবন মাত্র। বাইজেন্টাইন বা পারস্যের শাসকরা কখনোই মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করেনি। বরং মোহাম্মদই তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রদর্শনে ৬২৮ সালে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সে সাম্রাজ্য দুটোর শাসকদের নিকট চিঠি পাঠিয়েছিলেন, '*ইসলাম গ্রহণ অথবা ভয়ঙ্কর পরিণতি মোকাবেলা*'র হুমকি দিয়ে। এ সময় মোহাম্মদের সম্প্রদায় ছিল নিতান্তই একটা দুর্বল শক্তি, যখন তারা মক্কানগরী দখলের সামর্থ্যও অর্জন করে উঠেনি। যথার্থরূপেই বিশ্বের দুই সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসক তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাটুকুও না করে সে হুমকিপত্রকে উপেক্ষা করেন।

মোহাম্মদের চিঠিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় উভয় সাম্রাজ্যকেই ব্যাপক মূল্য দিতে হয়। এর দু'বছর পর মোহাম্মদ নিজে ৩০ হাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রত্যাশায় বের হয়ে সিরিয়ার নিকট তাবুকে পৌঁছেন। পরবর্তী দুই দশক ধরে মোহাম্মদের অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ইসলামি বাহিনী পারস্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেও ধ্বংসাত্মক অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। কোনো রকম উস্কানি, হুমকি বা শত্রুতা ছাড়াই এসব আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো হয়। মোহাম্মদ নিজের বাইজেন্টাইন ও পার্শিয়ান শাসকদেরকে তাঁর শাসনের কাছে নতি স্বীকারের দাবির মাধ্যমে শত্রুতার উস্কানি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দুই সম্রাট ক্ষুদ্র মোহাম্মদের সে শত্রুতামূলক উস্কানি উপেক্ষা করে নিজেদের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনে।

বিদেশী শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন

আল-কারাদাউইর মতে, মুসলিমরা যুদ্ধে রত হয়েছিল:

> অন্যান্য দেশের শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করার জন্য, যারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিতে তাদের প্রজাদের বাঁধা দেয়। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো (সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশে) অন্যান্য দেশের জনগণের কাছে ইসলামকে পরিচিত করে তোলা। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী সরকারগুলো তাদের নাগরিকদেরকে ইসলামের কথা ও কোরানের আহ্বান শুনতে দেয় নি। ওসব শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা বা উৎপীড়ন ইসলামের সর্বজনীন আহ্বান

---

[৮]. Al-Tabari, Vol. VII, p. 86

ছড়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং নবি (তাঁর উপর শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক) নিকটস্থ দেশসমূহের শাসকদের নিকট পত্র মারফত ইসলামের আহ্বান করেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে, তারা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে তাদের নাগরিকদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ী থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন, '*যদি তুমি এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর, তুমি তোমার জনগণকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ী থাকবে।*' তিনি পারস্য সম্রাটের কাছেও লিখেছিলেন, '*যদি তুমি ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে ম্যাজিয়ান (জরাথুষ্ট্রবাদী)-দেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ী থাকবে।*' এবং মিশরের গভর্নর আল-মুকাওয়াকিসকে তিনি লেখেন, '*ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে তুমি কপ্ট'দেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ী থাকবে।*' সুতরাং অন্যান্য দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণ হলো ইসলাম ও ওসব দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যকার প্রতিবন্ধকতা দূর করা, যাতে করে কোনরূপ শাস্তির ভয় ছাড়া তারা নিজেদের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নিতে পারে – সর্বশক্তিমান আল্লাহকে তারা বিশ্বাস করবে নাকি অবিশ্বাস করবে।

এসব যুক্তি আলোচনার আগে দেখে নেয়া যাক, কীভাবে আল-কারাদাউই নিজের কথাতেই স্ববিরোধিতা করছেন। এর আগে তিনি দাবি করেন যে, বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের শত্রুতা মুসলিমদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে বাধ্য করেছিল, যা পুরোপুরি ভিত্তিহীন বা অজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। তাঁর পরবর্তী যুক্তিতে বলেন: মুসলিমরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধই করেছিল – কারণ পারস্য, রোম ও মিশরের শাসকরা ইসলামের সর্বজনীন বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পথে বাঁধা সৃষ্টি করেছিল, ঐ দুই শক্তিশালী সাম্রাজের কাছ থেকে মুসলিমদের হুমকির মুখে পড়ার কারণে নয়। অতঃপর তিনি একটি লাইন উল্লেখ করেছেন, গোটা চিঠি নয়, যা নবি মোহাম্মদ ওসব দেশের শাসকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো চিঠি সম্পর্কে ইব্‌নে ইস্‌হাক লিখেছেন: '*নবির চিঠিসহ দিহাইয়া বিন খলিফা আল-কালবি হিরাক্লিয়াসের কাছে এলেন। ঐ চিঠিতে বলা হয়: 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে নিরাপদ থাকবে, এবং আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন; কিন্তু তুমি যদি ইসলাম প্রত্যাখ্যান কর, কৃষকদের পাপ তোমার উপর বর্তাবে।*''[৯] একইভাবে ওমানের রাজার কাছে প্রেরিত মোহাম্মদের চিঠিতে (ইতিপূর্বে উল্লেখিত) দাবি করা হয়: '*ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি নিরাপদ থাকবে। তুমি ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করলে, তুমি রাজা হিসেবে বহাল থাকবে। কিন্তু যদি ইসলাম থেকে বিরত থাক, তুমি শাসন ক্ষমতা হারাবে এবং আমার নবুয়তি প্রমাণ করতে আমার ঘোড়া তোমার এলাকায় ঢুকবে।*'

চিঠিগুলো সম্পর্কে আল-কারাদাউই যা বলেন, চিঠির প্রকৃত ভাষ্য তার বিপরীত। বিদেশী রাজা ও সম্রাটদের কাছে পাঠানো এসব চিঠির অর্থ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সনির্বন্ধ অনুরোধ নয়। চিঠির মূল ভাষ্য ছিলো: *ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা চাইলে। অন্যথায় মোহাম্মদের ঘোড় সওয়ার বাহিনীর নিষ্ঠুরতা নেমে আসবে তোমাদের উপর*। এসব চিঠিতে স্পষ্টতঃই সহিংসতার হুমকি দেওয়া হয়, যদি ওসব শাসক ইসলাম গ্রহণে ও মোহাম্মদের কাছে নতি স্বীকারে অস্বীকৃতি জানায়। এটা অবশ্যই আজকের খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার কিংবা প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার লাভের অনুরূপ ছিল না।

এখন চলুন আমরা আল-কারাদাউইর সাথে একমত হই যে, নবির চিঠি বলেছে: '*যদি তারা এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তারা তাদের নাগরিকদের পথভ্রষ্ট বা বিভ্রান্ত করার জন্য দায়ী থাকবে।*' কিন্তু ইসলামের কাছে বশ্যতা দাবিকারী মোহাম্মদের চিঠি ওসব শাসকরা প্রত্যাখ্যান করলে কীভাবে তা তাদের নাগরিকদের বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট করে? ইসলামের আহ্বান সম্বলিত চিঠি প্রত্যাখ্যাত হলেই নবি বা পরবর্তী খলিফাগণ সে বিদেশী ভূখণ্ড আক্রমণ করবেন, এটা কী ধরনের যুক্তি? ইসলাম বিস্তারের জন্য মোহাম্মদের পন্থা যদি শান্তিপূর্ণই হতো, তাহলে প্রথমে হুমকি এবং পরে আক্রমণের পরিবর্তে ওসব দেশের জনসাধারণকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি মিশনারি পাঠাতে পারতেন। পারস্য, মিশর ও বাইজেন্টাইনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রচারের জন্য মোহাম্মদ বা তাঁর খলিফাদের উদ্যোগ গ্রহণের কোনই নজির ইসলামি সাহিত্যে বা ইতিহাসে নেই। এখানে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর আল-খাত্তাব ইরানের সার্বভৌম শাসক ৩য় ইয়াজদগার্দ-এর নিকট তাঁর আনুগত্য দাবি অথবা মুসলিম কর্তৃক ধ্বংস মোকাবেলা করার কথা বলে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তা তুলে ধরা হলো:

> প্রাচ্যের শাহকে: আমার বশ্যতা স্বীকার ও আমার শর্তগ্রহণ ছাড়া তোমার ও তোমার জাতির জন্য ভাল কোনো ভবিষ্যত আমি দেখছি না। এক সময় ছিল যখন তোমার দেশ অর্ধপৃথিবী শাসন করেছে, কিন্তু দেখ কিভাবে এখন তোমার সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত সীমান্তে তোমার বাহিনী পরাজিত। তোমার জাতি বিলুপ্তির পথে। আমি তোমাকে পথ দেখাতে পারি, যা দ্বারা তুমি এ দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচতে পার। যেমন তুমি এক ঈশ্বরের পূজা কর, একমাত্র দেবতা, একমাত্র ঈশ্বর যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমি তোমার কাছে তাঁর বার্তা আনছি। তোমার জাতিকে আদেশ কর মিথ্যা অগ্নিপূজা বন্ধ করতে ও আমাদের সাথে যোগ দিতে, যা হবে সত্যের পথে যোগদান।
>
> বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর উপাসনা কর... এবং মুক্তির পথ হিসেবে ইসলাম গ্রহণ কর। এখন তোমার বহুঈশ্বরবাদী পথ বন্ধ কর ও মুসলিম হয়ে যাও, যাতে তুমি মহান আল্লাহকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করতে পার। তোমার নিজের অস্তিত্বের ও পারস্যবাসীর শান্তির জন্য এটাই একমাত্র পথ। কোনটা তোমার ও পারস্যবাসীর জন্য ভাল সেটা বুঝলে তুমি এটাই করবে। বশ্যতা স্বীকারই তোমার একমাত্র পথ।[১০]

আল-কারাদাউই আমাদেরকে বলতে চান যে, ধরুন সৌদির বাদশাহ কিংবা ইরানের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সর্বজনীন ইসলামের কাছে বশ্যতা স্বীকার বা আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান সম্বলিত একটি চিঠি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রত্যাখ্যান করল। তাহলে আমেরিকাকে আক্রমণ মুসলিমদের জন্য বৈধ হয়ে গেল। বাস্তবিকপক্ষে, ২০০৬ সালে মানবজাতির ত্রাণকর্তাস্বরূপ ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমদিনেজাদ প্রেসিডেন্ট বুশ ও আমেরিকার জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার আহ্বান জানান। একইভাবে আল-কায়েদার নেতারা বারংবার অবিশ্বাসী বা নাস্তিক বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকাকে, ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছে। সুতরাং আমেরিকাবাসীদের মাঝে ইসলামের সর্বজনীন বার্তাপ্রচারে প্রেসিডেন্ট বুশ বাঁধা দান করেছেন এবং সে কারণে আমেরিকা ইতিমধ্যেই মুসলিমদের দ্বারা সহিংস আক্রমণ ও বিজয়ের

---

৯. Ibn Ishaq, p. 655

১০. Letter of Omar, *Khalifat of Arabs to Shahanshah of Persia*; http;//www.youtube.com/watch/v=fwnKblyx96s; accessed 10 Sept, 2008.

জন্য একটা বৈধ টার্গেট বা লক্ষ্য হয়ে গেছে। আল-কায়েদা ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করেছে এবং সুযোগ পেলেই আরো আক্রমণের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে তাকে ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করানোর প্রত্যয়ে। আমেরিকাকে পরাজিত করার ক্ষমতা থাকলে, প্রেসিডেন্ট আহমদিনেজাদ খুব সম্ভব 'বড় শয়তান'কে আক্রমণ করে বসত, ঠিক যেমন করে সপ্তম শতাব্দীতে আরব মুসলিমরা তার বিধর্মী পারস্যের পূর্বপুরুষদেরকে আক্রমণ করেছিল।

উৎপীড়ক শাসকদের হাত থেকে দুর্বল দেশকে মুক্ত করা

তৃতীয় যুক্তিটিতে আল-কারাদাউই বলেন:

> যেহেতু ইসলাম মানুষের দ্বারা মানুষের দাসত্ব মোচনের সংগ্রাম, সুতরাং শক্তিশালী দখলদারের হাত থেকে নির্যাতিত দুর্বল জনগণকে উদ্ধার ছিল ইসলামের একটা লক্ষ্য। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে মুসলিমরা অত্যাচারী বিদেশী শক্তির হাত থেকে দুর্বল জনগণকে উদ্ধারের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। বাইজেন্টাইন শাসকরা মিশরের সমৃদ্ধি শোষণ করতো ও জনগণকে এতটাই নিপীড়ন করতো যে, মিশরীয়রা ইসলামকে স্বাগত জানায়। ফলে মুসলিমরা মাত্র ৮,০০০ যোদ্ধা নিয়ে মিশরে প্রবেশ করে বাইজেন্টাইনের শাসন থেকে মিশরকে মুক্ত করতে সফল হয়।

আল কারাদাউইর একথা বলা একেবারেই হাস্যকর যে, '*ইসলাম মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্ব মোচনের সংগ্রাম*', বিশেষ করে যখন কোরান প্রকাশ্যরূপে দাসত্বকে অনুমোদন দেয়। মুসলিমরা মুক্ত মানুষ, নারী-পুরুষ ও শিশুকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার গুরুরূপে নবি মোহাম্মদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে (৭ম অধ্যায় দেখুন)। পরন্তু তিনি পুনরায় এখানে তাঁর আগের দাবির স্ববিরোধিতা করেছেন যে, পারস্য ও বাইজেন্টিয়ামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আত্মরক্ষামূলক ছিল। এখানে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, মুসলিমরা নিজে থেকেই 'আক্রমণাত্মক' যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল এক তথাকথিত মহৎ উদ্দেশ্যে: নিষ্ঠুর পারস্য ও বাইজেন্টাইন শাসকদের হাত থেকে নির্যাতিত জনগণকে মুক্ত করার জন্য।

নবি ও পরবর্তী মুসলিম শাসকরা কি ওসব উৎপীড়ক শাসকদের কবল থেকে জনগণকে মুক্ত করতেই বিদেশী রাষ্ট্র দখলের অভিযানে নিযুক্ত হয়েছিলেন? এমন দাবির পক্ষে আদৌ কোন প্রমাণ নেই। ইসলামের ইতিহাস বা সাহিত্যে নবি মোহাম্মদ কিংবা পরবর্তী মুসলিম শাসকদের কাছে বাইজেন্টাইন সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য মিশরের গভর্নর বা জনগণের নিকট থেকে কোন রকম অনুরোধের কোনোই উল্লেখ নেই। পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের জনগণের নিকট থেকেও তাদের উৎপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাত থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য নবি মোহাম্মদ বা পরবর্তী মুসলিম শাসকদের কাছে পাঠানো অনুরোধের কোনই নজির নেই। বরঞ্চ ৬২৮ সালে নবি মোহাম্মদ মিশরের গভর্নরের নিকট যখন চিঠি পাঠান, তাতে তিনি সরাসরি গভর্নরকে হুমকি দেন যে, '*ইসলাম গ্রহণ করো, তুমি নিরাপদ থাকবে।*' মোহাম্মদ তাতে মিশর ও তার জনগণকে বাইজেন্টাইন নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্যের কোন কথা উল্লেখ করেননি।

সহিংসতার মধ্য দিয়ে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটার অভিযোগ খণ্ডনের লক্ষ্যে আল-কারাদাউইর উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা বিনা উস্কানিতে আক্রমণাত্মকভাবেই বিদেশী ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলো করেছিল ওসব জনগণের মাঝে ইসলামের সর্বজনীন বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ তিনি নিজে স্বীকার করেন যে মুসলিমরা বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করেছিল কেবলমাত্র ইসলাম বিস্তারের জন্যই, তাঁর নিজের ভাষায়, '*ইসলামের সর্বজনীন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য।*' নিজস্ব যুক্তিতেই বিজ্ঞ শেখ এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ইসলাম বস্তুতঃ তলোয়ারের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অথচ এ অভিযোগটি খণ্ডন করতে তিনি কলম ধরেছিলেন।

স্বেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়ন দূর করা

আল-কারাদাউই আরো দাবি করেন যে, মুসলিম পরিচালিত ওসব যুদ্ধ মূলত পারস্য ও বাইজেন্টাইন শাসক কর্তৃক তাদের জনগণের উপর চাপানো স্বেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়ন নির্মূল করার জন্য করা হয়েছিল। এখন সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যাক ওসব শাসকদের দ্বারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত জনগণের জন্য মুসলিমরা কী প্রকারের ন্যায়বিচার ও শান্তি আনয়ন করেছিল।

মদীনার ইহুদিরা যখন ইসলামের সর্বজনীন বার্তা প্রচারে বাঁধা দেয়, নবি তাদের উপর আক্রমণ করেন। বানু কাইনুকা ও বানু নাদির গোত্রকে নির্বাসিত করেন এবং বানু কোরাইজার লোকদেরকে হত্যা ও তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস বানান। ৬৩৮ সালে খলিফা ওমরের জেরুযালেম দখলকালে মুসলিমরা এমন ব্যাপক ধ্বংস ও লুণ্ঠন কার্যে লিপ্ত হয় যে, এর ফলশ্রুতিতে পরের বছর 'হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষ ও প্লেগরোগে মৃত্যুবরণ করে।' ৬৩৪ সালে মুসলিমদের অভিযানে গাজা ও কাইসারিয়ার মাঝখানের গোটা অঞ্চলটা ধ্বংস করে ফেলা হয়। চার হাজার খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও সামারিতান কৃষক তাদের ঘরবাড়ি ও দেশ রক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারায়। ৬৩৫ ও ৬৪২ সালের মধ্যে মেসোপটেমিয়া অভিযানের সময় খ্রিষ্টান মঠগুলো লুণ্ঠন ও সন্ন্যাসীদের হত্যা করা হয়। মনোফিসাইট আরবদের হত্যা বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। ইলামের জনগণ তরবারির তলায় প্রাণ হারায়।'[১১]

আল-বিলাদুরী ও মোহাম্মদ আল-কাফী (চাচনামায়)-র বর্ণনায় ভারতে মোহাম্মদ বিন কাসিমের প্রথম সফল আক্রমণে: দেবালে মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়; তিন দিনব্যাপী চলে হত্যাযজ্ঞ; কয়েদিদের বন্দি করা হয়। নিরুনে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও তাদের মন্দিরগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয় ও সেস্থানে মসজিদ স্থাপন করা হয়। রাওয়ার ও আসকালান্দায় অস্ত্রধারী সমস্ত লোককে হত্যা করে তাদের নারী ও

---

[১১]. Ibn Warraq, p. 219

শিশুদেরকে দাস হিসেবে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। মুলতানে অস্ত্র ধরতে সক্ষম এমন সমস্ত লোককে হত্যা করা হয়। নারী ও শিশুর পাশাপাশি মন্দিরের ছয় হাজার ধর্মযাজককে বন্দি বা দাস করা হয়।[১২]

ইসলামের অভিযানে বিজয়ী মুসলিমদের তিনদিনব্যাপী সাধারণ হত্যাযজ্ঞ চালানোর একটা রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান খলিফা ওমর। ৬৪১ সালে আলেক্সান্দ্রিয়া নগরী দখলের পর খলিফা ওমরের নির্দেশে সেখানে তিনদিন ব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ, লুণ্ঠন ও ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল পতনের পর সুলতান মেহমুদ তাঁর সেনাদের তিনদিনব্যাপী বেপরোয়া হত্যাকান্ড ও অবাধ লুটতরাজের সুযোগ দেন। তারা নগরীতে প্রবেশ করে নগরীর রাস্তায় নারী-পুরুষ-শিশু যাকে পায় তাকেই বেপরোয়াভাবে হত্যা করে। রাস্তা দিয়ে রক্তের বন্যা বয়ে যায়।[১৩] আমির তিমুর বা তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেছিলেন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার দায়িত্ব পূরণে এবং ১৩৯৯ সালের ডিসেম্বরে একদিনে তিনি দিল্লিতে ১০০,০০০ (এক লাখ) বন্দীকে হত্যা করেন।[১৪]

আল-কারাদাউই আমাদেরকে বলেন যে, মিশর বিজয় সেখানকার নির্যাতিত জনগণের কাছে এতই কাঙ্ক্ষিত ছিল যে, মাত্র ৮,০০০ যোদ্ধার প্রয়োজন হয়েছিল মিশরকে দখল করতে। এখানে ইসলামের শান্তির সে অগ্রদূতদের নিকট থেকে মিশরের নাগরিকরা যে পুরস্কার পেয়েছিল তার একটা নমুনা উল্লেখ করা যাক। খলিফা ওমরের বাহিনী আলেক্সান্দ্রিয়া দখলের পর সেখানে যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে ওয়ারাক লিখেছেন, আমর মিশরে প্রবেশ করে ফাইয়ুম'এর নিকটবর্তী বেহ্নেসা শহর দখল করেন; তারপর তিনি সেখানকার সমস্ত বাসিন্দাকে নির্মূল করেন – আটক বা আত্মসমর্পিত নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে। একই ভাগ্য বরণ করতে হয় ফাইয়ুম ও অ্যাবয়েতের জনগণকে। ইব্নে ওয়ারাকা আরো জানান:[১৫]

> 'নিকিউতে সমস্ত জনগণকে তরবারির তলে জীবন দিতে হয়। আরবরা সেখানকার বাসিন্দাদের বন্দি করে। আর্মেনিয়ায় ইউচেইতার সব মানুষকে মুছে ফেলা হয়। সপ্তম শতকে আর্মেনীয় ইতিহাসপঞ্জি থেকে জানা যায়, কীভাবে আরবরা আসিরিয়ার জনগণকে হত্যা করেছিল ও কিছু লোককে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। এবং অতঃপর কিভাবে তারা লেক ভ্যান'এর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দারন এলাকায় কী ভয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ড করেছিল। ৬৪২ সালে ডিভিন শহরের মানুষের কপালে দুর্ভাগ্যের পালা। ৬৪৩ সালে আরবরা আবার ফিরে আসে ধ্বংসযজ্ঞ, নির্মূল অভিযান ও দাসত্বের শিকল নিয়ে।'

এটাই ছিল শান্তি ও ন্যায় বিচারের ধরন, যা মুসলিম যোদ্ধারা বিজিত জনগণকে এনে দিয়েছিল কথিত পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী শাসকদের 'স্বেচ্ছাচারিতা, উৎপীড়ন ও অন্যায়' নির্মূল করে। বিজয়কালে মুসলিম হানাদারদের দ্বারা সংঘটিত এসব বর্বর নিষ্ঠুরতার পরও মুসলিম শাসনাধীনে পরাভূত বা বিজিত প্রজাদের নিপীড়ন ও শোষণের আদৌ কোন উপশম হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, খলিফা ওমরের শাসনকালের প্রথম দিকেই বিজিত জনগণের উপর আরোপিত করের বোঝা বহন তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছিল। মুসলিম ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ফজল আহমদের মতে, আবু লুলু ফিরোজ নামে এক পারস্যদেশীয় দাস অতিরিক্ত করের বোঝায় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন খলিফা ওমরের কাছে গিয়ে অনুনয় করে: "*আমার মনিব আমাকে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ভীষণভাবে শুষে ফেলছেন, অনুগ্রহ করে তা হ্রাস করা হোক।*"[১৬] ওমর তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এরই আক্রোশে ক্রোধান্বিত আবু লুলু পরদিন খলিফাকে ছোরাবিদ্ধ করে হত্যা করে।

মুসলিম শাসকদের আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে আল-কারাদাউইর সঙ্গে একমত পোষণ করেন জাকির নায়েকও। তিনি লিখেছেন: '*কোন কোন সময় নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইসলামে কেবল শান্তি ও ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিতে শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।*'[১৭] আমরা দেখবো কীভাবে ভারতে ইসলামের শান্তি ও ন্যায়বিচারের শাসন অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের দরজায় ভিক্ষুকে পরিণত করেছিল। তাদের উপরে চাপানো করের বোঝা পরিশোধের নিমিত্তে তাদেরকে স্ত্রী-সন্তানকে বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় ও বিপদগ্রস্থদের জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর মধ্যে বসবাসের জন্য আশ্রয় নিতে হয়েছিল, যাদের রাস্তায় ডাকাতি করে কিংবা জনহীন জঙ্গলে যা পেত তার উপর নির্ভর করেই বাঁচতে হত (পরে আলোচিত)।

তদুপরি আল-কারাদাউই দাবি করেছেন: জনগণ বিজয়ী মুসলিম হানাদারদেরকে উল্লসিত অভিনন্দন জানিয়েছিল। পূর্ববর্তী স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক শাসকদের হাত থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় জনগণ দ্বারা বিজয়ী মুসলিমদের অভিনন্দন জানানোর এ দাবিও ভিত্তিহীন। আগেই বলা হয়েছে যে, সাধারণ কৃষকরাও মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। ৬৩৪ সালে গাজা ও কায়সারিয়ার মধ্যখানে প্রায় ৪,০০০ হাজার কৃষক মুসলিম হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়ালে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। দেবাল বন্দরে মোহাম্মদ বিন কাসিম তিনদিন ধরে সেখানকার নাগরিকদের হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল কি হিন্দুরা মোহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনীকে হস্ত প্রসারিত করে স্বাগত জানিয়েছিল বলে? ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলে মুসলিম যোদ্ধারা তিনদিন ধরে সেখানকার মানুষ হত্যার কাজে লিপ্ত হয়ে রাস্তা-ঘাটে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। ১৫৬৮ সালে চিত্তোরে প্রায় ৩০,০০০ কৃষক তাদের রাজার পাশে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিল উদার ও মহান 'আকবর দ্য গ্রেট'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তারা আত্মসমর্পণ করলে আকবর তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।[১৮] আক্রান্ত রাষ্ট্রের তথাকথিত নির্যাতিত জনগণের নিকট থেকে মুসলিম সেনাদের প্রাপ্ত উল্লসিত অভিনন্দন এ রকমই ছিল।

---

১২. Eliot HM and Dawson J, *The History of India As Told by the Historians*, Low Price Publications, New Delhi, Vol. 1, p. 469

১৩. Runciman S (1990) *The Fall of Constantinople, 1453*, Cambridge, p. 145; Bostom AG (2005) *The Legacy of Jihad*, Prometheus Books, New York, p. 616-18

১৪. Lal KS (1999) *Theory and Practice of Muslim State in India*, Aditya Prakashan, New Delhi, p. 18

১৫. Ibn Warraq, p. 220

১৬. Ahmad F, *Hazrat Omar bin Khattab -- The Second Caliph of Islam*; http://path-to-peace.com/omer.html

১৭. Naik Z (1999) *Was Islam Spread by the Sword?* Islamic Voice, Vol. 13-08, No. 152

১৮. Smith VA (1958) *The Oxford History of India*, Oxford University Press, London, p. 342

অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকের লেখায়, মুসলিম হানাদাররা আক্রান্ত জনগণের দ্বারা কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। আক্রান্ত দেশের জনগণ যদি আক্রমণকারী বিজয়ী মুসলিমদেরকে স্বাগতই জানাবে, তাহলে মোহাম্মদ বিন কাসিমকে দেবালের জনগণের উপর তিনদিন ধরে হত্যাকাণ্ড চালানোর প্রয়োজন পড়ত না। আল-কাফি তার 'চাচ্‌নামায়' লিখেছেন: '*দেবালের অবিশ্বাসীরা আরবদের উপর চতুর্দিক থেকে এমন ঝটিকা বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে যে, ইসলামের বাহিনী দিশেহারা হয়ে যায় ও তাদের লাইন ভেঙ্গে পড়ে।*'[১৯] মুসলিমদের ভারত বিজয়ে ইসলামের মর্মস্পর্শী বার্তার কারণে স্বেচ্ছায় খুব কম মানুষই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সামগ্রিকভাবে বয়স্ক লোকেরা ইসলামি যোদ্ধাদের তরবারির তলে প্রাণ হারায় এবং অসহায় নারী ও শিশুরা দাসরূপে গৃহীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম আক্রমণকারীরা বিনা বাধায় ভূখণ্ড দখল করেছে, কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, জনগণ তাদেরকে উষ্ণ অভিনন্দনে বুকে তুলে নিয়েছিল; বরং অনিবার্য পরাজয়ের মুখে সেসব যুদ্ধে অর্থহীন প্রতিরোধ তুলে তারা চিহ্নিচিহ্ন হয়ে যাক, এটা তারা চায় নি।

১০২৪ সালে সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ সম্পর্কে ইব্‌নে আসির লিখেছেন: '*হিন্দু প্রতিরোধকারীরা দলে দলে সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করে ও তাদের হাত দ্বারা গলা জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করে আবেগের সঙ্গে আক্রমণ না করার জন্য তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। তারপর তারা পুনরায় মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার শপথ নেয়। সবশেষে তাদের সামান্য সংখ্যক লোক বেঁচে থাকে। মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে যায়।*'[২০] এরা ছিল সাধারণ মানুষ, যারা তাদের পবিত্র মন্দির রক্ষা করতে চেয়েছিল। মুসলিম হানাদাররা বারবার এ মন্দিরটিকে ধ্বংস করায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুদেরকে তাদের পবিত্র মন্দিরটি তিন-তিনবার পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছিল। এগুলো নিশ্চয়ই জনগণের দ্বারা বিজয়ী মুসলিম বাহিনীকে উল্লসিত অভিনন্দন জানানোর নজির নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধেরই নমুনা। বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ আল-বেরুনী সুলতান মাহমুদের বারংবার ভারত আক্রমণ ও তাঁর কীর্তি সম্পর্কে যা লিখেছেন তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, বিজয়ী মুসলিম শাসকরা বিজিতদের উপর কিরূপ আচরণ করেছিল। ১০১৭ সালে সুলতান মাহমুদের মধ্য এশিয়ার খোয়ারিজম রাজ্য দখলকালে পারস্যের স্বনামধন্য পণ্ডিত আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৫০) তার হস্তে ধৃত হন। মাহমুদ তাঁকে রাজধানী গজনীতে এনে দরবারের একজন কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। ভারত অভিযানকালে মাহমুদ আল-বেরুনীকে তার সঙ্গে ভারতে আনেন। তিনি ভারতের সর্বত্র দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে ঘুরে ঘুরে হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে দর্শন, অঙ্ক, ভূগোল ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি মুসলিমদের ভারত বিজয় সম্বন্ধে লিখেছেন: "*মাহমুদ দেশের সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও বিস্ময়করভাবে লুটপাট করেন। যার ফলে হিন্দুরা পরমাণু-ধূলার মতো বিচ্ছুরিত হয়ে যত্র-তত্র ছড়িয়ে পড়ে, অনেকটা জনগণের মুখে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর মতো। আর বিচ্ছুরিত জনগণের অবশিষ্টাংশ সমস্ত মুসলিমের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করে।*"[২১]

স্পেনে অভিনন্দন

কোন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনায় বিজিত জনগণের কিছু অংশ মুসলিম হানাদারদের স্বাগত জানিয়ে থাকতে পারে। মুসলিমদের স্পেন আক্রমণে ইহুদিদের দ্বারা অভিনন্দিত হবার দৃষ্টান্ত মুসলিমরা প্রায়শঃই তুলে ধরে। কিন্তু এ দাবিটির ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। স্টিফেন ও'শিয়া উল্লেখ করেন: '*অনেকে ধারণা করে যে, আইবেরিয়ার ইহুদিরা মুসলিমদেরকে তাদের মুক্তিদাতারূপে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু এ ধারণার পিছনে কোনও লিখিত প্রমাণ নেই।*'[২২] যাহোক স্পেনীয় ইহুদিদের দ্বারা মুসলিম হানাদারদেরকে স্বাগত জানানোর ফলাফল তাদের জন্য খুব একটা ভাল ছিলনা।

স্পেন তখন ছিল ভিসিগথিক শাসনের অধীনে। ভিসিগথরা ছিল উত্তর ইউরোপ থেকে আসা জার্মান জনগোষ্ঠী, সাধারণভাবে যাদেরকে বার্বারিয়ান বা বর্বর বলা হয়। এরা পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে স্পেন দখল করে। মুসলিমরা যেরূপ পরাজিতদের মুসলিম বানাতো দাস বানানোর মাধ্যমে কিংবা তলোয়ারের ডগায় মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে, ভিসিগথ শাসকরা স্পেনের খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের উপর সেরূপ জবরদস্তি করেনি। শুরুতে পৌত্তলিক ভিসিগথিক শাসকরা ইহুদি, খ্রিষ্টান বা পৌত্তলিক নির্বিশেষে সব নাগরিকদের প্রতি ছিল সহনশীল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলে ইহুদি ও পৌত্তলিক প্রজাদের প্রতি তাদের সহনশীলতা হ্রাস পায়। ৬৩৩ সালে ক্যাথলিক বিশপ বা যাজকরা, রাজাকে নির্বাচিত করার ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল, তারা সব ইহুদিকে বাধ্যতামূলক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের নির্দেশ ঘোষণা করে। এরপর থেকে ইহুদিদের প্রতি খ্রিষ্টান ভিসিগথিকদের ব্যবহার ও সম্পর্কে হানি ঘটে।

ভিসিগথিক রাজারাও ছিল মুসলিমদের মতই বিদেশী হামলাকারী। তারাও কৃষকদেরকে প্রবলভাবে শোষণ করতো। স্পেনের স্থানীয় আইবেরীয় জনগণ ছিল অনেকটা দাসের মত। তারা ভিসিগথিক শাসক পরিবারের জন্য মজুরিতে ক্ষেত-মজুরের কাজ করতো মাত্র। এর ফলে উত্তর আফ্রিকায় খলিফার গভর্নর মুসা বিন নুসায়ের যখন স্পেন আক্রমণ করেন, তখন কৃষকরা, যারা ছিল ভিসিগথ বাহিনীর মূল শক্তি, শাসকদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার কারণে লাঠি-বল্লম হাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে।[২৩] যদিও প্রথম দিকে স্পেনের ইহুদি ও কৃষকরা মুসলিম অভিযানে হয়ত অখুশি ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই তাদেরকে অনাকাঙ্খিত অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হয়। অচিরেই মুসলিম হানাদাররা শুরু করে দেয় লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং নারী-শিশুদেরকে ক্রীতদাসকরণ। কেবলমাত্র মর্যাদাসম্পন্ন ভিসিগথিক পরিবার

---

১৯. Sharma, p. 95-96
২০. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 470-71
২১. Sachau EC (2002) *Alberuni's India*, Rupa & Co., New Delhi, p. 5-6 (first print 1888)
২২. O'Shea S (2006) *Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Mediterranean World*, Walker & company, New York, p. 69
২৩. Fregosi P (1998) *Jihad in the West*, Prometheus Books, New York, p. 91

থেকেই ৩০ হাজার শ্বেতাঙ্গ কুমারী নারী ছিল দাস হিসেবে কব্জাকৃতদের মধ্যে।[২৪] এ. এস. ট্রিটনের মতে, এক অভিযানে মুসা প্রতিটি চার্চ ধ্বংস করে ও সেগুলোর ঘণ্টা ভেঙ্গে ফেলে। তারা আত্মসমর্পণ করলে মুসলিমরা যুদ্ধে নিহতদের ধনসম্পদ, গ্যালিসিয়ায় পলাতকদের ধনসম্পদ এবং চার্চের ধনসম্পদ ও সোনা-দানা, হীরা-জহরত করায়ত্ত করে।[২৫]

৭১১ সালে ইসলামের স্পেন বিজয় শুরুর পর চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সেখানে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা ও নিষ্ঠুরতা চলে। অবশেষে উমাইয়া রাজপুত্র আবদ আল-রহমান দামেস্ক থেকে পিছু ধাওয়াকারী আব্বাসীয় ঘাতকদের সামনে পালিয়ে যখন স্পেনে পৌঁছেন, তারপর সেখানে দৃশ্যত একটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। আবদ আল-রহমান স্পেনে উমাইয়া রাজবংশ (৭৫৬-১০৭১) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহুদি ও খ্রিষ্টান জিম্মি প্রজাদের বিরুদ্ধে গোঁড়া মুসলিম ও 'উলেমা'দের বৈষম্যমূলক ইসলামি আইন প্রয়োগে উদাসীনতা দেখানোর কারণে উমাইয়া শাসকরা ঐতিহাসিকভাবে 'গডলেস' বা 'ঈশ্বরহীন' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে (কারণ হিসেবে ৫ম অধ্যায়ে '*কিভাবে মুসলিমবিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত উৎকর্ষ সাধন করে?*' উপশিরোনাম দেখুন)। উমাইয়া শাসকরা অনেকটা সহনশীলতার সঙ্গে দেশ শাসন করতেন। তারা সাধারণতঃ মোহাম্মদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন এবং অমুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য কখনো চাপ দেননি, কর প্রদানের মাধ্যমে তারা রাজকোষ পূর্ণ করলেই খুশী ছিলেন।

স্পেনের যেসব ইহুদিরা মুসলিম হানাদারদেরকে মুক্তিদাতারূপে গণ্য করেছিল বলে বলা হয়, তারা অল্পদিনের মধ্যেই তাদের তথাকথিত মুক্তিদাতার স্বরূপ দেখতে পায়। শিঘ্রই তারা মুসলিম কর্তৃক নানারকম অসম্মান ও শোষণের শিকার হয়। মুসলিম শাসকরা তাদের উপর ইসলামি আইনে নির্দেশিত জিম্মিদের উপর আরোপযোগ্য অবমাননাজনক জিজিয়া, দুর্বহ খারাজ (বশ্যতা ও ভূমিকর) ও অন্যান্য কর আরোপ করেন। চার্চ ও সিনাগগ নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। ক্রীতদাসরূপে কব্জাকৃত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে শ্রমিকরূপে ব্যবহার করে ধ্বংসপ্রাপ্ত চার্চ সিনাগগের ইট, কড়ি-বর্গা, খুঁটি, দরজা-জানালা দিয়ে সেস্থানে মসজিদ গড়া হয়। ওমরের চুক্তি (নিচে দেখুন) অনুযায়ী তাদের জন্য অস্ত্রবহন, ঘোড়ায় চড়া, জুতা পড়া, চার্চের বেল বা ঘন্টা বাজানো, সবুজ কিছু পরিধান করা ও মুসলিম হামলাকারীদেরকে প্রতিহত করা নিষিদ্ধ হয়। যিশুকে স্বর্গীয় ঘোষণা ও ইসলাম থেকে কাউকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা বরাবরই মারাত্মক অপরাধ ছিল। ১০১০ ও ১০১৩ সালের মধ্যে কর্ডোভার নিকটবর্তী অঞ্চল ও স্পেনের অন্যান্য অঞ্চলে হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়। অমুসলিমদের সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে ১০৬৬ সালে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়, যার ফলে গ্রানাডার ৪,০০০ ইহুদির একটা গোটা সম্প্রদায়কে গণহত্যার মাধ্যমে নির্মূল করা হয়। স্পেনের ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মোজারাবদের (আরবীয়কৃত খ্রিষ্টান ক্রীতদাস) উপর চরম দুঃস্বপ্ন নেমে আসে যখন উত্তর আফ্রিকার গোঁড়া আলমোরাভিদ (১০৮৫-১১৪৭) ও আলমোহাদরা (১১৩০-১২৭০) স্পেন আক্রমণ করে উমাইয়াদের তাড়িয়ে দেয়। এসব গোঁড়া ধর্মীয় শাসকরা যেখানেই গেছে সেখানেই অবিশ্বাসীদের উপর সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। ১১৪৩ সালে আলমোহাদ খলিফা আল-মুমিন ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতিকারী ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার আদেশ দেন।[২৬] আলমোহাদ খলিফা আল-মুমিন (১১৩০-৬৩), আবু ইয়াকুব (১১৬৩-৮৪) এবং আল-মনসুর (১১৮৪-৯৯) কর্তৃক মৃত্যু ও দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ভয়ে ইহুদিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আলমোরাভিদ শাসকরা ১১২৬ সালে গ্রানাডার খ্রিষ্টানদেরকে মরক্কোয় নির্বাসিত করেন।[২৭]

১১৪৮ সালে আলমোহাদরা কর্ডোভা বিজয়ের পর ইহুদিদের হয় ইসলাম গ্রহণ নয় মৃত্যু, কিংবা নির্বাসন – এ তিনটির একটি বেছে নেয়ার নির্দেশ দেয়। এসময় বিখ্যাত ইহুদি ধর্ম শাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ মোজেস মাইমোনিদ (১১৩৫-১২০৪)-এর পরিবারসহ অন্যান্য অনেক ইহুদি নির্বাসন বেছে নেয়। অধিকাংশ মুসলিম অধিকৃত দেশে ইহুদিদের উপর একই রকম নিপীড়ন চলায় মাইমোনিদের পরিবার প্রথমে মরক্কোয় স্থায়ী হতে ব্যর্থ হয়ে পরে প্যালেস্টাইনে চলে যায়। মুসলিম ছদ্মবেশে প্রায় দুই দশক ইসলামি দেশে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত তাঁরা মিশরের ফুস্তাত-এ স্থায়ী হয়। মাইমোনিদ তাঁর লেখা '*দ্য এপিসল টু দ্যা জুজ অব ইয়েমেন*' গ্রন্থে মুসলিম দেশে ইহুদিদের উপর নেমে আসা নির্যাতন সম্পর্কে সম্যক ইঙ্গিত দিয়েছেন।[২৮]

তিনি ইয়েমেন, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইহুদিদের উপর নিপীড়ন ও জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরকরণ সম্পর্কে লিখেন: '*অবিরাম নির্যাতন-নিপীড়নের ফলে অনেকের মনে আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে দৃঢ়তা হারাবে ও সন্দেহ সৃষ্টি করবে অথবা বিপথে পরিচালিত হবে। কারণ তারা আমাদের দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছে। তারা আমাদের উপর শত্রুপক্ষের বিজয় ও কর্তৃত্ব দর্শন করছে।*' তিনি আরও লিখেছেন :

> ঈশ্বর আমাদেরকে আরবদের মাঝে ছুঁড়ে দিয়েছেন, যারা আমাদেরকে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতন করছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত ও বৈষম্যমূলক আইন পাস করছে, যা আমাদেরকে ধর্মগ্রন্থ পূর্বেই সতর্ক করেছিল, '*আমাদের শত্রুরাই আমাদের বিচার করবে*' (ডিউটেরোনমি ৩২:৩১)। তারা আমাদেরকে যতটা উৎপীড়ন, মর্যাদাহানি ও ঘৃণা করেছে ততটা কখনো কোন জাতি করেনি।

'আমরা তাদের দ্বারা মানুষের সহ্যের অতীত অসম্মানিত হয়েছি' – একথার উপর জোর দিয়ে মাইমোনিদ আরও লিখেছেন:

> *ইসাইয়া'র শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে আমরা আবাল-বৃদ্ধ সবাই অবমানিত হতে অভ্যস্ত হওয়ার সম্মতি দিয়েছি। ইসাইয়া আমাদেরকে বলেছেন: 'আমি প্রহারকারীকে আমার পিঠ ও গাল এগিয়ে দিয়েছি, যারা আমার চুল উপড়ে ফেলেছে' (৫০:৬)। তথাপি আমরা তাদের দুর্ব্যবহার থেকে মুক্তি পাইনা,*

---

২৪. Lal (1999), p. 103

25. Triton AS (1970) *The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects*, Frank Cass & Co. Ltd., London, p. 45

২৬. Walker, p. 247

২৭. Ibn Warraq, p. 226,236

২৮. Maimonides M (1952) *Moses Maimonides' Epistle to Yemen: The Arabic Original and the Three Hebrew Versions*, ed. AS Halkin, Trans. B. Cohen, American Academy for Jewish Research, New York

যা প্রায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে আমাদেরকে। আমরা যতই ভোগান্তির শিকার হই বা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে চাই না কেন, তারা আমাদের প্রতি সংগ্রাম ও বিক্ষোভ জাগ্রত করে। ডেভিড (নবি দাউয়ুদ) যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'আমি শান্তি চাই, কিন্তু আমি কথা বললে তারা যুদ্ধ করতে আসে' (সাল্ম ১২০:৭)। সুতরাং আমরা যদি হাস্যকর ও অযৌক্তিকভাবে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দাবি করি বা তাদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিব।

ভারতে এতগুলো হিন্দু কিভাবে টিকে থাকলো?

সহিংসতার মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার ঘটানোর অভিযোগ খণ্ডনে ড. নায়েক ভিন্ন একটা যুক্তি খাড়া করেছেন। তিনি অভিযোগটির প্রতিবাদ করেন এ বলে যে, ইসলাম যদি তরবারির দ্বারাই বিস্তার লাভ করত, তাহলে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে এতগুলো অমুসলিম টিকে থাকত না। তিনি লিখেন:

> মুসলিমরা মোট ১,৪০০ বছর ধরে আরব দেশ শাসন করছে। আজও সেখানে ১৪ মিলিয়ন কপটিক খ্রিষ্টান বসবাস করছে। যদি মুসলিমরা তরবারিই ব্যবহার করতো, তাহলে সেখানে একজন আরবও খ্রিষ্টান থাকত না।
>
> ভারতেও মুসলিমরা প্রায় হাজার বছর শাসন করেছে। চাইলে ভারতের প্রত্যেক অমুসলিমকে মুসলিমে ধর্মান্তরিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল। আজ সেখানে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি অমুসলিম। ভারতে আজকের অমুসলিমরাই প্রমাণ করছে যে, ইসলাম তরবারির দ্বারা বিস্তৃত হয় নি।

অথচ আল-কারাদাউই নায়েকের এ যুক্তির বিরোধিতা বা তা প্রত্যাখ্যান করেন এটা বলে যে, ইসলামের সর্বজনীন বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে মুসলিমদেরকে তরবারি ব্যবহার করতে হয়েছিল:

> তরবারি ভূগুণ্ড জয় করতে পারে, রাষ্ট্র দখল করতে পারে, কিন্তু কখনো মানুষের অন্তর খুলতে ও তার ভিতরে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারে না। ওসব দেশে সাধারণ মানুষ ও ইসলামের মধ্যেকার বাঁধাটা (অথাৎ অমুসলিম শাসন) সরে যাবার পরই কেবল সেখানে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল। কারণ এরপর তারা যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রের গণ্ডগোল থেকে দূরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইসলামকে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবে অমুসলিমরা মুসলিমদের চমৎকার নৈতিকতার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিল।

বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিত ডঃ ফজলুর রহমান, যাকে ইসলাম সম্পর্কে তার উদার ধারণার কারণে পাকিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালাতে হয়েছিল, তিনি কারাদাউইর মতকে সমর্থন করেন। রহমান মনে করেন যে, কোরানে বর্ণিত ধর্মীয়-সামাজিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদের (তরবারির দ্বারা) অনিবার্য প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি প্রশ্ন করেন: *সেটা ছাড়া কিভাবে একটা আদর্শিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?* অতঃপর সকলকে অনেকটা স্তম্ভিত করার মত তিনি বলেন: '*ইসলাম তরবারির দ্বারা বিস্তৃত*' কিংবা '*ইসলাম তরবারির ধর্ম*'-এ স্লোগান 'খ্রিষ্টানদের প্রচারণা' মাত্র। তারপর তিনি সরলভাবে স্বীকার করেন যে, '*ইসলাম বিস্তার ঘটার আগে একটা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে তরবারি প্রথমেই চলে আসে।*' তিনি লিখেছেন: '*তরবারি দিয়ে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ইসলাম নয়, ইসলামের রাজনৈতিক প্রভাব মাত্র, যাতে করে ইসলাম পৃথিবীতে কোরান নির্ণীত সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কেউ কখনো বলতে পারে না যে, ইসলাম তরবারি দ্বারা বিস্তৃত।*'[২৯]

জিহাদের প্রশ্নে আরব লীগের সেক্রেটারি জেনারেল (১৯৫২-৭১) আব্দুল খালেক হাসৌনা এক সাক্ষাতকারে (১৯৬৮) একইভাবে বলেন: '*ইসলাম তলোয়ার দ্বারা আরোপিত নয়, শত্রুরা যেমনটা দাবি করে। জনগণ নিজেদের পছন্দেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কারণ ইসলাম তাদেরকে যে জীবনধারার প্রতিশ্রুতি দেয়, তা তাদের আগের জীবনধারার চেয়ে উন্নত ছিল। মুসলিমরা অন্যান্য দেশ আক্রমণ করেছিল ইসলামের আহ্বান সর্বত্র জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া নিশ্চিত করতে মাত্র।*'[৩০]

এসব ইসলামি চিন্তাবিদরা – *ইসলাম তরবারির দ্বারা বিস্তৃত* – এ অভিযোগটি খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। অথচ সেটা করতে গিয়ে তারা হয়ত অন্যমনস্কতার কারণে তাদের নিজস্ব যুক্তিতেই বলেন যে, *ইসলাম প্রচারে বাস্তবিকই তরবারি মূল ভূমিকা পালন করেছে।* তাঁদের বিবৃতিগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তারা নিজেরাই সুস্পষ্ট স্বীকার করেন যে: *ইসলামের বিস্তারে তলোয়ারই ছিল প্রাথমিক অস্ত্র: প্রথমে তলোয়ারের ব্যবহার হয়েছিল; তারপরে ঘটেছিল ইসলামের বিস্তার। অতঃপর তাঁরা দাবি করেন ইসলাম শান্তিপূর্ণ উপায়ে এসেছে।* এক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন করতে হয়:

১) বিজয়-পরবর্তী ইসলামের বিস্তার পর্বটা কতটা শান্তিপূর্ণ ছিল?
২) ইসলামের ভৌগলিক সম্প্রসারণের প্রাথমিক 'তলোয়ার পর্বটি' কি কোনই ভূমিকা রাখেনি ইসলাম বিস্তারে বা ধর্মান্তরে?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাঠকগণ পাবেন একটু পরে। মুসলিম ইতিহাসবিদ লিখিত তথ্যের ভিত্তিতেই দেখানো হবে যে, পরাজিতদের ইসলামে ধর্মান্তরকরণ ব্যাপকহারে শুরু হয়েছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রেই। উপরোক্ত আধুনিক মুসলিম পণ্ডিতগণের দাবির ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয় দুটি নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক:

১) প্রথমতঃ 'ইসলামের শান্তি ও ন্যায় বিচারের বার্তা' উপলব্ধির কারণেই কি অমুসলিমরা ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল?
২) দ্বিতীয়তঃ ইসলাম যদি তলোয়ারের দ্বারা বিস্তৃত হবে, তাহলে কেন যথাক্রমে ১৪শ এবং ১ হাজার বছর মুসলিম শাসনের পরও মধ্যপ্রাচ্যে ১৪ মিলিয়ন ও ভারতে ৮০ শতাংশ লোক অমুসলিম রয়ে গেছে?

মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতে মুসলিম আক্রমণের প্রাথমিক চিত্রটি ইতিমধ্যেই সংক্ষিপ্ত বর্ণিত হয়েছে। ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ সতের বার উত্তর ভারতে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ চালান। সুলতান মাহমুদের প্রথম আক্রমণের তিন দশক পর আল-বেরুনি তাঁর

---

[২৯]. Sharma, p. 125
[৩০]. Waddy C (1976) *The Muslim Mind*, Longman Group Ltd., London, p. 187

'আল-বেরুনির ইণ্ডিয়া' (১০৩০ খ্রিঃ) গ্রন্থে লিখেছেন: মুসলিম অধিকৃত ভূখন্ডের হিন্দুরা 'ধূলিকণায়' পরিণত হয়; আর 'যারা টিকে ছিল, তাদের মনে মুসলিমদের প্রতি চরম ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে।' আল-বেরুনী আরও লিখেছেন: *'হিন্দুরা তাদের সন্তানদেরকে আমাদের (মুসলিম) সম্পর্কে, আমাদের পোশাক ও আমাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ভয় দেখায়। তারা আমাদেরকে 'শয়তানের' বাচ্চা বলে ঘোষণা করে ও আমরা যা কিছু করি তার সব কিছুকেই ভাল ও ন্যায়ের বিপরীত বিবেচনা করে।'*[৩১]

আরব মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের এ বিরাগের কারণ ছিল খোরাসান, পারস্য, ইরাক, মসুল ও সিরিয়া থেকে বৌদ্ধদেরকে নির্মূল করা – প্রথমে জরথুষ্ট্রবাদী, পরে মুসলিমদের দ্বারা। অতঃপর মোহাম্মদ বিন কাসিম ভারতে আকস্মিক হানা দিয়ে ব্রাহ্মণাবাদ ও মুলতান শহর দখল করে নেয় ও কানুজ পর্যন্ত গমন করে। আল-বেরুনী লিখেছেন: এ সকল ঘটনা তাদের অন্তরে গভীর ঘৃণা রোপন করেছে। ইব্‌নে বতুতা অনেক হিন্দু বিদ্রোহী ও বীর যোদ্ধাকে মুসলিম শাসকদের কাছে নতি স্বীকার বা ইসলাম গ্রহণ না করে মুলতান ও আলিগড়ের নিকটবর্তী অগম্য পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নিতে দেখেছেন। মুসলিম সম্রাট বাবর ভারতে মুসলিম শাসনের শেষ দিকে একই পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন (নিচে দেখুন)। তথাকথিত দয়ালু হৃদয়ের জাহাঙ্গীরের (মৃত্যু ১৬২৭) শাসনকালে হাজার হাজার, এমনকি লাখ লাখ, হিন্দু ভারতের জঙ্গলগুলোতে আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহে যোগ দেয়। জাহাঙ্গীর ১৬১৯-২০ সালে তাদের দুই লক্ষকে ধরে ইরানে বিক্রির জন্য পাঠান।[৩২]

আল-বেরুনী প্রমাণ করেন যে, সুলতান মাহমুদের প্রথম ভারত আক্রমণের প্রায় তিন দশক পরও ভারতের হিন্দুরা ইসলামের মধ্যে ন্যায় ও শান্তির বার্তা দর্শনে ব্যর্থ হয়। যদি তারা তা দেখতে পেতো, তাহলে মুসলিমদের প্রতি 'বদ্ধমূল বিতৃষ্ণা' ও 'গভীর ঘৃণা' প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা ইসলামের পতাকাতলে ভিড় জমাতো। অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিত ও বণিক, যারা ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে ভারত সফর করেন, তারাও অনুরূপ হতাশা প্রকাশ করেছেন। ৭১২ সালে ভারতে ইসলামি শাসন আসলেও দেখা যায় যে, শত শত বছর পরও ভারতীয় হিন্দুরা ইসলামের শান্তি ও ন্যায়ের অমিয় বার্তা গ্রহণ করেনি, বরং তার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করেছে। অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ লিখেছেন: *'শুরুতে সরাসরি ধর্মান্তরকরণ অত্যন্ত কম ছিল। দশম শতাব্দীর এক আরবীয় ভূগোলবিদ এক লেখায় অভিযোগ করেন যে, ভারতে ইসলাম একজনকেও টানতে পারেনি।'*[৩৩] ভারত ও চীন সফরকারী পর্যটক মার্চেন্ট সোলায়মান (৮৫১) উল্লেখ করেছেন যে, *তাঁর সময়ে ভারতীয় বা চীনের কাউকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে দেখেন নি, কিংবা আরবি বলতে শুনেন নি।*[৩৪] ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ছয়শ' বছর পর ইবনে বতুতা ও আটশ' বছরের বেশি সময় পর সম্রাট বাবর ইসলামের প্রতি হিন্দুদের প্রচণ্ড শত্রুভাব লক্ষ্য করেন; সম্রাট জাহাঙ্গীরও একই রকম লক্ষ্য করেন নয়শ' বছর পরে।

এসব বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ভারতে মুসলিম শাসনের অন্তিম দিনগুলোতেও হিন্দুরা ইসলামের সৌন্দর্য ও ন্যায়পরায়ণতায় আকৃষ্ট হতে সুস্পষ্ট ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা ইসলামের প্রতি ছিল শত্রুভাবাপন্ন। আমরা এরপর (অধ্যায়-৬) দেখতে পাব যে, ১২০৬ সালে দিল্লিতে মুসলিম সুলতানাত প্রতিষ্ঠার এক শতকের মধ্যে হিন্দুরা তাদের উপর আরোপিত জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য গুরুভার করের বোঝায় নিঃস্ব হয়ে মুসলিমদের দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করেছে। অথচ তারা শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করে এ কঠোর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারত, কিন্তু তারা তা করছিল না। আমরা মুসলিম ইতিহাসবিদ ও ইউরোপীয় পর্যটকদের ভাষ্যমতে দেখতে পাব যে, সপ্তদশ শতকেও হিন্দুরা স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দাসবাজারে নিয়ে যাচ্ছিল বিক্রি করার জন্য, যাতে তারা মুসলিম শাসক আরোপিত গুরুভার কর প্রদান করতে পারে। মুসলিম কর আদায়কারী কর্মকর্তারাও নিঃস্ব হিন্দুদের সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কর আদায়ের উদ্দেশ্যে বাজারে তাদেরকে বিক্রি করতে (দেখুন অধ্যায় ৭)। তথাপি তারা ইসলাম গ্রহণ করছিল না।

ভারত সম্পর্কিত মুসলিম লেখকদের তথ্য থেকে জানা যায় যে, সমগ্র ভারতজুড়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গলও হিন্দুদেরকে টিকে থাকার জন্য প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। ইব্‌নে বতুতা সুলতান মুহাম্মদ শাহ তুগলকের শাসনকালে (১৩২৫-৫১) ভারত ভ্রমণে মুলতানের নিকট দেখতে পান যে, '*(হিন্দু) বিদ্রোহী ও যোদ্ধারা দুর্ভেদ্য দুর্গম জংগলের মাঝে অবস্থান নিয়েছে।*' চীন সম্রাটের উদ্দেশ্যে দিল্লির সুলতানের তরফ থেকে পাঠানো এক কাফেলার সাথে গমনকালে কল (আলিগড়)-এর নিকট তিনি দেখতে পান যে, হিন্দুরা 'দুর্ভেদ্য পাহাড়ে' অবস্থান নিয়েছে, যেখান থেকে নেমে এসে তারা মুসলিম শাসিত এলাকায় আক্রমণ চালাত। তার কাফেলাটি এক মুসলিম শহরে এমন একটি আক্রমণ প্রতিহতকরণে লিপ্ত হয়, যাতে বিদ্রোহীরা পরাজিত ও শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত নিহত হয়।[৩৫] বিখ্যাত সুফি পণ্ডিত আমির খসরু তার 'সুহ নিফার' পুস্তকেও এরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বর্বর হানাদার আমির তিমুর (তৈমুর লং) তার *মালফুজাত-ই-তিমুরী* স্মৃতিলিপিতে উল্লেখ করেন যে, *তার অফিসাররা তাকে ভারতীয়দের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে, তা দুর্গম জংগল ও গাছপালার সমন্বয়ে গঠিত, যাদের কাণ্ড ও ডালপালা জড়ো হয়ে তা দুর্ভেদ্য করে তুলে... ওদেশের যোদ্ধা, জমিদার, রাজপুত্র ও রাজারা সে দুর্ভেদ্য জংগলে এক সাথে বসবাস করে বন্য প্রাণীদের মত।*[৩৬]

প্রথম মুগল সম্রাট বাবর ১৫২০-এর দশকে ভারত আক্রমণকালে ভারতীয় অধিবাসীদের জীবন বাঁচানোর আত্মরক্ষা কৌশল সম্পর্কে উল্লেখ করেন: '*অনেক অঞ্চলে জন্মেছে কন্টকময় দুর্ভেদ্য জংগল*' যা তাদের জন্য ভাল প্রতিরক্ষার কাজ করে এবং তার পিছনে আশ্রয় নিয়ে তারা 'চরম

---

৩১. Sachau EC (1993) *Alberuni's India*, Low Price Publications, New Delhi, p. 20-21
৩২. Elliot & Downson, Vol. VI, p. 516; Levi (2002) *Hindus Beyond the Hindu Kush: Indian in the Central Asian Slave Trades*, Journal of the Royal Asiatic Society, 12(3), p. 283-84
৩৩. Habibullah ABM (1976) The Foundations of Muslim Rule in India, Central Book Depot, Allahabad, p.1
৩৪. Sharma, p. 110
৩৫. Gibb HAR (2004) *Ibn Battutah: Travels in Asia and Africa*, D.K. Publishers, New Delhi, p. 190,215
৩৬. Elliot & Downson, Vol. III, p. 395

বিদ্রোহী হয়ে উঠে'। বাবর আগ্রা পৌঁছে জংগলে পালানোর এ সফল কৌশলটি লক্ষ্য করে সে সম্পর্কে লিখেন: '*আমরা না পাই আমাদের জন্য খাদ্য, না আমাদের ঘোড়ার জন্য ঘাস। গ্রামবাসীরা আমাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণায় চুরি-ডাকাতি ও লুটপাটে জড়িত হয়েছে। রাস্তায় কোনকিছুই নড়াচড়া করছিল না... সব লোকেরা ভয়ে (জংগলে) পালিয়েছে।*'[৩৭]

এ দৃষ্টান্তগুলো মুসলিম হানাদার ও শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সর্বদা চলমান দৃঢ় প্রতিরোধের যথেষ্ট ধারণা দেয়। এবং এগুলো আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে যে, বহু শতক মুসলিম শাসনের পরও কিভাবে ভারতে এতগুলো হিন্দু টিকে থাকতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম লিখিত ভারতের ঐতিহাসিক উপাখ্যানগুলো মুসলিম হানাদার ও শাসকদের আক্রমণের মুখে জীবন রক্ষার জন্য হিন্দু রাজা ও তাদের সৈন্যদের এবং বিদ্রোহী ও সাধারণ জনগণের জংগলে পলায়নের ঘন ঘন দৃষ্টান্তে পূর্ণ।

স্পষ্টতঃ হিন্দুদের মধ্যে ইসলামের প্রতি চরম প্রতিরোধ ও বিরোধিতা ছিল। তারা জীবন বাঁচাতে কিংবা ধরা পড়ে ক্রীতদাস হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হওয়ার ভয়ে দুর্ভেদ্য পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বন্য পশুদের সঙ্গে বসবাস করেছে। বহু কৃষক দুর্বহ করের বোঝা বহনে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজস্ব পৈত্রিক খামার ও ভিটে-মাটি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এরপরও অন্যরা সে নিষ্ঠুর ও দুর্বহ জিম্মি করের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে; তথাপি তা থেকে মুক্তি পেতে ইসলাম গ্রহণ করেনি। ১৬৭৯ সালে আওরঙ্গজেব অবমাননামূলক জিজিয়া কর পুনপ্রবর্তন করলে (তার আগে সহৃদয় আকবর তা বিলুপ্ত করে, রা. ১৫৫৬-১৬০৫) সর্বস্তরের অগণিত মানুষ দিল্লিতে এসে জড়ো হয় ও রাজপ্রাসাদের বাইরে অবস্থান ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে প্রতিবাদকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে আওরঙ্গজেব তাদের উপর হাতি ও ঘোড়া চালিয়ে দেয়। কফি খান লিখেছেন: '*হাতি ও ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ঠ হয়ে অনেক প্রতিবাদকারী নিহত হয়*' এবং অবশেষে '*তারা জিজিয়া কর প্রদান করতে বাধ্য হয়*'।[৩৮]

এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, ভারতে মুসলিম আক্রমণের এক সহস্র বছর পরও হিন্দুরা ইসলামের মাঝে তেমন আবেদনময়ী ও অর্থপূর্ণ কিছু খুঁজে না পেয়ে ইসলাম গ্রহণের বহুরকম প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধা উপেক্ষা করেছিল। পরিবর্তে তারা এরকম ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ নিচ্ছিল এবং তারপরও পূর্বপুরুষের ধর্ম ও সংস্কৃতি চেপে ধরে থেকে অপমানকর জিজিয়া, দুর্বহ খারাজ ও অন্যান্য নিষ্ঠুর কর প্রদান করে যাচ্ছিল।

অধিকন্তু, তলোয়ারের মুখে কিংবা অন্য কোন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের অনেকে প্রথম সুযোগেই পূর্বপুরুষের আদি ধর্মে ফিরে যেতে চেষ্টা করেছে। যেমন সুলতান মোহাম্মদ শাহ তুঘলক ১৩২৬ সালে দক্ষিণাত্যের দুই ভাই হরিহর ও বুক্কা'কে ক্রীতদাস বানিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন। দশ বছর পর সুলতান দক্ষিণাত্যের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করতে সে দু'ভাইয়ের নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। দিল্লি থেকে বহুদূরে অবস্থিত দক্ষিণাত্যে পৌঁছেই তারা বাপ-দাদার ধর্ম হিন্দুত্বে ফিরে যায়। উপরন্তু দক্ষিণ ভারতে তারা বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে ইসলামের চিহ্ন দূরীভূত করে।[৩৯] বিজয়নগর ক্রমে একটা শক্তিশালী রাজ্য ও ভারতীয় সভ্যতার এক সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিজয়নগর ২০০ বছরেরও অধিক সময়কালব্যাপী দক্ষিণ ভারতকে ইসলামিকরণের সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যতিক্রমধর্মী সম্রাট আকবর যখন ধর্মের ব্যাপারে নিজস্ব পছন্দের স্বাধীনতা প্রদান করেন, তখন পূর্বে যাদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল এমন অনেক হিন্দু তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যায়। অনেক মুসলিম মহিলা হিন্দু পুরুষকে বিয়ে করে হিন্দু ধর্মমতে জীবনযাপন শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, সম্রাট শাহজাহান (আকবরের নাতি) কাশ্মীর অভিযান শেষে রাজধানীতে ফিরার পথে দেখতে পান যে, ভাদাউরি ও ভীমবরের হিন্দু পুরুষরা মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করছে সামাজিক প্রথা বা আচারের অংশরূপে এবং কিছু মহিলা তাদের হিন্দু স্বামীর ধর্ম হিন্দুত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। শাহজাহান এধরনের বাছবিচারহীন বিবাহ বেআইনি ঘোষণা করে তাঁর কর্মচারীদেরকে হুকুম করেন হিন্দু স্বামীর কাছ থেকে মুসলিম স্ত্রীদেরকে পৃথক করতে।[৪০] কাজেই আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই যে, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্রাট আকবরের সহনশীল শাসনকে '*ভারতীয় ইসলামের প্রায় আত্মহত্যার শামিল*' বলে আখ্যায়িত করে আকবরের নিন্দা করেন ও তাঁর বিরোধীতাকারী তৎকালীন গোঁড়া সুফি সাধক শেখ আহমদ সিরহিন্দির প্রশংসা করেন। সিরহিন্দি হিন্দুদের উপর নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় নীতি চালু করার দাবিতে আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন (পরে আলোচিত)।[৪১]

কাশ্মীরের উপর লিখিত 'বাহারিস্তান-ই-শাহী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে: চরম প্রতিমাপূজা বিরোধী সুলতান সিকান্দারের আমলে বেপরোয়াভাবে হিন্দু মন্দিরগুলোর ব্যাপক ধ্বংস ও তলোয়ারের মুখে গণহারে ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদ নিষ্পেষিত হয়।[৪২] হায়দার মালিক চাদুরা লিখেছেন: সুলতান সিকান্দার (১৩৮৯-১৪১৩) '*অবিশ্বাসীদের বিলুপ্তিসাধনে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন ও অধিকাংশ মন্দির ধ্বংস করেন।*'[৪৩] সিকান্দারের উত্তরসূরী অপর এক হৃদয়বান মুসলিম শাসক সুলতান জয়নুল আবেদীন (বা শাহী খান, রা. ১৪১৭-৬৭) ধর্মান্তরিত হিন্দুদেরকে নিজ ধর্মে ফিরে যাবার অনুমতি দেন। সিডনি ওয়েন লিখেছেন: '*অনেক হিন্দু (অর্থাৎ জোরপূর্বক ইসলামিকরণকৃত) পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে*

---

৩৭. Lal (1999), p. 62-63

৩৮. Lal (1999), p. 118

৩৯. Smith, p. 303-04

৪০. Sharma, p. 211

৪১. Elst K (1993) *Negationism in India*, Voice of India, New Delhi, p, 41

৪২. Pundit KN (1991) *A Chronicle of Medieval Kashmir*, (Translation), Firma KLM Pvt Ltd, Calcutta, p. 74 (This authoritive seventeenth-century Persian chronicle, entitled *Baharistan-i-Shahi*, was written anonymously. It has been translated.)

৪৩. Chadurah MH (1991) *Tarikh-i-Kashmir*, ed. & trans. Razia Bano, New Delhi, p. 55

যায়।'[৪৪] পার্শিয়ান ইতিহাসপঞ্জি
'বাহারিস্তান-ই-শাহী' (১৬১৪) বেনামী মুসলিম লেখক সুলতান জয়নুল আবেদীনের অধীনে হিন্দুদের উত্থান ও ইসলামের পতন সম্পর্কে খেদ করে লিখেছেন:

> ...অবিশ্বাসীরা ও তাদের কলুষিত ও অনৈতিক চর্চা এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এমনকি এদেশের উলেমা, বিজ্ঞ (সুফি), সৈয়দ (মহৎব্যক্তি) এবং কাজি (বিচারক)-রাও সামান্যতম বিদ্বেষ পোষণ না করে সেগুলোতে মগ্ন হয়। এসব কাজে বাঁধা দেওয়ার কেউ ছিলনা। এর ফলে ইসলাম ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে ও এর আইন-কানুন ক্ষয় পেতে থাকে। প্রতিমাপূজা এবং কলুষিত ও অনৈতিক চর্চা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়।[৪৫]

পরবর্তীতে মালিক রায়নার শাসনে দলে দলে হিন্দুদেরকে পুনরায় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে ধর্মান্তর করা হয়। পরবর্তী শিথিল সময়ে তারা আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসে। কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক আমীর শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইরাকির প্ররোচনায় জেনারেল কাজী চক ওসব ধর্মত্যাগীদেরকে পবিত্র আশুরার দিনে (মুহররম, ১৫১৮ সাল) পাইকারি হারে হত্যা করে। তারা ঐদিন নেতৃস্থানীয় ৭০০-৮০০ হিন্দুকে হত্যা করে। সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসবিদ ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু – ভারতে ইসলামি স্বেচ্ছাচারিতার কালো ইতিহাস সাদা করতে যিনি অতিশয় আগ্রহী ছিলেন – এর চার শতাব্দী পরে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা কাশ্মীরি মুসলিমদের মাঝে পুর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাওয়ার আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। '*ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া*'তে তিনি লিখেছেন:

> কাশ্মীরে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ সেখানে জনসংখ্যার ৯৫ ভাগই মুসলিম হয়ে যায়, যদিও তারা তাদের পুরনো হিন্দু আচার ও প্রথার অধিকাংশই ধরে রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্যের হিন্দু শাসক দেখতে পান যে, বিপুল সংখ্যক ওসব মানুষ গণহারে তাদের আদি হিন্দু ধর্মে ফিরে যেতে উদগ্রীব।[৪৬]

ভারতে এখনও এত মানুষ হিন্দু কেন?

উপরোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ সুস্পষ্ট করে যে, হিন্দুরা কখনোই ইসলামের দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি। বরঞ্চ প্রবণতাটি ছিল এর বিপরীত: ইসলাম থেকে পুনরায় হিন্দুত্বে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। বিরল ক্ষেত্রে যখন কোন উদার মুসলিম শাসক ক্ষমতায় আসেন ও জনগণকে ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ দেন, তখন ইসলামের অবনতি ঘটে এবং পাশাপাশি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম বিকশিত ও বিস্তৃত হয়। একথা মুসলিম ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতগণই লিখে গেছেন।

বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসনের পরও ভারতবর্ষে কেন প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ অমুসলিম রয়ে গেছে, উপরোক্ত আলোচনায় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে বর্ণিত হবে যে, ভারতীয় বিধর্মীরা সহস্রাব্দব্যাপী নিষ্ঠুর মুসলিম শাসনাধীনে দৃঢ়তার সাথে চরম সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মর্যাদাহানি, অবমাননা ও বঞ্চনা এবং উৎপীড়ণমূলক কঠোর করের বোঝা সহ্য বা বহন করেছে; এরপরও তারা পৈতৃক ধর্মকে আকড়ে ধরে থেকেছে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিচেনাযোগ্য যে, তাত্ত্বিকভাবে যদিও মুসলিমরা ১১শ বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছে, কিন্তু বাস্তবে তারা কখনোই গোটা দেশের উপর অধিকার বা শাসন বিস্তার করতে পারেনি। মোহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু আক্রমণের পর প্রথম তিন শতাব্দে মুসলিম শাসন বিশাল ভারতের উত্তর-পশ্চিমের সামান্য অংশে সীমাবদ্ধ থাকে। ওসব অঞ্চলে মুসলিমদের এখনকার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এটাই প্রমাণ করে যে, দীর্ঘকালব্যাপী যে যে অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা শক্তভাবে বিরাজ করেছে, সেসব অঞ্চলে মুসলিম শাসকরা কার্যকরভাবে জনগণের উপর ইসলাম চাপাতে সক্ষম হন।

কেবলমাত্র সম্রাট আকবরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসে। কিন্তু আকবর ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় ধর্মত্যাগী; তিনি ইসলাম ধর্ম বিস্তারে কোনো সহযোগিতা করেননি। তাঁর সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের শাসনামলে মুসলিম জনসংখ্যা বিস্তৃত হওয়ার পরিবর্তে সম্ভবত ক্রমশঃ হ্রাস পায়। আকবরকে অনুসরণ করে পরবর্তী পঞ্চাশ বছর তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর ও নাতি শাহজাহানের শাসনামলে ইসলামিকরণ রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে শক্তিশালী হতে পারেনি।

আকবরের প্রপৌত্র গোঁড়া আওরঙ্গজেব (রা. ১৬৫৮-১৭০৭) যখন ক্ষমতা দখল করেন, তখন ইসলামিকরণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ রাষ্ট্রের মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তার শাসনামলে আবার দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। বার্নিয়ার-এর মতে, আওরঙ্গজেবের বর্বর নিষ্ঠুর শাসনামলে উদ্ধত রাজপুত ও মারাঠা যুবরাজগণ সবসময় ঘোড়ায় চড়ে সম্রাটের প্রাসাদ প্রাঙ্গনে যেত। তারা তাদের দেহরক্ষীদের সহযোগে সশস্ত্র অবস্থাতেই প্রাসাদে প্রবেশ করত।[৪৭]

আওরঙ্গজেব যখন 'ওমরের চুক্তি' ও শরীয়া আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অমুসলিমদের জন্য অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন উদ্ধত ও ভয়ঙ্কর রাজপুতদেরকে এ আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। অমুসলিমদের প্রতি আওরঙ্গজেবের ভয়ঙ্কর ও স্বেচ্ছাচারী নীতি সত্ত্বেও, তিনি যখন জিজিয়া কর পুনরায় আরোপ করেন, তার প্রতিবাদে শিবাজী ও রানা রাজসিংহের মতো বিদ্রোহীরা সম্রাটের কাছে পত্র পাঠায়।

---

৪৪. Owen S (1987) *From Mahmud Ghazni to the Disintegration of Mughal Empire*, Kanishka Publishing House, New Delhi, p. 127

৪৫. Pundit, p. 74

৪৬. Nehru J (1946) *The Discovery of India*, The John Day Company, New York, p. 264

৪৭. Bernier F (1934) *Travels in the Mogul Empire (1656-1668)*, Revised Smith VA, Oxford, p. 40,210

সম্রাটের কর্মচারীরা (আমিন) কর আদায় করতে গেলে উদ্ধত প্রজারা তাদের একজনকে হত্যা করে ও অপর একজনকে হিন্দুরা চুল-দাড়ি কেটে অপমানিত করে খালি হাতে ফেরৎ পাঠায়।[৪৮]

এমন কি আকবর ও জাহাঙ্গীরের সুপ্রতিষ্ঠিত মুঘল শাসনামলেও দেশব্যাপী তাদের প্রভাব ছিল অনেকটাই ভঙ্গুর। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথা 'তারিখ-ই-সেলিম শাহী'তে লিখেছেন: '*...অবাধ্য ও আনুগত্যহীনদের সংখ্যা মনে হয় কোনদিনও হ্রাস পাবে না। আমার পিতার ও পরবর্তীতে আমার শাসনামলে যেসব নজির দেখা গেছে, তাতে মনে হয় সাম্রাজ্যে এমন কোনও প্রদেশ নেই, যার কোন না কোন অংশে অভিশপ্ত দুর্বৃত্তরা উঠে এসে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরছে না; যার কারণে হিন্দুস্তানে কখনোই সম্পূর্ণ শান্তির সময় দেখা যায়নি।*' হিন্দুদের ঔদ্ধত্য সম্পর্কে ডার্ক হ. কল্ফ লিখেছেন: '*লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র মানুষ, চাষি অথবা অন্যরা, সরকারের প্রজা না হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।*' আকবরের রাজ্যসভার সদস্য বাদায়ূনির মতে, হিন্দুরা জঙ্গলে তাদের গোপন আশ্রয়স্থল থেকে মাঝে মাঝেই মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করতো। যারা জঙ্গলে পালিয়েছিল, তারা জঙ্গলের জংলা ফলমূল ও নানারকম শস্য দানা যেখানে যতটুকু পেত তা খেয়েই জীবন ধারণ করতো।[৪৯] কেন ও কীভাবে ভারতবর্ষে দীর্ঘকালের ইসলামি শাসনের পরও শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মানুষ হিন্দু রয়ে যায়, এসব উদাহরণ সে সম্পর্কে পাঠককে যথেষ্ট ধারণা দিবে।

ভারতে ইসলামে ধর্মান্তর ঘটে কিভাবে?

উপরোক্ত প্রমাণের আলোকে – দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের পরও কিভাবে ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ অমুসলিম রয়ে গেছে? – সেটা প্রশ্ন না করে, প্রশ্ন করা উচিত: *ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও কেন বা কীভাবে প্রায় ২০ ভাগ ভারতীয় মুসলিম হয়?* অর্থাৎ বহু মুসলিম লেখক ও শাসকদের সত্যায়ন অনুযায়ী ইসলামের প্রতি হিন্দুদের বিরূপতা সত্ত্বেও কিভাবে মুসলিম জনসংখ্যা স্ফীত হয়?

তলোয়ার দ্বারা ধর্মান্তর

কোরানের ৯:৫ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী নবি মোহাম্মদ বহুঈশ্বরবাদীদেরকে হয় ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু – এ দু'টো উপায়ের একটি বেছে নেয়ার মধ্য দিয়ে তরবারির দ্বারা ইসলামে ধর্মান্তরিত করা শুরু করেন। সুতরাং মূর্তিপূজক হিন্দুদেরও ইসলাম কিংবা মৃত্যু – এ দু'টোর একটি বেছে নেওয়ার কথা। মোহাম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধু বিজয় শুরু করেন, তিনি বিজিত এলাকার লোকদেরকে মৃত্যুর যন্ত্রনায় ইসলামে ধর্মান্তরিতের নীতি প্রয়োগ শুরু করেন। যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, মৃত্যু হয় তাদের বিধিলিপি; বাকি নারী ও শিশুরা দাসত্ব বরণের মাধ্যমে মুসলিম হয়ে যাবে। তবে তিনি সুযোগ দেন যে, কোন অঞ্চল যদি বিনা যুদ্ধে তার কাছে নতি স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে তিনি গণহারে হত্যা বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করবেন না। তার এ কিছুটা নমনীয় নীতির খবর বাগদাদে তার পৃষ্ঠপোষক হাজ্জাজের কাছে পৌঁছালে তিনি কাসিমকে লিখেন:

> "...আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি যে উপায়ে ও নিয়মে এগুচ্ছো তা (ইসলামের) আইনসম্মত। তবে তুমি শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ না করে, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সুরক্ষা দিচ্ছ। ঈশ্বর বলেন: '*অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদেরকে কোনো সুযোগ না দিয়ে গলা কেটে ফেল।*' জেনে রাখো, এটা মহান আল্লাহর নির্দেশ। তাদেরকে রক্ষার জন্য তোমার এতটা উদগ্রীব হওয়া উচিত নয়। এরপর থেকে ইসলাম গ্রহণকারী ছাড়া কাউকে বাঁচিয়ে রেখো না। এটা একটা মূল্যবান প্রচেষ্টা ও তা মেনে চললে তোমার উপর মর্যাদাহানির কোন অভিযোগ আরোপিত হবে না।"[৫০]

হাজ্জাজের নিকট থেকে এ হুমকিপূর্ণ নির্দেশ পেয়ে কাসিম তার পরবর্তী ব্রাহ্মণাবাদ বিজয়ে আগাগোড়া তা অনুসরণ করে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের কাউকেই জীবিত রাখেন নি। আল-বিলাদুরীর মতে ব্রাহ্মণাবাদ বিজয়ে '*আট কিংবা কারো কারো মতে ছাব্বিশ হাজার মানুষকে তরবারির তলায় হত্যা করা হয়।*'[৫১] যাহোক, হিন্দুরা অগণিত সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে এতগুলো মানুষকে তলোয়ারের তলায় ফেলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তৎপরিবর্তে তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে কর আদায় করা ছিল অত্যন্ত লাভজনক বিকল্প। এ পরামর্শে কাসিম হাজ্জাজকে চিঠি লিখলে হাজ্জাজ উত্তর করেন:

> 'আমার ভাতিজা মোহাম্মদ কাসিমের পত্র পেয়ে প্রকৃত ঘটনা অবগত হলাম। এতে জানা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণাবাদের বিশিষ্ট নাগরিকরা তাদের বৌদ্ধ মন্দির মেরামত ও তাদের ধর্মানুসরণের সুযোগের জন্য আবেদন করেছে। যেহেতু তারা আনুগত্য স্বীকার করেছে ও খলিফাকে কর দিতে সম্মত হয়েছে, সুতরাং তাদের কাছ থেকে আর কিছুই সঠিকভাবে আশা করা যায় না। তারা আমাদের সুরক্ষায় (ধিম্মি/জিম্মি হিসেবে) এসেছে, এবং আমরা কোনভাবেই তাদের জীবন বা সম্পদের উপর হস্ত প্রসারিত করতে পারি না।'[৫২]

এভাবে হিন্দুরা 'জিম্মি' প্রজা হিসেবে গৃহীত হয় এবং তরবারির দ্বারা ধর্মান্তর করা থেকে অব্যাহতি পায়।

উমাইয়া শাসকদের ধর্মান্তরকরণে অনীহা: আগেই বলা হয়েছে যে, ধার্মিক মুসলিমরা বরাবরই উমাইয়া শাসকদেরকে ঈশ্বরহীন বা ধর্মহীন বলে নিন্দা করেছে। তার একটা কারণ, উমাইয়া শাসকরা অমুসলিমদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণে কখনো আগ্রহী ছিলনা। তৎপরিবর্তে তাদের কাছ থেকে উচ্চহারে কর আদায়ের মাধ্যমে রাজকোষ পূর্ণ করার দিকেই তাদের অধিকতর ঝোক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, হাজ্জাজ ইসলাম

---

৪৮. Lal (1999), p. 118-119
৪৯. Lal (1994), p. 64
৫০. Elliot & Dawson, Vol I., p. 173-74
৫১. Ibid, Vol. I, p. 122
৫২. Sharma, p. 109

গ্রহণকারীদের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করতেন।[৫৩] যখন একদল অমুসলিম তাঁর কাছে আসে এটা জানাতে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, হাজ্জাজ তাদের ধর্মান্তরকে প্রত্যাখ্যান করেন ও তাঁর বাহিনীকে হুকুম দেন ওসব নব্য মুসলিমদের তাদের গ্রামে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।[৫৪] মিশর বিজয়ের সময় মুয়াবিয়া (পরে প্রথম উমাইয়া খলিফা) মিশরীয় কপ্টরা (খ্রীস্টান) গণহারে মুসলিম হয়ে যায় কিনা সে চিন্তায় উদগ্রীব হয়ে উঠেন। কেননা তিনি মনে করেন: *'সবাই ইসলাম গ্রহণ করলে জিজিয়া কর দেওয়া থেকে মুক্ত হয়ে তারা অর্থভাণ্ডারের বড় একটা লোকসান ঘটাবে।'*[৫৫]

হিন্দুদের প্রতি ধর্মহীন উমাইয়া শাসক প্রদর্শিত এ নমনীয়তা ছিল স্পষ্টতঃই কোরান ও হাদিস নির্দেশিত ইসলামের আদর্শ আইনের অমান্যকরণ। ইসলামের অবমাননাকারী এ দৃষ্টান্ত বা ছাড় পরবর্তীতে হানাফী আইনে অঙ্গীভূত হয়, যদিও ইসলামের অন্যান্য সব আইনশাস্ত্রগুলো পৌত্তলিকদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যু – এ দু'টোর একটি পথ বেছে নেওয়ার রায় বহাল রেখেছে। কাজেই, জোরপুর্বক ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দুরা নমনীয় উৎপীড়নের সম্মুখীন হয়।

৭৫০ সালে ঈশ্বরহীন উমাইয়া রাজবংশকে নিশ্চিহ্ন করে অধিকতর গোঁড়া ইসলামি শাসকরা ক্ষমতায় এলে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদেরকে মৃত্যুর ভয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। সাফারাইদ শাসক ইয়াকুব লাইস ৮৭০ সালে কাবুল দখল করে কাবুলের রাজকুমারকে বন্দি করেন। তিনি আর-রাখাজ-এর রাজাকে হত্যা করে মন্দিরসমূহ ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেন। এছাড়াও ইয়াকুব লেইস আর-রাখাজের বাসিন্দাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন। তিনি লুণ্ঠনের মালামাল বোঝাই করে রাজধানীতে ফিরে যান, যার মধ্যে ছিল তিন রাজার মস্তক ও ভারতীয় পূজার্চনার অনেক মূর্তি।[৫৬]

সুলতান মাহমুদের মন্ত্রী আবু নাসের আল-উত্‌বি লিখেছেন, সুলতান মাহমুদের কনৌজ বিজয়কালে *'নাগরিকরা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে ইসলামের তরবারির খাবারে পরিণত হয়।'*[৫৭] উত্‌বি আরও লিখেছেন, বারান দখলের সময় *'আলাহ্‌র তরবারি খাপমুক্ত করে শান্তির চাবুক তোলা হলে ১০ হাজার মানুষ ধর্মান্তরিত হতে ও মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে।'*[৫৮]

শিক্ষিত, মার্জিত ও ইসলামি আইনশাস্ত্রের (ফিকাহ্) পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত সুলতান মাহমুদ এক একটি শহর জয়ের পর সাধারণত পরাজিত পক্ষের যুদ্ধ করতে বা অস্ত্র ধরতে সক্ষমদের গণহারে হত্যা করতেন, তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাসকে হিসেবে কব্জা করতেন এবং অবশিষ্টদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেন। তিনি প্রায়শই এভাবে ধর্মান্তরিত এক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাতেন, যে অবশ্যই ইসলামি আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং ইসলামের বিস্তার ও প্রতিমা-পূজা প্রতিরোধের তদারকি করবে। এরূপ এক ধর্মান্তরিত যুবরাজ ছিলেন নওশা শাহ। আল উত্‌বি লিখেছেন, *'সুলতান মাহমুদের ভারত ত্যাগের পর নওশা শাহ'র উপর শয়তান ভর করে, কারণ তিনি পুনরায় মূর্তি-পূজার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সুতরাং সুলতান ঝড়ের বেগে সেখানে গিয়ে শত্রুর রক্তে তরবারি রঞ্জিত করেন।'*[৫৯] এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সুলতান মাহমুদ তার ভারত অভিযানের সময় শুধুমাত্র তলোয়ার দিয়ে জনগণকে ধর্মান্তরিতই করেননি; তিনি গজনী ফিরে যাবার পর নব্য মুসলিমরা যাতে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে না যায়, সেটাও নিশ্চিত করতেন। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে (পর্ব, *১৯৪৭ দাঙ্গা ও হত্যাযজ্ঞ: কে দায়ি?*) দেখব যে, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক মিলিয়ন অমুসলিমকে মৃত্যুর মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

ক্রীতদাসকরণের মাধ্যমে ধর্মান্তর

ভারতে ইসলামের প্রথম সফল অনুপ্রবেশেই মোহাম্মদ বিন কাসিম দেবল, ব্রাহ্মণাবাদ ও মুলতানে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেন। সাধারণত অস্ত্র বহনে সক্ষম এমন বয়সের যুবা-বৃদ্ধ যারাই মুসলিমদের আক্রমণের সময় তাঁর বাহিনীর সামনে পড়ে, তাদের সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। নিঃসন্দেহে এ অবস্থায় তারা জীবন বাঁচাতে প্রিয়জন স্ত্রী-সন্তানকে বিপন্ন অবস্থায় রেখে যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। তাদের নারী ও শিশুদেরকে বিজয়ী বীরেরা ক্রীতদাস বানিয়ে নিয়ে যেত। চাচনামায় লিখিত হয়েছে যে, কাসিমের রাওয়ার আক্রমণে ৬০,০০০ লোক ক্রীতদাস হয়, এবং সিন্ধু বিজয়ের চূড়ান্ত পর্বে ১০০,০০০ নারী ও শিশু ক্রীতদাসে পরিণত হয়।[৬০]

সবগুলো মুসলিম অভিযানে ক্রীতদাস হিসেবে ধৃত নারী ও শিশুদের সংখ্যা পদ্ধতিগতভাবে লিখিত হয় নাই। ধারণা করা যেতে পারে যে, সেহওয়ান, ধালিলা, ব্রাহ্মণাবাদ ও মুলতানের মত প্রধান প্রধান আক্রমণে প্রায় সম সংখ্যক মানুষ বন্দি হয়। কাজেই ভারতের সিন্ধু সীমান্তে কাসিমের তিন বছরের (৭১২-১৫) সংক্ষিপ্ত, অথচ কৃতিত্বপূর্ণ, অভিযানে সম্ভবত কয়েক লক্ষ লোক ক্রীতদাস হিসেবে ধৃত হয়। কাসিম সব সময় কোরান, নবির দৃষ্টান্ত ও শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী (কোরান ৮:৪১) বন্দি ও অন্যান্য লুণ্ঠিত সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের হিস্যারূপে দামেস্কে খলিফার নিকট প্রেরণ করে অবশিষ্টাংশ তাঁর সৈনিকদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। এভাবে ক্রীতদাস নারী ও শিশুরা মুসলিমদের

---

৫৩. Bulliet RW (1979) *Conversion to Islam and the Emergence of a Muslim Society in Iran*, In N. Levtzion ed., *Conversion to Islam*, Holmes and Meier Publishers Inc., New York, p. 33
৫৪. Pipes (1983), p. 52
৫৫. Tagher, p. 19
৫৬. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 419
৫৭. Ibid, p. 26
৫৮. Ibid, p. 42-43
৫৯. Ibid, p. 33
৬০. Lal (1994), p. 18-19

সম্পদে পরিণত হয় ও ইসলামে প্রবেশ করে। কয়েক বছরের মধ্যেই এসব ক্রীতদাস শিশুরা যখন পরিণত বয়সী মুসলিম হয়ে উঠে, তখন তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আয়োজিত নতুন পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত হতে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। অথচ যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতো, তারা কয়েক বছর আগে ছিল তাদেরই আত্মীয়-স্বজন, একই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ অল্প সময়ের ব্যবধানে দাস হিসেবে কব্জাকৃত এসব শিশুরা মুসলিম রাষ্ট্রের হাতিয়ারে পরিণত হয় – ইসলামের পরিধি বিস্তারে জিহাদে লিপ্ত হয়ে পরাজিত অবিশ্বাসীদেরকে তলোয়ারের হুমকিতে ধর্মান্তরকরণ, তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস বানানো এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য। এমনকি ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত ভাগের আন্দোলনকালেও প্রায় ১০০,০০০ হিন্দু ও শিখ নারীদের দাসী বানানো হয়। তাদেরকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে মুসলিমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় (অধ্যায়-৬)।

বংশবৃদ্ধির যন্ত্ররূপে ক্রীতদাসী নারী

কোরান ও নবির প্রথা বা হাদিস অনুযায়ী নারী-বন্দিরা তাদের মুসলিম মালিক বা প্রভুদের দ্বারা যৌনদাসীরূপে ব্যবহৃত হতো (দাস প্রথা সম্পর্কিত অধ্যায় ৭ দেখুন)। সুতরাং তারা দাসীরূপে ধৃত মুসলিম হয়ে সরাসরি মুসলিম জনসংখ্যা তো বৃদ্ধি করেই, পরন্তু মুসলিমদের জন্য সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েও তারা মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মূল্যবান ভূমিকা রাখে। সেসব নারী, বিশেষত সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হিন্দু নারীদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর, ভয়ে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুরা ফিরে এসে দেখতে পেতো যে, তাদের নারী ও সন্তানরা আর নেই। এর ফলে হিন্দুরা সন্তানাদি জন্ম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সঙ্গী থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ যেখানেই মুসলিমরা সফল আক্রমণ করেছে সেখানেই হিন্দুদের বংশবৃদ্ধি থমকে যায় বা দ্রুত হ্রাস পায়। অপরদিকে মোহাম্মদ বিন কাসিমের সঙ্গে যে কয়েক হাজার মুসলিম যোদ্ধা ভারতে এসেছিল, তারা পর্যাপ্ত বা উপচে-পড়া সংখ্যায় যৌনসঙ্গী পাওয়ায় সর্বোচ্চ হারে বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। আকবর তার হারেমে ৫,০০০ সুন্দরী রমণীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। মরক্কোর সুলতান মাউলে ইসমাইল (১৬৭২-১৭২৭) তাঁর ২,০০০-৪,০০০ হাজার স্ত্রী ও উপপত্নীর মাধ্যমে প্রায় ১,২০০ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।[৬১] পরাজিত হিন্দুদেরকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণ – বিশেষ করে নারীদেরকে, যারা মুসলিম সন্তান উৎপাদনে সম্পৃক্ত হয় – তা মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

সুতরাং মুসলিমরা ভারতের যেখানেই সার্থকভাবে আক্রমণ করেছে, সেখানেই হিন্দু পুরুষদের গণহারে হত্যা ও তাদের নারী-শিশুদের বন্দি করে হিন্দু জনসংখ্যা সরাসরি হ্রাস করেছে। পরোক্ষভাবে সন্তান উৎপাদনক্ষম নারীদেরকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে হিন্দু পুরুষদেরকে যৌনসঙ্গী থেকে বঞ্চিত করে হিন্দুদের বংশবৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টিও হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস করে। যেহেতু হিন্দু পরিবারগুলোর নারীরা পরবর্তীকালে মুসলিম সন্তান জন্মদানের যন্ত্রে পরিণত হয়, সেহেতু গণহারে ক্রীতদাসকরণের চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ায়: হিন্দু জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস ও মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। আর দ্রুত বর্ধিত এ মুসলিম জনসংখ্যার রক্ষণাবেক্ষণ হতো পরাজিত হিন্দু বা অমুসলিমদেরকে নিষ্পেষিত করা করের মাধ্যমে। এটা মূলত সে একই আচরণ-বিধি, যা নবি মোহাম্মদ বানু কোরাইজা ও খাইবারের ইহুদিদের উপর প্রয়োগ করেছিলেন।

সুতরাং মোহাম্মদ বিন কাসিমের তিন বছরব্যাপী ভারত আক্রমণ ও শাসনকালে শুধুমাত্র ক্রীতদাস হিসেবেই সরাসরি কয়েক লাখ হিন্দু ইসলামে যোগ হয়নি, বন্দি নারীরাও মুসলিম সন্তান উৎপাদনের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বিস্তার ঘটায়। নবির শুরু করা এ প্রক্রিয়া পরবর্তী মুসলিমরা সর্বত্র প্রয়োগ করে। ভারতে ইসলাম বর্জনকারী সম্রাট আকবর ১৫৬৪ সালে এর চর্চা সাময়িকের জন্য নিষিদ্ধ করলেও কিন্তু তা মূলত অকার্যকর হয়ে পড়ে। সুলতান মাহমুদ তার ভারতে অভিযানে ব্যাপকহারে হিন্দু নিধন করে অগণিত নারী ও শিশুকে দাসরূপে নিয়ে যান। আল উত্‌বি লিখেছেন যে, সুলতান মাহমুদ তাঁর ১০০১-১০০২ সালের ভারত অভিযানে ৫০০,০০০ বন্দিকে গজনিতে নিয়ে যান; পাঞ্জাবের নিন্দুনা আক্রমণে তিনি বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস আটক করেন; হরিয়ানার থানেশ্বরে মাহমুদ ২০০,০০০ লোককে ক্রীতদাস বানান এবং ১০১৯ সালে ৫৩,০০০ ক্রীতদাসকে নিয়ে ফিরে যান।[৬২]

মুসলিম ইতিহাসবিদদের তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক কে. এস. লাল-এর হিসাব অনুযায়ী উত্তর ভারতে সুলতান মাহমুদের পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে প্রায় ২০ লাখ হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পায়।[৬৩] এদের মধ্যে আক্রমণকালে অনেককে হত্যা করা হয়েছিল এবং অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যককে তরবারির মুখে ক্রীতদাসরূপে কব্জা করা হয়, যারা স্বভাবতই মুসলিম হয়ে যায়।

অতঃপর সুলতান মোহাম্মদ গোরী (মুইজুদ্দিন, মৃত্যু ১২০৬) ও তার সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক ভারতে মুসলিম শক্তি সুসংহত করার কাজে যোগ দিয়ে ১২০৬ সালে দিল্লির সুলতানাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে প্রত্যক্ষ মুসলিম শাসন শুরু করেন। মুহাম্মদ ফেরিশতার তথ্যমতে, '*মুইজুদ্দিন কর্তৃক দুই থেকে তিন লাখ 'খোখার' (হিন্দু) ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।*' ফখর-ই-মুদাব্বির মুইজুদ্দিন ও আইবকের নির্যাতন ও ক্রীতদাসকরণের চিত্রটি তুলে ধরেছে এভাবে: '*এমনকি গরিব (মুসলিম) বস্তিয়ালাও অসংখ্য ক্রীতদাসের মালিক বনে যায়।*'[৬৪]

ইসলামত্যাগী আকবরের শাসনকাল (১৫৫৬-১৬০৫) পর্যন্ত যুদ্ধে বন্দিদেরকে দাসকরণ মুসলিম-শাসিত ভারতবর্ষে একটা সাধারণ নীতি হিসেবে বহাল থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে গণহারে ক্রীতদাস বানানোর প্রক্রিয়া আকবর নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, তাঁর আমলেই যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ ঐতিহ্য প্রবলভাবেই বহাল থাকে। তাঁর মুক্তচিন্তক উপদেষ্টা আবুল ফজল হতাশার সাথে 'আকবর নামা'য় লিখেছেন: '*অনেক খারাপ মনের অবাধ্য অফিসার লুণ্ঠন করতে গ্রামে ও মহলে অগ্রসর হয়*'। এসব লুণ্ঠনে সাধারণত নারী ও শিশুদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। মোরল্যান্ড উল্লেখ করেছেন যে, আকবরের রাজত্বকালেও '*সুস্পষ্ট কোনো যুক্তি ছাড়াই একটা বা অনেকগুলো গ্রাম একজোটে হানা*

---

৬১. Milton G (2004) *White Gold*, Hodder & Stoughton, London, p. 120

৬২. Lal (1994), p. 20

৬৩. Lal KS (1973) *Growth of Muslim Population in Medieval India*, Aditya Prakashan, New Delhi, p. 211-17

৬৪. Lal (1994), p. 43-44

দেওয়া ও (হিন্দু) বাসিন্দাদেরকে দাসরূপে নিয়ে যাওয়া একটা ফ্যাশন বা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।'[৬৫] এ প্রেক্ষাপটে আকবরের এক সেনানায়ক আব্দুল্লাহ খান উজ্‌বেক যখন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না:

> "আমি পাঁচ লাখ (৫০০,০০০) নারী ও পুরুষকে বন্দি করে বিক্রি করেছি। তারা সবাই মোহাম্মদী হয়েছে। 'বিচারের দিন' তাদের বংশধররা এক কোটিতে পরিণত হবে।"[৬৬]

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের পরবর্তীশাসনকালে ইসলামিকরণ উত্তরোত্তর পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। 'শাহ ফাত-ই-কাংগ্রা' উদার ও দয়ালু শাসকরূপে পরিচিত জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে লিখেছে: '*তিনি তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা মোহাম্মদী ধর্ম প্রচারে উৎসর্গ করেন*' এবং তাঁর '*সমস্ত প্রয়াস সর্বদা পৌত্তলিকতার অগ্নি নির্বাপিত করার জন্য পরিচালিত হয়।*'[৬৭] 'ইন্তিখাব-ই-জাহাঙ্গীর শাহী' কিতাব অনুসারে গুজরাজের জৈনরা যখন একটা অদ্ভূত সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে, বা তাদের বিপুল সংখ্যক ভক্তের দৃষ্টি কাড়ে, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদেরকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে ও তাদের মন্দিরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার আদেশ দেন। তাদের মূর্তিগুলোকে মসজিদের সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে স্থাপনের হুকুম দেওয়া হয়, যাতে করে মুসলিম নামাজীরা মসজিদে প্রবেশের পথে সেগুলোকে পদদলিত করতে পারে।[৬৮] ওদিকে সম্রাট শাহজাহান তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের চেয়েও অনেক গোঁড়া ছিলেন।

আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় দাসকরণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণকে আবার পূর্ণোদ্যমে ফিরিয়ে আনেন। এমনকি ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের বাংলা দখলের পরও গোটা ভারতে মুসলিম শাসকদের দাসকরণ অব্যাহত থাকে। 'সিয়ার-উল-মুতাখিরিন' গ্রন্থ অনুযায়ী, ১৭৬১ সালে 'পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে' আহমদ শাহ আবদালীর বিজয়ের পর খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে কাতর মৃতপ্রায় বন্দিদেরকে দীর্ঘ সারি বেঁধে কুচকাওয়াজে বাধ্য করে অবশেষে শিরে – দ করা হয়। এরপর বন্দিকৃত তাদের ২২ হাজার নারী ও সন্তানদেরকে দাসরূপে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল শ্রেণীর।[৬৯] এর প্রায় দুই দশক আগে (১৭৩৮) ইরানের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। অবর্ণনীয় ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, স্বেচ্ছাচারিতা ও লুটতরাজের পর হাজার হাজার লোককে দাস বানিয়ে বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। নাদির শাহ তার অভিযানে প্রায় ২০০,০০০ ভারতীয়কে হত্যা করেন।

এখন এটা অনুধাবন করা কঠিন হবে না যে, ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার স্ফীতিতে হিন্দুদেরকে দাসকরণ সম্ভবত অন্য যে কোন উৎসের তুলনায় বেশি ভূমিকা রাখে। জেনারেল আব্দুল্লাহ খান উজ্‌বেকের উপরোক্ত আত্মগর্বী উক্তিটি এ দাবির সত্যতা প্রতিফলিত করে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নারী-ক্রীতদাসদের অবদান সম্পর্কে আর্নল্ড সংক্ষেপে বলেন: '*বিপুল সংখ্যক বন্দিকৃত নারীদাসীরা উপপত্নীরূপে ব্যবহৃত হয়ে দ্রুততার সঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারতো।*'[৭০] এর সাথে সায় দিয়ে মোহাম্মদ আশরাফ মনে করেন: '*ক্রীতদাসরা ভারতের বর্ধিত মুসলিম জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হয়েছে।*'[৭১] এ ক্ষেত্রে আশরাফ কিছুটা বেঠিক এ জন্য যে, ক্রীতদাসরা শুধু বৃদ্ধিশীল মুসলিম জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্তই হয়নি, বরং প্রাথমিক বছর ও দশকগুলোতে ক্রীতদাসরাই মুসলিম জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ ছিল। এবং পরবর্তী সময়ে একদিকে ক্রীতদাসরা অব্যাহতভাবে যুক্ত হতে থাকে, অন্যদিকে প্রধানত নারীদাসী কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানেরা মুসলিম জনসংখ্যাকে স্ফীত করে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ এটা প্রতীয়মান করে যে, আধুনিক ইসলামি প-িত শেখ আল-কারাদাউই, ডঃ জাকির নায়েক ও ডঃ ফজলুর রহমান প্রমুখের মতামতের বিপরীতে, ঠিক বিজয়ের মুহূর্তে স্পষ্টতঃই ধর্মান্তর ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয়। সুলতান মাহমুদ ও ইয়াকুব লাইসের মত হানাদারদের দ্বারা বিজিতদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরের মাধ্যমে এবং তরবারির ফলার মুখে নারী ও শিশুকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাস বানিয়ে তাদেরকে মুসলিমকরণের মাধ্যমে তা শুরু হয়। নবি মোহাম্মদের সময় থেকেই নারী, বিশেষত তরুণীরা, মুসলিমদের ক্রীতদাসকরণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল। সেসব ক্রীতদাসকৃত নারীরা মুসলিম সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হয়।

ধর্মান্তরকরণে অমুসলিমদের উপর অবমাননা ও অর্থনৈতিক বোঝার প্রভাব

ইসলাম একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরকে 'জিম্মি' প্রজা রূপে গণ্য করে। যদিও আল্লাহ বহুঈশ্বরবাদী হিন্দু, বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদী প্রভৃতি জনগোষ্ঠিকে হয় ধর্মান্তর কিংবা মৃত্যুবরণ বেছে নেওয়ার রায় দিয়েছে, কিন্তু 'ঈশ্বরহীন' উমাইয়ারা ভারতের সিন্ধু বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছুক বিপুল সংখ্যক বহুঈশ্বরবাদী লোককে হত্যা করার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সাধারণত মোহাম্মদের ধর্ম বিস্তারের পরিবর্তে বিজিতদের উপর চড়া হারে কর আরোপের মাধ্যমে রাজকোষ পূর্ণ করতে অধিক আগ্রহী উমাইয়া শাসকরা ভারতের বিপুল সংখ্যক বহুঈশ্বরবাদীকে রাজস্ব যোগানদাতা হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে মৃত্যু থেকে রেহাই দেয়। অতএব উমাইয়ারা কোরানের নির্দেশ (কোরান ৯:৫) লংঘন করে এসব বহুঈশ্বরবাদীর 'জিম্মি' শ্রেণীর প্রজায় উন্নীত করে। জিম্মিরা সাধারণতঃ সামাজিকভাবে চরম মর্যাদাহানি ও অবমাননা এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষণের শিকার হয়, যা তাদেরকে প্রচণ্ড দুর্দশনার মধ্যে পতিত করে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর

---

৬৫. Moreland WH (1995) *India at the Death of Akbar*, Low Price Publication, New Delhi, p. 92
৬৬. Lal (1994), p. 73
৬৭. Elliot & Dawson, Vol. VI, p. 528-29
৬৮. Ibid, p. 451
৬৯. Lal 91994), p. 155
৭০. Arnold TW (1896) *The Preaching of Islam*, Westminster, p. 365
৭১. Ashraf KM (1935) *Life and Conditions of the People of Hindustan*, Calcutta, p. 151

(কোন কোন লেখকের মতে খলিফা দ্বিতীয় ওমর, রা. ৭১৭-৭১৯)'এর চুক্তিতে ইসলামের নিয়মানুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রে 'জিম্মি' প্রজাদের প্রতি আচরণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ওমরের চুক্তি

ইসলামের শাফী আইনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফীর 'কিতাব-উল-উম্ম' ('গ্রন্থের মাতা') গ্রন্থে এ চুক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে। আরবদের সিরিয়া দখলের পর খলিফা ওমরের নির্দেশে সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের প্রধান ও খলিফার মাঝে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এতে মুসলিম নিয়ম-কানুনের প্রতি 'জিম্মি'দের পূর্ণাঙ্গ ও অবমাননাকর অধীনতা দাবি করে বলা হয়েছে যে, তাদের আনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ তারা বৈষম্যমূলক কর প্রদান করবে। এছাড়াও সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের জন্য মর্যাদাহানিকর ও অমানবিক অক্ষমতার শর্ত যুক্ত হয়েছে এ চুক্তিতে। খলিফা ওমর সিরিয়ার খ্রিষ্টান প্রধানকে ইসলামের কাছে তাদের আনুগত্যের শর্ত নির্ধারণ করে একটা চুক্তিপত্র পাঠান। চুক্তিটির প্রধান শর্তগুলো হলো:[৭২]

"আমি ও সমস্ত মুসলিম তোমার ও তোমার খ্রিষ্টান সদস্যদের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করছি যতদিন তোমরা তোমাদের উপর আরোপিত শর্তসমূহ মেনে চলবে। শর্তগুলো হলো:

১) তোমরা শুধু মুসলিম আইনের অধীনস্থ হবে, অন্য কারো নয়। এবং আমরা তোমাদেরকে যা করতে বলব, তা অস্বীকার করতে পারবে না।
২) যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নবি, তাঁর ধর্ম বা কোরান সম্বন্ধে অশালীন কিছু বলে, সে আল্লাহর, বিশ্বাসীদের সেনাপতির ও সমস্ত মুসলিমের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। যে শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল, তা বাতিল হবে ও তোমাদের জীবন হবে আইনের সীমার বাইরে।
৩) যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কোনও মুসলিম নারীর সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয় কিংবা কোনো মুসলিম নারীকে বিয়ে করে, বা পথে কোনো মুসলিমের উপর ডাকাতি করে, অথবা কোনো মুসলিমকে ইসলাম থেকে ধর্মচ্যুত করে, অথবা আমাদের শত্রুকে সাহায্য করে, অথবা কোনো গুপ্তচরকে আশ্রয় দেয়, তাহলে সে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তার জীবন ও সম্পদ আইনের বাইরে।
৪) কোনো মুসলিমের সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি এর চেয়ে কম ক্ষতি যে করবে সে উপযুক্ত শাস্তি পাবে।
৫) মুসলিমদের সঙ্গে তোমাদের আচরণ আমরা পর্যবেক্ষণ করবো। এবং তোমরা মুসলিমদের প্রতি বেআইনি কিছু করলে আমরা এ চুক্তি বাতিল ঘোষণা করবো ও তোমাদেরকে শাস্তি দিব।
৬) যদি তোমরা কিংবা অন্য অবিশ্বাসীরা বিচার চায়, আমরা মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচার করবো।
৭) কোনো মুসলিম শহরে ক্রুশ প্রদর্শন করবে না, অথবা (যিশুর) মূর্তি নিয়ে মিছিল করতে পারবেন না, তোমাদের প্রার্থনার জন্য কোনো গির্জা নির্মাণ বা সমবেত হওয়ার স্থান সৃষ্টি করতে পারবে না; (চার্চের) ঘণ্টা বাজাতে পারবে না; বা কোনো মুসলিমের কাছে মেরীর পুত্র যিশু সম্বন্ধে কোনও পৌত্তলিক ভাষা (অর্থাৎ যিশু ঈশ্বরের পুত্র) ব্যবহার করতে পারবে না।
৮) তোমরা 'জুন্নর' (ফিতা, খ্রীস্টানের চিহ্ন স্বরূপ) পরিধান করবে সমস্ত পোশাকের উপরে, যা কখনোই লুকাতে পারবে না।
৯) ঘোড়ায় চড়তে তোমরা বিশেষ গদি ব্যবহার করবে ও ভিন্ন ভঙ্গি করবে এবং একটা চিহ্ন দ্বারা তোমাদের 'কালানুয়াস' (টুপি) মুসলিমদের টুপি থেকে আলাদা করবে।
১০) মুসলিমরা উপস্থিত থাকলে তোমরা রাস্তার অগ্রভাগে যাবে না বা সমাবেশের প্রধান আসনে বসবে না।
১১) প্রত্যেক সুস্থ সাবালককে 'জিজিয়া' বা বশ্যতা কর দিতে হবে, নতুন বছরে পূর্ণ মাপের এক 'দিনার' করে। কর না দেওয়া পর্যন্ত সে শহর ত্যাগ করতে পারবে না।
১২) কোন গরিব লোক নিজস্ব জিজিয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত দায়গ্রস্থ থাকবে। দারিদ্র্য 'জিজিয়া' প্রদানের দায়িত্ব বাতিল করবে না, যেমন করেনা তোমাদেরকে প্রদত্ত সুরক্ষাকে বাতিল। তোমাদের যা আছে তাই আমরা নিয়ে নিব। বণিক হিসেবে ছাড়া যতদিন তোমরা মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাস ও ভ্রমণ করবে, ততদিন জিজিয়াই তোমাদের একমাত্র বোঝা।
১৩) কোনো অবস্থাতেই তোমরা মক্কায় প্রবেশ করবে না। পণ্যদ্রব্যসহ যদি ভ্রমণ কর, তাহলে তার এক-দশমাংশ মুসলিমদেরকে দিতে হবে। মক্কা ব্যতীত তোমরা ইচ্ছামতো অন্য যে কোনও স্থানে যেতে পারো। হেজাজ ব্যতীত অন্য যে কোনো মুসলিম দেশে তোমরা থাকতে পারো। হেজাজে তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না।

এগুলো হল আদর্শ শর্তাবলি, যা একটা আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের ('হানাফী'-আইনের অধীনস্থ রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের উপরও) উপর অবশ্যই আরোপিত হবে। জিম্মিদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কিত 'ওমরের চুক্তি'টি সুস্পষ্টভাবেই আল্লাহর কোরান (আয়াত ৯:২৯) ও নবির দৃষ্টান্তের সঙ্গে সমন্বিত। অতএব অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত 'হানাফী' আইনশাস্ত্রবিদ আবু ইউসুফ লিখেছেন: '*ওমরের চুক্তি পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত বৈধ ও চালু থাকবে।*'[৭৩] ইহুদি ও খ্রিষ্টান (ভারতে হিন্দুরাও), যারা ছিল তাদের স্ব-স্ব জন্মভূমিতে ন্যায্যভাবে মুক্ত ও সম্মানিত মানুষ, তাদেরকে

---

৭২. Triton, p. 12-24
৭৩. Ibid, p. 37

হানাদার মুসলিম শাসকদের কাছে এরূপ অবমাননাকর আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। জিম্মিদের প্রতি এরূপ আচরণ তাদের মাঝে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য কী প্রচণ্ড মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে সেটা কল্পনা করা আদৌ কঠিন নয়।

জিজিয়া ও অবমাননা

মুসলিম রাষ্ট্রে 'জিম্মি' প্রজাদের কিরূপ অমাননাকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে, তাদেরকে উপর আরোপিত 'জিজিয়া' কর আদায়ের আনুষ্ঠানিকতা তার স্পষ্ট ধারণা দেবে। জিজিয়া কর প্রদান চট করে একটা চেক লিখে দেওয়া কিংবা কালেক্টরের অফিসে টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার মত নয়। আল্লাহর দাবি অনুযায়ী, জিম্মিদেরকে জিজিয়া প্রদান করতে হবে এমনভাবে যে, তা তাদের মাঝে বশ্যতা স্বীকার ও স্বেচ্ছায় অবমানিত হওয়ার অনুভব সৃষ্টি করে (কোরান ৯:২৯)। বিখ্যাত ইসলামি বিশ্লেষক আল-জামাকশারী (মৃত্যু ১১৪৪) জিজিয়া প্রদানের উপর কোরানের ৯:২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে:[৭৪]

> তাদের নিকট থেকে জিজিয়া নেয়া হবে অবমাননা ও মর্যাদাহানিকরভাবে। (জিম্মিকে) সশরীরে হেঁটে আসতে হবে, ঘোড়ায় চড়ে নয়। যখন সে জিজিয়া প্রদান করবে, তখন কর-আদায়কারী বসে থাকবে আর সে থাকবে দাঁড়িয়ে। আদায়কারী তার ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলবে: *'জিজিয়া পরিশোধ কর!'* এবং জিজিয়া পরিশোধের পর আদায়কারী ঘাড়ের পিছনে একটা চাটি মেরে তাকে তাড়িয়ে দেবে।

ষষ্ঠদশ শতকে মিশরের বিখ্যাত সুফি পণ্ডিত আস-সারানি তাঁর 'কিতাব আল-মিজান' গ্রন্থে জিজিয়া প্রদান সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা দেন:[৭৫]

> খ্রিষ্টান বা ইহুদি জিম্মি নির্দিষ্ট দিনে বশ্যতা কর (জিজিয়া) গ্রহণের জন্য নিয়োজিত আমিরের কাছে সশরীরে হাজির হবে। তিনি বসে থাকবেন একটি উঁচু আসনে। জিম্মি তার সম্মুখে হাজির হয়ে হস্ত প্রসারিত করে কর প্রদানের প্রস্তাব করবে। আমির এমনভাবে সেটা গ্রহণ করবে যাতে তার হাত উপরে থাকে, জিম্মির হাত নিচে। অতঃপর আমির তার ঘাড়ে একটা চাটি মারবে এবং আমিরের সামনে উপস্থিত লোকেরা (মুসলিম) তাকে রূঢ়ভাবে হটিয়ে দিবে। ...এ দৃশ্য দেখার জন্য সাধারণ জনগণের উপস্থিতির অনুমতি ছিল।

এখন আমরা দেখব ভারতে কিভাবে জিজিয়া কর আদায় করা হতো। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ সালে ভারতে জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন (স্বধর্মত্যাগী আকবর কর্তৃক ইতিপূর্বে বাতিলকৃত) করে জিজিয়া প্রদানের নিম্নোক্ত পদ্ধতি ঘোষণা করেন:

> মৃতব্যক্তি ও ইসলাম গ্রহণকারীর উপর জিজিয়া প্রযোজ্য হবে না। অমুসলিম ব্যক্তি নিজে জিজিয়া নিয়ে আসবে। সে তার কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে পাঠালে তা গৃহীত হবে না। জিজিয়া প্রদানের সময় অমুসলিম অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকবে এবং আদায়কারী উপবিষ্ট থাকবেন। অমুসলিমের হাত নিচে থাকবে এবং আদায়কারীর হাত থাকবে উপরে। এবং তিনি বলবেন, 'হে অমুসলিম, জিজিয়া প্রদান কর।'[৭৬]

'খারাজ' বা ভূমিকর আদায়ের ব্যাপারে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী বিজ্ঞ ইসলামি পণ্ডিত কাজী মুঘিসুদ্দিনের কাছে উপদেশ চাইলে, কাজী একই পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে তার সঙ্গে যোগ করেন যে:

> 'আদায়কারী যদি তার ('খারাজ' দাতার) মুখে থু-থু দিতে চান, তাহলে সে মুখ হা করবে। তার উপর এ চরম অপমান ও আদায়কারী কর্তৃক তার মুখের ভিতরে থু-থু দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এ শ্রেণীর উপর আরোপিত চরম বশ্যতা, ইসলামের গৌরব ও বিশ্বাসের প্রতি মহিমান্যতা এবং মিথ্যা ধর্মের (হিন্দুত্ববাদ) প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন।'[৭৭]

একইভাবে কাশ্মীরের সহনশীল সুলতান জয়নুল আবেদীনের (১৪১৭-৬৭) কাছে লেখা এক চিঠিতে পারস্যের ইসলামি পণ্ডিত মোল্লা আহমদ লেখেন:

> 'তাদের উপর জিজিয়া আরোপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে অবমানিত করা। ঈশ্বর তাদেরকে অসম্মানিত করার জন্যই জিজিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে অবমানিত এবং মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।'[৭৮]

জনপ্রিয় সুফি সাধক শেখ আহমদ সিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪) অমুসলিমদের প্রতি সম্রাট আকবরের উদার ও সহনশীল নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ইসলামি আইনের লংঘন আখ্যায়িত করে তাঁর দরবারে চিঠি পাঠান। চিঠিটিতে সিরহিন্দী লিখেন:

> 'ইসলামের সম্মান 'কুফরী' (অবিশ্বাস) ও 'কাফির' (অবিশ্বাসী) কে অপমান করার মধ্যে নিহিত। যে কাফিরকে সম্মান দেয় সে মুসলিমকে অমর্যাদা করে। তাদের উপর জিজিয়া আরোপের উদ্দেশ্য হলো, এমন করে তাদেরকে অবমানিত করা যাতে তারা ভাল পোশাক পরতে বা জাঁকজমকের সঙ্গে বাস না করতে পারে। তারা ভীতসন্ত্রস্ত ও কম্পমান থাকে।'

অমুসলিমদের উপর জিজিয়া আরোপ সম্পর্কে একই রকম মনোভাব ছিল সুফি সাধক শাহ ওয়ালিউল্লাহ (মৃত্যু ১৭৬২) ও ভারতে মুসলিম শাসনকালের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ইসলামি পণ্ডিত ও সুফি সাধকদের।[৭৯]

জিম্মিদের প্রতি এরূপ চরম অবমাননাকর আচরণের অর্থ হলো, মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের অত্যন্ত হীন আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। হিন্দুদের প্রতি এ চরম অবমাননা ও অমর্যাদাকর আচরণ তাদের উপর ইসলাম গ্রহণের জন্য কী ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি

---

৭৪. Ibn warraq, p. 228-29
৭৫. Triton, p. 227
৭৬. Lal (1999), p. 116
৭৭. Ibid, p. 130
৭৮. Ibid, p. 113
৭৯. Ibid, p. 113-14

করেছিল, সেটা অনুধাবন করতে আদৌ কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এ সকল অবমাননার সঙ্গে যুক্ত ছিল অতিরিক্ত ও অসহনীয় বৈষম্যমূলক জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য করের অর্থনৈতিক ভার থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রলোভন। অর্থনৈতিক বোঝার মাত্রায় জিজিয়া ছিল অবমাননার পাশে তুলনামূলক কম গুরুভার। সবচেয়ে গুরুভার ছিল খারাজ বা ভূমিকর। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে (১২৯৬-১৩১৬) কৃষকরা আক্ষরিক অর্থে সরকারের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যায়, কারণ এ সময় খারাজ হিসেবে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ সরকার নিয়ে যেতো। এমনকি আকবরের শাসনামলে 'খারাজ' উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারিত থাকলেও কাশ্মীরে খারাজ হিসেবে নেয়া হতো দুই-তৃতীয়াংশ। ১৬২৯ সালের দিকে সম্রাট শাহজাহানের আমলে গুজরাটে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত ফসলের তিন-চতুর্থাংশ সরকারকে দিতে হতো।[৮০]

আগেই বলা হয়েছে যে, এরূপ অর্থনৈতিক শোষণের পরিণতিতে হিন্দুরা এমন এক অসহনীয় ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পতিত হয় যে, কর আদায়কারীর অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে তারা পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র ইসলামের কালেমা – '*আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ঈশ্বর নেই, এবং মোহাম্মদ আল্লাহর বার্তাবাহক*' – এ কথাটি উচ্চারণ করেই হিন্দুরা ওসব গুরুভার অর্থনৈতিক বোঝা, কষ্ট ও অবমাননা থেকে মুক্ত হতে পারতো। এবং এরূপ জবরদস্তিমূলক প্রক্রিয়ায় ইসলামে ধর্মান্তরকরণ বেশ সুচারুভাবেই প্রয়োগ হয়েছে ভারতে, যার কিছুটা প্রমাণ মেলে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১-৮৮) স্মৃতিকথা 'ফতুয়া-ই-ফিরোজ শাহী'তে:

> 'আমি আমার অবিশ্বাসী প্রজাদেরকে নবির ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করি। আমি ঘোষণা করি যে, যারা ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হবে তারা প্রত্যেকেই জিজিয়া কর থেকে মুক্তি পাবে। সর্বত্র জনগণের মাঝে এ সংবাদ পৌঁছে যায় ও বিপুল সংখ্যক হিন্দু নিজেদেরকে উপস্থাপন করে ইসলামের সম্মানকে স্বীকার করে নেয়। এরূপে তারা দিনের পর দিন সর্বত্র থেকে এগিয়ে আসে ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জিজিয়া থেকে মুক্ত হয়, এবং উপহার ও সম্মানের দ্বারা আনুকূল্য পায়।'[৮১]

সুতরাং ইসলামে ধর্মান্তরকরণ ও মুসলিম আক্রমণে বিজিত দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে এখন নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ধর্মান্তরের প্রথম বড় জোয়ারটি এসেছিল তলোয়ারের মুখে দাস বানানোর মাধ্যমে। তারপরে তাদের সন্তানরা মুসলিম জনসংখ্যা উত্তরোত্তর স্ফীত করতে থাকে। সুলতান মাহমুদের মতো মুসলিম হানাদাররা এক একটা শহর দখলে নিয়ে তার নাগরিকদেরকে মৃত্যুর মুখে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন, যা মুসলিম জনসংখ্যা বিস্তারে অবদান রাখে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর ও অজেয় মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে আক্রান্ত বাসিন্দারা অনিবার্য মৃত্যু ও ধ্বংসের কথা বিবেচনা করে প্রতিরোধ না করেই নতি স্বীকার করে নেয় এবং জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে। অবিশ্বাসী প্রজাদেরকে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণের সম্ভবত আরেকটি বড় অবদান আসে অবমাননাকর 'জিজিয়া', গুরুভার 'খারাজ' ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক কর থেকে মুক্ত হওয়ার প্রত্যাশায় ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

বর্বর আওরঙ্গজেবের অধীনে ধর্মান্তর

মুসলিম শাসকরা অবিশ্বাসী বা বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর করতে আরও অনেকরকম অবৈধ প্ররোচনা ও জবরদস্তির আশ্রয় নেয়। ইব্নে আশ্কারী তাঁর 'আল-তারিখ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব ধর্মান্তরের জন্য অন্যান্য প্রলোভনের মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক পদ প্রদান, জেল থেকে অপরাধীদের মুক্তি তাদের পক্ষে মামলার রায় নিষ্পত্তিকরণ ও রাজকীয় সম্মানে ভূষিতকরণের মতো সুবিধাদি প্রদানের প্রস্তাব করেছিলেন।[৮২] এর ফলে অবশ্যই বহু কুখ্যাত অপরাধী ইসলামে যোগ দিয়েছিল, যে প্রবণতা আজকের যুগেও সক্রিয় রয়েছে: যেমন পশ্চিমা দেশগুলোতে ভয়ঙ্কর অপরাধীরা জেলখানায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

বর্তমানে উত্তর ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার রূপরেখা বর্বর আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বল প্রয়োগ ও অন্যান্য জবরদস্তিমূলক চাপের মাধ্যমে ব্যাপকহারে ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট। 'দ্য গেজেট অব নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সেস'-এ (নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সেস বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বর্তমানের উত্তর প্রদেশ ও দিল্লির অন্তর্ভুক্ত) উল্লেখ রয়েছে যে: '*অধিকাংশ মুসলিম চাষি আওরঙ্গজেবের শাসনকালকে তাদের (পুর্বপুরুষদের) ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় হিসাবে উল্লেখ করে এবং এ ধর্মান্তর ছিল কখনো নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে, আবার কখনো রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হয়ে সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করতে।*' (এ ব্যবস্থা আওরঙ্গজেবের আমলে নিশ্চয়ই সব প্রদেশেই বিস্তৃত হয়ে থাকবে)। ইউরোপীয় দূত নিকোলাও মানুক্কি, যিনি আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ভারতবর্ষে কাটান, তিনি উল্লেখ করেন: '*কর প্রদানে অক্ষম অনেক হিন্দু কর আদায়কারীর অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতে মোহাম্মদী হয়ে যেতো*', এবং আওরঙ্গজেব এতে উৎফুল্ল বোধ করতেন। সুরাটে ইংরেজ কারখানার প্রেসিডেন্ট টমাস রোল লিখেছেন: আওরঙ্গজেব কর্তৃক জোরপূর্বক জিজিয়া আদায় করা হতো দু'টো উদ্দেশ্যে: *রাজকোষ বর্ধিত করতে ও গরিব শ্রেণীকে মুসলিম বানানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করতে*।[৮৩]

---

৮০. Ibid, p. 132, 34
৮১. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 386
৮২. Roy Choudhury ML (1951) *The State and Religion in Mughal India*, Indian Publictity Society, Calcutta, p. 227
৮৩. Sharma, p. 219

১৬৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর আওরঙ্গজেব রাজসভা ও প্রদেশের চাকরি থেকে হিন্দুদের বরখাস্ত এবং তদস্থলে মুসলিমদের নিয়োজিত করার জন্য এক আদেশ জারি করেন।[৮৪] জীবনধারণের তাগিদে এটা হিন্দুদের উপর ইসলাম গ্রহণের জন্য আরেকটি প্রবল চাপ প্রয়োগ করে। তিনি হিন্দু জমিদারদেরকে মুসলিম হওয়ার জন্য চাপ দেন, অন্যথায় জমিদারি ছাড়তে হবে, এমনকি মৃত্যুবরণও করতে হতে পারে। মনোহরপুরের জমিদার দেবি চাঁদের জমিদারি কেড়ে নিয়ে তাকে জেলে পাঠানো হয়। আওরঙ্গজেব দেবী চাঁদের কাছে কোতওয়াল (ঘাতক) পাঠায় একথা বলে যে, দেবী চাঁদ মুসলমান হলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, না হলে হত্যা করবে। দেবী চাঁদ ইসলাম গ্রহণে স্বীকৃত হয় তার জমিদারি পুনর্বহালের শর্তে।[৮৫] পিতার জমিদারি থেকে উচ্ছেদকৃত রতন সিং মুসলিম হলে মালওয়ার রামপুরা অঞ্চলের জমিদারি ফেরত পান।[৮৬]

অন্যান্য উদাহরণে হিন্দুদের উপর মুসলিম-কর্তৃক ইসলামকে অপমান করার মিথ্যা অভিযোগ এনে শাস্তিস্বরূপ জোর করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেও দেখা যায়। সুরাট পরিষদ ১৬৬৮ সালে ধর্মান্তরের একই কৌশলের উল্লেখ করেছে। যখন কোনো মুসলমান হিন্দু লগ্নিদাতা (বানিয়া)'র ঋণ পরিশোধ করতে চাইতো না, তখন সে মুসলমানটি কাজীর (বিচারকের) কাছে গিয়ে নালিশ করতো যে, ঐ লগ্নিদাতা হিন্দু নবিকে গালি-গালাজ বা ইসলামের অবমাননা করেছে। এক্ষেত্রে সে এক বা দুই জন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করতো। আর তারপরই হতভাগ্য হিন্দু বানিয়াকে লিঙ্গচ্ছেদন বা সুন্নত দিয়ে তাকে মুসলিম বানানো হতো।[৮৭]

আওরঙ্গজেব ১৬৮৫ সালে তাঁর প্রাদেশিক কর্মচারীদের প্রতি হিন্দুদেরকে মুসলমান হতে উৎসাহিত করার জন্য এক আদেশ জারি করেন। এতে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, যেসব হিন্দু পুরুষ মুসলমান হবে তারা প্রত্যেকে রাজভান্ডার থেকে চার রূপী পাবে, আর প্রত্যেক হিন্দু নারী মুসলমান হলে পাবে দুই রূপী।[৮৮] চার রূপী সেসময়ে একজন পুরুষের এক মাসের আয়ের সমান ছিল। যেহেতু ধর্মান্তর হিন্দু বা অমুসলিমদের কাঁধ থেকে পাহাড় প্রমাণ জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য গুরুভার করের বোঝা মুক্ত করা ছাড়াও অবর্ণনীয় নির্যাতন, অবমাননা ও অমর্যাদা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিত, সুতরাং এ সামান্য প্রলোভন ধর্মান্তরে এর আর্থিক লাভের তুলনায় আরো বড় প্ররোচনার কাজ করে। এক মুঘল দলিলে আওরঙ্গজেবের আমলে বিথুর-এর ফৌজদার শেখ আব্দুল মোমিনের ১৫০ জন হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। হিন্দুদেরকে 'সারোপাস' (সম্মানের পোশাক) ও নগদ অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করে ধর্মান্তরিত করেন তিনি।[৮৯]

কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদেরকে আওরঙ্গজেব বল প্রয়োগে গণহারে ধর্মান্তরিত করেন। উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিতরা সাহায্যের জন্য পাঞ্জাবের শিখ গুরু তেগ বাহাদুর সিং'এর কাছে আসেন। গুরু যখন কাশ্মীরীদেরকে অবৈধভাবে ধর্মান্তর করার বিষয় জানতে সম্রাটের দরবারে আসেন, তখন তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়, এবং তাঁকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে নির্যাতন করা হয়। অবশেষে তাঁকে (দুই শিষ্য সহ) শিরচ্ছেদের শিকার হতে হয়। এতে দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত কাশ্মীরী জনগণের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ বিধর্মী ছিল। আওরঙ্গজেবের কোপানলে পড়ে ভারতের হিমালয়ের রাণী কাশ্মীর রাজ্যটি ব্যাপকভাবে মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হয়, যা অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মান্ধও বটে। আওরঙ্গজেবের আমলে ভারতের অন্যত্র যেখানে মুসলিম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল, সেখানেও একই নীতি কার্যকর হওয়ার কথা।

কাশ্মীরে বর্বর ধর্মান্তর

ভারতে হিন্দুদেরকে সহিংস ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ শুধুমাত্র মুসলিম ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের যেসব দূরবর্তী প্রদেশে মুসলিম শাসকরা প্রায়শঃই স্বাধীন থেকেছে, সেখানেও শাসকরা তাদের ধর্মীয় দায়িত্বরূপে প্রজাদের উপর ইসলামি আইন প্রয়োগ করেছে। এক্ষেত্রে কাশ্মীর এক যথার্থ উদাহরণ।

সিকান্দার বুত্‌শিকুনের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪১৩) তিনি ও তার প্রধানমন্ত্রী, যিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিম, যোগসাজশে কাশ্মীরী হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অস্ত্র চালান। ফেরিশতা লিখেছেন, সিকান্দার এক আদেশ জারি করেন যা

> 'কাশ্মীরে মুসলিম ছাড়া অন্যকোন ধর্মাবলম্বীর বসবাস নিষিদ্ধ করে; আদেশটিতে তিনি কোনো মানুষের কপালে কোনো চিহ্ন আঁকা (যেমন হিন্দুরা আঁকে) নিষিদ্ধ করেন এবং পরিশেষে তিনি সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে তা দিয়ে ধাতুর মুদ্রা তৈরি করেন। অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ মুসলিম হওয়া কিংবা দেশত্যাগের পরিবর্তে বিষ খেয়ে জীবন বিসর্জন দেয়। কেউ কেউ জন্মস্থান ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়; আর অল্প সংখ্যক হিন্দু মুসলমান হয়ে বিতাড়িত হওয়া থেকে মুক্ত হয়। দেশ থেকে অধিকাংশ হিন্দু পালিয়ে গেলে সিকান্দার কাশ্মীরের সমস্ত মন্দির ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। ...কাশ্মীরের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার পর তিনি 'মূর্তি ধ্বংসকারী' উপাধিতে ভূষিত হন।'[৯০]

বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত ফেরিশতার (মৃত্যু ১৬১৪) মতে, এটাই ছিল সুলতান সিকান্দারের সবচেয়ে বড় সুকীর্তি।

---

৮৪. Exhibit No. 34, Bikaner Museum Archives, Rajasthan, India; Available at: http://according-to-mughal-records.blogspot.com/

৮৫. Exhibit No. 41, Bikaner Museum Archives.

৮৬. Sharma, p. 220

৮৭. Ibid, p. 219-20

৮৮. Bikaner Museum Archives, Exhibit No. 43

৮৯. Ibid, Exhibit No. 40

৯০. Ferishtah MQHS (1829) *History of the Rise of the Mahomedan Power in India*, translated by John Briggs, D.K. Publishers & Distributors (P) Ltd, New Dheli, Vol. IV (1997 imprint), p. 268

ফেরিশতা জানান, মূর্তি-ধ্বংসকারী পিতাকে অনুসরণ করে তার পুত্র আমীর খান (বা আলী খান) তাঁর ধর্মান্ধ প্রধানমন্ত্রীর সহযোগে দেশে অবস্থানরত অবশিষ্ট হিন্দুদেরকে কচুকাটা করেন। যেসব ব্রাহ্মণ তখনও দৃঢ়ভাবে হিন্দুধর্ম আকড়ে ছিল, তাদের বুকের উপর আমীর খানের নির্যাতনের মই চলে। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করে তাদেরকে হত্যা করা হয়। এরপরও যারা অমুসলিম থাকে তাদেরকে কাশ্মীর রাজ্যের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।[৯১] পরে মালিক রাইনা ও কাজী চকের শাসনামলে তরবারির মুখে হিন্দুদেরকে আবারো ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরকে গণহারে হত্যাও করা হয় (নিচে বর্ণিত)। এসব ঐতিহাসিক প্রমাণ নিঃসন্দেহে ভারতের হিন্দু ও অন্যান্য বিধর্মীদের ইসলাম গ্রহণে বলপ্রয়োগের মাত্রা উপলব্ধিতে সহায়ক হবে।

ধর্মান্তরের বিষয়ে প্রতারণামূলক প্রচারণা

স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর

আধুনিক ইসলামিক (অমুসলিমও) পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদগণ মধ্য যুগে ভারত ও অন্যত্র মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে নানা রকম মিথ্যের ধোঁয়াজাল সৃষ্টি করেছে। সেটা হলোঃ বিধর্মী বা অবিশ্বাসীরা ইসলামের মধ্যে শান্তি ও ন্যায় বিচারের বার্তা দেখতে পেয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মধ্য যুগের ইসলামি ইতিহাসবিদ, পর্যটক, হানাদার ও শাসকগণের লেখায় সে যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। ভারতে মুঘল আমলের ইউরোপীয় পর্যটক ও রাজকর্মচারীদের ইতিহাস পঞ্জিও মুসলিম ইতিহাসবিদদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত। ওসব দলিলে তৎকালে মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। ইসলামের ঐশীবার্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিধর্মীদর মুসলিম বনে যাবার সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। মধ্যযুগে হিন্দুদেরকে মুসলিম বানানোর সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়টি ছিল দানবীয় খারাজ, জিজিয়া ও অন্যান্য গুরুভার করের ভয়ঙ্কর বোঝা এবং অমানবিক নির্যাতন-অপমান থেকে বাঁচার জন্য ধর্মান্তরের প্রলোভন। মুসলিমদেরই সৃষ্ট একটা ঘৃণ্য ও অসহনীয় বাস্তবতাকে পরিহার করার জন্য এরূপ ধর্মান্তর কখনোই শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছামূলক বলে আখ্যায়িত হতে পারে না। ব্যাপক সহিংসতা ও জবরদস্তির ভয়ে কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হতে পারে, কিন্তু তার নজির খুবই কম এবং সেটা প্রকৃত অর্থে মোটেও স্বেচ্ছাকৃত নয়।

নিু বর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তর

ভারতের মুসলিমরা জোরগলায় দাবি করে যে, প্রধানত সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও নির্যাতিত নিুবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের সবার জন্য সমতার বার্তায় মুগ্ধ হয়ে বড় সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মধ্যযুগের ইসলামি ইতিহাসপঞ্জি, যেগুলোতে ধর্মান্তর সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ও সাক্ষ্য সংরক্ষিত হয়েছে, তাতে কোথাও এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা বলে যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে নিুবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। নিুবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তরের মাত্রা উচ্চবর্ণের তুলনায় হয়তোবা বেশি হতে পারে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তারা ছিল সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র অংশ; সুতরাং জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য অসহনীয় করের বোঝা তাদেরকে সবচেয়ে বেশি নিষ্পেষিত করেছিল। এ উপমহাদেশের মুসলিম জনসংখ্যার দিকে একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, সমাজের সকল স্তরেই ধর্মান্তর ঘটেছিল। বাস্তবতঃ ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষ এখনো নিুবর্ণভুক্ত হিন্দু, যা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে যে, ইসলামের উৎকৃষ্টতর বার্তায় আকৃষ্ট হয়ে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুযায়ী সেখানে আজকের শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলিমের আদি পুরুষরা ছিল নিুবর্ণের লোক।[৯২] তার অর্থ দাঁড়ায়ঃ হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে জন্মহার যদি সমান থেকে থাকে, তাহলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তুলনায় দুই গুণ নিুবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এখানে বিবেচনা করতে হবে যে, প্রত্যয় জাগানো বা উদ্বুদ্ধকারী প্রচারণার মাধ্যমে বহু নিুবর্ণের হিন্দু বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান ধর্মেও ধর্মান্তরিত হয়েছে। ইসলামের ক্ষেত্রেও যদি সেরূপ ঘটে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, মধ্যযুগীয় ইসলামে ধর্মান্তরকালে ভারতের মোট জনসংখ্যায় নিুবর্ণের হিন্দুদের অনুপাত আজকের তুলনায় অবশ্যই বেশি ছিল, সম্ভবত শতকরা ৮০ ভাগ। তার অর্থ দাঁড়ায়, নিুবর্ণের হিন্দুদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের হার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তুলনায় তেমন বেশি ছিল না। বস্তুত নিুবর্ণের হিন্দুদের মাঝে ধর্মান্তরের হার কিছুটা বেশী হওয়ার কারণ হলো, ইসলাম আরোপিত নানা রকম নিষ্পেষণমূলক করের বোঝা নিুবর্ণের হিন্দুদেরকে সবচেয়ে বেশি নিঃস্ব ও শ্বাসরুদ্ধ করে তুলেছিল।

বাস্তবে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, ধরে ইসলামি হানাদার ও শাসকদের অবিরাম অভিযানে যখন তরবারির মুখে হিন্দুরা ব্যাপকহারে দাসত্বের শৃঙ্খল পড়ে বাধ্য হয়ে ইসলাম বরণ করে, তখন কে নিুবর্ণের আর কে উচ্চবর্ণের এ বৈষম্য চিন্তা করার সময় বা সুযোগ কারো আদৌ ছিল না।

ঐতিহাসিকভাবে জনগণের কোন অংশ বা স্তর ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে মুসলিমদের কখনোই কোন আগ্রহ বা মাথাব্যাথা ছিল। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা মুসলিম সমাজে প্রচলিত কল্পকাহিনী ও শোনাকথার ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রথমে বলে যে, হিন্দু সমাজের নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে নিুবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারপর থেকে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরের অভিযোগে অভিযুক্ত মুসলিম পণ্ডিতরা ভারতে নিুবর্ণের হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় শান্তিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের প্রচারণায় জোর দিতে থাকে। মুর্শিদাবাদ

---

৯১. Ibid, p. 269

৯২. *85% of Muslims in India were SC, backward Hindus: Report*, Indian Express, 10 August

নবাবের দেওয়ান খোন্দকার ফজল-ই-রাব্বী ১৮৯০-এর দশকে দাবি করেন যে, বাংলায় নিম্নবর্ণের হিন্দু, যেমন তাঁতি ও ধোপারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে তিনি জোর দিয়ে এটাও বলেন যে, সেসব ধর্মান্তরিতরা মুসলিম জনসংখ্যার খুব সংখ্যালঘু একটা অংশ ছিল।[৯৩]

এটা উল্লেখ করা জরুরি যে, ভারতে মুসলিম শাসনের গোটা সময়কাল জুড়ে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ ও বিদ্রোহে বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু ও শিখরা অংশগ্রহণ করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই। এখানে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে। ক্রীতদাসে পরিণত করে ধর্মান্তরিত ও খোজা করা জনৈক হিন্দু ছিল খসরু খান। তিনি তার মুনিব সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজিকে ১৩২০ সালে হত্যা করে সুলতানের নেতৃস্থানীয় মুসলিম কর্মকর্তাদের নির্মূল করেন। খসরু খানের সহযোগিতায় ছিল গুজরাটের ২০,০০০ 'বেওয়ারী' হিন্দু (কোনো কোনো লেখক 'পারওয়ারী' বলে উল্লেখ করেছেন)।[৯৪] দিল্লির শাসন ক্ষমতা বা সিংহাসন থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করা ছিল তাদের লক্ষ্য। জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে: '*তারা চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রাসাদে মূর্তি পূজার প্রস্তুতি গ্রহণ করে*', এবং '*পবিত্র গ্রন্থকে (কোরানকে) আসন রূপে ব্যবহার করা হয় ও মসজিদের বেদিতে মূর্তি স্থাপন করা হয়।*'[৯৫] মধ্যযুগীয় লেখক জিয়াউদ্দিন বারানী, আমির খসরু ও ইবনে বতুতাও নিম্নবর্ণভূক্ত বেওয়ারী হিন্দুদের সাহস ও মালিকদের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধাহীনতার কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৬]

এমনকি অপেক্ষাকৃত উদার ও ন্যায়বান শাসক আকবরের বিরুদ্ধেও বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৫৬৮ সালে আকবরের চিত্তোর আক্রমণে নিম্নবর্ণভূক্ত ৪০,০০০ কৃষক রাজপুত সেনাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। তারা আকবরের বিরুদ্ধে এমন প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যে, ক্রুদ্ধ আকবর বন্দিদের প্রতি তাঁর আচরণগত সাধারণ নীতি পরিত্যাগ করে ৩০,০০০ বন্দি কৃষককে হত্যার আদেশ দেন। একইভাবে আওরঙ্গজেবকে অগ্রাহ্য করে মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী শিবাজীও (মৃত্যু ১৬৮০) ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু (দেখুন অধ্যায় ৫; পর্ব: '*মুসলিম রাজত্বকালে হিন্দু শাসকদের সহনশীলতা ও বিনয়*')। মারাঠীরা ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষক, যারা ১৭৬১ সাল পর্যন্ত মুসলিম বিরোধী প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিল। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় মুসলিমদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আফগানিস্তান থেকে চলে আসেন আহমদ শাহ আবদালী এবং 'পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে' আবদালীর হাতে তারা নির্মূল হয়। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী সব রকমের নিম্নবর্ণীয় হিন্দু – বেওয়ারী, মারাঠী, জাট, খোখার, গন্ড, ভীল, সাতনামী, রেড্ডী ও অন্যরা – ভারতে ইসলামি আক্রমণ ও কর্তৃত্বের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলিম হানাদার ও শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ফেরিশতার মতে, খোখার (বা গুক্ষুর) কৃষকরা ছিল হিংস্র বর্বর জাতি, যাদের কোনো ধর্ম বা নৈতিকতা ছিল না।[৯৭] তারা সুলতান মোহাম্মদ গোরীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, যেমন মুলতানে। ৭১৩ সালে মোহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক মুলতান বিজিত হয়। মুলতানে ইসলামের আবির্ভাবের পাঁচশ' বছর পরও খোখার কৃষকরা ইসলামের বার্তায় মুগ্ধ হতে পারেনি, বরং প্রচণ্ড বিদ্বেষে মোহাম্মদ গোরীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে। ইবনে আসির লিখেছেন, সুলতান খোখারদের নির্মূল করার জন্য মুলতানে ফিরে এসে তাদেরকে পরাজিত করে তাদের রক্তে রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দেন।[৯৮] যাহোক, খোখাররা অবশেষে ১২০৬ সালে এক যুদ্ধ শিবিরে মোহাম্মদ গোরীকে হত্যা করে। ২০ জন খোখার, যারা পূর্বে গোরীর আক্রমণে আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছিল, আকস্মিক ঝড়ের বেগে সুলতানের শিবিরে প্রবেশ করে ছোরার আঘাতে তাকে পরপারে পাঠায়।[৯৯] ইয়াহিয়া বিন আহমদের 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' গ্রন্থে এর দুই শত বছরেরও বেশি সময় পর (১৪২০/৩০-এর দশক) আমরা এক যশরথ শাইকা খোখারকে পাই, যে মুসলিম শাসকদের সবচেয়ে বড় বিধর্মী শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বস্তুত অনেক সময় উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই মুসলিম পক্ষে যুদ্ধ করেছে আর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তুলে ধরেছে বিদ্রোহের ধ্বজা। উদাহরণস্বরূপ, আওরঙ্গজেব তার রাজধানী দক্ষিণে স্থানান্তরিত করার পর উত্তর ভারতে জাট কৃষকরা বিদ্রোহ করে। তারা বাণিজ্যবহর ও দক্ষিণের রাজদরবারে প্রেরিত রাজস্ব ও সরবরাহ বহনকারী কাফেলা আক্রমণ শুরু করে। আওরঙ্গজেব জাট বিদ্রোহীদেরকে নির্মূল করতে উচ্চবর্ণের রাজপুত ও মুসলিমদের নিয়ে গঠিত এক রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। দীর্ঘ অবরোধের পর ১৬৯০ সালের জানুয়ারি মাসে রাজস্থানের সিনসানিতে জাট বিদ্রোহীদের দুর্গের পতন ঘটে। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষেই ব্যাপক হতাহত ও জীবনহানি ঘটে। ১,৫০০ জাট জীবন হারায় এবং রাজকীয় বাহিনীর ২০০ মুঘল ও ৭০০ রাজপুত যোদ্ধা হয় নিহত বা আহত হয়।[১০০] সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচার-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উৎফুল-চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করার দাবি সর্বৈব ভিত্তিহীন।

বৌদ্ধদের সবচেয়ে ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ: বৌদ্ধরাই সবচেয়ে ব্যাপকহারে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। ভারতে মুসলিম আক্রমণের সময় বৌদ্ধরা উত্তর-পশ্চিম (বর্তমান পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি) ও পূর্ব ভারতে (অর্থাৎ বেঙ্গল ইত্যাদি) কর্তৃত্বপূর্ণ ছিল। অথচ ইসলামের আগমন উভয় অঞ্চল থেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নিশ্চিহ্ন করেছে। মুসলিম শাসনামলে এক বাংলাতেই কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। আর ইসলাম-পূর্ব বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকা ৪০ শতাংশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৌদ্ধ নয়, বরং ব্যাপক

---

৯৩. Rabbi KF (1895) *The Origins of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, p. 113
৯৪. Ferishtah, Vol. I, p. 224
৯৫. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 224
৯৬. Lal KS (1995) *Growth of Scheduled Tribes and Castes in Medieval India*, Aditrya Prakashan, New Delhi, p. 73
৯৭. Ferishtah, Vol. I, p. 104
৯৮. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 297-98
৯৯. Ibid, p. 233-36; Ferishtah, Vol. I, p. 105
১০০. Lal (1995), p. 90

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু, যাদের অধিকাংশই নিম্নবর্ণের। বৌদ্ধদের মধ্যে কোন বর্ণবাদ বা শ্রেণীবিভেদ নেই। এটা নিঃসন্দেহে ইসলামের চেয়ে অধিক সমতাবাদী ও শান্তিপূর্ণ ধর্ম। তাহলে তাদেরকে কোন জিনিসটি উদ্বুদ্ধ করেছিল ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে? আর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা তথাকথিত নিগৃহীত ও নির্যাতিত এসব অঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে ইসলাম আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হলো কেন?

সুফিদের দ্বারা শান্তিপূর্ণ ধর্মান্তরকরণ

ইসলামে ধর্মান্তর সম্পর্কিত আরেকটি অবাস্তব দাবি চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে। সেটা হলো, সুফি বলে পরিচিত ইসলামের ভ্রষ্ট মতবাদী একটি সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ প্রচার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার ঘটিয়েছে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ টমাস আর্নল্ড (১৮৬৪-১৯৩০) – যিনি ইউরোপীয়দের মাঝে 'ইসলাম একটি সহিংস ধর্ম' বলে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ধারণা পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন – তিনি ১৮৯০ সালে উপরোক্ত প্রচারণা শুরু করেন, যা পরে অসংখ্য মুসলিম ও অমুসলিম ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতরা লুফে নেন। রিচার্ড হার্ডলি কর্তৃক সংক্ষেপিত নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলোর ভিত্তিতে আর্নল্ড সুফি কর্তৃক ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয়ে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেন:

> ১৮৭৮ সালে পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলার এক সেটেলমেন্ট রিপোর্টে লেফটেনেন্ট এলফিস্টোন উদ্ধৃত করেন: '*এখানে (পাকপাত্তান শহর) প্রসিদ্ধ দরবেশ ও শহীদ বাবা ফরিদের মাজার রয়েছে, যিনি দক্ষিণ পাঞ্জাবের জনগণের বড় একটা অংশকে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং যার অলৌকিকত্ব তাকে ঐ ধর্মের পীর (সুফি দরবেশ)-দের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে।*' ঝাং জেলার সেটেলমেন্ট রিপোর্টেও শেখ ফরিদ আল-দীন সম্পর্কে একই দাবি করা হয়েছে। ১৮৮১ সালের 'পাঞ্জাব লোক গণনা রিপোর্ট'-এ ইবেস্টোন বাবা ফরিদের সাথে মুলতানের বাবা আল-হকের নাম যুক্ত করেন, যাদের দুজনকে পশ্চিমা সমতল ভূমির লোকেরা সে অঞ্চলের লোকদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার কৃতিত্ব দেয়। ১৮৮০ সালে কুচ্রে জন্য প্রকাশিত বোম্বাই গেজেটিয়ার বলে কুচ্রে মেমোনরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় সৈয়দ ইউসুফ আল-দীনের অলৌকিকত্ব দেখে, যিনি ছিলেন সৈয়দ আবদ আল-কাদের জিলানীর বংশধর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্যত্র সৈয়দ মোহাম্মদ গেসু দারাজ হিন্দু তাঁতিদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন বলা হয়। ১৮৬৮ সালে সংগৃহীত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের 'আজমগড় সেটেলমেন্ট রিপোর্ট' ঐ জেলার মুসলিম জমিদারদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করে যে, তাদের পূর্বপুরুষদের ইসলামে ধর্মান্তরে এক মুসলিম দরবেশের শিক্ষা দায়ী ছিল। বাদাউনে শেখ জামাল আল-দীন তাবরিজী (যিনি পরে বাংলায় গমন করেন) সম্পর্কে বলা হয় যে এক হিন্দু গোয়ালার দিকে এক নজর তাকিয়েই তিনি তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এসব ও অন্য টুকিটাকি তথ্য থেকে আর্নল্ড তার সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিপুল সংখ্যক ভারতীয় মুসলিম এমনসব ধর্মান্তরিতদের বংশধর যাদের ধর্মান্তরকরণে বাহুশক্তি কোনো ভূমিকা রাখেনি, বরং কেবলমাত্র মিশনারিদের শিক্ষা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মপ্রচার কাজ করেছে।[১০১]

ইসলামে ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে সুফি সাধকদের শান্তিপূর্ণ ধর্মান্তর প্রক্রিয়া প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আর্নল্ড যে প্রধান নজিরগুলো উপস্থাপন করেছেন সেগুলো ১৮৮৪ সালের বোম্বাই গেজেটিয়ারে বর্গীয় নজির হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছে: সুফি সাধক মা'বারি খান্দায়াত (পীর মা'বারি) ১৩০৫ সালের দিকে দাক্ষিণাত্যে আসেন ধর্ম প্রচারক হিসেবে ও বিপুল সংখ্যক জৈনকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।[১০২] এ দলিলে পীর মা'বারি ধর্মান্তরের কাজে কী উপায় প্রয়োগ করেন সে বিষয়ে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হয়নি। উপরোল্লেখিত অন্যান্য দাবির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে (এসব দাবি অনেকটা মূলত অপ্রমাণিত ও রূপকথার মতো)।

যাহোক, পীর মা'বারি সম্বন্ধে মুসলিম লেখকদের প্রাচীন দলিলের উপর ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন বিষদ গবেষণা করেছেন, যাতে পীর মা'বারি বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইব্রাহিম জুবাইরি-র 'রাইজাত-উল-আউলিয়া (১৮২৫-২৬)' গ্রন্থ অনুযায়ী, পীর মা'বারি খান্দায়াত দাক্ষিণাত্যে এসেছিলেন এক ধর্মযোদ্ধা বা জিহাদী রূপে:

> দিলির বাদশাহ আলা আল-দীন খালাজি (আলাউদ্দিন খিলজি, মৃত্যু ১৩১৬)'র শাসনামলে তিনি (পীর মা'বারি) ৭১০ হিজ্রি সালে (১৩১০ খ্রিঃ) ইসলামের বাহিনীর সঙ্গে দক্ষিণে আসেন, যখন সোনা ও রূপার গুপ্ত ভাণ্ডার মুসলিমদের হস্তগত হয় এবং ইসলামের বিজয় ঘোষিত হয়।[১০৩]

এক সাধুর জীবনপঞ্জিতে বলা হয়েছে:

> পীর মা'বারি এখানে আসেন এবং রাজা ও বিদ্রোহীদের (বিজাপুরের) বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। এবং তাঁর লৌহদণ্ডের দ্বারা অনেক রাজার মস্তক ও ধড় ভেঙ্গে তাদেরকে পরাজয়ের ধুলায় লুণ্ঠিত করেন। বহু মূর্তিপূজক, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় পথনির্দেশ ও অনুকম্পা পায়, তারা তাদের অবিশ্বাস ও ভুল পথের জন্য অনুশোচিত হয় এবং পীর মা'বারির মাধ্যমে ইসলামে আসে।[১০৪]

অপর এক সূত্রে বলা হয়েছে যে, পীর মা'বারি একদল ব্রাহ্মণকে বিজাপুরে তাদের গ্রাম থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। মুসলিম লেখকরা পীর মা'বারিকে লৌহদণ্ড বা লোহার গদা হাতে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর জিহাদী যোদ্ধা বলে চিত্রিত করেছেন। এ কারণে তাকে *খান্দায়াত* বলা হয়, যার অর্থ '*ভোঁতা দণ্ড*'।

ইসলাম যে সুফি সাধকদের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিস্তার লাভ করেছিল – এ দাবীর এক প্রভাবশালী প্রচারক হলেন ডঃ ইটন। তিনি বলেন যে, যেসব স্থানে মুসলিম শক্তি পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, সেসব স্থানে ইসলাম এসেছিল '*বেনামা ভ্রমণশীল পুণ্যবান সাধকদের দ্বারা, যাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতার সাথে স্থানীয় জনগণ যুক্ত হতে পারতো*'। ইটন অতঃপর বাংলায় প্রচলিত একটি জনপ্রিয় মুসলিম কাহিনীর অবতারণা

---

[১০১]. Hardy P (1979) *Modern European and Muslim Explanations of Conversion to Islam in South Asia: A preliminary survey*, In N. Levtzion ed., p. 85

[১০২]. Arnold, p. 271

[১০৩]. Eaton RM (1978) *Sufis of Bijapur 1300-1700*, Princeton University Press, p. 28

[১০৪]. Ibid, p. 30

করেছেন এভাবে: *এক মুসলিম পীর তার ঐশ্বরিক বা ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতা নিয়ে এক গ্রামে এসে তথায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বলে রোগীর রোগ নিরাময় করেন; তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে; তাকে দর্শনের জন্য হাজার হাজার মানুষ ঐ গ্রামে হাজির হয় 'চাল, ফলমুল ও অন্যান্য উপাদেয় খাবার, ছাগল, মুরগি, কবুতর' প্রভৃতি উৎসর্গবস্তু নিয়ে, যা তিনি কখনো না ছুঁয়ে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেন। ইটন বলেন, সুফিদের এরূপ মানবীয় গুণাবলি তাদের মসজিদগুলোকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলে ও সেখান থেকে ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।*[১০৫]

ইটিন সম্পর্কে কৌতুহলের বিষয় হলো যে, তাঁর পিএইচ. ডি. থিসিসের জন্য ভারতীয় সুফিদের উপর রচিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপর তার নিজস্ব গবেষণা, যা তিনি '*সুফিস অব বিজাপুর ১৩০০-১৭০০*' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি সুফিদের মতামত ও কার্যকলাপ কিংবা তাদের ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় শান্তির কোনো রকম চিহ্ন দেখাতে ব্যর্থ হন। তার গবেষণায় বিজাপুরে আগত সমস্ত সুফি, বিশেষত প্রথম যুগের সুফিরা, ভয়ানক জিহাদী ও হিন্দুদের উপর নির্যাতনকারী রূপে প্রতীয়মান হয়; ইতিমধ্যে উদ্ধৃত পীর মা'বারি তাদের মধ্যে একজন। ইটনের গবেষণার ফলাফল সুফিদের প্রতি তার নিজস্ব ভালবাসা-ঘেঁষা উদ্দেশ্যমূলক মতামতের এতটাই বিরূপ যে, ভারতের মুসলমানরা তার সুফিদের উপর লিখিত বইটির বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ করে ও ভারতে বইটি নিষিদ্ধ করা হয়। তবুও সুফিদের ব্যাপারে তার অপ্রতিষ্ঠিত ও ভ্রান্ত মতামত প্রচারণা তিনি বন্ধ করবেন না।

যুক্তিসম্পন্ন মানুষের কাছে সুফিদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী কেবলমাত্র কাল্পনিক অতিকথা ছাড়া কিছুই নয়। অধ্যাপক মুহাম্মদ হাবিবের মতে, এসব কল্পকথা পরবর্তীতে যথাযথ গবেষণায় মিথ্যা উদ্ভাবন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে (নিচে দেখুন)। বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণে সুফিদের শান্তিপূর্ণ প্রয়াস যে ব্যাপক অবদান রেখেছিল, এমন দাবির পক্ষে কোনো ঐতিহাসিক বা অবস্থানগত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। ভারতে কোনো ঐতিহাসিক দলিলে উল্লেখ নেই যে, সুফিরা 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিল। সুবিখ্যাত উদারনীতিক সুফি পণ্ডিত আমীর খসরু (চতুর্দশ শতক) তার লেখায় মুসলিম শাসকদের দ্বারা বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীকে দাসত্বের শিকলে বেঁধে ধর্মান্তরকরণের বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি সুফি সাধকদের দ্বারা শান্তিপূর্ণ প্রচারণার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরের একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেননি। এখানে ভারতীয় সুফিদের আদর্শ ও অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মান্তরকরণে তাদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

সুফিবাদের উৎস

আল্লাহ জিহাদকে মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করেছেন, যার জন্য তারা যুদ্ধ করতে থাকবে যতদিন না সমগ্র পৃথিবীতে মানব জীবনের সর্বজনীন ও সর্বোৎকৃষ্ট দিক নির্দেশক ইসলাম একমাত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে (কোরান ২:১৯৩, ৮:৩৯)। আল্লাহ বিশ্বাসীদের জীবন কিনে নিয়েছেন; স্বর্গলাভের জন্য তারা কেবলমাত্র নিজেদেরকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতঃ জিহাদে শরিক হয়ে হত্যা করবে বা নিহত হবে (কোরান ৯:১১১)। যারা জিহাদে প্রাণ হারাবে আল্লাহ তাদেরকে স্বর্গসুখে সুখী করবেন শহীদ হিসেবে সরাসরি স্বর্গে অবতরণের সুযোগ দিয়ে। সুতরাং আল্লাহ বলেন: '*আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা 'মৃত' বলো না। না, তারা বেঁচে আছে, যদিও তোমরা সেটা অনুধাবন করতে পারছো না*' (কোরান ২:১৫৪)। আল্লাহ মুসলিমদেরকে একান্তভাবে তাঁর পথে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে তাদেরকে পিতা-পুত্র, স্ত্রী-ভ্রাতা ও গোত্রের লোকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং ইহলৌকিক আকাঙ্খা ও আনন্দের প্রলোভন ত্যাগ করতে উৎসাহিত করেছেন (কোরান ৯:২৪)।

নবি মোহাম্মদ তাঁর নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠাকালে আল্লাহর এসব নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেন। পৃথিবীতে ইসলামকে একমাত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর অনুসারীরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজ, রোজা ও বিশেষত জিহাদে তাদের জীবন উৎসর্গ করে। মদীনায়, যেখানে প্রথম আল্লাহ কর্তৃক জিহাদের মতবাদ প্রদর্শিত হয়, পুনর্বাসিত হবার পর নবি ও তাঁর ভক্তরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও সহিংস জিহাদে লিপ্ত হয়ে লুণ্ঠনমূলক অভিযান ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যার উদ্দেশ্য ও প্রতিফল ছিল ইসলামের বিস্তার ও নব্য জয়মান ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, এবং মূলতঃ লুণ্ঠিত মালামালের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন। জিহাদে নিহতরা শহীদত্ব পাবে (কোরান ২:১৫৪), আল্লাহর এই ডিক্রী স্বর্গলাভের জন্য সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হিসেবে নির্ণিত হয়, যেটা মুসলিমদের পার্থিব জীবনের প্রতিটি কাজের মূল লক্ষ্য। সুতরাং সেসব পবিত্র যুদ্ধে যারা মারা গেছেন, তারা মহাসৌভাগ্যবান ছিলেন: অর্থাৎ শহীদ হয়ে ইসলামের স্বর্গে গমনের জন্য তারা 'সরাসরি টিকেট' পেয়ে যায়।

ইসলামের প্রারম্ভিক বছর ও দশকগুলোতে শহীদ বরণের অনুপ্রেরণায় বিপুল সংখ্যক নতুন ভক্ত জিহাদী কার্যক্রমে নিয়োজিত হয়। ইসলামের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গে (বেহেস্তে) নিজস্ব স্থান নিশ্চিত করতে – যেখানে স্ফীত স্তনের কৃষ্ণনয়না পরমা সুন্দরী ও সদা-কুমারী হুরীদের নিয়ে অনুগ্রহ প্রাপ্তরা যৌনতৃপ্তি মেটাতে পারবে (কোরান ৪৪:৫১, ৭৮:৩১-৩৩) – শহীদত্ব লাভের জন্য এসব জিহাদীরা একান্তভাবে আল্লাহর রাহে জীবন দিতে নিজস্ব জ্ঞাতি ও সামাজিক বন্ধন এবং ইহলৌকিক কামনা-বাসনা ত্যাগ করে। সামাজিক বন্ধন ও মেলামেশা থেকে মুক্ত এবং সদা উপাসনায় ও বিশেষত শহীদের দরজা লাভের আশায় জিহাদে যোগদানের সুযোগ সন্ধানে মগ্ন তাদের জীবনধারা কিছুটা তপস্যামূলক হয়ে উঠে। মোটামুটি এটাই ছিল প্রাথমিক যুগে ইসলামের জীবন-দর্শন, যা নবি মোহাম্মদ আল্লাহর অনুমোদনে তাঁর ধার্মিক শিষ্যদের মনে প্রবিষ্ট করে যান।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে, বিশেষত নবির জীবদ্দশায়, যুদ্ধ করার মতো বয়সী ও স্বাস্থ্যবান সকল মুসলিম পুরুষকে জিহাদী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে হতো। ইসলামিক রাষ্ট্র দ্রুত বিস্তৃতি লাভ ও সুসংগঠিত হলে, রাষ্ট্র নিয়মিত বাহিনীরূপে জিহাদীদেরকে নিযুক্ত করে তাদেরকে

[১০৫]. Eaton RM (2000) *Essays on Islam and Indian History*, Oxford University Press, New Delhi, p. 32

রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসে। এর বাইরে অন্য মুসলিমরা তখনও স্বর্গলাভের জন্য শহীদের গৌরব অর্জনে জিহাদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে স্বেচ্ছাসেবক জিহাদী হিসেবে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে। এসব স্বেচ্ছাসেবক জিহাদীদেরকে 'আগ্রহী বা অভিযানকারী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ আসতো, তখন তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাদেরকেও পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, কিন্তু রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে নয়, জাকাতের তহবিল থেকে, যা ব্যয় করা হত শুধুমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। তারা এসব পবিত্র যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর (মালে গণিমত) একটা অংশ পেত, যা তাদের জীবনাধারণের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়।

মোহাম্মদ বিন কাসিম যখন ৬,০০০ আবর যোদ্ধা নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে জিহাদী অভিযানের নতুন সীমান্ত খোলেন, তখন মুসলিম ভূখণ্ডগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক এরূপ আগ্রহী অভিযানকারী লুণ্ঠিত মালামালের আশায় এবং ইসলামের প্রসারে আকৃষ্ট হয়ে স্রোতের মতো এসে কাসিমের বাহিনীকে স্ফীত করে তোলে।[১০৬] ধার্মিক মুসলিমদের মাঝে তখন শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল ছিল যে, তারা জিহাদী যুদ্ধে যোগ দিতে শত শত মাইল পথ পাড়ি দিতেও ইচ্ছুক ছিল। ড্যানিয়েল পাইপ্স জানান: '*এ কারণেই ৯৬৫ সালে বাইজেন্টিয়ামের বিরুদ্ধে জিহাদের সুযোগ গ্রহণ করতে প্রায় ২০,০০০ 'সেচ্ছাসেবক' ইরান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ১,০০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল।*' বলকান অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিতে তুর্কীর অটোমান হানাদাররা দূর-দূরান্তের মুসলিম দেশ থেকে হাজার হাজার যোদ্ধা আকৃষ্ট করে।[১০৭]

প্রাথমিক জোয়ারের পর জিহাদ অভিযান ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে ও কদাচিৎ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। 'গাজী' বলে আখ্যায়িত জীবিত থাকা স্বেচ্ছাসেবক জিহাদীরা, যারা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও তাপস জীবনযাপনে অভ্যস্থ ছিল, তারা 'রিবাত' (চৌকি) হিসেবে পরিচিত সীমান্তের দুর্গ সুরক্ষিত রেখায় বসবাস করতে থাকে। তারা আশা করে থাকতো যে সীমান্তের বাইরে কোনও এক সময় বিধর্মী ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে শহীদ-বরণের সুযোগ সৃষ্টিকারী জিহাদের সুযোগ আসবে। শহীদ-বরণে উদ্বুদ্ধ নতুন স্বেচ্ছাসেবক জিহাদীরাও গাজীদের এরূপ আলস্য জীবনে আকৃষ্ট হতে ও যোগ দিতে থাকে। তারা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনের আন্দালুসিয়ায় সীমান্ত বরাবর রিবাতসহ বহাল থাকে।[১০৮]

এসব গাজীরা 'মুরাবিত' নামেও পরিচিত ছিল, যার মোটামুটি অর্থ 'পাহাড়ি সীমান্তের মানুষ'। জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিতে কোনো কোনো সময় তারা সেসব নির্জন রিবাতে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতো। সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং কদাচিত জিহাদের সুযোগ পাওয়া এসব মানুষ নিঃসঙ্গ, বলা চলে, কিছুটা সন্ন্যাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের কারো কারো জীবন হয়ে পড়ে অলস, দীর্ঘকাল অকেজো বসে থাকায় অভ্যস্ত ও অহিংস।

পার্থিব ভোগ-লালসা ত্যাগী আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ তাদের জীবনাচরণ ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয় লালসাবর্জিত অথচ অহিংস হয়ে উঠে, ঠিক যেন বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের মত। এক সময় সীমান্তের নির্জন বা গুহাবাসী জিহাদীদের আশ্রয়স্থল বা রিবাতগুলো ধ্যান বা তপস্যার 'আশ্রম' হয়ে উঠে। স্যার হ্যামিল্টন গীব্স লিখেছেন: '*এ রিবাতগুলোই ইসলামে ধ্যান বা তপস্যা ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় (অর্থাৎ সুফিবাদ)। পরে জিহাদকে সকল ইহলৌকিক বা পার্থিব প্রলোভনের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক সংগ্রামরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।*'[১০৯]

এসব রিবাতের ভেতর থেকে কেউ কেউ শান্ত ও অহিংস জীবনদর্শনের শিক্ষা দিতে শুরু করে, যাতে তারা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা সমাজ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে এবং জাঁকজমক ও বিলাসী জীবন পরিহার করার প্রচারণা শুরু করে। উমর উদ্দিন লিখেছেন: '*তাদের লক্ষ্য ছিল আত্মাকে আবিষ্টকারী ও উন্নতিতে বাঁধাদানকারী প্রত্যেক ভোগ-লালসা পরিহার করে চলা।*'[১১০] এসব শান্ত মতবাদীরা 'সুফি' সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হয় ও তারা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়। এ সময় রিবাতগুলো পরিণত হয় সন্ন্যাসী আশ্রম, মঠ বা ধর্মশালায়, যেখানে নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় জীবনে সমাবিষ্ট হয়।[১১১] বেঞ্জামিন ওয়াকারের মতে:

> সন্ন্যাসত্ত্বের নীতিতে অনেক সুফি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশিষ্ট সুফিরা দারিদ্র্য, 'ফকির' বা ভিক্ষুক ও দরবেশী জীবনধারার স্তুতিতে লেখালেখি করেন। সুফিদের খুব অল্প সংখ্যক ইহলৌকিক আনন্দ, যেমন ধন-সম্পদ, খ্যাতি, ভোজ, নারী সম্ভোগ ও সঙ্গী-সাথী পরিত্যাগ করে নিদারুণ দারিদ্র্য, নাম-নিশানাহীনতা, ক্ষুধা, চিরকুমারত্ব ও নিঃসঙ্গ জীবন গ্রহণ করে; এমনকি তারা তাদের আধ্যাত্মিকতাকে আরো শক্তিশালী করতে গালিগালাজ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে উদাসীন থাকার মাধ্যমে দুর্ব্যবহার ও অসম্মানকে স্বাগত জানায়।[১১২]

সুতরাং সুফিবাদের পূর্বসূরী বা ভিত্তি জঙ্গী ইসলামি ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামির মধ্যে প্রোথিত ছিল। উমর উদ্দিন উল্লেখ করেছেন: সুফিবাদের উদ্ভব হয়েছিল '*দার্শনিক ও যুক্তিবাদীদের বুদ্ধিমত্তাবাদ এবং শাসকশ্রেণীর ঈশ্বরহীন চালচলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে।*'[১১৩] আব্বাসীয় শাসকরা তখন আরব বা ইসলামি সংস্কৃতিকে ঠেলে পিছনে ফেলে দেয় এবং ইসলাম-পূর্ব পারস্য সভ্যতার 'জাহিলিয়া' আচার-আচরণ (যা ইসলাম কর্তৃক অতিক্রান্ত) প্রবর্তণ করেছিল, যা নৈতিক শিথিলতা উৎসাহিত করে। অপরদিকে দার্শনিকরা ছিল 'প্লেটো ও এরিস্টোটলের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী', নবিদের উপর নয়। উমর উদ্দিন আরো বলেন, এ প্রবণতার বিরোধিতা করার জন্যই '*সুফিবাদের উদ্ভব এবং কোরান ও নবি বা তাঁর সাহাবাদের জীবন হলো এর আচরণবিধির ভিত্তি।*'

---

১০৬. Elliot & Dawson, Vol. I, p. 435
১০৭. Pipes (1983), p. 69
১০৮. Gibb, p. 33
১০৯. Ibid
১১০. Umaruddin, p. 61
১১১. Gibb, p. 33-34
১১২. Walker, p. 305
১১৩. Umaruddin, p. 58-59

উমর উদ্দিনের মতে, *'অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরে সুফিবাদ ইসলাম (অর্থাৎ গোঁড়া ইসলাম) থেকে খুব বেশি পৃথক ছিল না। তাঁদের মতবাদে ইসলামের কিছু সত্যের উপর বেশি জোর ছিল'*,[১১৪] অন্যগুলোর উপর ছিল কম নজর। পরে কিছু কিছু সুফি ধারা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে পড়ে এবং গোঁড়া বা মৌলবাদী ইসলামের কট্টর আচারনিষ্ঠা, যা আত্মার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা মেটাতে অক্ষম নিতান্তই বাহ্যিক আচার-আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল, তার বিরোধী হয়ে উঠে। অর্থাৎ তাঁরা ইসলামের মূল গোঁড়া পথ থেকে বিচ্যুত হয় ও শরীয়া বিধিবিধানের বাহ্যিক আচারকে *'ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিবর্তনের সর্বনিম্ন মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করে। একজন সুফির জীবন ও শিক্ষা এভাবে পরিকল্পিত যে, অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গমনকালে ক্রমান্বয়ে (শরীয়া) আইনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতা, গোঁড়ামি থেকে জ্যোতিতে বা আলোয়, ও আল্লাহর দিকে অভিযাত্রায় আত্মজ্ঞান থেকে স্রষ্টায় আত্মবিলুপ্তি (ফানা) অর্জন করবে।'*[১১৫] ধীরে ধীরে সুফি মতবাদে অসংখ্য পরিবর্তনের দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যার কিছু কিছু মূল ইসলামের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বা বিরোধী ও ভঙ্গকারী হয়ে দাঁড়ায়। এক পর্যায়ে কিছু পথভ্রষ্ট সুফি অনৈসলামিক সর্বেশ্বরবাদে পৌঁছে, যা সৃষ্টিকর্তার সাথে ব্যক্তি ও সমগ্র সৃষ্টিকে একটা একক সত্তায় ঐক্যবদ্ধ করে। আত্মমগ্নতা, আত্মলোপ ও আত্মধ্বংস ঘোষণাকারী সর্বেশ্বরবাদ, যা ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের দিকে নিয়ে যায়, সেটা ইসলামের মূল ধারণায় একটা অপবিত্র মতবাদ। অগ্রগতির এ স্তরে তাদের কোনও পথ নির্দেশক (অর্থাৎ নবি) অথবা আইন গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরান) প্রয়োজন পড়ে না। তারা শরীয়া আইনের প্রয়োজনীয় প্রায় সব আচার-আনুষ্ঠানিকতা – যেমন রোজা, নামাজ, হজ্ব, জাকাত প্রভৃতি – পরিত্যাগ করে। ইসলামি সমাজে তারা 'বিশরীয়া' অর্থাৎ শরীয়া বা ইসলামের বহির্ভূত বলে পরিচিত হয়।

ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু ১১১১) মূলধারার ইসলামি সমাজে সুফিবাদকে গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন। সুফিদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

> সুফিরা নবির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমকক্ষ হতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রতি বছর কোনো একটা সময়ের জন্য হিরা পর্বতের গুহায় নবির ধ্যানমগ্ন হওয়ার দৃষ্টান্তই সুফিদেরকে সমাজ থেকে অবসর গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। নবির নামাজে আত্মবিলুপ্তির অভ্যাসের ভিত্তিতে সুফিরা উন্মত্ত ও আত্মবিলয়ের প্রথা সৃষ্টি করে। সুফিদের জীবনে সন্ন্যাস বা তপশ্চর্যার রীতি নবির জীবনের অত্যন্ত সহজ-সরলতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট... নবি নিজে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করতেন, জুতা মেরামত করতেন, ছাগল দুয়াতেন এবং কখনই আকণ্ঠ ভোজন করেন নি।[১১৬]

ভারতীয় সুফিরা

কিছু কিছু সুফি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হলেও অধিকাংশই গোঁড়া বা মূলপন্থী থেকে যায়। দ্বাদশ শতকে গাজ্জালী মুসলিম সমাজে সুফিবাদের বিজয় ঘটাতে সক্ষম হন। তিনি মূলত ভ্রষ্ট ধারণা ও আচারসমূহকে অপসারিত করে সুফিবাদের দেহে ইসলামি গোঁড়ামিকেই বুনে দিয়েছিলেন, যার ফলে সুফিবাদ মুসলিমদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পায়। সুতরাং ইমাম গাজ্জালীর কারণে সুফিবাদের গোঁড়া অংশটাই মুসলিম সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। পথভ্রষ্ট বিশরীয়া সুফিদেরকে নানা নির্যাতন ভোগ, এমনকি মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উগ্র গোঁড়া ইসলামি শাসক সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (মৃত্যু ১৩৮৮) তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছেন যে, *'তিনি দিল্লির শেখ রুকনউদ্দিনকে আটক করেছিলেন, যিনি নিজেকে মাহদি (মেসিয়াহ) বলে ঘোষণা করেন এবং তিনি অতীন্দ্রিয় চর্চা ও বিকৃত ধারণার দ্বারা জনগণকে বিপথে পরিচালিত করছিলেন এটা বলে যে: তিনি সে রুকনউদ্দিন, যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি।' জনগণ রুকনউদ্দিন ও তার কিছু ভক্তকে হত্যা করে; তারা 'তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ও তাঁর হাড় ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড করে।'*[১১৭]

ভারতে মধ্য এশীয় তুর্কীরা যখন সরাসরি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে (১২০৬), তখন গাজ্জালীর খাঁটি বা কট্টর সুফিবাদ মুসলিম সমাজে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল এবং মুসলিম হামলাকারীদের পথ ধরে ভারতে সুফিদের আগমন ঘটে ব্যাপকভাবে। ভারতের বিখ্যাত সুফি দরবেশ – যেমন নিজামউদ্দিন আউলিয়া, আমির খসরু, নাসিরুদ্দিন চিরাগী, খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী ও জালালুদ্দিন – এরা সবাই গোঁড়া ও অসহিষ্ণু মতবাদী ছিলেন। তারা গোঁড়া ইসলামিক পণ্ডিত বা উলেমাদেরকে উচ্চ মূল্য দিতেন এবং তাদের শিষ্যদেরকে ধর্মীয় আইন ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে উলেমাদের রায় অনুসরণ করে চলার পরামর্শ দিতেন। বিখ্যাত আরব-স্প্যানিশ সুফি চিন্তাবিদ ইবনে আরাবির (মৃত্যু ১২৪০) গোঁড়ামিহীন বিতর্কিত মতবাদ ও চর্চায় প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় সুফিদের মধ্যে মঈনুদ্দিন চিশতি ও নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন তুলনামূলক অগোঁড়া ও উদারপন্থি। গোঁড়া মুসলিমদের বিরক্ত করে তারা তাদের সুফি ধর্মীয় আচার-প্রক্রিয়ায় বাদ্যপর্ব (সামা) ও নৃত্য (রাক্‌স) প্রবর্তন করেন। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হলে তারা কখনোই মূল গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যাননি এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বদাই উলেমাদের অগ্রগণ্য মনে করতেন। সুফি দরবেশদের প্রবর্তিত নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা অনুমোদনযোগ্য কিনা সে প্রশ্নে আউলিয়া বলতেন: *'যেটা আইনে (শরীয়া) নিষিদ্ধ, সেটা অগ্রহণযোগ্য।'* সেকালে বিতর্কিত সুফিদের ভজন বা ভক্তিমূলক গান অনুমোদনযোগ্য কিনা সে প্রশ্নে তিনি বলেন: *'বর্তমানে এ বিতর্কের ব্যাপারে বিচারক (অর্থাৎ কাজী, সাধারণত গোঁড়া প্রকৃতির) যে রায় দিবেন, তাই কার্যকর হবে।'*[১১৮]

উলেমাদের সাথে ভারতীয় সুফিদের কোনো রকম বিরোধিতা ছিল না। উভয়ের লক্ষ্য ছিল এক – ইসলামের স্বার্থ – যার অর্জনে তাদের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া বলতেন: *'উলেমারা যা বক্তৃতার দ্বারা অর্জন করতে চায়, আমরা তা আচরণ দ্বারা অর্জন করি।'* আউলিয়ার দীর্ঘসময়ের সঙ্গী জামাল কিয়ামুদ্দীন কখনোই তাঁকে নবির 'সুন্নত' পালনে ব্যর্থ হতে দেখেননি।[১১৯] অন্যান্য বিশিষ্ট সুফিরা অনেক

---

১১৪. Ibid, p. 62
১১৫. Walker, p. 304
১১৬. Umaruddin, p. 59-60
১১৭. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 378-79
১১৮. Sharma, p. 226
১১৯. Nazami KA (1991a) *The Life and Times of Shaikh Nizamuddain Auliya*, New Delhi, p. 138

ক্ষেত্রে অধিকতর গোঁড়া মত পোষণ করতেন। যেমন বিখ্যাত সুফি সাধক নাসিরুদ্দিন চিরাগ সুফি সাধনার ভ্রষ্ট ধারণা বা বিষয়গুলো পরিশ্রুত ও বিশুদ্ধ করেন। প্রফেসর কে. এ. নিজামী জানান: '*আল্লাহ ও তাঁর নবি যা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, তা করো এবং আল্লাহ ও তাঁর নবি যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা করোনা*' – একথা বলে তিনি (চিরাগ) সুফি সমাজে প্রবিষ্ট সমস্ত ভ্রষ্ট (শরীয়া থেকে) আচার ও চর্চা বা সাধনা নিষিদ্ধ করেন। প্রফেসর নিজামী আরো বলেন: '*তিনি সুফি ধারা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুন্নতের সাথে সমন্বিত করেন। যেখানে সামান্যতম দ্বন্দ্ব থাকে, সেখানে তিনি শরীয়া আইনের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন।*'[১২০]

সুফিদের চিন্তাধারা

এ পর্বে বিশিষ্ট সুফি, বিশেষত বিশিষ্ট ভারতীয় সুফিদের মন ও আদর্শ অনুধাবনের জন্য বিধর্মী ও সহিংস ইসলামি মতবাদ, যেমন জিহাদ, সম্পর্কে তাদের চিন্তাচেতনা সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

শ্রেষ্ঠ সুফি চিন্তাবিদ গাজ্জালি জিহাদ সম্পর্কে গোঁড়া ও সহিংস মত পোষণ করতেন। তিনি তার অনুরাগী মুসলিমদের উপদেশ দিতেন:

> "বছরে অন্তত একবার জিহাদে অবশ্যই যেতে হবে। দুর্গে অবস্থানকারীদের মাঝে নারী-শিশুরা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে গুলতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অগ্নিসংযোগ করে তাদেরকে পুড়িয়ে কিংবা ডুবিয়ে মারা যেতে পারে। তাদের গাছপালা কেটে ফেলা যেতে পারে। তাদের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ (বাইবেল, তৌরাত প্রভৃতি) অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। জিহাদীরা লুণ্ঠিত মালামাল (গণিমতের মাল) ইচ্ছে অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।"[১২১]

জিম্মি কর্তৃক অবমাননামূলক 'জিজিয়া' কর প্রদান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মাজিয়ানদেরকে অবশ্যই 'জিজিয়া' দিতে হবে। জিজিয়া প্রদানকালে জিম্মি তার মাথা ঝুলিয়ে দিবে এবং সরকারি কর্মচারী জিম্মির দাড়ি ধরে কানের নিচের স্ফীত স্থানে আঘাত করবে।

তিনি 'ওমরের চুক্তি' ও শরীয়া-প্রতিষ্ঠিত নিয়মের আলোকে জিম্মিদের ক্ষেত্রে কতকগুলো অক্ষমতা নির্দিষ্ট করেন। তিনি লিখেছেন:

> তারা খোলাভাবে মদ্যপান করতে ও চার্চের ঘণ্টা বাজাতে পারবে না... তাদের ঘর মুসলিমদের ঘরের চেয়ে উঁচু হবে না, তা যত নিচুই হোক। জিম্মিরা চমৎকার কোনো ঘোড়া বা খচ্চরে চড়তে পারবে না; তারা কেবল কাঠের গদি সম্বলিত গাধার পিঠে চড়তে পারে। তারা রাস্তার ভাল অংশ দিয়ে হাঁটতে পারবে না। তাদেরকে তালি দেওয়া জামা-কাপড় পরতে হবে। এমনকি সরকারি গোসলখানাতেও তাদেরকে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।[১২২]

বিশিষ্ট ভারতীয় সুফিগণ বিধর্মী কিংবা জিহাদের বিষয়ে ব্যাপক কোন মন্তব্য বা লেখা রেখে যান নি। তবুও ছোটখাট সুযোগ পেলেই এসব বিষয়ে তারা যেসব ছিটেফোটা মন্তব্য করে গেছেন, তা এসব ব্যাপারে তাদের চিন্তাচেতনার ইঙ্গিত দেয়। সামগ্রিকভাবে অবিশ্বাসী ও জিহাদের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল অনেকটা শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক গাজ্জালীর অনুরূপ।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া (১২৩৮-১৩২৫): নিজামুদ্দিন আউলিয়া গোঁড়া মুসলিমদের মতামত অবলম্বনে হিন্দুদেরকে নরকের আগুনে পোড়ার জন্য অভিশপ্ত করেন। তিনি বলেন: '*বিধর্মীরা মৃত্যুকালে শাস্তি পাবে। সে মুহূর্তে তারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করবে, কিন্তু তাদের তখনকার সে বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ সেটা হবে না অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস। সুতরাং একজন বিধর্মীর মৃত্যুকালীন বিশ্বাস অগ্রহণযোগ্য থেকে যাবে।*' তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন: '*পুনরুত্থানের দিন বিধর্মীরা শাস্তি ও নিদারুণ যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, কিন্তু তা কোন কাজে আসবে না। তারা নরকেই যাবে, যদিও বিশ্বাসী হিসেবে।*'[১২৩] তার 'খুৎবা'য় (ধর্মোপদেশ) নিজামুদ্দিন আউলিয়া বিধর্মীদেরকে অপকর্মী পাপী হিসেবে নিন্দা করে বলেন: '*আল্লাহ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য যথাক্রমে স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করেছেন, পাপীদেরকে তাদের অপকর্মের প্রতিদান দিতে মাত্র।*'[১২৪]

অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার চিন্তাভাবনা কোরানের প্রথম 'সুরা ফাতিহা' সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন: সুরা ফাতিহায় ইসলামের দশটি মৌলিক ভিত্তির মধ্যে দু'টি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তা হলো: '*অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং স্বর্গীয় বিধিবদ্ধ আইন প্রতিপালন করা।*' এবং সে মুতাবেক হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে নাসিরুদ্দিন কিবাচার বিজয়ে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং তার শিষ্য শাহ্ জালালকে ৩৬০ জন জিহাদি সাথীসহ প্রেরণ করেছিলেন সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করতে (এ প্রসংগে আরও আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৫৪)।

দক্ষিণ ভারতে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদের সম্ভাব্য সফলতা সম্পর্কে কাজী মুঘিসুদ্দিন যখন আউলিয়ার কাছে জানতে চান, আউলিয়া তখন আবেগাপ্লুতভাবে বলে উঠেন: '*এ বিজয় তো কি, আমি আরো বিজয়ের অপেক্ষায় আছি।*'[১২৫] নিজামুদ্দিন আউলিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের জিহাদ অভিযানে লুণ্ঠিত মালে গণিমত থেকে বিপুল পরিমাণ উপহার গ্রহণ করতেন ও তার খানকায় বা আশ্রমে তা গর্বের সাথে প্রদর্শন করতেন।[১২৬]

খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী (১১৪১-১২৩০): নিজামুদ্দিন আউলিয়ার পর সম্ভবত ভারতের দ্বিতীয়-শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক ছিলেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী, যিনি হিন্দুধর্ম ও তার চর্চার বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা প্রদর্শন করেন। আজমীর-এর আনাসাগর লেকে পৌঁছে তিনি সেখানে অনেক প্রতিমা-

---

[১২০]. Nazami KA (1991b) *The Life and Times of Shaikh Nizamuddain Chiragh-I Delhi*, New Delhi, p. 100,103
[১২১]. Bostom, p. 199
[১২২]. Ibid
[১২৩]. Sharma, p. 228-29
[১২৪]. Nazami (1991a), p. 185
[১২৫]. Ibid
[১২৬]. Sharma, p. 200

মন্দির দেখতে পেয়ে আল্লাহ ও নবির সাহায্যে সেগুলো ধূলায় মিশিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। সেখানে আবাস স্থাপনের পর খাজার ভক্তরা প্রতিদিন একটি বিখ্যাত মন্দিরের সামনে একটি গরু (হিন্দুরের কাছে পবিত্র) আনতো, যেখানে রাজা ও হিন্দুরা পূজার্চনা করতো; তারা সে গরু সেখানে জবাই করে তার মাংস কাবাব বানিয়ে খেত, যা ছিল হিন্দুধর্মের প্রতি তার ইচ্ছাকৃত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। বলা হয়, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তিনি না কি সেখানকার হিন্দুদের দুটি অতি পবিত্র হ্রদ, 'আনাসাগর' ও 'পানসেলা', শুকিয়ে দিয়েছিলেন তার আধ্যাত্মিক শক্তির তেজ দিয়ে।[১২৭] মঈনুদ্দিন চিশ্‌তীও তার ভক্তদের নিয়ে ভারতে এসেছিলেন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার লক্ষ্যে এবং সুলতান মুহাম্মদ গোরীর বিশ্বাসঘাতী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজমীরের সে যুদ্ধে দয়ালু ক্ষত্রিয় হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হন। চিশ্‌তী তার জিহাদী উদ্দীপনায় এ যুদ্ধে বিজয়ের সমস্ত গৌরব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বলেছিলেন: '*আমরা পিথাউরাকে (পৃথ্বীরাজকে) জীবন্ত আটক করে ইসলামের বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছিলাম।*'[১২৮]

ওদিকে মুলতানে হিন্দুদের বিরুদ্ধ নাসিরুদ্দিন কিবাচার এক জিহাদি মুসলিম বাহিনী যখন বিপন্ন অবস্থায় পরাজয়ের মুখোমুখি, তখন চিশ্‌তির সুবিখ্যাত শিষ্য ও সুফিসাধক কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী কিবাচার কাছে গিয়ে তাকে একটি যাদুকরী বা অলৌকিক তীর দিয়ে বলেন: '*বিধর্মী বাহিনীর দিকে এ তীর নিক্ষেপ করো... তার কথামত কিবাচা তা করেন এবং পরদিন যখন দিনের আলো ফুটে উঠে, তখন একজন অবিশ্বাসী সেনাকেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখা যায়নি; তারা সবাই পালিয়েছিল।*'[১২৯] এবং সে যাদুকরি সুফিসাধককে সম্মানিত করতে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লীর আশেপাশের মন্দিরগুলো ভেঙ্গে সেগুলোর মাল-মসলা দিয়ে সুবিখ্যাত 'কুতুব মিনার'টি নির্মাণ করেন।

আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫): শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কৃতী শিষ্য আমির খসরু মধ্যযুগীয় ভারতের এক উদার সুফি কবি হিসেবে পরিচিত। অনেক আধুনিক ইতিহাসবিদের দৃষ্টিতে তার ভারতে আগমন ছিল এ উপমহাদেশের জন্য এক আশীর্বাদ। পর পর তিন সুলতানের রাজদরবারে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সুখ্যাত আমির খসরু ভারতে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা ধ্রুপদী বাদ্যের এবং কাওয়ালী গান (সুফিদের নিবেদনমূলক গান)-এর প্রতিষ্ঠাতা। তবলা আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাকেই দেওয়া হয়ে থাকে।

গান ও কবিতায় আমির খসরুর কৃতিত্ব ও সাফল্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন পতিত অবিশ্বাসী ও তাদের ধর্মের প্রশ্ন আসে, তখন তার ইসলামের গোঁড়ামিপূর্ণ আবেগ স্পষ্ট হয়ে উঠে। হিন্দু রাজাদের উপর মুসলিম বিজয়ের বর্ণনায় তিনি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য, যেমন বৃক্ষ ও প্রস্তরমূর্তি পূজা, ইত্যাদির ব্যাপারে বিদ্রূপ করেন। মুসলিম বীরদের দ্বারা পাথরের মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতঃ তিনি লিখেন: '*মোহাম্মদের ধর্মের বিজয়োল্লাসের জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ। কোনো সন্দেহ নেই যে 'গাবর'রা (পৌত্তলিকদেরকে খর্বিত করতে গালি) পাথর পূজা করে, কিন্তু পাথর তাদের কোন সেবায় আসেনি; তারা পরপারে গেল শুধু সে পূজার অর্থহীনতার সাক্ষ্য বহন করে।*'[১৩০]

আমির খসরু মুসলিম বীরদের দ্বারা হিন্দুদেরকে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৩০৩ সালে চিতোর বিজয়ের পর খিজির খান কর্তৃক ৩০,০০০ বন্দিকে হত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লসিত আমির খসরু লিখেন: '*আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তিনি বিধর্মী-ছেদনকারী তলোয়ার দ্বারা ইসলামের চৌহদ্দি থেকে সকল হিন্দু নেতাদের হত্যার আদেশ দেন... ঈশ্বরের এ খলিফার নামে, ভারতে অবিশ্বাসের কোনই স্থান নেই।*'[১৩১] মালিক কাফুরের দক্ষিণ ভারতের একটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে হিন্দুদের ও তাদের যাজক ব্রাহ্মণদের উপর চালানো নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে খসরু কাব্যিক আনন্দ উল্লসিত হন।[১৩২] হত্যাকাণ্ডটির বর্ণনায় তিনি লিখেন: '*...ব্রাহ্মণ ও মূর্তিপূজকদের গর্দান থেকে মস্তক নাচতে নাচতে মাটিতে তাদের পায়ের উপর গড়িয়ে পড়লো ও রক্তের স্রোত বয়ে গেল।*' ভারতে হিন্দুদের দুর্দশাপূর্ণ বশীভূতকরণ ও ইসলামের বর্বরোচিত বিজয়ে গোঁড়ামিপূর্ণ উল্লাসে তিনি লিখেন:

> সমগ্র দেশ আমাদের পবিত্র ধর্মযোদ্ধাদের তরবারি দ্বারা আগুনে ভস্মিভূত কণ্টকশূন্য জঙ্গলের মত হয়ে গেছে। ইসলাম বিজয়ী হয়েছে, পৌত্তলিকতার পতন ঘটেছে। জিজিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির আইন মঞ্জুর না করা হলে, হিন্দুদের নামটি, শিকড় ও শাখা সহ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।[১৩৩]

আমির খসরু হিন্দুদের উপর মুসলিম বিজয়ীদের দ্বারা সংঘটিত বহু বর্বরোচিত সর্বনাশা নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এসব বর্ণনায় তিনি কোথাও একটু দুঃখ বা অনুশোচনার চিহ্ন দেখান নি, বরঞ্চ আবেগ জড়িত উল্লাস প্রকাশ করেছেন। ওসব বর্বর ঘটনার বর্ণনায় তিনি সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং মোহাম্মদের প্রতি গৌরব প্রকাশ করেছেন মুসলিম যোদ্ধাদের সে কৃতিত্বপূর্ণ কাজে সক্ষমতা দানের জন্য।

অন্যান্য সুফিগণ

অপর যে এক শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক ভারতে আসেন তাঁর নাম শেখ মখদুম জালাল আদ-দীন বিন মোহাম্মদ, যিনি হযরত শাহ জালাল নামে সমধিক পরিচিত ও বাংলার সিলেটে স্থিত হয়েছিলেন (পরে বর্ণিত)। এ সকল অতি শ্রদ্ধাবান সুফি সাধক ছাড়া আরও অনেক সুফি ব্যক্তিত্ব রয়েছেন – যেমন শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, শেখ নূরুদ্দিন মোবারক গজনবি, শেখ আহমদ শিরহিন্দী ও শেখ শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ – যারা অধিকতর গোঁড়া ধ্যান-ধারণার জন্য প্রায়শঃই আধুনিক ইতিহাসবিদ ও লেখকদের দ্বারা নিন্দিত হন। উদাহরণস্বরূপ, সুহরাওয়ার্দী তরিকা বা গোত্রের এক

---

১২৭. Ibid, p. 230
১২৮. Ibid
১২৯. Ibid, p. 230
১৩০. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 81-83
১৩১. Ibid, p. 77
১৩২. Ibid, p. 91
১৩৩. Ibid, p. 545-46

বিখ্যাত সুফি সাধক ও ইসলামি পণ্ডিত শেখ মুবারক গজনবি অমুসলিম (কাফির) ও তাদের ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও অসম্মান প্রকাশ করতেন। তিনি সুলতানকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, '*রাজারা কাফির ও কুফরি (নাস্তিকতা), শিরক (বহুঈশ্বরবাদ) ও মূর্তিপূজা উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত তাদের ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব পূরণ হবে না – যার সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তাঁর নবির 'দ্বীন' রক্ষার জন্য।*'[১৩৪] কিন্তু কোন অসম্ভব পরিস্থিতিতে তার উপদেশ ছিল: '*কুফরের গভীর ও দৃঢ় শিকড় এবং কাফির ও মুশরিকদের ব্যাপক সংখ্যাধিক্যের কারণে যদি পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা না যায়, তাহলে রাজাদের উচিৎ অন্তত মুশরিক ও মুর্তিপূজক হিন্দুদের অমর্যাদা, অসম্মান ও মানহানি করা, যারা ঈশ্বর ও তাঁর নবির নিকৃষ্টতম শত্রু।*'[১৩৫]

আধুনিক ইতিহাসবিদগণ কর্তৃক নিন্দিত হলেও এসব সুফিসাধকরা তাদের সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, বিশেষ করে উলেমা ও শাসক শ্রেণীর দ্বারা সম্মানিত হওয়ায় তারা রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে যথেষ্ট প্রভাব খাটাতেন। সুফি সাধক বাহাউদ্দিন জাকারিয়া ও নুরুদ্দিন মুবারক ইসলামের সর্বোচ্চ 'শেখ আল-ইসলাম' খেতাব ভূষিত হন, যা সাধারণত ইসলামের সবচেয়ে জ্ঞানী পণ্ডিতগণকে দেওয়া হত। ওসব অধিকতর গোঁড়া অথচ জনপ্রিয় সুফিদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে আরো বিশদ আলোচনায় না গিয়ে ইসলাম বিস্তারে সুফিরা কী ভূমিকা রেখেছিল এখন তা বিশ্লেষণ করা যাক।

ইসলাম বিস্তারে সুফিদের অবদান

শান্তিপূর্ণ ধর্ম প্রচারাভিযানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করার কৃতিত্ব দেওয়া হয় সুফিদেরকে। এ আলোচনার শুরুতেই দুটো বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথমত, সুফিরা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় একটি সুগঠিত ও গ্রহণযোগ্য সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। অথচ এর আগেই মধ্যপ্রাচ্য, মিশর, পারস্য ও উত্তর আফ্রিকার জনগণের অধিকাংশই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল এবং সে ধর্মান্তরে সুফিরা অবশ্যই বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। সুতরাং ফ্রান্সিস রবিনসন যথার্থই বলেন: '*মূলতঃ ইসলামের উল্লেখযোগ্য বিস্তারে সুফিরা মুখ্য ভূমিকা রেখেছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে।*'[১৩৬] দ্বিতীয়ত, সুফিদের কথিত শান্তিপূর্ণ ইসলাম বিস্তার মিশনকে সফলভাবে এগিয়ে নেয়ার আগে ইসলামের প্রভাব সৃষ্টির জন্য অনিবার্যরূপে প্রয়োজন হয়েছে ক্ষমতা ও তরবারির আতঙ্ক বা সন্ত্রাস।

মধ্যযুগীয় ভারতের সুফি সাধকদের উপরোল্লিখিত চিন্তাধারণা ও মনোবৃত্তি খুব একটা ভিন্ন ছিল না গোঁড়া ধার্মিক বা উলেমাদের মতামত থেকে, যারা অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মান্তরিতকরণে কোরান, সুন্নত ও শরীয়া অনুযায়ী শর্তহীনভাবে শক্তি প্রয়োগের পরামর্শ দিতেন। ভারতের সুফিরা ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সর্বদা সহিংস জিহাদকে সমর্থন করেছেন। শ্রেষ্ঠ সুফিসাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়া এবং মঈনুদ্দিন চিশতী উভয়েই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধের জন্য ভারতে এসেছিলেন এবং জিহাদী যুদ্ধে স্বয়ং অংশও নিয়েছিলেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য বাংলার শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক শেখ শাহ জালালকে ৩৬০ জন শিষ্যসহ প্রেরণ করেন (নিচে দেখুন)। বিজাপুরের প্রখ্যাত সুফিরাও পবিত্র ধর্মযোদ্ধারূপে অবিশ্বাসীদের হত্যা করে সেখানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন (ইতিমধ্যে উল্লেখিত)।

বাংলায় সুফিদের দ্বারা ধর্মান্তর

বিপুল সংখ্যক অমুসলিমকে সুফিগণ কর্তৃক শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার দাবি ঐতিহাসিক দলিল বা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। তদুপরি অধিকাংশ সুফি ছিলেন অসহিষ্ণু ও সহিংস জিহাদী মনোবৃত্তির; এমনকি তারা নিজেরাই ছিলেন সহিংস জিহাদে অংশগ্রহণকারী। বন্ধুত্বপূর্ণ এক আলাপচারিতায় বাংলাদেশী দুই ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞ পণ্ডিত আমাকে জানান যে, অন্তত বাংলাদেশে সুফিরা 'শান্তিপূর্ণ' উপায়ে ইসলামের
বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, একথা নেহেমিয়া লেট্‌সিওনের দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে, '*পূর্ব বাংলাকে প্রায় পুরোপুরি ইসলামে ধর্মান্তরকরণে সুফিরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।*'[১৩৭]

নিচে বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক সম্পর্কে অনুসন্ধান ধর্মান্তরিতকরণে তাদের ভূমিকা কতটা শান্তিপূর্ণ ছিল তার কিছুটা ধারণা দেবে পাঠককে। দুই জালাল, শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী (মৃত্যু ১২২৬ অথবা ১২৪৪) ও শেখ শাহ জালাল (মৃত্যু ১৩৪৭), ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ দুই সুফি সাধক। ১২০৫ সালে হিন্দু রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী বাংলায় আসেন। তিনি পান্দুয়ার (মালদহ, পশ্চিম বাংলা) নিকট দেবতলায় স্থায়ীভাবে বসতি গাড়েন। কথিত আছে যে, তিনি বিপুল সংখ্যক কাফিরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন, যদিও তার ধর্মান্তর পদ্ধতি অজ্ঞাত।

সৈয়দ আত্‌হার রিজভীর মতে, '*দেবতলায় এক কাফির (হিন্দু বা বৌদ্ধ) নির্মাণ করেছিলেন বিশাল এক মন্দির ও একটি কূপ। শেখ সেই মন্দির নিশ্চিহ্ন করে তথায় একটি 'তাকিয়া' (খানকাহ্‌) প্রতিষ্ঠা করেন।*'[১৩৮] কাফিরদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে এ বিখ্যাত সুফি সাধক কোন্ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন এ উদাহরণটি থেকে তার সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।[১৩৯]

---

[১৩৪]. Sharma, p. 179
[১৩৫]. Ibid, p. 183
[১৩৬]. Robinson F (2000) *Islam and Muslim History in South Asia*, Oxford University Press, New Delhi, p. 31-32
[১৩৭]. Levtzion N (1979) *Toward a Comparative Study of Islamization*, in *Conversion to Islam*, p. 18
[১৩৮]. Rizvi SAA (1978) *A History of Sufism in India*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, Vol. I, p. 201

বাংলার আরেক শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক আবাস গেড়েছিলেন সিলেটে। বাংলাদেশী মুসলিমদের কাছে তিনি এক জাতীয় বীর। শাহজালাল ও তার শিষ্যদের কৃতিত্ব হলো 'সত্যিকার' শান্তিপূর্ণ উপায়ে অধিকাংশ বাঙ্গালীকে ইসলামে দীক্ষিত করা।

পূর্ববাংলার (এখন বাংলাদেশ) সিলেটে শাহজালালের স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার ঠিক পূর্বে সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন গৌরগোবিন্দ নামে এক হিন্দু রাজা। শাহজালাল বাংলায় আসার পূর্বে গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ দুইবার গৌরগোবিন্দকে আক্রমণ করেন। উভয় আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের ভাতিজা সিকান্দর খান গাজী। দুবারেই মুসলিম হামলাকারীরা পরাজিত হয়।[১৪০] সুলতানের প্রধান সেনাপতি নাসিরুদ্দিনের পরিচালনায় গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে তৃতীয় আক্রমণ চালানো হয়। এ জিহাদ অভিযানে অংশ নিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া তার বিশিষ্ট শিষ্য শাহজালালকে ৩৬০ জন অনুসারীসহ প্রেরণ করেন। শাহজালাল ভক্তদের নিয়ে বাংলায় পৌঁছে হানাদার মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রাজা গৌরগোবিন্দ পরাজিত হন।[১৪১] প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের সবটুকু কৃতিত্বই বর্তায় শাহজালাল ও তার ভক্তদেও উপর।

সাধারণ নিয়মে মুসলিমদের প্রতিটি বিজয়ে বিধর্মীরা হাজারে হাজারে ক্রীতদাসের শিকলে বন্দি হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম হয়ে যেত। নিঃসন্দেহে সিলেটে শাহজালালের পদার্পণের প্রথম দিনই তলোয়ারের ডগায় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা বিপুল সংখ্যক কাফিরকে তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে সাহায্য করেন। বাস্তবিকপক্ষেই তা অত্যন্ত 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' ছিল বৈকি।

ইবনে বতুতা শাহজালালের সঙ্গে সিলেটে সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, সেখানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেসব বিধর্মীদের ধর্মান্তরিতকরণে তার প্রয়াস সহায়ক ছিল।[১৪২] কিন্তু ধর্মান্তরিতকরণে সুফি সাধকটির অবলম্বনকৃত উপায় বা ধরনটি সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। একথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, পবিত্র জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য শাহজালাল ভারতে এসেছিলেন ৭০০ সঙ্গী নিয়ে,[১৪৩] এবং গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী জিহাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ দৃষ্টান্ত সিলেটের হিন্দু বা বৌদ্ধদেরকে ধর্মান্তরিতকরণে তিনি কী ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, তার একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়।

অপর এক দৃষ্টান্ত অনুসারে, বাংলায় ধর্মান্তরকরণে সুফি সাধক নূর কুতুব-ই-আলম কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছিলেন বলে জানা যায়। ১৪১৪ সালে বিদ্রোহী হিন্দু যুবরাজ গণেশ মুসলিম শাসককে হটিয়ে দিয়ে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। এক হিন্দু ক্ষমতাসীন হওয়ায় সুফি ও উলেমা উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা তার শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করে বাংলার বাইরের মুসলিম শাসকদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইব্রাহিম শাহ সার্কি বাংলা আক্রমণ করে গণেশকে পরাজিত করেন। তৎকালীন বাংলার নেতৃস্থানীয় সুফি সাধক নূর কুতুক-ই-আলম সাময়িক শান্তি স্থাপনের মধ্যস্থতাকারী রূপে এগিয়ে আসেন। তিনি গণেশকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করে গণেশের বার বছরের পুত্র যদু'কে মুসলিম বানিয়ে সুলতান জালালুদ্দিন মোহাম্মদ নাম দিয়ে সিংহাসনে বসান।[১৪৪] সুফি সাধক কর্তৃক এ ধর্মান্তরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিংবা তরবারির ডগায় – যাই বলা হোক না কেন, ইসলামের জন্য তা হয়ে দাঁড়ায় এক পরম আশীর্বাদ। সুফিরা (উলেমারাও) ইসলামে ধর্মান্তরিত তরুণ সুলতানকে এমনভাবে দীক্ষিত করে তুলেছিলেন যে, তিনি (যদু) চরম সহিংসতার মাধ্যমে বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরের জন্য এক রক্তপিপাসু ধর্মান্তরকারীতে পরিণত হন। '*কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*'তে বলা হয়েছে যে, '*জালালুদ্দিন মোহাম্মদের (১৪১৪-৩১) শাসনকালে ধর্মান্তরের একটা স্রোত বয়ে যায়।*'[১৪৫] কিন্তু জালালুদ্দিন কর্তৃক বাংলায় বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরের এ স্রোত কিভাবে সাধিত হয়েছিল তার ধারণা পাওয়া যায় *জার্ণাল অব দ্যা এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (১৮৯৪)*-এ প্রকাশিত ড. জেমস ওয়াইজ-এর গবেষনা থেকে: '*তিনি একটিমাত্র শর্ত দিয়েছিলেন – হয় কোরান অথবা মৃত্যু... অনেক হিন্দু কামরূপ ও আসামের জঙ্গলে পালিয়ে যায়; তথাপি সম্ভবত তার ১৭ বছরের শাসনামলে (১৪১৪-৩১) যত লোককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল পরবর্তী তিনশ' বছরেও তা সম্ভব হয়নি।*'[১৪৬] অধ্যাপক ইশতিয়াক হুসেইন কোরেশী একটা কৌতূহলজনক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, বাংলার সুফিরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, কিন্তু তা করেছিলেন একেবারে 'গোঁড়ামির' রাস্তায়।[১৪৭] তার অর্থ হলো, বাংলার সুফিরা ছিলেন ধর্মীয় মতবাদে কট্টর; সুতরাং তাদের গ্রহণকৃত পদ্ধতি মতবাদী আপস ও শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধর্মান্তরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ; কেননা বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরিতকরণে গোঁড়া ইসলাম নিঃশর্ত শক্তি প্রয়োগ দাবি করে। বাংলার সুফিদের গোঁড়ামির প্রসঙ্গে ইশতিয়াক বলেন: '*তারা হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের স্থানগুলোতে তাদের 'খানকাহ' ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ইতিমধ্যে ইসলামের পূর্বেই পবিত্র (হিন্দু-বৌদ্ধদের কাছে) বলে পরিচিত ছিল।*' ইশতিয়াক

---

১৩৯. In Kashmir, great Sufi saint Sayyid Ali Hamdani also destroyed a temple to set up his Khanqah. There is a likely parallel between the methods these two Sufis applied in converting the Hindus (see below)

১৪০. There is a tradition that king Gaur Govinda was attacked because of his punishing one Shaykh burhanuddin and his son for slaughtering a cow. A piece of the cow-meat was stolen and dropped on th king's temple, which infuriated the king. Such Stories should be considered in the light of the facts that Muslims attacked every corner of India, often repeatedly and it is unlikely that they had or needed a valid reason like this in each case.

১৪১. *Hazrat Shah Jalal*, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ Hazrat_ Shah_Jalal

১৪২. Gibb, p. 269

143. *Shah Jalal (R)*, Banglapedia; http://banglapedia.search.com.bd/HT /S_0238.htm

১৪৪. Sharma, p. 243-44

১৪৫. Smith, p. 272

১৪৬. Lal, KS (1990) *Indian Muslims: Who Are They*, Voice of India, New Delhi, p. 57

১৪৭. Qureishi IH (1962) *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent (610-1947)*, S-Gravenhage, p. 74

আমাদেরকে জানাতে চান যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে সে স্থানে সুফিরা খানকাহ্ স্থাপন করেছিল – যা বহুস্থানে (কাশ্মীর, মালদাহ ইত্যাদিও) সুফিদের একটা সাধারণ ও পুনরাবৃত্ত ঘটনা সেটা স্থানীয় বিধর্মীদের ধর্মান্তরে সুবিধা করে দেয়। এ মর্মে লেট্‌সিওন বলেনঃ *'সুফিরা বৌদ্ধ মন্দিরের স্থানে তাদের খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন, আর তা সে ধর্মীয় পরিবেশে তাদের জন্য ফলদায়ক হয়।'*[১৪৮]

একথা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে, সুফিদের মন্দির ধ্বংস করে তার উপর 'খানকাহ' স্থাপন স্থানীয় বিধর্মীদেরকে তার সাথে সহজেই সম্পৃক্ত করে তুলে, আর বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধরা সেজন্য তাদের প্রতি ভালবাসায় গদগদ হয়ে উঠে।[১৪৯] সুফিদের মন্দির ধ্বংস করে সেস্থানে খান্‌কাহ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মকে অবমাননা করা বা আঘাত হানা। এবং বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় ইতিহাস বহু দৃষ্টান্তে ভরপুর যে, মুসলিমরা যখন তাদের (হিন্দু-বৌদ্ধ) মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে আসে তখন তারা স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু যখন তাদের ধর্মকে আক্রমণ করে, তখনি তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফুঁসে উঠেছে। মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতীয়দের মধ্যে যে বিরামহীন বিদ্রোহ ও সংগ্রামের অগ্নি জ্বেলে দিয়েছিল, তার পিছনে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রাজনৈতিক কারণের চেয়ে কোন অংশে কম দায়ী ছিলনা – এ সত্যটি জওয়াহেরলাল নেহরুর লেখায় বারংবার উদ্ধৃত হয়েছে।

সম্রাট আকবর ও কাশ্মীরে সুলতান জয়নুল আবেদীনের উদারনীতিক শাসন – যখন ধর্মীয় নির্যাতন নিষিদ্ধ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল – তা যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল। এটা প্রমাণ করে যে মুসলিমরা, তা শাসকই হোক কিংবা সুফি, যখন হিন্দু বা বৌদ্ধদের ধর্ম মন্দিরকে ধ্বংস বা কলুষিত করেছে, ভারতীয়রা তা অপছন্দ করেছে। অধিকন্তু বৌদ্ধরা, যারা বাংলায় সর্বাধিক সংখ্যক ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তারা বৌদ্ধবাদের অহিংস ও শান্তিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে এর আগে হিন্দু ধর্ম থেকে বৌদ্ধ ধর্মে স্বেচ্ছায় দীক্ষিত হয়েছিল। তাদের মন্দির ও অন্যান্য ধর্ম প্রতিষ্ঠানে মুসলিম আক্রমণ ও সেগুলোকে খানকাহ্ ও মসজিদে রূপান্তরিত করা হলে, নিঃসন্দেহে তা তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, কোনমতেই ইসলামের প্রতি অনুকূল আকর্ষণ নয়।

কাশ্মীরে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সুফিদের দ্বারা ধর্মান্তর

পারস্য ইতিহাস পঞ্জি, 'বাহারিস্তান-ই-শাহী' এবং 'তারিখ-ই-কাশ্মীর' (১৬২০), কাশ্মীরের হিন্দুদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণে সুফিদের সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে। কাশ্মীরে আগমণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি সাধক ছিলেন আমীর শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইরাকি। তিনি মালিক মুসা রায়নার সঙ্গে শক্তিশালী আঁতাত গড়ে তোলেন, যিনি ১৫০১ সালে কাশ্মীরের শাসনকর্তা হন। এর আগে কাশ্মীরের একমাত্র উদার ও সহনশীল মুসলিম শাসক জয়নুল আবেদীন (১৪২৩-৭৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করায় সেখানে হিন্দুত্ব উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, এর আগে মূর্তি-ধ্বংসকারীরূপে খ্যাত সিকান্দার যা প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছিলেন।[১৫০] 'বাহারিস্তান-ই-শাহী'তে বলা হয়েছে যে, মালিক রায়নার পৃষ্ঠপোষকতা ও কর্তৃত্বে আমীর শামসুদ্দীন মোহাম্মদ প্রতিমা-মন্দির পাইকারি হারে ধ্বংস এবং বিধর্ম ও অবিশ্বাসের ভিত্তি চিরতরে নির্মূল করার কাজে লিপ্ত হন। প্রতিটি ধ্বংসকৃত মন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে তথায় ইসলামি প্রথায় প্রার্থনা (নামাজ) চালু করা হয়।[১৫১] সুলতান ইউসুফ শাহের রাজসভার (১৫৭৯-৮৬) কর্মচারী হায়দার মালিক চাদুরা লিখিত কাশ্মীরের বিস্তৃত ইতিহাস 'তারিখ-ই-কাশ্মীর'-এ তিনি লিখেছেনঃ *'শেখ শামসুদ্দীন কাশ্মীরে পৌঁছেন। তিনি পূজার স্থান ও হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস শুরু করেন এবং সে উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালান।'*[১৫২] 'তোহ্‌ফাত-উল-আহবাব' নামের মধ্যযুগীয় এক ইতিহাস পঞ্জিতে বলা হয়েছেঃ *'শামসুদ্দীন ইরাকির পিড়াপিড়িতে মূসা রায়না আদেশ জারি করেন যে প্রতিদিন ১,৫০০ থেকে ২,০০০ বিধর্মীকে তার ভক্তদের দ্বারা শামসুদ্দীন ইরাকির সম্মুখে হাজির করা হোক। তারপর তাদের পবিত্র সূতা (জুনার) খুলে ফেলা হয়, তাদেরকে কলেমা পড়ানো হয়, তাদের মুসলমানি করা হয় ও তাদেরকে গোমাংস খাওয়ানো হয়।'* এভাবে তাদেরকে মুসলিম বানানো হয়। শামসুদ্দীন ইরাকি কর্তৃক হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তর সম্পর্কে 'তারিখ-ই-হাসান খুইহামি'তে উল্লেখ হয়েছে যে, *'শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জোরপূর্বক ২৪ হাজার হিন্দু পরিবার ইরাকির ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল (কাহরান ওয়া জাবরান)।'*[১৫৩]

পরে ১৫১৯ সালে মালিক কাজী চক সুলতান মোহাম্মদ শাহের অধীনে সামরিক প্রধানে উন্নীত হন। বাহারিস্তান-ই-শাহীতে বলা হয়েছেঃ *'কাজী চকের প্রতি আমীর শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইরাকির নির্দেশ ছিল যে, সে যেন এভূখন্ডের সমস্ত অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিককে নিশ্চিহ্ন করে, যা কাজী চক সম্পন্ন করেছিল।'*[১৫৪] এর আগে মালিক রায়নার শাসনকালে যাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের অনেকেই পরে বহুঈশ্বরবাদে (হিন্দুত্ববাদ) ফিরে যায়। এ অবস্থায় একটা গুজব ছড়ানো হয় যে, ওসব ইসলামত্যাগীরা *'পবিত্র কোরানের একটি কপি বসার আসনরূপে পাছার নিচে ব্যবহার করেছে।'* একথা শুনে ক্রুদ্ধ সুফি সাধক ইরাকি কাজী চকের কাছে নালিশ জানায় যেঃ

---

১৪৮. Levtzion (1979) in *Conversion to Islam*, p. 18

১৪৯. For the Sufis, building of their Khanqahs at the site of destroyed temples was meant for showing their utter contempt and disrspect for the religion of infidels.

১৫০. Pundit, p. 74; also discussed above.

১৫১. Ibid, p. 93-94

১৫২. Chadurah, p. 102-03

১৫৩. Pundit, p. 105-106

১৫৪. Ibid, p. 116

'পৌত্তলিকদের এ সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণের পর এখন এর বিরোধিতায় তাদের আগের ধর্মে ফিরে গেছে। তুমি যদি শরীয়ত মোতাবেক তাদেরকে দণ্ডদানে অক্ষমতা প্রদর্শন কর (ধর্মত্যাগীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড) ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না কর, তাহলে আমার জন্য আত্মনির্বাসনে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে।'[১৫৫]

উল্লেখ্য যে, শেখ ইরাকির অভিযোগের মধ্যে কোথাও কোরান অবমাননার কথা বলা হয়নি। তিনি কেবল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করার উপর জোর দিয়েছেন। বাহারিস্তান-ই-শাহী উল্লেখ করে যে, এ শ্রেষ্ঠ সুফি সাধককে শান্ত করতে কাজী চক '*অবিশ্বাসীদের উপর বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পবিত্র আশুরার দিন (মুহররম, ১৫১৮) হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হবে বলে স্থির করা হয়। সে নির্দিষ্ট দিনে সাত থেকে আট'শ বিধর্মীকে হত্যা করা হয়। হত্যাকৃতদের অধিকাংশই ছিল অবিশ্বাসী (হিন্দু/বৌদ্ধ) সম্প্রদায়ের সে সময়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।*' তারপর কাশ্মীরের অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের সব লোককে তরবারির মুখে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তর করা হয়। বাহারিস্তান-ই-শাহী জানায়: '*মালিক কাজী চকের এটা ছিল প্রধান একটা সাফল্য।*'[১৫৬] আর এ লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছিল মহান সুফি সাধক ইরাকির নির্দেশেই।

সৈয়দ আলী হামদানি ছিলেন আরেক সুফি সাধক, যিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন ১৩৭১ কিংবা ১৩৮১ সালে। তাঁর প্রথম কাজ ছিল ছোট একটা মন্দির ধ্বংস করে সেস্থানে নিজের 'খানকাহ্' স্থাপন করা।[১৫৭]

তার কাশ্মীরে পদার্পণের পূর্বে তৎকালীন শাসক কুতুবুদ্দীন ধর্মীয় আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে শিথিল ছিলেন। সে সময়ে কাজী ও ধর্মবিশারদসহ সমাজের সকল স্তরের মুসলিমরা ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়নি। মুসলিম শাসক, ধর্মবিদ কিংবা সাধারণ লোকেরা সহনশীলতা ও আয়েশের সাথে হিন্দু আচার-ঐতিহ্যের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।[১৫৮] কাশ্মীরী মুসলিমদের এরূপ অনৈসলামিক কর্মাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে সাইয়িদ হামদানি সে শৈথিল্য নিষিদ্ধ করেন ও গোঁড়ামি আনয়নের চেষ্টা চালান। সুলতান কুতুবুদ্দীন তার ব্যক্তিগত জীবনে গোঁড়া ইসলামি প্রথা চর্চার চেষ্টা করে, কিন্তু '*আমীর সাইয়িদ আলী হামদানির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ইসলামের বিস্তার ঘটাতে ব্যর্থ হন।*' অবিশ্বাসী প্রথা, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাবিত স্থানে বসবাসে অনীহা প্রকাশ করে প্রতিবাদস্বরূপ সুফি সাধক কাশ্মীর ত্যাগ করে চলে যান। পরবর্তীতে মূর্তি ধ্বংসকারী সিকান্দরের শাসনামলে কাশ্মীরের আরেক শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক আমীর সাইয়িদ মোহাম্মদ সেথায় আসেন, যিনি ছিলেন সাইয়িদ আলী হামদানির পুত্র। সাইয়িদ মোহাম্মদ ও মূর্তি ভঙ্গকারী সিকান্দরের যৌথ অংশীদারিত্বে তারা কাশ্মীর থেকে মূর্তিপূজা সমূলে উচ্ছেদ করে, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বাহারিস্তান-ই-শাহীতে উল্লেখ রয়েছে: '*এ দেশের মানুষের বিবেকের আয়না থেকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার কৃতিত্ব*' ছিল মহান সুফি সাধক সাইয়িদ মোহাম্মদের।[১৫৯]

সুফিদের দ্বারা গুজরাটে ধর্মান্তর

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮) গুজরাটের গভর্ণর বা শাসকরূপে ফারহাত উল-মূল্ক'কে নিয়োগ করেছিলেন। ফেরিস্তা উল্লেখ করেছেন: '*হিন্দুদের প্রতি সহনশীল নীতি গ্রহণ করে ফারহাত উল-মূল্ক হিন্দু ধর্মকে উৎসাহিত করেন এবং এরূপে প্রতিমা পূজা দাবিয়ে রাখার বদলে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন।*'[১৬০] স্বভাবতই এটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে '*গুজরাটের বিজ্ঞ সুফি ও গোঁড়া উলেমাগণের মধ্যে, এ ভয়ে যে এরূপ আচরণের পরিণামে ইসলামের সত্যিকার বিশ্বাসটাই সে অঞ্চল থেকে উঠে যেতে পারে।*' দিল্লীর সুলতানকে তারা চিঠি লিখে উদার এ মুসলিম গভর্ণরের রাজনৈতিক ধারণা ও '*সেটা ইসলামের জন্য তা কতটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে তিনি গভর্নর পদে বহাল থাকলে*' – তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে। অভিযোগ পেয়ে সুলতান ফিরোজ শাহ দিল্লিতে রাজসভার পবিত্র লোকদের (সুফি সাধক) এক সভা ডাকেন এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি গুজরাটের ভাইসরয় হিসেবে জাফ্ফর (মুজাফ্ফর খান)-কে নিয়োগ করেন।[১৬১]

সুফি সাধকদের অনুরোধে ও তাদের পছন্দে নিযুক্ত মুজাফ্ফর খান খুব শীঘ্রই গুজরাট থেকে সহনশীল গভর্ণর ফারহাত উল-মূল্ক'কে বিতাড়িত করেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে নৃশংস বর্বর সন্ত্রাস শুরু করে দেন। আর সে সঙ্গে শুরু করেন জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও হিন্দুদের মূর্তি ধ্বংসের হোলি খেলা। ১৩৩৫ সালে, '*তিনি সোমনাথে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি যে সব হিন্দু মন্দির খাড়া দেখেন, তার সবগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সে স্থানে মসজিদ স্থাপন করেন। ধর্ম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে সেসব স্থানে বিজ্ঞ সুফি সাধক ও শাসন কাজের জন্য কর্মচারীদের রেখে আসেন।*'[১৬২]

এ দৃষ্টান্ত আবারো প্রতীয়মান করে যে, যখনই কোন দয়ালু ও উদার চিত্তের মুসলিম শাসক অমুসলিমদের প্রতি সহনশীলতা দেখিয়েছে, সুফিরা সাধারণত তা সহ্য করেনি।

অধিকন্তু প্রশ্ন উঠে: *মুজাফ্ফরের সোমনাথে রেখে আসা সুফিরা কিভাবে সন্ত্রাসে আতঙ্কগ্রস্থ হিন্দু, যাদের ধর্মমন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, তাদের মাঝে ইসলাম বিস্তার করে?*

---

১৫৫. Ibid, p. 117
১৫৬. Ibid
১৫৭. Ibid, p. 36
১৫৮. Ibid, p. 35
১৫৯. Ibid, p. 37
১৬০. Ferishtah, Vol. IV, p. 1
১৬১. Ibid
১৬২. Ibid, p. 3

গুজরাট ও দিলির সুফিরা মূর্তি-পূজা অবদমন না করার জন্য সহনশীল গভর্ণর ফারহাত উল-মূল্কের অপসারণ চান। সুতরাং নিঃসন্দেহে মুজাফ্ফরের রেখে আসা সুফিরা অবশ্যই মুসলিম কর্মচারীদের সাথে হাত মিলিয়ে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন যাতে ইসলামি আইন কার্যকর ও হিন্দু ধর্ম অবদমিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ায়: সুফিরা নিশ্চিত করেন যে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির যেন আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয় এবং মূর্তি-পূজা দমনকরণে হিন্দু ধর্মচর্চা বন্ধ হয়। অবশ্য তারা কাশ্মীরের সুফি সাধক শামসদ্দীন ইরাকির মত কাজও করে থাকতে পারেন – যার ভক্তরা মুসলিম সেনাদের সহায়তায় প্রতিদিন ১,৫০০ থেকে ২,০০০ বিধর্মীকে ধরে তার খান্কায় এনে জোরপূর্বক মুসলিম বানিয়ে ছেড়ে দিতেন।

ধর্মান্তরকরণে সুফিদের প্রকৃত অবদান

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সুফিরা যদি ইসলামের বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা ঘটেছে ভারতে। কারণ, ভারতে ইসলামি বিজয় সূচিত হয়েছিল ঠিক এমন একটি সময়ে, যখন সুফিবাদ মুসলিম সমাজে প্রথমবারের মতো ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যথাযথভাবে সুসংগঠিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী সুলতান মোহাম্মদ গোরীর বাহিনীর সঙ্গে আজমীরে এসেছিলেন, ঠিক যখন মুসলিম বিজয় উত্তর ভারতে স্থায়ী পদাঙ্ক স্থাপন করতে শুরু করে। উপরে বিবৃত হয়েছে যে, কোনো বিখ্যাত ভারতীয় সুফির মাঝে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম বিস্তারের মানসিকতা ছিল না। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া ও শেখ শাহজালাল ভারতে এসেছিলেন পবিত্র ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে এবং বাস্তবত তারা হিন্দুদেরকে হত্যা ও ক্রীতদাস বানাতে জিহাদী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের বর্বর ও নির্মম জিহাদ উৎসাহিত করতেন ও তার রক্তক্ষয়ী জিহাদী অভিযানের বিজয়ে স্পষ্টতঃই উৎফুল্ল হন এবং হৃষ্টচিত্তে জিহাদে লুণ্ঠিত মালে গণিমতের মোটা উপহার গ্রহণ করেছেন।

এগুলো হলো মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সহনশীল সুফি সাধকদের কাহিনী। এসব তথ্য ও দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, তথাকথিত 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' ইসলাম বিস্তারের জন্য ধর্মপ্রচারণায় ব্রতী হওয়ার পরিবর্তে সুফিরা অনিবার্যরূপে মুসলিম শাসক কর্তৃক পরিচালিত রক্তঝরা ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমর্থক ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তারাই ছিলেন সহিংস জিহাদের প্ররোচক ও উদ্বুদ্ধকারী, এমনকি ওসব রক্তাক্ত যুদ্ধে বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারী। কাশ্মীরে সুফিরাই রক্তাক্ত জিহাদের অনুপ্রেরণা ও প্রণোদনা দেন, যার মাধ্যমে পাইকারি হারে হিন্দু মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস, হিন্দুদেরকে বেপরোয়াভাবে হত্যা ও জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তিতকরণ করা হয়।

মধ্যযুগীয় ভারতের এসব প্রসিদ্ধ সুফি সাধকদের মানসিকতা, মনোবৃত্তি ও কর্মকাণ্ড – সেটা হোক আজমীরে কিংবা বাংলায়, বিজাপুরে, দিল্লিতে বা কাশ্মীরে – তাতে ব্যবধান ছিল খুবই সামান্য। সুতরাং সমগ্র ভারতে ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে সুফিদের ভূমিকা কাশ্মীরের সুফি কর্তৃক পালিত ভূমিকা থেকে খুব বেশি ভিন্ন নাও হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ভারতে মুসলিম শাসকরা অগণিত হিন্দুর বিরুদ্ধে বিরামহীন জিহাদ চালিয়ে যান। এসব ধর্মযুদ্ধের অনেক ক্ষেত্রেই পরাজিত হতভাগাদেরকে গণহারে হত্যার পর হাজার হাজার বা লাখ লাখ নারী-শিশুকে দাস বানানোর মাধ্যমে ইসলামের পতাকাতলে আনা হয়। দলে-দলে, হাজারে-হাজারে বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরের জন্য এরূপ নিষ্ঠুর ও বর্বরতাপূর্ণ কাজ ও উপায়ের নিন্দা কখনো কোনো বিখ্যাত সুফি সাধক করেননি। এরূপ বর্বর কাজের নিন্দা জানিয়ে আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো বিখ্যাত সুফি সাধক একটি বিবৃতি দেননি। তারা কখনোই শাসকদেরকে তাদের বর্বর অভিযান ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় ধর্মান্তরিত করার এ নিষ্ঠুর পন্থা বন্ধ করতে বলেন নি। তাদের কেউই এ পর্যন্ত বলেননি: '*এরূপ নিষ্ঠুর উপায়ে ধর্মান্তরিত করার জন্য হিন্দুদের বন্দি বা আটক কোরো না। এ কাজটা আমাদের উপর ছেড়ে দাও। এটা আমাদের শান্তি পূর্ণ উপায়ে করণীয় দায়িত্ব।*' তৎপরিবর্তে তারা ওসব বর্বর ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ কাজে লাগামহীন সমর্থন, প্রকৃতপক্ষে উৎসাহ যুগিয়েছেন; এমনকি একান্ত আগ্রহে অংশগ্রহণও করেছেন।

কাশ্মীর, গুজরাট ও বাংলার হিন্দুদের ধর্মান্তরে সুফিদের সম্পৃক্তির দৃষ্টান্তগুলো ইসলাম বিস্তারে তাদের প্রয়োগকৃত পন্থার একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়, যা অমুসলিম ও তাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের বিকৃত ধারণা ও মনোবৃত্তির সঙ্গে যথার্থ সঙ্গতিপূর্ণ। কাশ্মীরে তাঁরা শাসকদেরকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ও তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরে উৎসাহিত করেন। ব্যাপকহারে অমুসলিমদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তারা ধর্মান্তরিত করেছেন, এমন প্রমাণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি এমনটা কখনো কোথাও ঘটে থাকে, সেটা মধ্যযুগীয় ভারতে সামগ্রিক ইসলামে ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় নিছকই প্রান্তিক ভূমিকা রেখেছিল মাত্র। বিশ্বের অন্যত্র তাদের সে ভূমিকা সম্ভবত আরো গুরুত্বহীন বা নগণ্য ছিল।

সুফিদের দ্বারা শান্তিপূর্ণ ধর্মান্তরের সাক্ষ্য-দলিল সামান্য: মধ্যযুগীয় ভারতের সর্বত্র লাগাতার মুসলিম অভিযানকালে যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ারের মুখে এবং দাস বানানোর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের গাদাগাদা প্রমাণ রেখে গেছেন মুসলিম ইতিহাসবিদরা। কিন্তু তার মধ্যে এমন কোনো ঘটনার একটি দলিলও খুঁজে পাওয়া যায় না, যা প্রমাণ করে যে, কোনো সুফি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দুকে 'অহিংস উপায়ে' ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন।

সুলতান মাহমুদ ভারতে তার প্রথম অভিযানে ৫০০,০০০ (পাঁচ লাখ) হিন্দুকে বন্দি ও দাস করে ইসলামে সংযুক্ত করেন। শাম্‌স সিরাজ আফিফ লিখেছেন যে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিলেন তাদেরকে নির্যাতন, অবমাননাকর জিজিয়া ও অন্যান্য দুর্বহ কর থেকে মুক্তি দানের প্রস্তাব দিয়ে,[১৬৩] যা সুলতান নিজেও লিপিবদ্ধ করে গেছেন (উপরে আলোচিত)। আফিফ জানান, ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৮০,০০০ হিন্দু বালককে দাসরূপে সংগ্রহ করেছিলেন: '*তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দাস-বালক শুধুমাত্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও মুখস্ত করে সময় কাটাত, অন্যেরা*

---

[১৬৩]. Sharma, p. 185

ধর্মশিক্ষায় ব্যস্ত থাকত ও বাকিরা বই নকল করে সময় কাটাত।'[১৬৪] এমনকি দাসকরণ ও জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তর নিষিদ্ধকারী বিজ্ঞ আকবরের শাসনামলেও তাঁর অনেকটা অখ্যাত ও মাত্র দুই বছর মালওয়া শাসনকারী জেনারেল আব্দুল্লাহ খান দাস বানানোর মাধ্যমে ৫০০,০০০ (পাঁচ লাখ) অবিশ্বাসীকে ইসলামে ধর্মান্তর করেছিলেন বলে দাবি করে গেছেন।[১৬৫] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আজকের মুসলিমদের পূর্বপুরুষরা মুসলিমে পরিণত হয়েছিল প্রধানত গোঁড়া ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে, মূলত সম্রাটের নির্যাতন থেকে রেহাই, সুবিধাজনক অধিকার প্রাপ্তি ও বৈষম্যমূলক করের বোঝা থেকে মুক্ত হতে।

এরূপ প্রধানত জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরের গাদা গাদা সাক্ষ্যর বাইরে ধর্মান্তরে সুফিদের অবদানের সাক্ষ্য নিতান্তই অনুপস্থিত। মধ্যযুগীয় ভারতে ধর্মান্তর সম্পর্কিত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে হাবিব উল্লেখ করেন: '*ঐতিহাসিক দলিলে মুসলমানদের কোন মিশনারি শ্রম বা ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টার নজির নেই। অমুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার জন্য আমরা কোনও মিশনারি কর্মকাণ্ডের চিহ্ন খুঁজে পাই না।*' তিনি যোগ করেন যে, মধ্যযুগীয় ইসলাম '*মিশনারি বা ধর্ম প্রচার কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধনে ব্যর্থ হয়*' এবং ভারতে '*আমাদেরকে সোজাসুজি স্বীকার করতে হয় যে, অমুসলিমদের ধর্মান্তরের জন্য মিশনারি আন্দোলনের কোন চিহ্নই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।*' তিনি আরো উল্লেখ করেন: '*কিছু কিছু সস্তা পুস্তকে মুসলিম আধ্যাত্ম সাধকদের অলৌকিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধর্মান্তরের কথা বলা হলেও ওসব পুস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে জানা যায়, সেগুলো পরবর্তীকালের বানানো গল্প ছাড়া কিছুই নয়।*'[১৬৬]

মধ্যযুগীয় সুফি সাধকদের উপর গবেষণা চালিয়ে রিজভী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, '*প্রাথমিক আধ্যাত্মিক দলিলে (মাল্‌ফুজাত ও মাক্‌তুবাত) এসব সাধকদের দ্বারা জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তর করার কোনোই উল্লেখ নেই।*' নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি সাধক। কিন্তু তার আত্মজৈবনিক স্মৃতিগ্রন্থ 'ফাওয়াইদ-উল-ফুয়াদ'-এ তার দ্বারা মাত্র দুজন হিন্দু দই বিক্রেতাকে ধর্মান্তরিত করার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১৬৭]

বড় ধরনের ধর্মান্তরের যেসব দৃষ্টান্তে সুফিদের সম্পৃক্ততা রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল অমুসলিমদের উপর বেপরোয়া সহিংসতা ও নির্মমতা প্রদর্শনে শাসকদেরকে প্ররোচিত করা। উপরে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণে এটা স্পষ্ট হয় যে, সুফি সাধকরা শান্তিপূর্ণ ধর্মপ্রচার কর্মকাণ্ডে খুব সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছেন বা উদ্যোগী হয়েছেন। এমনকি তারা সে ধরনের শান্তিপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার বিরোধীও ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মাহদী হুসেইন উল্লেখ করেছেন: ধর্মান্তরকরণে অতিশয় আগ্রহী সুলতান মুহাম্মদ শাহ তুঘলক মিশনারি কাজে সুফিদের নিয়োজিত হওয়ার প্রস্তাব করলে, সুফি সম্প্রদায় তার প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে।[১৬৮] অন্যত্র সুফিরা যখনই ধর্মান্তর কাজে জড়িত হয়েছেন, তাদের পদ্ধতি স্পষ্টতঃই শান্তিপূর্ণ ছিল না।

তদুপরি অধিকাংশ ভারতীয় সুফি, যারা পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছিলেন, তারা সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে ভারতীয় ভাষায় কথা বলতেন না। তারা কখনোই ঘৃণিত 'জাহিলিয়া' ভাষা (অর্থাৎ ভারতীয় স্থানীয় ভাষা) শিখতে আগ্রহী হননি। অথচ তৎকালীন ভারতের স্থানীয় অধিকাংশ মানুষ ছিল অশিক্ষিত, নিরক্ষর। তারা ফার্সি বা আরবি ভাষা বুঝত না। পরিশেষে, আজকের হিন্দুরা, বিশেষত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা, ইসলামে ধারণকৃত বলে দাবীকৃত উচ্চমানের সমতা, শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের বার্তা সম্বন্ধে অনেক ভাল বিচার-ক্ষমতা রাখে। আজ অসংখ্য সহজগম্য ও সৃজনশীল উপায়ে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ও সঠিক ব্যাখ্যায় ইসলামের বার্তা ভারতের প্রতিটি স্থানে পৌঁছে যাচ্ছে। ইসলামের বার্তা যদি এতটাই শ্রেষ্ঠ বা উচ্চমানের হতো, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার ভারতীয় অবিশ্বাসী মুসলিম শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে দাবি করা হয়, তাহলে আজকের দিনে ধর্মান্তরের হার অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি হতো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বণিকদের দ্বারা ধর্মান্তর

সম্প্রতি মুসলিম বণিকদের দ্বারা বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেটা ঘটেছিল, তা ইসলামে ধর্মান্তরের একটা নতুন দৃষ্টান্তরূপে প্রচারণা পাচ্ছে। *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*-র এক নিবন্ধে অতুল শেঠী দাবি করেন: 'ভারতে মুসলিম হানাদারদের দ্বারা ইসলাম আনীত হয়েছিল' – এটা একটা ভুল ধারণা। এ ভুল ধারণা সংশোধন করতে তিনি লিখেছেন:[১৬৯]

> অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এখন একমত যে, ভারতে ইসলামের প্রবর্তন আরব বণিকদের মাধ্যমে হয়েছে, মুসলিম হানাদারদের দ্বারা নয় – যা সাধারণত বিশ্বাস করা হয়। আরবরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন থেকে দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে আসা-যাওয়া করে আসছিল, আরবে ইসলাম প্রচারেরও অনেক আগে থেকে। এইচ. জি. রাউলিনসন তার *এইনসান্ট অ্যান্ড মেডিয়েভল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থে লিখেছেন: '*সপ্তম শতকের শেষাংশে ভারতের উপকূলীয় শহরগুলোতে প্রথম আরব মুসলিমরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করে*। তারা ভারতীয় নারীদের বিয়ে করে ও সম্মানসূচক আচরণ পায়। তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রচারেরও অনুমতি পায়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান বি. পি. শাহুর মতে, অষ্টম ও নবম শতকের মধ্যে যেখানে যেখানে আরব মুসলিমরা বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানেই তারা বিশিষ্ট অবস্থান দখল করতে শুরু করে। বস্তুতঃ এদেশে প্রথম

---

[১৬৪]. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 341
[১৬৫]. Lal (1994), p. 73
[১৬৬]. Lal (1990), p. 93
[১৬৭]. Ibid, p. 93-94
[১৬৮]. Ibid, p. 94
[১৬৯]. Sethi A, *Islam was brought to India by Muslim invaders*, The Time of India, 24 June 2007; also see Qasmi MB, *Origin of Muslims in India*, Asian Tribune, 22 April 2008

মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয় এক আরব বণিকের দ্বারা ৬২৯ সালে কোদুনগালুরে, যা এখন কেরালা নামে পরিচিত। কৌতূহলের বিষয় হলো, সেসময় নবি মোহাম্মদ জীবিত ছিলেন ও ভারতের এ মসজিদটি সম্ভবত বিশ্বের প্রথম গুটিকয় মসজিদের একটি। এটা প্রমাণ করে যে, ভারতে ইসলামের উপস্থিতি শুরু হয় মুসলিম হানাদারদের আগমনের অনেক আগেই।

প্রখ্যাত মুসলিম বণিক ও ইতিহাসপঞ্জিকার আল-মাসুদী ৯১৬-১৭ সালে আধুনিক বোম্বাই থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত '*চউল-এ হাজার হাজার মুসলিমের এক আবাসের বর্ণনা দিয়েছেন, যাদের পূর্বপুরুষরা আরব ও ইরাক থেকে লঙ্কা ও মশলার ব্যবসার জন্য এসেছিলেন। স্থানীয় রাজা এ বসতির লোকদেরকে কিছুটা রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেছিলেন। এর সদস্যরা ছিল প্রধানত আরব, যারা চউলে জন্মগ্রহণ করেছে ও স্থানীয় লোকদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।*'[১৭০]

স্পষ্টতঃই মুসলিম আক্রমণকারীরা ৭১২ সালে সিন্ধুতে বিজয়ের খুঁটি গাড়ার অনেক আগেই মুসলিম বণিকরা ভারতে আগমন করে বসতি স্থাপন করে। এসব উদাহরণের ভিত্তিতে দাবি করা হয় যে, আক্রমণকারী মুসলিম হানাদার ও বীর যোদ্ধারা নয়, বরং বণিকরা ভারতে ও অন্যান্য অনেক স্থানে ইসলামের বিস্তার ঘটিয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ফিলিপিন ও দক্ষিণ থাইল্যান্ড বণিকদের মাধ্যমে এরূপে ইসলাম বিস্তারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমুসলিমদের ইসলামে ধর্মান্তরে শক্তি প্রয়োগের অভিযোগ অস্বীকার করতে জাকির নায়েক প্রশ্ন রাখেন:

> ইন্দোনেশিয়া একটা দেশ যেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলিম বাস করে। মালয়েশিয়ার অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। প্রশ্ন হল: '*কোন মুসলিম বাহিনী অস্ত্রহাতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল?*'

মুসলিমদের কাছ থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর আসে: '*সেকালের শাসকরা স্বেচ্ছায় আজকের ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) কাছে সমর্পণ করেছিল সিল্ক রুট ও সমুদ্র পথ দিয়ে আগত আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে*' (ব্যক্তিগত যোগাযোগ)। অপরদিকে ড্যানিয়েল পাইপস নায়েকের সাথে সহমত প্রকাশে তার প্রশ্নের জবাব দেন এভাবে: '*দ্বারুল ইসলাম শান্তিপূর্ণভাবেও বিস্তৃতি লাভ করে রাজাদের স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরের মাধ্যমে, যেমন ১৪১০ সালে মালাক্কার শাসনকর্তা পরমেশ্বরের ধর্মান্তর; পরবর্তীতে তার নগরী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।*'[১৭১] একইভাবে আরব লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল খালেক হাসোনা দাবি করেন (১৯৩৮): '*কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ইসলাম চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিনে বিস্তার লাভ করে।*'[১৭২]

ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসবিদ রাদেন আব্দুলকাদির উইদিয়োতমোদিয়ো ইন্দোনেশিয়ার অমুসলিমদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর সম্পর্কে লিখেন:

> ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মান্তরের গোটা ইতিহাসে কোথাও কোনো বহিরাগত শক্তির অস্তিত্ব নেই। সত্যিকারের ধর্ম বিস্তারে জিহাদ বা পবিত্র ধর্মযুদ্ধই একমাত্র পথ নয়। নিয়ম অনুযায়ী, কেবলমাত্র উপদেশ ও প্রচারণা ব্যর্থ হলে শক্তি প্রয়োগ অনুমোদিত।[১৭৩]

উইদিয়োত মোদিয়ো অন্তত ইসলামে ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে 'ধর্মযুদ্ধের' মাধ্যমে শক্তিপ্রয়োগ ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত বলে একমত হয়ে সততার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তিনি ইন্দোনেশিয়ায় তার প্রয়োগের কোনো আলামত খুঁজে পাননি। এবং তিনি সোজাসুজি স্বীকার করেন যে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরের প্রচেষ্টায় বাঁধা এলে বা তা ব্যর্থ হলে, বল প্রয়োগ হতো বা হতে পারতো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রসারের পূর্বে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চলে তিনটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল, যেগুলো হলো শ্রীবিজয়া (মালয়েশিয়া), মাজপাহিত (ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ) ও সিয়াম বা শ্যাম (থাইল্যান্ড)। জনগণ তখন হিন্দু, বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদের সংমিশ্রনে সৃষ্ট একটি মিশ্র ধর্ম অনুসরণ করতো। ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমানের (মৃত্যু ৬৫৬) রাজত্বের প্রথম দিকে আরব মুসলিম বণিকরা সমুদ্রপথে চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলীয় বন্দরে যাত্রাবিরতির মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের সাথে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপন করে।

পরে ৯০৪ সাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মুসলিম বণিকরা শ্রীবিজয়ার সুমাত্রা বন্দরের বাণিজ্যকর্মে ক্রমে অধিকতর জড়িত হয়। ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলিম বণিকরা ভারতের গুজরাট, বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় বন্দর এবং চীন থেকেও অধিক সংখ্যায় আসতে থাকে। এসব মুসলিম বণিক, যারা সর্বদাই ধর্মপ্রচার মিশন সঙ্গে আনত, তারা উপকূলীয় বন্দর-শহরগুলোতে স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন করে, যেমন মালাক্কা ও উত্তর সুমাত্রার (আচেহ, জাভা) সামুদ্রা বা পাসাই। তারা স্থানীয় বিধর্মী নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তুলে। সম্ভবত দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ অঞ্চলে মুসলিম বণিক কর্তৃক স্থাপিত মুসলিম বসতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর সুমাত্রায় উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি গড়ে তুলে। এ সময়ের মধ্যে তারা দু'টো মুসলিম নগর-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়: একটা সামুদ্রা বা পাসাই-এ, অপরটি ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের পার্লাক-এ। ১৩৪৫-৪৬ সালে ইবনে বতুতা সামুদ্রা মুসলিম নগর-রাজ্যটি সফর করেন।

তখন পর্যন্ত এ অঞ্চলের অবিশ্বাসীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়নি বলে মনে হয়। মুসলিমরা স্থানীয় সহনশীল ও উদার সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে স্থানীয় নারীদেরকে বিবাহের মাধ্যমে তাদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা ধীরে ধীরে মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তুলে। তারা তিন থেকে চার শতাব্দীর মধ্যে সামুদ্রা ও পার্লাকে দুটো নগর-রাজ্য গড়ে তোলার মতো মুসলিম জনসংখ্যা অর্জনে সক্ষম হয়। এবং শীঘ্রই তারা

---

[১৭০]. Eaton (1978), p. 13
[১৭১]. Pipes (1983), p. 73
[১৭২]. Waddy, p. 187
[173]. Widjojoatmodjo RA (1942) *Islam in the Netherlands East Indies*, in the Far Eastern Quarterly, 2 (1), p. 51

আশেপাশের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামুদ্রা সুলতানাত সফরের পর ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন: '*শাসক সুলতান আল-মালিক আজ-জাহির ছিলেন সুখ্যাত ও মুক্তহস্ত শাসক।*' তার কারণ:

> তিনি অবিরাম ধর্মের জন্য যুদ্ধে (অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদে) ও যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত ছিলেন। তার প্রজারাও নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করতে আনন্দ পেত ও স্বেচ্ছায় যুদ্ধাভিযানে তার সঙ্গী হতো। মুসলিমরা সে অঞ্চলের সমস্ত অবিশ্বাসীদের উপর কর্তৃত্বকারী অবস্থানে ছিল, যাদেরকে (মুসলিমদেরকে) ভূমিকর দিয়ে শান্তির নিশ্চয়তা কিনতে হত।[১৭৪]

রাজা পরমেশ্বরের ধর্মান্তর: তথাপি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মান্তরিত করতে ইসলাম খুব সামান্যই সফলকাম ছিল এবং তাদের উপস্থিতি মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোণে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে প্রতারণার মাধ্যমে শ্রীবিজয়ার রাজা পরমেশ্বরের ধর্মান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে। পরমেশ্বর পালেমবাং থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এ সময় শ্রীবিজয়া রাজ্যের পতন ঘটছিল এবং মাজ্‌পাহিত শাসকরা তাদের প্রভু হয়ে উঠছিল। মাজ্‌পাহিত শাসকের সাথে এক কলহের কারণে তিনি তাঁর রাজধানী পালেমবাং থেকে কিছুটা নিরাপদ তেমাসেক দ্বীপে (সিঙ্গাপুর) স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। মাজ্‌পাহিত বাহিনীর সাথে এক হাতাহাতি যুদ্ধে তিনি মাজ্‌পাহিতের মিত্র শ্যামের যুবরাজ তেমাগিকে হত্যা করেন। এতে শ্যামের ক্রুদ্ধ রাজা মিত্র মাজ্‌পাহিতের সঙ্গে যৌথশক্তিতে পরমেশ্বরকে বন্দি ও হত্যার উদ্দেশ্যে একের পর এক শ্রীবিজয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরমেশ্বর পিছুপদ হয়ে তেমাসেক দ্বীপ থেকে পালিয়ে যান – প্রথমে মুয়ারে, পরে মালাক্কায়, এবং ১৪০২ সালে মালাক্কাকে রাজধানী করেন তিনি।

এ সময় বন্দর-নগরী মালাক্কায় দীর্ঘদিন আগে বসতি স্থাপনকারী মুসলিমরা উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি গড়ে তুলেছিলেন। প্রধানত ব্যবসায়ী পেশায় নিয়োজিত হওয়ায় তারা ভারতের সাথে মালাক্কার প্রসারিত বাণিজ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। সুতরাং পরমেশ্বরের রাজদরবারে তারা সর্বদাই স্বাগত পেত এবং সেখানে তাদের উপস্থিতি ক্রমশঃ বর্ধিত করে তারা পরমেশ্বরের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে প্রভাব বাড়িয়ে তুলে। মুসলিমরা তার সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়তে থাকে এবং তিনি শ্যাম ও মাজ্‌পাহিত শাসকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ক্রমশঃ তাদের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ঠিক এ সময়ে পরমেশ্বরের মুসলিম উপদেষ্টারা তাকে প্রস্তাব দেয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য আরো আরব মুসলিম যোদ্ধা পাঠানো হবে। পরমেশ্বর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর কয়েক বছর ধরে তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রুর বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে তার অবস্থান ক্রমশঃ দুর্বল ও বিপজ্জনক হতে থাকে।

ঠিক এ সন্ধিক্ষণে আরব বণিকরা তাকে পাসাই থেকে মিশ্ররক্তের এক সুন্দরী তন্বিকে উপহার দেয়, যার পিতা ছিল আরব ও মাতা ইন্দোনেশিয়ার বংশোদ্ভূত। পরমেশ্বর এ অনন্য সুন্দরী দাস-কন্যার প্রেমে পড়ে যান ও তার হারেমে সে গর্ভবতী হয়। নিঃসন্তান পরমেশ্বর দীর্ঘদিন থেকেই তার রাজ্যের জন্য এক উত্তরসূরীর আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। তিনি গর্ভবতী দাস-বালিকাকে তার সন্তানের বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, বিয়ের আগে সে পরমেশ্বরকে অবশ্যই ইসলাম গ্রহণের দাবি করে বসে। উত্তরোত্তর দুর্বল ও বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে মুসলিম সেনাদের থেকে অধিক সাহায্যের জরুরি প্রয়োজন ও এর সাথে উত্তরসূরীর আকাঙ্ক্ষা – এ দুটো কারণে পরমেশ্বর শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরে সম্মত হন। তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে গর্ভবতী দাস-বালিকাটিকে বৈধ রাণী করে প্রাসাদে নিয়ে আসেন।

মালাক্কা সুলতানাত ও জিহাদের তীব্রতা বৃদ্ধি: ১৪১০ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর পরমেশ্বর হিন্দু রাজ্য শ্রীবিজয়াকে একটি মুসলিম সুলতানাত অর্থাৎ মালাক্কা সুলতানাতে পরিণত করেন এবং নিজে সুলতান ইস্কান্দার শাহ নাম ধারণ করেন। ধর্মান্তরের পর তার অর্ধ-মুসলিম রাণী এবং মুসলিম যোদ্ধা ও উপদেষ্টারা তাকে এক কট্টর মুসলিম শাসক বানিয়ে তুলে। চীন সম্রাট ইউং লো'র এক কূটনীতিকের সেক্রেটারি ড্রাগোম্যান হিসেবে আগত মা হুয়ান নামক এক চীনা মুসলিম ১৪১৪ সালে সুলতান ইস্কান্দার শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সুলতানকে ইতিমধ্যেই এক 'কঠোর ধর্মবিশ্বাসীরূপে' দেখতে পান।[১৭৫]

ইবনে বতুতার তথ্য অনুযায়ী, চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিমরা সামুদ্রায় কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠার সাথে সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ছোট ছোট সহিংস জিহাদ শুরু করে দিয়েছিল। মালাক্কা সুলতানাত প্রতিষ্ঠার পর জিহাদ তীব্রতর হয় বৃহত্তর গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে। মালাক্কা সুলতানাত ইসলামের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে বড় আকারের জিহাদ অভিযানের কেন্দ্র হয়ে উঠে। গাজী কিংবা শহীদ হওয়ার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদের ইসলামি জোশে অনুপ্রাণিত এখনকার মুসলিম বাহিনী নাটকীয়ভাবে তার ভাগ্যে পরিবর্তন আনে বিপজ্জনকভাবে দুর্বল অবস্থান থেকে। প্রায় ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে আসা ইস্কান্দার শাহ (তথা পরমেশ্বর) ও তার বংশধররা দ্রুত প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের শক্তি অর্জন করে। সুলতানাতটি বিস্তৃত হতে থাকে: সর্বোচ্চ সম্প্রসারণকালে তা পরিবেষ্টিত ছিলো আজকের মালয়েশিয়া উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর এবং পূর্ব সুমাত্রা ও বোর্ণিওর বৃহত্তর অঞ্চল পর্যন্ত। পরে বোর্নিও আরেকটি স্বাধীন সুলতানাতে হিসেবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ দিন ধরে মালাক্কা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রাণ কেন্দ্ররূপে গণ্য ছিল, যার সঙ্গে যুক্ত ছিল মালয়েশিয়া, আচেহ্‌, রিয়াউ, পালেমবাং ও সুলাওয়েসি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে মালাক্কা সুলতানাত প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়ে শক্তিশালী মাজ্‌পাহিত রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে পতিত করে ও শ্যাম রাজ্যকে দুর্বল করে তুলে। ১৫২৬ সালে মুসলিম যোদ্ধারা যখন জাভা অধিকার করে, তখন মাজ্‌পাহিত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। মালাক্কা সুলতানাত তখনো পর্যন্ত টিকে থাকা থাই রাজ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত রেখে তার দক্ষিণাংশ থেকে কিছু ভূখণ্ড দখল করে নেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে মুসলিম আক্রমণকারীরা ঝড়ের বেগে থাই রাজধানী আয়ুথায়া আক্রমণ করে। কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠে যে, মুসলিম ধর্মযোদ্ধারা যেন সিয়াম অধিকার করে নিবে।

---

[১৭৪]. Gibb, p. 274

[১৭৫]. Widjojoatmodjo, p. 49

ঠিক এ বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে মালাক্কা প্রণালীর নৌপথ বরাবর কাকতালীয়ভাবে এক পর্তুগীজ বাণিজ্যবহর এসে নোঙ্গর করলে পর্তুগীজ ও মালাক্কা সুলতানের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা বিপন্ন ও অবরুদ্ধ সিয়ামের জন্য এক আশীর্বাদ হয়ে উঠে। ১৫০৯ সালে লোপেজ ডা সেকুরার নেতৃত্বে পর্তুগীজ নৌবহর মালাক্কা প্রণালীতে পৌঁছে। তৎকালীন মালাক্কার শাসক সুলতান মাহমুদ শাহ সম্প্রতি ভারতে ঘটিত মুসলিম-পর্তুগীজ দ্বন্দ্বের সূত্রে পর্তুগীজ বহরটিকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। ১৫১১ সালে ভাইসরয় আলফোন্সো ডা'আলবুকার্ক-এর নেতৃত্বে ভারতের কোচিন থেকে আরেকটি পর্তুগীজ বহর মালাক্কায় এলে পুনরায় দ্বন্দ্ব শুরু হয়। চল্লিশ দিন যুদ্ধের পর ২৪ আগস্ট পর্তুগীজ বাহিনীর হাতে মালাক্কার পতন ঘটে এবং সুলতান মাহমুদ শাহ মালাক্কা থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তী বছর ও দশকগুলোতে পর্তুগীজ ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলতে থাকে। পর্তুগীজদের দ্বারা মালাক্কা সুলতানাতের এ বিহ্বলতা ও পরিণামে অবলুপ্তি সিয়াম বা শ্যাম রাজ্যকে মুসলিম শাসকদের হাতে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে। সপ্তদশ শতকে শ্যামের শাসকরা সমুদ্র ভ্রমণকারী পর্তুগিজ ও ডাচ (হল্যান্ড) শক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন করলে তারা মুসলিম আক্রমণের হুমকি প্রতিরোধে সফলকাম হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিয়াম তার হারানো ভূখণ্ড ফিরে পেতে প্রতিআক্রমণ চালায়। তারা পতনোন্মুখ মুসলিম সুলতানাত পাট্টানি অধিকার করে শ্যাম রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে।

ফিলিপিনে ইসলামের বিস্তার: ফিলিপিনের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল মিন্দানাও ও সুলু হলো আরেকটি দৃষ্টান্ত যেখানে বণিকদের দ্বারা শান্তি পূর্ণ উপায়ে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল বলে মুসলিম ও অনেক পণ্ডিতরা দাবি করেন। মুসলিমরা প্রশ্ন তোলেন: *কোন্ মুসলিম বাহিনী তলোয়ার দ্বারা ইসলাম বিস্তারের জন্য ফিলিপিনে গিয়েছিল?* তারা দাবি করেন: ভারত ও মালয় উপদ্বীপ থেকে আগত সুফি ও মুসলিম বণিকরাই শান্তিপূর্ণ মিশনারি কার্যক্রমের মাধ্যমে সেখানে ইসলামের বিস্তার ঘটায়।

জানা যায়, ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে আরব বণিক মাখদুম করিমের মাধ্যমে দক্ষিণ ফিলিপিনের সুলু দ্বীপপুঞ্জে প্রথম ইসলাম আনীত হয়। তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। কিন্তু মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে মালাক্কা সুলতানাতের রাজনৈতিক উত্থান না হওয়া পর্যন্ত ফিলিপিনের সর্বপ্রাণবাদী বিধর্মীরা ব্যাপকহারে ইসলামে দীক্ষিত হয়নি। মালয়েশিয়ার জোহর'এ জন্মগ্রহণকারী এক আরব যোদ্ধা শরীফুল হাশেম সৈয়দ আবু বকর এক বাহিনী নিয়ে ১৪৫০ সালে বোর্ণিও থেকে পাল তুলে সুলু দ্বীপে আসেন ও সুলু সুলতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ইসলামি রাজনৈতিক শক্তিবলে সেখানকার সর্বপ্রাণবাদীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর অতিশয় সাগ্রহে শুরু হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বোর্ণিও সুলতানাতের পৃষ্ঠপোষকতায় সুলু থেকে অগ্রসরমান জিহাদ ভিসিয়াস (মধ্য ফিলিপিন)-এর প্রায় সবটুকু, লুজন (উত্তর ফিলিপিন)-এর অর্ধাংশ ও দক্ষিণের মিন্দানাও দ্বীপসমূহ মুসলিম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অবিরাম বিধর্মী ভূখণ্ডে প্রবেশ করে মুসলিম জিহাদীরা আতঙ্কিত সর্বপ্রাণবাদী জনগণের মধ্যে ইসলামের বিস্তার তীব্রতর করে। মুসলিম ধর্মযোদ্ধাদের পথ ধরে ১৫৬৫ সালের মধ্যে ইসলাম সুলু থেকে মিন্দানাও পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ম্যানিলা পৌঁছে যায়।

স্থানীয় ফিলিপিনোরা ছোট ছোট বারাঙ্গীতে (গ্রাম বা উপজাতীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক দল) সংগঠিত হয়ে সুসংগঠিত মুসলিম হানাদারদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনীয় উপনিবেশীরা ফিলিপিনের সেবু দ্বীপে পৌঁছে। সেখান থেকে তারা ধীরে ধীরে ফিলিপিনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ করলে অবশেষে ইসলামের বিস্তার থেমে যায়। স্পেনীয়রা যখন মুসলিমদের দক্ষিণ ফিলিপিনো দ্বীপগুলোর উপর তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণে ব্রতী হয়, তখন মুসলিম যোদ্ধাদের হুমকি ও নিষ্ঠুরতার শিকার সর্বপ্রাণবাদী জনগণ এ নতুন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলেনি। কিন্তু মুসলিম-অধ্যুষিত দ্বীপগুলোতে স্পেনীয়রা প্রচণ্ড ও সুদীর্ঘ প্রতিরোধের মুখে পড়ে।[১৭৬] স্থানীয় শক্তিগুলো স্পেনীয়দের সাথে মিত্রতা করে মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপগুলো কব্জা করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়।

যাহোক, স্পেনীয় দখলদাররা কিছু কিছু এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম দখলকারীদেরকে পিছনে হটে যেতে বাধ্য করে এবং ইসলামের আরো ভূখণ্ড দখল ও বিস্তার রুদ্ধ করে দেয়। পুরোপুরি ইসলামিকরণকৃত মিন্দানাও ও সুলু দ্বীপপুঞ্জ মুসলিম নিয়ন্ত্রণে থেকে যায় এবং আজও তা ইসলামিক রয়ে গেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধর্মান্তর পদ্ধতি

এটা বিতর্কাতীত যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিমরা প্রথমে বণিকরূপে এসে বন্দর নগরীগুলোতে স্থানীয় জনগণের পাশে বসতি গড়ে তোলে। স্থানীয় সহনশীল ও উদার সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে তারা বাঁধাহীনভাবে সেখানকার অবিশ্বাসী নারীদেরকে বিয়ে করে। তাদের এ মিশ্র-বিয়ের জাতকরা হয় মুসলিম। এরূপ মিশ্র-বিয়েতে এমনকি ক্ষমতাধর রাজা পরমেশ্বরও তার নিজের ধর্ম ধরে রাখতে পারেন নি, যদিও তার তন্বি উপপত্নী ছিল অর্ধমুসলিম, অর্ধইন্দোনেশীয়। দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রধানত পুরুষ মুসলিম বণিকরা এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর মূলত মিশ্র-বিয়ের মাধ্যমে সন্তানের জন্মই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল বলে মনে হয়। সে সময় কিছু চাকরবাকর বা কর্মচারী, যাদেরকে মুসলিম বণিকরা নিজস্ব ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করত, তাদের কেউ কেউ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকতে পারে, কেননা বিধর্মীদের প্রতি মুসলিমদের তীব্র ঘৃণা বা বিরূপ মনোভাবের প্রেক্ষিতে এ ধর্মান্তর দু'পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক ছিল। অধিকন্তু ইসলামে এক পুরুষের চার-চারটি স্ত্রী, তাদের সাময়িক বিবাহবন্ধনে (মুতা

১৭৬. Pipes (1983), p. 266

বিবাহ)[১৭৭] আবদ্ধ হওয়া ও অসংখ্য উপপত্নী (যৌনদাসী) রাখার ধর্মীয় অনুমোদনও মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম বসতির প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের তথাকথিত উচ্চমানের বার্তার কারণে খুব বেশি মানুষ ধর্মান্তরিত হয়নি। মুসলিমদের স্থায়ী বসবাস শুরুর প্রায় চারশ বছর পর ১২৯০-র দশকে উত্তর সুমাত্রায় মাত্র দু'টো ছোট মুসলিম নগর-রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। রাজা পরমেশ্বর ধর্মান্তরিত হয়ে মালাক্কায় একটি ইসলামিক সুলতানাত প্রতিষ্ঠার পর ইসলাম ক্ষিপ্রগতিতে বিস্তার লাভ করে মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপিন ও দক্ষিণ থাইল্যান্ড বিজয়ের মাধ্যমে। মালাক্কা সুলতানাত পর্তুগিজদের আগমনের পূর্বে মাত্র এক শতাব্দীর কিছুটা বেশি সময় মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিজিত জনগণের বিপুল অংশ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যথায় প্রতিরোধী বিধর্মীরা মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার পর দ্রুত ধর্মান্তরিত হয় কি কারণে?

রিচার্ড ইটন ও অ্যান্থনি জন্‌স সহ অনেক ইতিহাসবিদের মতে, এবার আসে প্রধানতঃ ভারত থেকে আগত সুফিদের শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তখন-পর্যন্ত-প্রতিরোধী অবিশ্বাসীদের মাঝে দ্রুত ইসলাম প্রচারের পালা। কিন্তু ইটনের বিবৃতিতেও কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই যাতে বলা যেতে পারে যে, সুফিরাই অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর করে। কিংবা ধর্মান্তরে তারা কী পন্থা ব্যবহার করেছিল তারও কোন ইঙ্গিত নেই। ইটনের মতে, সেখানে কেবলমাত্র 'অতি প্রভাবশালী জাভানি সুফি (কিয়ায়ি)'-দের সম্পর্কে 'কাল্পনিক রূপকথা' মত কিছু বিচ্ছিন্ন লেখার খোঁজ পাওয়া যায়।[১৭৮] এসব বাস্তবতাবিবর্জিত ও প্রমাণহীন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এসব বিজ্ঞ পণ্ডিতরা তরিৎ দাবি করে বসেন যে, সেথায় ধর্মান্তর ছিল শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির, যার কৃতিত্ব সুফিদের প্রাপ্য। এক অতিশয় আগ্রহপূর্ণ দাবিতে সৈয়দ নাগুইব আল-আত্তাস লিখেন: '*আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, প্রকৃতপক্ষে সুফিরাই ইসলামের বিস্তার ঘটান ও জনগণের মাঝে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। মালয়ের ক্ষেত্রে আমি প্রায় নিশ্চিত যে, ইসলাম সুফিদের দ্বারাই বিস্তৃত হয়।*' তার এ দাবি আদৌ কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল নয়, যা স্বীকার করে তিনি দ্রুত যোগ করেন: '*এই মতবাদের সমর্থনে যদিও কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।*'[১৭৯]

ভারতে এধরণের সুফি রূপকথা বা কাল্পনিক গল্প যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে, যার প্রায় সবই সম্ভবত বানানো গল্প। আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, ভারতের বিধর্মীদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মান্তরে সুফিরা কতটা অসফল ছিল; এবং কাশ্মীরে যখন তারা সফল হয়, তা কতটা ভয়ঙ্কর ছিল। উইদিয়োত মোদিয়োর মতে, ইবনে বতুতা সামুদ্রা সুলতানাতের মুসলিম শাসককে তার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ধর্ম পালন করতে দেখতে পান। সেই শাসক ছিলেন ইমাম শাফীর 'মাযহাব' বা তরিকার ভক্ত।[১৮০]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিমরা শা'ফী আইন গ্রহণ করেছিল। এ আইন শাস্ত্রে ধর্মান্তর বা মৃত্যুর যে কোন একটি বেছে নেওয়ার রায় পৌত্তলিকদের জন্য, যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ইসলাম-পূর্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী হিন্দু, বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদীরা। ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায়, সামুদ্রার মত ক্ষুদ্র নগর-রাজ্যে মুসলিমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে আশেপাশের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ও নির্মম জিহাদ শুরু করে দেয়।

পরমেশ্বরের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঠিক চার বছর পর চীনা মুসলিম মা হুয়ান তাকে 'একজন অত্যন্ত কট্টর ধর্মবিশ্বাসী' রূপে দেখতে পান। তার অর্থ: ইতিমধ্যে তিনি তার সুলতানাতে শা'ফি আইন কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করছিলেন। এ থেকে ধারণা পাওয়া যেতে পারে যে, সুলতান ইস্কান্দার ও তার পরবর্তীবংশধর শাসকরা অমুসলিম প্রজাদের উপর কিরূপ নীতি প্রয়োগ করেছিল। অনেক বেশী শক্তিশালী মালাক্কা সুলতানাত বিধর্মীদের উপর অধিকতর ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক শক্তি ও নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ না করলেও সামুদ্রার মতো ক্ষুদ্র সুলতানাতের পার্শ্ববর্তী বিধর্মীদের উপর নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত মালাক্কা সুলতানাতের জন্য অনুকরণীয় মডেল বা আদর্শ হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কীভাবে মুসলিম শাসিত মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম বিস্তার লাভ করে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে তৎকালে গুজরাটে পাশাপাশি ধর্মান্তর থেকে, যার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম সুলতানাতের ছিল ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ। গুজরাট ছিল সে সময়ে মালয় ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে আগত মুসলিম বণিক ও সুফিদের এক উল্লেখযোগ্য উৎসস্থল। তখন ভারতের, বিশেষ করে গুজরাটের, সুফিরা ধর্মান্তরে যে ভূমিকা পালন করছিলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় সুলতানাতের সুফিদের অনুসরণের জন্য সম্ভবত তা মডেল হিসেবে কাজ করেছে। বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দর-নগরীগুলোর সাথে তখন দক্ষিণ ভারতের উপকূলীর অঞ্চলের সুফিদেরও একই ধরণের কিংবা অধিককতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাস্তবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেহেতু দক্ষিণ-ভারতের মতো একই শাফী আইন অনুসরণ করে, সুতরাং সেকালের দক্ষিণ ভারতের সুফি কর্তৃক বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরের পদ্ধতি খুব সম্ভব মালয় ও ইন্দোনেশীয় সুফিদের ধর্মান্তরে মডেল হিসেবে কাজ করেছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, কীভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য ভারতের উপকূলীয় শহর মা'বার থেকে পীর মা'বারি বিজাপুরে এসেছিলেন এবং কীভাবে তিনি এ অঞ্চলকে ইসলামিকরণে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ব্রাহ্মণদেরকে পৈতৃক ভিটামাটি বা মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত করেছিলেন।

ভারতের তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম শাসক, সুফি ও উলেমাদের বিধর্মীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা সম্ভবত সর্বক্ষেত্রে অধিক মাত্রার ছিল (সম্ভবত দক্ষিণ ভারত বাদে)। কারণ এ অঞ্চলে প্রচলিত শা'ফী আইন বহুঈশ্বরবাদীদের জন্য মৃত্যু কিংবা ধর্মান্তরের রায় দেয়; অপরদিকে

---

[১৭৭]. It is said that the Pasai damsel, presented to Parameswara, was born of a *mut'ah* marriage.

[১৭৮]. Eaton (2000), p. 39

[১৭৯]. Al-Attas SN (1963) *Some Aspects of Sufism as Understood and Practice Among the Malays*, S Gordon ed., Malaysian Sociological Research Institute Ltd., Singapore, p. 21

[১৮০]. Widjojoatmodjo, p. 49

ভারতে হানাফী আইনের চর্চা তাদেরকে অধিকতর সহনশীল 'জিম্মি' প্রজার মর্যাদা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিজিত ভূখণ্ডে বিধর্মীদের প্রতি আচরণে শা'ফী আইন অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। কোরানের ৯:২ নং আয়াত – *'সমগ্র দেশে তোমরা চার মাস খুশিমতো সামনে বা পিছনে যেতে পার, কিন্তু জেনে রেখো, (মিথ্যাচার দিয়ে) তোমরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে পারবে না। যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাদেরকে লজ্জায় ঢেকে দেবে'* – এর ভিত্তিতে শা'ফী (হাম্বালিও) আইনে অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মান্তরের জন্য ঠিক চার মাস সময় দেয়; অন্যান্য মাযহাব সময় দেয় এক বছর পর্যন্ত।[১৮১] আর হানাফি মাযহাম পৌত্তলিকদেরকে সে বাধ্যকতা থেকে পুরোপুরি রেহাই দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর মুসলিমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যথায় ইসলাম বিমুখী বা প্রতিরোধী বিধর্মীদের ইসলামে ধর্মান্তর ভারতের তুলনায় অনেক কম সময়ে অথচ অনেক বেশি সম্পূর্ণরূপে সাধিত করেছিল। ১৫১১ সালে পর্তুগিজরা এসে মালাক্কা সুলতানাত বিলুপ্ত করার আগে তা টিকে ছিল মাত্র এক শতাব্দী কাল। এটা ঈঙ্গিত করে যে, এ অঞ্চলের হিন্দু-বৌদ্ধ-সর্বপ্রাণবাদী বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তর করতে অধিকতর জোরজবরদস্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

ইটন লিখেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার *'অত্যন্ত প্রভাবশালী সুফিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুলতানকে ক্ষমতায় বসতে সহযোগিতা করতে, আবার কখনো গ্রাম্য জনগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের প্রভাব খাটিয়ে সুলতানের ক্ষমতা ক্ষুণ্য করতে দেখা যায়।'*[১৮২] এসব দৃষ্টান্তই ড. ইটনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, ঐসব জনপ্রিয় বিপ্লবী বীর সুফিরা একটা অলৌকিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে উদ্যোগী হয়ে 'হিন্দু-বৌদ্ধ ও স্থানীয় জাভানীজ ধারণার' সমন্বয়ে একটা মিশ্র ইসলাম সৃষ্টি করে, যা 'হিন্দু জাভা'কে 'মুসলিম জাভা'য় রূপান্তরিত করে – এবং অবশ্যই সেটা হয় এক মানবিক ও শাক্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

ইটন উপেক্ষা করেছেন বা লক্ষ্য করেননি যে, শুধুমাত্র জাভা নয়, সুফিরা একই রকম রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন সর্বত্রই। কখনো তারা অবিশ্বাসীদেরকে নির্যাতন-নিপীড়ন করতে শাসকদের সাথে হাত মিলিয়েছেন; আবার কখনো তারা মুসলিম জনতার সাথে যুক্ত হয়ে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন, বিশেষত যেসব মুসলিম শাসক অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল ছিল, তাদের বিরুদ্ধে। বার্নার্ড লুইস লিখেছেন: মুসলিম শাসকরা *'সুফি দরবেশদের ভয়ঙ্কর রুদ্ধ শক্তিকে ভয় পেত, যা তারা খেয়াল-খুশি মত নিয়ন্ত্রণ বা ছেড়ে দিতে পারত। সেলজুক ও অটোম্যান সুলতানদের আমলে দরবেশ বিদ্রোহ হয়েছিল, যা তখনকার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্র বা কাঠামোর প্রতি প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'*[১৮৩]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুফিবাদের বিকাশ ঘটেছিল আব্বাসীয় শাসকদের পথবিচ্যুতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ারূপে। কারণ তারা অনৈসলামিক পারস্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও ইসলামের লংঘনে নৈতিক শিথিলতা প্রদর্শন করছিলেন। কাশ্মীর ও গুজরাটে সুফিরা হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য শাসকদের সাথে যোগ দেন। সুফি সাধক সাইয়িদ আলী হামদানি ইসলামের নীতি অনুযায়ী হিন্দুদের উপর নির্যাতনে কাশ্মীরের সুলতানকে প্ররোচিত করতে ব্যর্থ হলে প্রতিবাদে কাশ্মীর ত্যাগ করেন। অমুসলিমদের প্রতি সম্রাট আকবরের সহনশীল নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক শেখ আহমদ শিরহিন্দি সাধারণ মুসলিম জনগণ ও উলেমাদের সাথে হাত মেলান।

ধার্মিক মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সুফিদের যোগ দেওয়ার ঘটনা খুবই অপ্রতুল। এরকম একটা ঘটনা হলো, সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বুদ্দু শাহ নামক এক ক্ষুদে সুফি সাধক তার ৭০০ ভক্ত নিয়ে গুরু গোবিন্দ সিং-এর সাথে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার এ মিত্রতায় গোবিন্দ সিং-এর বাহিনীর হিন্দু ও শিখ সেনাদের মনে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। মোটকথা, সুফিরা সাধারণত শাসকদের সাথে আঁতাত গড়ে তোলেন বিশেষ করে অমুসলিম প্রজাদের উপর ইসলামের নিষ্ঠুর ও নিষ্পেষণমূলক আইন কার্যকর করার জন্য; তারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের সাথে হাত মিলিয়েছেন, যখন শাসকরা ইসলামের আইন প্রয়োগে শিথিলতা, বিশেষত বিধর্মীদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকৃতি জানান। শাসকদের বিরুদ্ধে কিংবা পক্ষে জাভার সুফিদের রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হওয়ার কারণ অন্যান্য অঞ্চলে ঘটিত কারণ থেকে ভিন্ন হওয়ার কথা নয়। আর তারা কখনো নির্যাতিত অবিশ্বাসীদের পক্ষে যোগ দিয়ে থাকলেও, এটা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ নেই যে, সে মিত্রতা বিধর্মীদেরকে ব্যাপক হারে ইসলামে আকৃষ্ট করে।

ইসলামের ধর্মযোদ্ধারা বিধর্মীদেরকে ইসলামে অনুগত বা আনয়নের জন্য পরিচালিত যুদ্ধাভিযানে যে নির্মমতা প্রদর্শন করেছে, তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকদের দ্বারা সংঘটিত জিহাদ অভিযান বা জিহাদী আক্রমণেও আতঙ্ক ও নিষ্ঠুরতা কোনো অংশে কম ছিল না। প্রফেসর অ্যান্থনি রীড দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় *'ইসলামকে অনেক বেশি রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতাবাদী'* রূপে দেখেন। অথচ তিনিই উল্লেখ করেন: *'১৬১৮-২৪ সালের মধ্যে মুসলিম শাসকদের দ্বারা আচেহ অভিযানের ফলে মালয় তার অনেক জনসংখ্যা হারায়।'*[১৮৪] একইভাবে মাতারাম-এর সুলতান অগুঙ, যিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক মহান মুসলিম শাসক হিসেবে খ্যাত, তার ৮০,০০০ সেনা সুরাবায়া ও তার নিকটবর্তী শহরসমূহ পাঁচ বছর ধরে (১৬২০-২৫) অবরোধ করে রাখে। সে অবরোধে তার বাহিনী সমস্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে দেয়, এমনকি পানিতে বিষ প্রয়োগ ও নদীতে বাঁধ দিয়ে শহরমুখী পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। এ অভিযানের ফলশ্রুতিতে

---

১৮১. Peters R (1979) *Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History*, Mouton Publishers, The Hague, p. 31

১৮২. Eaton (2000), p. 28

১৮৩. Lewis B (2000) *The Middle East*, Phoenix, London, p. 241

১৮৪. Reid A (1988) *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, Yale University Press, New Haven, Vol. I, p. 35,18

সেখানকার ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ বাসিন্দার মাত্র ৫০০ জনের মত অবশিষ্ট থাকে। বাকি সবাই হয় মারা যায় অথবা চরম কষ্ট ও দুর্ভিক্ষ থেকে রেহাই পেতে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।[১৮৫]

তদুপরি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে জোরপূর্বক গণহারে ধর্মান্তরিত করা। ষোড়শ শতাব্দীতে সুলাওয়েসির মাকাসারবাসীরা ইসলাম প্রতিরোধীদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল। বুলো-বুলো (সিন্দজাই অঞ্চল)-র স্থানীয় উপাখ্যানে বলা হয়েছে, মাকাসার-এর মুসলিম শাসক ইসলাম গ্রহণের জন্য অবাধ্য মাকাসারবাসীদেরকে আমন্ত্রণ জানান ও তা অস্বীকার করলে যুদ্ধের হুমকি দেন। এক বিশিষ্ট মাকাসার নেতা '*অবজ্ঞা বা ঐদ্ধত্যের সাথে ঘোষণা করেন যে, বুলো-বুলোর জঙ্গলে খাবার জন্য যতদিন শুকর পাওয়া যাবে, ততদিন নদীতে যদি রক্তের বন্যাও বয়ে যায়, তবুও তিনি ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করবেন না।*' উপাখ্যানে আরো বলা হয়েছে, '*অলৌকিকভাবে সে রাতেই সমস্ত শুকর অদৃশ্য হয়ে যায়; সুতরাং সে নেতা ও তার সমস্ত লোকজন ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়।*'[১৮৬] এ ঘটনা একদিকে এ অঞ্চলের লোকদের মাঝে তথাকথিত ইসলামের উৎকৃষ্ট বার্তার প্রতি চরম বিদ্বেষ ও প্রতিরোধ প্রতীয়মান করে; অন্যদিকে অলৌকিকভাবে সত্যি সত্যি শুকরগুলো গায়েব হয়ে গেল, এটা কেউ বিশ্বাস করলে, সে হবে চরম ও হাস্যকরভাবে বিশ্বাসপ্রবণ। কিন্তু বাস্তবে কী মাকাসারবাসীদেরকে গণহারে ইসলাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েছিল: নির্মম সহিংসতার হুমকি কিংবা সত্যি সত্যি যুদ্ধ?

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বানজারমাসিন (ইন্দোনেশিয়া)-এর উপাখ্যান 'হিকায়াত বানজার' মোতাবেক '*বানজারমাসিনের ইসলামিকরণ কার্যকরভাব নির্দিষ্ট হয়ে যায় যখন সিংহাসনের দুই দাবিদার গৃহযুদ্ধ পরিহারের জন্য দু'জনের মাঝে একক লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।*'[১৮৭] এটা পুনরায় প্রমাণ করে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকরা বিজিত জনগণকে গণহারে ধর্মান্তরিত করার সুস্পষ্ট লক্ষ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। যখন তারা জয় লাভ করতেন, সমস্ত জনগণকে বাধ্যগতভাবে ধর্মান্তরিত হতে হত, স্বেচ্ছায় নয়। এসব উদাহরণের ভিত্তিতে এম. সি. রিকলেফ্‌স বলেন: '*জাভায় অস্ত্রের মুখে ধর্মান্তরকরণ ঘটতে পারে যখন এক মুসলিম শাসক অমুসলিম শাসককে পরাজিত করে। যার ফলশ্রুতিতে পরাজিত বীর ও তার জনগণকে সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করতে হয়।*'[১৮৮]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কা ও অন্যান্য সুলতানাত তাদের ভূখণ্ড বিস্তৃতির জন্য বহু জিহাদী অভিযানে অবতীর্ণ হয়। নিঃসন্দেহে এসব যুদ্ধে তারা অগণিত বন্দিকে ক্রীতদাস হিসেবে কব্জা করে, যারা বরাবরই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। মুসলিমরা ক্ষমতা লাভের পর এ অঞ্চলে ক্রীতদাসকরণ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। পর্তুগিজরা যখন ইসলাম-শাসিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমন করে, তখন মজুরির ভিত্তিতে কাজের লোক পাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ সে সময় সমস্ত লোক ছিল কোন না কোন প্রভুর ক্রীতদাস। পারস্যের ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম ১৬৮৮ সালে লিখেন: '*ক্রীতদাস ভাড়া নেয়া তাদের প্রথা। ক্রীতদাসকে তারা কিছু টাকা দেয়, যা সে তার মালিকের হাতে তুলে দেয়। তারপর তারা সে ক্রীতদাসকে ঐ দিনের জন্য তাদের ইচ্ছামত কাজে লাগায়।*' একইভাবে পর্তুগিজ লেখক ইয়োয়াও দা বারোস ১৫৬৩ সালে লিখেন: '*যত গরিবই হোক না কেন, তুমি এমন কোনো স্থানীয় মালয়ীকে পাবে না, যে তার নিজের কিংবা অপর কারো জিনিস পিঠে তুলে নেবে, তার জন্য তাকে যত মজুরিই দেওয়া হোক না কেন। তাদের সমস্ত কাজ করে ক্রীতদাসরা।*'[১৮৯] চীনা পরিব্রাজক হুয়াং চুং ১৫৩৭ সালে ভ্রমণকালে লিখেন: '*(মালাক্কার জনগণ) বলে যে জমি থাকার চেয়ে ক্রীতদাস থাকা ভাল, কারণ প্রধানত ক্রীতদাসরাই মালিকের রক্ষক।*'[১৯০] রীড-এর মতে: '*(দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার) দাস-মালিক শ্রেণীর বণিকদের অনেক সদস্যেরই শক্ত শেকড় ছিল ইসলামি বিশ্বে, যেসব দেশে সম্পদরূপে দাসদের ব্যাপারে পরিষ্কার কতকগুলো আইন ছিল।*'[১৯১] এতে বুঝা যায় যে, মুসলিম বা আরব দেশ থেকে আগত মুসলিম বণিক ও তাদের বংশধররা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্রীতদাস ব্যবসায় ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয় ও দাসপ্রথার বিস্তার ঘটায়।

ইব্‌নে বতুতার সামুদ্রা সুলতানাত সফরকালে সুলতান তাকে দুই দাস-বালিকা ও দু'জন পুরুষ চাকর উপহার দেন।[১৯২] বতুতা মুল্‌জাওয়ার বিধর্মী শাসক, যিনি বতুতাকে তিন দিন আপ্যায়ন করেছিলেন, তার মালিকানাধীন ক্রীতদাসের কথাও উল্লেখ করেন। বতুতা বলেন, ওই শাসকের প্রতি ভালবাসার প্রতীক হিসেবে তার এক ক্রীতদাস নিজ হাতে আত্মাহুতি দেয়।[১৯৩] তার মানে, ইসলাম-পূর্ব আমলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। রীড উল্লেখ করেছেন, থাই রাজ্যের নাগরিকদেরকে বছরের অর্ধেক সময় রাজার জন্য কাজ করতে হতো।[১৯৪] এটাও এক ধরনের দাস প্রথা বা অর্ধ-দাসপ্রথা। ইসলাম-পূর্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সম্ভবত শাসক ও উচ্চ কর্মচারীরাই কেবল দাস-মালিক হতে পারত, সাধারণ বণিকরা নয়। সাধারণ বণিকরা ব্যাপক হারে দাস-মালিক হতে পেরেছে মুসলিম শাসনের অধীনে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলিমদের মালিকানাধীন ক্রীতদাসদেরকে সাধারণত ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে হতো, যে বাধ্যবাধকতা পূর্বে ছিল না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অমুসলিম ভূখণ্ডে হানা বা আক্রমণ একটা বিরামহীন দৃশ্যে হয়ে দাঁড়ায়। রিকলেফ্‌স বলেন: '*এটা ছিল প্রায় অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরপুর জাভার ইতিহাসের একটা সময়।*'[১৯৫] জনসংখ্যার একটা বড় অংশ যাদেরকে

---

১৮৫. Ibid, p. 17
১৮৬. Ibid, p. 35
১৮৭. Ibid, p. 124
১৮৮. Ricklefs MC (1979) *Six Centuries of Islamization in Java*, in N. Levtzion ed., p. 106-07
১৮৯. Reid (1988), p. 131
১৯০. Ibid, p. 129
১৯১. Ibid, p. 134
১৯২. Gibb, p. 275
১৯৩. Ibid, p. 277-78
১৯৪. Reid (1988), p. 132
১৯৫. Ricklefs in N. Levtzion ed., p. 106

আদিম বা বর্বর বলা হয়ে থাকে, তারা পাহাড়ে বাস করে। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিমরা ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ঐসব সর্বেশ্বরবাদী পাহাড়ি মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে মালয়, সুমাত্রা ও বোর্ণিওর মুসলিম জনগণের সাথে একীভূত করার ফলে তারা প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; তাদেরকে ক্রীতদাস করা হয়েছিল আক্রমণ, বশ্যতাকর পরিশোধ ও বিশেষত শিশুদেরকে ক্রয়ের মাধ্যমে।[১৯৬] রীড আরো উল্লেখ করেন, '*কিছু কিছু ক্ষুদ্র সুলতানাত, যেমন সুলু, বুটোন ও টিডোর প্রভৃতি এক লাভজনক ব্যবসা শুরু করে পূর্ব-ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিনে ক্রীতদাসের জন্য হানাকারী আক্রমণ ও তাতে ধৃত মনুষ্য শিকারকে ধনী শহরগুলোতে অথবা সপ্তদশ শতকের দক্ষিণ বোর্ণিওর বর্ধমান মরিচের জমিদারি-গুলোতে বিক্রির মাধ্যমে।*'[১৯৭]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিমদের যুদ্ধগুলোতে কখনো কখনো ক্রীতদাসকরণ প্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ: গোটা জনগোষ্ঠীকেই দাস বানিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ, টমাস আইভি ১৬৩৪ সালে জানান: এক ইংরেজ ব্যবসায়ী দল মরিচ ক্রয়ের জন্য একদা সমৃদ্ধশীল সুমাত্রা দ্বীপের শহর ইন্দেরাগিরির খুঁজে দুই দিন ধরে ঘোরাঘুরি করে ব্যর্থ হয়। শহরটির কোনো অস্তিত্ব বা চিহ্নই পাওয়া যায় না। পরে তারা জানতে পায় যে, ছয় বছর আগে আচেহ্‌র মুসলিমদের এক আক্রমণে পরাজিত হওয়ার ফলে শহরের সমস্ত বাসিন্দাকে তিন দিনের উজান পথের একটা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৯৮] পৌত্তলিক শ্রেণীর হিন্দু, বৌদ্ধ ও সর্বপ্রাণবাদী ধর্মের এসব দাসকৃত জনগণকে তাদের শাফী তরিকার মুসলিম কব্জাকারীরা স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব ধর্ম ধরে রাখতে দেয়নি।

যদিও স্পেনীয়রা ফিলিপিন দখল করে ও দক্ষিণের মুসলিম নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের উপর চাপ অব্যাহত রাখে, তথাপি মোরো মুসলিমরা দাস ধরার জন্য স্পেন-অধিকৃত ভূখণ্ডগুলোতে লাগাতার হানাকারী আক্রমণের মাধ্যমে জিহাদ চাঙ্গা রাখে। ১৬৩৭ সালে ম্যানিলার আর্চবিশপ লিখেন: তারা গত ৩০ বছর ধরে প্রতিবছর গড়ে ১০ হাজার ক্যাথলিক ফিলিপিনোকে দাস বানিয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১৬৬৫ সাল থেকে শুরু করে ফিলিপিনে স্পেনীয়দের শাসনের প্রথম দুই শতাব্দীতে মোরো জিহাদীরা প্রায় দুই মিলিয়ন (কুড়ি লক্ষ) অমুসলিমকে দাসত্বের শৃঙ্খল পড়ায়।[১৯৯] অতঃপর স্পেনীয় ও পর্তুগিজ নৌ-পাহারা উত্তরোত্তর কার্যকর হয়ে উঠে মোরো জিহাদী আক্রমণ রুখতে। তথাপি এক রক্ষণশীল হিসাব মতে, ১৭৭০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে দক্ষিণ ফিলিপিনো মুসলিমরা দাসকরণের মাধ্যমে ২০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ বিধর্মীকে সুলু সুলতানাতে আনে।[২০০] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয় দ্বীপপুঞ্জে দাসকরণ বিদ্যমান ছিল ব্যাপকহারে: ১৮৭৯ সালে পেরাক সুলতানাতে মোট জনসংখ্যার ছয় শতাংশ ছিল দাস; ১৮৬০-এর দশকে পশ্চিম সুমাত্রার পূর্বাঞ্চলসমূহে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ দাস ছিল; ১৮৮০-র দশকে উত্তর সুলাওয়েশীর মুসলিম শাসিত অঞ্চলে ৩০ শতাংশ ও উত্তর বোর্ণিওতে দুই-তৃতীয়াংশ কিংবা তারও বেশি লোক ছিল দাস।[২০১] এখানে এটা বিবেচ্য যে, ১৮১৫ সালে ইউরোপ দাস প্রথা নিষিদ্ধ করে ও মুসলিম বিশ্বকে সেপথ অনুসরণের জন্য চাপ দিতে থাকে এবং যখন সম্ভব বাহুবলের মাধ্যমে দাস-বাণিজ্য রুখতে হস্তক্ষেপ করে।

এরূপ ব্যাপকহারে দাসকরণের দৃষ্টান্ত পাঠককে একটা পরিষ্কার ধারণা দিবে – দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কীভাবে ধর্মান্তর ঘটেছিল সে সম্পর্কে। জোরপূর্বক পরাজিত জনগণকে ধর্মান্তরিত করার সুস্পষ্ট লক্ষ্যে মুসলিম শাসকগণ যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। অধিকন্তু মুসলিমদের বিরামহীন হানাকারী আক্রমণ, ইসলামি শাসনাধীনে বিধর্মী প্রজাদের প্রতি ভয়াবহ সামাজিক অমর্যাদা ও ভোগান্তি, এবং খারাজ, জিজিয়া ও অন্যান্য দুর্বহ করের বোঝা নিঃসন্দেহে তাদের উপর ইসলাম গ্রহণের বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকরা বিধর্মী জনগণের মাঝে কতটা সন্ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল তা অনুমান করা যায় ডাচ জেনারেল কোহেনের সাক্ষ্য থেকে (১৬১৫)। লোকেরা তাকে জানায়: '*বান্‌তেনের পান্‌জোরানরা কোনো স্পেনীয়, হল্যাণ্ডার বা ইংরেজকে ভয় পায় না, কিন্তু ভয় পায় কেবলমাত্র মাতারামকে (এর মুসলিম শাসককে)।*' তারা বলে: '*মাতারামের কাছ থেকে কেউ পালাতে পারে না। কিন্তু অন্যদের হাত থেকে বাঁচতে গোটা পাহাড়টাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, কেননা তারা তাদের জাহাজ নিয়ে আমাদেরকে পিছু ধাওয়া করতে পারে না।*'[২০২] এরূপ বেপরোয়া বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে মুসলিম ধর্মপ্রচারক সুফিরা ও উলেমারা সেসব নির্যাতিত, নিগৃহীত, অসম্মানিত, নিঃস্ব ও আতঙ্কিত বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরে কিছুটা অবদান রেখে থাকতে পারেন। কিন্তু সেসব ধর্মান্তরের প্রভাব ছিল সম্ভবত খুবই গৌণ, কেননা '*চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় কোন রকম মুসলিম মিশনারি কর্মকাণ্ড দেখা যায় নি।*'[২০৩] ইটনের মত ইতিহাসবিদদের উচিত অস্পষ্ট ও অবাস্তব ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীর ভিত্তিতে ধর্মান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে এ সত্যটি অনুধাবন করা। তার অর্থ দাঁড়ায় যে, সেখানে সুসংগঠিত কোনো মিশনারি কার্যক্রম ছিল প্রায় অনুপস্থিত (ভারতের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা), হোক তা সুফিদের দ্বারা কিংবা উলেমাদের; সুতরাং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ধর্মান্তরের ওসব ঘটনা ছিল নেহাৎই নগণ্য। অবশ্যই ধর্মান্তর সাধিত হয়েছিল প্রধানত রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচেষ্টায়: তলোয়ারের ডগা, ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণ ও অন্যান্য জবরদস্তিমূলক বাধ্যকতার মাধ্যমে, যেমনটা ঘটেছিল ভারতে।

---

১৯৬. Reid (1988), p. 133
১৯৭. Ibid
১৯৮. Ibid, p. 122-23
১৯৯. Reid A (1983) *Introduction: Slavery and Bondage in Southeast Asian History, in Slavery Bondage and Dependency in Southeast Asia*, Anthony Reid ed., University of Queensland Press, St. Lucia, p. 32
২০০. Warren JF (1981) *The Sulu Jone, 1968-1898: The Dynamics of the External Slave Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State*, Singapore University Press, Singapore, p. 208.
২০১. Clarence-Smith WG (2006) *Islam and the Abolition of Slavery*, Oxford University Press, New York, p. 15-16
২০২. Reid (1988), p. 122
২০৩. Van Nieuwenhuijze CAO (1958) *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia*, W. van Hoeve Ltd., The Hague, p. 35

মুসলিমরা যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তখন স্পষ্টতঃই তারা মিশ্র বিয়ে বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে স্বাধীনভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পারত। মুসলিমরা কখনো তাদের সহধর্মীদেরকে ইসলাম ত্যাগের অনুমতি দেয় না, অথচ এখানে ইসলাম গ্রহণকারী অবিশ্বাসী কিংবা তাদের ইসলামে প্ররোচণাকারী মুসলিমরা স্বভাবত সহনশীল স্থানীয় লোকদের হাতে কোনো রকম নির্যাতনের মুখোমুখি হয় নি। ইসলামের বার্তায় বড় কোন আবেদন থাকলে এরূপ একটি সহায়ক পরিবেশে মুসলিম বিজয়ের পূর্বের সুফি বা বণিকদের উদ্বুদ্ধকরণমূলক ইসলাম প্রচার অন্তত সেরূপ সফলতা পেত, যেমনটি পায় শক্তিবলে অঞ্চলটির মুসলিম কর্তৃক বিজয়ের পর। প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের যুদ্ধ মারফত অঞ্চলটি বিজয়ের পূর্বে প্রচারের মাধ্যমে ধর্মান্তর যেহেতু খুবই সামান্য বা তুচ্ছ ছিল, সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণে মূলত তরবারির মহোল্লাসই ছিল প্রাথমিক অস্ত্র।

ভারতের ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টান্ত খাটে। আল-মাসুদির লেখায় সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, মুসলিম হানাদার বাহিনী পৌঁছানোর পূর্বে মুসলিম জনসংখ্যার বিস্তৃতি ঘটেছিল প্রধানত ভারতের সহনশীল সংস্কৃতির মাঝে মিশ্র বিবাহের দ্বারা সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে। উপরোল্লেখিত আল-মাসুদির উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে, মিশ্র বিবাহ ব্যতিত ধর্মান্তর খুবই অপ্রতুল ঘটনা ছিল। কিন্তু মুসলিম হানাদার বাহিনী তিন-তিনটি ধাপে ভারতে ইসলামের তরবারি আনয়নের পর – প্রথমতঃ অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় মোহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক, দ্বিতীয়তঃ একাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সুলতান মাহমুদ দ্বারা ও পরিশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে সুলতান মোহাম্মদ গোরীর দ্বারা – ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এবং তা ঘটে মূলতঃ নিষ্ঠুর মুসলিম আক্রমণের মুখে ভারতের স্থানীয় জনগণকে ব্যাপকহারে দাসকরণ ও অন্যান্য নানা জবরদস্তি মূলক বাধ্যকতায় ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে।

উপসংহার

ইতিহাসবিদ দা লেইসি ও'লিয়ারি অমুসলিমদের ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয়ে লিখেছেন: *'ইতিহাস এটা স্পষ্ট করে যে, ধর্মান্ধ মুসলিমদের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ও বিজিত জাতিসমূহকে তরবারির মুখে জোরপূর্বক ইসলামি করার কাহিনী একেবারেই কাল্পনিক ও হাস্যকর অতিকথা, যা ইতিহাসবিদরা এযাবৎ বলে এসেছে।'*[২০৪]

ইতিহাস যদি পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যাওয়া সমসাময়িক পন্ডিত ও লেখকদের বাস্তব তথ্যমূলক সাক্ষ্য সম্পর্কিত দলিল বা আলোচনা হয়ে থাকে, তাহলে ও'লিয়ারি সম্ভবত ইসলামের বিস্তার সম্পর্কিত এ ধারণাকে '*একেবারে কাল্পনিক ও হাস্যকর অতিকথা*' বলতে পারতেন না। অবশ্য তিনি সঠিক হতেন যদি কল্পকথা বা অতিকথা বাস্তবতার সমার্থ হতো। ও'লিয়ারির মতো বহু আধুনিক মুসলিম ইতিহাসবিদ ও অনেক সমমনা, বিশেষত বাম-মার্ক্সবাদ ঘেঁষা, অমুসলিম অনুসারী রয়েছেন, যারা মনে করেন যে, সত্য উদ্ঘাটন ও উলেখ ইতিহাস গবেষণার বিষয় নয়, বরং তা গোপন করে কুতর্ক বা স্তুতি লেখাই হলো প্রকৃত ইতিহাস। বিশেষত ইসলামের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এটাই প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যারা ইসলামের ইতিহাসের অবিকৃত প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটন করতে চান – দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে – তাদের উচিত আল-কাফি (চাচনামা), আল বিলাদুরী, আল-বেরুনি, ইব্‌নে আসির, আল-উত্‌বি, হাসান নিজামী, আমীর খসরু, জিয়াউদ্দিন বারানি, সুলতান ফিরোজ তুঘলক, সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীর, বাদায়ুনি, আবুল ফজল, মোহাম্মদ ফেরিস্তা এবং আরো অনেক মধ্যযুগীয় লেখকের লেখায় ফিরে যাওয়া।

একজন স্বনামখ্যাত ফিলিস্তিনি সমাজতত্ত্ববিদ ও জাতিসংঘের শিক্ষা বিষয়ক 'রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্ক এজেন্সির উপদেষ্টা ড. আলী ঈসা ওসমান ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে বলেন: *'ইসলামের বিস্তার ঘটে সামরিক পন্থায়। মুসলিমদের মাঝে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দেওয়ার একটা ঝোঁক রয়েছে এবং আমাদের সেটা করা উচিত নয়। ইসলামের বিস্তারের জন্য তোমাকে অবশ্যই লড়াই করতে হবে – এটা কোরানেরই নির্দেশ।'*[২০৫] মধ্যযুগীয় উপাখ্যান লেখক, ইতিহাসবিদ এবং শাসকদের লেখা ও প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ অকপটভাবে ওসমানের দাবিকে আন্ত রিকভাবে সমর্থন দেয়।

পরিশেষে একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ভারতে বিধর্মীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণে যে পন্থা অনুসরণ করা হয়, তা ছিল সবচেয়ে নম্র প্রকৃতির। চলুন এ আলোচনার ইতি টানি এটা স্মরণ করে যে, ইসলামের সবচেয়ে মহান আধ্যাত্মিক শক্তিধর প্রচারক নবি মোহাম্মদও তলোয়ার ব্যতীত তাঁর নিজের জ্ঞাতিবর্গসহ অন্যান্য আরব বিধর্মীদেরকে উলে-খযোগ্য সংখ্যায় ধর্মান্তরিতকরণে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

অধ্যায় – ৫

আরব-ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ

> '*আল্লাহ তোমাদেরকে (মুসলিমদেরকে) পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী করেছেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর শাসক বানিয়েছেন।*' -- (আল্লাহ, কোরান ২৪:৫৫, ৬:১৬৫)
>
> '*লড়াই চালিয়ে যাও... যতক্ষণ না সর্বত্র ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হয়।*' -- (কোরান ৮:৩৯)
>
> '*আরবরা সর্বকালের সেরা সফল সাম্রাজ্যবাদী ছিল; কেননা তাদের দ্বারা বিজিত হওয়া (এবং তাদের মত হয়ে যাওয়া) বিশ্বাসীদের মনে সুরক্ষিত হওয়ার সামিল।*' -- (ভি. এস. নৈপুল, '*অ্যমঙ দ্য বিলিভার্স*', পৃ. ১৪২]

সাবেক উপনিবেশগুলোর নাগরিকরা বর্তমান সময়ের ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি তাদের অতীত ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে বিদ্বেষ পুষে চলেছে। এরূপ বিরূপ অনুভূতি তাদের সামগ্রিক জাতীয় চেতনা ও মননে, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় বিশিষ্ট স্থান পায়। ইউরোপীয় দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দেশগুলোতে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল কোনরূপ জাতিগত বা ধর্মীয় ভেদাভেদ না করে। কিন্তু তাদের ঔপনিবেশিক অতীত মুসলিমদের মাঝে সবচেয়ে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম দিয়ে চলেছে।

সাবেক অমুসলিম অধ্যুষিত উপনিবেশ – যেমন ভারত, সিঙ্গাপুর, হংকং, ফিলিপিন, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল ইত্যাদি – তাদের ঐতিহাসিক উপনিবেশিক অন্যায়-অবিচারের স্মৃতিকে অনেকটা পিছে ঠেলে দিয়ে অতীত সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সাথে সুষ্ঠ মেজাজে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এ বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে তাদেরকে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়া তার সাবেক উপনিবেশিক প্রভু (১৯১০-৪৫) জাপানের তৎকালীন নিষ্ঠুর আচরণ অনেকটা ভুলে গিয়ে বর্তমানে উভয় দেশ শক্তিশালী মৈত্রী গড়ে তুলেছে। অপরদিকে মুসলিম বিশ্ব উপনিবেশবাদী দেশগুলোর অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে সর্বদা পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে চলেছে। তাদের বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির কারণ খুঁজতে

---

২০৪. O'Leary DL (1923) *Islam at the Cross Roads*, E.P. Dutton and Co., New York, p. 8
২০৫. Waddy, p. 94

অভ্যন্তরীন ব্যর্থতার গভীরে নজর না দিয়ে তারা তাদের সমস্ত দুর্বলতা ও ব্যর্থতার দায়ভার অতীত ঔপনিবেশিক প্রভুদের উপর চাপাতে আরাম বোধ করে।

মুসলিমদের মাঝে উপনিবেশ-বিরোধী বিদ্বেষ এমন বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, ইসলামি মৌলবাদীদের মাঝে চলতি পশ্চিমাবিরোধী ঘৃণা ও সহিংসতা উদ্বুদ্ধকরণে তা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নাট্যকার ও অভিনেতা অ্যাডাম ব্রোইনস্কি'র মতেঃ মুসলিম উগ্রপন্থিদের দ্বারা আত্মঘাতী বোমা হামলা '*উপনিবেশবাদের ঐতিহ্য, তার প্রতি ক্ষোভ ও সম্ভবত অতীত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ*'এর সঙ্গে জড়িত।[১] জন পের মনে করেন, মহাদেশগুলোব্যাপী ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের ঐতিহ্য '*বহু-প্রজন্মিক ক্ষোভে পূর্ণ এক ব্যাপক একস্তম্ভিক ও ক্রমবর্ধনশীল অস্থির ইসলামি জনসংখ্যা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে অভ্যন্তীরণ সন্ত্রাসবাদের জন্মদানে ইন্ধন যোগায়।*'[২]

অথচ মুসলিমদের নিজস্ব অতীত শুধু সাম্রাজ্যবাদীই ছিল না, বিজিত জনগণের উপর চালানো তাদের নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ইউরোপীয়দের তুলনায় কোনক্রমেই কম মারাত্মক ছিলনা; অথচ আশ্চর্য বিষয় হলো তারা সেটা স্বীকার করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। ইসলামে ধর্মান্তরিত এক অস্ট্রেলীয় আদিবাসী রকি ডেভিস, বা শহীদ মালিক, দাবি করেন: '*ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ দ্বারা কলুষিত নয়।*' তার মতেঃ '*মুসলিম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হলো: একটি নিপীড়িতের জন্য, আরেকটি নিপীড়নকারীর জন্য। একটি উপনিবেশিকদের, অন্যটি উপনিবেশিতদের জন্য।*'[৩] তিনি অস্ট্রেলিয়ার এ. বি. সি. রেডিও'কে বলেনঃ

> 'খ্রিষ্টানত্ব হলো হানাদার সংস্কৃতি, এবং কেউ যদি বলেন, তা নয়, তাহলে তাদের সঙ্গে আমার খোলাখুলি টিভিতে বা শ্রোতাদের সামনে বিতর্ক হওয়া দরকার, এটা প্রমাণ করতে যে, খ্রিষ্টানত্ব ব্যবহৃত হয়েছিল বিশ্বের সমস্ত আদিবাসী জনগণকে আক্রমণ করতেঃ ক্যানাডার ইন্ডিয়ানরা সেটা বলবে, মাওরিরা সেটা বলবে, কুকদ্বীপ তা বলবে, আফ্রিকাবাসীরা তা বলবে, যে ইংরেজরা খ্রিষ্টানত্বকে ব্যবহার করেছিল বহিঃর্দেশ আক্রমণ, বিজয় ও ক্রীতদাস করণের জন্য। আর আমি কখনো কোন মুসলিম দেশ দ্বারা আক্রান্ত হইনি। খ্রিষ্টানরা যেখানেই গেছে, সেখানেই তারা লুণ্ঠণ, ডাকাতি, হত্যা, ক্রীতদাসকরণ ও ধর্ষণ করেছে।[৪]

মুসলিম আরবরা, যারা ছিল প্রধানত অসংস্কৃত ও আইনকানুনবিবর্জিত মরু-বেদুইন, তারা ৬৩০-এর দশকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিশ্বে এক ব্যাপক ও নির্মম বিজয় অভিযান শুরু করে। মাত্র একশ' বছরের মধ্যে তারা এশিয়ার বিশাল অংশ, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনসহ বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে প্রতিষ্ঠা করে এক বিরাট সাম্রাজ্য। এ প্রক্রিয়ায় তারা গণহত্যার মাধ্যমে নির্মূল করে অগণিত জনপদ, ধ্বংস করে সে সময়ের বড় বড় সভ্যতা ও চিরতরে মুছে ফেলে বহু জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ইসলামের এ সহিংস ও ধ্বংসাত্মক সম্প্রসারণবাদ, যা প্রতিষ্ঠিত করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী নিপীড়ন-নির্যাতনমূলক ঔপনিবেশিক শাসন, সেটাই এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

ইসলামি সাম্রাজ্যবাদঃ কোরানের নির্দেশ ও নবির আদর্শ

উপনিবেশবাদকে বর্ণনা করা যেতে পারে এমন একটা শাসন-পদ্ধতি হিসেবে, যেখানে শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের বা জনগণের উপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে মূলত শাসিতদের ধনসম্পদ – যেমন মালামাল, শ্রম ও বাজার ইত্যাদি – শোষণ করার জন্য। উপনিবেশিক রাষ্ট্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাসিতদের আর্থ-সামাজিক আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মর্যাদাহানি করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ যদিও উপনিবেশবাদের সাথে বিনিময়যোগ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেটা বিশেষত পরোক্ষ প্রভাব কিংবা সরাসরি সামরিক শক্তির দ্বারা শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রের উপর আরোপিত রাজনৈতিক শক্তি ও নিয়ন্ত্রণকে বুঝায়। সুতরাং উপনিবেশবাদের আওতা সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে কিছুটা ব্যাপকতর।

কোরানে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব পর্যায়ে একটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটা মতাদর্শ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইসলাম একটা ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধর্মবিশ্বাস – একের ভিতরে সব অন্তর্ভুক্ত একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আলাহ মুসলিমদেরকে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংস আক্রমণ ও যুদ্ধ সম্বলিত বিরামহীন জিহাদে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন গোটা বিশ্বে ইসলামের সর্বব্যাপী ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, কোরান নির্দেশ দিচ্ছেঃ

১. 'অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নিপীড়ন (অমুসলিম ধর্মবিশ্বাস) শেষ হয়, এবং ন্যায় বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বিজয়ী হয়'। (কোরান ২:১৯৩)
২. 'এবং লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নিপীড়ন শেষ হয় এবং ন্যায় বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে সর্বত্র বিজয়ী হয়।' (কোরান ৮:৩৯)

কোরান বলেঃ '*আলাহই আকাশ, পৃথিবী ও সব কিছুর মালিক*' (২৪:৪২, ৩৪:১)। আল্লাহ আসমান ও জমিনের উপর সর্বোচ্চ ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বকারী (কোরান ৫৭:৫, ৬৭:১)। তিনি মুসলিমদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেছেন বিশ্বজুড়ে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং কোরান বলেঃ 'আল্লাহ *তোমাদেরকে* পৃথিবীতে তাঁর *প্রতিনিধি* ও উত্তরাধিকারী করেছেন' (৬:১৬৫) এবং তিনি তাদেরকে পৃথিবীর শাসক বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (২৪:৫৫)। মুসলিমরা যখন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আল্লাহ এগিয়ে আসবেন ধীরে ধীরে

---

১. The Age, *Deadly disease without cure*, 19 June 2007.
২. Perr J, *Homegrown Terrorism in the U.S. and Europe*, Perrspectives, com, 13 August 2006.
৩. *A new faith for Kooris*, The Sydney Morning Herald, 4 May 2007.
৪. ABC Radio, *Aboriginal Da'wah -- 'Call to Islam'*, 22 March 2006; http://www.abc.net.au/rn/talks/8.30/relrpt/stories/s1597410.htm

তাদের ভূখণ্ড দখলে সাহায্য করতে এবং পরিশেষে গোটা পৃথিবী তাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিবেন। এরূপে আলাহ্‌র বিশ্ব-পর্যায়ের খিলাফত বাস্তবতা লাভ করবে। সুতরাং আল্লাহ বলেনঃ

১. ‘তারা (অবিশ্বাসীরা) কি দেখতে পাচ্ছেনা যে, তাদের ভূখণ্ডের পার্শ্ব কেটে কেটে আমরা ধ্বংস আনয়ন করছি?’ (কোরান ১৩:৪১)
২. ‘তারা (অবিশ্বাসীরা) দেখতে পায়না যে, আমরা তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড তার প্রান্তিক সীমানা থেকে ক্রমশঃ হ্রাস করছি।’ (কোরান ২১:৪৪)

আল্লাহ প্রয়োজন হলে অবাধ্য বিধর্মী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করবেন তাদের ভূখণ্ড কব্জা করতে, এবং অবশ্যই তা মুসলিমদের হাতে তুলে দেওয়ার নিমিত্তেঃ

> ‘এবং আমরা কতগুলো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা (আল্লাহ প্রদত্ত) তাদের জীবনধারনের উপায়ের জন্য অকৃতজ্ঞ ছিল! এবং অদূরেই তাদের বাসভূমি, যা তাদের পরে বসতিহীন রয়েছে সামান্য কিছু ছাড়া। এবং আমরাই, কেবল আমরাই, ছিলাম এর উত্তরাধিকারী। (কোরান ২৮:৫৮)

কোরান মতে, আল্লাহ এসব উচ্চাকাঙ্খামূলক প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণও করেছিলেন। আল্লাহ স্বয়ং নবিকে মদীনার ইহুদিদের জমিজমা দখলে সাহায্য করেন। আল্লাহ দাবি করেনঃ তিনি নিজে বানু কাইনুকা ও বানু নাদির গোত্রদ্বয়কে নির্বাসিত বা উৎখাত করে তাদের ভূমি ও ধনসম্পদ হস্তগত করতে মুসলিমদেরকে সাহায্য করেনঃ *‘ধর্মগ্রন্থভুক্তদের যারা (বানু নাদির ইহুদি ইত্যাদি) প্রথম হুমকিতে ঘরবাড়ি ছেড়ে নির্বাসনে যাবার কথা বিশ্বাস করেনি, আল্লাহই তাদেরকে চলে যেতে বাধ্য করেন’* তাদের মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়ে এবং আল্লাহ তাদের কাছ থেকে কব্জাকৃত সমস্ত লুণ্ঠিত মালামাল (ভূমি ও ধনসম্পদ) তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহকের হাতে ন্যাস্ত করেন (কোরান ৫৯:২-৬)। বানু কুরাইজা ইহুদি গোত্রের ক্ষেত্রে, ‘*আল্লাহ তাদেরকে দূর্গ বা সুরক্ষিত আশ্রয় থেকে বের করে আনেন এবং তাদের মনে সন্ত্রাস ঢুকিয়ে দেন*’, যাতে মুসলিমরা তাদের কিছু লোককে হত্যা ও বাকিদের বন্দি করতে পারে (কোরান ৩৩:২৬) এবং ‘*তোমাদেরকে (মুসলিমদের) তাদের জমিজমা, বাড়িঘর ও তাদের মালামালের মালিক করে দেন; এমন একটা ভূমির মালিক, যেখানে পূর্বে তোমাদের পদার্পণ বা আসা-যাওয়া হয়নি*’ (কোরান ৩৩:২৭)।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের জন্মের পর শত শত বছর ধরে মুসলিমরা সুস্পষ্টরূপে বিশ্বাস করে চলে যে, জিহাদী অভিযানে আল্লাহই তাদের বিজয় লাভ ও বিধর্মীদের ভূমি দখলে সাহায্য করেছেন। আব্বাসীয় রাজসভার বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদ (নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের) আল বিলাদুরী দাবি করেনঃ *আল্লাহই মুসলিমদের জন্য মদীনার ইহুদিদের জায়গা-জমি দখল করেছিলেন।*[৫] পেশোয়ারে (১০০১-০২) রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদের বিজয় সম্পর্কে আল-উত্‌বি উল্লেখ করেছেনঃ ‘*আলাহ সীমা ও হিসাব-নিকাশের অতীত অজস্র লুণ্ঠন দ্রব্য তাঁর বন্ধুদের উপর ন্যস্ত করেন, যার মধ্যে ছিল পাঁচ লক্ষ ক্রীতদাস নারী-পুরুষ। ঈশ্বরের সহযোগিতায় বিজয় লাভ করে ব্যাপক লুণ্ঠনের পর বিশ্বপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ সুলতান অনুসারীদের নিয়ে শিবিরে ফেরেন।*’[৬] ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, অটোম্যান আর্কাইভ (১৫৭১) লেপান্তো'র যুদ্ধে তাদের পরাজয় সম্বন্ধে উল্লেখ করেঃ ‘*স্বর্গ পরিচালিত নৌবহর অভিশপ্ত বিধর্মীদের নৌবহরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন পথে মোড় নেয়।*’[৭] এসব উদ্ধৃতির অর্থ হলো, মুসলিমরা বিশ্বাস করতো বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাদেরকে বিজয় এনে দিতেন স্বয়ং আল্লাহ। ইসলামি ঘটনাপঞ্জী বা লেখায় সর্বক্ষেত্রে এরূপ উদ্ধৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

পৃথিবীর উত্তরাধিকার, যা আল্লাহ মুসলিমদের উপর অর্পণ করেছেন, তার প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করার জন্য তারা অবশ্যই যেখানে পায় সেখানেই পৌত্তলিকদেরকে হত্যা করবে (কোরান ৯:৫) এবং সম্ভবত তাদের নারী ও সন্তানদেরকে ক্রীতদাস করবে (ইসলামে ধর্মান্তরের জন্য)। এভাবে মুসলিমরা পৌত্তলিকদের ভূখণ্ড দখল করে ইসলামি শাসন কায়েম করবে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মতো একেশ্বরবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি দখল করার জন্য মুসলিমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যতদিন না তারা মুসলিম শাসনের বশীভূত হয় (কোরান ৯:২৯)। এরূপে মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী একটা সাম্রাজ্যবাদী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করবে।

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ইসলামি রাষ্ট্রটিতে উপনিবেশিক শাসনের মত একটা অর্থনৈতিক শোষণ ও লাভের ধারণা বা মাত্রা অন্তর্ভুক্ত। ইতিমধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে যে, আল্লাহ জিহাদী যুদ্ধে পবিত্র লুণ্ঠনের মালামাল (মালে গণিমত) হিসেবে বিধর্মীদের ধনসম্পদ কব্জা করার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ ‘*(আলাহ) তোমাদেরকে (মুসলিমদের) তাদের জমিজমা, বাড়িঘর ও মালামালের মালিক করে দেন; এমন একটা ভূমির মালিক, যেখানে পূর্বে তোমাদের পদার্পণ হয়নি। ঈশ্বর সবকিছুই করতে সক্ষম*’ (কোরান ৩৩:২৭)। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য মুসলিমদেরকে শুধু নির্দেশই দেননি, তিনি নিজে সে লুণ্ঠনের একটা শেয়ার বা হিস্যাও গ্রহণ করেনঃ ‘*এবং জেনে রেখো যে, যুদ্ধে তোমরা যে মালামাল লুণ্ঠন করবে, তার এক পঞ্চমাংশ হিস্যা আল্লাহ ও তাঁর নবির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে*’ (কোরান ৮:৪১)। এছাড়াও আল্লাহ ইসলামি রাষ্ট্রের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য মুসলিমদেরকে তাদের হাতে পরাজিত ও বশীভূত জিম্মি প্রজা, যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টান, প্রভৃতির উপর নানারকম কর আরোপের নির্দেশ দেন (কোরান ৯:২৯)।

সুতরাং কোরান স্পষ্টতঃই বিশ্বব্যাপী স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যের একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটা কাঠামোগত রূপরেখা বা পরিকল্পনা নির্দেশ করে। নবি মোহাম্মদ আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রয়োগ করে আল্লাহর উচ্ছ্বসিত সহযোগিতায় ইসলামি শাসনের একটা আদর্শ ভিত্তি বা রূপরেখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আদর্শগতভাবে ছিল উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতির। নবি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় এসেছিলেন বিদেশ বা পরভূমিতে শরণার্থী হিসেবে। এবং অচিরেই তিনি মদীনায় একটি বিদেশী শাসন ও ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং

---

৫. Hitti PK (2002) *History of the Arab*, Palgrave Macmillan, London, p. 21,33.
৬. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 26
৭. Lewis B (2002) *What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response*, Phoenix, London, p. 12

সেটা বাস্তবায়ন করেছিলেন স্থানীয় অবাধ্য বা বশ্যতা-প্রত্যাখানকারী ইহুদি গোত্রগুলোকে একের পর এক নির্মূল করে, আর স্থানীয় পৌত্তলিকরা হুমকিমূলক বাধ্যকতা বা লুণ্ঠিত মালামালের লোভে প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর যুদ্ধবাজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে মিশে গিয়েছিল। মদীনায় বিদেশী ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার পর, সেটা সীমানার বাইরে দূর-দূরান্তে ইসলামের বিজয় ও সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণের জন্য বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

নবি মোহাম্মদ কর্তৃক উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো খাইবার দখল। যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতেই তিনি ৬২৮ সালের মে মাসে খাইবারের বিরুদ্ধে এক বিশাল মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ইহুদিদের পরাজিত করার পর তিনি যুদ্ধ করার মত বয়সী পুরুষদেরকে গণহারে হত্যা করেন, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করেন, এবং নারী ও সন্তানদেরকে ক্রীতদাসরূপে উঠিয়ে নিয়ে যান। বেঁচে যাওয়া ইহুদিদেরকে (প্রধানত বৃদ্ধ বয়সী) হত্যা না করে তাদেরকে জমি-জমা চাষাবাদের সুযোগ দেন। কিন্তু নবি তাদের উপর দুর্বহ কর আরোপ করেন: তাদেরকে জমিতে উৎপাদিত ফসলের ৫০ শতাংশ মদীনাভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারে প্রেরণ করতে হবে। এ ব্যবস্থাটি বলবৎ থাকবে যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা খাইবারের জমি চাষাবাদে নিজেরা সমর্থ না হয়ে উঠে। পরবর্তীতে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (মৃত্যু ৬৪৪ খ্রিঃ) নবির শেষ ইচ্ছানুযায়ী খাইবারের সমস্ত ইহুদিদেরকে বহিষ্কার করেন।

একইভাবে আল-তাবারি লিখেছেন, আল্লাহ তাঁর নবির জন্য '*হাওয়াজিন ও থাকিফ গোত্রের নারী, শিশু ও পশুপ্রাণী মালে গণিমত হিসেবে মঞ্জুর করেন..., যা তিনি সাম্প্রতিক ইসলাম গ্রহণকারী কোরাইশদের মধ্যে ভাগ করে দেন।*'[৮] মৃত্যুর পূর্বে মোহাম্মদ খ্রিষ্টান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের শক্ত ঘাঁটিগুলোর উপর ইসলামের উপনিবেশিক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরব উপদ্বীপে একটা উদীয়মান ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান। অস্ত্রশক্তির বলে বা হুমকির দ্বারা যখনই তিনি কোনো বিদেশভূমি দখল বা বশীভূত করেছেন, বিজিত জনগণ, বিশেষত পৌত্তলিকরা, মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সর্বোপরি তিনি পরাজিতদের নারী-শিশুকে ক্রীতদাস বানানো ছাড়াও তাদের সম্পদ ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। এছাড়াও তিনি তাদের উপর জিজিয়া ও খারাজ-এর মত অবমাননাকর ও দুর্বহ কর আরোপ করেন। এটা ছিল উপনিবেশিক শাসনের প্রকৃষ্ট রূপরেখা, যার মাঝে বিজিতদের উপর চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবমাননা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মোহাম্মদের খাইবার বিজয় স্পষ্টতঃই ছিল উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বিদেশী ভূখণ্ড দখলের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নবির এবং পরবর্তীতে ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসনের মধ্যেকার কাঠামোগত পার্থক্য ছিলো এ যে, অধিকাংশ দৃষ্টান্তে ইউরোপীয়রা বিজিত দেশের নারী ও শিশুদের গণহারে ক্রীতদাস বানিয়ে ইউরোপীয় রাজধানীগুলোতে প্রেরণ করেনি। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয়রা তাদের বিজিত ও উপনিবেশকৃত ভূখণ্ড থেকে কখনো তাৎক্ষণিকভাবে গোটা জনগোষ্ঠিকে উৎখাত বা উচ্ছেদ করেনি, যেরূপ মোহাম্মদ করেছিলেন মদীনার, খাইবারের বা মুস্তালিকের ইহুদিদেরকে।

নবি মোহাম্মদ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ ও উপনিবেশিক শোষণের এ আদর্শ বা মডেল তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী উত্তরাধিকারী খলিফা থেকে শুরু করে মধ্যযুগের ইসলামি কর্তৃত্বের গোটা সময় জুড়ে মুসলিম শাসকদের দ্বারা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। নবির মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যে শক্তিধর পারস্য সাম্রাজ্য ইসলামের পদানত হয় এবং সে যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য বাইজেন্টিয়ামকে বিস্তারশীল ইসলামি সাম্রাজ্যের কাছে বিশাল একটা অংশ হারাতে হয়। মধ্যযুগের শেষ দিকে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তারের অগ্রণী ভূমিকায় অবস্থানকারী অটোম্যান সুলতানদের অধীনে মুসলিম বাহিনী জিহাদের পতাকা উড়িয়ে ইউরোপকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করার প্রচেষ্টায় পর পর দুইবার 'ভিয়েনার দ্বারকোঠায়' পৌঁছে যায়।

সুতরাং জন্মলগ্নেই ইসলাম আল্লাহর স্বর্গীয় নির্দেশে নবি মোহাম্মদ কর্তৃক একটা সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের আবর্তনে মধ্যযুগে ইসলাম পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে ও সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিকতার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময়কাল ধরে তা টিকে থাকে। পরে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা ইসলামি সাম্রাজ্যবাদকে ভেঙ্গে ফেলতে শুরু করে। কিন্তু বিশ্বে কতজন লোক 'ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ' অথবা 'ইসলামি উপনিবেশবাদ'-এর নাম শুনেছে? অথচ বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম যে জিনিসটি আমরা শিখি বা শুনি, সেটা হল 'ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ'।

ইসলামি শাসন সম্পর্কে ধারণা

এ উপমহাদেশের মুসলিমরা ভারতে ইসলামের বীরত্বপূর্ণ উজ্জ্বল অতীতে গর্বিত হওয়ার শিক্ষায় বেড়ে উঠে। হিন্দুস্তানে ইসলামকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করায় চূড়ান্ত ভূমিকা রাখার কারণে তিন শ্রেষ্ঠ ইসলামি বীর মোহাম্মদ বিন কাসিম, গজনীর সুলতান মাহমুদ ও মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশেষ প্রশংসা পায়। ৭১২ সালে সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে কাসিমই প্রথমবারের মত ভারতে ইসলামের আলো নিয়ে এসেছিল। অতঃপর সুলতান মাহমুদ আসেন ১০০০ সালে, যিনি এ উপমহাদেশের অন্ধকারে নিমজ্জিত বিধর্মীদের মাঝে ইসলামের গৌরব আরো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকারের সাথে ১৭ বার ভারতে গৌরবোজ্জ্বল অভিযান চালান। মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে – ইসলামের আলো বিস্তারের জন্য তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার এক অনন্য প্রতীক বা আদর্শরূপে গণ্য। সুলতান মাহমুদের আমরণ দৃঢ়তা বা অধ্যবসায়কে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে মুসলিম শিশু ও কিশোরদেরকে জীবনে তাদের লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তা ও ধৈর্য বৃদ্ধি করতে উপদেশ দেওয়া হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) ভারতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে আরেক মহান ইসলামি বীর। তিনি সম্রাট আকবরের ভ্রষ্ট ও উদারনীতি উপড়ে ফেলে ভারতে ইসলাম রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' বা 'ঈশ্বরের ধর্ম' নামে নতুন

৮. al-Tabari, Vol. IX, p. 3

একটা মিশ্র ধর্ম সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যা ভারত থেকে ইসলামের আলো চিরতরে মুছে দিতে পারত। তাঁর প্রপৌত্র দারাশিকো ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়কে পুনরায় সতেজ করার জন্য আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হন। ধর্মান্ধ সুন্নি মুসলিম আওরঙ্গজেব তার ধর্মদ্রোহী ভাই দারাশিকোর বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন দারাশিকো। আওরঙ্গজেব দারাশিকোর বিরুদ্ধে ইসলাম ত্যাগের অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করেন। আওরঙ্গজেব দীর্ঘদিন উপেক্ষিত 'হানাফী' আইনের বিশাল সারসংক্ষেপ 'ফতোয়া-ই-আলমগীর' রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যা ভারতে পথভ্রষ্ট ইসলামকে সঠিক পথে আনয়নে সহায়ক হয়। সংক্ষেপে, আওরঙ্গজেব ভারতের ক্ষয়িষ্ণু ইসলামকে অধঃপতন বা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে তা পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। তিনি শক্তি প্রয়োগসহ অন্যান্য জবরদস্তি ও প্ররোচনা দ্বারা অমুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে ইসলামকে সমৃদ্ধ করেন। আওরঙ্গজেবের পঞ্চাশ বছরের শাসনামলে তার রাষ্ট্রীয় নীতিতে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ প্রভাব ফেলে, যার ফলে বর্তমানের উত্তর ভারতীয় মুসলিমরা তাদের ইসলামিক শিকড় খুঁজে পায় আওরঙ্গজেবের আমলে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মান্তরের মাঝে। এ তিন মহান মুসলিম বিজয়ী বীর ও শাসক অন্ধকারাচ্ছন্ন, অধঃপতিত ও পৌত্তলিক ভারতে নিয়ে আসেন ও বিস্তার ঘটান গৌরবময় সত্যধর্মের আলো। ইসলামের আবির্ভাব ভারতের মূল্যহীন 'জাহিলিয়া' (অজ্ঞতাপূর্ণ) অতীতকে উপড়ে ফেলে এক মহান সভ্যতার সূচনা করে। এ অঞ্চলের মুসলিমদের মাঝে ইসলামের আলাপ-চারিতা এরকমই।

শুধু মুসলিমদের মধ্যেই নয়, অনেক আধুনিক অমুসলিম ঐতিহাসিকের মাঝেও ভারতের মুসলিম শাসন সম্বন্ধে এটাই শক্তিশালী বা প্রধান ধারণা। পাকিস্তানের ইতিহাস পুস্তকে শেখানো হয়: *'মোহাম্মদের আগে ছিল অন্ধকার: ক্রীতদাস প্রথা, শোষণ। মোহাম্মদের পরে আলো: ক্রীতদাস প্রথা ও শোষণ উধাও।'*[৯] এ ধরনের ইতিহাস লেখকদের ধারণাগুলো শশী শর্মা সংক্ষেপিত করেছেন এভাবে:

> ভারতের মুসলিম-পূর্ব অতীতের সবটুকুই ছিল অধঃপতন, কুসংস্কার, অসমতা ও নিপীড়নে ভরপুর। তার সীমানার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ও অর্থপূর্ণ কিছু ছিল না। ইসলামই এনেছে তাদের সভ্যতার ইতিবাচক সবকিছু, যা নিয়ে ভারতীয়রা গর্ব করতে পারে: যেমন সুফি, কেবাব, গজল,[১০] ধর্মীয় অনুরাগ, মানবীয় ভ্রাতৃত্ব এবং অবশ্যই আমীর খসরু। আরবীয়রা কি অসার অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল না, ইসলামের আলো তাদেরকে সংস্কৃতির দোরগোড়ায় না আসা পর্যন্ত?[১১]

একই ইতিহাসবিদরা যখন ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে লিখতে যান, তারা এটাকে ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় হিসেবে চিত্রিত করেন, যা ছিল স্বেচ্ছাচার, নিপীড়ন ও চরম শোষণে পূর্ণ এবং কেবলমাত্র লুণ্ঠন ও অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য।

'ইসলাম শুধুই উপকারী' – ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এ ধারণাটি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত, যে বিষয়ে ইব্‌নে ওয়ারাক লিখেছেন: *'ইসলামের উপর যে কোন পরিচায়ক পুস্তক খুললে খুব সম্ভবত দেখতে পাবে যে, এটা শুরু হয়েছে এক জনগোষ্ঠির স্তুতি গেয়ে, যারা অবিশ্বাস্যরূপে সভ্য পৃথিবীর অর্ধেকটা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জয় করে নিয়েছিল; তারা এমন এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা পূর্বদিকে সিন্ধুর তীর থেকে শুরু করে পশ্চিমে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুস্তকের সে খণ্ডটি ইতিবাচক উজ্জ্বল ভাষায় এমন একটা সময়ের বর্ণনা করবে, যখন মুসলিমরা বিচিত্র জনগোষ্ঠির ও সংস্কৃতির বিপুল সংখ্যক লোককে শাসন করেছে।'*[১২] উদাহরণস্বরূপ, পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু ইসলামের বিস্তার সম্বন্ধে লিখেছেন: *'আরবরা... এক উন্মাদনাময় আনন্দে ও গতিশীল শক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে স্পেন থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত জয় করে এবং একটা উজ্জ্বল সংস্কৃতি বহন করে আনে।'*[১৩] কোনো ইতিহাসবিদ প্রাচীন বিশ্বের সাইরাস ও আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের বিপুল সাম্রাজ্য সম্পর্কে এমন আবেগাপ্লুত প্রশংসা বা স্তুতি গাইলে কখনোই ছাড় পাবেন না; আর সাম্প্রতিক অতীতের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এরূপ স্তুতি গাইলে তো কথাই নেই।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের লেখনীতে ইউরোপীয় উপনিবেশিক সাম্রাজ্য, যেমন ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের কথা, সর্বদা বর্ণিত হয় নেতিবাচক ও খর্বিত ভাষায়। সে শাসন বিদেশী প্রভুদের দ্বারা উপনিবেশিত জনগণের উপর চরম শোষণ, অবিচার ও দুর্দশা আনয়নের এক অধ্যায় হিসেবে চিত্রিত হয়। বস্তুত বহির্দেশে ইউরোপীয় শাসনকে নিশ্চিতভাবে উপনিবেশবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়, যার মাঝে এক লজ্জাজনক, মর্যাদাহানিকর ও নেতিবাচক অর্থ নিহিত। কোন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ইংরেজ উপনিবেশিক শাসনকে ইতিবাচক আলোকে উপনিবেশিতদের জন্য সুফলপ্রসু বলে বর্ণনা করলে তিনি হবেন চরম উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও ভর্ৎসনার পাত্র।

অথচ এটা দুর্বোধ্য যে বিদেশী মুসলিম হানাদাররা যাদের উপর নিষ্ঠুরভাবে ইসলামি শাসন আরোপ করেছিল, তারাসহ বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কদাচিৎ 'ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ' বলে কিছু শুনেছে। উপমহাদেশের মুসলিমরা, এমনকি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমরাও, স্বীকার বা বিশ্বাস করবে না যে, তাদের নিজ দেশসহ বিশ্বের বিপুল অংশের উপর দীর্ঘ সময়ব্যাপী ইসলামি আধিপত্যকে যথার্থই 'ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ' বলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আরব, পারস্য, তুর্কি ও উত্তর আফ্রিকার বার্বার মুসলিম হানাদার দখলকারীরা বহু দেশ বা জাতিকে জয় করে স্থায়ীভাবে ইসলামি শাসন আরোপ করেছে। মুসলিমরা কখনোই বহির্দেশে আরোপিত এসব মুসলিম শাসনকে সাম্রাজ্যবাদী বা উপনিবেশবাদী প্রকৃতির বলে বিবেচনা করেনা। আমেরিকার পি. বি. এস. টেলিভিশনের ইসলামের

---

৯. Naipaul VS (1981) *Among the Believers: An Islamic Journey*, Alfred A Knopf, New York, p. 143

১০. *Ghazals* are a kind of song

১১. Sharma, p. 111

১২. Ibn Warraq, p. 198

১৩. Nehru (1946), p. 222

ইতিহাসের উপর এক তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টারি, যা আমেরিকার স্কুলগুলোতে শিক্ষাদানের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে ইসলাম-প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যকে 'এম্পায়ার অব ফেইথ' বা 'ধর্মের সাম্রাজ্য' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, 'উপনিবেশিক সাম্রাজ্য' নয়।

এর আগের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের বহির্ভূখণ্ড বিজয় মানবিক ও দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। তারা দাবি করে, মুসলিম বিজয়ীরা কখনোই শোষণের জন্য নয়, বরং তারা এসেছিলেন তৎকালীন শাসকদের নৈরাজ্য ও নির্যাতন থেকে জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে সমন্বিত হতে ও বিজিত জাতিগুলোকে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, শিক্ষা ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত ও লালিত করতে। মুসলিম শাসকরা ভারতে সত্যিকার ধর্মটি আমদানি করে, যে ধর্মের মূলকথা 'সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার', এবং সেসব অর্থবহ জিনিস যা এদেশে কখনই ছিল না। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা-পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে দাবি করেন: '*এটা (ইসলাম) মানুষে মানুষে সমতা, ন্যায় বিচার ও সবার প্রতি ন্যায় আচরণ শিক্ষা দেয়। আমরা সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।*'[১৪] এটা সম্ভবত সত্য, কারণ দু'মুখো জিন্নাহ – 'হে বিশ্বাসীরা, পৌত্তলিকরা সত্যি সত্যিই অপবিত্র বা নোংরা' – কোরানের এ আয়াতের সাথে একমত প্রকাশ করতঃ নোংরা হিন্দুদের থেকে মুসলিমদেরকে পৃথক করতে মুসলিমদের জন্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ও সতর্কতার সাথে সে রাষ্ট্রটির নাম চয়ন করেন 'পাকিস্তান' বা 'পবিত্রদের ভূখণ্ড', অথাৎ পবিত্র মুসলিমদের জন্য ভূখণ্ড। এটা বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম '*মানুষে মানুষে সমতা, ন্যায় বিচার ও সবার প্রতি ন্যায় আচরণ শিক্ষা দেয়*' এবং জিন্নাহ তাতে বিশ্বাস করেন।

ইসলামি শাসন উপনিবেশবাদ নয় কেন?

ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিস্তার ঘটানোর জন্য আরব উপদ্বীপের প্রথম মুসলিমরা এবং পরবর্তীকালে তাদের পারস্য, তুর্কি, বার্বার ও মঙ্গল মুসলিম শিষ্যরা বিদেশী ভূখণ্ড আক্রমণ ও দখলের জন্য বহুদূর অতিক্রম করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ওসব বিজিত দেশ কয়েক শতাব্দী ধরে শাসন করে; অন্যত্র তারা এখন পর্যন্ত শাসন করে যাচ্ছে (যদিও ইউরোপীয় উপনিবেশিরা সাময়িকের জন্য তার বিরতি ঘটিয়েছিল)। তারা দখলকৃত অধিকাংশ দেশকে চিরতরে ইসলামি করে ফেলেছে। ভারত, বলকান ও পূর্ব-ইউরোপের মত দেশগুলোতে মুসলিম শাসকরা ব্যাপকহারে জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তর করতে ব্যর্থ হয়, হয়ত মুসলিমদের নিপীড়ন-নির্যাতন উপেক্ষা করে বিজিত জনগণের তাদের আদি ধর্ম ও সংস্কৃতিকে শক্তভাবে আকড়ে থাকার কারণে কিংবা মুসলিম শাসন স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় জনগণকে ব্যাপক সংখ্যায় ধর্মান্তরিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে।

ইউরোপে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদী শাসন শুরু হয় ৭১১ সালে স্পেন বিজয়ের মাধ্যমে, যা ১৪৯২ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। স্পেন থেকে তারা ইউরোপের গভীরে ঢুকে গিয়ে ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যায় এবং ৭৩২ সালে চার্লস মার্টেল কর্তৃক ট্যুর-এ পরাজিত হয়। এ পরাজয় আইবেরীয় ফ্রন্ট বা সীমান্ত থেকে ইউরোপে মুসলিম সম্প্রসারণ সীমিত করে দেয় ফ্রান্সের সীমান্তে। ১৪৯২ সালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে মুসলিমরা প্রায় আটশ বছর স্পেন শাসন করে। মুসলিমদের ট্যুরের যুদ্ধে পরাজয় ছিল একটা সাময়িক অথচ মারাত্মক আঘাত ইউরোপে ইসলামের দ্রুত অগ্রসরমান বিস্তারের উপর। ট্যুরের যুদ্ধের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তরূপে নেহরু উল্লেখ করেন: '*একজন ইতিহাসবাদ বলেছেন, ট্যুরের সমতলভূমিতে আরবরা বিশ্ব সাম্রাজ্য হারায়, যখন তা প্রায় তাদের হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে আরবরা যদি ট্যুরে জয়ী হত, তাহলে ইউরোপীয় ইতিহাসে ভীষণ পরিবর্তন ঘটত। তাদেরকে থামানোর মত আর কেউ ছিল না... খ্রিষ্টান ধর্মের পরিবর্তে ইসলাম হতো ইউরোপের ধর্ম এবং সে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হতো।*'[১৫] এডোয়ার্ড গীবন লিখেছেন, এ যুদ্ধে ফ্রান্স বিজয়ী না হলে '*সম্ভবত অক্সফোর্ডের স্কুলগুলোতে এখন কোরানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শিখানো হতো এবং এর পালপিট বা বেদিতে হয়তোবা লিঙ্গ ছেদনকৃত বা সুন্নত দেওয়া লোকদেরকে মোহাম্মদের ঐশীবাণীর পবিত্রতা ও সত্যতা প্রদর্শন করা হতো।*'[১৬]

যাহোক, ট্যুরে মুসলিমরা জয়ী হলে আল্লাহ নির্দেশিত বিশ্ব-পর্যায়ের মুসলিম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ব বিজয়ের জন্য মুসলিমদের জিহাদী জোশ ও উদ্দীপনা প্রতিরোধ করা কঠিন হতো। ইউরোপে তাদের বিজয় সংহত করার উদ্যোগে মুসলিমরা নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় শহর ও ইতালির বাইরের দ্বীপগুলোতে তাদের আক্রমণ তীব্রতর করে। ৮১৩ সালে তারা সেন্টুমসেলী, ইশ্চিয়া ও ল্যামপেডুসা দখল করে ধ্বংসসাধন করে। একই বছরে তারা সার্দিনিয়া ও কর্সিকা দ্বীপ আক্রমণ করে। ৮২৯ সালে তারা পুনরায় সেন্টুমসেলী ধ্বংস করে।

৮৪০ সালে আরবরা ইতালির গভীরে হানা দিয়ে সুবিয়াকো'র মঠ ধ্বংস করে। একই বছরে তারা বেনিভেন্তোর বাইরের উপকূলীয় শহরগুলো দখল করে নেয়, যেখান থেকে ক্যারোলিংজিয় সম্রাট দ্বিতীয় লুডোভিকো ৮৭১ সালে তাদেরকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। ৮৪৫ সালে দেশটির গভীরে ঢুকে পড়ে তারা ক্যাপো মিসেনো (নেপল্‌স) ও রোমের নিকটবর্তী পন্‌জা অধিকার করে এবং এটাকে রোমের উপর আক্রমণের ঘাঁটি বানায়। ৮৪৬ সালে তারা ব্রিন্দিসি বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইতালির প্রান্তসীমার নিকটবর্তী টারান্টো জয় করে নেয়। ৮৮০ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম বাসিল টারান্টো মুক্ত করতে সফলকাম হন।

---

১৪. Jamal K, *Founding fathers' descendants condemn emergency*, The News International, 20 November 2007

১৫. Nehru (1989) *Glimpses of World History*, Oxford University Press, New Delhi, p. 146

১৬. Pipes (1983), p. 86

৮৪৬ সালের ২৮ আগস্ট একটি মুসলিম নৌবহর টাইবার নদীর মুখে এসে পৌঁছে এবং রোম আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইতিমধ্যে সিভিটাভেকসিয়া থেকে একটি মুসলিম বাহিনী এবং পোর্টাস ও ওস্তিয়া থেকে অপর একটি মুসলিম বাহিনী স্থলপথে সে আক্রমণে যোগ দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। তারা রোমান সেনাদের দ্বারা শক্তভাবে সুরক্ষিত চৌহদ্দি দেয়ালের ভেতরে প্রবেশে ব্যর্থ হয়। আরবরা সেন্ট পিটার ও সেন্ট পলের চার্চ দুটো ভাংচুর ও লুণ্ঠন করে। স্যাক্সন, লঙ্গোবার্ড, ফ্রিজিয়ান ও ফ্রাংকরা তাদের সর্বশেষ সেনার মৃত্যু পর্যন্ত প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে সেন্ট পিটার রক্ষা করে। মুসলিমরা সুবার্ব অঞ্চলের সমস্ত চার্চ ধ্বংস করে ফেলে। পোপ চতুর্থ লিও সাময়িকভাবে রোম থেকে পালিয়ে যান ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর কাছ সাহায্যের আহ্বান জানান। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্পোলেটো'র মার্কিস গাই প্রতিআক্রমণ করে আরবদেরকে পরাজিত করেন। পরাজিত আরব বাহিনীর কিছু অংশ সিভিটাভেকসিয়ার দিকে ও বাকী অংশ ফন্ডির দিকে পালিয়ে যাবার পথে দেশটিতে ব্যাপক লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। গেইটাতে লঙ্গোবার্ড বাহিনী পুনরায় তাদের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মার্কিস গাই এক পর্যায়ে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হয়ে পড়েন, কিন্তু যথাসময়ে নেপলস্ থেকে সিজারিয়াসের বাইজেন্টাইন বাহিনী এসে তাকে উদ্ধার করে। এ আক্রমণের ফলে পোপ চতুর্থ লিও ভ্যাটিক্যান হিল রক্ষার জন্য ৮৪৮ সালে সিভিটাস লিওনিনার সংস্কারের কাজ হাতে নেয়।

৮৪৮ সালে মুসলিমরা আনকোনায় ধ্বংসকাণ্ড ঘটায়। পরবর্তী বছর এক বিশাল মুসলিম নৌবহর রোম আক্রমণের জন্য রওয়ানা দেয় এবং ওস্তিয়ার নিকট টাইবার নদীর মুখে এক ইতালিয় নৌবাহিনীর মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে আরবরা চরম পরাজয় বরণ করে। ৮৫৬ সালে তারা পুগলিয়ায় ক্যানোসা ক্যাথেড্রাল আক্রমণ ও ধ্বংসসাধন করে। ৮৬১ সালে তারা আস্কোলি আক্রমণ করে শিশুদেরকে হত্যা করার পর বাসিন্দাদেরকে ক্রীতদাসরূপে নিয়ে যায়। ৮৭২ সালে তারা সালেরনো আক্রমণ করে ছয় মাস অবরুদ্ধ করে রাখে। ৮৭৬ সালে তারা ল্যাটিয়াম ও আম্ব্রিয়া আক্রমণ করে বাসিন্দাদেরকে হত্যা করে ও ক্রীতদাস বানায় এবং রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে আশেপাশের বসতিগুলোতে লুণ্ঠন চালায়। তারা রোমান দেশটিকে একটা অস্বাস্থ্যকর বিরানভূমিতে পরিণত করে। পোপ অষ্টম জন (৮৭২-৮২) সিসেরো'তে আরবদেরকে পরাজিত করেন ও আটককৃত ১৮টি মুসলিম রণতরী থেকে ক্রীতদাসকৃত ৬০০ খ্রিষ্টানকে উদ্ধার করেন। আরবরা এ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর পর তিনি তাদেরকে বিতাড়িত করণে উদ্যোগী হন, কিন্তু ইউরোপীয় রাজাদের কাছ থেকে তেমন সাহায্য না পাওয়ায় ব্যর্থ হন ও বশ্যতা কর দিতে বাধ্য হন।

মুসলিমরা রোমান দেশে বিজয় সংহত করতে ল্যাটিয়ামের উপকূল ও অভ্যন্তরভাগে ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখে। তারা তিভোলি (সারাসিনেসকো), সাবিনা (সিসিলিয়ানো), নারনী, নেপি, ওর্তে, তিবুরতিনো অঞ্চল, সাকো ভ্যালী, টুসিয়া ও আর্জেন্টারিও পর্বত হস্তগত করার জন্য অগ্রসর হয়। ৮৮০ থেকে ৮৯০-এর দশক পর্যন্ত তাদের ধ্বংস ও লুণ্ঠন কার্য অব্যাহত থাকে। দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিমরা দক্ষিণ ইতালিতে একটা আমীরাত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, ৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে তুসকা'র মার্কিস অ্যাডালবার্টুস, স্পোলেটোর মার্কিস আলবেরিকাস, কাপুয়া ও বেনিভেন্তোর রাজপুত্র ল্যান্ডুল্‌ফ, সালের্নো রাজপুত্র গাইমার, গেইতা ও নেপলস্রের ডিউকরা এবং বাইজেন্টাইন সম্রাট কনস্টানটিন এক আরব-বিরোধী মৈত্রীবাহিনীতে যোগ দেন, যে সংঘর্ষে পোপ দশম জন ব্যক্তিগতভাবে পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। এতে আরবরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং ইতালির মূল ভূখণ্ড মুসলিম হানাদার মুক্ত হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় সিসিলি দ্বীপ, যেখানে মুসলিমরা দীর্ঘমেয়াদী আমীরাত প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ৬৫২ সালে লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞমূলক প্রথম জিহাদী হামলার শিকার হয়। এরূপ জিহাদী আক্রমণ বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে সিসিলিতে – যেমন ৬৬৯, ৭০৩, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৪০ ও ৭৫২ সালে। সিসিলিতে শতাব্দীব্যাপী (৬৫২-৭২৫) এ প্রাথমিক মুসলিম আক্রমণমূলক অনুপ্রবেশ সেখানে ইসলামের স্থায়ী পদাঙ্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত জোশে সিসিলি বিজয় শুরু হয় যখন তিউনিস থেকে একটি আগলাবিদ আরব মুসলিম বাহিনী ৮২৭ সালে মাযারা ডেল ভ্যালো'তে এসে হাজির হয়। এর ফলে এক সুদীর্ঘ যুদ্ধ শুরু হয়। ৮৩১ সালে পালের্মো'র পতন ঘটে; ৯৩৫ সালে প্যান্টেলেরিয়া এবং ৮৪৩ সালে মেসিনার পতন হয়। কা'ফু ও এন্না যথাক্রমে ৮৫৮ ও ৮৫৯ সালে বিজিত ও ভস্মীভূত হওয়ার আগে বহু বছর মুসলিম বিজয় প্রতিরোধ করেছিল। সিরাকুস দীর্ঘদিন শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলে, কিন্তু আরবরা ৮৭৮ সালে তা জয় করে সমস্ত অধিবাসীক হত্যা করে। এর সাথে সিসিলির পরাজয় সম্পূর্ণ হয়। পালের্মো *আল-মদীনা* নাম ধারণ করে নতুন ইসলামি রাজ্যের রাজধানী হয়। গ্রিক ভাষার স্থলে আরবি ভাষা প্রবর্তিত হয়। ৮২৭ সালেই মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি স্থানীয় পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১০৬১ সালে নর্ম্যান'রা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে, যার পরিণতিতে ১০৯১ সালে মুসলিমরা সিসিলি থেকে বিতাড়িত হয়।

অপর একটি সীমান্তে মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল-কেন্দ্রিক পূর্ববিশ্বের সমগ্র খ্রিষ্টজগৎ জয় করে নেয়। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের সুবিখ্যাত বিজয়ে মুসলিম ধর্মযোদ্ধারা তিনদিন ধরে অবিরাম সেখানকার নাগরিকদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায় ও অবশিষ্টদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। অটোম্যান জিহাদীরা কনস্টান্টিনোপলকে পাশ কাটিয়ে ইতিমধ্যেই ১৩৫০-এর দশকে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। কয়েক দশক ধরে লড়াই-পাল্টা লড়াই চলার পর অটোমানরা বিপুল বিজয় লাভ করে ১৩৮০-র দশকে বুলগেরিয়া ও বলকান অঞ্চল দখলের মাধ্যমে। এবং ১৪২৩ সালে তারা ভেনিস আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল হস্তগত হলে অটোম্যানদের ইউরোপ বিজয়ের পথ আরো সুগম হয়ে উঠে। তারা সমগ্র বলকান উপদ্বীপ দখল করে এবং রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রিমিয়া জয় করে নেয়। ১৫২৯ ও ১৬৮৩ সালে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র ভেনিসের উপর তারা পরপর দুইবার ব্যর্থ অভিযান চালায়। বিভিন্ন সময়ে মুসলিমরা গোটা স্পেন, পর্তুগাল, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, গ্রিস, বুলগেরিয়া ও রোমানিয়া শাসন করেছে। তারা ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশবিশেষও শাসন করেছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যে অটোমানদের ব্যাপক বিজয়ের ফলে ইউরোপ একটা হ্রাসকৃত ও কোণঠাসা খ্রিষ্টান ভূখণ্ড হয়ে পড়েছিল, যা বিপর্যস্ত ও হতাশাগ্রস্ত ভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করছিল অপ্রতিরোধ্য অটোমান বাহিনী কর্তৃক নিশ্চিত দখলকে। এ বাস্তবতাটি ধ্বনিত করে ইস্তাম্বুলে প্রেরিত পবিত্র রোমান

সাম্রাজ্যের কূটনীতিক বাস্‌বেক (১৫৫৪-৬২) বলেছিলেন, *তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর সাফাভিদ পারস্যের হুমকিই কেবলমাত্র ইউরোপকে আসন্ন অটোমান বিজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।*[১৭]

১৬৮৩ সালে ভিয়েনার দ্বারে অটোমান হানাদারদের দ্বিতীয় পরাজয় সুস্পষ্টরূপে দীর্ঘকালীন মুসলিম নিপীড়কদের উপর অবশেষে ইউরোপীয় শক্তির প্রাধান্য প্রমাণ করে। মুসলিমদের এ পরাজয়ে ইসলাম ও ইউরোপের মধ্যেকার সুদীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভাগ্যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে ও ইউরোপের পক্ষে চলে যায়। এটা শুধুমাত্র ইসলামের সম্প্রসারণের সমাপ্তির সূচনালগ্নই নয়, ইসলামের পতনের সূচনালগ্নও চিহ্নিত করে। অটোমানরা দ্রুততার সাথে পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত অংশ থেকে শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হয়। কোনো কোনো বলকান অঞ্চলে তারা বিংশ শতাব্দীর শুরুকাল পর্যন্ত তাদের শাসন অব্যাহত রেখেছিল। মুসলিমরা শুধু ইউরোপ থেকেই বিতাড়িত হয়নি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ব্রিটেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেন শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ইসলামি ভূখণ্ড দখল করে নেয়। রাশিয়া মধ্য এশীয় ও পূর্ব ইউরোপের ব্যাপক অংশ মুসলিমদের হাত থেকে কব্জা করে। এদিকে চীন, বার্মা ও থাইল্যান্ড ইতিপূর্বে মুসলিমদের দখল করা ভূমি পুনর্দখল করে নেয়।

মুসলিম বিশ্বের উপর ইউরোপের পাল্টা অভিযানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের মধ্যে অধিকাংশ মুসলিম-শাসিত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইউরোপীয়দের হাতে চলে আসে। শুধুমাত্র অগম্য বা অপ্রবেশ্য, কিংবা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন, অথবা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রদানে সহায়ক কিছু অঞ্চল, যেমন ইরানসহ আফগানিস্তান, সৌদি আরব ও অটোমান তুরস্ক, ইত্যাদি ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের এ সময়কালটাই "উপনিবেশিক যুগ" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। অবশেষে ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত উপনিবেশগুলো থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে সরে এলে, সেসব দেশ পুনরায় মুসলিমদের হাতে চলে যায়। অন্যত্র যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু ছিল, যেমন ভারতে, সেখানে তারা বৈধ ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বদেশী জনগণের কাছে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারায়। নাইজেরিয়ার মত কোনো কোনো দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে বিষয়টি এখানে বিবেচনা করতে হবে তা হল: মুসলিম হানাদাররা ওসব বিদেশী ভূখণ্ড করায়ত্ত করেছিল নিষ্ঠুরতাপূর্ণ হামলার মাধ্যমে এবং বহু শতাব্দী যাবত তারা সেখানে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে শাসন চালায়। যার ফলে কোনো কোনো ভূখণ্ডকে ইসলামিকরণ করে ফেলা হয়েছে চিরকালের জন্য। ইউরোপীয় উপনিবেশিকরাও সেসব দেশ অধিকার ও শাসন করার জন্য দূরদেশ থেকে এসেছিল, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের শাসন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া মুসলিমদের শাসনের চেয়ে কম নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ছিল। মুসলিম আক্রমণ ও দখলের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার ও শাসন বেসামরিক জনগণের জন্য অনেক কম রক্তক্ষয়ী, এবং জখম ও ধ্বংসপূর্ণ ছিল।

সুতরাং প্রশ্ন জাগে: *কেন ভারতের বিদেশী শাসন দু'টোর একটিকে ঘৃণিত উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু অপরটিকে নয়?*

মুসলিমদের মাঝে এ প্রশ্নটির জনপ্রিয় একটি উত্তর দিয়েছেন কানাডার ইয়র্ক বিশ্ব বিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ড. তাজ হাশমী। তার মতে: "*ব্রিটিশদের বিপরীতে মুসলিম শাসকরা ভারতকে তাদের নিজ দেশ বিবেচনা করেছে, কেননা ভারতের সম্পদ ও ধনরত্ন নির্গত করে নেয়ার জন্য লন্ডনের মত কোন বড় মহানগরী তাদের ছিল না।*"[১৮]

এ দাবিটিতে দুটো মৌলিক দিক রয়েছে যা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, বিদেশে ইসলামি শাসন শোষণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল না; দ্বিতীয়ত, আক্রমণকারী মুসলিম দখলদাররা বিদেশী ভূখণ্ডকে তাদের নিজস্ব বাসস্থান বা নিবাস বলে বিবেচনা করতো এবং তারা এর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত হয়েছিল। অপরদিকে ইউরোপীয় শাসন পরিচালিত হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত উদ্দেশ্যে: কেবলমাত্র বিজিত জনগণ ও তাদের ধনসম্পদ শোষণের নিমিত্তে। যাহোক, একথা আদৌ সত্য নয় যে, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা কখনো বিজিত দেশকে নিজেদের দেশ বলে বিবেচনা করেনি। আফ্রিকার কোনো কোনো দেশ, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা এবং অস্ট্রেলেশিয়ায় তারা বিপুল সংখ্যায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। যদি ব্রিটিশ শাসন ভারতে মুসলিম শাসনের মতো, ধরুন প্রায় হাজার বছর চালু থাকতো, তাহলে পরিণামে ইংরেজরাও বহু সংখ্যায় ভারতকে নিজ দেশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারত।

ইসলামি সম্প্রসারণে অর্থনৈতিক শোষণ

কে অস্বীকার করতে পারে যে, ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসন ইউরোপের রাজধানীগুলোর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রধানত ধন-সম্পদ শোষণ, সস্তা শ্রম ও বিদেশী বাজার দখলের জন্যে ছিল না? মোটের উপর লন্ডন, প্যারিস, আমস্টারডাম, মাদ্রিদ ও লিসবনের মত বৃহৎ নগরীগুলোর সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য বিদেশে তাদের তৎকালীন অর্থনৈতিক শোষণ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কাছে ঋণী ছিল। আজকের বহু বিশিষ্ট ইউরোপীয় পরিবার তাদের সচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যপূর্ণ অবস্থার জন্য তাদের দুঃসাহসিক ঝুঁকি গ্রহণকারী উপনিবেশিক পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণী, যারা চরম দারিদ্র্য থেকে ধনী হওয়ার ভাগ্য অর্জন করেছিল চা, মশলা, রাবার, চিনি বা শিপিং ব্যবসার মাধ্যমে।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী দখলকারী মুসলিম আক্রমণ ও শাসনের সত্যিকার লক্ষ্যটি কী ছিল? সেটাও কি অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল না? এবার চলুন বিশ্লেষণ করে দেখি ইসলামের প্রতিষ্ঠালগ্নে নবি মোহাম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক শোষণের আদর্শ দৃষ্টান্ত কীভাবে পরবর্তীকালীন ইসলামের সম্প্রসারণকে প্রভাবিত করেছিল।

---

[১৭]. Lewis (2002), p. 10

[১৮]. Hashmi T, News from Bangladesh Website, 2 June 2005

লুণ্ঠন ও অর্থনৈতিক শোষণের আদর্শ নমুনা বা দৃষ্টান্ত – যা নবি মোহাম্মদ তাঁর বিভিন্ন বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে যান, উদাহরণস্বরূপ খাইবার দখলের যুদ্ধে – সেটা ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে মুসলিম আক্রমণের 'মোডাস অপারেন্ডি' বা 'কর্ম পদ্ধতি' হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, নবি যা কিছু করে গিয়েছেন, তা শুধু মুসলিমদের জন্য হুবহু করণীয়তার সমর্থন পায়না, ধর্মীয়ভাবে মুসলিমদের কাজ ও কর্মে তা পুনরাবৃত্ত করাও আদর্শ নজিররূপে নিদের্শিত। বিজিত জিম্মি প্রজাদের কাছ থেকে নানারকম কর আদায় করার জন্য 'ওমরের চুক্তি'তেও একই রূপরেখা চিত্রিত হয়েছে। প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা যখন সিরিয়া, জেরুযালেম, মিশর ইত্যাদি জয় করে, তখন খ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরকে মদীনার খিলাফতের রাজকোষে 'জিজিয়া' কর দিতে হতো, এবং মুসলিম রাষ্ট্রে অন্যান্য অবমাননাকর ঘৃণ্য ব্যবস্থাসমূহ 'জিম্মি'দের উপর প্রযোজ্য ছিল। তদুপরি খলিফা ওমর বিজিত মুসলিম ভূখণ্ডের জিম্মিদের উপর 'খারাজ' বা ভূমিকর ও ব্যবসাকর ইত্যাদি আরোপ করেছিলেন।

ভারতে ৭১২ সালে মোহাম্মদ বিন কাসিম তার সফল আক্রমণে লুণ্ঠন ও হরণ করেছিলেন বিপুল ধনসম্পদ। অসংখ্য পুরুষকে হত্যা করে বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশুকে দাসরূপে বন্দি করেছিলেন। ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে, কাসিম সব সময়ই স্বর্গীয়ভাবে অনুমোদিত '*যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য (আনফাল)*'-র এক-পঞ্চমাংশ মালামাল ও ক্রীতদাসকৃত নারী-শিশুকে রাষ্ট্রের হিস্যা হিসেবে দামেস্কস্থ খলিফার কাছে প্রেরণ করতেন। প্রতিটি সফল অভিযানের পর তিনি খলিফার কাছে প্রেরণের জন্য রাষ্ট্রের প্রাপ্য এক-পঞ্চমাংশ হিস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে আলাদাভাবে রেখে দিতেন। আল কাফি 'চাচনামায়' লিখেছেন যে, এক আক্রমণ থেকে লুণ্ঠন দ্রব্যসহ উভয় লিঙ্গের ২০,০০০ বন্দিকে খলিফার নিকট প্রেরণ করা হয়।[১৯] খলিফা সে মালে গনিমতের মধ্য থেকে কিছু অতি সুন্দরী যুবতীকে তাঁর হেরেমের অংশ করতেন, অন্যান্যদের তাঁর দরবারের বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি ও উচ্চ পদের সেনাদেরকে উপহার দিতেন এবং অবশিষ্টদেরকে বিক্রি করে দিতেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমৃদ্ধ করতে।

নবি মোহাম্মদ সর্বাধিক সুন্দরী ও মূল্যবান বন্দি যুবতীকে – যেমন খাইবারের নেতা কিনানার সতের-বছর-বয়স্কা অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী সাফিয়াকে – তাঁর নিজ উপপত্নী বা যৌনদাসীরূপে কব্জা করতেন। তেমনিভাবে কাসিম বিশেষ উপঢৌকন ও সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ বিশেষ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দিনীকে, যেমন অনন্য সুন্দরী কিংবা রাজ ও অভিজাত ঘরের যুবতী কন্যা বা স্ত্রীদেরকে, খলিফার নিকট প্রেরণ করতেন। রাজা দাহিরের দুই সুন্দরী কন্যাকে বন্দি করে কাসিমের কাছে আনা হলে, কাসিম যথারীতি তাদেরকে খলিফা আল-ওয়ালিদের সমীপে প্রেরণ করেন এবং খলিফা দুবোনকে তাঁর হেরেমের অংশ করে নেন। আর কাসিম রাজা দাহিরের স্ত্রীকে নিজস্ব যৌনদাসী বানান।

সিন্ধুতে মোহাম্মদ বিন কাসিমের প্রাথমিক আক্রমণের খরচ দাঁড়ায় ৬ কোটি দিরহামে, যা খলিফার কোষাগার থেকে বহন করা হয়েছিল। সিন্ধুতে কাসিমের তিন বছরব্যাপী অভিযানকর্ম শেষে তাকে ডেকে পাঠানোর কয়েক মাস পূর্বে ইরাকের গভর্নর আল-হাজ্জাজের নিকট তার প্রেরণকৃত লুণ্ঠিত মালামালের এক পঞ্চমাংশ হিস্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ কোটি দিরহাম।[২০] হাজ্জাজ দ্রুত খলিফার কোষাগারের ঋণ শোধ করে দিয়ে কাসিমের নিকট পত্র লিখে জানান: '*ভাতিজা! আমি তোমার বাহিনীসহ অভিযানকালে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মাওয়ানের কাছে সম্মতিদান ও অঙ্গীকার করেছিলাম যে, সরকারি কোষাগার থেকে সরবরাহকৃত সমস্ত ব্যয়ভার পরিশোধ করে দিব, এবং সেটা সম্পন্নকরণ আমার উপর আরোপিত।*'[২১]

কাসিম হিন্দু প্রজাদের উপর 'জিজিয়া' ও 'খারাজ' কর আরোপ করেন কোরান ও সুন্নতের নীতির ভিত্তিতে খলিফা ওমর প্রবর্তিত আইন অনুসারে। চাচনামা লিখেছে: '*মোহাম্মদ বিন কাসিম নবির আইন অনুযায়ী সমস্ত প্রজার উপর কর আরেপ করেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা ক্রীতদাসকরণ, বশ্যতা কর (বা খারাজ) ও জিজিয়া কর প্রদান থেকে মুক্তি পায়। এবং যারা তাদের নিজস্ব ধর্ম পরিত্যাগ করেনি তাদের কাছ থেকে ওসব কর আদায় করা হয়।*'[২২] সিন্ধু মুসলিমদের হস্তগত হওয়ার ফলে হিন্দুরা যুগ-যুগ ব্যাপী বসবাসকারী তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে-মাটিতেই ক্রীতদাসরূপে মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হয়। তাদেরকে নিম্নোক্তরূপে ধার্যকৃত ভূমিকর (খারাজ) দিতে হতো: '*সাধারণভাবে ভূমিকর নির্দিষ্ট হয় উৎপাদিত গম ও বার্লির পাঁচ ভাগের দুই ভাগ, যদি সে ভূমি সরকারি নালার মাধ্যমে জল সরবরাহকৃত হতো; যদি চাকা বা অন্য কৃত্রিম উপায়ে সেচ প্রদান করা হতো, তাহলে দশ ভাগের তিন ভাগ দিতে হতো; যদি কোন রকম সেচ দেওয়া না হত, তাহলে চার ভাগের এক ভাগ কররূপে প্রদান করতে হতো।*' এ কর ধার্যকরণ ছিল খলিফা ওমরের মূল-নীতি অনুযায়ী, যা তিনি ইরাকের কর্ষিত জমির (সাওয়াদ) কর হিসাবের সময় আরোপ করেছিলেন।[২৩] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, হিন্দু আইনে উৎপাদিত ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ থেকে বার ভাগের এক ভাগ কর হিসেবে নির্ধারিত ছিল।

এসব কর থেকে আদায়কৃত রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য হিস্যারূপে নিয়মিতভাবে খলিফার কোষাগারে পাঠানো হতো। সিন্ধু প্রদেশ সম্ভবত যৌথভাবে বছরে ১১.৫ মিলিয়ন, অর্থাৎ ১ কোটি ১৫ লাখ দিরহাম (১৮৬০'এর দশকে ২ লাখ ৭০ হাজার ব্রি. পাউন্ডের সমান) ও ১৫০ পাউন্ড এলো-কাঠ (বা মুসব্বর-কাঠ) খলিফার কোষাগারে পাঠাতো। এর মধ্যে ছিল জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য আবগারি শুল্ক। ইলিয়ট ও জন্‌সন কর্তৃক মুসলিম খিলাফতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে খলিফার কোষাগারে প্রেরিত তৎকালীন সরকারি রাজস্বের যে বার্ষিক হিসাবে করা হয়েছে তা নিচে দেওয়া হলো:[২৪]

১. মাকরান: ৪০০,০০০ দিরহাম

[১৯]. Lal KS (1994) *Muslim Slave System in Medieval India*, Aditya Prakashan, New Delhi, p. 19
[২০]. Elliot & Dawson, Vol. I, p. 470-71
[২১]. Ibid, p. 206
[২২]. Ibid, p. 182
[২৩]. Ibid, p. 474
[২৪]. Ibid, p 471-472

২. সিজিস্তান: ৪৬০,০০০ দিরহাম, ৩০০ বিচিত্র রঙের ছোপ-তোলা পোশাক ও ২০,০০০ পাউন্ড মিষ্টদ্রব্য।
৩. কিরমান: ৪,২০০,০০০ দিরহাম, ৫০০ মূল্যবান পোশাক, ২০,০০০ পাউন্ড খেজুর ও ১,০০০ পাউন্ড শা-জিরা।
৪. তুখারিস্তান: ১০৬,০০০ দিরহাম।
৫. কাবুল: ১,৫০০,০০০ দিরহাম ও ১,০০০টি গরু (৭০০,০০০ দিরহাম মূল্যের সমান)।
৬. ফার্‌স: ২,৭০০,০০০ দিরহাম, ৩০,০০০ বোতল গোলাপ জল ও ২০,০০০ বোতল জাম বা বৈঁচি জাতীয় ফলের রস।
৭. খুলতান: ১,৭৩৩,০০০ দিরহাম।
৮. বুস্ত: ৯০,০০০ দিরহাম।

এ তথ্য স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে, মোহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধুতে প্রবর্তিত মুসলিম শাসন আরবে অবস্থিত খিলাফতের কেন্দ্রস্থল থেকে সুদূর ভূখণ্ডে আরোপিত বিদেশী শাসন বৈ আর কিছুই ছিল না, যা মুসলিম-অধিকৃত অন্যান্য বিদেশী ভূখণ্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটা এখন পরিষ্কার যে, হানাদার মুসলিম দখলকারীরা সিন্ধুতে এসেছিল শুধু শাসন করতেই নয়, শোষণ করতেও। তারা এসেছিল সেখানকার ধনসম্পদ শুষে নিয়ে খিলাফতের সদর দফতর দামেস্কে (পরে বাগদাদে) প্রেরণ করতে। ঠিক একই পন্থা ইউরোপীয়রা প্রয়োগ করেছিল তাদের উপনিবেশগুলোতে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতের হিন্দুদের উপর মুসলিম শাসকদের দ্বারা আরোপিত কর এতটাই অসহনীয় ছিল যে, করের দাবি পূরণ করতে তাদেরকে স্ত্রী-পুত্রকেও বিক্রি করে দিতে হয়েছে। সমসাময়িক মুসলিম ইতিহাসবিদ ও ইউরোপীয় পর্যটকদের লিখিত তথ্য অনুযায়ী সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামলে (প্রায় ১৬২০-১৭০৭ সাল) এ চিত্রটি ছিল একটা সচরাচর ঘটনা। দুর্বহ কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় কৃষক গভীর জঙ্গলে পালিয়েছিল কর আদায়কারীর নির্যাতন থেকে বাঁচতে।

সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারতে যখন দ্বিতীয় দফায় ইসলামি আক্রমণ শুরু হয় (১০০০ সাল), তখন বাগদাদের খিলাফত কর্তৃপক্ষ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বাগদাদের দুর্বল আব্বাসীয় খিলাফতকে অগ্রাহ্য করে ফাতেমীরা ৯০৯ সালে মিশরে এক স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ৭৫৬ সাল থেকেই উমাইয়ারা স্বাধীনভাবে স্পেন শাসন করে আসছিল। তখনো ভারতে নিষ্ঠুর ও নির্মম হামলাকারী সুলতান মাহমুদের উপর বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফারা যথেষ্ট প্রভাব খাটাতো। মাহমুদ যখন খোরাসানের আব্দুল মালিককে পরাজিত করেন, তখন খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ উদীয়মান এ শক্তিশালী জেনারেলের উপর খুশি হয়ে আমির বা নেতা'র স্বীকৃতি দেন এবং 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' (রাষ্ট্রের দক্ষিণ হস্ত) ও 'আমীন-উল-মিলাহ' (মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন। খলিফার এ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে সুলতান মাহমুদ ১০০০ সালের দিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ শুরু করেন। এবং খলিফার সে স্বীকৃতি ও আশীর্বাদের প্রতিদানস্বরূপ মাহমুদ নানা ধনরত্নেপূর্ণ বিপুল অংকের অর্থ ও উপহার-উপঢৌকন খলিফাকে প্রেরণ করতেন ভারত থেকে সংগৃহীত লুণ্ঠন দ্রব্য ও আনুগত্য কর থেকে। 'তারিখ-ই-আল্‌ফি' গ্রন্থটি জানায়, সুলতান মাহমুদ বাগদাদে প্রেরণের জন্য এক পঞ্চমাংশ লুণ্ঠিত মালামাল পৃথক করে রেখেছিলেন, যার মধ্যে ছিল ১৫০,০০০ হাজার ক্রীতদাস।[২৫] তার অর্থ দাঁড়ায়: সুলতান মাহমুদের রাজ্য ছিল বাগদাদ খিলাফতের পূর্ণাঙ্গ একটা প্রদেশ। তার পুত্র সুলতান মাসুদও খলিফার স্বীকৃতি ও বৃত্তি গ্রহণ করেন প্রতিবছর খলিফাকে ২০০,০০০ দিনার, ১০,০০০ হাজার পোশাক ও অন্যান্য উপঢৌকন প্রদানের অঙ্গীকার করে।[২৬]

ভারতের উপর সুলতান মাহমুদের নিষ্ঠুর আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব গজনবী শাসনের অধীনে চলে আসে। এর প্রায় ১৫০ বছর পর দুই আফগান গোরী সুলতান, মোহাম্মদ ঘোরী (মৃত্যু ১২০৬) ও তার ভাই গিয়াসউদ্দিন, উত্তর ভারতে নতুন করে আক্রমণ শুরু করেন, যার ফলশ্রুতিতে ১২০৬ সালে দিল্লিতে মুসলিম সুলতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। গজনীর দুই শাসক, সুলতান মোহাম্মদ গোরী ও পরবর্তীতে তাজুদ্দিন ইলদোজ (মৃত্যু ১২১৬), উভয়েই বাগদাদের খলিফার স্বীকৃতি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লির সুলতান ইলতুতমিস (মৃত্যু ১২৩৬) ইলদোজকে পরাজিত করে খলিফার অভিষেক গ্রহণ করেন। যদিও প্রতিটি ঘটনা বিশদভাবে লিখিত হয় নি, তবে শুধুমাত্র বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন বা অর্থ ও উপঢৌকনের প্রতিদানস্বরূপই খলিফারা তাদেরকে ওসব মূল্যবান পদবিতে ভূষিত করতেন। বাগদাদ ও পরবর্তীতে কায়রোর (মোঙ্গলরা তাদেরকে বাগদাদ থেকে বিতাড়িত করার পর) ইসলামি শক্তির কেন্দ্রীয় আসনে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন প্রদানের প্রতিদান স্বরূপ দিল্লির সুলতানদের উপর খলিফার আশীর্বাদবর্ষণ অব্যাহত ছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও (মৃত্যু ১৩৮৮) খলিফার অভিষেক গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন: *'খিলাফতের ডেপুটি বা সহকারি হিসেবে আমার কর্তৃত্বের পূর্ণ নিশ্চয়তা বা স্বীকৃতি প্রদান করে আমার নিকট একটি উপাধি-পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, এবং বিশ্বাসীদের নেতা (অর্থাৎ খলিফা) আমাকে অনুগ্রহপূর্বক 'সাইয়েদু-স সালাতিন' (নামাজীদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত) উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেন।'*[২৭]

সমকালীন ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দিন বারানী তখনকার মিশরে অবস্থিত খলিফার প্রতি মোহাম্মদ শাহ তুঘলকের (মৃত্যু ১৩৫১) বদান্যতা সম্পর্কে লিখেছেন: "খলিফার প্রতি সুলতানের বিশ্বাস এতই প্রবল যে, ডাকাতির ভয় না থাকলে হয়তোবা তিনি দিল্লির সমস্ত ভাণ্ডার মিশরে প্রেরণ করতেন।"[২৮] গিয়াস উদ্দিন নামক বিতাড়িত বাগদাদ খলিফার এক বংশধর, যার বর্তমান গুরুত্ব খুবই সামান্য, মোহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে দিল্লিতে আসেন। মিশরীয় প্রভুর প্রতি সুলতানের বদান্যতা কতটুকু ছিল, তা অনুমান করা যাবে এ সম্পর্কহীন, এমনকি গুরুত্বহীন, আগন্তুককে প্রদত্ত বৃত্তির ধরন দেখেই। '*কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*'য় সংক্ষেপে বলা হয়েছে:

---

২৫. Lal (1994), p. 19-20
২৬. Lal (1999), p. 208
২৭. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 387
২৮. Lal (1999), p. 210

তার (গিয়াস উদ্দিনের) প্রাসাদের পানির পাত্রসমূহ সোনা ও রূপার, গোসলের টবও সোনার এবং প্রাসাদে থাকার জন্য প্রথম বারের মত তাকে ৪০,০০০ তঙ্কা (স্বর্ণমুদ্রা) উপহার পাঠানো হয়। তাকে পুরুষ ও নারী চাকর এবং দাস-দাসী দেওয়া হয়। এছাড়াও তার জন্য দৈনিক ৩০০ তঙ্কা অনুমোদন করা হয়, যদিও তার খাবারের অধিকাংশই আসতো রাজকীয় রান্নাঘর থেকে। সমস্ত বাগান, জমি-জমা ও একশ'টি গ্রাম সহ সুলতান আলাউদ্দিনের সিরি শহরটি, যা ছিল রাজধানীর চারটি নগরীর মধ্যে একটি, তাকে দেওয়া হয় এর জায়গিরদার হিসেবে। তাকে দিল্লি প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। তাকে স্বর্ণের কারুকার্যময় সাজসজ্জায় সুসজ্জিত ৩০টি খচ্চর দেওয়া হয় এবং যখনই তিনি সুলতানের দরবারে যেতেন, সুলতানের নিজস্ব কার্পেটটির উপর একসাথে বসার সম্মান পেতেন।[২৯]

গিয়াস উদ্দীনের মত এক গুরুত্বহীন ও সম্পর্কহীন অতিথির উপর সুলতান যখন এরূপ অবারিত সম্পদ ও বৃত্তি বর্ষিত করেন, তখন এটা অনুমান করা কঠিন হবে না যে, কী পরিমাণ সম্পদ ও ধনরত্ন তিনি কায়রোয় খলিফার নিকট প্রেরণ করতেন। বাংলা (১৩৩৭-১৫৭৬), জৈনপুর ও মালওয়ার স্বাধীন সুলতানগণও বিপুল অঙ্কের অর্থ ও উপঢৌকনের বিনিময়ে খলিফার নিকট থেকে পৃথক পদবিতে ভূষিত হতেন। উদাহরণস্বরূপ, খলিফা আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ মালওয়ার সুলতান মাহমুদ খিলজীকে (১৪৩৬-৬৯) সম্মানের পোশাক ও স্বীকৃতি প্রেরণ করেন, যা তিনি বিপুল পরিমাণ সোনা-রূপার বিনিময়ে গ্রহণ করেন। এমনকি দিল্লি সুলতানাতের কয়েকজন বিদ্রোহীও অর্থ, স্বর্ণ ও ক্রীতদাসের বিনিময়ে খলিফা প্রদত্ত পদবি পেয়েছিলেন।[৩০]

নিঃসন্দেহে দিল্লির সুলতানাত কেন্দ্রীয় ইসলামি খিলাফতের একটি কার্যকর প্রদেশ ছিল মাত্র। এ ঘনিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় নির্মম নিষ্ঠুর জিহাদী হামলাকারী আমির তিমুর (তৈমুর লং) কর্তৃক ১৩৯৯ সালে তুঘলক রাজবংশ বিধ্বস্ত হওয়ার পর। দিলির্ন ধাতবমুদ্রা থেকে আরব খলিফাদের নাম মুছে যায়, কেননা তিমুর তার বর্বরোচিত আক্রমণের পর নিজেকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করে সিংহাসনে সাইয়িদদেরকে ক্ষমতায় স্থলাভিষিক্ত করে দিল্লি থেকে ফিরে যান। তিমুরের হুমকি ও তার স্বীকৃতির তাৎপর্য উপলব্ধি করে সাইয়িদ সুলতানরা তিমুর ও তার উত্তরাধিকারীদেরকে খলিফারূপে স্বীকৃতি দেয় এবং তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দে অধীনতা কর প্রেরণ করতেন। ফেরিস্তা লিখেছেন: প্রথম সাইয়িদ সুলতান খিজির খান *'তৈমুরের হয়ে সরকারি ক্ষমতা পরিচালনা করেন; যার নামে তিনি ধাতব মুদ্রা খোদাই করেন ও নামাজের 'খুৎবা' প্রবর্তন করেন। তৈমুরের মৃত্যুর পর তার উত্তরসুরী শাহরুখ মির্জার নামে 'খুতবা' পাঠ করা হতো, যার নিকট তিনি মাঝে মাঝে অধীনতা কর পাঠাতেন।'*[৩১] তার মানে দাঁড়ায়, এসময় দিল্লি সুলতানাতের ইসলামি প্রভূত্ব বিলুপ্ত না হয়ে চলে যায় সমরখন্দে। তৎকালীন মুসলিম শাসকদের মধ্যে, হোক সে অটোমান কিংবা পারস্য, সবচেয়ে শক্তিধর আকবর দ্য গ্রেট (১৫৫৬-১৬০৫) পরবর্তীতে বিদেশী প্রভুত্বের থেকে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। সুতরাং ৭১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত মুসলিমরা ভারতের অংশবিশেষ মূলত বৃহত্তর ইসলামি বিশ্বের একটা প্রদেশরূপেই শাসন করেছে।

ভারত থেকে রাজস্ব ও উপঢৌকন শুধু খিলাফতের সদর দপ্তর দামাস্কাস, বাগদাদ, কায়রো বা সমখরন্দেই প্রেরিত হয়নি, ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনাসহ অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলেও ভারতের মুসলিম শাসকরা অর্থ, উপঢৌকন ও বদান্য উপহার প্রেরণ করতেন। সেটা ঘটে এমনকি মুঘল আমলেও, যখন ভারতীয় শাসকরা বিদেশী মুসলিম প্রভুদের নিকট থেকে নিজেদেরকে স্বাধীন ঘোষণা করেছিন। সম্রাট বাবর (১৫২৫-৩০) তার আত্মজীবনীতে 'ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে' সমরখন্দ, খোরাশান, মক্কা ও মদীনার পবিত্র মানুষদের নিকট তার উপঢৌকন-উপহার প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এক স্থানে তিনি লিখেছেন: *'আমরা কাবুল ও ভার্সাক' এর উপত্যকা অঞ্চলের নারী, পুরুষ, ক্রীতদাস ও মুক্ত, বয়স্ক অথবা নাবালক নির্বিশেষে প্রত্যেককে একটি করে 'শাহরুখী' (ধাতবমুদ্রা) দিয়েছি।'* এমনকি ইসলাম-ত্যাগী আকবরও মক্কা ও মদীনার প্রতি বদান্যতা ও মহত্ত্ব প্রদর্শন করতেন। 'হুমায়ূন নামা'য় লেখা হয়েছে: *'যদিও তিনি নিজে হিন্দুস্থানের বাইরে যেতেন না, তবু তিনি অন্য অনেককে তাদের ধর্মের প্রাথমিক কর্তব্য হজ্জব্রত পালনে সাহায্য করেন এবং তাদের খরচ বহনের জন্য তহবিল উন্মুক্ত করে দেন। প্রতি বছর তিনি হজ্জযাত্রী দলের নেতা নির্ধারণ করে তার হাতে মক্কা ও মদীনা নগরীকে প্রদানের জন্য প্রচুর পরিমাণ উপহার ও অর্থ তুলে দিতেন। তার চাচি গুলবদন বেগম যখন হজ্জে গমন করেন, সহগামী সুলতান খাজা অন্যান্য উপহারের সঙ্গে ১২,০০০ সম্মানসূচক পোশাক সঙ্গে নিয়ে যান।'* মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭) ও শাহজাহান (১৬২৮-৫৮) পারস্য, রোম (ইস্তাম্বুল) ও আজারবাইজানে 'ঈশ্বরের তরফ থেকে' 'তাঁর বান্দা'দের জন্য ভাতা পাঠাতেন, হোক তারা হিন্দুস্তানী কিংবা অন্য মুসলিম দেশের। সম্রাট শাহজাহান মক্কায় অত্যন্ত ব্যয়বহুল উপঢৌকন পাঠাতেন।[৩২]

কীভাবে ভারতের অমুসলিম প্রজাদের মাথার-ঘাম-পায়-ফেলে উপার্জিত অর্থ ও ধনসম্পদ দামাস্কাস, বাগদাদ, কায়রো বা সমরখন্দের ইসলামি খিলাফতের কোষাগারে, ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনায় এবং গোটা ইসলামি বিশ্বের পবিত্র মানুষদের পকেটে পাঠানো হতো, এটা তার একটা দৃষ্টান্তমাত্র। অথচ একই সময়ে ভারতের বিধর্মীদেরকে নিপতিত করা হয়েছিল চরম দুর্দশায়।

এটা একটা সুষ্ঠুভাবে দলিলকৃত ইসলামি পন্থা, যা ঐতিহাসিকদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষিত যে, নবি মোহাম্মদের সময় থেকেই মুসলিমদের বিজয়ের একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিজিত জনগণের সম্পদ ও ধনরত্ন লুণ্ঠন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ক্রীতদাস সংগ্রহ, প্রধানত নারী ও শিশুদেরকে, যাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে মুসলিম মালিকদের দাসরূপে কাজ করানো হতো ('ক্রীতদাসত্ব' সংক্রান্ত সপ্তম অধ্যায় দেখুন)। তরুণী ও সুন্দরী নারী-বন্দিরা শাসকদের হারেমে এবং জেনারেল ও সাধারণ মুসলিমদের ঘরে যৌনদাসীরূপে স্থান পেতো। তাদের

---

[২৯]. Haig W (1958) *Cambridge History of India*, Cambridge University Press, Delhi, Vol. III, p. 159

[৩০]. Ahmed A (1964) *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment*, Clarendon Press, Oxford, p. 10

[৩১]. Ferishtah, Vol. I, p. 295; Lal (1999), p. 210

[৩২]. Lal (1999), p. 212

ব্যবহার ছিল ত্রিমূখী: প্রথমত তারা তাদের মুসলিম প্রভুদের আরাম-আয়েসের জন্য কাজ করতো; দ্বিতীয়ত প্রভুদের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতো; এবং তৃতীয়ত মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতো। মুসলিমদের বিদেশী ভূখণ্ড দখলের তৃতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল পরাজিত জনগণের উপর নিস্পেষণমূলক জিজিয়া, খারাজ ও অন্যান্য কর আরোপ করা এবং আদায়কৃত রাজস্বের একটা অংশ মুসলিম খিলাফতের কেন্দ্রীয় কোষাগারে পাঠানো হতো।

নবি মোহাম্মদ বিদেশী ভূখণ্ড দখল ও ইসলামি শাসন সম্প্রসারণের একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান, যাতে তিনি আগ্রাসী হুমকি অথবা সহিংস আক্রমণের দ্বারা বিদেশী ভূখণ্ড জয় করতেন। কোনো বিদেশী ভূখণ্ড বা সম্প্রদায়কে পরাজিত করার পর তাদের ধনসম্পদ ও কোষাগার অবধারিতরূপে লুণ্ঠন করা হতো এবং এক পঞ্চমাংশ লুণ্ঠিত মালামাল চলে যেত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে, কোরান অনুসারে যার মালিক হবেন আল্লাহ ও তাঁর নবি, যদিও কেবলমাত্র নবিই তা ব্যবহার করতেন। কোনো সম্প্রদায় তার আক্রমণে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে – যেমন বানু কোরায়জা, মুস্তালিক ও খাইবারের ক্ষেত্রে – তাদেরকে পরাজিত করার পর তিনি বয়স্ক লোকদের গণহারে হত্যা করতেন এবং নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস বানাতেন। পরাজিত জনগণের উপর নবি কর আরোপ করতেন, যেমন খারাজ (ভূমি কর, বশ্যতা কর) ও জিজিয়া (পোল-ট্রাক্স বা মাথাপিছু ধার্য কর)। কোষাগারে প্রেরিত রাজস্ব তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। মোহম্মদের মৃত্যুর পর লুণ্ঠিত মালামাল ও বন্দি ক্রীতদাসের এক পঞ্চমাংশ খিলাফতের কোষাগারে প্রেরিত হতো। নবুয়ত যুগের পর মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রায় অজেয় হয়ে উঠে। এ সময়ে নবির প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্ত তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও জাঁকজমকের সাথে পালন করে চলে। সমসাময়িক মুসলিম ইতিহাসবিদ ও ইউরোপীয় পর্যটকদের প্রদত্ত প্রামাণ্য তথ্য, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে, নিশ্চিত করে যে, নবির সাম্রাজ্যবাদী বিজয় ও উপনিবেশিক শোষণের মডেল বা পন্থাটি ইসলামের বিজয়ের গোটা ইতিহাসব্যাপী লাগাতার প্রয়োগ হয়েছে, যদিও কখনো কখনো কিছুটা কম নিপীড়নমূলকভাবে।

ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসনের মতই পরাজিত জিম্মি প্রজাদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং তাদের সম্পদ ও ধনরত্ন বিদেশী ভূখণ্ডস্থ মুসলিম রাজধানীতে পাঠানো ছিল বিশ্বের বিশাল অংশে ইসলামের বিজয় ও শাসনের একটা সাধারণ উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি, যেমন ব্রিটিশ, ডাচ ও ফরাসিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক শোষণ। ইসলামি উপনিবেশিক সম্প্রসারণের জন্য এটা ছিল গৌণতর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নবি কর্তৃক শুরুকৃত ইসলামের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সর্বত্র মানুষের মাঝে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটানো। সেটা করতে গিয়ে তারা নির্মমভাবে অগণিত অবিশ্বাসীকে হত্যা করেছে, নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেছে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। এক্ষেত্রে পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের মতো ইসলামি উপনিবেশীদের লক্ষ্য ছিল অনুরূপ: ধর্ম বিস্তার ও অর্থনৈতিক শোষণ।

ইসলামের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ

আল্লাহ কোরানে বলেন যে, তিনি ধর্ম হিসেবে ইসলামকে পূর্ণতা দিয়েছেন এবং সেটাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর অনুগ্রহরূপে নির্দিষ্ট করেছেন ও অন্য সকল ধর্মের উপর এর প্রাধান্য ঘোষণা করেছেন:

১. আজ আমি তোমাদের জন্য তোমার (নবির) ধর্মকে পূর্ণতা দিচ্ছি, তোমাদের উপর আমার কৃপা অর্পণ করছি ও তোমাদের ধর্মরূপে ইসলামকে নির্দিষ্ট করছি। (কোরান ৫:৩)

২. এটা তিনিই যিনি পথ নির্দেশনা ও সত্য ধর্মসহ তাঁর বার্তাবাহককে প্রেরণ করেছেন, সকল ধর্মের উপরে এর আধিপত্য ঘোষণার জন্য: এবং আল্লাহই এর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (কোরান ৪৮:২৮)

ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যাতে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক – বস্তুত জীবন ও সমাজের প্রতিটি বিষয় পরিবেষ্টিত। মুসলিমরা সর্বজনীনভাবে বিশ্বাস করে যে, ইসলাম 'একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান'। সুতরাং ইসলাম স্বর্গীয় প্রকৃতির একটা পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা পর্যায়ের ধর্ম। নবি মোহাম্মদ ও তাঁর প্রাথমিক উত্তরাধিকারীগণ, অর্থাৎ মদীনার 'যথার্থরূপে পরিচালিত খলিফাগণ', (৬২২-৬৬১) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বাসীদের সমাজ' ছিল আদর্শ সভ্যতা, যাকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বের সমস্ত ধর্ম ও মানুষের উপর ইসলামের প্রাধান্য বা আধিপত্য অর্জিত হবে বিশ্বাসীদের পেশি শক্তির দ্বারা জিহাদের মাধ্যমে, যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

মোহাম্মদের অধীনে ইসলামের আবির্ভাবে ইসলাম-পূর্ব সংস্কৃতি, রীতি-প্রথা ও ধর্ম সমষ্টির সভ্যতাগুলো বিবেচিত হয় 'জাহিলিয়া' বা 'অজ্ঞানতার' যুগ রূপে। মোহাম্মদ ও তাঁর বিশ্বাসী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বর্গীয়ভাবে নির্দেশিত সভ্যতা দ্বারা ওসব পুরানো সভ্যতা-সংস্কৃতি দূরীভূত হবে। নবি মোহাম্মদ কোরানের ৯:৫ নং আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পৌত্তলিকদেরকে 'হয় ইসলাম গ্রহণ নয় মৃত্যু' – এ উপায় দুটির একটি বেছে নেওয়ার শর্ত দিয়ে তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠি সহ সমগ্র আরবাঞ্চলের ইসলাম-পূর্ব পৌত্তলিক ধর্মীয় চর্চা, সংস্কৃতি ও প্রথায় সমষ্টিগত সভ্যতাকে মুছে ফেলার জন্য একান্তচিত্তে কাজ করে যান। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে ইসলামের ধর্মযোদ্ধারা আরবাঞ্চলের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ও বিশ্বের বৃহত্তম পারস্য, বাইজেন্টিয়াম ও ভারতীয় সভ্যতাসহ বিশাল ভূখণ্ড জয় করে নিলে, পরাজিত জনগণ তাদের আদি সংস্কৃতি, রীতি-প্রথা ও ধর্মীয় চর্চায় ব্যাপক ধ্বংসসাধন ভোগ করে। সুতরাং ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ ও আতঙ্কজনক রাজনৈতিক নিপীড়ন আরোপের বাইরে, মুসলিম হানাদার ও শাসকরা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও অপরিমিত ও নজিরবিহীন ধ্বংস-সাধন করে।

ইসলামপূর্ব যুগের বিশ্ববিখ্যাত বিজয়ীরা – যেমন আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট, সাইরাস দ্য গ্রেট, ইউরোপে জার্মানরা (ভ্যান্ডাল, ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ প্রভৃতি) এবং ভারতে শক ও হুনরা – সবাই বিজিত দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে হয় মিশে যায়, অথবা বিজয়ী ও বিজিত সংস্কৃতির মধ্যে যুগপৎ সমন্বয় সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়। ইসলাম-পরবর্তী যুগে মোঙ্গল দখলদাররাও শেষ পর্যন্ত বিজিত জনগণের সভ্যতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন: চীন ও মঙ্গোলিয়ায় তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়, মধ্য এশিয়ায় হয় মুসলিম, এবং সম্ভবত রাশিয়া ও হাঙ্গেরিতে

তাদের কিছু অংশ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।[৩৩] কিন্তু মুসলিম বিজয়ীরা একনিষ্ঠভাবে বিধর্মী বিজিতদের সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হন – এ বিশ্বাসে যে, ইসলামপূর্ব 'জাহিলিয়া' যুগের সমস্ত চিহ্ন বা সাক্ষ্য মুছে ফেলে তদস্থলে ইসলামের বিশুদ্ধ ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভারত থেকে স্পেন পর্যন্ত অসংখ্য পৌত্তলিক মন্দির, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মঠ, খ্রিষ্টান চার্চ, ও ইহুদি সিনাগগ প্রভৃতির ব্যাপক ধ্বংসলীলা মুসলিম দখলদারদের দ্বারা অনৈসলামিক সংস্কৃতির বেপরোয়া ধ্বংসের সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং ইসলামের বিজয় সাধিত হয়েছিল একটা 'অসামান্য সাংস্কৃতিক মূল্যের বিনিময়ে',[৩৪] যা পুরোপুরি অস্বীকৃত ও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে বিজিতদের সভ্যতার উন্নয়ন ও পরিপুষ্টি সাধনে দখলদার মুসলিম বিজয়ীরা প্রশংসিত হয়। শাসিতদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর ইউরোপীয় ও আরব-ইসলামি শাসনের তুলনামূলক প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে ওয়ারাক আফসোস করে লিখেন:

> ইউরোপীয়রা যদিও তৃতীয় বিশ্বে তাদের প্রতারণাপূর্ণ ও অধঃপতিত মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অবিরাম তিরস্কৃত, কিন্তু কেউই উল্লেখ করবে না যে, ইসলাম কর্তৃক উপনিবেশিত দেশগুলো ছিল অগ্রগামী প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র, আর এটা করতে গিয়ে ইসলামি উপনিবেশবাদ বহু সংস্কৃতিকে পদদলিত ও চিরতরে ধ্বংস করে।[৩৫]

সুতরাং অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ছাড়াও ইসলামি দখলদাররা এসেছিল সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের এক উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্য নিয়ে। ইসলাম এ মন্ত্রটি সহ আসে যে, নবি মোহাম্মদ ছিলেন মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও বিশুদ্ধ উদাহরণ, এবং মুসলিমদেরকে অবশ্যই তাঁর জীবন, কর্ম ও কীর্তির সব কিছুতে যতদূর সম্ভব সমকক্ষ হতে হবে। মোহাম্মদ যেহেতু ছিলেন একজন আরব ও ইসলাম ধর্মের আদি উৎস, একজন অনারব লোক ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আদর্শগতভাবে অনুকরণের অঙ্গীকার করে আরব-ইসলামি প্রভু মোহাম্মদের জীবনকে। পৈতৃক সংস্কৃতিক ও সভ্যতার মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ও চর্চাকে দূরে ঠেলে দিয়ে জীবনযাপন প্রণালিতে একজন আরব ও ধর্মীয় বিশ্বাসে ইসলামি হওয়ার প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় তার সারাজীবনের একান্ত লক্ষ্য। তেহরানে বসবাসরত ব্রিটিশ-শিক্ষিত সাংবাদিক মি. জাফরি'র সঙ্গে সাক্ষাত করেন স্যার ভি. এস. নৈপুল। ভারতের লক্ষ্মৌতে জন্ম ও শিক্ষালাভ করা মি. জাফরি একজন শিয়া মুসলিম, যিনি বড় হয়েছিলেন 'জাম-এ-তৌহিদী' বা 'বিশ্বাসীদের সমাজ'-এর স্বপ্ন বুকে নিয়ে – যা ছিল ইসলামের শুরুতে মদীনায় মোহাম্মদ প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সংস্কৃতি ও সমাজ পুনপ্রতিষ্ঠার একটি স্বপ্ন। এ রকম জীবনে বা সমাজে বসবাসের স্বপ্ন নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালে হিন্দু-অধ্যুষিত ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে শিয়া মুসলিমদের প্রতি সুন্নি মুসলিমদের আচরণে সন্তুষ্ট হতে না পেরে তিনি আবার পাড়ি জমান শিয়া-অধ্যুষিত ইরানের উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক 'তেহরান টাইমস'-এ কাজ করেন। কিন্তু এখানেও তিনি হতাশ হন; কারণ *'শাহ'এর অধীনস্থ ইরানে ছিল একটা নৈরাজ্যকর অবস্থা এবং যখন সেখানে বিশাল সম্পদ এলো, তা সাথে নিয়ে এল দুর্নীতি, সমকামিতা এবং সাধারণ পাপাচার ও দূর্বৃত্তায়ন।'*[৩৬] তারপর সেখানে এলো ইসলামিক বিপ্লব, যা মি. জাফরিকে অনেকটা পুলকিত করে তুলে। নবির অনুরূপ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌম হিসেবে আয়াতুল্লাহদের অধীনে শাসিত ইরান অনেকটাই 'জাম-এ-তৌহিদী'র কাছাকাছি ছিল, যার স্বপ্ন জীবনভর দেখে এসেছেন মি. জাফরি। এ রকম স্বপ্ন পশ্চিম গোলার্ধসহ বিশ্বের সর্বত্র ধর্মান্ধ মৌলবাদী বলে কথিত ধার্মিক মুসলিমদের মধ্যে সর্বজনীন।

মি. জাফরির কাহিনীর পিছনে রয়েছে মুসলিমদের একটি মৌলিক আবেগ বা আকাঙ্ক্ষা: অর্থাৎ পশ্চিমা শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত একজন ভারতীয় মুসলিমও তার নিজের পুর্ব-পুরুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ত্যাগ করে প্রকৃত আরব-ইসলামিক ধর্ম, সামাজিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিবেশে জীবনযাপনের জন্য কতদূর যেতে প্রস্তুত। বিজিত ও ধর্মান্তরিত জনগণের উপর ইসলাম আরোপিত এ আরব সাংস্কৃতিক আধিপত্য সম্বন্ধে আনোয়ার শেখ লিখেছেন:[৩৭]

> ইসলামে ধর্মান্তরিত সকলেরই এটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদেরকে অবশ্যই আরব সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ তাদের সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হবে আরবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীন: যেমন মোহাম্মদকে আচরণের আদর্শরূপে স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামিক আইনের প্রবর্তন, আরবি ভাষা ও আরবি আচরণ শিক্ষা এবং মক্কা ও আরবদের ভালবাসা ইত্যাদি, কেননা একজন আরব হওয়ায় মোহাম্মদ যা কিছু আরবীয় তা ভালবেসেছেন ও কার্যকর করেছেন। এর চেয়েও খারাপ কথা হলো, তাদেরকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জন্মভূমিকে এতটাই ঘৃণা করতে হবে যে, সেটা 'দ্বার-উল-হারব্', অর্থাৎ একটি জীবন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।

উপমহাদেশের মুসলিম দেশগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলে সেখানকার ব্যাপক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, জাতিগত ও ভৌগলিক বৈচিত্রের বিপুল জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ইসলামের ধ্বংসমূলক প্রভাব সহজেই প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে, এশিয়ার বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন, আফ্রিকার মিশর, সুদান, আলজেরিয়া ও সোমালিয়া, এবং ইউরোপের তুরস্ক ও চেচনিয়া ইত্যাদি ভূখণ্ডের ইসলামি দখলের পূর্বে সেখানকার জনগণের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকড় হিন্দু, বৌদ্ধ, জরথুষ্ট, সর্বপ্রাণবাদী, খ্রিষ্টান, ইহুদি ও পৌত্তলিক প্রভৃতিতে প্রোথিত ছিল। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে সে ব্যাপক ঐতিহাসিক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র মুছে আজ সেখানকার মুসলিমদের সংস্কৃতি এখানে-সেখানে সামান্য পার্থক্য ব্যতীত প্রায় যেন আরব-ইসলামি সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে

---

৩৩. Nehru J (1989) *Glimpses of World History*, Oxford University Press, New Delhi, p. 222

৩৪. Crone P & Cook M (1977) *Hagarism: The Making of the Islamic World*, Cambridge University Press, Cambridge, p. VIII

৩৫. Ibn Warraq, p. 198

৩৬. Naipaul VS (1998) *Beyond Belief: The Islamic Incursions among the Converted Peoples*, Random House, New York, p. 144-45

৩৭. Shaikh A (1998) *Islam: The Arab Imperialism*, The Principality Publishers, Cardiff, Chapter 7

গেছে। আরো বেশী উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, তাদের সংস্কৃতি ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি পাশাপাশি বসবাসকারী তাদের ইসলামপূর্ব পূর্বপুরুষদের ধর্মভুক্ত মানুষদের থেকে এতটাই পৃথক হয়ে গেছে যে, সেসব অমুসলিম প্রতিবেশীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তারা খুশি হয়। এটা ঘটেছে ওসব অনেক দেশেই প্রায় দুই শতাব্দিব্যাপী ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসন সত্ত্বেও, যখন ওসব দেশের হারিয়ে যাওয়া বা হ্রাসপ্রাপ্ত ইসলামপূর্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষিত করা সহ ধর্মনিরপেক্ষকরণের দৃঢ় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল।

সমগ্র বিশ্বে জীবন ও সমাজের প্রত্যেকটি স্তরকে ইসলামিকৃত দেখা বিশ্বাসী মুসলিমের মাঝে একটি সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা বহু উচ্চশিক্ষিত মুসলিমকে দেখেছি। তারা নিজের দেশে বা মুসলিম বিশ্বের অন্য কোনো দেশে ইসলামি মতে জীবন যাপনের জন্য তাদের গ্রহণকৃত স্বাগতিক দেশ ত্যাগ করার কথা কখনোই চিন্তা করে না; অথচ তারা ভীষণভাবে পশ্চিমা অধঃপতিত সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে বসবাসের দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল। তাদের মনে রয়েছে পশ্চিমা সমাজ ও সংস্কৃতিকে অর্থনৈতিক ও কিছুমাত্রায় রাজনৈতিক বিষয় (গণতন্ত্র ইত্যাদি) ব্যতীত তদস্থলে নৈতিকভাবে বিশুদ্ধ ইসলামি ব্যবস্থা দেখার উদগ্রীব বাসনা। মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে শরীয়তী অর্থ-ব্যবস্থার বর্ধনশীল জনপ্রিয়তা পশ্চিমা সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পুনর্গঠনেও মুসলিমদের বাসনা ব্যক্ত করে।

এটা বুঝা উচিত যে, ইসলামের জন্মকালে জরথুষ্টবাদী পারস্য, হিন্দু-বৌদ্ধ ভারত, পৌত্তলিক-কপটিক (মিশরীয় খ্রিষ্টান) মিশর, পৌত্তলিক-বৌদ্ধ চীন ও খ্রিষ্টান বাইজেন্টিয়াম ছিল বিশ্বের উৎকৃষ্টতম সভ্যতা। তাদের প্রত্যেকের ছিল সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং শিল্পে, ভাস্কর্যে, শিক্ষায়, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে দীর্ঘকালীন সাফল্য। অপরদিকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত আইন-কানুনবিহীন আরব উপদ্বীপে, যখন এসব সভ্যতাগুলো সাদাসিধা বেদুইন আরবীয় সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসরমান ছিল। উল্লেখ্য, এসব উৎকৃষ্ট সভ্যতার দেশ – যেমন অন্যান্যের মধ্যে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও ফিলিস্তিন ইত্যাদি – থেকে মুসলিমরা তাদের ইসলামপূর্ব সভ্যতা সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে। মিশর হলো ৩,০০০-বছর-টিকে-থাকা প্রাচীন বিশ্বের এক উৎকৃষ্ট মানব সভ্যতার উত্তরাধিকারী, কিন্তু অনারব মিশরীয় মুসলিমরা এখন সবাই হয়ে গেছে আরব। মিশরীয় সমাজের এরূপ রূপান্তরে আনোয়ার শেখ আফসোসের সাথে লিখেন: '*মিশরের দিকে তাকিয়ে দেখ... বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি ও স্বর্গতুল্য আচার-আচরণের এ চমৎকার দেশটির ভাগ্য ইসলামের নিয়ন্ত্রণে আসতেই টুপ করে সে পাতালে পড়ে গেল। এখন আর কেউ মিশরীয় নেই। সবাই হয়ে গেছে আরব।*'[৩৮]

হতবাক হবার ব্যাপার হলো আজকে সেসব মহোত্তম সভ্যতার বংশধর ধার্মিক মুসলিমরা তাদের আদি ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষকেও ঘৃণা করে। উদাহরণস্বরূপ, আলজিরীয় ইসলামি আন্দোলনকারীরা ১৯৯০'এর দশকে অস্ত্র তুলে নেয় তাদের দেশকে অতীতের বার্বার আফ্রিকান সংস্কৃতি থেকে ছিন্ন ও পুরোপুরি আরবীয়করণের লক্ষ্যে, এবং ২০০ হাজারেরও বেশী নিজ দেশবাসীকে হত্যা করে তদুদ্দেশ্যে। এখানে উল্লেখ্য যে, তাদের ইসলামপূর্ব বার্বার বংশধররা হানাদার মুসলিম আক্রমণকারী ও ইসলামধর্মের প্রতি চরম ঘৃণায় আরবদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল আফ্রিকায়। ইবনে খালদুন জানান: আরব দখলদারদের দ্বারা চূড়ান্তরূপে ইসলাম আরোপের পূর্বে বার্বাররা ১২ বার জোরপূর্বক চাপানো ইসলামধর্ম ত্যাগ করেছিল। বার্বারদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে আরবরা কয়েকবার নিজেদেরকে মাগরিব থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।[৩৯]

মুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরান ও নবির উদাহরণ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করে; সুতরাং তারা পরিণত হয় আরব-ইসলামি সংস্কৃতির দাসে। শুধুমাত্র আরব-ইসলামি জীবনাচরণের অন্ধ অনুকরণই নয়, তাদের নিজস্ব ইসলামপূর্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাফল্য বা অর্জনগুলোকে ধ্বংস করাও তাদের উপর আরোপিত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আরব-ইসলামিক সভ্যতা কর্তৃক সেগুলো পরিত্যক্ত বা বাতিল বলে গণ্য। তাদের কাছে তাদের জন্মভূমি যতদিন ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিশুদ্ধ, অর্থাৎ ইসলামি, না হচ্ছে, ততদিন 'দ্বার-আল-হার্ব' বা 'যুদ্ধক্ষেত্র' হিসেবে গণ্য হবে। আনোয়ার শেখের ভাষায়: '*এসব অনারব মুসলিমরা মুসলিম জাতিসত্তার বিশ্বাসের অজুহাতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জন্মভূমির প্রতি এক বিশেষ ঘৃণার মনোভাব পোষণ করে।*'[৪০]

সুতরাং উপমহাদেশের ধার্মিক মুসলিমরা তাদের দেশকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু পৌত্তলিকতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিবর্জিত স্থানরূপে দেখার একটা উদগ্রীব বাসনা পোষণ করে। নিজেদের জন্য একটা বিশুদ্ধ ইসলামি দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য লাখ লাখ জীবনের বিনিময়ে মুসলিমরা পাকিস্তান দেশটির সৃষ্টি করে, যা তাদের দৃষ্টিতে এ অঞ্চলের মুসলিমদের সবচেয়ে গৌরবান্বিত অর্জন। ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম-অধ্যুষিত কাশ্মীরে একই আন্দোলন চলে আসছে। একইভাবে ইরানের ধার্মিক মুসলিমরা চায় যে, তাদের ইসলামপূর্ব ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চিহ্নগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব তাদের দেশ থেকে মুছে ফেলা হোক। ইসলামি বিপ্লবের পর (১৯৭৯) ইরানের আয়াতুল্লাহরা – যারা মোহাম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাজের পুনর্জন্ম ঘটাতে চান – তারা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাচীন ইরানী ইতিহাস পড়ানো নিষিদ্ধ করেন এবং সেসব বিষয়ের শিক্ষকদেরকে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন। একইভাবে মিশরীয় মুসলিমরাও অধীর আগ্রহে দেখতে চান যে, তাদের দেশের ইসলামপূর্ব কপটিক খ্রিষ্টানরা এবং তাদের ভরপুর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষ মুছে ফেলা হোক।

১৯৭০-এর দশকের শেষ ও ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে নৈপুল পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ইরান ভ্রমণকালে শিক্ষিত মুসলিমদের মনে তাদের সমাজের তথাকথিত অনৈসলামিক আচার-বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে ফেলার ও তাদের ইসলামপূর্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস করার পরিব্যাপ্ত একটা আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করেন। ইন্দোনেশিয়ার ধার্মিক মুসলিমদের মাঝে ইসলাম-আরোপিত আপোষহীন আরব সাম্রাজ্যবাদী

---

৩৮. Ibid

৩৯. Levtzion N (1979) *Toward a Comparative Study of Islamization*, In N. Levtzion ed., p. 6

৪০. Shaikh, Chapter 7

চেতনা লক্ষ্য করে নৈপুল লিখেন: *'ইসলামি ধর্মান্ধতার নিষ্ঠুর দিক হলো, এটা মাত্র একটি জাতির মানুষকে স্বীকার করে – তা হলো আরবরা, নবির আপন বা মূল মানুষ - একটিমাত্র অতীত ও পবিত্র স্থানসমূহ, তীর্থযাত্রা এবং তীর্থস্থানের মাটিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। আরবের ওসব পবিত্রস্থানসমূহ সকল ধর্মান্তরিতদের পবিত্রস্থান হতে হবে। ধর্মান্তরিত জনগণকে তাদের অতীতকে মুছে ফেলতে হবে; ধর্মান্তরিত জনগণের জন্য কেবলমাত্র প্রয়োজন একটি পবিত্র ধর্ম, ইসলাম, এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। এটা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে আপোষহীন প্রকৃতির দৃষ্টান্ত।'*[৪১]

বিজিত ও ধর্মান্তরিত অনারব জনগণ ও তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর ইসলামের ক্ষতিকর প্রভাব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নৈপুল লিখেছেন: *'ধর্মান্তরিতদের কাছে তার জন্মভূমির কোনো ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই, তার প্রত্নসামগ্রী বা ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের কোনোই মূল্য নেই; তাদের কাছে আরবের ধূলোই একমাত্র পবিত্র বস্তু।'*[৪২]

ইসলামি বিজয়ের ১২শ' বছর পর সিন্ধুর মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক আরবীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্য – যেমন আরব বিশ্বাস, আরব ভাষা, আরব পোশাক-আশাক, আরব নাম ইত্যাদি – লক্ষ্য করে নৈপুল লিখেন:[৪৩]

> ইসলাম ও আরব সাম্রাজ্যবাদের মত সম্ভবতঃ আর কোনোই সাম্রাজ্যবাদ নেই। পাঁচশ' বছর রোমান শাসনাধীনে থাকার পরও গল'রা তাদের পুরনো দেব-দেবী ও শ্রদ্ধা-ভক্তি উদ্ধার করতে পেরেছিল; সেসব বিশ্বাস মরে যায়নি; সেগুলো রোমান আবরণের নিচেই প্রাণবন্ত ছিল। কিন্তু ইসলাম একটা ধর্মীয় শর্তরূপে অতীতকে মুছে ফেলতে চায়; বিশ্বাসীরা শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র আরবকে সম্মান দেখায়; এছাড়া তাদের ফিরে চাওয়ার বা যাওয়ার কিছুই নেই।

মুসলিমদের মাঝে তাদের ইসলামপূর্ব অতীতকে মুছে ফেলার তাগিদ একটা অলস আকাঙ্ক্ষামাত্র নয়। স্ব-স্ব জন্মভূমিতে তারা অনৈসলামিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নসমূহ – অর্থাৎ তাদের ইসলামপূর্ব 'জাহেলিয়া' ঐতিহ্যকে – ধ্বংস করতে সক্রিয় ও সহিংস প্রয়াস করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সালে আফগানিস্তানের ইসলামপন্থি তালিবানরা ১৮শ' বছরের পুরনো বামিয়ান বৌদ্ধমূর্তিটি গুঁড়িয়ে দেয়; ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে তালিবানরা উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় প্রথম শতাব্দির বুদ্ধ-খোদিত একটি শীলা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়; ১৯৮৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভায় উগ্র ইসলামপন্থিরা নবম শতকে প্রতিষ্ঠিত বিস্ময়কর বড়বুদুর বৌদ্ধ মন্দিরটি বোমা মেরে ধুলিস্মাৎ করতে চেষ্টা করে; ২০০৮ সালের জুন মাসে মিশরের ইসলামবাদীরা দাইর আবু কানায় অবস্থিত বিশ্বের প্রাচীনতম খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী মঠটি আক্রমণ করে। ২০০৬ সালের এপ্রিলে মিশরের শীর্ষস্থানীয় ইসলামি আইনবিশারদ ও শ্রেষ্ঠ মুফতি আলী গোমা ইসলামি ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে মূর্তি প্রদর্শন করা অনৈসলামিক ঘোষণা করে এক ধর্মীয় ফতোয়া বা অনুশাসন জারি করেন। এতে আশংকা করা হয়েছিল যে, ইসলামপন্থিরা মিশরের অতি সমৃদ্ধ ইসলামপূর্ব ঐতিহ্যসমূহের উপর তাদের আক্রোশ উন্মোচন করতে এ ফতোয়াটি ব্যবহার করতে পারে। যেমন 'আখবার আল আদব' ম্যাগাজিনের সম্পাদক লিখেন: *'এ সম্ভাবনাটি অস্বীকার করা যায় না যে, ফতোয়াটির উপর ভিত্তি করে লুক্সর'এর কারনাক মন্দির বা অন্য যেকোন ফারাও মন্দির উড়িয়ে দিতে কেউ সেখানে প্রবেশ করবে না।'*[৪৪] গত তিন দশক ধরে ইরানের আয়াতুল্লাহরা একটার পর একটা অজুহাত তুলে নিয়মিতভাবে ইসলামপূর্ব যুগের স্মৃতিস্তম্ভ ও সমাধি-মন্দিরগুলো ধ্বংস করে চলেছে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যা কিছু ইসলামি নয়, তার চিহ্ন মুছে ফেলার একটা সুস্পষ্ট প্রয়াস লক্ষ্যণীয় মুসলিমদের দ্বারা হিন্দুদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূল করার দৃঢ় অভিযানের মধ্যে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) জনসংখ্যার প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ ও পাকিস্তানে প্রায় ১০ শতাংশ ছিল হিন্দু। বর্তমানে হিন্দুদের সংখ্যা বাংলাদেশে ১০ শতাংশে ও পাকিস্তানে মাত্র ১ শতাংশে এসে ঠেকেছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যার ব্যাপক হ্রাসের প্রধান কারণ হলো হিন্দুদের প্রতি উগ্র মুসলিমদের অসদাচরণ ও দুর্দশা সৃষ্টির ফলে হিন্দুদের ক্রমাগত ভারতে পাড়ি জমানো। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের আরো একটি গৌণ কারণ হলো, নানা বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে তাদের কিছু সংখ্যক লোকের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া। হিন্দু (ও অন্যান্য অমুসলিম) তরুণীদেরকে অপহরণ করে গুন্ডা প্রকৃতির মুসলিমদের সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া, তাদের নারীদের ব্যাপক ধর্ষণ, তাদের ভূ-সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল, রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তাদেরকে গণহারে উচ্ছেদ ও অন্যান্য ধরনের সামাজিক চাপ সৃষ্টির কারণে ইসলামে ধর্মান্তরে অনিচ্ছুক হিন্দুরা উপায়ান্তর না দেখে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও বঞ্চনার কারণে ১৯৬৪ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় এক কোটি হিন্দু দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত হিন্দুদের প্রায় ২৬ লাখ একর জমি মুসলিমরা জবরদখল করে নিয়েছে।[৪৫] চলচ্চিত্র প্রযোজক ও ভাষ্যকার নাঈম মোহায়মেন বাংলাদেশে অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে লিখেছেন:

> আমরা কেবলমাত্র শ্রেণী অভিজাত নই, মুসলিম-অভিজাতও, যারা এ দেশটিকে বিধ্বস্ত ও লুটপাট করেছে এবং অন্যান্যদেরকে ছায়া-নাগরিকে পরিণত করেছে। 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' ('ভেস্টেড প্রপার্টি অ্যাক্ট') থেকে শুরু করে এমন কিছু আইন, সামাজিক আদর্শ, রাজনীতি ও নিরব বৈষম্য রয়েছে, যা আমাদের হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, আদিবাসী এবং পাহাড়ি নাগরিকদেরকে মানবেতর পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে। তারা স্কুল, চাকরি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও স্বাভাবিক জীবন ধারা থেকে বিতাড়িত।[৪৬]

---

৪১. Naipaul (1998), p. 64
৪২. Ibid, p. 256
৪৩. Ibid, p. 331
৪৪. *Fatwa against statues triggers uproar in Egypt*, Middle East Times, 3 April 2006
৪৫. *Hindus lost 26 lakh acres of land from 1965 to 2006*, The Daily Star, Dhaka, 15 May 2008
৪৬. Mohaiemen N, *Tattered blood-green flag: Secularism in crisis*, Daily Star, Bangladesh, 26 Feb 2007

মিশরে মুসলিমদের অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়নের ফলশ্রুতিতে আদিবাসী কপটিক খ্রিষ্টানদের সংখ্যা হ্রাস অব্যাহত রয়েছে। খ্রিষ্টানদের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমরা প্রতিটি রাস্তায়, যেখানে খ্রিষ্টানদের চার্চ রয়েছে, সেখানে মসজিদ স্থাপন করে। নিয়মিতভাবে মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সৃষ্টি করে, তাদের ধনসম্পদ, চার্চ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে (প্রচার মাধ্যমে যা বার বার উল্লেখিত হচ্ছে) ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। মিশরীয় কপ্টদের উপর মুসলিমরা এরূপ অশালীন আচরণ করে, যা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে অথবা দেশত্যাগ করে পশ্চিমা দেশে চলে যেতে বাধ্য করে। সম্প্রতি একটা ঘটনায় ২০,০০০ মুসলিমের এক দাঙ্গাকারী উচ্ছৃঙ্খল জনতা পাথর ও বিউটেন গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে কায়রোর ওয়েস্ট আইন শামস-এ অবস্থিত ভার্জিন মেরীর কপটিক অর্থডক্স চার্চটির উদ্বোধনী দিনে ভেতরে অবস্থানরত ১,০০০ খ্রিষ্টানকে অবরোধ করে। তারা রাতারাতি নব-নির্মিত চার্চ-মুখী একটি ভবনের দ্বিতীয় তলাটিকে মসজিদ বানিয়ে নামাজ পড়া শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনী তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করলে তারা চার্চ ভবনটি আক্রমণ করে দরজা-জানালা ভেঙ্গে চুরমার করে ও গোটা দ্বিতীয় তলাটি বিধ্বস্ত করে। তারা জিহাদের আয়াতগুলো আওড়াতে থাকে; সেই সাথে '*আমরা চার্চটি গুড়িয়ে দিব*' এবং '*হে ইসলাম, তোমার জন্য আমরা আমাদের রক্ত, আত্মা ও নিজেদেরকে বিসর্জন দিব*' ইত্যাদি বলে শ্লোগান দেয়।[৪৭] সম্প্রতি লন্ডনে কিছু হিন্দু তরুণীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য কিছু মুসলিম এমন সন্ত্রাসী আচরণ করে যে, শেষ পর্যন্ত ঐ তরুণীরা পুলিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[৪৮] খোদ ব্রিটেনেই যখন এমন ঘটনা ঘটছে, তখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অমুসলিমের উপর কী ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আরব খ্রিষ্টান জনসংখ্যাও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তারা বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে বাঁচতে প্রধানত পশ্চিমা দেশগুলোতে পালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের বেথলেহেম নগরী ছিল এক সময় খ্রিষ্টান প্রধান; এখন সেটা মুসলিম প্রধান নগরী। ১৯৯০ সালে এ নগরীতে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৬০ ভাগ, যা কমতে কমতে ২০০০ সালে ৪০ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। আর বর্তমানে বেথলেহেম নগরীতে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা প্রায় ১৫ শতাংশে এসে ঠেকেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ে আইনজীবী ও হিব্রু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জুস্টাস রীড ওয়েইনারের মতে, '*ফাতাহ্ নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের না দেখার ভান ও দুষ্কর্ম ঢাকা দেওয়ার প্রবণতার কারণে খ্রিষ্টান আরবরা মুসলিমদের হাতে বারংবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। তাদের দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে আতঙ্ক সৃষ্টি, প্রহার, ভূমি দখল, চার্চ ও অন্যান্য খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্নিবোমা নিক্ষেপ, চাকরি দিতে অস্বীকার, অর্থনৈতিক অবরোধ, নির্যাতন-নিপীড়ন, অপহরণ, জোরপূর্বক বিবাহ, যৌন-নিপীড়ন ও চাঁদাবাজি।*'[৪৯] এসব সমস্যা তাদেরকে অন্যত্র অভিবাসিত হতে বাধ্য করে। অপরদিকে ইসরাইলে যিশুর জন্মস্থান নাজারেথ নগরীটি, যা ১৮৪৮ সালে খ্রিষ্টান-প্রধান ছিল, তা আজও খ্রিষ্টান-প্রধান নগরীরূপে রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক প্রবণতার উপর ভিত্তিশীল এক হিসাব মতে, মুসলিমদের দ্বারা ক্রমবর্ধমান হারে নির্যাতন ও অসদাচরণের ফলে আগামী পনেরো বছরের মধ্যে মুসলিম-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীর এবং গাজার ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।[৫০]

অপরদিকে হিন্দু সংখ্যাগুরু ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ১৯৬০ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় নাইজেরিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৪০ শতাংশ; আজ সেখানে সম্ভবত মুসলিমরা সংখ্যাগুরু। ১৯৯০ সালের গৃহযুদ্ধের আগে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় জনসংখ্যার ৪৩.৫ শতাংশ ছিল মুসলিম; ২০০৮ সালে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশের উপরে। ইসরাইলে বিশ্বের সর্বত্র থেকে ইহুদি অভিবাসীরা গিয়ে জড়ো হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত বহাল রেখে চলেছে। যে কোনো দেশেই সংখ্যালঘু মুসলিমরা হয় অন্যান্যদের চেয়ে সংখ্যায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, অথবা জনসংখ্যায় তাদের হিস্যা বহাল রাখছে। কিন্তু ব্যতিক্রমহীনভাবে ইসলামিক দেশগুলোতে সংখ্যালঘুরা দ্রুত অপসৃত হয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস 'শাহাদৎ' বলেঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোনোই ঈশ্বর নেই' (কোরান ৬:১০২,১০৬; ২:১৬৩)। ইসলাম – যা মহাবিশ্বের সত্যিকার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা আল্লাহর অনুমোদিত একমাত্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা – তা অন্য সবকিছুকে উপড়ে ফেলবে ও সকল মানুষের উপর কর্তৃত্ব করবে। সবকিছু সমন্বিত বা ধারণকৃত একটি ইসলামি সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ – অর্থাৎ ইসলামকে আল্লাহর দাবিকৃত সকল মানুষের জন্য একমাত্র ও পূর্ণাঙ্গ একটা জীবনব্যবস্থারূপে গড়ে তোলার জন্য মুসলিমদেরকে অবশ্যই জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে, তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন (কোরান ২:১৯৩, ৮:৩৯)। ইসলামি দেশসমূহে অমুসলিমদের উপর চলমান নির্যাতন-নিপীড়ন, যার প্রতি বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির প্রতিবাদ বা বিরোধিতা একেবারেই ক্ষীণ, সেটা সচেতন বা অবচেতনভাবে ইসলামিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ, যা ইসলামের একটা মৌলিক বিধান, তা আরোপেরই একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

কাজেই ইসলামি আগ্রাসনের কারণে মানবজাতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে বিপুল ভাণ্ডার হারিয়েছে, তা অধিকাংশ মুসলিমের কাছে কোনো আফসোসের কারণ নয়। ধার্মিক মুসলিমের কাছে এটা বরং একটা আনন্দের বিষয়; কারণ এগুলোর ধ্বংস তাদের কাছে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ ও স্বর্গীয় দায়িত্ব। নৈপুল যথার্থই উল্লেখ করেনঃ '*এটা (ইসলাম) ধর্মান্তরিত জনগণের উপর চরম ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি আরোপ করেছে। ধর্মান্তরিত হতে গেলে তোমাকে তোমার অতীত ধ্বংস করতে হবে, ইতিহাস ধ্বংস করতে হবে। তার উপর পা রেখে তোমাকে বলতে হবে 'আমার পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি আর নেই, তাতে কিছু এসে যায় না।*'"[৫১] সব মহাদেশেই মুসলিমদের ক্ষমতা বা আয়ত্বের মধ্যে আসা 'জাহিলিয়া'

---

৪৭. *20,000 Muslims Attack a Church in Cario*, Assyrian International News Agency, 26 November, 2008

৪৮. Daily Mail, *Police protect girls forced to convert to Islam*, 22 Feb 2007

৪৯. Weiner JR (2008) *Palestinian Crimes against Charistian Arabs and Their Manipulation against Israel*, in Institute for Global Jewish Affairs Bulletin, No. 72, 1 September 2008

৫০. Lefkovits E, *Christian groups in PA to disappear*, Jerusalem Post, 4 December 2007

৫১. Ezard, *Nobel dream comes true for VS Naipaul*, The Guardian, 12 October 2001

ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার প্রভৃতির সাক্ষ্য বা চিহ্ন নির্মূল করার অভিযান চলছে পুরোদমে। বিশ্বব্যাপী একটা ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমরা অবশ্যই গোটা পৃথিবীকে আরব-ইসলামিক সমাজে রূপান্তরিত করবে, যেখানে ইসলামই হবে একমাত্র আদর্শ ও সবার জন্য সর্বক্ষেত্রে আরোপের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা। আজকের উপনিবেশ-পরবর্তী মুসলিম বিশ্বে সেরূপ একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর অতি দ্রুত সংঘটিত হচ্ছে, বিশেষ করে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশ্ব সংস্কৃতিকে আরবীয়-ইসলামিকরণের প্রক্রিয়া এখন পশ্চিমা দেশগুলোতেও শুরু হয়ে গেছে অভিবাসিত মুসলিমদের দ্বারা।

বিজিত দেশসমূহে ইসলামের অবদান

মুসলিম দখলদাররা ভারতে (ও সর্বত্র) গিয়েছিল উপনিবেশিক ধারায় অর্থনৈতিক শোষণের নিমিত্তে কি না, ইতিমধ্যে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুসলিমরা অস্বীকার করে যে, এরকম কিছু ঘটেছিল। মুসলিম হামলাকারীরা নিরীহ হিন্দুদের ভূখণ্ডকে বারংবার আক্রমণ করে বিপুল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে, তাদের বহু লোককে হত্যা করে, ও বিপুল সংখ্যক নারী-শিশুকে ক্রীতদাস বানায়। লুণ্ঠন সামগ্রী ও বন্দিদের এক-পঞ্চমাংশ সুদূর ভূখণ্ডে অবস্থিত খলিফার ভাণ্ডারে চলে গেছে। ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নানা প্রকার সর্বনাশা করের দুর্বহ বোঝা এসে পড়তো ইসলামে ধর্মান্তরিত না হওয়া বিধর্মী জনগণের উপর। তাদেরকে এমন দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেওয়া হতো যে, মুসলিমপূর্ব সমৃদ্ধিশীল ভারতের মানুষকে মুসলিমদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে হতো। দিল্লির সুলতানাত প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দীর মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনকালের (১২৯৬-১৩১৬) শুরুতেই এসব ঘটতে শুরু করে। দুর্বহ করের বোঝা থেকে মুক্ত হতে হিন্দুদেরকে তাদের নারী ও শিশুদের বিক্রি করতে হয়েছে। কর আদায়কারীদের নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে অন্যেরা জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মুসলিমদের দৃষ্টিতে এগুলো স্থানীয় লোকদের উপর উপনিবেশিক ধারার শোষণ নয়, বরং মুসলিম হামলাকারীদের দ্বারা ভারতে মহত্তম সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতাবাদের আনয়ন। মুসলিমদের ধারণার এ দৃষ্টান্ত সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপন করেছেন অধ্যাপক তাজ হাশমী:[৫২]

> মুসলিমরা ভারতে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আনয়ন করে। ফলমূল, যেমন তরমুজ, আপেল, আঙ্গুর, খুবানি, বিভিন্ন প্রকারের বাদাম, জাফরান, সুগন্ধী, গান পাউডার, মোজাইক, চীনা মাটির বাসন, স্থাপত্যে তীক্ষ্ণাগ্র ও অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান, গম্বুজ, মিনার, সঙ্গীতে সিতার ও তবলা এবং সঙ্গীতের পরিমার্জিত নিয়ম, ঘোড়া, পাগড়ি, চামড়ার জুতা, ধূতি ও শাড়ির পরিবর্তে সেলাই করা বা দর্জি নির্মিত পোশাক এবং লুঙ্গি, বরফ, গোলাপ জল এবং সামাজিক সমতাবাদ ইত্যাদি মুসলিম শাসকবর্গ, ব্যবসায়ী ও সুফিদের দ্বারা ভারতে আনীত হয়।

মুসলিমদের দ্বারা ভারতে আনীত এসব ভাল বা উপকারী জিনিসগুলোর আলোচনা এ গ্রন্থের আওতায় পড়ে না। তথাপি এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, প্রকৃত ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষায় এসব উপকারী জিনিস বা বিষয়গুলোর কোনই ভিত্তি নেই; এমনকি আরব জ্ঞান-গরিমা বা ঐতিহ্যেও এগুলোর অনেকেরই কোন ভিত্তি বা শেকড় ছিল না (বস্তুতঃ গান, কবিতা, শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি ইসলামে অনুমোদিত নয়)। বরং সেগুলো গৃহিত হয়েছিল মুসলিম কর্তৃক জয়কৃত বা সম্পর্ক স্থাপনকৃত ইসলামপূর্ব যুগের পারস্য, মিশর, সিরিয়া ও বাইজেন্টিয়ামের অগ্রসর সভ্যতার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে।

ইসলামের সমালোচক ও লেখক মোহাম্মদ আসগর, হাশমীর এ অতিশয়োক্তির উত্তরে লিখেন:

> এটা একটা ভাল যুক্তি যা বিদেশী শক্তি কর্তৃক একটি দেশ দখলের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে বিজিত জাতির কাছে না থাকা কিছু জিনিস প্রবর্তন করার জন্য। এখন বিশ্বে যা ঘটছে, তার ন্যায্যতা প্রতিপাদনে আমরা কি একই যুক্তি প্রয়োগ করতে পারি? ইরাকিরা হ্যামবার্গার ও স্যান্ডউইচ খেত না কিংবা আমেরিকানরা স্টেইক ও অন্যান্য অনেক কিছু খায়, যা তারা খেতে অভ্যস্ত নয়। তারা গগনচুম্বী অট্টালিকা, বাঁধ ও অন্যান্য আধুনিক জিনিস নির্মাণেও সমর্থ ছিল না। তদুপরি তারা তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি নির্যাতনকারী ও স্থায়ী একনায়কত্বের অধীনে বাস করছিল। সুতরাং আমেরিকানরা ইরাকীদের মাঝে নিজেদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি প্রবর্তনের মানসে ইরাক আক্রমণ করে। ইরাকে তাদের উপস্থিতি ইরাকিদের স্যান্ডউইচ ও হ্যামবার্গার খাওয়ার সুযোগ যুগিয়েছে এবং তাদেরকে উচ্চ ভবন নির্মাণের কলাকৌশল শিখানো হচ্ছে। তারা তাদেরকে (ইরাকিদেরকে) গণতন্ত্রের শিক্ষা দিচ্ছে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমেরিকানরা ইরাকিদের একটা সুসভ্য জাতিতে পরিণত করে দিবে; এটা মধ্যযুগের ভারতীয় জনগণের উপর মুসলিমরা যা করেছিল, তারই একটা পুনরাবৃত্তি বা প্রতিরূপ ঘটনা।

এ দু'টো ঘটনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নিরীহ ভারতীয়দের উপর মুসলিম হামলাকারীদের বিবেকহীন নির্মমতার ব্যাপারে হাশমীর উদ্ভট ন্যায্যতা প্রতিপাদনের যথার্থ জবাব দিয়েছেন আসগর। তবে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, সামাজিক সমতাবাদ, শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যা, বাদ্যযন্ত্রাদি এবং অবশ্যই ওসব সুফি দরবেশ – যা ইসলাম ভারতে আনয়ন করে – সেসব ব্যাপারে হাশমীর দাবির সত্যতা বিশ্লেষণ করাও জরুরি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর বিশ্লেষণ প্রয়োজন:

১. যার মধ্যে ইসলামের ভিত্তি নিহিত, সে আরবদের ও তাদের সংস্কৃতির এসব অবদানে কিছু করার ছিল কি?
২. ওগুলো আরবদের উদ্ভাবিত ছিল কি?
৩. মোহাম্মদের সময়ে আরব সমাজ সামাজিক-সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে অতটা উন্নত ছিল কি?

আরবদের অনুন্নত সমাজ

[৫২]. Hashmi, *op cit*

নবুয়তির যুগের আরব সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণ করে যে, তখনকার আরব সমাজের পরিস্থিতি সে রকম ছিল না। ইসলামপূর্ব ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের উপর ইসলামিক সাহিত্যে দেখা যায়, নবি মোহাম্মদের সময় আরব উপদ্বীপে ছিল এক অমার্জিত জনগণের বসবাস, যাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল সামান্য অগ্রসরমান বা অনেকটা আদিম স্তরের। তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সভ্যতার পর্যায় ছিল ভারত, পারস্য, মিশর ও সিরিয়ার (লেভান্ত) সমসাময়িক উন্নত সভ্যতার তুলনায় ভ্রুণের স্তরে। মক্কানগরী একটা বিরান মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত ছিল। সেখানে কৃষিকাজ হত খুবই সামান্য, যা এমনকি আল্লাহও সত্যায়িত করেছেন: '*আমি আমার কিছু উত্তরপুরুষদেরকে 'তাঁর পবিত্র ঘর' (কা'বা)-এর কাছাকাছি একটা চাষাবাদ-অযোগ্য উপত্যকায় স্থাপিত করেছি*' (কোরান ১৪:৩৭)। ফলে মক্কার লোকদের দৈনন্দিন তেমন কাজকর্ম ছিল না। তারা সাময়িক ব্যবসা-বাণিজ্য ও কা'বায় আগত তীর্থযাত্রী থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং মক্কার মধ্য দিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে গমনাগমনকৃত বাণিজ্য কাফেলার উপর ধার্যকৃত করের অর্থে জীবনধারণ করতো। এদের মধ্যে অধিকতর যুদ্ধবাজ ও দুঃসাহসী ঝুঁকি গ্রহণকারীরা বাঁচার তাগিদে হামলা ও লুণ্ঠন কাজে লিপ্ত হতো। জনসংখ্যার বিরাট একটা অংশ ছিল যাযাবার শ্রেণীর, যারা বাঁচার তাগিদে মরুভূমির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে পরিভ্রমণ করে বেড়াতো; অনেকটা এরূপ অবস্থা সেখানে বিংশ শতাব্দীতে তেল আবিষ্কার পর্যন্ত বহাল থাকে।

নবি মোহাম্মদের পৈত্রিক শহর মক্কার লোকেরা অনেকটা আলস্যপূর্ণ জীবনযাপন করতো। জীবনধারণের জন্য মাঝে মাঝে যে সুযোগ আসতো, তাই তারা লুফে নিতো। হাতে অগাধ সময় থাকায় বিনোদন হিসেবে তারা প্রধানত যৌনকর্মে লিপ্ত হতো বলে মনে হয়। সে সময়ের আরব সমাজ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ইসলামিক ইতিহাসবিদ ম্যাক্সিম রডিনসন রাব্বী ওয়াথান'এর উদ্ধৃতি দেন এভাবে:

> "আরবদের মতো বিশ্বের আর কোথাও ব্যভিচারিতার প্রতি এমন ঝোঁক ছিল না, যেমন ছিল না পারস্যের মতো ক্ষমতা, অথবা রোমের মতো ধনসম্পদ, অথবা মিশরের মতো যাদুমন্ত্র। বিশ্বের সকল যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বা লাম্পট্যকে দশ ভাগে ভাগ করা হলে, তার নয় ভাগই বিস্তৃত হত আরবদের মধ্যে, এবং অবশিষ্ট দশম ভাগ বিশ্বের অন্যান্য জাতির জন্য যথেষ্ট।[৫৩]

একইভাবে রোনাল্ড বডলি মক্কার আরবদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেন:

> 'মক্কার এক অনন্যা সুন্দরী বেশ্যার পুত্র ছিলেন আমর ইবনে আল-আস। মক্কার সকল সুপুরুষই তার (সে নারীর) বন্ধু ছিল। অতএব আবু সুফিয়ান থেকে শুরু করে যে কেউই আমরের পিতা হতে পারেন। কেউ কেবলমাত্র এতটুকু নিশ্চিত হতে পারতেন যে, সে নিজেকে ডাকতে পারত আমর ইবনে আবু লাহাব, অথবা আমর ইবনে আল আব্বাস, অথবা আমর ইবনে যে কেউ, কোরাইশদের শীর্ষস্থানীয় দশ ব্যক্তির মধ্যে। তখনকার মক্কার সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে কে তাকে জন্ম দিল সেটা কোন ব্যাপার ছিল না।'[৫৪]

কিছু পাঠক মনে করতে পারেন যে, এটা সম্ভবতঃ সে সময়ের সর্বজনীন রীতি ছিল, কিন্তু তা নয়। বস্তুতঃ ইসলামের নির্যাতন-নিপীড়ণের অনেক শিকার, যেমন পারস্যরা, কোন না কোন পরিস্থিতিতে ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও অলস ও অভব্য আরবদেরকে ঘৃণা করতো। পারস্যরা (ইরানিরা) আজো জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে তাদের দ্বারা ঘৃণিত দ্বিতীয় খলিফা ওমরের মৃত্যুদিবস, কেননা ওমরই সুবিখ্যাত পারস্য সভ্যতাকে বেদুইন আরবদের পায়ের তলায় আনয়ন করেছিলেন। ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আরব-মুসলিমদের দখলকৃত অনেক অগ্রসর সভ্যতার অভিজাত শ্রেণীর তাদের আরব প্রভুদের প্রতি ধারণা ছিল নিতান্তই নিম্নমানের ও অসম্মানজনক। তারা অনেক ইসলামিক আনুষ্ঠানিকতাকে বিদ্রূপ করতো এবং তাৎপর্যহীন সাফল্য বা অবদানের সূত্রে তাদেরকে হীন করতো। বরঞ্চ তারা তাদের নিজস্ব জাতীয় সাফল্য ও অবদানকে মহিমান্বিত করতো। তারা নিজেদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গর্ববোধ করতো, এমনকি তাদের উপর নিষ্ঠুরভাবে চাপিয়ে দেওয়া ইসলামিক প্রথা ও অনুশাসনকে সরিয়ে ইসলামপূর্ব তাদের নিজস্ব সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করতো।

পারস্য, মিশরীয় ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে এরূপ আরব-বিরোধী আন্দোলনের নাম ছিল 'সুবিয়া'। ইসলামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দে আন্দোলনটি জোরদার হয়ে উঠে। এ আন্দোলনের এক বিখ্যাত নায়ক ছিলেন মহান পারস্য জেনারেল খায়দার বিন কাউয়াস বা আফসিন, যিনি উদারপন্থি ও মুক্তচিন্তক আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিমের অধীনে কাজ করতেন। ইসলামিক সাম্রাজ্যের জন্য বড় সামরিক সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও আফসিন আরব সংস্কৃতি ও ইসলাম ধর্মকে ঘৃণা করতেন। তার সম্বন্ধে ইগনাজ গোল্ডজিহার উল্লেখ করেছেন: '*তিনি এত সামান্যই মুসলিম ছিলেন যে, তিনি ইসলামের দুজন প্রচারকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন, যারা একটি পৌত্তলিক ধর্মমন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। তিনি ইসলামি আইনকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন।*' গোল্ডজিহার যোগ করেন, ইসলামের 'হারাম-হালাল' প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা করে তিনি '*শ্বাসরোধ করে মারা পশুর মাংস খেতেন ও এটা বলে অন্যদের তা খেতে প্ররোচিত করতেন যে, ইসলামিক রীতি অনুযায়ী হত্যা করা পশুর মাংসের চেয়ে এ মাংস অনেক বিশুদ্ধ।*' তিনি বিভিন্ন ইসলামি প্রথাকে ব্যঙ্গ করতেন, যেমন সুন্নত দেওয়া। তিনি 'পারস্য সাম্রাজ্য ও শ্বেত ধর্মের পুনরুজ্জীবনের' স্বপ্ন দেখতেন, এবং আরব, মাগরেবি ও তুর্কি মুসলিমদের উপহাস করতেন।[৫৫] ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলাম ত্যাগ করে জরথুষ্টবাদে ফিরে যাওয়ার অভিযোগে জেনারেল আফসিনকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, যেথায় তিনি ৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান।[৫৬]

তাদের নিজস্ব জাতীয় ও ঐতিহাসিক সাফল্যের ব্যাপারে গর্ববোধ করার পাশাপাশি 'সুবিয়া' আন্দোলনের নেতারা আরবদের অনুন্নত বেদুইন সংস্কৃতির দিকে আঙ্গুল তুলে তাকে বন্য, অমার্জিত ও অসভ্য বলে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধা করেনি। তারা দাবি করতো যে, পারস্যদের

---

[৫৩]. Rodinson M (1976) *Muhammad*, trs. Anne Carter, Penguin, Harmondsworth, p. 54
[৫৪]. Bodley RVC (1970) *The Messenger: The Life of Muhammad*, Greenwood Press reprint, p. 73
[৫৫]. Goldziher I (1967) *Muslim Studies*, trs. CR Barber and SM Stern, London, Vol. I, p. 139
[৫৬]. Endress G (1988) *An Introduction to Islam*, trs. C Hillenbrand, Columbia University Press, New York, p. 172

কাছ থেকেই আরবরা আচার-আচরণ ও ভব্যতা শিখেছে। তারা আরবদেরকে তাঁবুবাসী, মেষ পালক, উট চালক, গিরগিট ভক্ষণকারী ও নিয়মকানুনহীন মরুদখলকারী হিসেবে চিত্রিত করতো। ইসমাইল আল-থালিবীর মতে, তারা কোরাইশদের মাঝে প্রচলিত পায়ুকামিতার নিন্দা করতো[৫৭] (এটা ইতিপূর্বে উল্লেখিত আরবদের মাঝে লাগামহীন ও অধঃপতিত যৌনগত ও নৈতিক অবস্থান সমর্থন করে)। আরোপিত আরব সংস্কৃতির উপর স্বদেশী সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রমাণের লক্ষ্যে একই রকম আন্দোলন মিশরীয় কপ্ট, নাবাতিয়ান আরব ও স্বাভাবিকভাবে আরব-বিজিত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই গড়ে উঠে। ফিরুজান (বা আবু লুলু), যিনি আরব হামলাকারীদের দ্বারা পারস্যে সংঘটিত স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিশোধরূপে ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় খলিফা ওমরকে হত্যা করেন, আজও ইরানিরা তাকে পারস্যের এক বীররূপে সম্মান দেখায়।[৫৮]

এ দৃষ্টান্তগুলো যথেষ্ট ধারণা দেয় তৎকালীন আবরদের অনুন্নত সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে, যাদের মধ্য থেকে ঘটেছিল ইসলামের জন্ম ও বিস্তার এবং যাদের সাংস্কৃতিক আদর্শের উপরই রচিত হয়েছিল ইসলামি ধর্মের ভিত। যে ধরণের লাগামহীন নিষ্ঠুরতা, যৌনদাসীত্ব, পায়ুকামিতা ও বিপুলাকার হারেমের (দাসত্ব অধ্যায় দেখুন) সংস্কৃতি মুসলিম দখলদাররা সাথে এনে দূর-দূরান্তে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা তৎকালীন আদিম বেদুইন আরব সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দুর্বলতারই প্রতিফলন।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে: *সেই অসংস্কৃত ও অনুন্নত আরবরা ভারত, পারস্য, মিশর, লেভান্ত ও বাইজেন্টিয়ামের মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলোকে কীভাবে ও কতটা মূল্যবান বস্তু বা অবদান প্রদান করতে কিংবা পুষ্ট করতে পারতো?*

সপ্তম শতাব্দীর আরবরা যৌনাকর্মে লিপ্ততায় ও কবিতায় তাদের বিজিত জনগণের চেয়ে সম্ভবত উপরে ছিল। সমগ্র বিজিত ভূখণ্ডব্যাপী মুসলিম দখলদারদের দ্বারা বিরাট বিরাট হারেম ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যৌনদাসীত্বের প্রবর্তন সুস্পষ্টরূপে তাদের যৌন সংস্কৃতির অনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। কবিতায় ইসলামপূর্ব আরবরা তাদের প্রতিবেশীদের তুলনায় এগিয়ে ছিল। কিন্তু ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে কবি ও কবিতাকে নিন্দা করে (কোরান ২৬:২২৪, বুখারী ৮:১৭৫, মুসলিম ২৮:৫৬০৯)। তদুপরি গ্রিক কবিতা আরব কবিতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল। যদিও মুসলিমরা ভারতকে কবিতা, গজল, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও বিজ্ঞানে উন্নত ও পুষ্ট করার দাবিতে গর্ববোধ করে, অথচ নির্ভেজাল সত্যটি হলো, কবিতা ব্যতীত এগুলোর কোন কিছুতেই আরবদের উৎকর্ষতা ছিল না, এবং ভারতকে দেওয়ার মতো তাদের নিজস্ব সৃষ্ট বা অর্জিত কিছুই ছিল না।

বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আরবরা কিভাবে তথাকথিত উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি বয়ে এনেছিল, সে ব্যাপারে নেহরুর পঞ্চমুখ প্রশংসা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ নিজেরই বিরোধিতা করে দু'পৃষ্ঠা পরেই তিনি লিখেন: '*(আরবরা) শীঘ্রই তাদের* সাদাসিধা *জীবনযাপন পরিত্যাগ করে ও একটা অধিকতর মার্জিত সংস্কৃতি গড়ে তোলে... তাদের মধ্যে বাইজেনটাইন প্রভাব চলে আসে... তারা যখন বাগদাদে আসে, তখন প্রাচীন ইরানের ঐতিহ্য তাদেরকে প্রভাবিত করে।*'[৫৯] নেহরু তার ইচ্ছামতো যেকোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারেন, কিন্তু সাদাসিধা জীবনযাপনকারী আরবরা তাদের গ্রাসকৃত উন্নত সভ্যতাগুলোকে মুল্যবান কিছুই দিতে পারতো না। আরবরা কেবল শিখতে পারতো, অন্যের অর্জনকে জোরদখল করতে পারতো, এবং তারা তাই করেছিল, নেহরুর ভাষায়, বাইজেন্টাইন ও পারস্য সভ্যতা থেকে।

ইসলামে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা নিষেধ

অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মধ্যযুগীয় মুসলিম বিশ্ব উৎকর্ষ সাধন করেছিল, যেমন শিল্প ও স্থাপত্যে, সঙ্গীত ও কবিতায়, বিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জনে। কিন্তু এ চর্চাগুলো ইসলামে সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ এ দুনিয়ার বিলাস-ব্যাসন ও জাঁকজমক মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ করে বলেন: '*আমরা (আল্লাহ) অবশ্যই নির্দিষ্ট করেছি মহান আল্লাহতে অবিশ্বাসকারীদেরকে তাদের ঘরের ছাদ ও আরোহণ করার সিঁড়ি রূপা দিয়ে সাজাতে। এবং তাদের ঘরের দরজা, যেখানে তারা হেলান দিবে সেই আসন ও অন্যান্য স্বর্ণখচিত ভূষণ; ওগুলোর সবকিছুই অর্থহীন এবং ইহজাগতিক জীবনের বিষয় মাত্র। কিন্তু পরকালের চাবিকাঠি রয়েছে কেবল তোমাদের প্রভুর হাতে – তাদের জন্য যারা সুরক্ষা করে (অপকর্মের বিরুদ্ধে)*' (কোরান ৪৩:৩৩-৩৫)। এর অর্থ হলো: এ জগতের জাঁকজমক ও বিলাসিতা কেবল শয়তানের দোসর অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ। মুসলিমরা সতর্কতার সাথে এগুলো পরিহার করে চলবে। মুসলিমরা অবশ্যই খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ থেকে দূরে থাকবে, যেহেতু আল্লাহ বলেন: '*এ জগতের জীবন খেলা ও বিনোদন ছাড়া আর কি? সর্বোত্তম নিবাস হচ্ছে পরকালে, যা নির্ধারিত সঠিক পথধারীদের জন্য। এরপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?*' (কোরান ৬:৩২)

আল্লাহ সুস্পষ্টরূপে স্থাপত্য ও নির্মাণে জাঁকজমক নিষিদ্ধ করেছেন, নিষিদ্ধ করেছেন বিনোদন ও গান বাজনায় (সঙ্গীত, কবিতা ইত্যাদি) লিপ্ত হওয়া। সুতরাং যারা বাদ্যযন্ত্র আইনসঙ্গত মনে করতো নবি মোহাম্মদ সেসব মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন: তারা ধ্বংস হবে এবং উল্লুক ও শুকরে রূপান্তরিত হবে (বুখারী ৭:৪৯৪b)। অপর এক হাদিস অনুযায়ী, মোহাম্মদ আলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন: '*আল্লাহ যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, তেমনি আমি তোমাকে প্রেরণ করছি বীণা ও বাঁশি ভেঙ্গে ফেলার জন্য।*'[৬০] বিশাল অট্টালিকা নির্মাণের ব্যাপারে

৫৭. Al-Thaalibi I (1964) *Lata' if Al-ma' arif. The Book of Curious and Entertaining Information*, ed. CE Bosworth, Edinburgh University Press, p. 25

৫৮. Mohammad-ali E, *Tomb of Firuzan (Abu-Lolo) in Kashan to be Destroyed*, The Circle of Ancient Iranian Studies Website, 28 June 2007; http://www.cais-soas.com/News/2007/June2007/28-06.htm (As noted elsewehere, Muslim sources allege that Abu LuLu assassinated Omar for a dispute over tributes)

৫৯. Nehru (1946), p. 224

৬০. Walker, p. 283

মোহাম্মদ আল্লাহর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে বলেন: *'সত্যিই সবচেয়ে অলাভজনক যে বিষয়টি বিশ্বাসীদের সম্পদ খেয়ে ফেলে তা হলো ইমারত'* এবং *'বিশ্বাসীরা প্রতিটি ব্যয়ের জন্য পুরস্কৃত হবে, কেবলমাত্র ইমারত নির্মাণের ব্যয় ছাড়া'* ।[৬১] মদীনায় একটা শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও নবি নিজে জমকালো কোন ভবন নির্মাণে সচেষ্ট হননি। ইসলামের প্রথম যুগে যে দু'টো মসজিদ তিনি নির্মাণ করেছিলেন – একটা কোবায় ও অপরটি মদীনায় 'নবির মসজিদ' – তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এগুলোর কাঠামো সাদামাটা ছিল। মদীনায় তাঁর ভাঙ্গাচোরা মসজিদটির ছাদ দিয়ে বৃষ্টি পড়তো। তাঁর সাহাবিরা মেরামতের কথা বললে তিনি উত্তর করেন: *'না, একটা মসজিদ সাদাসিধা ও আধিক্য বর্জিত হওয়া উচিৎ, যেন একটা বুথ বা চালাঘর, ঠিক নবি মুসার চালাঘরের মতো।'*[৬২]

আল্লাহ সৃজনশীলতা বা বুদ্ধিমত্তা চর্চা – যেমন বিজ্ঞানে, দর্শনে ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানার্জনে – ইত্যাদির পক্ষপাতীও নন। নবি মোহাম্মদ ছিলেন অশিক্ষিত এবং আল্লাহ গর্বের সাথেই নবির এ গুণের বা নিরক্ষরতার মহিমা কীর্তন করেছেন: *'যারা বার্তাবাহককে অনুসরণ করবে, সে নবিকে যিনি না জানেন পড়তে না লিখতে, যাঁকে তোমরা তাউরাত ও গস্পেলের বর্ণনায় খুঁজে পাবে'* (কোরান ৭:১৫৭)। আল্লাহ অধিকন্তু মুসলিমদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন অনুসন্ধিৎসু হওয়ার বিরুদ্ধে এবং বিশ্ব সম্বন্ধে সৃজনশীল প্রশ্ন করার বিরুদ্ধে: *'হে বিশ্বাসীরা! সে বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরো না, যা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে, ...তোমাদের পূর্বে কিছু লোক এমন প্রশ্ন করেছিল, এবং সেকারণে তারা বিশ্বাস হারায়'* (কোরান ৫:১০১-০২)। বুঝা যায় যে, নবিকে তাঁর সাহাবারা বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা সৃজনশীল প্রশ্নে বিদ্ধ করতেন, যার উত্তর দিতে তিনি অপারগ ছিলেন। সুতরাং নবি তাঁর সেসব ভক্তদেরকে সৃজনশীল প্রশ্ন করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী দিয়ে আল্লাহ যা নির্দেশ করেছেন তা অন্ধভাবে অনুসরণের পরামর্শ দেন: *'আল্লাহর নবি বলেন, 'তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'কে এটা, কে ওটা সৃষ্টি করেছে?' এবং অবশেষে বলে, 'কে তোমাদের প্রভুকে সৃষ্টি করেছে?' সুতরাং যখন শয়তান তাকে এরূপ প্রশ্নে অনুপ্রাণিত করে, তখন তার আল্লাহর আশ্রয়-প্রার্থী হওয়া উচিত এবং ওসব চিন্তা পরিত্যাগ করা উচিত'* (বুখারী ৪:৪৯০৬; মুসলিম ১:২৪২-৪৩)। নবি মোহাম্মদ মদীনায় তাঁর শাসনকালে নিজে বিজ্ঞান, শিল্পকলা, স্থাপত্য বা অন্যান্য সৃজনশীল জ্ঞানের প্রসারে কোনোই উদ্যোগ নেন নি।

কোরানে সুরক্ষিত ইসলামের ঐশীবাণীকে ধার্মিক মুসলিমরা সর্বজ্ঞ স্রষ্টা কর্তৃক সরাসরি প্রকাশিত বিশ্বের সকল জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ এনসাইক্লোপেডিয়া বা ভাণ্ডার বলে বিশ্বাস করে এসেছে। কোরানের ৩:১৬৪ নং আয়াত বলে: *'আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপর মহত্তম আনুকূল্য বর্ষণ করেছেন। তিনি তাদের মধ্য থেকেই নবি প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের জন্য আল্লাহর নিদের্শনা (জ্ঞান) ঘোষণা করেন বা পাঠ করে শোনান, এবং তাদেরকে ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান-গরিমায় দীক্ষা দেন; এর আগে তারা ছিল স্পষ্টতঃ ভুল পথে।'* অর্থাৎ কোরানের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতির কাছে তাঁর প্রকৃত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নির্দেশনার ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন; ইসলামের আবির্ভাবের আগে মানুষ যা জানতো বা করতো, তা ছিল সুস্পষ্টরূপে ভ্রান্ত। আল্লাহ দাবি করেন যে, তাঁর জ্ঞানকোষ কোরান থেকে প্রাকৃতিক বিশ্বের কোনো জ্ঞান বা নির্দেশনাই বাদ পড়েনি: *'পৃথিবীতে জীবনধারণকারী এমন কোনো জীব নেই বা পাখায় ভর করে উড়ন্ত প্রাণী নেই, যারা তোমাদের মত সম্প্রদায় গঠন করে না। আমরা তার কিছুই এ গ্রন্থ থেকে বাদ দেইনি'* (কোরান ৬:৩৮)। আল্লাহ জোর দিয়ে বলেন যে, কোরান মিথ্যে বা জাল করা কোন গ্রন্থ নয়, বরং তাঁর সত্যিকার নির্দেশনা ও প্রাজ্ঞতা, যাতে আগে যা ছিল ও পরে আসবে এমন সমস্ত জ্ঞান ধারণকৃত এবং তা স্বর্গ থেকে বর্ষিত হয়েছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহ। আল্লাহ বলেন: *'তাদের ইতিহাস বা কাহিনীতে নিশ্চয়ই জ্ঞানী লোকদের জানার বা শিখার অনেক কিছু রয়েছে। এটা এমন কোনো বর্ণনামূলক গ্রন্থ নয়, যা বানানো বা জাল করা যেতে পারে, বরং এটা পূর্বে যা ছিল তার সত্যায়ন ও সমস্ত বিষয়ের একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, এবং বিশ্বাসীদের জন্য একটা পথ-নির্দেশনা ও অনুগ্রহ'* (কোরান ১২:১১১)।

সুতরাং ধার্মিক মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, কোরানে ধারণকৃত জ্ঞান ও নির্দেশিকাই হলো সবকিছু, যা এ জগতে সুষ্ঠু জীবনযাপণের জন্য মানুষের প্রয়োজন। কেবলমাত্র কোরানের উপদেশ ও নিষেধ নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে যে কেউ স্বর্গের মঙ্গলময় অনন্তকালীন জীবন লাভ করতে পারে, যা এ জগতে প্রতিটি মুসলিমের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অধ্যাপক উমরউদ্দিন লিখেছেন: *'মুসলিমরা শুরুতেই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আগের সমস্ত চিন্তাধারা বাতিল হয়ে গেছে। কোরান মানবজাতির জন্য একমাত্র সত্য নির্দেশিকারূপে বিবেচিত, যা ইহজগত ও পরজগতের সফলতার প্রতিশ্রুতি দেয়।'*[৬৩] একইভাবে ড. আলি ইসা ওসমান দাবি করেন: *'কোরান হলো মুসলিমদের চিন্তা-চেতনার উজ্জীবক ও জ্ঞান-গরিমার সমাপ্তি।'*[৬৪] এ প্রেক্ষাপটে আব্বাসীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীস, ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ আরবি বা ফারসিতে অনুবাদ করে যখন মুসলিমদের বোধগম্য করা হয়, তখন তারা হতবাক হয়ে যায় এটা ভেবে যে, ইসলামের পূর্বেও মানবজাতির কাছে এমন বিশাল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভাণ্ডারের কথা জানা ছিল। ইসলাম যেহেতু ইসলামপূর্ব ওসব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেটা নিশ্চিত করতে, কথিত আছে যে, কোনো কোনো খলিফা আরবিতে অনুবাদের পর গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার মূল পাণ্ডুলিপিগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। ইসলামপূর্ব মূল পাণ্ডুলিপি নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রমাণ ধ্বংস করা, যাতে কালক্রমে এগুলো ইসলামিক যুগের সৃষ্ট ও বৈধ বলে পরিচিতি পায়। এর ফলে প্রাচীন লেখায় বা ইতিহাসে উল্লেখিত বহু গ্রিক ও ল্যাটিন জ্ঞানভাণ্ডারের মূল গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি এখন কেবল টিকে আছে আরবি ভাষায়।[৬৫]

---

[৬১]. Hughes TP (1998) *Dictionary of Islam*, Adam Publishers and Distributors, New Delhi, p. 178
[৬২]. Walker, p. 271
[৬৩]. Umaruddin, p. 42
[৬৪]. Waddy C (1976) *The Muslim Mind*, Longman Group Ltd., London, p. 15
[৬৫]. Walker, p. 289

অতএব প্রাথমিককালের মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও বস্তুগত অর্জনের প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ তো ছিলই না, বরং ছিল ঘৃণা। স্বভাবতই মুসলিম-বিজিত ভূখণ্ডগুলোতে এরূপ প্রয়াসের ক্ষেত্রেগুলো তাদের দ্বারা অবহেলিত ও পতনমুখী হয়। শিল্পকলা, কবিতা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও স্থাপত্য প্রভৃতির প্রতি ইসলামের ঘৃণা বা অবজ্ঞা ওসব ক্ষেত্রে বা প্রয়াসে হানিকর প্রভাব ফেলে, যে সম্পর্কে আলফ্রেড গিলোম বলেন: এসব প্রয়াসে ইসলামের ঐতিহ্য '*কম মূল্যবান প্রতিপন্ন হয়, বিশেষত যেখানে ধর্ম সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব ফেলে।*'[৬৬] আলবেরুণী তার নিজের চোখে দেখা ভারতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের উপর ইসলামের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন: '*আমাদের দ্বারা বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে হিন্দু বিজ্ঞান অনেক দূরে আশ্রয় নিয়েছে, এবং পালিয়ে গেছে সেসব স্থানে, যেখানে আমাদের হস্ত এখনো পৌঁছুতে পারে নি – যেমন কাশ্মীর, বেনারস ও অন্যান্য স্থানে।*'[৬৭] ভারতে মুসলিম দখলকারীদের অবদান সম্পর্কে রিজওয়ান সেলিম লিখেছেন:

> সভ্যতার নিচু স্তরের ও মূলত সংস্কৃতিহীন অসভ্যরা আরব ও পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রাথমিক শতাব্দিগুলো থেকেই ভারতে অনুপ্রবেশ শুরু করে। ইসলামি দখলকারীরা অসংখ্য হিন্দু মন্দির বিধ্বস্ত করেছে, অগণিত ভাস্কর্য ও মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে, হিন্দু রাজাদের অগণিত স্থান ও দূর্গ লুণ্ঠন করেছে, বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে হত্যা করে হিন্দু নারীদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এ কাহিনী শিক্ষিত ও অগণিত অশিক্ষিত লোকেরাও ভালভাবেই জানে। ইতিহাস গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু অনেক ভারতীয় হয়তো স্বীকার করবে না যে, বিদেশী মুসলিম লুণ্ঠনকারীরা বিশ্বের সবচেয়ে মননশীলভাবে অগ্রসর সভ্যতার ঐতিহাসিক বিবর্তন ধ্বংস করে দেয়, সে সাথে সবচেয়ে সমৃদ্ধকল্প সংস্কৃতি ও সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল সমাজ।[৬৮]

ইসলাম সমতাবাদী নাকি বর্ণবাদী?

ইসলামি ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা ও উপলব্ধি ছাড়াই বিশ্বে সামাজিক সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা আনয়নে ইসলামের উপর অত্যাধিক কৃতিত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতা সম্বন্ধে হাশমী ও রীড-এর দাবি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। নেহরু বলেন: ইসলাম '*গণতন্ত্র ও সমতার একটা সুগন্ধ আনয়ন করে*', যা আরব ও প্রতিবেশী জাতিগুলোর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৬৯] ইসলামের সমতাবাদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সম্মানিত ইসলামি ইতিহাসবিদ বার্নার্ড লুইস দাবি করেন:[৭০]

> এ দাবিটিতে যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে... ইসলামিক বিধান বাস্তবিকই সমতার একটা বার্তা বয়ে আনে। ইসলাম শুধু ওসব সামাজিক পৃথকীকরণকে (বর্ণবাদ, শ্রেণীপ্রথা প্রভৃতি) অসমর্থনই করে না, ইসলাম সেগুলোকে সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। নবির কার্যকলাপ ও উক্তি, প্রচলিত প্রথায় সংরক্ষিত প্রাথমিক যুগের শাসকদের সম্মানজনক নজির ইত্যাদি প্রতীয়মান করে যে, ইসলাম জন্ম, মর্যাদা, ধনসম্পদ, এমনকি ধার্মিকতা ও মেধার দ্বারাও আনুকূল্য প্রাপ্তির সম্পূর্ণরূপে বিরোধী।

লুইস আরো বলেন, এসব মৌলিক নীতির বিচ্যুতি ছিল অনৈসলামিক, প্রকৃতপক্ষে, ইসলামবিরোধী উদ্ভাবন। অথচ তিনি শিঘ্রই স্বীকার করেন যে, ইসলামে ক্রীতদাস, অবিশ্বাসী ও নারীদের মর্যাদাহীনতা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ দ্বারা অনুমোদিত, যা ইসলামের সমগ্র ইতিহাসে প্রশ্নাতীতভাবে অটুট থাকে।[৭১]

যাহোক এটা বিজ্ঞজনোচিত দাবি নয় যে, ইসলাম গোষ্ঠী, বর্ণ বা জাতীয়তা নির্বিশেষে সকল মানুষের – আরব বা অনারব, কালো বা সাদা – সবার জন্য সমতা এনেছে। কোরানে ধারনকৃত স্বর্গীয় বাণীতেই ইসলাম একটা বর্ণবাদী ও আরব প্রাধান্যবাদী ধর্ম হিসেবে নির্ণীত। আল্লাহ তাঁর পছন্দের জাতিরূপে আরবদেরকে মানবজাতির মাঝে সেরারূপে মহিমান্বিত করেছেন, যাদেরকে তিনি বিশ্বের সকল মানুষের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ও প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করবেন। এটা অনেকটা ইসরাইলিদের মতো, যারা ঈশ্বরের পছন্দকৃত মানুষ, তবে তাদের প্রভাবের বিস্তৃতি কেবলমাত্র ইসরাইলি ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ দাবি করেন, হেজাজের আরবরা বিশ্বের সকল মানুষ ও জাতির মধ্যে সেরা: '*তোমরা মানবজাতির জন্য উদ্ভূত সকল মানুষের সেরা; (কেননা) তোমরা সঠিককে গ্রহণ করো, মিথ্যাকে পরিহার করো, এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো*' (কোরান ৩:১১০)। মোহাম্মদের প্রথম যুগের জীবনীকার ইবনে সাদের মতে, নবিও একই দাবি করে বলেছিলেন:

> 'আল্লাহ পৃথিবীকে দুভাগে বিভক্ত করে আমাকে উৎকৃষ্ট অর্ধাংশে স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সে অর্ধাংশকে তিন অংশে ভাগ করেন এবং আমি তাদের মধ্যে সেরাটিতে ছিলাম। অতঃপর তিনি জনগণের মধ্য থেকে আরবদেরকে বাছাই করেন। অতঃপর তিনি আরবদের মধ্য থেকে কোরাইশদেরকে বাছাই করেন। অতঃপর তিনি বানু হাশিমের মধ্য থেকে আবদ আল-মুত্তালিবের সন্তানদেরকে বাছাই করেন। অতঃপর তিনি আবদ আল-মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্য থেকে আমাকে বেছে নেন (নবি বানানোর জন্য)।'[৭২]

বস্তুত আল্লাহ ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যে, ইসলাম হবে একান্তই আরবদের জন্য একটি ধর্ম, যাদের কাছে ইতিপূর্বে কোন ঐশী বার্তা প্রেরিত হয়নি। সুতরাং আল্লাহ বলেন: '*অথবা তারা কি বলে, তিনি (মোহাম্মদ) এটা বানিয়ে বলছেন?' না, এটা তোমার প্রভুর সত্য পথ-নির্দেশনা,*

---

৬৬. Amold T and Guillaume A eds., (1965) *The Legacies of Islam*, Oxford University Press, p. V
৬৭. Lal (1999), p. 20
৬৮. Salim R, *What the invaders really did*, Hindustan Times, 28 December 1997
৬৯. Nehru (1989), p. 145
৭০. Lewis (2002), p. 91
৭১. Ibid, p. 91-92
৭২. Ibn Sa'd AAM (1972) *Kitab al-Tabaqat*, Trans. S. Moniul Haq, Kitab Bhavan, New Delhi, Vol. I, p. 2

*যাতে তুমি আরবের জনগণকে উপদেশ দিতে পার, **যাদের কাছে তোমার আগে কোন সতর্ককারী বার্তাবাহক আসেনি**: এ জন্য যে, তারা পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে'* (কোরান ৩২:৩)।

এক হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ মোহাম্মদের কোরাইশ গোত্রকে ইসলামের ব্যানারে বিশ্ব পরিচালনার জন্য বেছে নেন: '*আলাহর নবি বলেন, কোরাইশদের হাতেই শাসনের কর্তৃত্ব থাকবে ও যে ব্যক্তি তার শত্রুতা বা বিরোধিতা করবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন, যতদিন পর্যন্ত তারা ধর্মীয় আইন না মানবে*' (বুখারী ৪:৫৬:৭০৪)।

সুতরাং আল্লাহ সুস্পষ্টরূপেই ইসলামকে আরব প্রাধান্য বা প্রভুত্বকারী ধর্ম হিসেবে রচনা বা পেশ করেন, অথচ এর সম্পূর্ণ বিপরীতে অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত ইসলামকে সমতাবাদী ধর্ম বলে দাবি বা ধারণা করেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের ঈশ্বর একজন শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্যবাদী, অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী, বর্ণবাদী – যিনি শেষবিচারের দিন দণ্ডপ্রাপ্ত অবিশ্বাসীদেরকে নিগ্রোদের মতো কৃষ্ণাঙ্গে রূপান্তরিত করবেন:

১. 'বিচারের দিন তোমরা দেখবে: যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে, তাদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যাবে।' (কোরান ৩৯:৬০)
২. 'সেদিন কিছু মুখ সাদা ও কিছু কালো হবে: যাদের মুখমণ্ডল কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে '*তোমরা কি ধর্ম গ্রহণের পর তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে? এখন সে প্রত্যাখ্যানের ফল ভোগ করো।*' কিন্তু যাদের মুখমন্ডল সাদা হবে, তারা হবে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত।' (কোরান ৩:১০৬-০৭)
৩. 'যারা ভাল কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে ভাল পুরস্কার বা তারও অধিক, এবং কৃষ্ণবর্ণ বা কলঙ্ক তাদের মুখ ঢেকে দিবে না। এবং যারা অপকর্ম করেছে... আল্লাহর হাত থেকে রক্ষার জন্য তাদের কেউ থাকবে না। তাদের মুখমণ্ডল যেন রাতের ঘনকালো অন্ধকারে ঢেকে যাবে।' (কোরান ১০:২৬-২৭)

ইসলামের আরব-শ্রেষ্ঠত্ববাদ ও কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী বর্ণবাদ কেবলমাত্র অলসভাবে বসে থাকার জন্য এক স্বর্গীয় নির্দেশ ছিল না, বরং ইসলামের প্রাথমিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত তা এক জীবন্ত বাস্তবতা হয়ে রয়েছে। এখনো মধ্যপ্রাচ্যের আরবরা বাংলাদেশ বা আফ্রিকার মতো গরিব দেশের মুসলিম সহধর্মী ভাইদের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক ও মর্যাদাহানিকর আচরণ করে। কোরানের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সুখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ইগনাজ গোল্ডজিহারও মনে করেন যে, ইসলাম ঈশ্বরের সমীপে সমস্ত মুসলিমদের মাঝে দ্ব্যর্থহীন সমতার শিক্ষা দেয়। অতএব আরবদের দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের তথাকথিত সকলের-জন্য-সমতা নীতিটির সতত উপেক্ষায় বা ভঙ্গনে অযথাই ব্যথিত হয়ে গোল্ডজিহার লিখেন: '*ইসলামে সকল মানুষের জন্য সমতা শিক্ষাটি মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন অকার্যকর থেকে যায়, যা আরবদের চেতনায় কখনোই উপলব্ধ হয়নি, এবং তাদের দৈনন্দিন আচরণে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।*'[৭৩]

আরব-মুসলিমরা আরবাঞ্চলের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে বিপুল ভূখণ্ড বিজয়ের পর তারা কখনোই ধর্মান্তরিত অনারব মুসলিমদেরকে সমতা দেয়নি। তারা ছিল শাসক শ্রেণীর প্রভু; অবশিষ্ট মুসলিমরা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। অবশ্য আল্লাহর বিধানমতে এটাই হওয়ার কথা। আরবরা অনারব ধর্মান্তরিতদের সাথে মর্যাদাহানিকর আচরণ করেছে এবং আগা-গোড়া তাদের উপর '*বিভিন্ন আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য অক্ষমতা*' আরোপ করেছে।[৭৪] আরবরা বরাবর তাদের অনারব মুসলিম ভাইদের প্রতি বর্ণবাদী নীতি কার্যকর করেছে। 'ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম' উল্লেখ করে:[৭৫]

> আরবরা তাদেরকে (অনারব মুসলিমদেরকে) পদাতিক যোদ্ধা হিসেবে ব্যবহার করতো। তারা তাদেরকে লুণ্ঠনের মালামালের ভাগ থেকে বঞ্চিত করতো।[৭৬] তারা তাদের সঙ্গে রাস্তার একই ধার দিয়ে চলতো না, কিংবা এক সঙ্গে খেতে বসতো না। প্রায় প্রতিটি স্থানে তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য পৃথক শিবির বা বাসস্থান ও পৃথক মসজিদ নির্মাণ করা হতো। তাদের সঙ্গে আরবদের বিবাহকে অপরাধ গণ্য করা হতো।

নিঃসন্দেহে আরবদের, বিশেষত মোহাম্মদের গোত্র কোরাইশদের, দ্বারা শাসিত একটি বিশ্ব-পর্যায়ের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্যই ইসলাম জন্মলাভ করেছিল। সুতরাং ইতিহাসব্যাপী মুসলিম বাদশাহ বা সুলতানদের মাঝে (হোক সে অনারব) আরবদের, বিশেষত কোরাইশ গোত্রের, সাথে বংশগত যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা একটা ফ্যাশন বা রীতি হয়ে উঠে, যা বস্তুত শাসক হিসেবে তাদের বৈধতার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি সময়ে বাহাওয়ালপুরের (সিন্ধু) কালো চামড়াধারী নবাব – যার উজ্জ্বল বর্ণের বা সাদা চর্মধারী সন্তান লাভের জন্য শ্বেতকায় নারীর প্রতি খায়েশ ছিল, দৃঢ়তার সাথে কোরাইশ গোত্রের আব্বাসীয়দের সাথে তার বংশগত যোগসূত্র দাবি করেন। কিন্তু 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম'-এর সর্বশেষ সংস্করণটি সে দাবিটি সুস্পষ্টরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে।[৭৭] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মঙ্গোলীয় চেহারার সুলু সুলতানাতের শাসকরা ক্ষমতার বৈধতা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তাদের ইসলামিত্ব জোরদার করতে নিজেদেরকে নবি মোহাম্মদের অধঃস্তন বংশধর বলে দাবি করতেন। ঐতিহাসিকভাবে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শাসকরা স্বভাবত নিজেদেরকে আরবীয় বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতেন। খ্যাতনামা মরক্কোর সুলতান মোউলে ইসমাইল (মৃত্যু ১৭২৭) নিজেকে নবির অধঃস্তন বংশধর বলে দাবি করেন। পারস্যে সাফাভি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাইল (১৫০২-২৪ খ্রিঃ) একজন তুর্কি ও পারস্য সংস্কৃতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে মোহাম্মদের অধঃস্তন বংশধর দাবি করেছিলেন। গোটা ইতিহাসব্যাপী মুসলিম শাসকদের মাঝে এমন দাবি প্রায় সর্বজনীন। এখনো উত্তর আফ্রিকার অনেক স্থানে আরবরাই শাসনকর্তা; যেমন সুদান ও মরক্কো এখনো তারাই শাসন করছে।

---

৭৩. Goldziher, p. 98
৭৪. Lewis B (1966) *The Arabs in History*, Oxford University Press, New York, p. 38
৭৫. Ibn Warraq, p. 202
৭৬. Examples of these treatments will be found in the chapter on Slavery.
৭৭. Naipaul (1998), p. 329-31

উপরোল্লেখিত বর্ণনায় আল্লাহ নিঃসন্দেহে জাতিসমূহের মধ্যে কালো মানুষদের সবচেয়ে কম পছন্দ করেন। সে অনুসারে কৃষ্ণাঙ্গরা আরব দখলদার ও শাসকদের হাতে সবচেয়ে খারাপ আচরণ ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে। আরবরা আফ্রিকাকে ক্রীতদাস শিকার ও উৎপাদনের ক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে (৭ম অধ্যায় দেখুন), যে দুর্ভাগ্য আজো তাদেরকে কোনো না কোনোরূপে পিছনে তাড়া করে ফিরছে, যেমন সুদানে (দেখুন অধ্যায় ৭; সেকশন: 'সুদানে ক্রীতদাস প্রথার পুনরাগমণ')। ইসলামের উষালগ্ন থেকে আরবি ভাষার অনেক বিখ্যাত কবি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, যারা আরবদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বর্ণবাদী ও অবমাননাকর আচরণ ও দুর্ভোগের কথা তাদের কবিতায় বিলাপের সাথে প্রকাশ করেছেন বারংবার: যেমন '*আমি কালো কিন্তু আমার আত্মা শুভ্র*', অথবা '*আমি যদি সাদা হতাম, মেয়েরা আমাকে ভালবাসতো*' ইত্যাদি। লুইস উল্লেখ করেন যে, আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ইসলামপূর্ব আরবে বর্ণবাদ মূলত অনুপস্থিত ছিল। এর সাথে যোগ করে তিনি লিখেন:

> ইসলামি বিধান একে (বর্ণবাদকে) উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, এমনকি জাতিগত ও সামাজিক ঔদ্ধত্যের সর্বজনীন প্রবণতাকেও নিন্দা করে এবং ঘোষণা করে আল্লাহর সামনে সকল মুসলিমের সমতা। তথাপি বিভিন্ন রচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, একটা নতুন এবং কখনো কখনো সাংঘাতিক রকমের সামাজিক বৈরীতা ও বৈষম্যের উদ্ভব ঘটে ইসলামি বিশ্বে।'[৭৮]

আরব শ্রেষ্ঠত্ববাদ ও কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী বর্ণবাদের বিধান যে খোদ ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের মধ্যেই নিহিত সে সম্পর্কে লুইস স্পষ্টতই জ্ঞাত নন। বর্ণবাদের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে এবং আজো যা ঘটছে (বর্তমানে বিশ্বে আরবরাই সবচেয়ে বর্ণবাদী), তা ইসলামের ঈশ্বর দ্ব্যর্থহীনভাবে কামনা করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে ইসলামের জন্মকালে সব সমাজেই কোন না কোন রকম সামাজিক বিভেদ বিদ্যমান ছিল। ইসলাম – যা তৎকালীন অনুন্নত আরব সমাজের প্রচলিত ধারণা, ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধসমূহ অঙ্গীভূত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল – তা ভারতের মতো অগ্রসর সভ্যতাকে উচ্চ সংস্কৃতি ও সামাজিক সমতার মতো বিষয়ে সামান্যই প্রদান করতে পারতো, কিংবা আদৌ পারতো না, যদিও তাজ হাশমী আমাদেরকে তার বিপরীত বিশ্বাস করাতে চান। লাগামহীন ক্রীতদাসত্ব (যৌনদাসীত্বসহ), বিশাল বিশাল হারেম, অমুসলিম প্রজাদের উপর ভয়াবহ সামাজিক মর্যাদাহানি ও অবমাননা এবং চরম অর্থনৈতিক শোষণ – এগুলোই ছিল ভারতে ইসলামি শাসনের তথাকথিত উৎকর্ষের চিহ্ন, যার সাথে উচ্চ সংস্কৃতি ও সামাজিক সমতাবাদের মত ধারণার ন্যূনতম সাদৃশ্য নেই, বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রিটিশদের মতো মুসলিম শাসকরা কখনো ভারতের কোনো সামাজিক ব্যাধির মূলোৎপাটন করার উদ্যোগ নেন নি – যেমন সতীদাহ ও বর্ণপ্রথা – যা মুসলিমপূর্ব সময় থেকে ভারতকে আক্রান্ত করে এসেছে। বস্তুত সেসব সামাজিক ব্যাধির কিছু কিছু মুসলিম শাসনামলে আরো প্রকট হয় (পরবর্তী অধ্যায় দেখুন)।

বারংবার দাবিকৃত ও যথেষ্ট গৃহীত, অথচ ভিত্তিহীন, দাবি যে ইসলাম ভারতে উচ্চ সংস্কৃতি, মানবিক ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সমতা আনয়ন করেছিল, সে বিষয়ে আনোয়ার শেখ লিখেছেন:[৭৯]

> ইসলাম অনারব মুসলিমদের জাতীয় মর্যাদা ও সম্মানে অধিকতর ক্ষতি সাধন করেছিল অন্য যে কোন বিপর্যয়ের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার তুলনায়; তথাপি তারা বিশ্বাস করে এ ধর্ম (১) সমতা এবং (২) মানবিক ভালবাসার দূত। এটা একটা কল্পচিত্র মাত্র, যাকে অসাধারণ দক্ষতার সাথে সত্যরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত নবি মোহাম্মদ মানবতাকে দুই অংশে বিভক্ত করেন – আরব ও অনারব। এ শ্রেণীকরণ অনুযায়ী আরবরা হচ্ছে শাসক, আর অনারবরা হবে শাসিত আরব সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনে। মানবজাতির প্রতি ইসলামের ভালবাসাও আরেকটা বড় রকমের মায়াজাল। অমুসলিমদেরকে ঘৃণা হলো ইসলামের অস্তিত্বের চাবিকাঠি। এটা শুধু সমস্ত ভিন্নমতাবলম্বীদেরকে নরকবাসী হিসেবেই ঘোষণা করে না, মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে চিরস্থায়ী উত্তেজনার আগুনও উস্কে দেয়।

ইসলাম কর্তৃক সমতাবাদী বৌদ্ধধর্মের মূলোৎপাটন

ইসলামের বিস্তারকালে স্পষ্টতই ইসলামের চেয়েও অধিক শান্তিপূর্ণ, অহিংস ও সমতাবাদী প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বৌদ্ধবাদ মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত ছিল। এ সময় ভারতের কোনো কোনো অংশেও (যেমন বাংলা, সিন্ধু প্রভৃতি) তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল। ইসলাম যেখানেই গেছে, সেখানেই বৌদ্ধধর্মকে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে নির্মূল করেছে; আলবেরুনীও তা উল্লেখ করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১২০৩ সালে বিহারে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বৌদ্ধদেরকে নির্মূল করা সম্বন্ধে বর্ণনায় ইবনে আসির উল্লেখ করেন:[৮০] '*শত্রুর অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী অত্যন্ত তেজ ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে দুর্গের প্রবেশ পথে চলে যায় ও সে স্থান দখল করে। বিজয়ীদের হাতে বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠনের মালামাল চলে আসে। সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণ (আসলে বৌদ্ধ ভিক্ষু)। তাদেরকে হত্যা করা হয়।*' ইবনে আসির আরো লিখেন: '*যখন তিনি (বখতিয়ার) বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেন, সেখানে বিপুল সংখ্যক পুস্তক দেখতে পান।*' কিন্তু সেখানে হত্যাকান্ড এতটাই ব্যাপক ছিল যে, ইসলামি বাহিনী যখন বইগুলোর বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করে, তখন তা বলার জন্য কাউকে খুঁজে পায় নি। কারণ '*স্থানীয় সমস্ত লোককেই হত্যা করা হয়েছিল।*'[৮১] প্রকৃতপক্ষে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়

---

[৭৮]. Lewis (1966), p. 36

[৭৯]. Shaikh A (1995) *Islam: The Arab National Movement*, The Principality Publishers, Cardiff, Preface

[৮০]. In the attack of Bihar, Bakhtiyar had two brave brothers, Nizamuddin and Shamsuddin, in his army. Author Ibn Asir had met Shamsuddin at Lakhnauti in 1243.

[৮১]. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 306

তলার একটি বিশাল পাঠাগার ছিল। বখতিয়ার যখন নিশ্চিত হন যে, সেখানে কোরানের কোন কপি নেই, তখন তিনি গোটা পাঠাগারটিকে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলেন।

হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ ও স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রধান রচয়িতা ডঃ বি. আর. আম্বেদকার ১৯৪০-এর দশকে মুসলিমদের পক্ষ নেন তাদের পাকিস্তান সৃষ্টির লড়াইয়ে। তিন একে তাদের বৈধ অধিকার বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। অথচ ভারতে বৌদ্ধদের উপর ইসলামি আক্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি (আম্বেদকার) লিখেন, *'নিঃসন্দেহে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটে।'* ভারতে ও অন্যত্র ইসলামের মূর্তি ধ্বংসের মিশন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

> ইসলাম এসেছিল 'বুত'-এর শত্রু হিসেবে। 'বুত' শব্দের অর্থ প্রত্যেকেরই জানা। এটা একটা আরবি শব্দ যার অর্থ মূর্তি। অতএব এ শব্দের উৎপত্তি ইঙ্গিত করে যে, মুসলিমদের মনে মূর্তিপূজা বলতে বৌদ্ধধর্মকে চিহ্নিত করেছিল। মুসলিমদের কাছে ছিল এগুলো এক ও অভিন্ন বস্তু। এরূপে মূর্তি ভাঙ্গার মিশন অবশেষে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের মিশনে পরিণত হয়। ইসলাম শুধু ভারতের বৌদ্ধবাদকেই ধ্বংস করেনি, তারা যেখানেই গেছে সেখানেই তা করেছে। ইসলামের জন্ম হওয়ার আগে বৌদ্ধবাদ বকত্রিয়া, পার্থিয়া, আফগানিস্তান, গ্যান্ধার (কান্দাহার) ও চীনা তুর্কিস্তানের ধর্ম ছিল, যেন এটা ছিল গোটা এশিয়ারই ধর্ম।

আম্বেদকার জানান যে, ইসলাম শুধু বৌদ্ধধর্মের উপর আঘাতই হানেনি, এ অঞ্চলের বৌদ্ধ জ্ঞান-কেন্দ্রগুলোকেও ধ্বংস করেছিল। তিনি লিখেছেন: *'মুসলমান হানাদাররা নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগদ্দালা, ওদান্তাপুরীসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লুণ্ঠন ও ধ্বংসসাধন করে। কিভাবে মুসলিম দখলদারদের তরবারির আঘাতে বৌদ্ধ পুরোহিতরা নির্মূল হয়, তা মুসলিম ঐতিহাসিকরাই লিখে রেখে গেছেন।'* ভারতে বৌদ্ধধর্মের উপর ইসলামের সর্বনাশা আঘাত বর্ণনা করতে গিয়ে আম্বেদকার লিখেছেন: *'এমনই ছিল ইসলামি হানাদার কর্তৃক বৌদ্ধ পুরোহিতদের গণহারে হত্যা। একেবারে শিকড়ে কুঠার চালনা করা হয়েছিল। কেননা, বৌদ্ধ পুরোহিতদেরকে হত্যার মাধ্যমে ইসলাম বৌদ্ধধর্মকেও হত্যা করে। এটাই ছিল ভারতে বৌদ্ধধর্মের উপর নেমে আসা সবচেয়ে বড় বিপর্যয়।'*[৮২]

অধিকন্তু, মুসলিম শাসকরা নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে আচরণে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মতোই শ্রেণী-বৈষম্য মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তারা কখনোই তাদের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে নিচু শ্রেণীর হিন্দুদেরকে ক্ষমতায়িত করতে চাননি। মুসলিম শাসকরা যখন সেনাবাহিনীতে কিংবা অন্যান্য চাকরিতে কিছু হিন্দুকে নিয়োগ শুরু করেন, বিশেষত মুঘল আমলে, তারা সবসময় উচ্চবর্ণের রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের দিকে নজর দিতেন। আর নিম্নশ্রেণীর নিপীড়িত হিন্দু ও শিখরা উঠাতো বিদ্রোহের ধ্বজা। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেব ১৬৯০ সালে নিম্নগোত্রের জাট বিদ্রোহীদের নির্মূল করার জন্য রাজপুত সেনাদের দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী সিনসানীতে পাঠান; এতে ১,৫০০ জাট বিদ্রোহী নিহত হয়েছিল।

ইসলাম ভারতে আমির খসরু, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মঈনুদ্দিন চিশতীর মতো বিশিষ্ট সুফিদের আনার ব্যাপারে হামশীর দাবি সম্পর্কে বলতে হয়, যদি মুসলিম শাসকরা এরিস্টটল, আইজাক নিউটন, আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো কিছু যুগস্রষ্টা চিন্তাবিদকে আনতেন, তাহলে তা প্রশংসার যোগ্য হতো। যাহোক, কথিত মহান উদারনীতিক সুফি কবি আমির খসরু কীভাবে ইসলামি লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও হিন্দুদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো দেখে নগ্ন আনন্দ উপভোগ করতেন, তা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সুফি দরবেশ – যেমন আউলিয়া, চিশতী ও শাহজালাল – তারা সবাই ভারতে এসেছিলেন হিন্দু নিধনের উদ্দেশ্যে 'জিহাদ' করতে। আউলিয়া ভারতে ব্যাপক লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ ও ক্রীতদাসকরণ মূলক সফল জিহাদ অভিযানে অধীর সন্তুষ্টি প্রকাশ ও আনন্দের সঙ্গে লুণ্ঠনকৃত মালামাল থেকে উপহার গ্রহণ করতেন। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সুফিরা – যেমন কাশ্মীর ও গুজরাটে – তারা ভারতীয়দের উপর জিহাদ অনুপ্রাণিত করে সন্ত্রাস ও ধ্বংসযজ্ঞ আনয়ন করেন।

এ বিশ্লেষণ প্রতীয়মান করে যে, ভারতসহ মোহাম্মদের মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যে বিজিত তৎকালীন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলোকে দেওয়ার মতো আবরদের কিছুই ছিল না। ইসলামি হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠনের তাৎক্ষণিক ফলাফল ছিল ওসব সভ্যতার বিদ্যমান শিল্পকলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাস্কর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার পতন বা অবদমন। ভারত থেকে মিশর পর্যন্ত মুসলিমদের দ্বারা অনেক শিক্ষা ও জ্ঞানকেন্দ্র ধ্বংস এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত প্রয়াস পারস্য, মিশরীয় ও সিরীয়দের মাঝে পুনরায় উজ্জীবিত হয় কেবলমাত্র তাদের ইসলামপূর্ব সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার ঐতিহ্যের অদম্যতার কারণে। এমনকি নেহরু, যিনি সদা ভারতে মুসলিম শাসনের রঙ্গীন চিত্র অঙ্কনে আগ্রহী, তিনিও ব্যর্থ হন ইতিবাচক কোনোকিছু চিহ্নিত করতে, যা ইসলাম ভারতকে প্রদান করেছিল। তিনি লিখেছেন:

> মুসলিমরা, যারা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল, তারা নতুন কোনো কলা-কৌশল কিংবা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামো আনেনি। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ধর্মীয় বিশ্বাসটি সত্ত্বেও তারা ছিল 'শ্রেণীবদ্ধ' ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সামন্ততান্ত্রিক। কলাকৌশল এবং উৎপাদনের পদ্ধতি ও শিল্পসংগঠনের ক্ষেত্রে ভারতে তৎকালে যা চালু ছিল, তার তুলনায় তারা ছিল নিম্নতর। সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক জীবন ও সামাজিক কাঠামোতে তাদের প্রভাব ছিল অতি নগণ্য।[৮৩]

মুসলিম বিশ্ব কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করে?

---

৮২. Ambedkar BR (1990) *Writing and Speches: Pakistan or the Partition of India*, Government of Maharashtra, Vol. III, p. 229-38

৮৩. Nehru (1946), p. 265

ইসলামি আক্রমণকারীদের নিষ্ঠুর ও বিধর্মী ধর্মীয় প্রতীক ধ্বংসকারী হামলার প্রাথমিক জোয়ারের পর সে অসংস্কৃত ও অমার্জিত বেদুইন আরবরা বিশ্বের অগ্রসর সভ্যতাকে তত্ত্বাবধায়ন করার জন্য যেন অনেকটা অসম্ভব গুরুভার দায়িত্বের মুখে পতিত হয়। সুসংগঠিত ও অগ্রগ্রামী রাষ্ট্রের প্রশাসনে যে অভিজ্ঞতা ও শৃংখলাবোধ থাকা প্রয়োজন, সেসব জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তারা অনেক ধর্মীয় আপোষ করতঃ বিজিত দেশের বহু ইসলামপূর্ব অগ্রসর মানবিক অর্জন, যেগুলোর সাথে তাদের নতুন পরিচয় ঘটে, তা হজম করতে বাধ্য হয়। তাদেরকে সেসব দেশের অগ্রসর 'জাহিলিয়া' ব্যবস্থা ও স্থানীয় জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিক্ষাগত প্রশাসনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। আরবরা অনেকক্ষেত্রে অধর্মান্তরিত, অথচ প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, লোকদেরকে ওসব বিষয় পরিচালনা করতে দিয়ে নিজেরা বিজয়ের কাজে লিপ্ত থাকে।

মুসলিম শাসকরা সাধারণত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদিদের, প্রকৌশল, ভাস্কর্য ও শিল্পকলায় গ্রিকদের, এবং আইন, ঔষধ, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের দক্ষরূপে পেয়েছিল। তারা ওসব অভিজ্ঞ অবিশ্বাসীদেরকে স্ব-স্ব পেশায় নিয়োজিত রাখাকে সুবিধাজনক ও বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল। এর ফলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনেক অবদান, যা মুসলিমরা ইসলামিক বলে মনে করে থাকে, তা প্রকৃতপক্ষে এসেছিল সেসব ঘৃণিত অনারব অবিশ্বাসীদের মনন, শ্রম ও ঘাম থেকে। অমুসলিমদের উপর মুসলিম শাসকদের নির্ভরশীলতার মাত্রা অনুমান করা যায় নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে: ইসলামের জন্মের প্রায় আড়াইশ বছর পর খলিফা মুতাওয়াক্কিল যখন ৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তার পাঠাগার সম্প্রসারণ করেন, তখন তিনি কোন সুশিক্ষিত মুসলিমকে খুঁজে পাননি পাঠাগারটির পরিচালনার ভার অর্পণ করতে। ফলশ্রুতিতে তাকে সে কাজটির দায়িত্ব অর্পণ করতে হয় হুনাইন ইবনে ইসহাক নামক এক খ্রিষ্টানের হাতে, যদিও খলিফা খ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরকে চরমভাবে ঘৃণা ও নির্যাতন করতেন।

ইসলাম-বিজিত উন্নত ভূখণ্ডগুলো মুসলিম হানাদারদের প্রাথমিক আঘাত হজম করার পর সেখানে পুনরায় সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞানের উজ্জীবন ঘটে, কিন্তু তাতে মরুভূমির আরবদের অবদান ছিল একেবারেই নগণ্য। ওগুলোর পুনরুজ্জীবন বা পুনরোদ্ভব ঘটেছিল মুসলিম-বিজিত অগ্রগামী অনারব জাতি ও সভ্যতার ইসলামপূর্ব স্পন্দনশীল স্থানীয় ঐতিহ্য থেকে। ওসব অবদান অবশ্য এসেছিল ইসলামের নীতি বা শিক্ষার আপোষের মাধ্যমে, যেহেতু সেসব অর্জন ইসলামপূর্ব জাহেলিয়া যুগীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলন, যা ইসলাম কতৃক বাতিল হয়ে গিয়েছিল। উপরের আলোচনা অনুসারে, ওসব প্রচেষ্টা বা অর্জনের অনেকেই আল্লাহ ও নবি মোহাম্মদ কর্তৃক সুস্পষ্ট নিন্দিত হয়েছে। ইসলামের জন্ম হয়েছিল সেগুলোকে লালন করতে নয়, ধ্বংস করতে। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে লক্ষ্যে নবি মোহাম্মদ ও পরবর্তী মুসলিম হানাদাররা একের পর এক বিদ্যমান অনৈসলামিক সভ্যতাগুলোর উপর আগ্রাসনমূলক আক্রমণে লিপ্ত হয়। ইসলামিক বিজয়ের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরা বিদেশী ভূখণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে ওসব 'জাহেলিয়া' অর্জনসমূহ মুছে ফেলার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে, কিন্তু অবশেষে চূড়ান্ত সাফল্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়, ওসব গভীর দৃঢ়মূল সংস্কৃতি ও সভ্যতাগুলোর অদম্যতার কারণে, যার কোনো কোনোটির ভিত্তি ছিল হাজার হাজার বছরের পুরানো। ইসলামের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈশ্বরহীন উমাইয়াদের ক্ষমতাদখল (৬৬১) রাজনৈতিক ও আদর্শগত অনেক ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটায়, যেগুলো ছিল নবি যা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার বিমুখী। আর সেটা মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত চর্চাকে ইসলাম-প্রত্যাশিত অভিমুখ থেকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

যদিও এ গ্রন্থের আওতাভুক্ত নয়, তবু উমাইয়া খলিফা ও শাসকদের মোহাম্মদ ও ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও নিস্পৃহতার কারণ ও তার ফলাফল এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা সঙ্গত। প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার পিতা মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান ও মোহাম্মদের মাঝে রক্তাক্ত ও স্থায়ী দ্বন্দ্বের কারণে মোহাম্মদ ও ইসলামের প্রতি অধিকাংশ উমাইয়া শাসকের ছিল গভীর ঘৃণা। মুয়াবিয়া নিজেই ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদের মক্কা বিজয়কালে আবু সুফিয়ান পরিস্থিতির চাপে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হন। সেদিন বিপুল সংখ্যক মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করলেও মুয়াবিয়া তা করেন নি। পরের বছর আল্লাহ যখন ৯:১-৫ নং আয়াত নাযিলের মাধ্যমে পৌত্তলিকদেরকে হয় ইসলাম গ্রহণ নয় মৃত্যুবরণ – এ শর্ত দিয়ে উৎখাতে চড়াও হন, তখন সমস্ত মক্কাবাসীকে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। কোন কোন সূত্রে বলা হয়, মুয়াবিয়া তবুও ইসলাম গ্রহণ না করে ইয়েমেনে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে ইয়েমেন ও সমস্ত আরব ভূখণ্ড যখন ইসলামের দখলে চলে আসে, তখনি কেবল মুয়াবিয়া নিস্পৃহভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সুতরাং ইসলাম ও কোরানের প্রতি মুয়াবিয়া ও অধিকাংশ উমাইয়া শাসকদের ভক্তি ছিল সামান্য। ৬৫৭ সালে খলিফা আলির বিরুদ্ধে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়ার পক্ষ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। এ অবস্থায় পবিত্র কোরানের প্রতি মুসলিমদের পরম শ্রদ্ধাশীলতার প্রেক্ষিতে, মুয়াবিয়া তার সেনাদেরকে বর্শার ডগায় কোরানের পাতা ফুঁড়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। এ দৃশ্য দেখে আলির বাহিনী যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে ও কৌশলগতভাবে যুদ্ধটিতে হেরে যায়।

মুয়াবিয়ার খলিফা হিসেবে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর উমাইয়ারা আলির পরিবারের বহু সদস্যের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। মুয়াবিয়ার পুত্র প্রথম ইয়াজিদের শাসনকালে আলির পুত্র ও মোহাম্মদের নাতি, হুসেন, ৬৮০ সালে কারবালার যুদ্ধে নির্মমভাবে নিহত হন। হুসেন ইয়াজিদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। উভয়ের বাহিনী কারবালায় মুখোমুখি হলে বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ স্বরূপ হুসেনের বাহিনীকে পানির উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বদরের যুদ্ধেও মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে একইভাবে পানীয় জলের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। এ যুদ্ধে নিহত পুরুষ, নারী ও শিশুদের মস্তক ছিন্ন করে বস্‌রার গভর্নরের কাছে আনা হয়। আর হুসেনের ছিন্ন মস্তক পাঠানো হয় দামেস্কে খলিফা ইয়াজিদের নিকট, যেখানে তা প্রকাশ্যে জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হয়। সহি বুখারীতে (৫:৯১) হুসেনের ছিন্ন মস্তক সম্পর্কে লিখিত আছে যে: *'আল-হুসেনের মস্তক উবায়দুলাহ বিন জিয়াদ (ইয়াজিদ)-এর নিকট আনা হলে তা একটি পাত্রে রাখা হয়। অতঃপর জিয়াদ আল-হুসেনের মস্তকের মুখ ও নাকের মধ্যে একটি কাঠি বা দণ্ড ঢুকিয়ে তা নিয়ে নাচতে শুরু করে ও তার চেহারা সম্বন্ধে কিছু বলতে থাকে।'*

নুহু'র এবং আদ ও থামুদ'এর লোকদেরকে যেভাবে অতীতে ধ্বংস করা হয়েছিল, ইসলাম-বিরোধীদেরকে সেভাবে ধ্বংস করার অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ কোরানে (১৪:৯)। খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ (মৃত্যু ৭৪৩) আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতিকে ব্যঙ্গ করে কোরানের সে পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে একটি বর্শার আগায় গেঁথে তীর ছুঁড়ে তা ছিন্ন-ভিন্ন করে পৃষ্ঠাটির প্রতি চ্যালেঞ্জ করেন: *'সব বিরোধীকেই তুমি তিরস্কার করো? দেখো, আমি সে অবাধ্য প্রতিপক্ষ। শেষ বিচারের দিন যখন তুমি আল্লাহর সামনে হাজির হবে; বলবে যে, ওয়ালিদ তোমাকে এভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করেছিল।'*[৮৪] ইসলামের প্রতি অশ্রদ্ধ দ্বিতীয় ওয়ালিদ ছিলেন *'অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা মানুষ, যিনি সব সময় কবি, নর্তকী ও সঙ্গীতজ্ঞদের সাহচর্যে থাকতেন, এবং উদারনৈতিক আনন্দোচ্ছল জীবনযাপন করতেন, ধর্মীয় বিষয়ে উদাসীনতা দেখিয়ে।'*[৮৫]

মাত্র কয়েক বছরের তুলনামূলক গোঁড়ামিত্ব ছাড়া (৭১৫-২১) ৯০ বছরের উমাইয়া শাসনের (৬৬০-৭৫০) অধিকাংশ সময়টাই উমাইয়া শাসকরা সর্ব প্রকারের অধার্মিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে। উমাইয়ারা ইসলামি ধর্মবিশ্বাস থেকে একটিমাত্র জিনিস সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিল – তা হলো, দেশ জয়ের জন্য জিহাদ বা যুদ্ধের মতবাদ। মুয়াবিয়া ছিলেন এক আরব সাম্রাজ্যবাদী প্রভু, যার অধীনে একীভূত মুসলিম বিশ্ব বৃহত্তম বিস্তৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। উমাইয়ারা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে ইসলামের 'জিহাদ' মতবাদটির ব্যাপক ব্যবহার করলেও কখনোই মোহাম্মদের ধর্ম সম্প্রসারণে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেনি; বরং তারা পরাজিতদের ধর্মান্তরের বিরোধী ছিল, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু সুফিয়ান ছিলেন মক্কার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও নেতা, মোহাম্মদ সেটা ছিলেন না। আবু সুফিয়ানের পরিবার ছিল নগরীর সবচেয়ে শিক্ষিত পরিবারগুলোর একটি। ইসলামের ধর্মীয় মতবাদ ও মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধ বা নিস্পৃহ হওয়ায় কারণে উমাইয়া রাজবংশের শাসনামলে প্রাথমিক মুসলিম আক্রমণে বিনষ্টকৃত সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, যেমন শিল্পকলা ও ভাস্কর্য, কবিতা ও সঙ্গীত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আগ্রহ বা উৎসাহ ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। পরবর্তীতে পারস্য সংস্কৃতি ও সভ্যতায় লালিত আব্বাসীয় শাসকরা এসব উদ্যোগকে আরো জোরদার ও সম্প্রসারিত করেন, যা মধ্যযুগীয় মুসলিম বিশ্বে 'স্বর্ণ যুগের' আগমনের পথ সুগম করে।

এটা তর্কাতীত যে, নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অগ্রগামী ছিল। আর এর কারণ ছিলো, মুসলিমরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও উন্নত সভ্যতাসমূহ, যেমন মিশর, ভারত, পারস্য ও লেভান্থ ইত্যাদিকে জয় করে তাদের ধনসম্পদ, মেধা ও সঞ্চিত বুদ্ধিবৃত্তিক ভাণ্ডাররাজী গ্রাস করে নিয়েছিল। আলেক্সান্ডারের বিজয়রথ অনুসরণ করে হেলেনিক সভ্যতার কেন্দ্র গ্রিস থেকে পূর্বে আলেক্সান্দ্রিয়া ও লেভান্থে পৌঁছে ছিল। এভাবে প্রাচীন গ্রীসের বুদ্ধিবৃত্তিক ভাণ্ডারও মুসলিম বিশ্বের হস্তগত হয়ে যায়। উত্তর দিক থেকে আসা বর্বর বলে বিবেচিত ভ্যান্ডাল, গথ ও ভাইকিং প্রভৃতির দ্বারা আক্রমণ ও দখল এবং সে সাথে অস্পষ্টতাবাদী খ্রিষ্টান প্রভাবে বিধ্বস্ত ইউরোপ ডুবে গিয়েছিল অন্ধকারে। এ অবস্থায় বিশ্বের নেতৃস্থানীয় সভ্যতা কোনটি হতে পারত?

গোঁড়া মুসলিমদের দ্বারা প্রাথমিক আঘাতের পর ইসলামের গ্রাসকৃত সক্রিয় ও উচ্ছল ইসলামপূর্ব সভ্যতাগুলো নিজে থেকেই ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে বিশাল ইসলামি বিশ্বে। আরবরা নয়, বরং প্রধানত পারস্য, ভারতীয়, গ্রিক ও লেভান্তীয়রা – যাদের অনেকেই ছিল অমুসলিম – তারাই মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত প্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত ও লালিত করে। বিদেশী পাণ্ডুলিপির অনুবাদ, যা ছিল মধ্যযুগীয় মুসলিম বিশ্বের উৎকর্ষ অর্জনের মূল কারণ, তা ইসলামপূর্ব পারস্যে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি মুসলিম শাসনকালে প্রধানত ঈশ্বরহীন উমাইয়া ও পথভ্রান্ত পারস্যায়ণকৃত আব্বাসীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘটেছিল অনুবাদের কাজ; এবং সে অনুবাদকর্ম সাধিত হয়েছিল মূলত অমুসলিম, বিশেষত খ্রিষ্টান, পণ্ডিতদের দ্বারা। তিনশত বছর ধরে সক্রিয়ভাবে চলমান অনুবাদকর্মে নিযুক্ত হয়েছিল বহু অনুবাদক, যাদের মধ্যে একজনও মুসলিম ছিল না। পরন্তু এসব প্রয়াস ও অর্জনের অনেক কিছুই যেহেতু ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সুতরাং মধ্যযুগীয় মুসলিম বিশ্বের উৎকর্ষতার কৃতিত্ব ইসলামের ঘাড়ে বর্তায় একেবারেই সামান্য; বরং সে কৃতিত্ব বর্তায় মূলত ইসলামপূর্ব সভ্যতারগুলোর উপর, যা ইসলাম জোরদখল ও গ্রাস করেছিল সহিংসতার মাধ্যমে।

উপনিবেশগুলোকে নিজস্ব আবাস করা

এটা সত্য যে, দখলকারী হিসেবে মুসলিমরা যেখানেই গেছে সে স্থানকেই তারা নিজ দেশ বানানোর চেষ্টা করেছে, যা ইউরোপীয় উপনিবেশিকদের ক্ষেত্রে সর্বত্র হয়নি। মুসলিমদের কাছ থেকে এটা কেবলই প্রত্যাশিত ছিল, কেননা আল্লাহ তাদেরকে সমগ্র বিশ্ব জয় করে তাকে সর্বতঃভাবে ইসলামিকরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ মুসলিমদেরকে সমগ্র ধরিত্রীর উত্তরাধিকারী করেছেন। সুতরাং বিশ্বের মালিকানা, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের নিজস্ব, তা অবৈধ দখলকারী অমুসলিমদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার দায়িত্ব বর্তেছিল মুসলিমদের উপর। কাজেই ইউরোপীয়দের বিপরীতে মুসলিমদের দ্বারা বিদেশী ভূখণ্ড দখল ছিল মূলত আসল মালিকের কাছে সে ভূখণ্ডের হস্তান্তর মাত্র। মুসলিমরা বিদেশী ভূখণ্ড কব্জা করেছিল চিরতরে তার মালিক, প্রকৃত মালিক, বনে যাওয়ার নিমিত্তে (এ বিষয়টি ইসলামের সকল আইনশাস্ত্রে স্বীকৃত)। অতএব তারা বিজিত ভূমি পূর্ববর্তী মালিককে ফেরৎ দিতে পারতো না, প্রকৃতপক্ষে সে প্রশ্নই উঠেনা। বিজিত ভূখণ্ডের প্রতি মুসলিম দখলকারীদের ভালবাসা এতই বেশি ছিল যে, তারা সেসব দেশের স্বদেশী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জনগণকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিরতরে ধ্বংস করে ফেলেছে। আর মুসলিমরা এটাকে একটা গর্বের বিষয় হিসেবে দেখে; যেমন হাশমী গর্বের সঙ্গে বলেন: *'মুসলিম শাসকরা ভারতকে নিজের দেশ মনে করতো, যা ব্রিটিশ দখলদাররা করে নি।'* মুসলিম দখলদারদের এ বৈশিষ্ট্যটির প্রশংসা করতে গিয়ে একইভাবে নেহরু লিখেছেন: *'তাদের রাজবংশগুলো ভারতীয় রাজবংশে পরিণত হয় এবং মিশ্র বিবাহের মাধ্যমে জাতিগত সংমিশ্রণ ঘটেছিল বহুলাংশে... তারা*

[৮৪]. Walker, p. 237; also Ibn Warraq, p. 243

[৮৫]. Ibn Warraq, p. 243

ভারতকে নিজস্ব দেশ হিসেবে দেখতেন এবং অন্য কোন সম্বন্ধ ছিল না (বহির্বিশ্বের সাথে)।' অপরদিকে, নেহরু বলেন: *'ব্রিটিশরা ভারতে থেকেছিলেন বহিরাগত, বিচ্ছিন্ন ও বেমানানরূপে।'*[৮৬]

মুসলিমদের মতো আফ্রিকায়, আমেরিকার দেশসমূহে ও অস্ট্রেলেশিয়ায় অনেক ইউরোপীয়রাও সাবেক উপনিবেশগুলোতে নিজেদের স্থায়ী আবাস গেড়েছে। ইসলামি হানাদারদের বিজিত দেশে নিজেদের বসতি স্থাপনকে মুসলিমরা গর্বের বিষয় মনে করে এবং অনেক তরফ থেকে প্রশংসাও পায়। কিন্তু উপনিবেশগুলোতে বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয়রা এক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে; প্রশংসার পরিবর্তে তারা পায় সন্দেহ, ঘৃণা, এমনকি সহিংসতা। এটা যদিও একটা হতবাক হওয়ার বিষয়, এর সাথে আরো কিছু যোগ করার রয়ে গেছে। অনেক বিজিত দেশে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়েছে, সেখানে তারা সাধারণতঃ খুবই দরিদ্র ও আধুনিক সভ্যতায় তাদের অবদান অতি নগণ্য। অধিকাংশ স্থলে তারা কেবলমাত্র গোঁড়ামি, সহিংসতা, সন্ত্রাস, মানবাধিকার লংঘন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগামী। যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু – যেমন ভারত, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন, পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া ও অন্যত্র – সেখানে তারা অধর্মান্তরিত সহনাগরিকদের চেয়ে পিছিয়ে ও দরিদ্রতর অবস্থানে রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ওসব অমুসলিম জাতির উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে অতীতের মুসলিম শাসকরা স্বদেশী অমুসলিমদের উপর ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা চালায়; দেশের বিভিন্ন অংশে তাদেরকে কয়েক শতাব্দী থেকে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চরম সামাজিক অমর্যাদা ও অর্থনৈতিক শোষণ-নিস্পেষণে জর্জরিত করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের ভারত-ত্যাগের পর সংখ্যাগুরু হিন্দুরা তাদের দেশের নিয়ন্ত্রণভার পুনর্গ্রহণের পর মুসলিমরা নতুন জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তি-চালিত ব্যবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে পিছে পড়ে যাচ্ছে। সেজন্যে ভারত সরকার করদাতাদের অর্থে মুসলিমদেরকে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমরা সমসুযোগের প্রতিযোগিতায় পিছে পড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি কেরালা রাজ্যে চাকরির একটা অংশ তাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ু রাজ্যেও একই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। শেষ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া হয়তো সারা ভারতেই প্রবর্তিত হয়ে যাবে।

ভারতে আজকের করদাতারা প্রধানত হিন্দু, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসনের যাঁতাকালে প্রচণ্ড শোষিত, নিস্পেষিত, আতঙ্কিত ও অবমানিত হয়েছিল। মুসলিমদের প্রতি এসব বিশেষ অর্থনৈতিক উৎসাহ বা অনুদানকে কিছু সমালোচক যথার্থই 'জিজিয়া' করের পুনর্প্রবর্তন আখ্যায়িত করেছেন, যা মুসলিম শাসকরা অমুসলিম প্রজাদের উপর আরোপ করেছিল এবং ব্রিটিশরা তা বিলুপ্ত করে। যাহোক, ভারতে উপনিবেশিক যুগের পূর্বকালীন 'জিজিয়া' ও উপনিবেশোত্তর কালে 'জিজিয়া' করের পুনর্প্রবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণগত পার্থক্য ও সাদৃশ্য রয়েছে। সেটা হলো মুসলিমরা ইংরেজ-পূর্ব মুসলিম শাসনামলে হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিমদের নিকট থেকে 'জিজিয়া' শুষে নিতো। আজকের নতুন নীতিতে, শাসক শ্রেণীর হিন্দুরা (যারা প্রধান করদাতা) মুসলিমদেরকে শোষণের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় তা প্রদান করছে। উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামি আইনে 'জিম্মি' শ্রেণীভুক্ত হিন্দুরা জিজিয়া প্রদান করছে, আর মুসলিমরা তার সুবিধা ভোগ করছে। কেবলমাত্র এটাই ইসলামের আনুশাসনিক আইনে স্বীকৃত।

অপরদিকে উপনিবেশিক ভূখণ্ডে বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয়রা তাদের অবলম্বিত স্বদেশ-ভূমিতে খুবই উৎপাদনশীল ও অবদানশীল নাগরিক। উদাহরণস্বরূপ, জিম্বাবুয়েতে ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা সংখ্যায় অতি নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক অতীতে খামারগুলো থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আগে পর্যন্ত তারা ছিল জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এরূপ মূল্যবান নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা স্বদেশী জনগণ ও সরকারের নিন্দা ও ঘৃণার মুখোমুখি হয়। এমনকি তাদেরকে সহিংস অত্যাচারও ভোগ করতে হয়। জিম্বাবুয়ের শ্বেতাঙ্গরা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অবশিষ্টাংশ হিসেবে অভিযুক্ত হয়, যারা উপনিবেশিক যুগীয় শোষণ অব্যাহত রাখছে। উপনিবেশিক যুগের সে শোষণের অবশিষ্টাংশ নির্মূল করার জন্য ১৯৮০ সালে স্বাধীনতা লাভের পর জিম্বাবুয়ের সরকার শ্বেতাঙ্গদের মালিকানাধীন জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষ্ণাঙ্গ কৃষকদেরকে দেওয়ার জন্য একটা ভূমি সংস্কার কর্মসূচি শুরু করে। ২০০০ সালে রবার্ট মুগাবে সরকার কৃষ্ণাঙ্গদেরকে প্রয়োজন হলে জোরপূর্বক শ্বেতাঙ্গদের মালিকানাধীন খামারভূমি দখল করার অবাধ স্বাধীনতা দেয়। এর ফলে শ্বেতাঙ্গ কৃষকদের উপর উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিংসতা শুরু হয় ও বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গের মৃত্যু ঘটে।[৮৭] এ ভয়ানক সহিংস ভূমি-দখল অভিযানে শ্বেতাঙ্গ মালিকানাধীন খামার থেকে ১১০,০০০ বর্গ-কিলোমিটার জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়।[৮৮]

শ্বেতাঙ্গবিরোধী অভিযানের ফলে বিপুল সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ কৃষক জিম্বাবুয়ে ত্যাগ করে। বাজেয়াপ্তকৃত অধিকাংশ জমি এখন কৃষ্ণাঙ্গদের দখলে। কিন্তু আধুনিক কৃষিকাজ সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতায় তাদের দুর্বলতার কারণে দখলকৃত জমির বেশীরভাগই পতিত পড়ে রয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পুঁজির অভাব এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে কঠোর পরিশ্রমের প্রতি উদাসীনতা। সুতরাং আগের সমৃদ্ধ খামারগুলো এখন পড়ে আছে অনুৎপাদনশীল অবস্থায়, যা জিম্বাবুয়েকে আজ স্মরণকালের সবচেয়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত করেছে। জিম্বাবুয়ের ১১.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মারাত্মক খাদ্য সংকটের মুখে পড়ে ২০০৭ সালে।

১৯৮০ সালে যখন ব্রিটিশ উপনিবেশিরা জিম্বাবুয়ে ছেড়ে আসে, তখন এটা ছিল মহাদেশের সবচেয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ, যাকে দক্ষিণ আফ্রিকার 'খাদ্যের ঝুড়ি' বলা হতো। আজ সে জিম্বাবুয়েকে জনগণের জন্য খাদ্য যোগাতে সংগ্রাম করতে হচ্ছে; তাদের ৪৫ শতাংশ পুষ্টিহীনতার শিকার; দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেশটিকে অবিরাম তাড়া করে চলছে। শ্বেতাঙ্গ কৃষকদেরকে অবমাননাকর ও সহিংস উপায়ে অসার দাম্ভিকতাপূর্ণভাবে বহিস্কার করে রবার্ট মুগাবের সমর্থকরা রাস্তায় আনন্দ-নৃত্য করে কিছু সময়ের জন্য আত্মতৃপ্তি পায়। কিন্তু এ অবিচক্ষণতাপূর্ণ

[৮৬]. Nehru (1946), p. 233-34

[৮৭]. *White Farmers held in Zimbabewe*, BBC News, 7 August 2001

[৮৮]. Wikipedia, *Land Reform in Zimbabwe*, http://en.wikipedia.org/ wiki/Land_reform_in_Zeimbabwe

কাজ জিম্বাবুয়ের অর্থনৈতিক জীবনে ভয়াবহ ও অসংশোধনীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিম্বাবুয়েতে মুদ্রাস্ফীতি চলছে বাৎসরিক ১০০,০০০ শতাংশ হারে।[৮৯]

সাবেক আরো অনেক উপনিবেশ যেখানে ইউরোপীয়রা ব্যাপক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেছে, সেসব স্থানেও উপনিবেশবিহীনকরণের মনোভাব প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট থাবো মেবেকি, যিনি রবার্ট মুগাবেকে তার মিত্র ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে নায়ক মনে করেন, তার কৃষ্ণাঙ্গ সমর্থকরাও তাদের নিজ দেশে জিম্বাবুয়ের অনুরূপ শেতাঙ্গবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ দেখতে চান। ম্যাক্স হাস্টিংস মেবেকি সম্বন্ধে লিখেছেন: '*তার অনেক ভোটার জিম্বাবুয়ের ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ ও তার শেতাঙ্গদের প্রতি নির্মম আচরণে উল্লসিত।*'[৯০] জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন হওয়া সত্ত্বেও এমনটা ঘটছে শ্বেতাঙ্গ বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে, যাদেরকে ছাড়া ওসব জাতিকে মারাত্মক অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখে পড়তে হবে।

অপরদিকে, অতীতে মুসলিম-বিজিত দেশগুলোতে মুসলিম বসতি স্থাপনকারী ও তাদের দ্বারা ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলিমরা অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর অভাব-অনটনের মধ্যে নিপতিত। ভারতের দিকে নজর দিলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, স্বদেশী হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তর মূলত তাদের উপর এক পঙ্গুত্ব আরোপ করেছে। যদিও জন্মগতভাবে হিন্দুদের থেকে পৃথক নয়, তথাপি ভারতে মুসলিমরা প্রায় প্রত্যেক ইতিবাচক অর্জনের বা অবদানের ক্ষেত্রে, যেমন শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, সমৃদ্ধি ও উন্নতি ইত্যাদিতে ক্রমাগত পিছে পড়ে যাচ্ছে। এরপরও মুসলিম হওয়ার কাল্পনিক উৎকৃষ্টতায় তারা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করে। বিজিত দেশকে নিজের দেশ ভাবার কারণে তারা এমনকি অমুসমিদের কাছ থেকেও সম্মান বা প্রশংসা পায়। মুসলিমরা হিন্দু ও তাদের 'জাহিলিয়া' সংস্কৃতিকে ঘৃণা অব্যাহত রেখেছে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ভারতীয় মুসলিমদের মাঝে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় মৌলবাদিত্ব এ অভিযানকে জোরদার করছে। গোটা ভারতকে তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামিকরণে সফল হলে বিশাল জনগোষ্ঠীর এ দেশটি বিশ্ব-মানবতার জন্য বড় একটা বোঝা বা পঙ্গুকৃত অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে।

---

৮৯. Angus Shaw, *Zimbabwe inflation passes 100,000%, officials say*, The Guardian, 22 February 2008

৯০. Hastings M, *I'll never lament the passing of white rule in Zimbabwe*, The Guardian, 27 Feb 2007

অধ্যায় - ৬

ভারতে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ

"মেঘের অন্ধকারে বিদ্যুত চমকানোর মতো ঝলসে উঠলো তলোয়ার এবং ধাবমান তারকার ন্যায় রক্তের বন্যা বয়ে গেল। আল্লাহর বন্ধুরা পরাজিত করলো তাদের প্রতিপক্ষকে। মুসলমানরা অবিশ্বাসী আল্লাহর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতঃ তাদের ১৫,০০০ লোককে হত্যা করলো... তাদেরকে বন্য জন্তু ও শিকারী পাখির খাদ্যে পরিণত করা হল... আল্লাহ তাঁর বন্ধুদেরকে এত পরিমাণ লুণ্ঠনদ্রব্য প্রদান করলেন, যা পরিমাপ ও গণনার অতীত। এবং তৎসঙ্গে পাঁচ লক্ষ ক্রীতদাস, সুন্দর সুন্দর নর ও নারি।" -- (সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উপর তার মন্ত্রী আল-উৎবির বর্ণনা)

"(সুলতান) মাহমুদ দেশটির সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন এবং এমন সাংঘাতিক রকমের ক্ষতি সাধন করেন যে, হিন্দুরা ধূলিকণার মতো সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে...। কেন হিন্দু বিজ্ঞানসমূহ দেশের যে সকল অংশ আমরা জয় করেছি সেসব স্থান থেকে অপসৃত হয়ে দূরে সরে গেছে, এটা তার একটা কারণ। সরে গেছে এমন সব স্থানে, যেখানে আমাদের হাত এখনো পৌঁছাতে পারেনি – কাশ্মীর, বেনারস ও অন্যান্য স্থানে।"
-- (আলবেরুনি, বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী, মৃত্যু ১০৫০)

"হিন্দু নারী ও শিশুরা মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে বের হয়েছে।" -- (হিন্দুদের উপর সুলতান আলাউদ্দিনের সর্বনাশা শোষণ সম্বন্ধে মিশরীয় সুফি দরবেশ শামসুদ্দিন তুর্কী)।

অষ্টম শতকের শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পর পর দু'টো বিদেশী শাসন দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত – ইসলামি ও ব্রিটিশ। ইসলামের শাসন শুরু হয় ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু দখলের মাধ্যমে এবং তা সরকারিভাবে শেষ হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর। অপরদিকে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দখল কার্যকর হতে শুরু করে ১৭৫৭ সালে; শেষ হয় ১৯৪৭ সালে।[১]

৭১২ সালে দামেস্কের খলিফা আল-ওয়ালিদের আশির্বাদপুষ্ট ও বাগদাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাসিম ভারতে ইসলামের বিজয় ও শাসনের অভিষেক ঘটান। ১৫৯০'এর দশকে মুঘল সম্রাট আকবরের অধীনে মুসলিম শাসকগণ শক্তভাবে ভারতবর্ষের প্রায় সম্পূর্ণ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। সম্রাট আওরঙ্গযেবের অধীনে (১৬৫৮-১৭০৭) ভারতের মুসলিম নিয়ন্ত্রণ আরো কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাড়াটিয়া বাহিনীর হাতে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ভারতে ইসলামি শাসনের সমাপ্তি সূচনা করে। ১৭৯৯ সালে সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক মহীশূরের টিপু সুলতানের ইংরেজদের হাতে পরাজয় কার্যকরভাবে ভারতে মুসলিম শাসনের সমাপ্তি টানে। ১৮৫০ সালে পাঞ্জাবসহ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল কার্যত ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ব্রিটিশ ভাড়াটিয়ারা ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সাবেক মুসলিম শাসকদেরকেই পুতুলস্বরূপ 'রাষ্ট্র প্রধান' করে রেখেছিল। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রবর্তন করে।

স্বাধীনতার লক্ষ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দীর্ঘ সংগ্রামের পর ব্রিটিশ শাসকরা ১৯৪৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতের উপর থেকে স্বার্বভৌমত্বের দাবি তুলে নেয় এবং একই বছরের ১৪-১৫ই আগস্ট ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হয়। অনেক শতাব্দী ধরে বিদেশী কর্তৃত্বে থাকার পর উপমহাদেশটি স্বাধীন হয় – যদিও পাকিস্তান ও ভারত, এ দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে। উপমহাদেশটির জনগণ নিজস্ব ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায় শেষ পর্যন্ত।

কৌতূহলের বিষয় হলো: ভারতের এ দু'টো বিদেশি শাসনের মাত্র একটিকে, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকে, উপনিবেশিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক, পণ্ডিত এবং উপমহাদেশ ও অন্যান্য স্থানের নাগরিকদের দ্বারা কেবল ব্রিটিশ শাসনই নিন্দিত হয় ও হয়েছে। অনেক বেশি সময়কাল ব্যাপ্ত ইসলামি শাসন তার চেয়ে কোন অংশে কম অন্ধকারাচ্ছন্ন বা দুর্দশাগ্রস্ত ছিল না; অথচ সে ইসলামি শাসনকে দুধে-ধোয়া বানানোর জন্য সচেতন ও সুচিন্তিত প্রয়াস চালানো হয়েছে। অদ্ভুতভাবে অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় আধুনিক ইতিহাসবিদ ও লেখকরা ইসলামি শাসনকে প্রধানত ইতিবাচক হিসেবে চিত্রিত করে। শুধুমাত্র ইসলামি পাকিস্তান ও বাংলাদেশেই নয়, হিন্দু ভারতেও আধুনিক ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণাটি প্রাধান্য পেয়েছে। এ উপমহাদেশের মানুষ, হিন্দু বা মুসলিম, সবাই ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনটি কতটা নিষ্ঠুর ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণমূলক ছিল সেকথা আওড়াতেই অবিরাম ব্যস্ত। কিন্তু ভারতে ইসলামি আক্রমণ ও দখলের ফলে ঘটিত দৃশ্যমান অধিকতর অত্যাচার, শোষণ ও অবিচারে পূর্ণ দীর্ঘতর মুসলিম শাসনের নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ পায় না। ভারতের মুসলিম শাসনের কথা যখন বলা হয়, তা মূলত একটা ইতিবাচক, লাভজনক, এমনকি গৌরবময়, অধ্যায়রূপে বর্ণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ইসলামি স্বেচ্ছাচারীতাকে ধূয়ে-মুছে নির্মলরূপ প্রদানে অগ্রণী পণ্ডিত নেহরু বলেন: '*ইসলাম ভারতে অগ্রগতির উপাদান এনেছিল।*'[২]

একটা বড় আকারের মুসলিম জনসংখ্যার মাঝে উত্থিত ধর্মীয় মৌলবাদ, অসহিষ্ণুতা ও জঙ্গীত্বের কারণে ভারতের ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা ক্রমবর্ধমান হারে হুমকি মুখোমুখি হচ্ছে। যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখন আর কোনক্রমেই ভারতের ভবিষ্যতের ক্ষতি করতে পারে না, তবু ভারতীয়দের আলাপচারিতায় সেটাকে দানবীয় ভিলেন বা জাত-বদমায়েশরূপে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু ভারতে ইসলামি শাসনের ক্ষতিকর প্রভাবের সত্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান ও আলোচনা সাধারণত একটা নীরবতার বা অস্বীকৃতির নীতিতে আবৃত অথবা সোজাসুজি নিষিদ্ধ বিষয় হয়ে

---

১. Some coastal parts of India, such as Goa, also came under Portuguese control in the sixteenth century.

২. Nehru (1989), p. 213

রয়েছে। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবি ও লেখকরা ইসলামি বিজয়ের প্রকৃত ফলাফল বা প্রভাব স্বীকার করতে দৃঢ়ভাবে অনিচ্ছুক। অপরদিকে তারা ব্রিটিশ শাসনের ছোট-বড় প্রতিটি নেতিবাচক বিষয় খুঁড়ে তুলতে ব্যস্ত, যদিও সে বিষয়গুলো ভারতের ভবিষ্যতের জন্য আজ প্রায় একেবারেই গুরুত্বহীন। তারা তাদের ধারণাগত ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘস্থায়ী বা চলমান নেতিবাচক প্রভাবগুলোর নিন্দায় পঞ্চমুখ, কিন্তু ইসলামিক শাসনের ক্ষেত্রে একই বিষয় বা ফলাফলগুলোর আলোচনায় প্রদর্শন করে অদ্ভুত নীরবতা বা অস্বীকৃতি। সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয়টি হলো, মার্কসবাদী ঘরানার অনেক হিন্দু ইতিহাসবিদও ইসলামি শাসন ও ঐতিহ্যের মহিমান্বিত বর্ণিল ছবি অঙ্কনে তাদের মুসলিম প্রতিপক্ষের সাথে জোড়া বেঁধেছে। তবে এ দৃষ্টিভঙ্গিটি তৎকালীন মুসলিম ঐতিহাসিক ও লেখকগণ কর্তৃক লিখে রেখে যাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণকে ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য প্রদর্শন মাত্র।

সর্বত্র ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা উপমহাদেশে ও অন্যত্র অতীত ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসন এমনভাবে নিন্দিত ও দানবায়ীত হয়েছে যে, অধিকাংশ ইউরোপীয়রা আজ তাদের পূর্বপুরুষদের অতীত উপনিবেশিকতার দোষে অপরাধ বোধ বশতঃ লজ্জা পায় এবং সোজাসুজি সে অপকর্মকে স্বীকার করে নিচ্ছে। ভারতের ব্রিটিশ শাসন কেবলই নেতিবাচক ছিল – কীভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গিটির উদ্ভব হয়, সে সম্বন্ধে ইবনে ওয়ারাক লিখেছেন:

> ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার প্রথম প্রমত্ত দিনগুলোর পর ভারতীয় ইতিহাসবিদরা তাদের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস উগরাতে থাকে, যা ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের মাঝে কোনোই গ্রহণযোগ্য গুণাবলি খুঁজে পায়নি। পরে ১৯৬০ ও ১৯৭০'এর দশকে নতুন দেশটির প্রতিটি মন্দ বিষয়, প্রতিটি ব্যর্থতা, প্রতিটি দুর্বলতার দায়ভার শেষ পর্যন্ত চলে যায় ব্রিটিশদের উপস্থিতিকাল ও অতীতের ব্রিটিশ শোষণের ঘাড়ে।'[৩]

ওয়ারাক আক্ষেপ করে বলেন: কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারত, ইউরোপ ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামের রক্ত-ঝরানো সম্প্রসারণবাদী দখল ও শাসন ছিল এমন এক শুভকর্ম, '*যা নিয়ে মুসলিমরা গর্ববোধ করতে পারে, যা প্রশংসিত হওয়ার বিষয়।*' উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (ও. আই. সি.)'র মহাসচিব তুরস্কের একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু অতীতের ইসলামি উপনিবেশিক যুগে ইউরোপকে প্রদত্ত ইসলামের অবদানের ভিত্তিতে তুরস্কের ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের দাবি করেন। তিনি বলেন: '*আমরা বলতে পারি যে ইউরোপের প্রতিষ্ঠার একটা উপাদান হলো ইসলাম। বলকান অঞ্চলে অটোমানরা পাঁচ শতাব্দীকাল শাসন করেছে। আন্দালুসিয়ায় মুসলিম শাসন টিকে ছিল আট শতাব্দী, ...ইসলামকে ইউরোপে বহিঃস্থ উপাদান বলে গণ্য করা যায় না। এটা ইউরোপীয় সভ্যতার একটা প্রতিষ্ঠাকারী উপাদান।*'[৪] ওদিকে শিক্ষা থেকে প্রশাসন, শাসনকর্ম থেকে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্রিটিশ অবদান ব্যতীত বর্তমান ভারতবর্ষের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে অসম্ভব হতো। কিন্তু যদি কোনো ব্রিটিশ রাজনীতিক ভারতে ইংরেজ শাসনের অবদান সম্পর্কে একইরূপ একটি বিবৃতি দেন, নিঃসন্দেহে আন্ত র্জাতিকভাবে হৈচৈ পড়ে যাবে।

এ সন্ধিক্ষণে ভারতে ইসলামি অভিযান ও পরবর্তী মুসলিম শাসন সম্বন্ধে একটা বাস্তবতা-ভিত্তিক গবেষণা হওয়া অতীব জরুরি, বিশেষ করে যখন অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ইসলামবাদী সন্ত্রাসীদের দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা মারাত্মকরূপে চ্যালেঞ্জ বা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা ইসলামি সন্ত্রাসী হুমকিতে আরো বেশি বিপন্ন। এ বিশ্লেষণে ভারতবর্ষে ইসলামি শাসনের আজ পর্যন্ত মূলত না-ছোঁয়া প্রকৃত প্রভাব এবং বর্তমান ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে তার চলমান ঐতিহ্য মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে। একথা পুনরায় জোর দিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে ইসলামি শাসন ছিল যতটা সম্ভব সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক, যেমনটি ছিল ব্রিটিশ শাসন।

ইসলামি বিজয় ও শাসন

ভারতে আধুনিক ইতিহাস লেখার একটা কেন্দ্রীয় ধারা হলো এ রকম: ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতে মুসলিম ও হিন্দুদের (এবং অন্যান্য অমুসলিম) মাঝে ছিল মহোত্তম একটা সমন্বয়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব। ব্রিটিশরা ভারতের ক্ষমতা দখলের পর হিন্দু-মুসলমানের মাঝে দ্বন্দ্ব ও অশান্তি সৃষ্টি করে, যা অদ্যাবধি ভারতকে আক্রান্ত করে চলেছে।

কিন্তু ব্রিটিশ দখলপূর্ব ভারতের ইসলামি শাসনকালীন প্রধান প্রধান মুসলিম ইতিহাসবিদ ও শাসকদের রেখে যাওয়া ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে তাকালে, যে কেউ অনুধাবন করতে পারবে যে, ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য বা দ্বন্দ্ব মূলত ছিল না – এমন দাবিটি প্রকৃত বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। দুঃখজনক অথচ অপরিহার্য সত্যটি হলো, হানাদার ইসলামি দখলকারীরা ভারতে পা রাখার পর থেকেই হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয় ছিল খুবই সামান্য। এখন ভারতে মুসলিম দখল ও শাসনের শতাব্দীগুলোব্যাপী হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের পথ-পরিক্রমা বা স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

মোহাম্মদ বিন কাসিমের আক্রমণ: উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরান ও সুন্নতের অনুশাসনে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজ্জাজ ৬,০০০ সৈন্যের শক্তিশালী একটি বাহিনী সহযোগে কাসিমকে ভারতের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে অভিযানের পথে দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান সকল ভারতীয় পুরুষকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস বানানোর নির্দেশ দেন। সিন্ধুর দেবাল বন্দর দখল করার পর কাসিমের বাহিনী তিনদিন ধরে সেখানকার নাগরিকদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়।ব্রাহ্মণাবাদে অস্ত্র-বহনে-সক্ষম বয়সের ৬,০০০ থেকে ১৬,০০০ লোককে হত্যা করা হয়। মুলতানে অস্ত্র বহনে সক্ষম সমস্ত লোককে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়। চাচনামায় উল্লেখ আছে যে, রাওয়ারে কাসিমের সফল আক্রমণে

---

[৩] Ibn Warraq, p. 198

[৪] Kamil Subasi, *Ihsanoglu: Islam not just a guest in Europe*, Today's Zaman, 9 October 2008

৬০,০০০ ক্রীতদাস কব্জাকৃত হয়।[৫] কাসিম হাজার হাজার ভারতীয় প্রতিরোধকারীকে হত্যা ও তাদের বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশুকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। সিন্ধুতে তার তিন বছর অবস্থানকালে কয়েক লক্ষ নারী ও শিশুকে কাসিম ক্রীতদাস বানিয়েছিল। এছাড়াও মন্দিরসমূহ নিশ্চিহ্ন করা হয়, ভেঙ্গে গুঁড়ো করা হয় ভাস্কর্য ও মূর্তি এবং ধ্বংসকৃত মন্দিরের স্থলে তোলা হয় মসজিদ। হিন্দু স্থাপনা, মন্দির ও রাজ-দরবারগুলো লুট করে সংগ্রহ করা হয় বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠন দ্রব্য।

সুলতান মাহমুদের অভিযান: উত্তর ভারতে তার ১৭ বার লুটতরাজমূলক অভিযানে (১০০০-২৭) সুলতান মাহমুদ আরো ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে কাসিমের কৃতিত্বকে পুনরুজ্জীবিত করেন। একের পর এক অভিযানে সুলতান মাহমুদ নিষ্ঠুর-নির্দয়ভাবে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরকে হত্যা করতেন; হাজার হাজার, লাখ লাখ নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস হিসেবে কব্জা করতেন এবং তার বাহিনী নাগালের মধ্যে পড়া সবকিছুই লুটপাট ও বাজেয়াপ্ত করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তার অভিযান (১০০১-০২) সম্পর্কে আল-উত্‌বি লিখেছেন:

> মেঘের অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুত চমকানোর মতো ঝলসে উঠলো তলোয়ার এবং ধাবমান তারকার ন্যায় রক্তের বন্যা বয়ে গেল। আল্লাহর বন্ধুরা পরাজিত করলো তাদের প্রতিপক্ষকে। মুসলমানরা অবিশ্বাসী আল্লাহর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতঃ তাদের ১৫,০০০ লোককে হত্যা করলো... তাদেরকে বন্য জন্তু ও শিকারী পাখিদের খাদ্যে পরিণত করা হল... আল্লাহ তাঁর বন্ধুদেরকে এত পরিমাণ লুণ্ঠনদ্রব্য প্রদান করলেন, যা পরিমাপ ও গণনার অতীত। এবং তৎসঙ্গে পাঁচ লক্ষ ক্রীতদাস, সুন্দর সুন্দর নর ও নারী।'[৬]

১০০৮ সালে নগরকোট (কাংরা) দখলে লুণ্ঠনদ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ধাতব মুদ্রায় ৭,০০০,০০০ দিরহাম এবং ৭০০,৪০০ মণ সোনা ও রূপা; এছাড়াও অজস্র দামি পাথর ও কারুকার্যময় পোশাক। আল-উত্‌বি লিখেছেন, সুলতান মাহমুদ *'ইসলামের পতাকা উড্ডীন ও পৌত্তলিকতা উচ্ছেদের নিমিত্তে'* ১০১১ সালে থানেসার আক্রমণে অগ্রসর হন। এযুদ্ধে *'বিধর্মীদের রক্তের স্রোত এতই প্রবল ছিল যে, নদীর স্বচ্ছ পানি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং জনগণ তা পান করতে পারে নি। সুলতান যে পরিমাণ লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে ফিরেন, তা গণনার অসাধ্য। আল্লাহকে সকল প্রশংসা, ইসলাম ও মুসলমানদের উপর সম্মান উপস্থাপনের জন্য।'*[৭]

কণৌজের যুদ্ধে *'বাসিন্দারা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয় ইসলামের তলোয়ারের খাদ্যে পরিণত হওয়ার জন্য। এখানে সুলতান মাহমুদ বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠনের সামগ্রী, বন্দি (অর্থাৎ ক্রীতদাস) ও ধন-সম্পদ করায়ত্ত করেন, যা গুণতে গেলে গণনাকারীদের আঙ্গুল ক্লান্ত হয়ে পড়তো।'* আল-উত্‌বি আরো লিখেছেন: *'সে স্থানের বহু বাসিন্দা পালিয়ে যায় এবং চরম দুর্দশাগ্রস্থ নারী ও শিশুরা যে যেদিকে পারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, যেন অসংখ্য হতভাগা এতিম ও বিধবাদের মতো। অনেকে এভাবে পালিয়ে যায় এবং যারা পালায়নি তাদেরকে হত্যা করা হয়। সুলতান সাতটি দূর্গের সবগুলো একদিনে দখল করে নেন এবং তার সেনাদেরকে সেগুলো লুণ্ঠন ও লোকজনকে বন্দি করার নির্দেশ দেন।'*[৮]

আগেই বলা হয়েছে যে, সুলতান মাহমুদের রাজসভার আলবেরুনি হিন্দুস্তানে তার আক্রমণকে 'দেশটির সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে' বলে বর্ণনা করেন। আলবেরুনি লিখেন: ভারতীয় বাসিন্দাদের উপর তার নিষ্ঠুরতা এমন ছিল যে, *'হিন্দুরা যেন ধূলিকণার মত সর্বদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে'* এবং পোষণ করে *'সমস্ত মুসলিমদের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব।'*[৯] নেহরু উল্লেখ করেছেন: *'সমগ্র উত্তরে তিনি এক সন্ত্রাসী হয়ে দাঁড়ান। অধিকাংশ মুসলিম তাকে ভক্তি করে; অধিকাংশ হিন্দু করে ঘৃণা।'*[১০] নেহরু যোগ করেছেন: *'মাহমুদের হামলা ও হত্যাযজ্ঞের পর উত্তর ভারতে ইসলাম বর্বর নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে।'*[১১]

গোরীদের আক্রমণ: দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে দখলদার গোরীদের আক্রমণ ভারতে ইসলামের বিজয় ও সম্প্রসারণের তৃতীয় জোয়ারটি বয়ে আনে, যা ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা চূড়ান্তকৃত করে ১২০৬ সালে দিল্লি সুলতানাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পারস্যের ইতিহাসবিদ হাসান নিজামী তার 'তাজ-উল-মা'সির' গ্রন্থে মোহাম্মদ গোরীর আজমীর বিজয় সম্বন্ধে লিখেছেন: *'এক লক্ষ হীন ও বিপর্যয়গ্রস্ত হিন্দু দ্রুত নরকের আগুনে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল';* আর হানাদাররা *'এত পরিমাণ মালামাল লুণ্ঠন করলো যে, যেন সাগর ও পাহাড়ের গোপন ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়ে পড়েছে';* সুলতান গোরী সামনে অগ্রসর হয়ে দিল্লি আক্রমণ করলে *'যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের বন্যা বয়ে গেল।'*[১২]

নিজামী উল্লেখ করেন, ১১৯৩ সালে সুলতান মোহাম্মদ গোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেকের আলিগড় অভিযানে *'তলোয়ারের ডগায় তারা (হিন্দুরা) নরকের আগুনে নিপতিত হলো।'* সেখানে হত্যাযজ্ঞ এতই প্রবল ছিল যে, *'তাদের ছিন্ন মস্তকে গড়া তিনটি বুরুজ যেন আকাশ সমান হয়ে গেল এবং তাদের শবদেহ শিকারি পাখির খাদ্যে পরিণত হলো। অঞ্চলটিকে মূর্তি ও মূর্তিপূজা মুক্ত করা হয় ও অবিশ্বাসের ভিত্তি ধ্বংস করা হয়।'*[১৩]

---

[৫] Lal (1994), p. 18
[৬] Elliot & Dawson, Vol II, p. 26
[৭] Ibid, p. 40-41
[৮] Ibid, p. 45-46
[৯] Lal (1999), p. 20
[১০] Nehru (1989), p. 155
[১১] Ibid, p. 209
[১২] Elliot & Dawson, Vol. II, p. 215-16
[১৩] Ibid, p. 224

নিজামী লিখেছেনঃ আইবেকের বেনারস অভিযানে, *'যা ছিল হিন্দু রাজ্যের কেন্দ্রস্থল... সেখানে তারা ধ্বংস করে প্রায় এক হাজার মন্দির; সেগুলোর ভিতের উপর মসজিদ স্থাপন করা হয়; সেখানে আইনের জ্ঞান (শরীয়া) ঘোষণা করা হয়; এবং (ইসলাম) ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়'।*[১৪] ১১৯৭ সালের জানুয়ারিতে কুতুবুদ্দিন আইবেক গুজরাটের রাজধানী নাহরওয়ালার দিকে অগ্রসর হন এবং *'তরবারির দ্বারা পঞ্চাশ হাজার অবিশ্বাসীকে নরকে প্রেরণ করেন এবং মৃতদেহের স্তূপে পাহাড় ও সমতল ভূমি সমান হয়ে যায়; আর ২০ হাজারেরও বেশি ক্রীতদাস ও অগণিত গবাদি পশু বিজয়ীদের হস্তগত হয়।'*[১৫] ১২০২ খ্রিষ্টাব্দে কালিনজর অভিযানে আইবেকের উজ্জ্বল সাফল্য সম্পর্কে নিজামী লিখেছেনঃ *'মন্দিরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়, এবং নামাজে আহ্বানের আওয়াজ আকাশের উচ্চমার্গে পৌঁছে যায় ও পৌত্তলিকতার নাম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়।'* নিজামী আরো লিখেছেনঃ *'পঞ্চাশ হাজার লোক ক্রীতদাসত্বের অধীনে আসে এবং হিন্দুদের রক্তে সমতলভূমি পীচের মতো কালোবর্ণ ধারণ করে।'*[১৬] গোরীর ভারত আক্রমণ সম্পর্কে নেহরু লিখেছেনঃ *'বলতে হয় এসব মুসলিমরা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর... মুসলিম আক্রমণের প্রাথমিক ফলস্বরূপ জনগণ দক্ষিণ দিকে দলে দলে পাড়ি জমায়... যখন এ নতুন আক্রমণ এলো এবং প্রতিহত করা সম্ভব হলো না, তখন দক্ষ কারিগর ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা দলে দলে দক্ষিণ ভারতের দিকে চলে যায়।'*[১৭]

হতভাগ্য হিন্দুদের উপর গণহত্যা, তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় ক্রীতদাসকরণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, অগণিত হিন্দু-মন্দির ধ্বংসসাধন ও তদস্থলে মসজিদ নির্মাণ, ব্যাপক বেপরোয়া লুঠতরাজ এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠনের এসব দৃষ্টান্ত কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলনা অসংখ্য মুসলিম বিজয় ও যুদ্ধে; বরঞ্চ এগুলো ছিল সাধারণ ঘটনা, যা ইসলামি দখল ও শাসনের পুরো সময় ধরে ভারতে একটা পরিচিত চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯৬-১৩১৬) ও মোহাম্মদ শাহ তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১) ছিলেন ভারতীয় বিধর্মীদের উপর চরম নির্যাতনকারী ও শোষক। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮) ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু শাসক। তিনি খুবই সতর্ক থাকতেন তার যুদ্ধে মুসলিমদের জীবন বিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে, হোক সে নিজের পক্ষের কিংবা প্রতিপক্ষের। কিন্তু বিধর্মীদের ব্যাপক সংখ্যায় হত্যা কোন ব্যাপার ছিল না তার জন্য। সিরাজ আফিক লিখেছেন, তার বাংলা অভিযানে, *'হত্যাকৃতদের মাথা (বাঙালিদের) গণনায় সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০,০০০।'*[১৮]

সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকরা ব্রাহ্মণদেরকে জিজিয়া কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। কিন্তু গোঁড়া ধার্মিক ও ধর্মান্তরে অতি-উৎসাহী সুলতান ফিরোজ শাহ্‌ ভেবে দেখলেন যে, *'এটা ছিল ধর্মীয়ভাবে ভুল'* এবং *'ব্রাহ্মণরাই ছিল পৌত্তলিকতা চর্চার চাবিকাঠি'*; সুতরাং তিনি যথারীতি তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করেন।[১৯] তিনি একান্তভাবে মূর্তিপূজা দমন করতেন ও বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। তিনি তার রাজ্যে মূর্তিপূজা চর্চা ও মন্দির নির্মাণ হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ রাখার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজস্ব স্মৃতিনামা 'ফতোয়া-ই-ফিরোজ শাহী'তে হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও সেগুলোর ধর্মযাজকদের হত্যার অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এক দৃষ্টান্তে তিনি লিখেছেনঃ *'(হিন্দুরা) এখন নগরীতে প্রতিমা-মন্দির নির্মাণ করেছে, যা নবির আইনবিরোধী। এতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এরূপ মন্দিরসমূহকে সহ্য করা যাবে না। স্বর্গীয় নির্দেশনার অধীনে আমি এসব ভবন ধ্বংস ও ওসব অবিশ্বাসী আনুগত্যহীন নেতাদের হত্যা করেছি, যারা অন্যদেরকে বিভ্রান্তির দিকে প্ররোচিত করে। এবং নিম্ন স্তরের লোকদের আমি কশাঘাতে শায়েস্তা করি, যতদিন পর্যন্ত এ অপকর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়।'*[২০] অন্য একটি দৃষ্টান্তে তিনি খবর পান যে, কোহানা গ্রামে হিন্দুরা একটা নতুন প্রতিমা-মন্দির নির্মাণ করেছে; সেখানে তারা সমবেত হতো ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চর্চা করতো। তিনি লিখেছেনঃ *'আমি নির্দেশ দিলাম যে, এ শয়তানি কর্মের নেতাদের বিকৃত আচরণ জনসমক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং তাদেরকে প্রাসাদের তোরণের সম্মুখে হত্যা করা হোক। আমি আরো আদেশ করলাম যে, বিধর্মীয় বই-পুস্তক, মূর্তি ও পূজার কাজে ব্যবহৃত পাত্রসমূহ... জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হোক। অন্যান্যদেরকে হুমকি ও দণ্ডদানের মাধ্যমে বিরত করা হয় – যা ছিল সকলের প্রতি সতর্কবাণী, যেন কোনো 'জিম্মি' একটা মুসলিম-শাসিত দেশে এরূপ অপকর্ম চর্চা অনুসরণ করতে না পারে।'*[২১]

মধ্য-যুগীয় ঐতিহাসিক আব্দুল কাদির বাদায়ুনি উল্লেখ করেছেনঃ মধ্য ভারতে গুলবর্গা ও বিদার সুলতানাতের বাহমানি সুলতানরা *'প্রতিবছর এক লক্ষ হিন্দু পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করা প্রশংসার কাজ বলে বিবেচনা করতেন।'*[২২] ফেরিশতা লিখেছেনঃ এক মুসলমানের মৃত্যুর প্রতিশোধে এক লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করা দাক্ষিণাত্য সুলতানাতের বাহমানি সুলতানদের একটা রীতি ছিল। ফলে, রাজা দ্বিতীয় দেব রায় এক যুদ্ধে দু'জন মুসলিম সেনাকে আটক করলে সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন আহমদ শাহ বাহমানি (১৪৩৬-৫৮) প্রতিজ্ঞা করেনঃ *'ডিউরে (দেব রায়) যদি বন্দি অফিসারদের জীবন নেয়, তার প্রতিশোধে তিনি প্রত্যেকের জন্য এক লক্ষ করে হিন্দুকে হত্যা করবেন।'* এ প্রতিজ্ঞায় আতঙ্কিত দেব রায় শুধু মুসলিম বন্দিকে মুক্ত করেই দেননি, সুলতানকে আনুগত্য কর দিতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।[২৩]

---

১৪. Ibid, p. 223
১৫. Ibid, p. 230
১৬. Ibid, p. 231
১৭. Nehru (1989), p. 208-09
১৮. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 297
১৯. Ibid, p. 366
২০. Ibid, p. 380
২১. Ibid, p. 381
২২. Lal (1999), p. 62
২৩. Farishtah, Vol. II, p. 267-68

আমির তিমুর তার স্মৃতিকথা 'মালফুজাত-ই-তিমুরী'-তে উলেখ করেছেন যে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইসলামি কর্তব্য পালনে তিনি ভারত আক্রমণ করেন '*গাজী (অবিশ্বাসী নিধনকারী) কিংবা শহীদ হওয়ার খায়েশে।*' দিল্লি আক্রমণের প্রাক্কালে (ডিসেম্বর ১৩৯৮) ইতিমধ্যে কব্জাকৃত বিপুল সংখ্যক বন্দিকে হত্যার হুকুম দানের ব্যাপারে তিনি লিখেছেন: '*ইসলামের গাজীরা যখন এ আদেশের খবর জানতে পায়, তখনই তারা তরবারি তুলে নেয় তাদের বন্দিদেরকে হত্যা করতে। ১০০,০০০ অবিশ্বাসী, অর্ধামিক পৌত্তলিককে হত্যা করা হয়*' একটি মাত্র দিনে।[২৪.]

আওরঙ্গজেবের অধীনে

ইসলামি শাসনের শেষ দিকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ ভারত (১৬৫৮-১৭০৭) ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দু মন্দির ও শিক্ষালয় ধ্বংস, এবং অবিশ্বাসীদেরকে (হিন্দু, শিখ প্রভৃতি) হত্যার অভিজ্ঞতা পায়। তার সরকারি দিনপঞ্জি 'মা-আসির-ই আলমগীর' অনুযায়ী, সম্রাট ১৬৬৯ সালে জানতে পান যে, '*বেকুব ব্রাহ্মণরা তাদের স্কুলগুলোতে বাজে বা ভ্রান্ত বইয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে, আর ছাত্ররা – মুসলমান ও হিন্দু উভয়ই – দূর-দূরান্ত থেকেও চলে আসত সে শয়তানি শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের আগ্রহে।*' একথা শুনে ক্রুদ্ধ আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ '*সমস্ত প্রাদেশিক গভর্নরকে আদেশ দেন অবিশ্বাসীদের শিক্ষালয় ও মন্দিরসমূহ আগ্রহের সাথে ধ্বংস করার জন্য; এবং পৌত্তলিকতার শিক্ষা ও চর্চা সম্পূর্ণরূপে রোধ করার জন্য তাদেরকে কড়া তাগিদ দেওয়া হয়।*'[২৫.] '*হিন্দুদের জন্য কোন সম্মানসূচক চিহ্ন ব্যবহার বা হাতির পিঠে চড়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। অমুসলিমদের উপর আরোপিত সবচেয়ে বড় বোঝা ছিল ১৬৭৯ সালে প্রবর্তিত মাথাপিছু ধার্য কর বা জিজিয়া।*'[২৬.] আওরঙ্গজেব ছিলেন হিন্দু-মন্দির কলুষিত করায় সেরা, তিনি হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেন। 'মা-আসির-ই আলমগীর'-এ লিখিত ১৬৭৯ সালের মাথাখারাপ করার মতো হিন্দুমন্দির ধ্বংসের তথ্য নিম্নরূপঃ

১. 'খান জাহান বাহাদুর যোধপুর থেকে আসেন ধ্বংসকৃত হিন্দু মন্দিরগুলো থেকে গৃহিত মূর্তি-বোঝাই করা কয়েকটি গাড়ি সঙ্গে নিয়ে।' ওসব মূর্তির কয়েকটি 'বড় মসজিদের সিঁড়ির নিচে রাখা হয় পদদলিত করার জন্যে।'
২. যখন যুবরাজ মোহাম্মদ আযম ও খান জাহান বাহাদুর উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হন '*পৌত্তলিকদের মূর্তি ধ্বংস অভিযান কার্যকর করতে*', প্রায় কুড়িজন রাজপুত যুবরাজ প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের মন্দির রক্ষার জন্য এবং '*ওসব গোঁড়াদেরকে*' নরকে প্রেরণ করা হয়, আর '*মন্দিরগুলো এরপর নির্মূল করা হয় ও অগ্রদূতেরা প্রতিমাগুলোকে ধ্বংস করে।*'
৩. আওরঙ্গজেব উদিসাগরের রানার নির্মিত তিনটি মন্দির ভাঙ্গার আদেশ করেন। সে মন্দির তিনটি ভাঙ্গার অভিযান থেকে ফিরে হাসান আলি খান উল্লেখ করেনঃ '*প্রাসাদের আশেপাশের মন্দির ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের আরো ১২২টি মন্দির নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।*'
৪. আরওঙ্গজেব চিতোরের দিকে অগ্রসর হন, এবং সেখানে ৬৩টি মন্দির ধ্বংস করা হয়।
৫. '*আম্বারের প্রতিমা-মন্দির ধ্বংসের আদেশ*' কার্যকর করে এসে আবু তুরাব জানানঃ '*তিন কুড়ি ও ছয়টি ওরূপ মন্দির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।*'[২৭.]

আওরঙ্গজেবের নির্দেশে কেবলমাত্র ১৬৭৯ সালেই ২০০টিরও বেশি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়। তার পঞ্চাশ বছর শাসনকালে কত হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস হতে পারে তা অনুমান করা দুর্বোধ্য নয়; কোন কোন হিসাবে ৫,০০০। মন্দির রক্ষাকারীদেরকেও অনেক সময় নির্মূল করা হতো, যার দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। আওরঙ্গজেব তার ভাই দারাসিকোকেও খাতির করেননি, যাকে তিনি হিন্দুধর্মে আগ্রহ দেখানোর জন্য স্বধর্মত্যাগী আখ্যায়িত করে মৃত্যুদণ্ড দেন। ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, আওরঙ্গজেব শিখ গুরু তেগ বাহাদুর সিংকে তার দুই সঙ্গীসহ হত্যা করেছিলেন কাশ্মীরের হিন্দুদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অপরাধে।

পারস্যের শাসক নাদির শাহ্ ১৭৩৮ সালে তার ভারত আক্রমণে প্রায় ২০০,০০০ মানুষ হত্যা করেন এবং বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠনদ্রব্য ও কয়েক হাজার সুন্দরী বালিকাসহ বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস নিয়ে ফিরে যান। ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ও শিল্পকলার উপর পণ্ডিত ফরাসী গ্রন্থকার অ্যালেইন দানিয়েলু (মৃত্যু ১৯৯৪) নাদির শাহর দিল্লি আক্রমণ সম্বন্ধে লিখেছেনঃ '*এক সপ্তাহব্যাপী তার সেনারা প্রত্যেককে হত্যা করে, সবকিছু লুণ্ঠন করে এবং গোটা গ্রামাঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, যাতে বেঁচে যাওয়া লোকেরা খাওয়ার জন্য কিছুই না পায়। তিনি মূল্যবান আসবাবপত্র, শিল্পকর্ম, ঘোড়া, কোহিনূর হীরা বা কোহিনূর মনি, বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ও ১৫০ মিলিয়ন (দেড় কোটি) স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ইরানে ফিরে যান।*'[২৮.] ভারত অভিযান থেকে তিনি এত বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে যান যে, ইরানে ফিরে গিয়ে নাদির শাহ তিন বছরের জন্য জনগণের উপর কর আরোপ বন্ধ রাখেন।[২৯.]

ভারতে মুসলিম দখলদারদের দ্বারা এমন ব্যাপক হারে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসের মত দৃষ্টান্ত বিজয়ের ইতিহাসে বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক একটা মন্দির ধ্বংসের পর সেখানে রক্ষিত মূর্তি ও ধনভাণ্ডার ভাংচুর ও লুটপাট করার পর বিধ্বস্ত

২৪. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 394,436
২৫. Ibid, Vol. VII, p. 183-184; also Bikaner Museum Archives, Exhibit No. 9
২৬. Antonova K, Bongard-Levin G & Kotovsky G (1979) *A History of India*, trs. Judelson K, Progress Publishers, p. 255
২৭. Elliot & Dawson, Vol. VII, p. 187-88.
২৮. Danielou A (2003) *A Brief History of India*, trs. Kenneth F. Hurry, Inner Traditions.
২৯. Nader Shah, Wikipedia, http:///en.wikipedia.org /wiki/Nadir-Shah

মন্দিরের সাজ-সরঞ্জামাদি দিয়ে সে স্থানেই মসজিদ নির্মাণ করা হতো। দিল্লির 'কোয়াত-উল-ইসলাম' (ইসলামের শক্তি) মসজিদটি ঐ এলাকার ১৭টি বিধ্বস্ত মন্দিরের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে নির্মাণ করা হয়।[৩০] অন্যান্যদের মধ্যে আমির খসরু ও সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের বর্ণনা অনুযায়ী (ইতিপূর্বে উল্লেখিত), মন্দিরের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদেরকে সাধারণত হত্যা করা হতো।

মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকদের বর্বরতার এসব জ্বল-জ্যান্ত বিবরণ গৃহীত হয়েছে প্রধানত তৎকালের মুসলিম ইতিহাসবিদগণের লিখিত তথ্য থেকে। তারা এসব সর্বনাশা বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী লিখেছেন অনেকটা আনন্দপূর্ণ ধর্মীয় গর্ববোধের সাথে। মুসলিম আগ্রাসক ও শাসকদের মন্দির ধ্বংসের প্রতি প্রবল আসক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে ফ্রান্সিস ওয়াটসন লিখেছেন: '*হিন্দুস্তানের মূর্তি-পূজকদের বিরুদ্ধে তাদের মন বিষে ভরা ছিল। মুসলিমরা বিপুল সংখ্যক প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য, যা সে সময়ের মুসলিম ইতিহাসবিদগণই নথিবদ্ধ করে গেছেন। অল্প ক্ষতি সাধিত কয়েকটি মাত্র মন্দির কোন মতে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক – শত শত নয়, হাজার হাজার – প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে তার পাথরগুলো টুকরো টুকরো করা হয়। প্রাচীন নগরী বারানসি ও মথুরায়, উজ্জয়ন ও মহেশ্বরে, জোয়ালামুখি ও দোয়ারকায় প্রাচীনকালের একটি মন্দিরও অক্ষত ও অটুট অবস্থায় ছিলনা।*'[৩১]

এমনকি মুসলিম শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে মহানুভব ও জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত আকবর রাজপুত প্রতিরোধীদেরকে সমর্থন করায় চিতোরে (১৫৬৮ সালে) প্রায় ৩০,০০০ আত্মসমর্পণকৃত হিন্দু কৃষককে বেপরোয়া হত্যার নির্দেশ দেন। সুদীর্ঘ সে অবরোধে ৮,০০০ রাজপুত সেনা নিহত হলে তিনি তাদের স্ত্রী-কন্যাসহ প্রাসাদের প্রায় ৮,০০০ নারীকে বন্দি ও ক্রীতদাসীকরণের নির্দেশ দেন। কিন্তু রাজপুত নারীরা বন্দি হয়ে যৌনদাসীতে পরিণত হয়ে ইজ্জত হারানোর চেয়ে নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে একযোগে অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়।[৩২] ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে, তার পিতা (জ্ঞানী ও দয়ালু সম্রাট আকবর) ও তার নিজস্ব শাসনাকালে (১৫৫৬-১৬২৭) মোট ৫০০,০০০ থেকে ৬০০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়।

ভারতে ইসলামের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা শুরু হয় সিন্ধু আক্রমণের মাধ্যমে এবং তার কোনো না কোনো অংশে তা চলতে থাকে সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক টিপু সুলতান (১৭৫০-৯৯)-এর শাসনকাল পর্যন্ত, যাকে দেখা হয় ভারতের একজন 'জাতীয়তাবাদী বীর' হিসেবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তার শক্তিশালী প্রতিরোধের কারণে। অথচ হায়াবাদানা রাওয়ের 'হিস্ট্রি অব মহিশূর' অনুসারে, ১৭৯০-এর দশকে এক দ্বীপাবলী উৎসবের দিন টিপু সুলতান মহীশূরের আইয়েঙ্গার সম্প্রদায়ের ৭০০ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেন, মাদ্রাজ ও তিরুমালিয়েঙ্গারের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল হ্যারিসের সঙ্গে তাদের চুক্তি করার অভিযোগে। সংক্ষেপিত এম.এম.কে.এফ.জি. নামের এক মুঘল জেনারেল টিপু সুলতানের একটি জীবনী (যা টিপুর পুত্র কর্তৃক সংশোধিত) লিখে যান। মুহিবুল হাসান অনুসারে পুস্তকটি জানায় যে, ত্রিবাঙ্কুরের যুদ্ধে টিপু সুলতান ১০,০০০ হিন্দু ও খ্রিষ্টানকে হত্যা এবং তাদের ৭,০০০-কে ক্রীতদাস বানান। ক্রীতদাসদেরকে সেরিনাগাপত্তমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাদের সুন্নত করানো (লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ) হয়, গোমাংস খাওয়ানো হয় ও ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়।[৩৩] তৎকালীন মুসলিম ইতিহাস লেখক কিরমানি তার 'নিশান-ই-হায়দারী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, টিপু সুলতান ৭০,০০০ কুরগিকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন। কিছু আধুনিক ইতিহাসবিদ টিপু সুলতান কর্তৃক এতগুলো লোকের জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর প্রচারণাকে অতিরঞ্জিত বলে থাকেন, যা করা হয়েছিল তাকে *ইসলামের রক্ষক বা নায়ক* হিসেবে দেখানোর এক প্রচেষ্টা।[৩৪] সংখ্যাটি সত্য হোক বা না হোক, কিন্তু সেকালীন ওসব মুসলিম ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবিরা খুশী মনেই নিশ্চিত করেন যে, ভারতে মুসলিম শাসনের অন্তিম দিনগুলোতেও তলোয়ারের দ্বারা অবিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিত করা তাদের কাছে স্পষ্টতই মহৎ কাজ হিসেবে বিবেচিত ছিল।

অ্যালেইন দানিয়েলু ভারতে মুসলিম আক্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন: '*৬৩২ সালের দিকে মুসলিমরা যখন প্রথম আসা শুরু করে, তখন থেকেই ভারতের ইতিহাসে খুন, হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের একটা দীর্ঘ একঘেয়েমি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এটা চলে তাদের ধর্ম, তাদের একক ঈশ্বরের পক্ষে "পবিত্র যুদ্ধের নামে"; ওসব বর্বররা সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে, নিশ্চিহ্ন করেছে পুরো জাতিসমূহকে।*' দানিয়েলু আরো লিখেছেন: মাহমুদ গজনী '*ছিলো মুসলিম নির্মমতার একটা প্রাথমিক দৃষ্টান্ত, যিনি ১০১৮ সালে মথুরায় মন্দির ভস্মিভূত করেন, কনৌজকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন এবং বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরটি ধ্বংস করেন, যা ছিল সমস্ত হিন্দুদের কাছে পবিত্র। গজনীর উত্তরসূরীরাও ছিল তারই মত নির্মমতার পরাকাষ্ঠা: পবিত্র বেনারস নগরীর ১০৩টি মন্দির ধূলিসাৎ করা হয়; এর বিস্ময়কর মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়; বিপুলাকার প্রাসাদগুলো বিধ্বস্ত করা হয়।*' প্রকৃতপক্ষে '*যা কিছু সুন্দর, পবিত্র, পরিশীলিত (ভারতীয়দের নিকট), তার সবকিছু সচেতনভাবে ধ্বংস করা*' ভারতে মুসলিম আক্রমণকারীদের নীতি ছিল বলে মনে হয়, বলেন দানিয়েলু।[৩৫]

আমেরিকান ইতিহাসবিদ উইল ডুরান্ট, ভারতে মুসলিম বিজয় ছিল সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত বলে যিনি মনে করেন, তিনি লিখেছেন: '*ইসলামি ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতগণ অষ্টম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের বীর যোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত হিন্দুদের উপর হত্যাযজ্ঞ, জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরিতকরণ, হিন্দু নারী ও শিশুদেরকে অপহরণ করে দাসবাজারে নিয়ে যাওয়া এবং মন্দির ধ্বংসের কাহিনী*

---

[৩০] Watson F and Hiro D (1979) *India: A Concise History*, Thames & Hudson, Inida, P. 96

[৩১] Ibid, p. 96

[৩২] Lal KS (1992) *The Legacy of Muslim Rule in India*, Aditya Prakashan, Delhi, p. 266-67

[৩৩] Hasan M (1971) *The History of Tipu Sultan*, Aakar Books, New Delhi, p. 362-63

[৩৪] Tippu Sultan, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Tipu-Sultan.

[৩৫] Danielou, p. 222

অতিশয় আনন্দ ও গর্বের সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করেছেন। সে সময়ে লাখ লাখ হিন্দু তলোয়ারের মুখে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়।'[৩৬] বস্তুত ভারতীয় বিধর্মীদের উপর ইসলামি নিষ্ঠুরতার এরূপ বিকৃত মহিমাকীর্তন ছিল ইসলামি প্রভাবের শেষকাল পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস লিখনে একটা সাধারণ ধারা। অন্যান্য অনেকের মধ্যে মোহাম্মদ আল-কাফি, আল-বিলাদুরী, আল-উৎবি, হাসান নিজামী, আমির খসরু ও জিয়াউদ্দিন বারানী প্রমুখ প্রখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবিদের লিপিপুঞ্জ তার প্রমাণ বহন করে।

ভারতে মুসলিমদের দ্বারা বিজিত বিধর্মীদেরকে হত্যা, ক্রীতদাসকরণ ও তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসসাধনের সমতুল্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। হিন্দুকুশ পর্বতটির এরূপ নামকরণের কারণ: ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ক্রীতদাসকে মুসলিম-অধ্যুষিত মধ্য এশিয়ায় বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বিরূপ আবহাওয়ার মুখে পতিত হয়ে তাদের বহু সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে। ইবনে বতুতা জানান (১৩৩৩ সালে বর্ণিত): '*হিন্দুকুশ মানে "ভারতীয়দের (হিন্দুদের) হত্যাকারী", কেননা ভারত থেকে আনা ক্রীতদাস বালক ও বালিকাদের বিপুল সংখ্যক সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের কারণে মারা যায়।*'[৩৭] হিমে জমাট বেঁধে হিন্দুকুশে কত সংখ্যক মানুষ মারা যায় তা অনিশ্চিত। মোরল্যান্ড জানান, '*তাদের সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে, বেঁচে যাওয়া ক্রীতদাসদের দামও বিদেশী বাজারে সস্তা হয়ে পড়ে।*'[৩৮]

ইসলামপূর্ব ভারত

একটা উন্নত সভ্যতা

মুসলিম বিজয়ের আগে ভারত ছিল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সভ্যতাসমূহের অন্যতম। বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, দর্শন, ঔষধ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভাস্কর্য ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তার ছিল উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও কৃতিত্ব। ভারতীয় গণিতবিদরা গণিতের ধারণা 'শূন্য' ('০') উদ্ভাবন করেন ও বীজগণিতের (অ্যালজেবরার) মৌলিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পারস্য সভ্যতার অনুসারী আব্বাসীয় খলিফারা ইসলামপূর্ব পারস্যের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহে আনুপ্রাণিত হয়ে[৩৯] পণ্ডিত ও বণিকদেরকে ভারতে পাঠান বিজ্ঞান, গণিত, ঔষধ ও দর্শনের উপর লিখিত বিভিন্ন দলিল ও মৌলিকগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য। নেহরু জানান: '*তারা ভারত থেকে ঔষধ ও গণিতের উপর প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেন। ভারতীয় পণ্ডিত ও গণিতবিদরা বিপুল সংখ্যায় বাগদাদে আসেন। বহু আরবীয় ছাত্র উত্তর ভারতের তক্ষশীলায় আসে পড়াশুনার জন্য, যা তখনো পর্যন্ত ছিল একটা খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঔষধশাস্ত্রে যার ছিল বিশেষত্ব।*'[৪০]

৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে এক ভারতীয় পণ্ডিত বীজগণিতের উপর দুটো গ্রন্থ সাথে নিয়ে বাগদাদে আসেন। একটি ছিল সপ্তম শতকের বিখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' (আরবদের নিকট যা 'সিন্দহিন্দ' হিসেবে পরিচিত)। এতে ছিল বীজগণিতের মৌলিক ধারণা। নবম শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলিম গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খোয়ারিজমী বীজগণিতের গাণিতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় কাজের সঙ্গে গ্রিক জ্যামিতির মিলন ঘটান। খোয়ারিজমী পরবর্তীতে 'ফাদার অব এ্যালজেবরা' বা 'বীজগণিতের পিতা' হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। 'আলগোরিদম' (বা 'আলগোরিজম') শব্দটি খোয়ারিজমীর নামের ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তর থেকে উদ্ভূত, যা ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহারের মাধ্যমে আল-খোয়ারিজমী কর্তৃক উন্নীত গাণিতিক হিসাব করার একটা কৌশল। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটিতে ছিল সংখ্যা চিহ্নিতকরণের বৈপ্লবিক পদ্ধতি, যার মধ্যে ছিল 'জিরো' বা 'শূন্য'-এর ধারণা, যা অন্যত্র অজানা ছিল। মুসলিম পণ্ডিতরা এ ভারতীয় সংখ্যা নিরূপক পদ্ধতিকে 'ইন্ডিয়ান (হিন্দি) সংখ্যা' বলতেন; পরে ইউরোপীয়রা এর নাম দেন 'আরবি সংখ্যা'।[৪১] এসব সাফল্যে যদিও মুসলিম চিন্তাবিদরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, কিন্তু তারা মাঝে মাঝেই আত্মতৃপ্তির সাথে এসব চুরি করা উদ্ভাবনের কৃতিত্ব এককভাবে দাবি করে থাকে। ইসলাম-পূর্ব ভারতের চমৎকার ও ইন্দ্রিয়-উদ্দীপক ভাস্কর্য এবং চমৎকার স্থাপত্য কর্মের ঐতিহ্য ছিল। মুসলিম দখলদাররা আসার পর সুদক্ষ ভারতীয় নির্মাতা ও কলাকুশলীরা তাদের নিজস্ব দক্ষতা ও ধারণার সঙ্গে মুসলিম ধারণার সংমিশ্রণে ইমারত ও স্থাপত্যে একটা নতুন ভারতীয়-ইসলামী বা ইন্দো-ইসলামিক মোজাইক সৃষ্টি করে, যা ভারতে স্বঘোষিত ইসলামি সভ্যতার 'ঐতিহ্যে' অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

আলবেরুনি (মৃঃ ১০৫০) ১০৩০ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইন্ডিকা'য় এসব প্রাচীন ভারতীয় সাফল্যের উপর বহু কিছু লিখেছেন। আরবীয় বিষয়ে পণ্ডিত এডোয়ার্ড সাচাউ ১৮৮০ সালে এ গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেন, যা ১৯১০ সালে '*আলবেরুনির ইন্ডিয়া*' নামে

---

৩৬. Durant W (1999) *The story of Civilization: Our Oriental Heritage*, MJF Books, New York, p. 459

৩৭. Gibb HAR (2004) *Ibn Battutah: Travels in Asia and Africa*, D.K. Publishers, New Delhi, p. 178

৩৮. Moreland WH (1923) *From Akbar to Aurangzeb*, Macmillan, London, p. 63

৩৯. Patronized by the pre-Islamic Sassanian kings of Persia, the great Nestorian Learning centre of Jundhishpur had become a flourishing centre for translating the ancient works of Greek, Indian and other origin. Under king Khosro I (531-579), it had become a melting pot of Syrian, Persian and Indian scholars. Khosro I had sent his own physician to India in search of medical books. These were then turned from Sanskrit into Pahlavi (Middle Persian), and many other scientific works were translated from Greek into Persian or Syriac.

৪০. Nehru (1989), p. 151

৪১. Eaton RM (2000) *Essays on Islam and Indian History*, Oxford University Press, New Delhi, p. 29

প্রকাশিত হয়। সাচাউ লিখেছেন: '*আলবেরুনির দৃষ্টিতে হিন্দুরা ছিলেন উৎকৃষ্ট দার্শনিক, ভাল গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী।*'[৪২] গণিতে ভারতীয় সাফল্য সম্বন্ধে আলবেরুনির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

> সংখ্যা উল্লেখের ক্ষেত্রে আমরা যেমন হিব্রু বর্ণমালায় বিন্যাসিত আরবি অক্ষর ব্যবহার করি, তারা (ভারতীয়রা) তা করে না। আমরা (এখন) যে সংখ্যা-চিহ্ন ব্যবহার করি, সেটা হিন্দু চিহ্নেরই পরিশীলিত রূপ। আরবরাও হাজারে গিয়েই থেমে যায়, যা নিশ্চয়ই সঠিক ও সেটা করাই খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যারা সংখ্যা পদ্ধতিতে বা গণনায় হাজারকেও ছাড়িয়ে যায়, তারা হলো হিন্দুরা – অন্তত তাদের গাণিতিক কৌশলগত রাশিতে মুক্তভাবে বা কোন শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী আবিষ্কৃত; অন্যান্য ক্ষেত্রে, উভয় পদ্ধতি একত্রে মিশ্রিত। ধর্মীয় কারণে তারা ১৮ বর্গ পর্যন্ত সংখ্যার বর্গের নাম সম্প্রসারণ করেছে, যাতে গণিতবিদরা ব্যাকরণবিদের সহযোগিতা পেয়েছে সব রকমের শব্দ প্রকরণে।[৪৩]

আলবেরুনি জানান, ভারতীয় জ্ঞান, যেমন 'কালিমা' ও 'দিমনা' উপকথা এবং বিখ্যাত 'চারকা' সহ ঔষধশাস্ত্রীয় বই-পুস্তক ইত্যাদি, সংস্কৃত থেকে সরাসরি অনুবাদ অথবা প্রথমে ফারসি ভাষায় অনুদিত হওয়ার মাধ্যমে আরবদের কাছে আসে। সাচাউ মনে করেন যে, ভারত থেকে বাগদাদে আসা জ্ঞানের প্রবাহ সংঘটিত হয় দুটো পৃথক পর্বে। তিনি লিখেছেন:

> সিন্ধু দেশ যখন খলিফা মনসুরের প্রকৃত শাসনাধীনে ছিল (৭৫৩-৭৪), ভারতের সে অংশ থেকে বাগদাদে দূত আসে এবং যাদের মধ্যে ছিল পন্ডিত ব্যক্তিরাও, যারা সঙ্গে আনেন ব্রাহ্মগুপ্তের দুটো বই: 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' ও 'খন্দখাদিয়াকা' (আরকান্দা)। এসব পণ্ডিতদের সহায়তায় আলফাজারী, সম্ভবত ইয়াকুব ইবনে তারিকও, এগুলো অনুবাদ করেন। উভয় গ্রন্থই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ও যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। এ ঘটনার সূত্রেই আরবরা সর্বপ্রথম জোতির্বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। টলেমীর আগে তারা ব্রহ্মগুপ্তের নিকট থেকে (এ বিষয়ে) শিক্ষা গ্রহণ করে।[৪৪]

সাচাউ আরো লিখেছেন যে, হিন্দু জ্ঞান লাভের আরো একটি প্রবাহ আরব বিশ্বে এসেছিল খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনকালে (৭৮৬-৮০৮)। বলখ্-এর খ্যাতনামা রাজকর্মচারী পরিবার 'বারমাক', যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত হলেও গুপ্তভাবে তাদের বংশগত বৌদ্ধ ঐতিহ্য প্রজন্মান্তরেও ত্যাগ করেন নি, তারা

> ...পণ্ডিতদেরকে ভারতে পাঠাতেন সেখানে ঔষধশাস্ত্র এবং ঔষধ প্রস্তুত প্রণালিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য। এছাড়া, তারা হিন্দু পণ্ডিতদেরকে বাগদাদে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন, তাদেরকে হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দিতেন, এবং তাদেরকে ঔষধশাস্ত্র, ঔষধ প্রস্তুত বিজ্ঞান, বিষবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষীবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর সংস্কৃত গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও মুসলিম পণ্ডিতরা কখনো কখনো আলমুয়াফ্ফুক সহ অন্যান্য বারমাকদের প্রতিনিধিরূপে একই উদ্দেশে ভারতে আসতেন, আলবেরুনির সময়ের খুব বেশি আগে নয়।[৪৫]

অধিকন্তু আরবরাও সাপ, বিষ, পশুরোগবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, নীতিবিদ্যা, রাজনীতি ও যুদ্ধবিজ্ঞানসহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে ভারতীয় রচনাবলী অনুবাদ করে। সাচাউ যোগ করেন: '*অনেক আরব লেখক হিন্দু পণ্ডিতদের থেকে গৃহীত অনেক বিষয়ের উপর মৌলিক গ্রন্থ, টীকা ও উদ্ধৃতাংশ প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত হয়। তাদের একটা প্রিয় বিষয় ছিল ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, যার জ্ঞান আলকিন্দি ও অন্যান্যদের প্রকাশনার মাধ্যমে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।*'[৪৬]

একাদশ শতাব্দীর স্পেনীয় মুসলিম পণ্ডিত সাইদ আল-আন্দালুসি বিশ্ব-বিজ্ঞানের উপর লিখিত তার 'দ্য ক্যাটাগরিজ অব নেশনস' ('জাতিসমূহের শ্রেণীকরণ') গ্রন্থে ভারতকে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে চিত্রিত করেন। উক্ত গ্রন্থটি ভারতকে বিজ্ঞানচর্চার প্রথম জাতিরূপে স্বীকৃতি দেয় এবং ভারতীয়দেরকে তাদের প্রজ্ঞাশীলতা, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় ও দুর্লভ আবিষ্কারের জন্য প্রসংশা করেছে। এতে বলা হয়েছে:

> ভারতীয়রা তাদের কৃতিত্ববলে সংখ্যাশাস্ত্র ও জ্যামিতিবিদ্যা গবেষণায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। তারা তারকারাজির চলাচলে (জ্যোতির্বিদ্যায়), আকাশের রহস্য উদঘাটনে (জ্যোতিষ শাস্ত্র) ও অন্যান্য গাণিতিক গবেষণায় অজস্র তথ্য অর্জন করেছে এবং জ্ঞানের শীর্ষে পৌঁছেছে। এর পরও চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বিভিন্ন ঔষধের শক্তি, মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য এবং বস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহ (কেমিস্ট্রি) প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানে তারা অন্যান্য জাতিকে অতিক্রম করেছে।[৪৭]

ইসলামের প্রাথমিককালের (সপ্তম-অষ্টম শতক) বহু মুসলিম পণ্ডিত তৎকালীন অনেক জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরী সম্বলিত প্রাণবন্ত ও সম্পদশীল ভারতের কথা লিখে গেছেন (নিচে বর্ণিত)। ভারতের ইসলামপূর্ব সভ্যতা সম্বন্ধে ফ্রান্সিস ওয়াটসন উল্লেখ করেন:[৪৮]

---

[৪২] Sachau EC (1993) *Alberuni's India*, Low Price Publications, New Delhi/Sachau EC (2002) *Alberuni's India*, Rupa & Co., New Delhi, Preface, p. XXX

[৪৩] Ibid, p. 160-61

[৪৪] Ibid, p. XXXIII-XXXIV

[৪৫] Ibid, p. XXXIII

[৪৬] Ibid, p. XXXVI

[৪৭] al-Andalusi S (1991) *Science in the Medieval World: Book of the Categories of Natilons*, Translated by Salem SI and Kumar A, University of Texas Press, Chapter 5.

[৪৮] Watson & Hiro, p. 96

এটা স্পষ্ট যে, মুসলিম আক্রমণকারীরা যখন ভারতের দিকে নজর দেয় (অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী), তখন দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অঞ্চল ছিল তার সম্পদের জন্য, যেমন মূল্যবান ও অর্ধমূল্যবান পাথর, ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং চারুশিল্প ও শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি। দশম শতাব্দীর হিন্দুস্তান দূরকল্প দর্শন, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকরণ, গণিত ও প্রকৃতির কর্ম-প্রক্রিয়ার জ্ঞান প্রভৃতি অঙ্গনে সাফল্যের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমের সমকালীন দেশগুলোর চেয়ে অধিক অগ্রসর ছিল। মধ্যযুগের প্রথম দিকে হিন্দুরা প্রশ্নাতীতভাবে অনেক বিষয়ে চীনা, পারস্য (সাসানিয়ানরাসহ), রোমান ও বাইজেন্টাইনদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল। এ উপমহাদেশে শিব ও বিষ্ণুর অনুসারীরা নিজেদের জন্য মননশীলভাবে বিবর্তিত এমন একটি সমাজ তৈরি করেছিল – যেটা ছিল আনন্দপূর্ণ ও সমৃদ্ধশীলও – যা তৎকালীন ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম একেশ্বরবাদীরা অর্জন করতে পারেনি। মুসলিম দখলদাররা আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করার আগে মধ্যযুগীয় ভারত ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তিপূর্ণ সংস্কৃতি এবং সর্বকালে বিশ্বের পাঁচটি শীর্ষস্থানীয় সভ্যতার একটি।

হিন্দু শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে দেখ, যা মুসলিম মূর্তিধ্বংসকারীরা মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করেছে। পৌরাণিক হিন্দু ভাস্কর্য ছিল সর্বাধিক তেজস্বী ও ইন্দ্রিয়-জাগরণকারী – যা বিশ্বের অন্যত্র সৃষ্ট মানবমূর্তির চেয়ে আকর্ষণীয় ও মনোরম ছিল (কেবলমাত্র প্রাক গ্রিক শিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পকর্মের সাথে হিন্দু মন্দিরের এসব ভাস্কর্যের তুলনা করা যেত)। পৌরাণিক হিন্দু মন্দিরগুলোর স্থাপত্যকর্ম ছিল বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্যকারী, অলঙ্কারিত ও মন্ত্রমুগ্ধকারী স্থাপত্যরীতি (ধর্মীয় স্থাপত্যকর্মের মধ্যে কেবলমাত্র ফ্রান্সের ক্যাথেড্রালসমূহের গথিক শিল্পকর্ম হিন্দু মন্দিরের এ জটিল স্থাপত্যকর্মের সঙ্গে তুলনার যোগ্য)। বিশ্বের কোনো ঐতিহাসিক সভ্যতার শিল্পীরাই প্রাচীন হিন্দুস্তানি চারুশিল্পী ও কারিগরদের মতো মেধার প্রকাশ ঘটাতে পারেনি।

প্রাচীন গ্রিকরা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান, ঔষধশাস্ত্র ও দর্শনে অধিকতর অবদান রেখেছিল, তথাপি ভারত ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্যের সকল ক্ষেত্রেই অনিবার্যরূপে একটা নেতৃস্থানীয় সভ্যতা।

সহনশীল ও মানবিক সমাজ

সাইদ আল-আন্দালুসি উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক সাফল্য ছাড়াও '*বহু শতাব্দী যাবত সকল জাতিরই জানা যে, ভারতীয়রা পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানের আধার, সৌন্দর্য ও বৈষয়িকতার উৎস। তারা সর্বোচ্চ চিন্তাশীল ও নীতিকাহিনীর মানুষ...।*' বস্তুত ভারত শুধু বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট সভ্যতাই ছিল না, উৎকৃষ্ট মানবতা, বীরত্বে বিনয় ও নৈতিক আচরণেও দখলদার মুসলিমদের তুলনায় উৎকৃষ্টতর ছিল। ইসলামি দখলের পূর্বে ভারতের হিন্দু রাজা ও রাজপুতরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো সমকালীন অন্যান্য সভ্যতাগুলোর মতোই, কিন্তু তা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। মুসলিম পর্যটক বণিক সুলায়মান তার 'সালসিলাতুত তারিখ' (লিখিত ৮৫১ খ্রি:) গ্রন্থে লিখেছেন: '*ভারতীয়রা কখনো কখনো রাজ্যজয়ের যুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু সেরকম ঘটনা খুব বিরল।*' সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের বহরের সঙ্গে চীনা সম্রাটের দরবারে যাওয়ার পথে ইবনে বতুতা আশ্চর্য হয়ে যান মালাবারের (কেরালার) হিন্দু শাসকদের পরস্পরের ভূখণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও যুদ্ধবিগ্রহ না করার মনোভাব দেখে। তিনি লিখেছেন: মালাবরে '*বার জন বিধর্মী শাসক রয়েছে, তাদের কেউ কেউ পঞ্চাশ হাজার সেনার সামরিক বাহিনীতে শক্তিমান এবং অন্যরা দুর্বল, মাত্র তিন হাজার সেনার মালিক। তথাপি তাদের মধ্যে বিবাদ বলে কিছু নেই এবং শক্তিধর রাজারা কখনোই দুর্বলদের দেশকে গ্রাস করার আশা পোষণ করে না।*'[৪৯] মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতে (এবং অন্য সর্বত্র) শুধুমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধেই নয়, তাদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে লাগামহীন যুদ্ধবিগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। গোটা মুসলিম শাসনকালে ভারতের সর্বত্র মুসলিম সেনানায়ক, প্রধানগণ ও যুবরাজদের নিজেদের মধ্যেও বিরামহীন বিদ্রোহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনায় পূর্ণ ছিল। সুতরাং মালাবরের শাসকদের শান্তিপ্রিয়তা ও যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবে ইবনে বতুতার আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপারটি সহজেই বোধগম্য। সোলায়মান আরো জানান: ভারতীয় রাজারা নিয়মিত বেতনভুক্ত সেনাবাহিনীও রাখতেন না; সেনাদেরকে বেতন দেওয়া হত শুধু যখন তাদেরকে যুদ্ধের জন্য ডাকা হতো; '*যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তারা নাগরিক জীবনে ফিরে যেতো এবং রাজার নিকট থেকে কোনো অনুদান না নিয়ে নিজেরাই নিজস্ব ভরণপোষণ চালাতো।*'[৫০]

ভারতীয়রা শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়েই উচ্চ নৈতিক প্রথা ও আচরণ মেনে চলতো। যুদ্ধ ও লড়াই প্রধানত বিরোধী পক্ষের যোদ্ধা শ্রেণীর ক্ষত্রিয়দের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতো, যারা সাধারণত খোলা মাঠে যুদ্ধ করতো। যুদ্ধে তারা একটা নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলতো, এবং বিজয় ও বস্তুগত লাভের খাতিরে তা বিসর্জন দেওয়া মৃত্যুর চেয়েও লজ্জাজনক কাজ মনে করতো। এমনকি বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ আল-ইদ্রিসীও লিখেছেন যে, হিন্দুরা কখনো ন্যায় বিচার থেকে দূরে সরে যেতো না (নিচে আলোচিত)। ধর্ম শিক্ষক ও পুরোহিত এবং অযোদ্ধা, বিশেষত নারী ও শিশুদেরকে, সাধারণত যুদ্ধের ডামাডোলের বাইরে রাখা হতো। ধর্মীয় প্রতীক ও স্থাপনা – যেমন মন্দির, চার্চ ও মঠ ইত্যাদি – এবং বেসামরিক বাসস্থান সাধারণত আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস প্রক্রিয়ার বাইরে থাকতো। যুদ্ধে মালামাল লুণ্ঠন, যা ইসলামের পবিত্র যুদ্ধে স্বর্গীয়ভাবে অনুমোদনকৃত একটি প্রধান লক্ষ্য, ইসলামপূর্ব ভারতে তা যুদ্ধ ও বিজয়ের অংশ ছিল না। পরাজিত পক্ষের নারীদেরকে সাধারণত আটক কিংবা তাদের সতীত্বহরণ করা হতো না – যা ছিল সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার রীতি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, উদাহরণস্বরূপ চীন ও গ্রিক সভ্যতা। মার্চেন্ট সোলায়মানও ভারতীয় যুদ্ধবিগ্রহে এরূপ কিছু নৈতিক আচরণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: '*কোনো রাজা প্রতিবেশী কোনো রাজ্যকে পরাজিত করলে তিনি পরাজিত রাজ-পরিবারের কোনো সদস্যের উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন, যিনি বিজয়ী রাজার নামে সে রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। পরাজিত রাজ্যের বাসিন্দারা কোনক্রমেই অন্যরূপ কিছু সহ্য করবে না।*'[৫১] দশম শতকের মুসলিম

---

[৪৯] Gibb, p. 232

[৫০] Elliot & Dawson, Vol. I, p. 7

[৫১] Ibid

ইতিহাসবিদ আবু জাইদুল হাসান জাবাজ-এর (শ্রীবিজয়া অথবা জাভার) মহারাজা কর্তৃক কুমার (ক্ষেমার; এগুলো বর্ধিত ভারতীয় সভ্যতার অংশ ছিল) রাজ্য বিজয় সম্বন্ধে লিখেছেন।[৫২] কুমার রাজ্যের তরুণ উদ্ধত যুবরাজ জাবাজ রাজ্য দখলের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, যা শুনে ক্ষুব্ধ জাবাজের রাজা কুমার রাজ্য আক্রমণ করে। কুমারের রাজপ্রাসাদ দখল ও উদ্ধত যুজরাজকে হত্যার পর জাবাজের রাজা '*প্রত্যেকের নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়ে তারপর নিজে কুমারের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।*' অতঃপর তিনি কুমারের উজিরকে (প্রধানমন্ত্রী) উদ্দেশ্য করে বলেন:

> '*আমি জানি যে, তুমি নিজে একজন সত্যিকার মন্ত্রীর মতো ব্যবহার করেছো; এখন তোমার আচরণের প্রতিদান গ্রহণ করো। আমি জানি তুমি তোমার প্রভুকে ভাল উপদেশই দিয়েছো, কিন্তু সে তা মাথায় তোলে নি। এ সিংহাসনে বসার যোগ্য একজন লোক খুঁজে বের করো এবং তাকে ঐ নির্বোধের স্থলে বসাও।*' অতঃপর মহারাজা তৎক্ষণাৎ নিজ দেশে ফিরে গেলেন, এবং তিনি কিংবা তার কোনো লোক কুমারের রাজার মালিকানাধীন কোনো বস্তু স্পর্শও করলেন না।[৫৩]

প্রাচীন গ্রিক পর্যটক ও ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০-২৯০) ভারত সফরকালে ভারতীয় যুদ্ধবিগ্রহের অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। অ্যালেইন দানিয়েলু তার সে পর্যবেক্ষণ এভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন:

> যখন অন্যান্য জাতির মধ্যে যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় জমিজমা ধ্বংস করে তাকে কর্ষণ-অযোগ্য পতিত জমিতে পরিণত করা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, তখন বিপরীত পক্ষে ভারতীয়দের মধ্যে কৃষিকাজের লোকেরা একটি পবিত্র ও অলংঘনীয় শ্রেণীরূপে বিবেচিত; জমিকর্ষক বা চাষিরা, এমনকি যখন কাছাকাছি কোথাও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, তখনো তারা কোনো রকম বিপদের আশংকায় ভোগে না; কেননা যুদ্ধে রত দু'পক্ষ কেবলমাত্র পরস্পরকে হত্যা করে; কিন্তু কৃষিকাজে নিযুক্তদেরকে বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকে। তদুপরি তারা কখনো শত্রুপক্ষের জমি আগুন লাগিয়ে ধ্বংসসাধন করে না বা তাদের বৃক্ষ নিধন করে না।[৫৪]

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রাচ্য সভ্যতার উপর নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আর্থার বাশাম (মৃত্যু ১৯৮৬) প্রাচীন ভারতে যুদ্ধের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে লিখেছেন: '*তার গোটা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে, কোন শহরের উপর তরবারি চালানো বা অযোদ্ধা জনগণকে হত্যার কাহিনী হিন্দু ভারতে খুব কমই রয়েছে। অ্যাসিরিয়ার রাজাদের ভয়ঙ্কর বিকৃত কর্মকাণ্ড, যারা তাদের বন্দিদেরকে জীবন্ত চামড়া ছিলে ফেলতো, প্রাচীন ভারতে এহেন আচরণের কোনো ঘটনা নেই। আমাদের নিকট প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো এর মানবতা।*[৫৫] সপ্তম শতকে চীন থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, ভারতের শাসক যুবরাজদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলা সত্ত্বেও দেশটি সেগুলোর দ্বারা সামান্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে আগত চীনা তীর্থযাথী ফাক্সিয়ান ভারতের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নত সংস্কৃতি অবলোকন করে স্তম্ভিত হয়ে যান। লিন্ডা জনসন লিখেছেন: যুদ্ধ-বিধ্বস্ত চীনে লালিত-পালিত ও বড় হওয়া ফাক্সিয়ান এ দেশটি দ্বারা ভীষণভাবে অভিভূত হন, যার শাসকরা জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে হত্যা করার চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মকর্ম উৎসাহিত করণে বেশি উদ্বিগ্ন ছিল।[৫৬]

ইসলামি যুদ্ধের নীতিমালা

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ভারতে আগ্রাসী মুসলিম দখলদাররা কোরান ও সুন্নত ভিত্তিক একটা সম্পূর্ণ নতুন যুদ্ধনীতি নিয়ে আসে। সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকগণ জানান যে, একটা সাধারণ নীতিরূপে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত বিপক্ষীয় সৈন্যকে হত্যা করতো। যুদ্ধে জয়ের পর তারা প্রায়শঃই বেসামরিক গ্রাম ও শহরের উপর চড়াও হয়ে প্রায়ই যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন বয়সী লোকদেরকে হত্যা করতো; তাদের বাড়িঘর বিধ্বস্ত ও লুটপাট করতো; কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহর অগ্নিসংযোগে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করতো; বেসামরিক জনগণের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পুরোহিত ব্রাহ্মণ, যাদের উপর সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে আস্থাবান ছিল, তারা হতেন মুসলিমদের নির্মূল অভিযানের বিশেষ লক্ষ্য; অবিশ্বাসীদের ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্র, যেমন হিন্দু ও জৈন মন্দির, বৌদ্ধ মঠ, শিখ গুরুদুয়ারা ও স্বদেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল অপবিত্রকরণ, ধ্বংসসাধন ও লুণ্ঠনের প্রধান লক্ষ্য; আর নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাসরূপে বিপুল সংখ্যায় আটক করা হতো। তারা বন্দিকৃত সুন্দরী যুবতীদেরকে যৌন দাসীরূপে ব্যবহার করতো; অন্যদেরকে গৃহকর্মে নিযুক্ত করতো ও বাকীদেরকে বিক্রি করে দিতো। লুণ্ঠিত মালামালের বিপুলত্ব ও সে সাথে বন্দির সংখ্যা দিয়ে বিচার করা হতো সামরিক অভিযানের সাফল্য ও গৌরব, যা মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিহাসবিদদের মহিমাকীর্তনে প্রতিফলিত হয়েছে। যখন বিপুল সংখ্যক বিধর্মী নিহত হতো, তখন সুলতান মোহাম্মদ গোরী, কুতুবুদ্দিন আইবেক ও সম্রাট বাবর সহ অনেকেই বিশালাকার 'বিজয়স্তম্ভ' নির্মাণ করতেন সেসব হতভাগ্যদের মস্তক দ্বারা, সে বিজয়কে উদযাপন করতে।

দাক্ষিণাত্য সুলতানাতের সুলতান আহমদ শাহ বাহমনি (১৪২২-৩৬) বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করেন, যে বিষয়ে ফেরিশতা লিখেছেন: '*তিনি যেখানেই যেতেন নির্দয় ও নির্মমভাবে নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করতেন। এ ঘটনা তার চাচা ও পূর্বসূরী মোহাম্মদ শাহ ও*

---

৫২. The Southeast Asian kingdoms of Srivijaya, Java and Khmer were then an extension of the Indian civilization with a firmly rooted Hindu-Buddhist religious influence. The famous Muslim historian al-Masudi had met Zaidul Hasan in Basra in 916, and reproduced this story in his Meadows of Gold.

৫৩. Elliot & Dawson, Vol. I, p. 8-9

৫৪. Danielou, p. 106

৫৫. Basham AL (2000) *The Wonder That Was India*, South Asia Books, Columbia, p. 8-9

৫৬. Johnson L (2001) *Complete Idiot's Guide to Hinduism*, Alpha Books, New York, p. 38

বিজয়নগরের রাজাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির (বেসামরিক লোকদের উপর অত্যাচার না করার) সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন নিহতের সংখ্যা ২০ হাজার পূর্ণ হত, তখন তিনি তিন দিনের জন্য থেমে সে রক্তাক্ত ঘটনা উদযাপনে আনন্দোৎসব করতেন। তিনি পৌত্তলিক মন্দির ভাংচুর ও ব্রাহ্মণদের কলেজগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন।[৫৭] মুসলিম দখলদার ও শাসকরা কোরান ও নবির হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলামি পবিত্র যুদ্ধের খাতিরে এসব বর্বরতামূলক কর্মে লিপ্ত হতো। মদীনার বানু কোরায়জা (৬২৭) বা খাইবারের ইহুদী গোত্রের উপর নবির আক্রমণ (৬২৮) এবং তাদের প্রতি তাঁর আচরণের ধরণ পরবর্তীকালীন ইসলামের মহান বীরদের দ্বারা অনুকরণের আদর্শ নজির বা দৃষ্টান্তরূপে কাজ করে।

যুদ্ধ সংক্রান্ত হিন্দু ও ইসলামি নীতির পার্থক্য স্পষ্টতরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছিল দিল্লি ও আজমীরের রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে সুলতান মোহাম্মদ গোরীর আক্রমণে (১১৯১)। তার প্রথম আক্রমণে মোহাম্মদ গোরী পরাজিত ও বন্দি হন পৃথ্বিরাজের হাতে। ভারতের উত্তর সীমান্তে তার অনেক গণহত্যা, ক্রীতদাসকরণ, লুটতরাজ ও ধ্বংসসাধন মূলক বর্বরোচিত আক্রমণ সত্ত্বেও পৃথ্বিরাজ চৌহান গোরীকে ক্ষমা করে দেন এবং কোনরূপ অবমাননা ও শাস্তি ছাড়াই মুক্ত করে দেন। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই গোরী তার বাহিনীকে পুনর্গঠিত করে পুনরায় আক্রমণ করে দিল্লির বিনয়ী বীর ও হিন্দু রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করেন।[৫৮] মোহাম্মদ গোরী তার প্রতি পৃথ্বিরাজের পূর্ববর্তী মহানুভবতার উপযুক্ত প্রতিদান দেন পৃথ্বিরাজের চক্ষু দুটি উৎপাটনের পর তাকে হত্যা করে।[৫৯]

হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের বৈপরিত্যের আরো নমুনা পাওয়া যায় ১৩৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের রাজা কৃষ্ণরায়ের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের সুলতান মোহাম্মদ শাহর আক্রমণ সম্পর্কিত ফেরিশতার বর্ণনায়। মোহাম্মদ শাহ এ আক্রমণে ১০০,০০০ বিধর্মীকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করেন এবং '*বিধর্মীদের উপর হত্যাযজ্ঞ এমনই তীব্ররূপ ছিল যে, তাদের তলোয়ারের কবল থেকে অন্তঃসত্ত্বা নারী ও কোলের শিশুরাও রক্ষা পায়নি,*' লিখেছেন ফেরিশতা।[৬০] মুসলিম বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা মূলকভাবে হামলা করলে কৃষ্ণরায় পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু তার ১০,০০০ যোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ফেরিশতা লিখেছেন: মোহাম্মদ শাহর '*প্রতিশোধের তৃষ্ণা এতকিছুর পরও অতৃপ্ত রয়ে যায় এবং তিনি বিজয়নগরের আশেপাশের সকল বাসিন্দাকে হত্যার আদেশ দেন।*'

এমতাবস্থায় কৃষ্ণরায় শান্তি স্থাপনের জন্য দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু মোহাম্মদ শাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর সুলতানের এক প্রিয়ভাজন উপদেষ্টা তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি কেবল এক লাখ হিন্দুকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাদের জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে নয়। এতে সুলতান উত্তর করেন যে, '*সে প্রতিজ্ঞার দ্বিগুণ সংখ্যক সম্ভবত নিধন করা হয়েছে*', তথাপি তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা কিংবা গণহত্যা ত্যাগ করতে রাজী নন।[৬১] এর অর্থ দাঁড়ায়: এ আক্রমণটিতে দুই লাখের মতো লোককে হত্যা করা হয়েছিল। অবশেষে দূতরা বিপুল অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সুলতানকে শান্তি স্থাপনের সিদ্ধান্তে রাজী করাতে সক্ষম হন এবং তারা সুলতানের সঙ্গে কিছু কথা বলার অনুমতি চান। ফেরিশতার জানান: '*কথা বলার অনুমতি পেয়ে তারা বলেন যে, দোষী ব্যক্তির (রাজার) অপরাধের জন্য কোনো ধর্মই নির্দোষ লোকের উপর শাস্তি আরোপের বিধান দেয় না, বিশেষত অসহায় নারী ও শিশুদের উপর: যদি কৃষ্ণরায় কোনো অপরাধ করে থাকে, দরিদ্র ও দুর্বল নাগরিকরা সে ভুলের ভাগীদার হতে পারে না।*' এতে মোহাম্মদ শাহ উত্তর করেন: '*যা কিছু করা হয়েছে তার সবই স্বর্গীয় রায়ের মোতাবেক (যেমন কোরানের ৯:৫ নং আয়াতে পৌত্তলিকদেরকে হত্যা করতে আল্লাহর নির্দেশ), এবং সেটা পরিবর্তন বা অমান্য করার ক্ষমতা তার নেই।*' পরিশেষে দূতেরা মোহাম্মদ শাহর মনে মানবিক চেতনা জাগাতে সক্ষম হন। ফেরিশতা জানান: '*এরপর তিনি শপথ করেন যে, কোনো বিজয়ের পর তিনি একজন শত্রুকেও হত্যা করবেন না এবং তার উত্তরসূরীদেরকেও একই পথ অনুসরণের নির্দেশ দিবেন।*'[৬২] সুতরাং ভারতীয় মানবতা এক্ষেত্রে এক মুসলিম শাসককে তার পবিত্র ধর্মীয় অথচ নির্মম দায়িত্ব বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে।

যুদ্ধনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বৈপরিত্য সম্বন্ধে জন জোন্স-এর পর্যবেক্ষণ: '*একটা অদ্ভুত সত্য হলো, প্রথমতঃ মোহাম্মদের অনুসারীরা এবং দ্বিতীয়তঃ নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী যিশুর ভক্তরা (অর্থাৎ পর্তুগিজরা) এ দেশটি আক্রমণ শুরু না করা পর্যন্ত ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বীভৎস ও রক্তাক্ত দানবীয়তার কথা শোনা যায়নি।*'[৬৩] উনিশ শতকের প্রখ্যাত দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার (মৃত্যু ১৮৬০) ভারতে ইসলামি আক্রমণের নোংরা কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে: '*সীমাহীন নির্যাতন, ধর্মীয় যুদ্ধবিগ্রহ, ঐরূপ রক্তাক্ত উম্মাদনা, যার সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের কোনোই ধারণা ছিল না। প্রাচীন মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস ও বিকৃতকরণ – একটা শোকাবহ, নোংরা ও বর্বরোচিত কাজ – যা এখনো একেশ্বরবাদী হিংসাত্মক রোষের সাক্ষ্য বহন করে চলছে... যা গজনীর মাহমুদের সেই অভিশপ্ত স্মৃতি থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত চলমান থাকে... হিন্দুদের বেলায় আমরা এরকম কোনো কিছু শুনি না।*'[৬৪] ইংরেজ উপন্যাসিক আলডুয়াস হাক্সলি (১৮৯৪-১৯৬০) ইসলামের সেচ্ছাচারিতামূলক ইতিহাসের সঙ্গে পরবর্তীকালের খ্রিষ্টানধর্মের অনুরূপতা দেখাতে তার 'এন্ডস অ্যান্ড মীন্স' গ্রন্থে লিখেছেন:

---

৫৭. Ferishtah, Vol. II, p. 248
৫৮. Dutt, KG, *The Modern Face of Ang Kshetra*, Tribune India, 17 October 1998
৫৯. Prithviraj III, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Prithaviraj-Chauhan
৬০. Ferishtah, Vol. II, p. 195
৬১. Ibid, p. 196-97
৬২. Ibid, p. 197
৬৩. Jones JP (1915) India-Its Life and Thought, The Macmillan Company, New York, p. 166
৬৪. Saunders TB (1997) *The Essays of Arthur Schopenhauer: Book 1: Wisdom of Life*, De Young Press, p. 42-43

এ একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সত্য যে, মুসলমানরা আসার আগে ভারতে দৃশ্যত কোনো নির্যাতন ছিল না। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ, যিনি সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ভারত সফর করেন এবং সেখানে ১৪ বছর অবস্থানের পর তার লিপিবদ্ধ করা তখনকার অবস্থা বা পরিবেশগত বিবরণ এটা স্পষ্ট করে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধরা কোনো রকম সহিংসতা প্রদর্শন না করেই পাশাপাশি বসবাস করতো। হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের কোনোটিই (ইউরোপের) 'ইনকুইজিশন'এর মতো অমর্যাদাকর কর্মে অবমানিত নয়; না দোষী আলবাইজেনসিয়ান ক্রুসেডের মতো অন্যায়-অবিচার বা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অপরাধমূলক ধর্মীয় যুদ্ধের উন্মত্ততার দোষে।[৬৫]

এটা তর্কাতীত যে, ভারতে বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলস্বরূপ। যদিও হিন্দু ধর্মে অবশ্যই কিছু দুর্বলতা ছিল, তথাপি এসব নতুন ধর্মীয় উপাঙ্গ বা শাখাগুলো হিন্দু সমাজের ভিতর থেকেই বিকশিত হয় কোনো রকম অবিচার-নির্যাতনের শিকার না হয়ে, যে নীতি ইসলাম ভারতে এনেছিল কিংবা এর গোটা ইতিহাসে ইসলামত্যাগী বা বিপথগামীদের উপর আরোপ করেছিল।

খ্রিস্টান নির্যাতন এবং বর্বরতাও লক্ষ লক্ষ পৌত্তলিক, ইহুদী, ধর্মে ভিন্ন মতাবলম্বী, স্বধর্মত্যাগী ও ডাইনীদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল ইউরোপে, দক্ষিণ আমেরিকায় ও ভারতের গোয়ায়। ইসলামের নবি মোহাম্মদ নিজে ইসলামের সমালোচক ও ইসলামত্যাগীদেরকে হত্যা করতেন এবং আজ পর্যন্ত ধর্মত্যাগী ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা ও নির্যাতনের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে মুসলিমদের মাঝে। এখানে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন যে, ইসলামের উদ্ভবের সময় বৌদ্ধধর্ম ছিল মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় একটা প্রাণবন্ত ধর্ম এবং ভারতের কোনো কোনো অংশেও তা যথেষ্ট জোরদার ছিল। ইসলাম অত্যন্ত মানবিক ও শান্তিপূর্ণ এ প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে ভারত থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মোহাম্মদের জীবদ্দশায় ইসলাম তরবারির দ্বারা আরব-ভূমি থেকে পৌত্তলিকতা নির্মূল করেছিল। ইসলামের উগ্র প্রচেষ্টার দ্বারা পারস্যের জরথুষ্ট ধর্ম, এবং লেভান্ত, মিশর ও আনাতোলিয়া (তুরস্ক) থেকে খ্রিষ্টান ধর্মকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলামের বর্বর নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে লাখ লাখ জরথুষ্টবাদী (পারসিরা) ভারতে পালিয়ে আসে, যেখানে হিন্দু সমাজ তাদেরকে স্বাগত জানায় এবং আজ পর্যন্ত তারা সেখানে একটা সুখী সম্প্রদায় হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। অবশ্য ভারতে পলায়নও তাদেরকে ইসলামের বর্বরতা থেকে রেহাই দেয়নি; পরবর্তীতে মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা ভারত দখলের পর তাদের উপর ইসলামের নির্যাতন অব্যাহত থাকে। যেমন গজনীর সুলতান মাহমুদের পরবর্তী বংশধর সুলতান ইব্রাহিম ভারত অভিযানে অগ্রসর হন। ইতিহাসবিদ ও 'তাবাকত-ই-আকবরী' গ্রন্থের লেখক নিজামুদ্দিন আহমদ জানান: *'তিনি অনেক শহর ও দুর্গ জয় করেন। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল খুরাসানী বংশোদ্ভূত একটা গোত্র (পারসি) অধ্যুষিত ঘনবসতিপূর্ণ একটি নগরী, যাদেরকে আফ্রাসিয়া তাদের জন্মভূমি থেকে বহিস্কার করেছিলেন। নগরীটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে ইব্রাহিম কমপক্ষে ১০০,০০০ লোককে বন্দি করে নিয়ে যান।'*[৬৬]

মুসলিম ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সহিষ্ণুতা

ভারতীয়দের মানবতা, সহিষ্ণুতা ও বীরত্বে বিনয়-নম্রতা মুসলিম ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট করেছিল। আরব ভূগোলবিদ আবু জাইদ ভারতীয় সভ্যতার একটা সম্প্রসারিত অঞ্চল শরণদ্বীপ (শ্রীলঙ্কা)-এর শাসক ও জনগণ সম্বন্ধে লিখেন: *'নবম শতাব্দীর শেষ দিকে শরণদ্বীপে অনেকগুলো ইহুদি বসতি ছিল। এছাড়াও সেখানে অন্য ধর্মের লোকজনও বাস করতো, বিশেষতঃ মনিবাদীরা। রাজা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে স্ব-স্ব ধর্ম পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন।'*[৬৭] সুখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ও পর্যটক আল-মাসুদি দশম শতকের গোড়ার দিকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ভারতীয় রাজা বালহারার তার রাজ্যের মুসলিম বসতি স্থাপনকারীদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি বালহারাকে (দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট রাজবংশ) বিশ্বের তিনজন শ্রেষ্ঠ রাজার কাতারে স্থাপন করেন: বাগদাদের খলিফা এবং চীন ও কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট।[৬৮] রাজ্যের মুসলিমদের প্রতি বালহারার আচরণ সম্পর্কে আল-মাসুদি উল্লেখ করেন: *'সিন্ধু ও ভারতের রাজাদের মধ্যে কেউই বালহারার মতো মুসলমানদের প্রতি এতোটা সম্মান দেখান নি। তার রাজ্যে ইসলাম অত্যন্ত সম্মান পেয়েছে ও রক্ষিত হয়েছে।'*[৬৯] আল-মাসুদি বর্ণিত ইরাকি এবং আরবীয় মরিচ ও মশলা ব্যবসায়ীদের দ্বারা সৃষ্ট বোম্বাইয়ের নিকট একটি বড় মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সে মুসলিম সম্প্রদায়কে *'স্থানীয় রাজা অনেকটা রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রদান করেছিলেন'* এবং *'স্থানীয়দের সাথে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো।'*[৭০] বালহারার রাজ্যে মুসলিমদের মর্যাদা সম্পর্কে আল-ইশতাখরি লিখেছেন (৯৫১ সালের দিকে): *'এটা একটা বিধর্মীদের দেশ। কিন্তু এর নগরীগুলোতে মুসলমানরাও বাস করে। সেখানে মুসলমানরাই বালহারার পক্ষে নিজেদেরকে শাসন করে, অন্য কেউ নয়।'*[৭১]

দশম শতাব্দীর প্রখ্যাত আরব পর্যটক, ভূগোলবিদ ও বিখ্যাত 'সুরাত-আল-আর্‌দ' বা 'পৃথিবীর মুখ' (৯৭৭) গ্রন্থটির লেখক ইবনে হাউকল ভারতের ক্যামবে ও সাইমুরের মধ্যবর্তী অঞ্চল ভ্রমণকালে দেখতে পান যে, *'বাসিন্দারা মূর্তিপূজক কিন্তু মুসলমানরা স্থানীয় যুবরাজের কাছ থেকে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত। তারা নিজস্ব ধর্মীয় লোকদের দ্বারা শাসিত। এসব বিধর্মীদের নগরীগুলোতেও তারা মসজিদ স্থাপন করেছে এবং*

---

৬৫. Swarup R (2000) *On Hinduism Reviews and Reflections*, Voice of India, p. 150-51
৬৬. Elliot & Dawson, Vol. V, p. 559
৬৭. Ibid, Vol. 1, p. 10
৬৮. Nehru (1989), p. 210
৬৯. Ibid, p. 24
৭০. Eaton (1978), p. 13
৭১. Ibid, p. 27

নামাজের সময় ঘোষণার জন্য নিয়মিত পদ্ধতিতে আযান দেওয়ারও অনুমোদন পেয়েছে।'[৭২] বালহারার রাজ্যের মুসলমানদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে আল-ইদরিসীও একই রকম বর্ণনা করেছেন: *'ব্যবসার জন্যে আগত বিপুল সংখ্যক মুসলমান বণিক শহরটিতে আসে। তারা রাজা এবং তার মন্ত্রীদের দ্বারা মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয় এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পায়।'* আল-ইদরিসী আরো লিখেছেন: *'ভারতীয়রা স্বভাবতঃই ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী এবং তাদের কাজেকর্মে সেটা থেকে তারা বিচ্যুত হয় না। তাদের বিশ্বস্ততা, সততা ও আনুগত্য সর্বজনবিদিত। এবং এসব গুণের জন্য তারা এতই বিখ্যাত যে, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তাদের দেশে আসে দলে দলে।'* তিনি ভারতীয়দের *'সত্যকে ভালবাসা ও পাপকে ভয় পাওয়ার'* গুণে মুগ্ধ হন।[৭৩] এমনকি আধুনিক মুসলিম ইতিহাসবিদ হাবিবুল্লাহ উল্লেখ করেছেন: *'মুসলিমরা হিন্দুদের কাছ থেকে সদাশয় আচরণ ও সম্মান পেতো এবং এমনকি নিজেদেরকে শাসন করার স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছিল।'*[৭৪]

ভারতীয়দের এসব নৈতিক বৈশিষ্ট্য তাদের সভ্যতার মূল্যবোধের গভীরেই নিহিত ছিল। একজন শ্রেষ্ঠ বিজয়ী হতে গিয়ে রাজা অশোক সম্ভবত এসব নীতিসমূহ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। কলিঙ্গ জয় করতে গিয়ে তিনি বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করে বিধ্বস্ত করেছিলেন সবকিছু। কলিঙ্গ যুদ্ধে ১০০,০০০ সেনা ও সাধারণ জনগণের মৃত্যু ঘটেছিল এবং সে ঘটনা তাকে এতটাই ব্যথিত করেছিল যে, পরবর্তীকালে তিনি এক শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী শাসকে পরিণত হন এবং যুদ্ধকে মারাত্মকভাবে ভয় করতেন। পরিশেষে তিনি একজন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর্মী হন। অথচ মুসলিম বিজয়ীদের জন্য বিপুল সংখ্যক বিধর্মীদের হত্যা করা ছিল নিত্যকার ও আনন্দের ঘটনা। তাদের বিখ্যাত সব বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের মুসলিমদের দ্বারা সেরূপ বিজয়কে মহিমান্বিত করা হতো। নিষ্ঠুর মুসলিম আক্রমণকারীদের হাতে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় শাসকরা স্পষ্টতঃই মহানুভবতা, মানবতা ও বীরত্বে বিনয় প্রদর্শন করেছিলেন মুসলিমদের প্রতি। এ মহানুভবতা ও বিনয় হিন্দুরা দেখিয়েছিল শুরুতেই, যখন খলিফা আল-মুতাসিমের শাসনামলে (৮৩৩-৪২) হিন্দুরা বিদ্রোহ করে মুসলিম দখলকারীদেরকে সিন্ধান থেকে বিতাড়িত করেছিল। দুই শতাব্দী ধরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তীয় অঞ্চলে (বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তান) ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ধ্বংস, লুণ্ঠন, দাসকরণ ও তাদের মন্দিরসমূহকে কলুষিত করা সত্ত্বেও হিন্দুরা সিন্ধানের *'মসজিদকে সম্মান দেখাতো, যেখানে নগরীর মুসলমানরা প্রতি শুক্রবার যেতো নামাজ আদায় ও খলিফার জন্য প্রার্থনা করতে।'*[৭৫]

মুসলিম আমলে হিন্দু শাসকদের সহিষ্ণুতা ও বিনয়

ভারতে মুসলিম শাসনের পুরো সময়ে তার কোনো না কোনো অংশ হিন্দুরা শাসন করেছে। আর ওসব হিন্দু শাসকরা ইসলামি কর্তৃত্বের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত মুসলিমদের প্রতি সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা ও বীরত্বে বিনয় দেখিয়েছেন, যদিও পাশাপাশি মুসলিম হানাদার ও শাসকরা তাদের দখলকৃত ও আক্রমণকৃত ভারতীয় অংশে এ সময়ের মধ্যে প্রায় হাজার বছর ধরে হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার আঘাত হেনেছে, ধ্বংস করেছে তাদের ধর্মকে।

মুসলিম শাসনামলে ভারতের সাহসী যুবরাজ ও সাধারণ লোকেরা মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মাঝে মাঝেই পুনরায় হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর ছিল এমন একটি রাজ্য (১৩৩৬-১৫৬৫)। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ, তামিল নাড়ু ও কেরালা নিয়ে এ রাজ্য গঠিত ছিল। মুসলিম শাসকদের দ্বারা অবিরাম আক্রান্ত রাজ্যটি কখনো স্বাধীনতা ভোগ করতো, অন্য সময় মুসলিম অধিকারীদেরকে আনুগত্য কর দিতে বাধ্য হতো। হেরাতের আব্দুর রাজ্জাক, যিনি মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল খানের দূত হিসেবে ১৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়নগর এসেছিলেন, তিনি লিখেছেন: *'নগরীটি এমন যে, সারা পৃথিবীতে এর মতো আরেকটির কথা কেউ চোখেও দেখেনি, কানেও শোনেনি।'*[৭৬] পর্তুগিজ পরিব্রাজক পাইস ১৫২২ সালে বিজয়নগরে ভ্রমণে এসে লিখেন: এটা ছিল *'রোমের মতো বিরাট ও দেখতে খুব সুন্দর'*; এবং *'বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট সরবরাহকৃত নগরী... কেননা এ নগরীটির অবস্থা অন্য কোনো নগরীর মতো নয়, যেগুলো প্রায়শঃই প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়; এ রাজ্যে সবকিছুরই প্রাচুর্য।'*[৭৭] নৈপুল উল্লেখ করেছেন: *'প্রবাদ রয়েছে যে, এ রাজ্য এমন সমৃদ্ধ ছিল যেখানে খাদ্যশস্যের মতো প্রকাশ্য বাজারে হীরা-চুনি ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু বিক্রি হতো।'*[৭৮] রাজ্জাকের চাক্ষুষ বিবরণ – *'রত্ন ব্যবসায়ী বা জহুরিরা তাদের হীরা-পান্না-মণি-মুক্তা প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রি করে'*[৭৯] – সে প্রবাদটির বাস্তবিক সত্যতা জ্ঞাপন করে। ১৫৬৪ সালে দীর্ঘ ২০০ বছরেরও বেশি সময় স্থায়ী বিজয়নগরের মহান হিন্দু সভ্যতাকে ধ্বংসের জন্য প্রতিবেশী চারটি মুসলিম সুলতানাত হাত মিলায়। ১৫৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে দীর্ঘ পাঁচ মাস অবরোধের পর একে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে ফেলা হয়। এ ধ্বংসযজ্ঞ সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্ট সিউয়েল উল্লেখ করেছেন: *'এমন জাঁকজমকপূর্ণ একটা নগরী; প্রাচুর্যের পরিপূর্ণতায় ভরপুর একটা সমৃদ্ধ ও পরিশ্রমী জনগণের নগরী ... যা অবরুদ্ধ, লুণ্ঠিত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় বর্ণনাতীত বর্বর হত্যাযজ্ঞ ও ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।'*[৮০] ফেরিশতা সে যুদ্ধে পলায়নপর হিন্দুদের

---

৭২. Elliot & Dawson, Vol. 1, p. 457

৭৩. Ibid, p. 88

৭৪. Sharma, p. 89.

৭৫. Elliot & Dawson, Vol. I, p. 450

৭৬. Ibid, Vol. IV, p. 106

৭৭. Nehru (1989), p. 258

৭৮. Naipaul VS (1977) *India: A Wounded Civilization*, Alfred A Knopf Inc., New York, p. 5

৭৯. Elliot & Dawson, Vol. IV, p. 107

৮০. Nehru (1989), p. 259

উপর চালিত হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন সম্পর্কে লিখেছেন: *'তাদের রক্তে নদীর পানি লালে লাল হয়ে যায়। উৎকৃষ্ট কর্তৃত্বধর গণনা থেকে জানা যায় যে হামলার সময় ও পলায়নপরদের পিছে ধাওয়া করে এক লাখের বেশি বিধর্মীকে হত্যা করা হয়। লুণ্ঠিত মালামালের পরিমাণ এতোই বিপুল ছিল যে, মিত্রবাহিনীর সঙ্গে থাকা প্রত্যেক বেসামরিক লোকও স্বর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার ও দামি পাথর এবং তাবু, অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও দাস পেয়ে ধনী হয়ে উঠে।'*[৮১]

এখন বিজয়নগরের রাজার সহিষ্ণুতার কথায় আসা যাক। ফেরিশতা লিখেছেন: *'মুসলিম আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার বাহিনীকে আরো মজবুত করতে রাজা দ্বিতীয় দেবরায় (১৪১৯-৪৯) (তার রাজ্যের) মুসলিমদেরকে সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেন; তাদের জন্য ভূসম্পত্তি বরাদ্দ করা হয় এবং বিজয়নগর শহরে তাদের ব্যবহারের জন্য একটা মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তিনি এ নির্দেশও দেন যে তাদের ধর্ম পালনে কেউ তাদেরকে বিরক্ত করতে বা বাঁধা দিতে পারবে না।* ***অধিকন্তু তিনি আদেশ করেন তার সিংহাসনের সামনে উঁচু একটি তাকিয়ার উপর কোরান স্থাপিত থাকবে, যাতে বিশ্বাসী মুসলিমরা তাদের আইন-বিরুদ্ধ কোনো পাপ না করেই তার উপস্থিতিতে আনুগত্য প্রকাশ বা কুর্নিশ করতে পারে।'***[৮২] যাহোক ভারতের একমাত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এ হিন্দু সভ্যতাটিকে শেষ পর্যন্ত চরম মূল্য দিতে হয় বিশ্বাসঘাতক মুসলিমদেরকে এ সহিষ্ণুতা ও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রদানের পরিণাম হিসেবে। এ যুদ্ধের দু'বছর পর ১৫৬৭ সালে বিজয়নগর সফরকারী পর্যটক সিজার ফ্রেডেরিক উল্লেখ করেছেন: *'ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজার বাহিনীতে মুসলিমরা গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়। ১৫৬৪-৬৫ সালে আশেপাশের সুলতানদের যৌথ বাহিনী যখন বিজয়নগর আক্রমণ করে তখন দুই বিশাল (মুসলিম) ব্যাটালিয়ান, যার একটিতে ৭০ হাজার ও অপরটিতে ছিল ৮০ হাজার সেনা, রাজা রামরাজকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে দুই মুসলিম সেনাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি প্রতিপক্ষ মুসলিমদের হাতে ধরা পড়েন। সুলতান হুসেইন নিযাম শাহ তাৎক্ষণিকভাবে তার শিরো – দ করার আদেশ দেন। এভাবে বিজয়নগরের পতন ঘটে।'*[৮৩]

এটা এখানে স্বীকার করা প্রয়োজন যে, রাম রাজার বাহিনী মধ্যে কিছু মাত্রার অসহিষ্ণুতা জন্ম নিচ্ছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক খুবই শক্তিশালী রাজা এবং প্রতিবেশী মুসলিম সুলতানাতের কিছু কিছু এলাকা দখল করা শুরু করে সেসব সুলতানদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মুসলিম অঞ্চলে প্রবেশ করে তার যোদ্ধারা এরূপ কিছু কর্মকাণ্ড শুরু করছিলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যা মুসলিমরা ৬৩০-এর দশকে ভারত আক্রমণ শুরু করার পর থেকে এ যাবত করে আসছিল, এবং বিশেষত যেরূপ আচরণ মুসলিমরা বিগত ২০০ বছর ধরে বিজয়নগরের উপরও করে আসছিল। ফেরিশতা লিখেছেন: ১৫৫৮ সালে হুসেইন নিযাম শাহর শাসনাধীন আহমদনগর আক্রমণে রাম রাজার যোদ্ধারা মসজিদের অবমাননা করে সেখানে প্রার্থনা করে, কয়েকটি ধ্বংসও করে; এমনকি তারা মুসলিম নারীদের মর্যাদাও লংঘন করে।[৮৪] যাহোক সেনাবাহিনির এরূপ অপবিত্রকরণমূলক অপকর্ম রাম রাজা কখনোই অনুমোদন করেন নি। এক ঘটনায় তার মুসলিম সেনারা বিজয়নগরের তুরুকভাদা এলাকায় হিন্দুদের কাছে পবিত্র একটি গরু কোরবানি দিয়ে হিন্দুদের মাঝে রোষ সৃষ্টি করে। রাম রাজার ভাই তিরুমালাসহ তার অসন্তুষ্ট কর্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার নিকট আবেদন জানায় এ অপবিত্রকরণমূলক কাজ সম্বন্ধে। উল্লেখ্য যে, এমনকি আজকের দিনেও যদি একটা মুসলিম সংখ্যাধিক্য দেশে, ধরুন পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশে, ইসলাম-বিরুদ্ধ এরূপ ঘটে, তা স্বভাবত উগ্র মুসলিম জনতাকে সহিংস বিক্ষোভে, এমনকি রক্ত পাতে উস্কে দিবে। যাহোক রামরাজা তার মুসলিম সেনাদের দ্বারা কোরবানির উদ্দেশ্যে গো-হত্যা বন্ধ করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন: তাদের ধর্মচর্চায় হস্তক্ষেপ করা সঠিক হবে না, কেননা তিনি তার সেনাদের দেহের প্রভু মাত্র, আত্মার প্রভু নন।[৮৫]

ভারতে ইসলামি কর্তৃত্বের শেষ দিকে গোঁড়া ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের শাসনকালে (মৃত্যু ১৭০৭) তার মারাঠা প্রতিপক্ষ শক্তিশালী শিবাজী তার রাজ্য সম্প্রসারণ করছিল মুসলিম অঞ্চল দখল করে। কাবিল খান তার 'আদব-ই-আলমগীরি' গ্রন্থে লিখেছেন: শিবাজী যখন মুঘলদের দক্ষিণ ভূখন্ডে অনুপ্রবেশ করা শুরু করে, আওরঙ্গজেব তখনো যুবরাজ। তিনি তার সেনাপতি নাসির খান ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন সর্বদিক থেকে শিবাজীর ভূখন্ডে প্রবেশ করে *'গ্রামগুলোকে বিধ্বস্ত, নির্দয়ভাবে জনগণকে হত্যা ও চরমভাবে লুণ্ঠন করার জন্য'*; তাদেরকে হত্যা ও ক্রীতদাসকরণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ দয়া প্রদর্শন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়,[৮৬] যা ছিল মুসলিমদের বহুযুগের পুরনো রীতি। কিন্তু গভীরভাবে ধার্মিক হিন্দু শিবাজী কখনোই সেরূপ হিংসাত্মক ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেননি। এমনকি তার ঘোর সমালোচক কফী খান তার 'মুন্ত খাব-উল-লুবাব' গ্রন্থে শিবাজীর মহত্তম আদর্শের প্রশংসা করতে বাধ্য হন। তিনি লিখেছেন: *'কিন্তু তিনি (শিবাজী) একটা নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, তার অনুসারীরা যখন লুণ্ঠন করবে, তারা কখনো মসজিদ, ঈশ্বরের গ্রন্থ (কোরান) বা কারো নারীর কোনো ক্ষতি করবে না।'*[৮৭]

কার্যক্ষেত্রে শিবাজী তার কথা বা নীতির যথার্থ প্রয়োগও করতেন। মুসলিম শাসকরা যদিও হাজার হাজার হিন্দু নারীকে ক্রীতদাসে পরিণত ও যৌনদাসীরূপে ব্যবহার করতো, শিবাজী সেরূপ জঘন্য কর্ম থেকে দূরে থাকতেন, এমনকি অপূর্ব সুন্দরী বন্দি রমনীদের প্রলোভন উপেক্ষা

---

[৮১] Ferishtah, Vol. III, p. 79
[৮২] Ibid, p. 266
[৮৩] Majumdar RC ed. (1973) *The Mughal Empire,* in *The History and Culture of the Indian People,* Bombay, Vol. VII, p. 425
[৮৪] Ferishtah, Vol. III, p. 72,74
[৮৫] *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. XXII, p. 28
[৮৬] Sarkar J (1992) *Shibaji and His Times,* Orient Longham, Mumbai, p. 39
[৮৭] Ghosh SC (2000) *The History of Education in Medieval India 1192-1757*, Originals, New Delhi, p. 122

করেও। তার এক কর্মকর্তা ১৬৫৭ সালে এক অনন্য সুন্দরী মুসলিম বালিকাকে আটক করে শিবাজীকে উপহার দেয়। শিবাজী তাকে তার নিজের মা জিজা বাই-এর চেয়েও সুন্দরী বলে প্রশংসা করেন; তাকে সম্মানজনকভাবে পোশাক ও স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত করেন; এবং ৫০০ ঘোরসওয়ারের পাহারায় তাকে তার লোকদের কাছে পাঠিয়ে দেন।[৮৮] স্পষ্টতঃই শিবাজীর বীরত্বে এরূপ বিনয়, যা ছিল মুসলিমদের মাঝে অভাবনীয়, তা দেখে কাফী খান তার ঘৃণিত শত্রুরও প্রশংসা না করে পারেননি।

শিবাজী মুসলিমদেরসহ সকল ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতীককে সম্মান প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেন। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার প্রতিপক্ষ আওরঙ্গজেব তার শাসনামলে হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, ২০০-টিরও বেশি শুধুমাত্র ১৬৭৯ সালেই। তথাপি শিবাজী পরম বিবেকবানের মতো সতর্কতার সাথে মুসলিম মসজিদ, মাদ্রাসা বা পবিত্রস্থান কলুষিত করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরং তিনি সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি সুফিদেরকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন; এমনকি সুফিদেরকে ভরণপোষণ দিয়ে সাহায্য করতেন এবং নিজ খরচে তাদের জন্য খানকাহ্ নির্মাণ করতেন। উল্লেখ্য, কেলোশির বাবা ইয়াকুত ছিলেন তেমনি এক সুফি সাধক, যিনি শিবাজীর সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন।[৮৯]

অতিরিক্ত রক্তপাত থেকেও শিবাজী বিরত থাকতেন। মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকরা যখন হাজারে-হাজারে হিন্দুদেরকে অহরহ হত্যা করতে দ্বিধা করেনি, এমনকি সহনশীল এবং মহানুভব আকবরও যখন চিতোরের আত্মসমর্পণকৃত ৩০,০০০ কৃষককে হত্যা করেন ১৫৬৮ সালে, শিবাজী কখনোই ঐরূপ ঠাণ্ডা মাথায় তার প্রতিপক্ষ যুদ্ধবন্দিদের উপর গণহত্যা চালাননি। ১৬৬৪ সালে তিনি যখন সুরাট আক্রমণ করেন, সেখানকার মুঘল গভর্নর ইনায়েত খান পালিয়ে যান ও ৫০০ মুসলিম যোদ্ধাকে বন্দি করা হয়। ইনায়েত খান একটি গোপন স্থান থেকে শান্তি আলোচনার জন্য শিবাজীর নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূতের ছদ্মবেশে ইনায়েত খানের উক্ত প্রতিনিধি লুকিয়ে রাখা ছোড়া নিয়ে শিবাজীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তার বিশ্বাসঘাতকতা দেখে ও মাটিতে পতিত শিবাজী নিহত হয়েছেন ভেবে তার সৈনিকরা মুসলিম বন্দিদেরকে হত্যার ডাক তোলে। এমতাবস্থায় বেঁচে যাওয়া শিবাজী দ্রুত মাটিতে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আসন্ন গণহত্যা রোধ করেন। যাহোক তার জীবন হরণের এ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে ক্রুদ্ধ শিবাজী চার জন চক্রান্তকারী বন্দিকে হত্যা করেন, কুড়ি জনের হাত কেটে দেন এবং বাকীদেরকে ক্ষমা করে দেন।[৯০] প্রতিশোধ গ্রহণের এ ঘটনা অবশ্যই কিছুটা নির্মম ছিল, তবে তা ছিল শিবাজীর জীবনে দুর্লভ আর মুসলিমদের জন্য তুচ্ছ ও অহরহ ঘটনা। স্পষ্টত মুসলিমদের তুলনায় এটা ছিল বড়ই সংযমপূর্ণ ঘটনা, এমনকি পরবর্তীকালের ব্রিটিশদের চেয়েও অধিক সংযমশীল।

যদুনাথ সরকার জানান: প্রশাসনে তিনি '*দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, ভেদাভেদহীনভাবে তিনি সকল ধর্ম ও নারীদের মর্যাদার সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন, সকল ধর্মমতের সত্যিকারের ধার্মিক লোকদের (মুসলিমসহ) জন্য তিনি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যের হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, এবং সম্প্রদায়, শ্রেণী বা ধর্মমত নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার জন্য সমান সুযোগ প্রদান করতঃ তিনি মেধাবী সবার জন্য সরকারি চাকরির দরজা খোলা রাখেন।*'[৯১] একজন অশিক্ষিত ও গভীরভাবে ধার্মিক হিন্দু শিবাজীর ধর্মনিরপেক্ষতা, সহিষ্ণুতা ও মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রজাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতার নীতি সমকালীন মুসলিম শাসিত ভারতে অকল্পনীয় ছিল।

তথাপি শিবাজী তার ঘোর মুসলিম শত্রুদের ভূখণ্ডে হানা দিয়ে লুটপাট করতেন। ভারতের এমন একটা অংশে (মহারাষ্ট্র) ছিল তার রাজ্য যেখানে '*ধান উৎপাদন অসম্ভব ছিল এবং গম ও ভুট্টা সামান্য পরিমাণে জন্মাতো*'; কাজেই লুণ্ঠন করা ছাড়া তার কোনো উপায় ছিল না। এ ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের সুরাট গভর্নর তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন: "*আমার জনগণ ও দেশকে রক্ষার জন্য তোমার সম্রাট আমাকে একটা বিরাট বাহিনী রাখতে বাধ্য করেছে। সে বাহিনীকে অবশ্যই তারই প্রজাদের দেওয়া বেতনে চলতে হবে।*"[৯২] এ অজুহাত হয়তো তার সব হামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তার অভিলাষ ছিল একটা স্থানীয় হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, নির্যাতনকারী ও বৈষম্যমূলক বিদেশী মুসলিম শাসকদের বিপরীতে; এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্যই ছিল তার সকল হামলা। তথাপি তার কর্মকাণ্ডে যতটা ত্রুটিই থাক না কেন, তা তার মুসলিম প্রতিপক্ষের দ্বারা সংঘটিত লুটতরাজ এবং অমুসলিম প্রজাদের প্রতি তাদের নির্যাতন, বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবমাননার সঙ্গে আদৌ তুলনাযোগ্য নয়।

প্রধানত মুসলিম ইতিহাসবিদদের লেখা থেকে গৃহীত এসব দৃষ্টান্ত ভারতীয় সমাজের মানবীয়, বীরত্বে বিনয়ী, সহিষ্ণু ও মুক্ত বৈশিষ্টের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। অপরদিকে মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকরা যা কিছু সাথে এনেছিল, তা ছিল এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত। ভারতে মুসলিম শাসনের শেষ দিকের বহু মুসলিম ইতিহাসবিদ ও অমুসলিম পর্যবেক্ষকও এ সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেন। ভারতীয়দের প্রশংসায় সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল লিখেছেন: '*এ দেশের মানুষ ধার্মিক, স্নেহশীল, অতিথিপরায়ণ অমায়িক ও খোলামেলা মনের। তারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহী, জীবনের অনাড়ম্বরতায় বিশ্বাসী, ন্যায় বিচারের অনুসারী, সন্তুষ্ট, পরিশ্রমী, কর্মকাণ্ডে সক্ষম, অনুগত, সত্যবাদী এবং দৃঢ় ও অবিচলিত...।*' দুয়ার্ত বারবোসা উল্লেখ করেছেন: বিজয়নগর রাজ্যে '*যে কেউ আসতে ও যেতে পারতো, কোনরকম দুর্ভোগ ও জ্বালাতন ছাড়াই স্ব-স্ব ধর্ম অনুযায়ী বসবাস করতে পারতো, হোক সে খ্রিষ্টান, ইহুদি, মুসলিম কিংবা ধর্মবিহীন অবিশ্বাসী। প্রত্যেকেই সমতা ও ন্যায় বিচার ভোগ করতো।*' আকবরের রাজসভার অপেক্ষাকৃত গোঁড়া ইতিহাসবিদ মোল্লা বাদাওনিও ভারতীয় সমাজের স্বাধীনতা ও

---

[৮৮] Sarkar, p. 43
[৮৯] Sarkar, p. 288; Ghosh, p. 122
[৯০] Sarkar, p. 76
[৯১] Ibid, p. 302
[৯২] Ibid, p. 2,290

সহনশীলতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন: *'হিন্দুস্তান একটা ভাল দেশ, যেখানে সবকিছুই অনুমোদিত এবং কেউ কাউকে ভ্রুক্ষেপ করে না (অর্থাৎ কারো কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করে না) ও জনগণ যার যেখানে খুশি যেতে পারে।'*[৯৩.]

এরূপ মানবিক, সহনশীল ও স্বাধীন একটা স্থানে এসে আক্রমণকারী মুসলিম দখলদার ও শাসকরা ঘটিয়েছে ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ ও নিষ্ঠুরতা। তারা হাজারে হাজারে, লাখে লাখে সেসব শান্তিপ্রিয় মানুষকে হত্যা করেছে, ক্রীতদাস বানিয়েছে তাদের অগণিত ও অধিক সংখ্যককে। তারা হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেছে, লুণ্ঠন ও ধ্বংসসাধন করেছে ভারতের অপরিমেয় সম্পদ, যার বর্ণনা তৎকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে লিখে রেখে গেছেন। কানহাদ্দে প্রবন্ধা নামক এক ভারতীয় ঐতিহাসিক ইসলামি আগ্রাসীদের কর্মকাণ্ডের স্বচক্ষে দেখা বিষয়ের (১৪৫৬ সালে) বর্ণনা করেছেন এভাবে: *'বিজয়ী বাহিনী পুড়িয়ে দিলো গ্রামগুলো, ফসলের জমি ধ্বংস করে ফেললো, জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করলো, ব্রাহ্মণ ও সকল শ্রেণীর শিশু ও নারীদেরকে বন্দি করলো, কাঁচা চামড়ার ফিতা বা ফালি দিয়ে তাদেরকে প্রহার করলো, বন্দিদেরকে একটা চলন্ত জেলখানার মধ্যে তুলে নিয়ে গেলো এবং বন্দিদেরকে কুকুরের মতো আজ্ঞানুবর্তী ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হলো।'*[৯৪.] মুসলিম আক্রমণকারীরা এরূপ বর্বরতামূলক কর্মযজ্ঞ চালিয়েছে তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মাত্র। ভারতের বিধর্মী ও পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতে না পারার জন্য ধর্মান্ধ উলেমা ও আধ্যাত্মিক সুফিরা প্রায়শঃ মুসলিম শাসকদের নিন্দা করতেন। উদাহরণস্বরূপ সুলতান আলাউদ্দিনকে কাজী মুঘিসুদ্দিন স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'হিন্দুরা সত্য নবির ঘোরতর শত্রু', যাদেরকে করতে হবে নিশ্চিহ্ন অথবা চরম অবমাননা।[৯৫.]

ভারতের মুসলিম আগ্রাসক ও শাসকদের দ্বারা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের উপর যে নির্মম, নিষ্ঠুর ও বিরামহীন বর্বরতা সংঘটিত হয়, তা পর্তুগিজ ও স্পেনীয় হানাদারদের দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকার পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসীদের উপর চালিত হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। ১৪৯২ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের আগমনের শুরুতে সে মহাদেশটির জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯ কোটি; এক শতাব্দী পর তাদের মধ্য থেকে মাত্র ১ কোটি ২০ লাখ বেঁচে থাকে।[৯৬.] এ ব্যাপক মৃত্যুর অধিকাংশই ঘটেছিল উপনিবেশীদের দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে বয়ে আনা ইউরোপীয় ও আফ্রিকার রোগের কারণে – যেমন শিশুদের রোগ হাম, ডিপথেরিয়া ও হুপিং কাশি, সেই সঙ্গে বসন্ত, *ফ্যালসিপ্যারাস* ম্যালেরিয়া ও হলুদ জ্বর (ইয়েলো ফিভার) ইত্যাদি। দক্ষিণ আমেরিকায় এসব রোগের অনুপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগণের সেসব রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিলনা; ফলে এসব বিদেশী রোগে সেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। এক শতাব্দীর মধ্যে নিম্নাঞ্চলীয় মৌসুমি এলাকার অধিকাংশ মানুষ আক্ষরিক অর্থে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল; অপরদিকে আন্দেজ ও মধ্য আমেরিকার উচ্চভূমিরও ৮০ শতাংশ লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।[৯৭.] তথাপিও উপনিবেশবাদীরা প্রধানত ধর্মীয় কারণে সম্ভবত লাখ লাখ স্থানীয় পৌত্তলিকদেরকে হত্যা করেছিল। এমনকি ইউরোপীয়দেরও আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত ম্যালেরিয়া ও হলুদ জ্বর প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না; আমেরিকায় নিয়ে আসা আফ্রিকার ক্রীতদাসদের থেকে এ দুই রোগে আক্রান্ত হয়ে তারাও বিপুল সংখ্যায় মারা যায়।

ঐতিহাসিক দলিল ও পরিবেশ-পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক কে. এস. লাল হিসাব করেছেন যে, ১০০০ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ কোটি, যা ১৫০০ সালে এসে দাঁড়ায় মাত্র ১৭ কোটিতে, পাঁচটি শতাব্দীর পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও।[৯৮.] অধ্যাপক লালের হিসাবে ১০০০ থেকে ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মুসলিম হানাদার ও শাসকদের হাতে ৬ থেকে ৮ কোটি লোক মারা যায়। মুসলিম হানাদার ও শাসকদের হাতে এমন বিপুল সংখ্যক ভারতীয়ের মৃত্যুর হিসাব কারো কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাতিসংঘের হিসাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনারা মাত্র ৯ মাসে ১৫ থেকে ৩০ লাখ লোককে হত্যা করে। এটা ঘটে আধুনিক সাংবাদিকতার উৎকর্ষতার যুগে, অথচ বিশ্ব সে সম্পর্কে সামান্যই জানে। অধিকন্তু নিহতদের মধ্যে বড় সংখ্যক ছিল তাদের একই ধর্মের লোক, পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালি মুসলিম। অতএব এটা খুবই সম্ভাব্য যে, মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকরা, যারা ভারত থেকে পৌত্তলিকতা ও তার অনুসারীদেরকে উচ্ছেদের দৃঢ় ধর্মীয় প্রকল্প নিয়ে এসেছিল, তারা এরূপ একটা বিশালভূখণ্ডে ১০ শতাব্দীরও বেশি সময়ে সহজেই আট কোটি বা তারও বেশী বিধর্মীকে হত্যা করে থাকতে পারে।

হিন্দু-মুসলিম বিভক্তি: একটা ব্রিটিশ উদ্ভাবন?

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা দিক, যাকে উপমহাদেশের সমালোচকরা ব্রিটিশ শাসকদেরকে অন্ধ-উচ্ছাসের সাথে দানবায়ীত করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে, তা হলো তাদের 'বিভক্তি ও শাসন' ('ডিভাইড অ্যান্ড রুল') নীতি। এসব সমালোচকরা দাবি করে যে, ব্রিটিশ শাসকরা তাদের দখলদারিত্ব ও শোষণ প্রক্রিয়া মজবুত করা ও অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে ভারতীয়দের ঐক্যকে দুর্বল ও তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকে স্তিমিত করার পূর্ব-পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলিমের মাঝে শত্রুতা বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। তারা যুক্তি দেখান যে, এ চাতুরী হিন্দু-মুসলিমদেরকে বিভক্ত করে রাখে; তারা ধর্ম নিয়ে পরস্পরের মাঝে দ্বন্দ্ব ও হানাহানিতে ব্যস্ত থাকে, যা ব্রিটিশ শাসনকে অব্যাহতভাবে চলতে দেয়।

---

৯৩. Lal (1994), p. 29

৯৪. Goel SR (1996) *Story of Islamic Imperialism in India*, South Asia Books, Columbia (MO), p. 41-42

৯৫. Lal (1990), p. 113

৯৬. Elst, p. 8

৯৭. Cuttin PD (1993) *The Tropical Atlantic of the Slave Trade*, In M Adas ed., *Islam & European Expansion*, Temple University Press, Philadelphia, p. 172

৯৮. Lal (1973), p. 25-32

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের একটা বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ মনে করে যে, ব্রিটিশ-সৃষ্ট এ ধর্মীয় বিভাজনই সে অঞ্চলের মারাত্মক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণ, যা আজও তাদেরকে আক্রান্ত করে চলছে। তাদের মনে এ বিশ্বাস গভীরভাবে প্রোথিত যে, ব্রিটিশরা আসার আগে ভারতে হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে ধর্মীয় শত্রুভাবাপন্নতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; ব্রিটিশরাই এ ধূর্ত ও অশুভ পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছিল হিন্দু ও মুসলিমদেরকে পরস্পরের গলা কাটাকাটিতে ব্যস্ত রাখার জন্য।

ইংরেজদের তথাকথিত 'বিভক্তি ও শাসন' নীতিটির মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনা গোগ্রাসে গিলেছে ও প্রায়শই উগরে দেয় বা দিচ্ছে এ অঞ্চলের মানুষ – হোক সে হিন্দু বা মুসলিম, প্রগতিশীল বা সংস্কারবিরোধী, উদারবাদী বা গোঁড়া। সমালোচকরা মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে একটা আশ্চর্য রকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল, যা উদ্দেশ্য সিদ্ধিকর প্রতারক ব্রিটিশরা নষ্ট করে দেয়। এমনকি নেহরুও চিত্রাঙ্কিত করেন যে, ব্রিটিশরা সুচিন্তিতভাবে হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে। ভারতের কংগ্রেস দল এ ষড়যন্ত্রমূলক মতবাদকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকার অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে দেখে; সমস্ত দোষ গিয়ে পড়ে সাবেক উপনিবেশবাদীদের উপর, তাদের অনুপস্থিতিতেও।

নিচে দেখানো হবে যে, নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে ধর্মীয় বিভাজন বা বিভক্তিকে নিজেদের সুবিধায় কাজে লাগিয়েছিল। তবে প্রশ্ন করতে হবে: *ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে শত শত বছরের মুসলিম শাসনামলে হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে বা আদৌ বিদ্যমান ছিল কি?*

ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে একটা স্বপ্নীল ঐক্য ও সংহতি বিদ্যমান ছিল, এরূপ দাবি ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ দ্বারা আদৌ সমর্থিত নয়; বরং এর বিপরীত অবস্থার সমর্থনে যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ভারতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী মুসলিম শাসনামলে প্রতিটি প্রধান প্রধান হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল, যার অনেকগুলোকে বিরাট বিরাট মিনার সম্বলিত মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়, এবং তা করা হতো ইসলামের বিজয়োল্লাস ও সে সঙ্গে হিন্দু ও তাদের ধর্মকে ইসলামের পায়ে পদানত ও মর্যাদাহীন করার প্রতীক হিসেবে। এমনকি ১৬০০ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশরা প্রথম বণিকরূপে ভারতবর্ষের মাটিতে পদাপর্ণ করার পরও আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস এবং সারা ভারতের হিন্দুদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য জোরজবরদস্তি প্রয়োগ করছিলেন। ইসলামি নির্যাতন ও বর্বরতার ফলে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের আলো মূলত নিভে গিয়েছিল; অথচ মুসলিম হানাদারদের প্রথম আগমণের সময় ভারতের বেশ কিছু অংশে সেটা একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ধর্ম ছিল। মুসলিম শাসনামলে শিখ ও জৈনদেরকেও ভয়ঙ্কর মুসলিম স্বেচ্ছাচারিতার হিস্যা ভোগ করতে হয়েছে।

ভারতের স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখদের উপর মুসলিম হানাদার ও শাসকদের নিপতিত এরূপ জঘন্য নির্যাতনের পরও কি মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও একতার সম্পর্ক গড়ে উঠা সম্ভব ছিল?

উত্তর যদি হয় হাঁ, তাহলে বলতে হবে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিন্দুদের দ্বারা ঘটিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনেক কম শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড – যেমন অযোধ্যার বাবরী মসজিদের স্থলে মুসলিমদের দ্বারা ধ্বংসকৃত রামমন্দির পুনর্নির্মাণ করতে তাদের অনেকটা ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন – হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে পারস্পারিক সহিষ্ণুতা, বন্ধুত্ব ও ঐক্য সংহত করছে। এটা অনস্বীকার্য যে, ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে কেবলই একটা বড় বিভক্তি বিদ্যমান থাকতে পারতো, মুসলিম শাসকদের দ্বারা অমুসলিমদের উপর চরম নির্যাতনের ফলে।

ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে একটা নির্ভেজাল ঐক্য ও শান্তি বিদ্যমান থাকার কল্পকথা – যা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মার্ক্সবাদী ও মুসলিম ঐতিহাসিকরা প্রচার করে থাকেন – সেটা প্রকৃত ইতিহাসের হাস্যকর মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তৎকালীন মুসলিম ইতিহাসবিদ ও শাসকদের রেখে যাওয়া অসংখ্য ঐতিহাসিক দলিল ও প্রমাণের বিরোধী। এ ঐক্য ও শান্তির বিষয়টি ইসলামের মৌলিক নীতিরও বিরোধী, যা হিন্দু-পৌত্তলিকদেরকে ইসলামের ঘোরতর বা জাত-শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ও তাদেরকে সমূলে বিনাশের দাবি করে।

ব্রিটিশদের হিন্দু-মুসলিম বিভক্তির ব্যবহার: স্পষ্টতঃই ভারতে মুসলিম শাসনের পুরো সময় ধরে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে একটা বিরাট ফাঁরাক ও সংঘাত বিদ্যমান ছিল। ব্রিটিশ বেনিয়ারা ১৬০০ সালে ভারতে পদার্পণ করার পর ১৭৫৭ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা শুরু করার পূর্বে প্রায় দেড়শত বছর ধরে সেটা দেখেছে নিজ চোখে। তারা দেখেছে আওরঙ্গজেবকে হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করতে, দেখেছে মারাঠা, শিখ ও অন্যান্যদের সঙ্গে তাকে অবিরাম রক্তাক্ত ও তিক্ত সংগ্রাম করতে। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা সে পূর্ব-বিদ্যমান বিবাদ ও শত্রুতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে মাত্র। উদাহরণস্বরূপ সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালে চীফ কমিশনার স্যার হেনরী লরেন্স লক্ষ্ণৌতে মুসলিম ও হিন্দু সেনাদের এক সমাবেশকে বলেন:[৯৯]

> সৈনিকরা! বাইরে কেউ কেউ প্রচার করছে যে, সরকার তার সৈনিকদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছে। তোমরা সবাই জানো যে, এটা সর্বৈব মিথ্যা। এর আগে আলমগীর (আওরঙ্গজেব) ও পরবর্তীকালে হায়দার আলী হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছে, অপবিত্র করেছে তাদের ধর্মীয় স্থানসমূহ, তাদের মন্দির ধূলিস্মাৎ করেছে, এবং নির্দয়ভাবে তাদের দেবতা-মূর্তিগুলোর উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। আমাদের সময়ের দিকে তাকাও। এখানে যারা উপস্থিত তাদের অনেকেরই জানা যে, রনজিৎ সিং কখনোই তার মুসলিম প্রজাদেরকে নামাজ আহবানের অনুমতি দেননি – কখনোই দেননি মুয়াজ্জিনকে আযান দেওয়ার অনুমতি লাহোরের সজ্জিত সুউচ্চ মিনাগুলো থেকে, যা আজও সেখানে তাদের মহান প্রতিষ্ঠাতাদের স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে রয়েছে। গত বছরের আগেও কোনো হিন্দু লক্ষ্ণৌতে একটি মন্দির স্থাপনের সাহস পেতো না। তার সব কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। এখন কার সাহস আছে যে আমাদের মুসলিম বা হিন্দু প্রজাদের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করবে***...?***

[৯৯] Brown RC (1870) *The Punjab and Delhi in 1857*, Atlantic, Delhi, p. 33

এ দৃষ্টান্তটি কেবল ব্রিটিশদের মুসলিম-অমুসলিম বিভক্তি ও দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোর বিষয়টাই স্পষ্ট করে না, এটা ঐতিহাসিক সত্যকেও নিশ্চিত করে যে, এ বিভক্তি ব্রিটিশদের ভারতে ক্ষমতা দখলের আগেই বিদ্যমান ছিল এবং তারা এ বিবাদ-বিভক্তি ইতিমধ্যেই অনেকাংশে হ্রাস করেছিল। যাহোক ব্রিটিশদের এ মুসলিম-অমুসলিম বিভক্তি ব্যবহারের কারণে হোক বা না হোক, এটা সত্য যে হিন্দু ও ভারতের অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় সিপাহি বিদ্রোহকে মুসলিমদের মতো ততটা আনন্দচিত্তে সমর্থন করেনি। শিখ ও গুর্খারা ব্রিটিশদেরকে সমর্থন করেছিল। শিখরা স্পষ্টতঃই আওরঙ্গজেবের শাসনকালে তাদের উপর ঘটিত বর্বরতাকে তখনো ভুলে যায়নি। তারা দিল্লি পুনর্দখলে ব্রিটিশদেরকে সাহায্য করে। উত্তরের সিন্ধিয়া সহ অন্যান্য অনেক রাজ্যও ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল।

শিখ ও হিন্দুরা কেনোই বা সিপাহি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে? ব্রিটিশরা যদিও নির্বাহি ক্ষমতা ধরে রাখে, কিন্তু মোহাম্মদ শাহ জাফর তখনো ছিলেন সরকারিভাবে ভারতের রাষ্ট্র-প্রধান, যিনি আজকের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের দ্বারা এক মহান বিপ্লবী দেশপ্রেমিকরূপে প্রশংসিত হন সিপাহি বিদ্রোহে ইন্ধন যোগানোর কারণে। কিন্তু তার লড়াই ছিল কেবলমাত্র অতীতের মুসলিম সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, ব্রিটিশদেরকে ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের উপর পুনঃস্থাপন করার জন্য নয়। শাহ জাফরের আহ্বানে সারা ভারতের মুসলিমরা সিপাহি বিদ্রোহকে তাদের হারানো ইসলামি কর্তৃত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। সিপাহি বিদ্রোহ চলাকালীন শাহ জাফর নিজেকে ভারতের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন ও তার নামে ধাতব মুদ্রা প্রবর্তন করেন, যা ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ বা শাসন আরোপ বা সংহত করার আদর্শ প্রতীক। মুসলিমরা নামাজের সময় খুৎবায় তার নাম পুনরায় যুক্ত করে, যা ছিল মুসলিমদের মাঝে তাকে ভারতের 'আমির' (নেতা) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতীক মাত্র।

সিপাহি বিদ্রোহের ব্যাপারে অটোমান তুর্কী শাসকদের অবস্থানও ভারতের ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদে সহায়ক ছিল না। ব্রিটিশের দ্বারা মুসলিম শাসকদের বহিষ্কারের পর, সাধারণত অমুসলিম শাসনের অধীনে থাকতে ঘৃণা পোষণকারী ভারতীয় মুসলিমরা বহির্দেশীয় শক্তিধর অটোমান সুলতানের প্রতি তাদের আনুগত্য ও সমর্থন উপস্থাপন করতঃ তাকে তাদের খলিফা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু অটোমানদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সাহায্যের সূত্রে ব্রিটিশরা তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলিমদের যুদ্ধ না করার নিমিত্তে অটোমান সুলতানের কাছ থেকে একটা নির্দেশনামা বা ফতোয়া আদায় করতে সক্ষম হয়।

অটোমান সুলতানের এ নির্দেশনামা সারা ভারতের মসজিদগুলোর খুৎবায় পড়ে শোনানো হয়। সিপাহী বিদ্রোহীদেরকে অটোমান সুলতান সমর্থন করা দূরে থাক, তাদের দ্বারা সংঘটিত বিদ্রোহের ব্যাপারে তিনি নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করেন।[১০০] স্পষ্টত অটোমানদের প্রভাবে **১৮৫৭** সালে ভারতের বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিত ও উলেমারা কলকাতায় সমবেত হয়ে এক 'ফতোয়া' জারি করে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অটোমান সুলতান ও ইসলামের খলিফার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ফতোয়াটিতে বলা হয়: '*ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ অবৈধ।*'[১০১] হায়দরাবাদের মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী সালার জং লিখেছেন: ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রাপ্ত ব্রিটিশদের উপকারের ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে '*ইস্তাম্বুল থেকে অবারিতভাবে অটোমান খিলাফতের সমস্ত প্রভাব ব্যবহার করা হয় বিদ্রোহের বিস্তারকে প্রতিরোধ করতে*' ও ভারতীয় মুসলিমদেরকে ব্রিটিশদের পাশে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টায়।[১০২] ভারতীয় মুসলিমদের কার্যত রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রধান বা নেতা অটোমান সুলতানের এরূপ হতাশাজনক অবস্থানের কারণে তাদের ব্রিটিশ-বিরোধী জিহাদের জোয়ার স্তিমিত হয়ে পড়ে। সালার জং লিখেছেন: '*তাদের খলিফার নির্দেশে ভারতের চরম যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়গুলোও (মুসলিম)... ব্রিটিশ পক্ষকে অকৃত্রিম সমর্থন যোগায় (বিদ্রোহের) একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে।*'

সিপাহি বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশরাজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, ভারতে তাদের শাসনের দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ভারতীয় মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যেকার সুদীর্ঘকালীন বিদ্যমান তিক্ত ধর্মীয় বিবাদকে কাজে লাগানোর মধ্যে। এরপর থেকে তারা এ বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, বিশেষত সেনাবাহিনীতে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সেনাদেরকে পৃথক কোয়ার্টারে রাখার মাধ্যমে – তাদেরকে আর কখনো একই বাহিনীর অধীনে কাজ করার সুযোগ না দিয়ে।[১০৩]

ব্রিটিশ শাসকদেরকে বিতাড়িত করার আন্দোলনে বিলুপ্ত মুঘল নেতারা (নওয়াবরা) নানারকম প্রলোভনে হিন্দুদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ তারা বহুকাল ধরে বিতর্কিত অযোধ্যার বাবরি মসজিদ-রামমন্দির চত্বরটি হিন্দুদের হাতে সমর্পন করতে সম্মত হয়, তাদের মুসলিম-বিরোধী আক্রোশ প্রশমিত করতে ও এরূপে তাদেরকে বিদ্রোহে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করতে। ব্রিটিশ বাহিনীর অনেক হিন্দু সৈনিক তাদের মুসলিম সহযোদ্ধাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। যুক্ত প্রদেশ, দিল্লি, মধ্য ভারতের কিছু অংশ ও বিহারের বিপুল সংখ্যক হিন্দু বিদ্রোহে যোগ দেয়। তবে মোটের উপর ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণে হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিমদের উৎসাহ তুলনামূলক কম ছিল; অন্যত্র তারা ব্রিটিশদের পক্ষেও ছিল।

খুব সম্ভবত সিপাহি বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে জিজিয়া ও অমুসলিমদের ক্রীতদাসত্বের অতীত প্রথা ও দিনগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা প্রয়াস মাত্র, যা ব্রিটিশরা বন্ধ করেছিল। নেহরুর মতে সিপাহি বিদ্রোহ ছিল পুরানো সামন্তবাদ পুনরায় সংহত করার এক প্রয়াস, যা তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি লিখেছেন: '*১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ ছিল সামন্তবাদী ভারতের সর্বশেষ ঝলক।*'[১০৪] *ব্রিটিশদেরকে বিতাড়িত করে মুঘল*

---

[১০০] Ozcan A (1977) *Pan Islamism, Indian Muslims, the Ottomans & Britain* (1877-1924), Brill, Leiden, p. 16

[১০১] Ibid, p. 20

[১০২] Ibid, p. 17

[১০৩] Braudel F (1995) *A History of Civilization*, trs. Mayne R, Penguin Books, New York, p. 242

[১০৪] Nehru (1989), p. 415

শাসন ফিরিয়ে আনতে ভারতের মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের হাত মিলানো কি বুদ্ধিমানের কাজ ছিল বা হতো? ব্রিটিশ শোষণ হয়তোবা ছিল মুসলিমদের মতোই খারাপ। তার বাইরে ব্রিটিশরাজের অধীনে তারা অবশ্যই অধিকতর মুক্ত বা স্বাধীন, কম উত্যক্ত ও বেশি সম্মানিত; এমনকি মুসলিম শাসনের অধীনে তারা যা কিছু ভোগ করেছে তার চেয়ে অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থানে। নৈপুল লিখেছেন: *'ব্রিটিশ শাসনকাল – কোন অংশে দুইশ' বছর, অন্যত্র একশ' বছরের বেশি – ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণের সময়।'*[১০৫] মুসলিম শাসনের অধীনে পুনরায় 'জিম্মি' হওয়াটা তাদের কাছে সুস্পষ্টরূপেই কম আকর্ষণীয় ছিল।

হিন্দু-মুসলিম বিবাদ, ভারত ভাগ ও তাতে ব্রিটিশের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের জন্য সামগ্রিকভাবে দোষের ভাগিদার হলো ব্রিটিশ শাসকরা, বিশেষত হিন্দুদের কাছে। ১৮৮৫ সালে *ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস* দলটি প্রতিষ্ঠা লাভের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ রোপিত হওয়ার সাথে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে একটা উত্তেজনাও দানা বাঁধতে শুরু করে। এ উত্তেজনা আরো উস্কানি পায় ১৯০৬ সালে *নিখিল ভারত মুসলিম লীগ* দলটি প্রতিষ্ঠার ফলে। ১৯২০-এর দশকে এটা সহিংসতায় মোড় নেয় এবং আরো ভয়ঙ্কররূপে ১৯৪০-এর দশকে, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়: ভারত ও পাকিস্তান। ভারত বিভক্তি সংক্রান্ত সহিংসতায় ২০ লক্ষ পর্যন্ত মানুষ মারা যেয়ে থাকতে পারে। আর সে ধ্বংসাত্মক সহিংসতার জন্য ব্রিটিশরা ঢালাওভাবে নিন্দিত হয়েছে। যাহোক ভারত বিভক্তি ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সহিংসতায় ব্রিটিশদের দুষ্কর্মের উপর একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্রুত সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হচ্ছিল। ১৯১৪ সালে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আগমনের পর তা বহুগুণ গতি লাভ করে। তার হিন্দু ধর্মীয় অহিংসা নীতির পোশাকে আবৃত 'অহিংসা আন্দোলন' ভারতীয় জনগণকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে তোলে। ১৯২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বরে ১৯১৯ সালীয় সংবিধান অগ্রাহ্যের জন্য গান্ধীর আহ্বান ও ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে তার অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে ভারতীয় জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া প্রদান স্পষ্ট করে তোলে যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হতে যাচ্ছে।

এ সময়ে ভারতীয় মুসলিমদের মাঝে দুটো পৃথক আন্দোলন গড়ে উঠে। ধার্মিকেরা শুরু করে 'খিলাফত' আন্দোলন (১৯১৯-২৩)। ব্রিটিশদের দ্বারা একের পর এক মুসলিম শাসকদের উৎখাত শুরুর প্রেক্ষাপটে ভারতের মুসলিমরা এর আগেই তাদের রাজনৈতিক প্রধান ও ত্রাণকর্তারূপে অটোমান সুলতানের উপর আস্থা স্থাপন করেছিল। তারা এ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল বিখ্যাত সুফি সাধক শাহ ওয়ালিউলাহর (মৃত্যু ১৭৬২) শিক্ষা থেকে, যিনি ভারতে মুসলিম শক্তি ভেঙ্গে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখে শক্তিশালী অটোমান সুলতানকে 'আমির-উল-মুমেনীন' বা 'বিশ্বাসীদের নেতা' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ১৭৯৯ সালে সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক টিপু সুলতান উৎখাত হওয়ার পর মুসলিম আনুগত্য ব্যাপকভাবে অটোমানদের উপর স্থাপিত হয়, যা দেখতে পাওয়া যায় সিপাহি বিদ্রোহে অটোমানদের বিরোধিতায় তাদের অনুগত সাড়া দেওয়ার মধ্যে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ-ফরাসি বাহিনী অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ছিনিয়ে নিয়ে অনেকগুলো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। এতে বিশ্বের প্রধানত উম্মাবাদী-খিলাফতবাদী মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ভারতের ক্রুদ্ধ ধার্মিক মুসলিমরা অটোমানদের বিরুদ্ধে নাক গলানোর রোষে ভারত থেকে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন শুরু করে। তারা চেয়েছিল ব্রিটিশরা চলে যাবার পর ভারত হবে বিশ্বের মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে একত্রে যুক্ত করা অটোমান খিলাফতের একটা অংশ। গান্ধী ও জওয়াহেরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল দু'পক্ষেরই শত্রু ব্রিটিশদের উৎখাত করার জন্য এ ইসলামি আন্দোলনে যোগ দেয়। কিন্তু 'মোপলা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত ১৯২১ সালে মালাবরে নিরীহ হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত মুসলিম সহিংসতার প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস দলের নেতাদের মাঝে খিলাফত আন্দোলন আনুকূল্য হারায় (নিচে দেখুন)। ১৯২৩ সালে কামাল আতাতুর্ক অটোম্যান খিলাফত বিলুপ্ত করার পর এ আন্দোলনটি পরিত্যক্ত হয়।

জাতীয়তাবাদী মানসিকতার মুসলিমরা ভারতবর্ষে একটা পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় আন্দোলনটি শুরু করে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার দ্বারা এ ধারণার সূচনা হলেও খিলাফত আন্দোলনের মৃত্যু ঘটার পরই তা গতি লাভ করে। মুসলিমরা এ বিভক্তিকরণ আন্দোলনটি শুরু করে এ ভয়ে যে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে বসবাস করতে হতে পারে। এ ভয়টি স্পষ্টতঃ প্রতিফলিত হয় আল্লামা ইকবালের গণতন্ত্রের সমালোচনায়, যেখানে তিনি বলেন: এটা এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে *'মাথা গণনা করা হয়, পরিমাপ করা হয় না।'* মোহাম্মদ ইকবাল (যার পরিবার হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছিল অল্পকাল আগে) বিকৃত অন্ধবিশ্বাসী মুসলিমদের মতোই তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত ইসলামি আদর্শের প্রাধান্যের বিশ্বাসে মনে করতেন: *'সমগ্র ভূমির মালিক মুসলিমরা, কারণ এগুলো তাদের আল্লাহর মালিকানাধীন।'*[১০৬] সুতরাং যদিও সে পর্যন্ত ভারতের সমস্ত বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও নোবেল বিজয়ী ছিল হিন্দু, তথাপি ধর্মান্ধ ইকবালের দৃষ্টিতে হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমদের মাথার পরিমাপ বা ওজন হতে হবে বেশি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার জন্য উন্মত্ত সহিংসতা চালানোর সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ দল মুসলিমদের মাঝে একটা গোপন লিফলেট বিলি করে, যাতে বলা হয়: *'একজন মুসলিমের পাঁচজন হিন্দুর অধিকার পাওয়া উচিত, অর্থাৎ একজন মুসলিম পাঁচজন হিন্দুর সমান।'*[১০৭] ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের মাটিতে অতীতের সে মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে ইকবাল

---

[১০৫] Naipaul (1998), p.247

[১০৬] Elst K (1993) *Negationism in India*, Voice of India, New Delhi, p. 41

[১০৭] Khosla GD (1989) *Stern Reckoning: A Survey of Events Leading Up To and Following the Partition of India*, Oxford University Press, Delhi, p. 313

১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’-এর সমাবেশে সভাপতি হিসেবে তার ভাষণে মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি হিসেবে ‘পাকিস্তান’-এর একটা সুনির্দিষ্ট নকশা উপস্থাপন করেন।[১০৮] ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি রাষ্ট্রে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর অসাধ্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইকবাল বলেন:

> ‘ধর্ম কি কোনো ব্যক্তিগত বিষয়? তোমরা কি চাও ইসলাম একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শরূপে মুসলিম বিশ্বে একই ভাগ্য বরণ করুক, যা ইতিমধ্যে ইউরোপে ঘটেছে খ্রিষ্টান ধর্মের ভাগ্যে? ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে কেবলমাত্র একটা নৈতিক আদর্শরূপে রাখা কি সম্ভব, এমন জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে, যেখানে ধর্মীয় মনোভাবের প্রভাব ফেলার কোনোই অনুমতি নেই? ভারতে এ প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু। ধর্ম একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্র – ইউরোপীয়দের কণ্ঠের এ প্রস্তাবটিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইউরোপে খ্রিষ্টানত্বকে সন্ন্যাসবাদী একটা ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণরূপে বস্তুজগৎকে প্রত্যাখান করে ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারায় তার পরিচালনাকে সম্পূর্ণ জাগতিক চেতনার উপর ছেড়ে দেয়, সে ধারণা এ প্রস্তাবনার মধ্যে নিহিত। কিন্তু নবির ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতি, যা কোরানে বিধৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।’

অতএব মুসলিমদের জন্য এমন একটা রাষ্ট্র প্রয়োজন, যেখানে ধর্মীয় বিধিবিধান রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনে পুরোপুরি অঙ্গীভূত হবে। সুতরাং ইকবাল যোগ করেন:

> ...ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ ইসলাম দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আঙ্গিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটাকে প্রত্যাখ্যান মানে, পরিণামে অপরটিকেও প্রত্যাখ্যান করা। অতএব একটা রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সংগঠনকে জাতীয়ভাবে গঠনের মানে যদি হয় ইসলামি ঐক্য বা সংহতির স্থানচ্যুতি, সেটা মুসলিমদের কাছে অচিন্ত্যনীয়। এ বিষয়টি এ মুহূর্তে ভারতীয় মুসলিমদের সাথে সরাসরি সংযুক্ত।’

সুতরাং মুসলিমদের একটা পৃথক রাষ্ট্র প্রয়োজন এবং সে প্রসঙ্গে ইকবাল ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’টির স্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেন এভাবে:

> ‘আমি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একটা মাত্র রাষ্ট্ররূপে একত্রকরণ দেখতে চাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীকার হোক কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে, একটা সুসংহত উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় ‘মুসলিম রাষ্ট্র’ আমার দৃষ্টিতে হবে মুসলিমদের চূড়ান্ত গন্তব্য স্থান, কমপক্ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিমদের।’

১৯৩৭ সালে জিন্নাহকে লিখিত এক চিঠিতে ইকবাল খোলাখুলি স্বীকার করেন যে, তার প্রস্তাবিত পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রটির উদ্দেশ্য হলো ‘*মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা করা*’। এবং তিনি সুদূরের মুসলিম-অধ্যুষিত বাংলাকেও সে মুসলিম রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করেন এভাবে: ‘*উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও বাংলার মুসলিমরা কেন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাওয়ার যোগ্য রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না, ভারতের ভিতরের ও বাইরের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর মতো?*’[১০৯] ১৯৩৮ সালে তার মৃত্যুর ঠিক পূর্বে ইকবাল মুসলিমদেরকে জিন্নাহর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান করে বলেন:

> একটামাত্র পথ রয়েছে। মুসলিমদের উচিত জিন্নাহর হাত শক্ত করা। তাদের মুসলিম লীগে যোগ দেওয়া উচিত। ভারতীয় প্রশ্নটির এখন যে সমাধা হচ্ছে, তা আমরা মোকাবেলা করতে পারি হিন্দু ও ইংরেজ উভয়ের বিরুদ্ধেই একত্রিত জোট গঠনের মাধ্যমে। সেটা ছাড়া আমাদের দাবি গৃহীত হবে না। লোকেরা বলে আমাদের দাবিতে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতার ছাঁপ। এটা একান্তই অপপ্রচার। এ দাবিগুলো আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে জড়িত।’[১১০]

জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনটি গতি সঞ্চার লাভ করে। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে পৃথক ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিতে ‘লাহোর প্রস্তাব’ পাস করে। প্রস্তাবটিতে বলা হয়: ‘*...যেসব এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যাগুরু, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে, সেগুলোকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যুক্ত করা হবে, যার মধ্যে নির্বাচনী অংশগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।*’[১১১]

দীর্ঘকাল অমুসলিমদের উপর বর্বরতাপূর্ণ মহাশক্তিধর প্রভুত্ব খাটানো মুসলিমদের ঐতিহাসিক আত্মগর্ব তাদেরকে স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ যুক্ত ভারতে একটা সংখ্যালঘু জাতি অথচ সম-অধিকার প্রাপ্ত নাগরিক হওয়ার পরিণাম বহন করতে দিল না। তারা একটা পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে নির্মম সহিংসতা শুরু করে দেয় (নিচে দেখুন), যা ব্রিটিশদেরকে উপলব্ধি করায় যে, হিন্দু ও মুসলিমরা একত্রে বাস করতে পারবে না। এ পরিস্থিতিই পরিণামে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তি ঘটায়। আনোয়ার শেখ মনে করেন, ইসলাম মৌলিকভাবে নিজেই ‘বিভক্তি ও শাসন’-এর একটি মতবাদ এবং ইসলামের এ ‘বিভক্তি ও শাসন’ মতবাদই ভারতের বিভক্তির জন্য দায়ী, ব্রিটিশদের বিভক্তিমূলক নীতি নয়। তিনি লিখেছেন:[১১২]

> ... কিন্তু যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তাদের (ইসলামিক হানাদারদের) আদর্শ, অর্থাৎ ইসলাম, যা তাদেরকে ভারতে বয়ে এনেছিল, তা স্মৃতি থেকে মোছা যাবে না; কেননা নিরাময়ের পরিবর্তে সে আঘাত একটা নিরাময়-অযোগ্য বিষ ফোঁড়ায় পরিণত হয়েছিল। যদিও সব মুসলিমের ৯৫ শতাংশই মূল জনসংখ্যা থেকে আসা, আর অবশিষ্ট মাত্র ৫ ভাগও শত শত বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করার সূত্রে ভারতীয় হিসেবেই স্বীকৃতি প্রাপ্ত, তথাপি তারা সবাই

---

১০৮. Sherwani LA ed. (1977) *Speeches, Writings and Statements of Iqbal,* Iqbal Academy (2nd Edition), Lahore, p. 3-26.

১০৯. Allama Iqbal Biography; http//www.allamaiqbal.com/person/ biography/biotxtread.html.

১১০. Iqbal & Pakistan Movement; http//www.allamaiqbal.com/person/ movement/move-main.htm

১১১. Menon VP (1957) *The Transfer of Power*, Orient Longman, New Delhi, p. 83

১১২. Shaikh (1998), Chapter 7

মিলে নিজেদেরকে একটা পৃথক মুসলিম জাতি মনে করেছিল – এ বিশ্বাসে যে, তাদের জন্মভূমি একটা 'দ্বার-উল-হার্ব' বা 'যুদ্ধক্ষেত্র'। এ অন্যায় মতাদর্শটিই ভারতের বিভক্তির কারণ ছিল। আরবরা (আরব হানাদাররা) নিজেরা যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, আরবীয় 'বিভক্তি ও শাসন' মতবাদটি তা করে দেয় তাদের জন্য।

পৃথক ইসলামি রাষ্ট্র সৃষ্টির লক্ষ্যে মুসলিমদের অন্ধ-উদ্দীপনা যখন প্রবল হয়ে উঠে, তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে হিন্দু রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, যা তাদের মাতৃভূমির বিভক্তির বিরোধী ছিল। এ নতুন হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন ভারত-বিভক্তি সম্পৃক্ত দাঙ্গা ও রক্তপাতে সমান দোষী বা অংশীদার রূপে নিন্দিত হয় অনেকের দ্বারা। কিন্তু এটা তর্কাতীত যে, ভারত ভাগের সময় যে সহিংসতা ও হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় তার প্রাথমিক কারণ ছিল সংখ্যাগুরু অমুসলিম জনগণের সঙ্গে একটা ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভারতকে গ্রহণে মুসলিমদের অনিচ্ছা ও প্রত্যাখ্যান।

স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও অব্যাহত সহিংসতার জন্য হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদীরাও চরম নিন্দিত হয়েছে। তবে প্রথমত এটা বিবেচনা করতে হবে যে, হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল মুসলিমদের অযৌক্তিক ও ধর্মান্ধ আন্দোলনের স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ারূপে – যেমন খিলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী (গান্ধী ও নেহরু সমর্থিত) ভারতকে নিখিল ইসলামি খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত করার অভিপ্রায়, পরে ভারতকে বিভক্ত করে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি ও সে লক্ষ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অমানবিক সহিংসতা (যেমন মোপলা বিদ্রোহ) ইত্যাদি।

মুসলিমরা নিষ্ঠুর হানাদাররূপে ভারতে এসে শত শত বছর শাসন করে। তারা সর্বোচ্চ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে ব্যাপক গণহত্যা ও ক্রীতদাসকরণসহ লাগামহীন লুণ্ঠনকার্যের মাধ্যমে ভারতীয়দের ধনসম্পদ লুট করে এবং তাদের ধর্মীয় প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসসাধন করে। অর্থনৈতিক শোষণকে বাদ দিলে, ব্রিটিশ শাসন কিছুটা হলেও ভারতীয় অমুসলিমদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনে সুদীর্ঘ ইসলামি নিষ্ঠুরতা ও অমর্যাদা সহ্য করার পর। ব্রিটিশ শাসকদের যখন চলে যাওয়া সময় আসে ভারতীয় জনগণের হাতে স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দিয়ে, তখনই মুসলিমরা ভারতভূমি বিভক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তর, ক্রীতদাসকরণ এবং অন্যান্য উপায়ে নির্যাতন ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে যদিও বিপুল সংখ্যক লোক মুসলিম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের উপর নিষ্ঠুরভাবে চাপিয়ে দেওয়া একটা বিদেশী আদর্শের ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করার কোনো অধিকারই তাদের ছিল না। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য মুসলিমদের দাবি ও সে দাবি বাস্তবায়নে তাদের নির্মম সহিংসতা হিন্দুদের মাঝে পৃথক একটি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ধর্মান্ধতার উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এর ফলে কিছু হিন্দু তাদের ধর্মীয় অস্তিত্বের প্রতিনিধিরূপে একটা জঙ্গি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী শক্তিরূপে জেগে উঠে, তাদের দেশকে বিভক্ত করতে উদ্যত মুসলিমদের বিরুদ্ধে। বিশেষত **১৯২১** সালে মোপলা সহিংসতার পর হিন্দু সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ' (আর. এস. এস.)। এর উদ্ভব দীর্ঘকালব্যাপী মুসলিমদের ঐতিহাসিক অন্যায়-অবিচার এবং বর্তমান মুসলিমদের ধর্মান্ধতা, অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছিল মাত্র।

১৯৪৭ সালের দাঙ্গা ও হত্যাযজ্ঞ: কে দায়ী?

ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সহিংসতার জন্য প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশদেরকে দোষারোপ করা হয়, বিশেষতঃ হিন্দুদের দ্বারা। কনরাড এলস্ট উল্লেখ করেছেন: কংগ্রেস দল মনে করে যে '*একটা অশুভ শক্তি (ব্রিটিশরা) হিন্দু-মুসলিম অনিচ্ছুক ভ্রাতৃত্বের উপর বিভক্তি চাপিয়ে দিচ্ছিল।*'[১১৩] ভারত ভাগের উপর প্রধান প্রধান সাহিত্যকর্ম – যেমন খুশবান্ত সিং-এর উপন্যাস 'ট্রেন টু পাকিস্তান', ভীষম শাহ্নীর উপন্যাস 'তামাস' (চলচ্চিত্রে রূপায়িত) ও 'দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্স' গ্রন্থে উরাভাবী বুতালিয়ার ভারত-ভাগ সংশিষ্ট প্রামাণ্য সংগ্রহসমূহ – ইত্যাদি এমনভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে হিন্দুদের ঘাড়ে অধিক দোষ চাপানো যায় হিন্দু সহিংসতার ঘটনাগুলোকে লক্ষ্যণীয় করে তোলার মাধ্যমে। যাহোক এ উপমহাদেশের জনগণের সাধারণ ধারণা হলো, ভারত ভাগের সময়ে সংঘটিত সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য হিন্দু ও মুসলিমরা সমানভাবে দায়ী। এ বিষয়ে অধিকাংশ গবেষণামূলত কাজগুলোও করা হয়েছে হিন্দু ও মুসলিমদের উপর সমভাবে দোষ চাপানোর ইচ্ছাকৃত প্রয়াসে চালিত পথে। **১৯৪৭** সালের সহিংসতার একটা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এখানে উপস্থাপন করা হবে। এতে পাঠকবর্গ বিচার করে দেখতে পারবেন তিনটি পক্ষের – (ক) ব্রিটিশ রাজ, (খ) মুসলিম ও ইসলামি আন্দোলন এবং (গ) হিন্দু ও হিন্দুত্ব আন্দোলন – মধ্যে কে কতটা দোষের ভাগীদার।

মপ্লা বিদ্রোহ

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও বিভক্তির আন্দোলনকালের সহিংসতা উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে যেতে হবে দক্ষিণ ভারতের মালাবারে **১৯২১** সালের দৃশ্যপটে, যা আমাদেরকে দেখাবে মুসলিমরা তাদের নিরীহ প্রতিবেশীদের উপর কীরূপ নির্মম বর্বরতা ঘটাতে পারতো। জানা যায় যে, মুসলিম বণিকরা ৬২৯ সালে মালাবর উপকূলের বন্দরে এসে সহিষ্ণু হিন্দুদের মাঝে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তাদের সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল হিন্দু নারীদের সাথে মিশ্র বিয়ের মাধ্যমে। দাবি করা হয় কিছু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিমদের সংখ্যা যথেষ্ট বড় হয়ে উঠে (বর্তমানে প্রায় এক-চতুর্থাংশ)। এ পর্যায়ে তারা জিহাদী পথ অবলম্বন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, এবং মাঝে মাঝে সুফি সাধকদের ইন্ধনে পর্তুগিজ দখলদার ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ

[১১৩] Kamra AJ (2000) *The Prolonged Partition and Its Programs*, Voice of India, New Delhi, p. VII

কর্মে লিপ্ত হতে শুরু করে। রবিনসন লিখেছেন: এখন তারা গড়ে তোলে '*ধর্মযুদ্ধ ও শহীদী মৃত্যুর একটি ধারা বা রীতি... যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ধর্মীয় সহিংসতায় – উদাহরণস্বরূপ ১৮৩৬ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে এরূপ ৩২টি সহিংসতার ঘটনা ঘটে।*'[১১৪] সব সময়ই তাদের জিহাদী উচ্ছ্বাসের শিকার হত নিরীহ হিন্দুরা।

১৯২১ সালে মালাবরের মুসলিমরা (যাদেরকে 'মপলা' বলা হয়) নিরীহ হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটা জঘণ্য সহিংসতার ঘটনা ঘটায়, যা 'মপলা বিদ্রোহ' নামে পরিচিতি লাভ করে। 'খুদ্দাম-ই-কাবা' ও 'কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি' নামের দু'টি মুসলিম সংগঠন এ বিদ্রোহের ইন্ধন যোগায়, যেগুলো নিখিল বিশ্ব ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল। আম্বেদকার জানান: তারা এ মতবাদ প্রচার করতো যে, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ভারত ছিল 'দ্বার-উল-হারব'; মুসলিমদেরকে এর বিরুদ্ধ যুদ্ধ করতে হবে এবং আর তা না পারলে তাদেরকে অবশ্যই 'হিজরত' (একটা মুসলিম দেশে পাড়ি জমান)-এর বিকল্প নীতি গ্রহণ করতে হবে।[১১৫] যদিও বিদ্রোহটি ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধ, যারা ছিল নাগালের বাইরে; এবং তাদের অনুপস্থিতিতে মুসলিমরা প্রতিবেশী হিন্দুদের উপর শুরু করে দেয় সন্ত্রাস। আম্বেদকার মপলাদের দ্বারা সংঘটিত ভয়ঙ্কর বর্বরতার বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> মপলাদের হাতে হিন্দুদের উপর ভয়াবহ দুর্ভাগ্য নেমে আসে। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, মন্দির অপবিত্রকরণ, মহিলাদের জঘন্য ইজ্জতহানি ও নির্যাতন, যেমন অন্তঃস্বত্ত্বা নারীর পেট চিড়ে ফেলা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ ও পাইকারিভাবে ধ্বংসসাধন; মোটকথা মপলারা হিন্দুদের উপর সব রকমের নিষ্ঠুর ও অবাধ বর্বরতা নির্বিঘ্নে সংঘটিত করে... নিহত, আহত বা ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা জানা যায়নি। তবে সে সংখ্যা হবে অগণিত।

১৯০১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতে বসবাসকারী জে. জে. বেনিঙ্গা সে ভয়ঙ্কর বর্বরতার উপর এক বিবরণ প্রকাশ করেন।[১১৬] বেনিঙ্গা কয়েকজন দুষ্কর্মকারী বা অপরাধীর বিচারে তিন সদস্যের বিচারক-মণ্ডলীর রায়টি উদ্ধৃত করেন, যা বলে:

> 'কমপক্ষে বিগত একশত বছর ধরে মপলা সম্প্রদায় মাঝে মাঝেই এরূপ খুন-খারাবী মূলক অপকর্মের জন্য ঘৃণিত হয়ে আসছে। অতীতে তারা এগুলো করেছে ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে... তাদের সংকীর্ণ ও ধর্মান্ধ মন এরূপ উত্তেজক শিক্ষায় আক্রান্ত যে *কাফেরদেরকে হত্যা করলে স্বর্গ পাওয়া যাবে*। তারা লড়াইয়ের পথে নেমে পড়ে বাছবিচারহীনভাবে হিন্দুদেরকে হত্যা করে... এ হিংস্র কাজে নেমে পড়তে তারা কোন অভিযোগেরও প্রয়োজন মনে করে না।'

বেনিঙ্গা আরো লিখেছেন: '*...কূপগুলো ছিন্নভিন্ন লাশে ভরে যায়; অন্তঃসত্ত্বা নারীদেরকে কেটে টুকরো করা হয়; শিশুদেরকে তাদের মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করা হয়; স্বামী ও পিতাদেরকে তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের সামনে নির্যাতন, কষাঘাত ও জীবিত পোড়ানো হয়; নারীদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়; বাড়ি-ঘর ধ্বংস করা হয়... কমপক্ষে একশ'টি মন্দির ধ্বংস বা অপিবত্র করা হয়; মন্দিরে গো-হত্যা করা হয় এবং তার নাড়িভূরি প্রতিমার গলার ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ফুলের মালা ছিড়ে ফেলে; পাইকারি হারে লুটপাট করা হয়।*' রবিনসন উল্লেখ করেছেন যে, মপলাদের হিসাব মতে '*১০,০০০ জীবনহানি ঘটে*'।[১১৭]

এ বর্বর ঘটনার পর খিলাফত আন্দোলনের সমর্থক মহাত্মা গান্ধী নিষ্ঠুর মপলাদেরকে '*দেশের সবচেয়ে সাহসীদের মধ্যে গণ্য করে*' ও 'খোদাভীরু' আখ্যা দেয়; এবং এ বর্বরতার মাত্রাকে খাটো করে দেখানোর জন্য তার 'ইয়ং ইন্ডিয়া' ম্যাগাজিনে লিখেন: '*আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন খবর পেলাম, যা মনে হল সুনির্দিষ্ট ও সত্য খবর, যে সেখানে ধর্মান্তরের ঘটনা ছিল মাত্র তিনটি... আমি মনে করি না যে, এটা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটাবে।*'[১১৮] কিন্তু বাস্তবে সেখানে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল।

কলকাতায় 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' দাঙ্গা

মপলা বিদ্রোহের পর খিলাফত আন্দোলনটি স্তিমিত হয়ে পড়ে। এখন ভারত বিভাজন সংক্রান্ত সহিংসতার দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে, যা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্টে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের এক বছর আগে। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্তও পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণাটি প্রতিহত করা হচ্ছিল এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সমান প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন একটি মধ্যবর্তী সরকার গঠনের প্রয়াস চলছিল। মুসলিমরা ছিল জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ ও হিন্দুরা ৭৫ ভাগ; কাজেই কংগ্রেস দল এ প্রস্তাবে আপত্তি জানায়। পরিবর্তে তারা ৬ জন হিন্দু, ৫ জন মুসলিম ও অবশিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো থেকে ১ জন প্রতিনিধির প্রস্তাব করে। জিন্নাহ এ নতুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আলোচনা থেকে সরে এসে ১৯৪৬ সালের ২৬শে জুলাই বোম্বাইতে 'মুসলিম লীগ কাউন্সিল' অধিবেশন আহ্বান করেন। বৈঠকটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের কেন্দ্রীয় রায়টি ছিল নিম্নরূপ:[১১৯]

---

১১৪. Robinson F (2000) *Islam and Muslim History in South Asia*, Oxford University Press, New Delhi, p. 247
১১৫. Ambedkar, Vol. 8, p. 163
১১৬. Banninga JJ (1923) *The Moplah Rebellion of 1921*, in *Moslem World* **13**, p. 379-87
১১৭. Robinson, p. 247
১১৮. Gandhi K (1921) *Young India*, September 8 edition.
১১৯. Khosla, p. 38

'এটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ভারতের মুসলিমরা একটা স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ স্বার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুতেই শান্ত হবে না... *নিখিল ভারত মুসলিম লীগ* কাউন্সিল মনে করে যে, মুসলিম জাতির জন্য সময় এসে গেছে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' বা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর জন্য, যা হবে পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে এবং ব্রিটিশ-অধীন বর্তমান দাসত্ব ও বর্তমানে চিন্তাকৃত শ্রেণীপ্রথা-কলুষিত হিন্দু জাতির ভবিষ্যত কর্তৃত্ব থেকে মুক্তির জন্য ।'

ডাইরেক্ট এ্যাকশনটি কিরূপ হবে? সেটা সহিংস হবে নাকি অহিংস – এ প্রশ্নটিতে জিন্নাহকে পিড়াপিড়ি করা হলে তিনি উত্তর দেন: "*আমি এখানে নৈতিকতা আলোচনা করতে যাচ্ছি না।*" নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, যিনি পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন, তিনি আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস (এ. পি.)-কে বলেন: "*আমরা কোন পন্থাই বাদ দিতে রাজি নই, ডাইরেক্ট এ্যাকশনের অর্থ হলো আইনের বিরুদ্ধে যে কোন কর্ম।*" সরদার আব্দুর রব নিস্তার, যিনি পরে স্বাধীন পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী ও গভর্নর পদে আসীন হন, তিনি পূর্ব-হুঁশিয়ারীমূলকভাবে স্পষ্ট করেন যে: "*পাকিস্তান অর্জিত হতে পারে কেবল রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে এবং সুযোগ এলে অমুসলিমদের রক্ত ঝরবে, কারণ মুসলিমরা অহিংসায় বিশ্বাসী নয়।*"[১২০] এ উক্তিগুলো পরিষ্কার করে তোলে ডাইরেক্ট এ্যাকশনটি কিরূপ হতে যাচ্ছিল। জিন্নাহর মনোভাব ও প্রচণ্ড উস্কানি সম্বন্ধে ব্রিটেনের 'নিউজ ক্রনিকল' লিখে: '*এরূপ উগ্র ভাষা ও আলোচনা ত্যাগের কোনোই অজুহাত নেই। মি. জিন্নাহ সম্পূর্ণরূপে আপোষহীন অবস্থান নিচ্ছেন, যেন মনে হয় তিনি সত্যি সত্যি একটা ধর্মযুদ্ধের জন্য লালায়িত বা তৃষ্ণার্ত।*'[১২১]

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৪.৩ শতাংশ) ও মুসলিম লীগ সরকার শাসিত প্রদেশ 'বাংলা'র রাজধানী কলকাতাকে চয়ন করা হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টে জিন্নাহর ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু করার ক্ষেত্র হিসেবে। ডাইরেক্ট এ্যাকশন বিক্ষোভটির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে আমরা এখন এর পূর্বে মুসলিমদের মাঝে প্রচারিত অত্যন্ত উত্তেজক প্রচারণার পর্যালোচনা করতে পারি। যেমন:

মুসলিম লীগ দ্বারা উর্দু ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রচারণাপত্রগুলো ডাইরেক্ট এ্যাকশনে ঘটবে এমন সহিংস ঘটনার দৃশ্যাবলি রঙ্গীন ও কল্পনা-মধুর দাম্ভিক ভাষায় চিত্রিত করা হয়। এমন একটি প্রচারণাপত্রে দেখা যায় হাজার হাজার তলোয়ারধারী সশস্ত্র মুসলিম হিন্দুদেরকে হত্যা করছে নগরীর রাজপথগুলোতে রক্তের নদী বইয়ে দিতে। অপর একটিতে বাংলা কবিতা হিন্দুদেরকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে যে, তাদের শির ধূলায় গড়াগড়ি যাবে, যা সম্পন্ন করতে সশস্ত্র মুসলিমরা দলে দলে তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।[১২২]

রক্ত হিম করা এরূপ উস্কানিমূলক প্রচারণার এক হিন্দু জবাব প্রকাশিত হয় 'দৈনিক বসুমতি'তে ১৯৪৬ সালের ১১ই আগস্টে। তাতে বর্ণিত হয়: '*মুসলিম লীগ-ওয়ালাদের জানা উচিত যে, কেবল হুমকিতে কাজ হবে না। তারা (হিন্দুরা) হাসতে হাসতে বুলেট ও ছুরির মোকাবেলা করতে জানে... তারা এক মুহূর্তের জন্যও পরাজয় মেনে নেয় না। লীগ আমাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে পারে, কিন্তু তা শুধু তাদের জন্যই বিপদ ডেকে আনবে।*' তিন দিন পর সে পত্রিকার প্রধান সংবাদের শিরোনামটি ছিল: '*সামনে ব্যাপক হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ আশঙ্কা করা হচ্ছে।*'[১২৩]

প্রচারণাপত্রগুলোতে চিত্রায়িত সেসব সহিংসতা উদ্রেককারী বক্তব্য মুসলিম জঙ্গিরা কার্যকর করে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন'-এর দিন (১৬ই আগস্ট)। কলকাতার মেয়র এস. এম. উসমান সমাবেশে দশ লাখ মুসলিমকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। ডাইরেক্ট এ্যাকশনের জন্য জিন্নাহ রমজান মাসের ১৮ তারিখটি বেছে নেন, কারণ সেদিনই নবি মোহাম্মদ তিনগুণ শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে 'বদরের যুদ্ধে' অভাবনীয় বিজয় অর্জন করেছিলেন। মুসলিম লীগের প্রচারণাপত্রে বিপুল সংখ্যক মুসলিমকে সমাবেশে হাজির হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত আহ্বান জানানো হয়:[১২৪]

'মুসলিমদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, এ রমজান মাসেই কোরান নাজেল হয়েছিল; এ রমজানেই জিহাদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল; এ রমজান মাসেই ইসলাম ও পৌত্তলিকতার (মূর্তিপূজক হিন্দু ইত্যাদি) মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব 'বদরের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিল এবং মাত্র ৩১৩ জন মুসলিমের মাধ্যমে জয় লাভ করেছিল; এবং এ রমজান মাসেই আবারো ১০,০০০ সেনাবহর নিয়ে পাক নবি মক্কা বিজয় করেছিলেন এবং স্বর্গীয় রাজ্য ও আরবে ইসলামের রাজনৈতিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই পবিত্র মাসে সংগ্রাম শুরু করার সুযোগে মুসলিম লীগ ভাগ্যবান বোধ করছে।'

এদিকে 'জিহাদের জন্য মুনাজাত' শিরোনামে আরেকটি প্রচারণাপত্র মসজিদের মোনাজাতে পড়ে শোনানোর জন্য বিলি করা হয়। এতে উপরের অংশের সাথে নিম্নোক্ত অংশ যুক্ত করা হয়: [১২৫]

'আলাহর অনুগ্রহে ভারতে আমরা দশ কোটি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কারণে আমরা হিন্দু ও ব্রিটিশদের দাস। হে আল্লাহ! এ রমজান মাসে আমরা আপনার নামে জিহাদ শুরু করছি। আমাদের শরীর ও মন শক্ত করণে আশীর্বাদ দিন... সর্বাত্মক সংগ্রামে আপনার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন; কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করুন; আমাদেরকে ভারতে ইসলামের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষমতা দিন ও এ জিহাদে উপযুক্ত উৎসর্গ দিন; আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা যেন ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামি রাজ্য গড়ে তুলতে পারি।'

'মুগুর' নামক একটি প্রচারণাপত্র পবিত্র মাসের এ শুভ ঘটনার বিষয়ে লিখে:

---

১২০. Ibid, p. 43
১২১. Ibid, p. 44.
১২২. Sugata Nandi (2006) *Locating the Origins of a Criminal Riot*, http://mail.sarai.net/pipermail/urbanstudygroup/2006-April/000824.htm.
১২৩. Ibid.
১২৪. Khosla, p. 51
১২৫. Ibid, p. 51-52

'প্রকাশ্য লড়াইয়ের দিনটি এসেছে গেছে, যা মুসলিম জাতির মহোত্তম কামনা। তোমাদের জন্য স্বর্গের উজ্জ্বল দুয়ার উন্মুক্ত করা হয়েছে। এসো হাজারে হাজারে প্রবেশ করি। এসো আমরা সবাই মিলে বিজয়োল্লাস করি পাকিস্তানের, বিজয়োল্লাস ঘোষণা করি মুসলিম জাতির ও বিজয়োল্লাস করি সে বাহিনীর যারা 'জিহাদ' ঘোষণা করেছে।'

কলকাতার মেয়র একটা লিফলেট প্রকাশ করে, যাতে জিন্নাহকে একটি তলোয়ার হাতে দেখানো হয়। তাতে লেখা: [১২৬.]

'আমাদের মুসলিমদের মাথায় ছিল ভারতের মুকুট ও শাসন। তৈরি হও, তলোয়ার হাতে তুলে নাও। মুসলিমরা চিন্তা করে দেখো, কেন আজ আমরা 'কাফিরদের' অধীনস্ত। কাফিরদেরকে ভালবাসার ফলাফল ভাল নয়। হে কাফিররা! গর্ব করো না। তোমাদের ধ্বংস দূরে নয় এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ আসছে। তলোয়ার হাতে আমাদের গৌরব প্রদর্শন করো ও একটা বিশেষ বিজয় পাবো।'

অপর একটি লিফলেট, যাতে মুসলিমদেরকে তলোয়ার নিয়ে সমাবেশে আসার আহ্বান জানানো হয়, তাতে বলা হয়: "*আমরা দেখবো কারা আমাদের সাথে খেলতে নামবে (যুদ্ধ করবে), কারণ রক্তের নদী বয়ে যাবে। আমাদের হাতে থাকবে তলোয়ার ও মুখে 'তাকবীর' ধ্বনি ("আল্লাহু আকবার" বা "আলাহ্ মহান")। কাল হবে রোজ কেয়ামত।*"

বাংলার মুখ্যমন্ত্রি হুসেইন শহীদ সোহারাওয়ার্দী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বটিও নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিজে ডাইরেক্ট এ্যাকশনের কার্যকলাপ পরিচালনা করেন, যেভাবে তা চালিত হওয়ার নির্দেশ ছিল। মুসলিমদের সহিংসতায় পুলিশি হস্তক্ষেপ যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী মন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী কলকাতার পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি থেকে হিন্দু পুলিশ অফিসারদেরকে অন্যত্র নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে ২৪টি থানার ২২টিকে মুসলিম অফিসারের হাতে তুলে দেন; বাকী দু'টি থানা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। মুসলিম লীগ কর্মীরা গুণ্ডা-পাণ্ডা ও দুর্বৃত্ত শ্রেণীর মুসলিমদেরকে যোগাড় করে তাদেরকে নানা রকমের অস্ত্রে সজ্জিত করে। কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায় এ অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে পুলিশকে অবহিত করেন, কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়। 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' দিবসের সকাল বেলায় মুসলিম পাণ্ডারা লাঠি, বলম, ছোরা, কুঠার, এমনকি বন্দুক সজ্জিত হয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মহড়া দিতে থাকে। হাওড়া ব্রীজে পুলিশের এক ইউরোপীয় উচ্চ-কর্মকর্তা সমাবেশগামী একদল জনতাকে থামিয়ে তাদের নিকট থেকে লাঠি, বল্লম, ছোরা, চাকু, কুঠার, অপ্রজ্জ্বলিত মশাল, খালি সোডা পানির বোতল, কেরোসিন ভর্তি টিন, তেলে ভেজানো নেকড়া, যা বাড়িঘরে আগুন দিতে ব্যবহৃত হবে – সেগুলো সংগ্রহ করেন।[১২৭.]

সোহরাওয়ার্দীর 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন'-এর বক্তৃতা সম্বন্ধে ইয়াসমিন খান লিখেছেন: "*তিনি সুস্পষ্টভাবে সহিংসতাকে উস্কে না দিলেও নিশ্চয়ই জনতাকে এমন ইঙ্গিত দেন যে, তারা আইনের তোয়াক্কা না করে যা কিছু ইচ্ছা করতে পারে, পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীকে ডাকা হবে না, এবং মন্ত্রণালয় তাদের ঘটানো কর্মকাণ্ড থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখবে।*"[১২৮.] সমাবেশ শেষে সমেবেত সশস্ত্র জঙ্গি মুসলিমরা কলকাতার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ করে রক্তাক্ত ধ্বংসকাণ্ড শুরু করে: যেমন লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ।

পূর্ব-নির্দেশানুসারে পুলিশ সবকিছু অগ্রাহ্য করে ও উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিন্দু ও শিখদের বাড়িঘর লুটপাট ও ভস্মিভূত করা দেখতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী পুলিশ সদর দপ্তরে এসে নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের দায়িত্ব হাতে তুলে নেন ও পুলিশকে পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি পুলিশকে মুসলিম দাঙ্গাকারী, লুণ্ঠনকারী ও হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে বাঁধা দেন, কিন্তু হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণের অভিযোগের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ইন্সপেক্টর ওয়েড আটজন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছিলেন, যারা রেড-ক্রসের ফিতা (ব্যান্ড) পরে মল্লিকবাজার মার্কেটে লুটপাট করছিল। সোহরাওয়ার্দী তাদেরকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[১২৯.] লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ থেকে রক্ষার জন্য মুসলিম দোকানগুলোর সামনে লেখা হয়েছিল 'মুসলিম দোকান-পাকিস্তান'। কংগ্রেস নেতাদের বাড়িঘর আক্রমণ ও লুটপাটের পর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সংবাদপত্র ভবনগুলোও আক্রান্ত হয় ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়। অমুসলিমদের জ্বলন্ত সম্পদ ও বাড়িঘরের আগুন নেভাতে আসা ফায়ার ব্রিগেড কর্মীদেরকে অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা আগুন নেভাতে বাঁধা প্রদান করে। হিন্দু মন্দিরসমূহে চরম বর্বরতা প্রদর্শন ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। মেডিক্যাল কলেজ, স্কুল ও ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলগুলোও মুসলিমদের আক্রমণ, বর্বরতা ও ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় লাহোর হাইকোর্টের বিচারক জি. ডি. খোস্‌লা লিখেছেন: '*রাজপথে মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে... ঘরের ছাদ থেকে শিশুদেরকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ছিল। ছোট শিশুদেরকে ফুটন্ত তেলে দগ্ধ করার খবর পাওয়া যায়। অন্যদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়। নারীদেরকে ধর্ষণের পর অঙ্গহানি করে মেরে ফেলা হয়।*' দেড় দিন ধরে মুসলিম দাঙ্গাকারীরা তাদের খুশিমত হত্যাযজ্ঞ ও বেপরোয়া লুটতরাজ চালানোর পর হিন্দু ও শিখরা তাদের প্রাথমিক শোক ও আঘাতের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে শুরু করে। এ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী সেনাবাহিনী তলব করা বন্ধ রাখেন, কিন্তু হিন্দু ও শিখরা পাল্টা আক্রমণে উদ্যত হতেই তিনি সেনাবাহিনী তলব করেন।

তবে পরিস্থিতি তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। হিন্দু ও শিখরা, যারা ছিল কলকাতার জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ, ঘুরে দাঁড়িয়ে মুসলিমদের মতো একই কায়দায় পাল্টা জবাবে তাদের উপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মৃতদেহ সৎকারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনটি সংস্থা সর্বমোট ৩,১৭৩টি মৃতদেহ সংগ্রহ করেছিল। পারিবারিকভাবে কবর দেওয়া, নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া ও পুড়িয়ে ভস্মিভূত করা হতভাগাদের সংখ্যা এ হিসাবের বাইরে ছিল। আনুমানিক কমপক্ষে ৫,০০০ লোক এ দাঙ্গায় নিহত হয় বলে সাধারণ ধারণা করা হয়। যেসব মৃতদের

[১২৬.] Ibid, p. 52-53

[১২৭.] Ibid, p. 54

[১২৮.] Khan Y (2007) *The Great Partition: The Making of India and Pakistan*, Yale University Press, p. 64

[১২৯.] Khosla, p. 59

হাসপাতালে আনা হয় ও যারা সেখানে আনার পর মারা যায়, তাদের মধ্যে ১৩৮ জন ছিল মুসলিম, ১৫১ জন হিন্দু ও অন্যান্য ৬৩ জন। অর্থাৎ এ হিসাবে মুসলিমরা ছিল নিহতদের ৪৩ শতাংশ। আগুন লাগিয়ে ধ্বংসকৃত সম্পদ ও বাড়িঘরের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ ছিল হিন্দু, ২০ ভাগ মুসলিম এবং ১৫ ভাগ সরকারি ও অন্যান্যদের মালিকানাধীন।[১৩০]

অমুসলিমদের সম্পদের ক্ষতির তুলনায় মুসলিম সম্পদের ক্ষতি কম হলেও মৃতের সংখ্যা মুসলিমদের জন্য সুখবর ছিল না। নিশ্চয়ই এটা নবির বদরের জিহাদের মত সফলতা ছিল না, যা অর্জনের আশা করেছিল মুসলিম লীগ। আল্লাহর অনুগ্রহবিহীন এ অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলে হতাশাগ্রস্ত মুসলিম লীগ নেতারা কাফিরদের উপর 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' ঘটানোর দোষ চাপানোর চেষ্টায় জোর গলায় দাবি করে যে, *'দাঙ্গা শুরু করেছিল কংগ্রেস সমর্থকরা এবং তাদের কেউ কেউ আরো এর ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে থাকে যে, মুসলিম লীগের সুনামহানি করার জন্য মুসলিমদেরকে পাইকারিভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে হিন্দুরা গভীর চক্রান্তমূলক একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিল।'*[১৩১]

'টাইম' ডাইরেক্ট এ্যাকশন সম্বন্ধে নেহরুর প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করেছে এভাবে: *'ডাইরেক্ট এ্যাকশন হয় সরকারকে উপরে ফেলবে, অথবা সরকারকে ডাইরেক্ট এ্যাকশন উপরে ফেলতে হবে।'*[১৩২] ব্রিটিশ-বিরোধী মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পি. সি. লাহিড়ী এ নির্মমতা সম্বন্ধে লিখেছেন:

> একটা পৃথক সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য কংগ্রেস ও হিন্দুদেরকে লীগের দাবির কাছে মাথা নত করার জন্য তাদেরকে ভয় দেখাতে ও সন্ত্রাসে আতঙ্কিত করতে মুসলিম লীগের সুচিন্তিত পরিকল্পনা কলকাতায় ব্যর্থ হয়; কারণ হিন্দুরাও (এবং শিখ) আক্রমণ ও হত্যায় মুসলিমদের চেয়ে পিছিয়ে থাকে নি। একটা বিপুল সংখ্যক মুসলিমও নিহত হয়।[১৩৩]

কলকাতা দাঙ্গার পর ২রা সেপ্টেম্বরে অন্তবর্তীকালীন কংগ্রেস সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দিন বোম্বাইয়ের মুসলিমরা দাঙ্গা শুরু করে। কয়েকদিন ধরে চলা এ সহিংসতায় ২০০'র বেশি লোক নিহত হয়।

হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা চলে যায় পূর্ব বাংলায়

কলকাতায় 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন'-এর হতাশাজনক ফলাফল ও তাদের মুসলিম ভাইদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পূর্ব-বাংলায়, যেখানে মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগুরু, সেখানকার মুসলিমরা তাদের মাঝে আদিকাল থেকে বসবাসকারী হিন্দুদের উপর আদিম উন্মত্ততা প্রদর্শনের হিংস্র কর্মকাণ্ড শুরু করে। এখানে ধারাবাহিক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যার মধ্যে 'নোয়াখালী দাঙ্গা' নামে পরিচিত ১৯৪৬-৪৭ সালের নোয়াখালী-তিপ্পেরায় ঘটিত দাঙ্গাটি বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে বিশুদ্ধ ইসলামবাদী সৌদি 'ওহাবীবাদ' ও 'আনজুমান সোসাইটি'র ইন্ধনে উদীয়মান ইসলামি মৌলবাদ বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল, বিশেষ করে নোয়াখালীতে, যেখানে অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল মুসলিম (৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ)।[১৩৪] নোয়াখালী ও পূর্ব-বাংলার অন্যান্য জেলার (কুমিলা, ফেনী) প্রায় ৩৫০ গ্রামে ছড়িয়ে পড়া দাঙ্গার 'প্রাথমিক উদ্দীপক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এ মৌলবাদকে।[১৩৫] লাহিড়ী জানান: *'এরূপে কলকাতায় ব্যর্থ হয়ে মুসলিম লীগ নোয়াখালী জেলাকে অপর একটি কার্যক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়, যেখানে গোটা জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশ ছিল হিন্দু; তারা হিন্দুদের বাড়ি ও সম্পদে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, হিন্দু নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ, গণহারে ধর্মান্তরকরণ এবং হত্যাকাণ্ডের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়।'*[১৩৬] নোয়াখালী সহিংসতার প্রথম খবর কলকাতার বেঙ্গল কংগ্রেস দলের কার্যালয়ে পৌঁছে ১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবর নোয়াখালীস্থ কংগ্রেস কর্মীদের পাঠানো টেলিগ্রামের মাধ্যমে, যাতে লেখা হয়:[১৩৭]

> 'ব্যাপকহারে বাড়িঘর পোড়ানো হয়েছে / শত শত লোককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে / শত শত লোককে হত্যা করা হয়েছে / বিপুল সংখ্যক হিন্দু বালিকাকে জোরপূর্বক মুসলিমদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে ও অপহরণ করা হয়েছে / সমস্ত মন্দির ও মূর্তি অপবিত্র বা কলুষিত করা হয়েছে / অসহায় শরণার্থীরা চলে আসছে তিপ্পেরা জেলায় / নেতা গোলাম সারওয়ার নোয়াখালী থেকে হিন্দুদেরকে নির্মূল করার জন্য মুসলিমদেরকে উস্কে দিচ্ছে...'

কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত প্রচারণা চালিয়ে ও সমস্ত দোষ হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এ পীর মৌলভি গোলাম সারওয়ার নোয়াখালী দাঙ্গার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। কলকাতা দাঙ্গা সম্বন্ধে মুসলিম ধর্মগুরুরা প্রকাশ্যে ইসলামি সমাবেশে (ওয়াজ মাহফিল) হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে থাকে। ক্রোধোন্মত্ত সহিংসতা ছড়ানোর লক্ষ্যে তারা মুসলিমদের মাঝে গুজব ছড়ায় যে, তাদেরকে ধ্বংস ও হত্যা করার জন্য হিন্দুরা কলকাতা থেকে সশস্ত্র শিখ ও হিন্দু গুণ্ডা ভাড়া করে এনেছে নোয়াখালীতে। খোস্‌লা লিখেছেন: অক্টোবরের মাঝামাঝির মধ্যে *'শত শত হত্যাকাণ্ড ঘটে, হাজার হাজার নারীর মর্যাদাহানি করা হয় ও ছিনিয়ে নিয়ে বা অপহরণ করে জোরপূর্বক মুসলিমদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়।*

---

[১৩০] Ibid, p. 63-66
[১৩১] Ibid, p. 66
[১৩২] *Direct Action*, Time, 26 Aug, 1946; http://www.time.com/time/ magazine/article/0,9171,933559,00. html
[১৩৩] Lahiri PC (1964) *India Partitioned and Minorities in Pakistan*, Writers' Forum, Calcutta, p. 6
[১৩৪] Batabyal R (2005) *Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali*, 1943-47, SAGE Publications, p. 195-96
[১৩৫] Ibid, p. 270-71
[১৩৬] Lahiri, p. 7
[১৩৭] Khan, p. 68

সমস্ত হিন্দু গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়। জেলার সমস্ত হিন্দুদের বিষয়-সম্পত্তি মুসলিমরা লুটপাট ও ডাকাতি করে নিয়ে যায় ও তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করে।'[১৩৮]

হিন্দু মন্দিরগুলো কলুষিত ও মূর্তিসমূহ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। নোয়াখালীতে সে সময় প্রায় ৪০০,০০০ হিন্দু বসবাস করতো; তাদের ৯০ শতাংশ মৃত্যুর ভয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়। '*ধর্মান্তরিতদেরকে কালেমা পড়তে*[১৩৯]*, গরু জবাই করতে ও তার মাংস খেতে বাধ্য করা হয়,*' লিখেছেন খোস্‌লা। এ দাঙ্গায় ৫,০০০-এর বেশি লোককে হত্যা করা হয়; ৯৯ শতাংশ অমুসলিম ঘরবাড়ি লুটপাট করা হয়, যার মধ্যে ৭০-৯০ শতাংশ আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবেশী তিপ্পেরা জেলাতেও ঠিক একই রকম দৃশ্যের অবতারণা হয়। সাতাত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধ মহাত্মা গান্ধী এ মর্মান্তিক দাঙ্গা প্রশমনের জন্য নোয়াখালীতে আসেন ৬ই নভেম্বরে। তিনি মুসলিমদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তার অহিংস বাণী প্রচার করেন ও হিন্দুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণের আহ্বান জানান। অপরদিকে আশ্রয় শিবিরে অবস্থানকারী হিন্দুদেরকে তিনি বুকে সাহস সঞ্চয় করে ঘরে ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন।[১৪০]

বিহারে হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণ

'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' থেকে নোয়াখালী দাঙ্গার দিনগুলো পর্যন্ত বিহারে একটা বৈরী আবহ দানা বেঁধে উঠছিল। কলকাতায় হাজার হাজার বিহারি লোকের দোকান ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের পর চলমান ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে তারা কলকাতা ছেড়ে বিহারে চলে আসে। খোস্‌লা লিখেছেন: তারা সঙ্গে নিয়ে আসে '*কলকাতায় হিন্দুদের উপর সংঘটিত নির্বিচার হত্যাকান্ড, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের লোমহর্ষক কাহিনী, যা শুনে বিহারিদের মনে আগুন জ্বলে উঠে।*'[১৪১] কলকাতায় 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন'-এর দিন বিহারে মুসলিম লীগ স্থানীয়ভাবে একটি সমাবেশ করে, যাতে বক্তারা তলোয়ার শক্তিশালী করতে মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, যা তাদের অতীত সাফল্য অর্জন সম্ভব করেছিল। নেতৃস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতাদের দাবির সূত্র ধরে বক্তা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল বলেন: "*তাদের (হিন্দুদের) আক্রমণ ও তাদের আচরণ অহিংসা নীতির উপর ভিত্তিশীল, কিন্তু.... আমাদের প্রতিনিধিগণ কায়েদে আযম (জিন্নাহ), নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দী স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আমাদের নিকট অহিংসা মানে কিছুই না। আমরা যখন লড়াই করতে চাব, আমাদের হাতে যেসব অস্ত্র আছে, তারই সবই ব্যবহার করবো।*"

মুসলিম ছাত্র সংঘের শহীদুল হক অত্যন্ত উস্কানিমূলক ভাষায় জিহাদের মৌলিক বিশ্বাস ঘোষণা করে এভাবে: "*একজন মুসলিমের জন্য স্বর্গের রাস্তা হলো হিন্দুদেরকে হত্যা করা এবং তাদের দ্বারা নিহত হওয়ার মধ্যে।*'[১৪২] কলকাতার হিন্দুদের উপর ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা, যার শিকার ছিল অনেক বিহারী হিন্দুও এবং বিহারে স্থানীয়ভাবে মুসলিমদের এরূপ বিস্ফোরক বক্তৃতা, যার সাথে চূড়ান্ত উস্কানিটি যোগ করেন বিহার শরীফের মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট, যিনি কাপড় বিতরণ কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তিনি কাপড়ের প্রতিটি রেশন কার্ডের ছাঁপে (সীল) লিখেন: "*আল্লাহু আকবার, লেকে রহেঙ্গে পাকিস্তান (আলাহ মহান, আমরা পাকিস্তান সৃষ্টি না করে থামবো না)।*"[১৪৩] এ পর্যায়ে বিহারী হিন্দুদের মাঝে ক্ষোভের আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠে।

অতঃপর নোয়াখালীতে হিন্দুদের উপর ঘটিত ভয়াবহতার খবর আসা শুরু করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর 'স্টেটসম্যান' নোয়াখালীর হত্যা, লুটপাট ও অগ্নি-সংযোগের কাহিনী প্রকাশ করে এবং পরবর্তী দিনগুলোতে তার ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরে। এ রকম উত্তেজিত অবস্থায় দক্ষিণ বিহারের স্থানীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারীর দ্বারা মুসলিমদের মাঝে বিলি করা সরাসরি সহিংসতার উস্কানি সম্বলিত লিফলেট বিহারের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার হয়। এতে হিন্দুদেরকে 'ইসলামের শত্রু' আখ্যায়িত করে লেখক নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলেন: ''*যার মাথা লড়াইয়ের মাঠে রক্ত ও ধূলাবালি মাখানো অবস্থায় পাওয়া যাবে।*'' জিন্নাহকে সম্বোধন করে লেখা অপর একটি লিফলেট বলে: ''*আমরা ভারতীয় বিধর্মীদেরকে যথেষ্ট সময় দিয়েছি। সময় এসে গেছে অবিশ্বাসের অন্ধকার (অর্থাৎ হিন্দুবাদ) দূরীভূত করার ও ইসলামের উজ্জ্বল আলো দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করার। এ মহত্তম লক্ষ্য অর্জন করতে আমরা বিধর্মীদেরকে নিধন করবো, যেমনটি করা হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে (আরবে)।*" এরপরও কলকাতা থেকে প্রকাশিত আরেকটি লিফলেট এসে পৌঁছে, যাতে জিন্নাহর নির্দেশ ছিল: '*হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে, হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরিত ও হত্যা করতে, জাতীয়তাবাদী মুসলিম (তারা ভারত ভাগের বিরোধী) ও কংগ্রেস নেতাদের হত্যা করতে এবং হিন্দু নারীদের উপর পাশবিক আক্রমণ চালাতে*'।[১৪৪]

গোটা বিষয়গুলো বিহারী হিন্দুদেরকে উপলব্ধ করে তোলে যে, মুসলিমদের ওসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যাযজ্ঞ, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, দাসকরণ, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন কর্মকাণ্ড ছিল পাকিস্তানের দাবি মেনে নিতে বাধ্যকরণে কংগ্রেস ও হিন্দুদেরকে আতঙ্কিত করতে মুসলিম লীগের একটি সুপরিকল্পিত কৌশল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার অশনি সংকেত পেয়ে রাজনৈতিক নেতারা জনগণকে শান্ত হওয়ার আহ্বান জানায়; অশান্তি সৃষ্টিকারীদের

---

১৩৮. Khosla, p. 68
১৩৯. *Kalma* is the Muslim profession of faith
১৪০. Khosla, p. 69-76
১৪১. Ibid, p. 77
১৪২. Quran 9.111: *Allah hath purchased of the believers their persons and their goods in return of Paradise: they fight in his cause, and slay and are slain- a promise binding on Him in truth, through the Law, the Gospel, and the Qur'an*.
১৪৩. Khosla, p. 79
১৪৪. Ibid, p. 80-81

বিরুদ্ধে প্রাদেশিক সরকার কড়া হুঁশিয়ারিও জারি করে; কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়। ২৫শে অক্টোবর শুরু হয় মারাত্মক সহিংসতা ও নৈরাজ্য, যা চরম আকার ধারণ করে নভেম্বরের ৩-৪ তারিখে, তারপর দ্রুত স্তিমিত হয়ে যায়। খোস্‌লা লিখেছেন: *'ঐ ১২ দিনে বিহারের হিন্দুরা তাদের মুসলিম ভাইদের উপর আক্রোশ উগড়ে দেয় এবং প্রতিশোধের সুধা পান করে।'* পুলিশ নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সহিংসতার জোয়ার থামাতে ব্যর্থ হয়। গান্ধী এ সহিংসতার খবর পেয়ে প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশন শুরু করেন; সে সংবাদে সহিংসতার আগুন দ্রুত নিভে যায়। সহিংসতা থামাতে বিহারী হিন্দু জনতাও বিশেষ ভূমিকা রাখে। নেহরু, যিনি সহিংসতা চলাকালে বিহারে গিয়েছিলেন, তিনি ১৯৪৬ সালের ১৪ই নভেম্বরে আইন পরিষদে বলেন: *'আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পিছনে একটা বড় কারণ ছিল বিপুল সংখ্যক লোক, বিশেষত বিহারীরা, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনতার (দাঙ্গাকারী) মুখোমুখি হয়। মহাত্মার প্রস্তাবিত অনশনের খবরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।'*[১৪৫] খোস্‌লার এক হিসেব অনুযায়ী এ দাঙ্গায় ৫,৩৩৪ জন মুসলিম ও ২২৪ জন হিন্দু নিহত হয়। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতারা এ সংখ্যাকে অস্বাভাবিকরূপে অতিরঞ্জিত করে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ মুসলিমের মৃত্যু দাবি করে।[১৪৬]

দাঙ্গা চলে যায় পাকিস্তানে

বাংলা ও বিহার থেকে এবার দাঙ্গার কেন্দ্রবিন্দু চলে যায় বর্তমান পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে। সহিংসতার পরবর্তী পর্যায়ে বিহারে মুসলিমদের উপর হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণ মুসলিম লীগের দাঙ্গা প্ররোচণার হাতিয়ার হয়ে উঠে। মুসলিম লীগ দল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে বিহারে কী ঘটেছিল তা জানার জন্য কর্মী পাঠায়। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিহারের নিকটবর্তী) ছাত্রদের সঙ্গে গিয়ে তারা সেখানে যা যা ঘটেছিল তার কাহিনী সংগ্রহ করে আনে। তারা বিহার দাঙ্গার কথিত নমুনারূপে সেখান থেকে নিহতদের কয়েকটি মাথার খুলি, অঙ্কিত চিত্র, বিধ্বস্ত মসজিদের ইট ও কোরানের ছেঁড়া পাতা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। সেগুলো তারা মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম ভারত, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিমদের মাঝে প্রদর্শন করে। বিহার দাঙ্গার অতিরঞ্জিত কাহিনীর প্রচারণা এবং তার সাথে "আমরা বিহারের প্রতিশোধ নেবো সীমান্তে (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে)" ও "রক্ত দিয়ে হবে রক্তের প্রতিশোধ" ইত্যাদি স্লোগানের মাধ্যমে তারা মুসলিম জনতাকে হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায় উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলায় হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সহিংসতা শুরু হয় এবং তা বর্তমান পাকিস্তানের সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।[১৪৭] এ অধ্যায়টির সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু ঘটনাবলির সারাংশ তুলে ধরা হচ্ছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমুসলিমরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ। মুসলিমদের আক্রমণে নগণ্য হিন্দু ও শিখ জনসংখ্যা সহজেই বিধ্বস্ত হয়। তাদের দোকান-পাট ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান লুট করে অগ্নি সংযোগ করা হয়, হিন্দু মন্দির ও শিখ গুরুদুয়ারা লুটপাট ও কলুষিত করা হয়। যদিও উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা প্রধানত লুণ্ঠন, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস ও কলুষিত করণে লিপ্ত হয়, তবে তারা বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু ও শিখকে হত্যাও করে, তাদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক মুসলিমদের সাথে বিয়ে দেয়। জানুয়ারি (১৯৪৭) পর্যন্ত এ সহিংসতা প্রধানতঃ হাজারা জেলায় ও কিছুটা দেরা ইসমাইল খান জেলায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম লীগ *গণ অসহযোগ আন্দোলন* শুরু করলে সহিংসতা আরো ঘনীভূত হয়ে প্রদেশের সকল জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ কর্মীদের নেতৃত্বে উচ্ছৃঙ্খল জনতা এবার শিখ ও হিন্দুদেরকে গণহারে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ শুরু করে, তার সাথে হিন্দু-শিখ সম্পদ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে দেরা ইসমাইল খান শহর ও তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে ব্যাপক আকারে সহিংসতা, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ শুরু হয়, যা অমুসলিমদেরকে জান-প্রাণের ভয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। লুটপাট করার পর দাঙ্গাকারী মুসলিম জনতা তাদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্নি-সংযোগ করে ভস্মীভূত করে। হামলা চলে তিন দিনব্যাপী, যাতে হিন্দু ও শিখদের ১,২০০টি দোকান-পাট ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও পোড়ানো হয়; শহরটি পরিণত হয় ধ্বংসাবশেষে। কোনো কোনো গ্রামে সমস্ত হিন্দু ও শিখকে হয় মেরে ফেলা হয়, অথবা জীবন বাঁচাতে তারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়। পলায়নপর হিন্দুদের উপর রাস্তাঘাটে ওঁৎ পেতে থাকা মুসলিম গুন্ডা বাহিনী চড়াও হয়ে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা ও নারীদেরকে অপহরণ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সহিংসতা একইভাবে চলমান থাকে ১৯৪৭ সালের আগস্টে দেশভাগের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। ১৯৪৮ সালের ২২শে জানুয়ারি বন্দুক, বল্লম ও কুঠারধারী সশস্ত্র উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা ৫০০ থেকে ৬০০ জন মুসলিমলীগের সশস্ত্র-কর্মীর সহায়তায় পারাচিনার-এ একটা শরণার্থী শিবিরে হামলা চালায় যেখানে ১,৫০০ হিন্দু ও শিখ আশ্রয় নিয়েছিল। সে আক্রমণে তারা শরণার্থীদের মধ্যে থেকে ১৩৮ জনকে হত্যা করে, ১৫০ জনকে জখম করে ও ২২৩ জন নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।[১৪৮]

মুসলিম অধ্যুষিত পশ্চিম পাঞ্জাবে সহিংসতা শুরু হয় কিছুটা দেরিতে। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা মার্চে মুসলিম লীগের পাকিস্তান সৃষ্টির দাবির প্রতিবাদে লাহোরে হিন্দু ও শিখ ছাত্ররা একটি মিছিল বের করে। পুলিশ এ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে কয়েকজন ছাত্রকে হত্যা করে। নগরীর অপর অংশে আরেকটি মিছিল মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ ঘটনাগুলো মুসলিমদেরকে সহিংসতায় উন্মত্ত করে তুলে; তারা হিন্দু ও শিখদেরকে আক্রমণ ও ছুরিকাঘাত করে, লুটপাটের পর তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩৭ জন হিন্দু ও শিখ নিহত

---

১৪৫. Ibid, p. 81-83
১৪৬. Kamra, p. 14
১৪৭. Khosla, p. 264-65
১৪৮. Ibid, p. 267-73

হয়। লাহোর থেকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পাঞ্জাবের মুসলিম অধ্যুষিত সমস্ত জেলাগুলোতে, যেমন অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, ঝেলুম ও আটক।[১৪৯] সহিংসতার বিস্তার সম্বন্ধে পাঞ্জাব সরকারের চীফ সেক্রেটারি আকবর হোসেন বলেন: *'লাহোর থেকে এ ভয়ঙ্কর ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রক্তপাত ও অগ্নি সংযোগ ঘটে অনেক জেলায়; গ্রামাঞ্চল ও শহর উভয়েই এ বিবেকহীন উন্মত্ততার খেশারত দেয়।'*[১৫০]

৫ই মার্চ সহিংসতা লাহোরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, যাতে হিন্দু ঘরবাড়ি ও সম্পত্তিতে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ ঘটে; নিহত হয় হিন্দু ও শিখরা। ১১ই মার্চ সহিংসতা নির্বাপিত হতে থাকে। অমৃতসরে মুসলিমরা জনসংখ্যার প্রধান অংশ না হলেও তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল। সেখানে সহিংসতা শুরু হয় ৬ই মার্চ শরীফপুরায় একটি ট্রেনে হামলা করে হিন্দু ও শিখ যাত্রীদেরকে হত্যার মাধ্যমে। মহিলা কক্ষের তিনজনসহ হিন্দু ও শিখদের অনেকগুলো মৃতদেহ নিয়ে ট্রেনটি অমৃতসর স্টেশনে পৌঁছে। এরপর উন্মত্ত মুসলিম সহিংসতা, হত্যাযজ্ঞ ও অগ্নি সংযোগের তাণ্ডব শুরু হয় অমৃতসরে। খোস্‌লা বর্ণনা করেন: *"হাসপাতালগুলো ভরে যায় মৃতদেহে; আহতদের কারো কারো দেহ থেকে মাথা প্রায় বিচ্ছিন্ন করা, কারো কারো পেট কেটে ভেতর থেকে নাড়িভুরি বের করা, হাত-পা বিচ্ছিন্ন করা, ইত্যাদি সব রকমের ভয়াবহ জখমের দৃশ্য।"* ৭ই মার্চ শহরের বিভিন্ন অংশে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে সত্যিকারের নরক-দৃশ্যের অবতারণা করে। শিখ ও হিন্দুদের দোকানপাট লুটপাট করার পর আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। ৮ই মার্চ পর্যন্ত ১৪০ জনের মৃত্যু ও অসংখ্য আহত হয়, যদিও আরো অনেক মৃতদেহ সে নারকীয় আগুনে ভস্মীভূত হয়ে ও দালানকোঠার ধ্বংসস্তূপের নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। গোটা সপ্তাহজুড়ে অমৃতসরে দাঙ্গা ও সহিংসতা চলতে থাকে, যে বর্বরতায় প্রধানত হিন্দু ও শিখরা জীবন ও সম্পদহানির বড় শিকার হয়। সকল অমুসলিম কারখানাগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয় কেবলমাত্র 'জাওয়ালা ফ্লাওয়ার মিল'টি ছাড়া।

৫ই মার্চেই পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতানে উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা গদা (মুগুর), বল্লম ও ছোরা হাতে *"লেকে রাহেঙ্গে পাকিস্তান, পাকিস্তান জিন্দাবাদ'* (আমরা পাকিস্তান ছিনিয়ে নেব, পাকিস্তান জিন্দাবাদ) ধ্বনি দিতে দিতে হিন্দু ও শিখ ছাত্রদের একটি মিছিলে হামলা করে অনেক ছাত্রকে আহত করে। এ ঘটনার খবর মুসলিমদেরকে বর্বর সহিংসতায় উন্মত্ত করে তুলে। মুসলিম গুণ্ডারা তিন দিন ধরে ছোরা, তলোয়ার ও কুঠার হাতে হিন্দু ও শিখদের উপর চড়াও হয়ে তাদেরকে হত্যা করে ও তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর লুট করার পর পুড়িয়ে ছারখার করে। বর্বর মুসলিম গুণ্ডারা 'শ্রী কৃষাণ ভগবান যক্ষা হাসপাতাল'টিতে হামলা করে ডাক্তার ও রোগীদের কচুকাটা করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মন্দির ও গুরুদুয়ারাগুলো লুটপাট ও কলুষিত করা হয়, মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চুরমার করা হয় ও অনেকগুলোতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অনেক মন্দিরের – যেমন যোগমায়া, রামতীর্থ, দেবপুরা ও দেবতা খু মন্দির – চত্বরস্থ ভক্তদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। অনেক শিখ ও হিন্দু তরুণীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসী বানানো হয়।

বিভাগ-পূর্ব সহিংসতায় সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভোগের শিকার হয় রাওয়ালপিণ্ডি জেলার বিভিন্ন গ্রাম-শহরের হিন্দু ও শিখরা। তাদের উপর চলে অমানবিক নির্যাতন: হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, দাসকরণ, গণহারে ধর্মান্তর, লুণ্ঠন ও অগ্নি-সংযোগ। সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হবে।

৬ই মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা শিখ ও হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু করে: তাদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে ও জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করে এবং অনেক শিখের চুল-দাড়ি কেটে ফেলে। যেসব এলাকায় হিন্দু ও শিখরা মুসলিমদের তুলনায় সমশক্তিপূর্ণ ছিল, সেসব স্থানে তারা পাল্টা আক্রমণ করে মুসলিম পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। পরে মুসলিমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে মুসলিমদেরকে সাহায্য করতে ডেকে এনে হিন্দু ও শিখদের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে হামলা চালায়। তিন দিন ধরে চলে হত্যা ও লুণ্ঠনযজ্ঞ। ৭ বা ৮ই মার্চে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে একটা শান্তি কমিটি গঠনের জন্য মুসলিম লীগ আমন্ত্রণ জানায় ১১ জন হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিকে। উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা তাদেরকে আটক করে ৭ জনকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করে; দু'জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

রাওয়ালপিণ্ডির গ্রামগুলোতে সশস্ত্র মুসলিমরা ঢোল বাজিয়ে রক্ত হিমকারী শ্লোগানসহ এক একটা অমুসলিম গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে তা ঘিরে ফেলে, বাড়িঘরের ধনসম্পদ লুট করে এবং কিছু বাসিন্দাকে হত্যার মাধ্যমে বাকীদেরকে আতঙ্কিত করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে। তারা বাড়িঘর লুণ্ঠন করে এবং সুন্দরী তরুণী বালিকা ও নারীদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায়; অনেক ক্ষেত্রে তরুণীদেরকে উৎপীড়ন ও ধর্ষণ করে খোলামাঠে; আর উন্মত্ত জনতা ব্যস্ত হয় বাড়িঘর ও দোকান-পাটে আগুন ধরিয়ে দিতে। খোস্‌লা লিখেছেন:[১৫১]

> বেপরোয়া উদাসীনতার সাথে কিছু মহিলা আত্মহত্যা করে কিংবা নির্বিকারে আত্মীয়স্বজনের হাতে মৃত্যুবরণ করে; অন্যেরা কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে অথবা আর্তচিৎকারের সাথে জীবন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মরে। বেপরোয়া পুরুষরা লুণ্ঠনকারীদের প্রতি প্রচন্ড বেগে ধাবিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে... কিছু গ্রাম সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হয়। বাড়িঘর ও দোকানপাট লুণ্ঠনের পর আগুনে পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করা হয়। ধর্মান্তর অনেকের জীবন রক্ষা করে, কিন্তু তাদের সম্পদ রক্ষা করেনি। ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি পুরোপুরি ধ্বংস আনয়ন করে। পুরুষদেরকে গুলি করে অথবা তলোয়ারের ডগায় হত্যা করা হয়। কোনো কোনো ঘটনায় শিশুদেরকে উত্তপ্ত তেলের কড়াইতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। এক গ্রামে যেসব নারী ও পুরুষরা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে একত্রিত করে চারিদিকে গোলাকারে কাঁটাঝোপ ও জ্বালানি-কাঠ স্থাপন করে আগুন জ্বালিয়ে জীবন্ত পুড়ানো হয়। এক মহিলা তার চার মাসের শিশুকে পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য বাইরে ছুঁড়ে দেয়। শিশুটিকে বল্লম আগায় ফুঁড়িয়ে আবার আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া হয়।

---

[১৪৯] Ibid, p. 101-02
[১৫০] Ibid, p. 105-06
[১৫১] Ibid, p. 107-08

১০ই মার্চ প্রতিবেশী মহল্লা থেকে এক উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা হানা দেয় দোবেরান গ্রামে, সেখানে বাস করতো ১,৭০০ মানুষ, যার অধিকাংশ শিখ। শিখ ও হিন্দুরা স্থানীয় গুরুদুয়ারায় আশ্রয় নেয়। মুসলিমরা তাদের নির্জন ঘরবাড়ি লুটপাট করার পর আগুনে পুড়িয়ে দেয়। মুসলিমরা অতঃপর গুরুদুয়ারাটি আক্রমণ করলে অবরুদ্ধ শিখরা তাদের কাছে থাকা কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে, কিন্তু তাদের অনেকের মৃত্যু হয় ও শীঘ্রই অস্ত্রের গুলি ফুরিয়ে যায়। মুসলিম হামলাকারীরা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অস্ত্রগুলো তাদের কাছে হস্তান্তর করলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এ শর্তে প্রায় ৩০০ লোক অস্ত্র সমর্পণ করতে বের হয়ে আসে। তাদেরকে একত্রিত করে জনৈক বরকত সিং-এর বাড়িতে রাখা হয়, কিন্তু রাত্রিতে সে ঘরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। পরদিন সকালে হামলাকারীরা গুরুদুয়ারার দরজা ভেঙ্গে ফেললে অবশিষ্ট শিখরা উদ্যত তলোয়ারসহ বেরিয়ে এসে সবাই প্রাণ বিসর্জন দেয়।

এরূপ ভয়াবহ ঘটনা ঘটে প্রচুর। আর এগুলো ছিল বিভাগ-উত্তর সহিংসতার কাহিনী মাত্র। পরিশেষে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্মতির প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে হিন্দু ও শিখদের উপর নেমে আসে এর চেয়ে বহুগুণ অধিকমাত্রার সন্ত্রাস, হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন, ক্রীতদাসকরণ, গণহারে ধর্মান্তরকরণ, ধর্ষণ এবং জীবন ও ধনসম্পদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। পরবর্তী সময়ের অগণনীয় ঘটনাবলি এ পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তবে এটা বলা যথেষ্ট হবে যে, বিভাজনকালীন দিনগুলোর মধ্য দিয়ে পরবর্তী বছরের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বর্তমান পাকিস্তানের সকল অংশে মুসলিমরা হিন্দু ও শিখদের উপর ভয়াবহ সহিংসতা ও রক্তপাত ঘটাতে থাকে, যেখানে মুসলিমরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৬০ থেকে ৯২ শতাংশ। গুরবচন সিং তালিব তার "মুসলিম লীগ অ্যাটাক অন শিখস্ অ্যান্ড হিন্দুস ইন দ্য পাঞ্জাব ১৯৪৭" গ্রন্থে বৃহত্তর পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও অন্যান্য জেলায় প্রধান প্রধান হামলার ৫৯২টি দৃষ্টান্ত তালিকাভুক্ত করেছেন – যার সবগুলোই কোনরূপ উস্কানি ছাড়া মুসলিমরা সংঘটিত করেছিল।[১৫২]

শিখ ও হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণ

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৭ সালের জুলাইয়ের শেষের দিক পর্যন্ত বিভাগ-পূর্ব সন্ত্রাস ও সহিংসতায় – যেমন কলকাতায়, পূর্ব বাংলায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে (অমৃতসরসহ) – মুসলিমদের হাত ছিল প্রায় একচেটিয়া। বিহারে হিন্দুদের স্বল্পস্থায়ী আক্রমণ ছিল কলকাতা ও নোয়াখালীতে মুসলিমদের উস্কানিমূলক দাঙ্গা ও হৈ সাথে স্থানীয় মুসলিমদের সৃষ্ট উস্কানির প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু পাকিস্তান অংশে মুসলিম সহিংসতা কোনো না কোনো অঞ্চলে প্রায় বিরতিহীনভাবে অব্যাহত থাকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গায় দুর্ভোগের শিকার হওয়া শিখরা অমৃতসরসহ পূর্ব পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে অমৃতসরকে ভয়াবহ মুসলিম সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হতে হয়েছিল। তার উপর সেসব শিখ শরণার্থীরা তাদের উপর মুসলিমদের ভয়ঙ্কর নির্যাতন ও নৃশংস বর্বরতার কাহিনী বয়ে আনে। সেসব মর্মান্তিক কাহিনী স্বভাবতই স্থানীয় শিখদের মনে বিদ্বেষ জ্বেলে দেয়, এমনকি প্রতিশোধের মনোভাবও, বিশেষ করে যারা ইতিমধ্যে মুসলিম বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতায় ক্ষত-বিক্ষত অমৃতসরের শিখদের মাঝে। তাদের সহধর্মীদেরকে হত্যা করা হয়েছে ব্যাপক সংখ্যায়, করা হয়েছে জোরপূর্বক গণহারে ধর্মান্তর; তাদের নারীরা হয়েছে ধর্ষিত, ক্রীতদাসী ও অপহৃত; তাদের বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ হয়েছে লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত; এবং তাদের গুরুদুয়ারাগুলো লুণ্ঠিত ও কলুষিত।

এ প্রেক্ষাপটে শিখদের মাঝে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে, বিশেষত তাদের মধ্যে, যারা ওপার থেকে এসেছিল খালি হাতে, যাদের পরিবারের লোকজন নিহত হয়েছে, স্ত্রী-কন্যা ধর্ষিত ও অপহৃত; তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল মার্চে অমৃতসরের মুসলিম সহিংসতায় ব্যাপক ভোগান্তির শিকার শিখরা। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে মুসলিমরা লাহোরে আবারো দাঙ্গার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, যা ইতিমধ্যে আক্রোশে অগ্নিকুণ্ড অমৃতসরের হিন্দু ও শিখদের মাঝে সহিংসতা উস্কে দেয়; তারা প্রতিবেশী মুসলিমদের উপর শুরু করে প্রতিশোধের পাল্টা সহিংসতা। তাদের রোষের আগুন দ্বিগুণ হরে উঠে যখন শেখপুরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। শেখপুরা ছিল শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক দেব-এর জন্মস্থান ও শিখদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় স্থান।। আগস্ট মাসে পাঞ্জাবের বিভক্তি-রেখা বরাবর দু'পাশেই সম-মাত্রায় সহিংসতা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। অমৃতসর থেকে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্যান্য জেলায় সহিংসতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যেমন গুরুদাশপুর, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর এবং পরবর্তীতে হরিয়ানাতে।

শিখরা সহিংসতায় প্রধানত মুসলিমদেরকে হত্যা ও তাদের সম্পদ লুট করে। মুসলিম নারীদের অপহরণের কিছু ঘটনাও ঘটেছিল। কিছু ঘটনায় মুসলিম মহিলাদেরকে অপহরণ করে শিখদের সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাহোক আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষ – যারা মুসলিমদেরকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল – অপহৃত মুসলিম নারীদেরকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেয় নিজ নিজ পরিবারের কাছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমদের বর্বরতার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এবং ভারত বিভাজনের প্রাক্কালে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' থেকে শুরু করে পরবর্তী নৃশংস, নির্মম ও ভয়াবহ ঘটনাবলির আলোকে পূর্ব পাঞ্জাবের শিখরা উপলব্ধি করে যে, মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের প্রতিশোধের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় মুসলিমদেরকে তাদের মাঝ থেকে চিরতরে বিতাড়িত করা (নিচে আলোচিত)।

ভারতীয় অংশে দিল্লির যেসব এলাকায় মুসলিমদের শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল, সেসব স্থানেও ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে পুরোপুরি মুসলিমদের উস্কানিতে। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে মুসলিম লীগ মুসলিম গুণ্ডাদেরকে সশস্ত্র করে দিল্লিতে সহিংসতার আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত ভাগের দিনগুলোতে মুসলিমরা পুনরায় 'স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, দেশীয়-তৈরি কামান, রাইফেল, বোমা, মর্টার

[১৫২] Talib SGS (1991) *Muslim League Attack on Sikhs and Hindus in the Punjab 1947* (compilation), Voice of India, Appendix: *Atrocities*, chapters 9-11.

ও মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত হয়ে সশস্ত্র হয়ে উঠে।'[১৫৩] মুসলিম কামার ও মোটর মেকানিকরা অস্ত্র উৎপাদনদকারী হয়ে উঠে। মুসলিম দাঙ্গাকারীদেরকে বেতার ট্রান্সমিটার ও গ্রাহক যন্ত্রও সরবরাহ করা হয় বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য, যার ১৩টি উদ্ধার করা হয়েছিল অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রের মধ্যে।

১৯৪৭ সালের ২১শে আগস্টে দিল্লির সাহাদারায় এক মুসলিম ছাত্রের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরিত হয়, সম্ভবত বোমাটি প্রস্তুত করার সময় হঠাৎ করে। ২৩শে সেপ্টেম্বর রাতে, বলা হয়, মুসলিম পাণ্ডাদের ছোঁড়া একটি বোমা বিস্ফোরিত হয় কারোলবাগের হিন্দু বসতি এলাকায়। এরপর মুসলিমরা সাম্প্রদায়িক উন্মত্তায় বিস্ফারিত হয়ে উঠে। সশস্ত্র উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম দাঙ্গাবাজরা রাস্তায় নেমে মহড়া করতে থাকে; ড. যোশী নামক এক অমুসলিম বাসিন্দা তাদেরকে শান্ত করতে এগিয়ে গেলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর দিল্লির অন্যান্য অংশেও মুসলিম সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ৬ই সেপ্টেম্বর তারা ব্যাপকভাবে লুটতরাজ ও ছুরিকাঘাত শুরু করে দেয়। একটা উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা জেলার জেলখানাও আক্রমণ করে ও এক হিন্দু প্রহরীকে হত্যা করে। তারা পুলিশের সাথে লড়াই করে, যদিও তার শতকরা ৬০ ভাগই ছিল মুসলিম পুলিশ।

এক পুলিশ রিপোর্টে লিখিত হয়েছে যে, ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে পুলিশের একটি প্রহরাদল দেখতে পায় মুসলিম দাঙ্গাবাজরা সবজিমণ্ডি এলাকার হিন্দুদের উপর গুলিবর্ষণ করছে। পুলিশ তাদের মুখোমুখি হলে সংঘর্ষে অনেক পুলিশ আহত হয়। সহকারী সাব-ইনসপেক্টরকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। সারাদিন ধরে পুলিশ ও মুসলিম দুর্বৃত্তদের মধ্যে এ যুদ্ধ চলতে থাকে এবং থানাও আক্রান্ত হয়। মুসলিমরা দিলির উপকণ্ঠে হিন্দু গ্রামগুলোতে আক্রমণ ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করতে শুরু করে দেয়। ডাইরেক্ট এ্যাকশন থেকে শুরু করে তাবৎ মুসলিম সহিংসতা ও পাকিস্তান অংশের অসহায় হিন্দুদের উপর সংঘটিত চলমান নৃশংস বর্বরতার প্রেক্ষাপটে দিল্লিতে এসব বিরামহীন উস্কানি শেষ পর্যন্ত দিল্লির হিন্দুদের ধৈর্য নিঃশেষ করে দেয়। তারা পাল্টা আক্রমণ করে মুসলিমদেরকে হত্যা করা শুরু করে। মুসলিমদের হাতে অস্ত্র থাকলেও সংখ্যাগত দিক দিয়ে তারা হেরে যায়; তারা মুসলিমদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ মুসলিমদের বাড়ি থেকে অনেকগুলো লাইসেন্সবিহীন বন্দুক, ছোরা, ১৫৪টি বোমা, ৪৫টি মর্টার, ১৯৫০ রাউন্ড রাইফেলের গুলি, ১৩টি ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার, কিছু হাত-বোমা, স্টেন-গান, কার্তুজ ও রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ধার করে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সহিংসতায় ৫০৭ জন মুসলিম ও ৭৬ জন হিন্দু নিহত হয়। সম্ভবত সমান সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা সে তথ্যের বাইরে থেকে যায়।[১৫৪]

পূর্বপরিকল্পিতভাবে হিন্দু ও শিখ নির্মূল অভিযান

ভারত বিভাগকালীন সহিংসতা প্রায় দুই কোটি মানুষকে সীমান্ত পারি দিতে বাধ্য করেঃ পাকিস্তান থেকে ভারতে যায় হিন্দু ও শিখরা; ভারত থেকে পাকিস্তানে যায় মুসলিমরা। বুঝা যায় যে, মুসলিম লীগ শুধু পৃথক একটি দেশই চায়নি, তারা সেটা চেয়েছিল একান্তই মুসলিমদের জন্য – অবিশ্বাসী হিন্দু-শিখ ইত্যাদি বিবর্জিত। ভারত ভাগের সময় তারা যে সহিংসতা ঘটায়, দেখা যায়, সেটা ছিল মুসলিম লীগের সতর্কভাবে পরিকল্পিত কৌশল পাকিস্তান থেকে অমুসলিম, তথা হিন্দু ও শিখ, শূন্য করার উদ্দেশ্যে। 'দ্য টাইমস অব লন্ডন' লিখেছিলঃ '*লীগের বেপরোয়া কুপ্রচারণাই পাঞ্জাব ট্রাজেডির কারণ।*'[১৫৫] কলিন্স ও লাপিয়ার লিখেছেনঃ 'জিন্নাহ ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতাদের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা মুসলিমদেরকে বিশ্বাসী করে তুলে যে, ''*পবিত্র ভূমি' পাকিস্তান থেকে হিন্দু সুদখোর, দোকানদার ও জমিদাররা (শিখ ভূস্বামী) নিশ্চিহ্ন হবে.... পাকিস্তান যদি আমাদের হয়, হিন্দু-শিখদের দোকানপাট, খামার, বাড়িঘর ও কলকারখানাও আমাদের হবে।*'[১৫৬] কলিন্স ও লাপিয়ার আরো জানানঃ

> 'লাহোরের কেন্দ্রীয় পোস্ট-অফিসটি হিন্দু ও শিখদের নামে পাঠানো হাজার হাজার পোস্ট কার্ডে ভরে যায়। সেগুলোতে অঙ্কিত ছিল নারী-পুরুষ সবাই ধর্ষিত ও নিধন হচ্ছে। কার্ডের উল্টো দিকে ছিল এ বার্তা: '*মুসলিমদের হাতে আমাদের শিখ ও হিন্দু ভাই-বোনদের উপর এরকমই ঘটছে যেখানে তারা ক্ষমতা দখল করেছে।*' এ পোস্টকার্ডগুলো ছিল শিখ ও হিন্দুদেরকে আতঙ্কিত করতে মুসলিম লীগ পরিচালিত মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের অংশ।'[১৫৭]

লাহোরের রাষ্ট্রীয় ভবন থেকে এক কর্মকর্তা ১৯৪৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহকে একটি চিঠি পাঠান। তাতে লেখা ছিল: '*আমি প্রত্যেককে বলছি যে, কিভাবে শিখরা সীমান্ত পার হবে সেটা আমার মাথা ব্যথা নয়; বড় কথা কতো তাড়াতাড়ি আমরা তাদের থেকে মুক্ত হতে পারি। লায়ালপুরে ৩০০,০০০ শিখের নড়াচড়ার এখনো কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যেতেই হবে।*'[১৫৮]

কলকাতা, নোয়াখালী কিংবা বর্তমান পাকিস্তানের মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে প্রধানত বা একান্তই মুসলিমদের দ্বারা গঠিত পুলিশ বাহিনী সেসব ধ্বংসযজ্ঞ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডে উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় থাকে, এমনকি বহুক্ষেত্রে অংশগ্রহণও করেছিল। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, কলকাতা দাঙ্গায় সোহরাওয়ার্দী কিভাবে পুলিশকে পরিচালনা করেছিলেন। 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' সহিংসতায় বাংলার মুসলিম লীগ সরকার ও

---

১৫৩. Khosla, p. 282-83
১৫৪. Ibid, p. 242-85
১৫৫. Times of London, 19 March 1947
১৫৬. Collins L & Lapierre D (1975) *Freedom at Midnight*, Avon, New York, p. 330
১৫৭. Ibid, p. 249
১৫৮. Khosla, p. 314

পুলিশের ভূমিকা বুঝার জন্য অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-৪৩) ও পরে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪) শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের[১৫৯] বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ তারিখে বাংলার আইন পরিষদে দাঙ্গার উন্মত্ত বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন: "*মনে হলো যে, আধুনিক এক নাদির শাহ কলকাতায় এসে চেপে বসে নগরীটিকে লুণ্ঠন, ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করছে। স্যার, যতবারই আমি পুলিশ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি, আমাকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের (কন্ট্রোল রুম) সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়।*" পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগযোগ স্থাপনে তার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সরকার ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়ে তিনি বলেন:[১৬০]

> 'পুলিশ অফিসাররা আমার কথা শুনবে না, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নিয়ন্ত্রণ করবে না, সরকারী ভবনগুলো আমার কথা শুনবে না। স্যার, এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। আর এটা তর্কাতীত যে, ১৬ তারিখ শুক্রবার যখন অস্থিরতা শুরু হয়, তখনই যদি পুলিশ ও সেনাবাহিনী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতো, তাহলে এসব ঘটতে পারতো না; তা সেদিন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো। সুতরাং এ রায় অপরিহার্য যে, দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য পুলিশ দায়ী না হলেও জীবনহানির জন্য তারা সরাসরি দায়ী; এবং যদি একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় ও সেসব কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে আমার অভিমত হলো: হত্যা কিংবা হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা দানের অভিযোগে তাদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে ফাঁসি, টানা-হেঁচড়া ও প্রহারিত হওয়ার যোগ্য।'

পাকিস্তান অঞ্চলের জেলাগুলোতে ভারত ভাগের সময়কালীন সহিংসতা সম্বন্ধে গুরবচন সিং লিখেছেন:

> 'পুলিশ ও সেনা বাহিনী – পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে কর্মকর্তা ও মালামাল ভাগাভাগির কারণে যা এখন সম্পূর্ণরূপে মুসলিমদের দ্বারা গঠিত – তারা কেবল লুটপাটকারী উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতাকে সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহিতই করেনি, অনেক সময় তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়, কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে ও হত্যাকাণ্ডের কাজ সমাপ্ত করে যেখানে দুর্বৃত্তরা একা সফলে ব্যর্থ হয়। আগস্টের মধ্যেই লাহোরের অমুসলিমদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তাদের সাবেক সংখ্যার সামান্য অংশে পরিণত হয়। কিন্তু এরপরও লাহোরে ১০০,০০০ হিন্দু ও শিখ থেকে যায়।'[১৬১]

একটা সামরিক ও বেসামরিক গেজেট রিপোর্ট জানায়, বিশেষত শিখরা লাহোর ত্যাগ করতে চায়নি এটা বলে যে, লাহোর তাদের জন্মভূমি। কিন্তু এ জিদ তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়: '*অচিরেই সেখানকার হিন্দু ও শিখদের উপর নেমে আসে ধ্বংস, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ। তাদের নয় হাজার মৃতদেহ লাহোরের পথেঘাটে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। তাদের গলিত লাশের দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠে লাহোরের বাতাস।*'[১৬২] গুরবচন সিং তালিব জানান, ১৯৪৭ সালের ১০ই আগস্ট প্রায় সবগুলো হিন্দু ও শিখ বসতি এলাকায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে চুনিমণ্ডি, বাজাজ হাট্টা, সুয়া-বাজার, লোহারি গেট, মোহল্লা সাথান ও মোজাং'এ। প্রত্যেকটি অমুসলিম এলাকায় পুলিশ এসব হামলায় নেতৃত্ব দেয়। ১৯৪৭ সালের আগস্টের শুরুর দিকে লাহোরে ভয়াবহ গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'দ্যা হিন্দুস্তান' পত্রিকার প্রতিনিধি লিখেন: '*পশ্চিম পাঞ্জাবে গত তিন সপ্তাহে যত নিহত হয়েছে, তার ৭০ শতাংশই ঘটেছে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উন্মত্ত সামরিক বাহিনী ও পুলিশের হামলায়। তাদের বুলেটে নিহত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর নিজ হাতে সম্পন্ন শেখপুরা গণহত্যা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিবে।*'[১৬৩]

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান অংশে শুরু থেকেই পুলিশ হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞে উন্মত্ত দাঙ্গাবাজ মুসলিমদেরকে সহযোগিতা করেছে, এমনকি সরাসরি অংশও নিয়েছে। ১৯৪৭ সালের ৫ই মার্চ রাষ্ট্রিয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর বা ন্যাশনাল গার্ডের সহায়তায় একদল উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতা লাহোরের রঙমহলে অমুসলিমদের দোকানপাট লুটপাট শুরু করে। হিন্দু ও শিখরা তাদের প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ালে সেখানে মুসলিম সাব-ইনপেক্টর একদল পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হয় ও প্রতিরোধকারী হিন্দু-শিখদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এ সময় এক তরুণ হিন্দু পুলিশের এ অন্যায় ভূমিকার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে ইন্সপেক্টর তাকে গুলি করে মেরে ফেলে।[১৬৪] ১৯৪৬ সালের ৬ই মার্চ যখন মুসলিমরা অমৃতসরে দাঙ্গা ও সহিংসতা শুরু করে, তখন সহিংসতার এলাকায় হিন্দু পুলিশদের বদলি করে তদস্থলে মুসলিম পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সহিংসতায় মুসলিম দাঙ্গাবাজদেরকে পুলিশের সহায়তা প্রদান সম্বন্ধে খোস্‌লা লিখেছেন: '*মুসলিম পুলিশের সাহায্যপুষ্ট মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেটরা দুস্কৃতকারীদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে কিংবা না দেখার ভান করে।*' একইভাবে রাওয়ালপিণ্ডিতে সংঘটিত সহিংসতায় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ উদাসীন থাকে এবং দুস্কৃতকারীদেরকে সহায়তা করে। বিচারপতি খোস্‌লা লিখেছেন: '*যখন এক প্রবীণ শিখ উকিল এরূপ পুলিশী সহায়তার ব্যাপারে এক ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রশ্ন করেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিথ্যা গুজব ছড়ানোর অভিযোগ তুলে তাকে হুশিয়ার করেন যে, সে তার নিজের জীবন বিপন্ন করছে।*'[১৬৫]

এমনই ছিল বিভাগ-পূর্ব দাঙ্গায় মুসলিম প্রধান অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিক্রিয়া। ১৯৪৭ সালের আগস্টে দেশভাগের সময় নতুন করে ঘনীভূত সহিংসতায় পুলিশ ও সরকারি কর্তৃপক্ষের সহায়ক অংশগ্রহণ আরো অধিক লক্ষণীয় হয়ে উঠে, যার কিছু

---

[১৫৯] Fazlul Huq was kicked out of the Muslim League in 1940 for advocating for an undivided India.
[১৬০] Ibid, p. 307
[১৬১] Talib, op cit
[১৬২] Ibid
[১৬৩] The Jalianwala Bagh massacre in Punjab was the worst violence committeed by the British in course of the Independence Movement of India. It caused 379 deaths according to British records, while up to 1,000 in Indian claims.
[১৬৪] Khosla, p. 101-02
[১৬৫] Ibid, p. 103,106

দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের আগস্টে লাহোরে হিন্দু ও শিখ গণহত্যায় বালুচ রেজিমেন্ট বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ওদিকে ঝাং'এর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পীর মোবারক আলী শাহকে দেখা যায় উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নেতৃত্ব দিতে ও রাইফেল হাতে গুলিবর্ষণ করতে।[১৬৬]

বিভাজিত ভারতীয় অংশে কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহিংসতাকে হ্রাস বা খর্ব করার প্রয়াস চালায়। সীমান্তের উভয় পাশের কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে খোস্‌লা লিখেছেন: *যেখানে ভারত ও পূর্ব পাঞ্জাব সরকার উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি মোতায়েন করেছে, সেখানে পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডা-পাণ্ডাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছে নানা সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।*[১৬৭] তবে ভারতীয় কিছু অংশেও, বিশেষ করে পূর্ব পাঞ্জাবে (যেমন আম্বালা অঞ্চলে), কিছু পুলিশ অফিসার সীমান্তের ওপারের মুসলিম পুলিশদের দ্বারা শিখ ও হিন্দুদের উপর ঘটিত কর্মকাণ্ডের ক্ষোভে শিখদের পাল্টা আক্রমণে উদাসীনতা প্রদর্শন বা না দেখার ভান করে; কেউ কেউ হত্যা ও লুটপাটে অংশও নেয়। তবে ভারতীয় অংশে এরূপ ঘটনা ছিল নেহাৎই অল্প এবং এরূপ অপকর্ম ঘটনকারী পুলিশদেরকে কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করে। পাকিস্তানে অপকর্ম ঘটনকারী পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এরূপ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

মুসলিমদের জাতিগত উচ্ছেদকরণ

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভক্ত ভারতীয় অংশে মুসলিমদের জাতিগত উচ্ছেদ সংঘটিত হয় মূলত পূর্ব পাঞ্জাবে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে শিখদের এ বিলম্বিত পাল্টা আক্রমণ – যা ঘটে মুসলিমদের দ্বারা ঘটিত চরমতম উত্তেজক উস্কানিতে – সেটাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করলে তার সঠিক বিচার বা মূল্যায়ন হবে না। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক তার সমসাময়িক মুঘল হামলাকারী বাবরের গণহারে হিন্দু নিধন ও তাদের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নানক তার '*বাবর বাণী*'তে আইমানাবাদে বাবরের ধ্বংসযজ্ঞ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়ে হানাদারের বর্বরতাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে অভিযোগের আকারে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিম নিষ্ঠুরতাকে শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'-এ সন্নিবেশিত করেছেন এভাবে:

> 'ইসলামকে মাথায় তুলে নিয়ে তুমি হিন্দুস্তানকে ভয়ঙ্করতায় করেছো নিমজ্জিত...। তারা এমন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করছে অথচ তোমার অনুকম্পা সাড়া দিচ্ছে না। শক্তিমান শক্তিমানকে আক্রমণ করলে হৃদয় দগ্ধ হয় না। কিন্তু যখন শক্তিমান অসহায়কে চূর্ণ করে, তখন নিশ্চয়ই যিনি (ঈশ্বর) তাদেরকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। হে ঈশ্বর! এসব কুকুরেরা হীরাতুল্য হিন্দুস্তানকে ধ্বংস করেছে, (তাদের সন্ত্রাস এতই প্রবল যে) তাদের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কেউই প্রশ্ন করে না, এবং তথাপি তুমি নির্বিকার....' (মাহলা ১:৩৬)।

ইসলামি নিষ্ঠুরতা পরবর্তীতে গুরু নানকের অনুসারীদের উপরও বর্ষিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার নিজস্ব পুত্র খসরুর বিদ্রোহে সমর্থন দানের অভিযোগে শিখ গুরু অর্জুন দেবকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর কাশ্মীরি হিন্দুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তর করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে গুরু তেগ বাহাদুর সিংকে আওরঙ্গজেবের আদেশে শিরোচ্ছেদ করা হয় জঘন্য নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতনের পর। ১৭০৫ সালে আওরঙ্গজেব গুরু গোবিন্দ সিং ও তার অনুসারীদেরকে আক্রমণ করে তাদেরকে দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। গুরু গোবিন্দ সিং ছিলেন গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র। নিরাপদে চলে যেতে দেওয়ার আশ্বাসে গোবিন্দ সিং ও তার অনুসারীরা দূর্গ থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেবের সেনারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের উপর চড়াও হয়ে তাদেরকে কচুকাটা করে পরিবার-পরিজনসহ, যার মধ্যে ছিল গোবিন্দ সিং-এর পরিবারও। এ যাত্রায় গুরু গোবিন্দ সিং বেঁচে গেলেও অবশেষে আওরঙ্গজেবের সিরহিন্দের (পাঞ্জাবে) গভর্নর ওয়াজির খান তাকে হত্যা করে ১৭০৭ সালে।

এসব নিষ্ঠুরতার প্রেক্ষাপটে, যে ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকরা শিখ ধর্মগুরুদেরকে একের পর এক হত্যা করেছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে শিখদের ক্ষোভ ও আক্রোশকে অবমূল্যায়ন করা যায় না। সে আক্রোশের ফলস্বরূপ আমরা মুসলিম-প্ররোচিত সিপাহি বিদ্রোহে শিখদেরকে দেখি ব্রিটিশদেরকে সহায়তা করতে। তার উপর মুসলিমদের মপলা বর্বরতা, তাদের ভারত-বিভক্তিকরণের জন্য জোর আন্দোলন (যার বিরোধী ছিল শিখরা) এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে কলকাতায় মুসলিম বর্বরতার শুরু (যার বিশেষ শিকার হয়েছিল শিখরাও), যা পাকিস্তান অঞ্চলের ও অমৃতসরের শিখদের উপরও আরো নির্দয়-নির্মমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বুঝা যায় যে, এ প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাঞ্জাবের শিখরা উপলব্ধি করেছিল: মুসলিমদেরকে তাদের মাঝে থাকতে দিলে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা কোনো ক্রমেই সম্ভব হবে না। এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠে পূর্ব পাঞ্জাবে অবৈধ শিখ সহিংসতার বিরুদ্ধে শিখ নেতৃবৃন্দের এক বিবৃতিতে:[১৬৮]

> আমরা মুসলিমদের বন্ধুত্ব চাই না এবং আমরা আর কখনো তাদেরকে বন্ধু নাও বানাতে পারি। আমাদেরকে লড়াই করতেও হতে পারে, কিন্তু সেটা হবে পরিচ্ছন্ন লড়াই – যাতে পুরুষ পুরুষকে হত্যা করবে। নারী ও শিশু এবং আশ্রয়প্রার্থীদেরকে এরূপে হত্যা করা এখনই বন্ধ করতে হবে। শরণার্থী ট্রেন, বহর ও কাফেলার উপর কোনোরকম আক্রমণ করা চলবে না। আমরা তোমাদেরকে এসব করতে বলছি মুসলিমদেরকে রক্ষার জন্য নয়, বরং তোমাদেরই সম্প্রদায়, সম্মান, চরিত্র ও ঐতিহ্যের স্বার্থে।'

---

১৬৬. Ibid, p. 122,179
১৬৭. Ibid, p. 119
১৬৮. Ibid, p. 288

পরিস্থিতি শান্ত করতে এরূপ রূঢ় বা বেখাপ্পা ভাষার আবেদনে শিখ নেতারা লড়াইয়েরও অনুমোদন দেয়, তবে কেবল মুসলিম পুরুষরা প্রতিপক্ষ হিসেবে এগিয়ে এলে; নারী, শিশু ও আশ্রয়প্রার্থীদের কোনোরূপ ক্ষতি করা যাবেনা। এ আহ্বানে স্পষ্টতঃই মুসলিমদের বিরুদ্ধে শিখদের একটা ক্রোধ নিহিত রয়েছে, যাতে মুসলিম হানাদার ও শাসকবর্গ কর্তৃক শিখদের উপর নির্যাতনের ইতিহাস ও মুসলিমদের চলমান ভয়াবহ বর্বরতার ভূমিকা স্পষ্টতই প্রতিফলিত।

অন্যত্র মুসলিমরা হত্যাকাণ্ড ও জাতিগত উচ্ছেদের শিকার হয়েছিল রাজস্থান অঞ্চলের ছোট দুটি রাজ্য আলোয়ার ও ভারতপুরে, যেগুলো ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ দু'টি রাজ্যে 'মিও' নামে পরিচিত মুসলিমরা বড় সংখ্যায় বসবাস করতো। ইয়ান কপল্যান্ডের এক হিসাব অনুযায়ী, এখানে হিন্দু সহিংসতায় প্রায় ৩০,০০০ মিও মারা যায় ও প্রায় ১০০,০০০ বহিস্কৃত হয়। রাজস্থানের এ সহিংসতা সংঘটিত হয়েছিল ভারত-বিভক্তি সংক্রান্ত দাঙ্গার শেষ পর্যায়ে। কপল্যান্ড জানান: এ হিন্দু সহিংসতার কারণ ছিল '*নোয়াখালী ও পাঞ্জাব হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নেওয়া*'। কোন পক্ষ এ সহিংসতায় উস্কানি দিয়েছিল তা জানা যায় নি। কপল্যান্ড লিখেছেন: '*এ প্রেক্ষাপটে কে আক্রমণকারী আর কে আক্রান্ত, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, এমনকি অর্থহীন। উভয় পক্ষই নিন্দনীয়।*'[১৬৯.]

দিল্লির উপকণ্ঠে মিও মুসলিমদের দ্বারা হিন্দু গ্রামগুলোতে ভয়াবহ হামলার ঘটনা খুব সম্ভবত প্রতিবেশী আলোয়ারের হিন্দু সহিংসতাকে উস্কে দিয়েছিল। খোস্‌লা জানান: '*(দিল্লির) কয়েকটি গ্রামে মিও অধিবাসীরা সহিংসতা শুরু করেছিল। হিন্দু গ্রামগুলোকে আক্রমণ করা ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতিবেশী আলোয়ার রাজ্যের মিওরা অবশেষে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল ও অনেক মিও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।*'[১৭০.] এ অঞ্চলের মিওদের মাঝে একটা পৃথক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও চলছিল; তারা চেয়েছিল রাজস্থানের প্রাণকেন্দ্রে 'মিওস্তান' নামে পৃথক আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে।

ভারত ভাগের সময় আনুমানিক ৬০০,০০০ থেকে ২,০০০,০০০ লোক নিহত হয়; প্রায় ১০০,০০০ প্রধানত হিন্দু ও শিখ নারী ধর্ষণের শিকার হয়; সমসংখ্যক নারীকে ক্রীতদাসকরণ ও অপহরণ করা হয়; এবং কয়েক মিলিয়ন হিন্দু ও শিখকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয় মৃত্যুর মুখে পতিত করে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কেবল নোয়াখালীতেই সেখানকার মোট ৪০০,০০০ হিন্দুর মধ্যে ৯৫ শতাংশ ইসলামে গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। বিভাগ-সম্পৃক্ত দাঙ্গায় মুসলিম ও অমুসলিম নিহতদের সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটে পূর্ব পাঞ্জাবে। এ বিভক্তিতে দু'দেশের সীমান্তের এপার-ওপার স্থানান্তরিত হয় প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ মানুষ। ১৯৫১ সালের স্থানচ্যুত লোকদের গণনা অনুযায়ী প্রায় ১ কোটি ৪৫ লাখ লোক পাঞ্জাবের সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিল। এদের মধ্যে বিভাগের পরপরই ৭২,২৬,০০০ হাজার মুসলিম চলে যায় ভারত থেকে পাকিস্তানে আর ৭২,৪৯,০০০ হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান থেকে ভারতে পাড়ি জমায়। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের পূর্বস্থ বাংলা অংশে ৩৫ লাখ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে গমন করে; আর মাত্র ৭ লাখ মুসলিম বিপরীত মুখে অভিবাসিত হয়।[১৭১.] এটা বুঝতে হবে যে, মুসলিমদের সীমান্ত পাড়ি বা অভিবাসন ছিল সাধারণত একান্তই কাঙ্ক্ষিত প্রকৃতির, কেননা তারাই একটা পৃথক মুসলিম আবাসভূমি চেয়েছিল; এবং অবিশ্বাসীদের কর্তৃত্বাধীন 'দ্বার আল-হারব' (হিন্দু ভারত) থেকে একটা মুসলিম দেশে স্থানান্তরের প্রচারণা মুসলিম সংগঠনগুলো তাদের ভারত-বিভক্তকরণ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল।

ধনসম্পদ হারানোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের চেয়ে হিন্দু ও শিখরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সারা ভারতে হিন্দু ও শিখরা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে সম্পদশালী সম্প্রদায়। দেশ ভাগের আগে পূর্ব বাংলার হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও জাতীয় সম্পদের ৮০ শতাংশের মালিক ছিল তারা। কাম্‌রা জানান: '*পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহরের অধিকাংশ দালান-কোঠা ও সম্পদের মালিক ছিল হিন্দুরা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহুরে সম্পদের ৮৫ শতাংশ।*'[১৭২.] উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ ও খ্রিষ্টানরা মিলে ছিল মোট জনসংখ্যার ৮.২ শতাংশ। কিন্তু শুধুমাত্র হিন্দুরা এ প্রদেশের ৮০ শতাংশ আয়কর প্রদান করতো। লাহোরে ৮০ শতাংশ সম্পদের মালিক ছিল সংখ্যালঘু অমুসলিমরা।[১৭৩.] বুঝা যায় যে, মুসলিম সহিংসতা হিন্দু ও শিখদেরকে বিতাড়িত করে তাদের বিপুল সম্পদ দখলের অভিলাষে পূর্ব-পরিকল্পিতরূপে শুরু করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের প্রচারণা *পাকিস্তান আমাদের হলে অমুসলিমদের সম্পদের মালিকও আমরাই হব*, ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই বাংলার কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায় এক প্রেস বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের আকাঙ্ক্ষার কথা বলেন এভাবে: পূর্বাঞ্চলীয় পাকিস্তানের মুসলিমদের মনে এমন একটা ধারণা রয়েছে যে, ১৫ আগস্টের পর হিন্দুদের বাড়িঘর ও জমিজমা স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমদের অধিকারে চলে যাবে এবং সে অঞ্চলে হিন্দুরা মুসলিমদের অধীনস্ত এক ধরনের প্রজারূপে থেকে যাবে।[১৭৪.] এ ধারণা আরো সঠিক ও শক্তভাবে প্রযোজ্য ছিল পাঞ্জাবের মুসলিম লুটেরাদের ক্ষেত্রে, যেখানে '*তারা প্রত্যেকেই মনে করেছিল যেন নবাব বনে গেছে।*'[১৭৫.]

দায়ী কে?

---

১৬৯. Copland I (1998) *The Further Shores of Partition: Ethnic Cleansing in Rajasthan 1947, Past and Present*, Oxford, **160**, p. 203-39

১৭০. Khosla, p. 284

১৭১. Partition of India, Wikipedia, http://en.wikipedia. org/wiki/Partition-of-India

১৭২. Kamra, p. 3

১৭৩. Khosla, p. 120,258

১৭৪. Hindustan Times, 22 July 1947

১৭৫. Civil and Military Gazette, Lahore, 30 December 1948

স্পষ্টতঃই ভারত বিভাজনের সাথে সম্পৃক্ত বিশাল মানবিক বিপর্যয় বা ট্রাজেডির প্রায় সবটুকু দায়-দায়িত্ব বর্তায় মুসলিমদের ঘাড়ে। প্রথমতঃ তারাই শুরু করেছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং সাধারণত তারাই ছিল সমস্ত সহিংসতা ও উচ্ছেদ ঘটনাবলির উস্কানিদাতা ও শুরুকারক। তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি অর্জনের লক্ষ্যে ভারত-বিভাজনের এক বছর আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছিল ভয়ানক সহিংসতা। তাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি যখন শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয় ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে, তখন তারা আবারো ঝাপিয়ে পড়ে আরো ন্যাক্কারজনক ও বীভৎস সহিংসতায় এবং শেষ পর্যন্ত বিভাজন সম্পন্ন হয়। মুসলিমলীগ ও মসজিদের প্রচারণা অনুযায়ী কলকাতায় 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' ছিল একটি জিহাদ এবং নবি মোহাম্মদের জিহাদী 'বদর যুদ্ধের' পুনর্সংঘটন। সহিংসতায় মুসলিমদের সামগ্রিক মনোভাব ছিল নবসৃষ্ট ইসলামি 'পবিত্র ভূমি'কে নিকৃষ্ট বিধর্মীমুক্ত করা। ইহুদিদের গণহারে হত্যা ও উচ্ছেদ এবং পৌত্তলিকতা অবলুপ্ত করতঃ আরব ভূখণ্ডে মোহাম্মদের প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নজির এক্ষেত্রে হুবহু মিলে যায়।

আগস্ট মাসে দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সর্বত্র দাঙ্গা সংঘটিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে (ইস্ট বেঙ্গল) দেশভাগের সময়টিতে সহিংসতা কৌশলে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু ১৯৫০ সালের ফেরুয়ারিতে হিন্দুদের উপর উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম জনতার ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষক সহিংসতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কাশ্মীরে পাকিস্তানের ব্যর্থ হামলার সূত্র ধরে এ সহিংসতা সৃষ্টির প্ররোচণা করা হয়েছিল। এ সময় পাকিস্তানী সংবাদ-মাধ্যম, রেডিও ও মুসলিম নেতাদের দ্বারা যা তা মিথ্যা প্রচারণা রটানো হয়: যেমন হিন্দুদেরকে 'অন্তর্ঘাতক', 'শত্রুর চর', 'ফিফ্থ কলামিস্ট' (রাজাকার) ও 'অবাধ্য শক্তি' প্রভৃতিতে আখ্যায়িত করা হয়। ৬ ও ৭ই ফেরুয়ারি রেডিও পাকিস্তান থেকে ঘোষণা করা হয়: "*ভাইসব! ভারতে ও পশ্চিম বাংলায় এখন যে অমানবিক নিষ্ঠুরতা চলছে, তা তোমরা শুনেছো। তোমরা কি শক্তি সঞ্চয় করবে না?*" এরূপ মিথ্যা প্রচারণা ও কাহিনীতে পূর্ব বাংলার সংবাদ পত্রগুলোর পাতাও ছেয়ে যায়। পাকিস্তান রেডিও ঘোষণা দেয়: কলকাতায় ১০,০০০ মুসলিম মারা গেছে; এ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক 'পাশবান' বানায় ১০০,০০০।[১৭৬] সারা পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিমদেরকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খল সহিংসতায় উদ্বুদ্ধ করতে এরূপ মিথ্যা প্রচারণায় চালানো হয়েছিল। সে সময় হিন্দুদের উপর সংঘটিত গণহত্যা, ধর্ষণ, নারী-অপহরণ, গণ-ধর্মান্তকরণ, অগ্নি সংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা এ গ্রন্থের তুলে ধরা হবে না। তবে উদাহরণস্বরূপ জওয়াহেরলাল নেহরু শুধু ঢাকায় নিহতের সংখ্যা ৬০০ থেকে ১,০০০ বলে উল্লেখ করেন, যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। নেহরু কর্তৃক প্রদত্ত একটা সংখ্যা অনুযায়ী: রাজাপুর থানার একটি গ্রামে আনুমানিক ১৫০ জন হিন্দু নিহত হয় ও বাকীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়; প্রায় ১৫ লাখ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে পালিয়ে যায়।[১৭৭]

হিন্দু ও শিখরা সহিংসতাকে কখনোই উস্কানি দেয়নি বা তা শুরু করেনি; তারা কেবলই বিলম্বিতভাবে বর্বরতাপূর্ণ মুসলিম দাঙ্গায় পাল্টা-আক্রমণ বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত ভাগের সময় ভারতের অভ্যন্তরে পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লি, আলোয়ার ও ভারতপুর ছাড়াও দাঙ্গা সংঘটিত হয় আলীগড়, বোম্বাই ও জম্মু-কাশ্মীরসহ অন্যান্য অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী এবং সে দাঙ্গাগুলোতেও তারাই উস্কানি দিয়েছিল ও শুরু করেছিল। উদাহরণস্বরূপ কাশ্মীরে পাঠান মুসলিমরা হিন্দু নারীদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের ঝেলুম জেলার বাজারগুলোতে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করেছিল।[১৭৮] পূর্ব পাঞ্জাবসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু ও শিখ সহিংসতা ছিল প্রতিশোধমূলক মাত্র। শিখদের দ্বারা পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলিমরা প্রচণ্ড মার খায়। অন্যান্য স্থানের মধ্যে কলকাতা, নোয়াখালী, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এমনকি পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরেও মুসলিমরা বিনা উস্কানিতে চরম দুর্দশা সৃষ্টিকারী সহিংসতা শুরু করার মাধ্যমে হিন্দু-শিখদের ধৈর্যের চরম পরীক্ষা নিয়েছিল, যা নিঃসন্দেহে তাদেরকে সহিংসতায় অংশ নিতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতের অভ্যন্তরে অধিকাংশ স্থানে শিখ ও হিন্দুরা খুবই সংযত আচরণ করে। যেসব এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যালঘু ছিল সেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই শান্তি বিরাজ করে। কাজেই নিঃসন্দেহে ভারতের বিভাজন-সংশ্লিষ্ট সহিংসতা, বর্বরতা ও রক্তপাতের জন্য বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলিমদেরকেই প্রায় সবটুকু দায়ভার বহন করতে হবে: প্রথমতঃ তাদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবির জন্য; দ্বিতীয়তঃ বিনা উস্কানিতে সংঘটিত সহিংসতা ও রক্তক্ষয়ে তাদের উদ্যোগ ও প্ররোচনার জন্য। ব্রিটিশ শাসক এবং হিন্দু ও শিখরা (হিন্দুত্ববাদী দলগুলোসহ) এ দোষের সামান্যই ভাগীদার।

ভারতের সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের প্রভাব

ভারতে ইসলামি উপনিবেশিকতার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অংশটি ছিল মুসলিম হানাদার ও শাসকদের দ্বারা অমুসলিমদের উপর ব্যাপক সহিংসতা, চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও ব্যাপক মাত্রায় তাদেরকে ক্রীতদাসকরণ (পরবর্তী অধ্যায় দেখুন)। অধিকন্তু ভারতীয় সমাজের অনেক বিদ্যমান অশুভ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়, যেমন সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ও বর্ণ প্রথা প্রভৃতি মুসলিম শাসনামলে আরো খারাপ পর্যায়ে চলে যায়। ইসলামি শাসন ভারতে কিছু নতুন অশুভ সামাজিক বিষয় সৃষ্টিও করে, যেমন 'ঠগী' সম্প্রদায় ও 'জওহর' প্রথা। ব্রিটিশরা ভারতে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এসব অশুভ প্রথা বা বিষয়ের কিছু কিছু, যেমন ঠগী ও জওহর, অদৃশ্য হয়ে যায়। ভারতের অন্যান্য সামাজিক দুর্বলতাসমূহকে বিলুপ্ত বা দমন করতেও ব্রিটিশরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আর ভারতের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যবস্থায় ইসলামি শাসনের প্রভাব ছিল পঙ্গুত্বমূলক।

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

---

[১৭৬] Kamra, p. 55,57

[১৭৭] Ibid, p. 59,66,105

[১৭৮] Talib, p. 201.

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রটি হয়েছিল ভারতে ইসলামি উপনিবেশবাদের সবচেয়ে খারাপ শিকার। মুসলিম শাসক ও হানাদাররা ভারতের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলেছিল। শিক্ষার জন্য তারা শুধুই মুসলিমদের জন্য মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ করতো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামপূর্ব ভারতে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং ঔষধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতির মান ছিল যথেষ্ট উন্নত; ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তৎকালীন বিশ্বের খ্যাতনামা অনেক জ্ঞানার্জনকেন্দ্র, যেমন নালন্দা (৪২৭-১১৯৭), তক্ষশীলা, কাঁশী, বিক্রমশীলা, জগদ্দালা ও ওদান্তাপুরা। আজকের বিহারে অবস্থিত ছিল সেকালের বৌদ্ধ জ্ঞানার্জনকেন্দ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, যা ছিল ছাত্রাবাস সহ বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এর সুদিনগুলোতে সেখানে ১০,০০০ ছাত্র ও ২,০০০ শিক্ষকের সঙ্কুলান হতো। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল ৯ তলার বিশাল এক পাঠাগার, যেখানে নানা বিষয়ের খুটিনাটি গ্রন্থাবলির পাণ্ডুলিপি বা মূলগ্রন্থ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা হতো। নালন্দা সে সময়ের সবচেয়ে বিশ্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত ছিল, যেখানে কোরিয়া, জাপান, চীন, তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া, পারস্য ও তুরস্ক থেকে ছাত্র ও পণ্ডিতবর্গ আসতো জ্ঞানার্জনের জন্য।[১৮৯.] ১১৯৭ সালে বখতিয়ার খিলজি এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস করে এবং এর বিশাল ও সমৃদ্ধ পাঠাগারটি পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে। ভারতে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য বাগদাদ থেকে বহু মুসলিম ছাত্র তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো। এসব প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্ঞানকেন্দ্রসমূহ মুসলিম হানাদার ও শাসকরা ধ্বংস করে; মুসলিম দখলের পর এগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার উপর ইসলামি আক্রমণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলবেরুনি বলেনঃ মুসলিম অধিকৃত অঞ্চল থেকে হিন্দু বিজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চা উধাও হয়ে গিয়েছিল।[১৮০.] আকবরের তুলনামূলক উদারনৈতিক শাসনামলে হিন্দুরা হাজার হাজার মন্দির পুনর্নির্মাণ করে, যা হিন্দু শিক্ষালয়রূপেও ব্যবহৃত হতো। পরে আওরঙ্গজেব সেসব হিন্দু মন্দিরে মুসলিম ছাত্রদের উপস্থিতি ও তাদের 'কুফরি' শিক্ষা গ্রহণ করা লক্ষ্য করে সমস্ত মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দেন। এভাবে পুনরুজ্জীবিত হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা তিনি ধ্বংস করে ফেলেন। দক্ষিণাঞ্চলে সুলতান আহমদশাহ বাহমনির মতো অন্যান্য মুসলিম শাসকরা 'পৌত্তলিক মন্দির'সমূহ ও 'ব্রাহ্মণদের কলেজ' গুলো ধ্বংস করে।[১৮১.]

মুসলিম হানাদাররা ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ তো করেইনি, বরং অমুসলিমদের জ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো নজরে এলেই তারা তা ধ্বংস করেছে। ৬৪১ সালে খলিফা ওমরের মিশর অধিকারের সময় তারা আলেক্সান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরীটি ধ্বংস করে।[১৮২.] পারস্য দখলের পর তারা টেসিফোনের রাজকীয় জরথুষ্টবাদী লাইব্রেরীটিও ভস্মীভূত করে; দামেস্ক (সিরিয়া) ও স্পেনের লাইব্রেরীগুলোর উপরও একই বিপর্যয় নেমে আসে। ১১৭১ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী ফাতেমীয় শাসকদের বিতাড়িত করার পর কায়রোর বিখ্যাত লাইব্রেরীটির অনেক বই-পুস্তক ধ্বংস করেন। ভারতে লাইব্রেরী ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ধ্বংসের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

মুসলিম শাসকরা ভারতে কেবলমাত্র ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন 'মক্তব' ও 'মাদ্রাসা' নির্মাণ করেন, অনেক ক্ষেত্রে যা মসজিদের সাথে যুক্ত থাকতো। এগুলো করা হয়েছিল শুধুমাত্র মুসলিম ছাত্রদের ধর্মীয় এবং অন্যান্য সামরিক ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের জন্য, যা মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা এবং কোরান, হাদিস ও ইসলামিক আইন মুখস্ত করাই ছিল সে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান বিষয়। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে কৃষি, হিসাব বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্কশাস্ত্রেও সীমিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।[১৮৩.] ইসলামিক ইতিহাসবিদ কবি আল্লামা শিবলী (মৃত্যু ১৯১৪) জানানঃ মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে শয়নকক্ষ, কার্পেট, খাদ্য, তেল, কলম, কাগজ, মিষ্টদ্রব্য ও ফল-ফলারি সরবরাহ করা হতো। ইবনে বতুতা তার ভারত ভ্রমণকালে কোনো কোনো সময় মাদ্রাসায় অবস্থান করতেন। ৩০০ কক্ষের একটি মাদ্রাসায় তিনি ছাত্রদেরকে কোরান শিক্ষা নিতে দেখেন, যাদেরকে দৈনন্দিন খাদ্য ও বাৎসরিক ভাতাস্বরূপ কাপড় দেওয়া হতো। আরেকটি মাদ্রাসায়, যেখানে তিনি ১৬ দিন অবস্থান করেছিলেন, সেখানে ছাত্রদেরকে দৈনিক উৎকৃষ্ট খাদ্য, যেমন মুরগির মাংস, পোলাও, কোরমা ও মিষ্টান্ন সরবরাহ করা হতো।[১৮৪.]

এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল মুসলিম ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ছিল; অমুসলিমদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। মুসলিম শাসকগণ তাদের প্রশাসনে কেবল মুসলিমদেরকেই নিয়োগ করতেন। সুতরাং হিন্দুদেরকে শিক্ষিত করা স্বভাবতই অনর্থক কাজ হিসেবে বিবেচিত ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, ইসলামে ঘৃণিত অমুসলিমদের জন্য মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন মাদ্রাসা ও মসজিদ, ইত্যাদির গণ্ডিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, যে রীতি আজও বলবৎ রয়েছে। পরে ধর্মদ্রোহী আকবর যখন সকল ধর্মের লোকদের জন্য তার প্রশাসনের চাকরির দরজা

---

১৭৯. Nehru (1989), p. 122; also Nalanda, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/ wiki/Nalanda

১৮০. Sachau (2002), p. 6

১৮১. Ferishtah, Vol. II, p. 248

১৮২. Some modern scholars, such as Phillip K Hitti, deny this on the ground that the Library of Alexandria could not exist, because it was destroyed during the invasion of Julius Caesar in 48 BC. But, according to Theodore Vrettos (*Alexandria, City of the Western Mind*, The Free Press, New York, 2001, p. 93-94): *'Caesar's soldiers set fire to the Egyptian ships, and the flames, spreading rapidly in the driving wind, consumed most of the dockyard, many structures near the place, and also several thousand books that were housed in one of the buildings. From this incident, histroians mistakingly assumed that the Great Library of Alexandria had been destroyed, but the Library was nowhere near the docks... Some 40,000 book scrolls were destroyed in the fire, which were not at all connected with the Great Library; they were account books and ledgers containing records of Alexandria's export goods bound for Rome and other cities throughout the world.'*

১৮৩. Ghosh, p. 22

১৮৪. Ibid, p. 23

খুলে দেন, তখন তিনি অমুসলিম ছাত্রদের জন্যও মাদ্রাসার দরজা খুলে দেন এবং তাতে সংস্কৃত ও উপনিষদের মতো হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়ন যুক্ত করেন।[১৮৫] এমনকি আকবর অবিশ্বাস্যরূপে তার নতুন ধর্মমত 'দীন-ই-ইলাহী'র ঘোষণার প্রেক্ষিতে নবি ও কোরানের পবিত্র ভাষা আরবি শিক্ষাকে বন্ধ করারও চেষ্টা করেছিলেন।[১৮৬] কেননা এ সময় ইসলামি শিক্ষা হয়ে উঠেছিল অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন, এমনকি অসহায়ক।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩০ থেকে ৬৫০ সাল পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সময় তিনি ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত সুসংগঠিত অবস্থায় দেখতে পান। সাত বছর বয়সেই বালক-বালিকারা পাঁচটি শাস্ত্র শিখতে শুরু করতো; সেগুলো হলো ব্যাকরণ, কলা ও শিল্পবিজ্ঞান, ঔষধ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন। হিউয়েন সাঙ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নেহরু উল্লেখ করেছেন: এতে মনে হচ্ছে যে, যেহেতু সমস্ত ভিক্ষু ও ধর্মযাজকগণ ছিলেন শিক্ষক, সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা তুলনামূলক বিস্তৃত ছিল শিক্ষকদের কোনো ঘাটতি না থাকায়। ভারতীয় জনগণের জ্ঞানচর্চার প্রতি ভালবাসা দেখে হিউয়েন সাঙ স্তম্ভিত হয়ে যান।[১৮৭] বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা যে এতটা উচ্চ মার্গে পৌঁছে গিয়েছিল, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কেননা আলবেরুনি ও আন্দালুসিসহ অনেক মুসলিম ঐতিহাসিকও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সিন্ধু উপত্যকায় আলেক্সান্ডারের আগমণের ফলে ভারত প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার সান্নিধ্যে চলে আসে। ভারত এর ফলে গ্রিক সভ্যতার অর্জনসমূহ আত্মীকরণ করতে সমর্থ হয়, বিশেষত কলা বিদ্যায়। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাওয়ার ফলে ইসলামের জন্মকালে ভারত বিজ্ঞান, জ্ঞানচর্চা ও অন্যান্য মানবিক প্রচেষ্টায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। উল্লেখ্য করা হয়েছে যে আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিকে অনেক আরব ছাত্র তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো শিক্ষা লাভের জন্য। খলিফা হারুন-উর-রশিদ (মৃত্যু ৮১৩) তার রাজপ্রাসাদে অনেক ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও চিকিৎসককে নিয়োগ করেছিলেন; ভারতীয় চিকিৎসকরা বাগদাদে মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিল।[১৮৮]

এমনকি নেহরু, যিনি ইসলাম সম্পর্কে সর্বদা ভাল কথা বলতে উৎসাহী, তিনিও অভিযোগ করেন যে, দীর্ঘ আট'শ বছরের শাসনকালে মুসলিম শাসকরা একটি ভাল কলেজও প্রতিষ্ঠা করেনি। তারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যাপারে কোনোই আগ্রহ দেখায়নি, বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে। এমনকি বিজ্ঞ সম্রাট মহান আকবর, যিনি ছিলেন অশিক্ষিত বা নিরক্ষর, তিনিও বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রসারে বড় কোনো উদ্যোগ নেননি। তিনি কেবল তার নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, যার কোন বাস্তব মূল্য ছিলনা। ইউরোপে যখন অভাবনীয় সব ঘটনা ঘটছিল, সে সময় মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে ভারতীয় ভাষা ও হিন্দু ধর্মশিক্ষা যুক্ত করা ছাড়া আকবর বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য সৃজনশীল জ্ঞানচর্চা এগিয়ে নিতে বড় কোনো স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন নি। নেহরু লিখেছেন: আকবর তার প্রজাদের করের বোঝা লাঘব এবং সহনশীলতা প্রনয়ণ করলেও '*তার মন সাধারণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের স্তর উন্নীত করার দিকে পরিচালিত হয়নি।*'[১৮৯] তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ও সর্ববৃহৎ শক্তিধর আসনে অধিষ্ঠিত আকবর পর্তুগিজ ও ব্রিটিশ বণিকদের নিকট থেকে উপহার স্বরূপ ঘড়ি গ্রহণ করেন; তার দরবারের পর্তুগীজ জেসুইট খ্রীস্টানদের কাছ থেকে ছাপানো বই গ্রহণ করেন। কিন্তু কিভাবে এসব প্রযুক্তি কাজ করে, সে প্রশ্ন তার মনকে কখনো নাড়া দেয়নি। আকবরসহ মুসলিম শাসকরা তাদের অসার দাম্ভিকতা ও বিশালত্বের স্মারক হিসেবে কেবল বিপুল ব্যয়বহুল স্মৃতিস্তম্ভ, নগরদুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণে ব্যস্ত থেকেছেন, যেগুলো রেনেসাঁ যুগীয় ইউরোপকেও হার মানাতো। সুতরাং এতে আশ্চর্যের হবার কিছু নেই যে, অতীতে ভারত একটি সৃজনশীল ও জ্ঞান-গরিমায় অগ্রগামী সভ্যতা হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম শাসনামলে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনোই অবদান রাখতে পারেনি।

শ্রেণী বা বর্ণ প্রথার অবনতি

ভারতে ইসলামের অবদান সম্বন্ধে মুসলিমরা জোরের সাথে যে দাবিটি করে থাকে তা হলো: ইসলাম এদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতা এনেছে। ইসলামে সকল মানুষ সমান, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নাই, নেই উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণ। মুসলিমরা দাবি করে: এরূপ উদারতা ও সমতা দেখেই ভারতে বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অত্যুৎসাহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা তাদেরকে হিন্দু সমাজের নিপীড়িত ও জঘন্য জীবন থেকে রক্ষা করে।

নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরের বিষয়টি ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মান্তর মুসলিম সমাজে ওসব নিম্নবর্ণের লোকদের সামাজিক মান আদৌ উন্নীত করেনি। ইউরোপীয়দের অনুসরণে ফজলে রাব্বী হলেন প্রথম মুসলিম, যিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান যে, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অথচ তিনিই লিখেছেন যে, ধর্মান্তর তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদার পরিবর্তন ঘটায়নি; এরপরও তারা কেবলই সমমর্যাদার মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করতে পারতো।[১৯০] একইভাবে আশরাফ ইসলামকে দেখেন '*সমতা ও ভ্রাতৃত্বের*' ধর্মরূপে এবং মনে করেন তা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সমাজে উচ্চতর স্থানে উন্নীত হওয়ার পথ খুলে দিয়েছিল। অথচ তিনিই অনেক প্রধানত ইসলামি সূত্রের ভিত্তিতে লিখেন: '*ইসলামে এ ধর্মান্তর কোনো পরিবর্তন আনেনি গড়াপড়তা মুসলিমদের পুরনো পরিবেশে, যা*

---

১৮৫. Ibid, p. 22
১৮৬. Ibid, p. 29
১৮৭. Ibid, p. 124
১৮৮. Nehru (1989), p. 154,151
১৮৯. Ibid, p. 313
১৯০. Rabbi KF (1895) *The Origins of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, p. 60-61

গভীরভাবে বর্ণ-বিভেদ ও সাধারণ সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।’[১৯১] ড. উয়াইজ বাংলায় দেখতে পান যে, হিন্দুসমাজ বা বর্ণবহির্ভূত কিছু বেদে গোষ্ঠি প্রায় ৩০ বছর আগে (১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ) ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম জীবন চর্চা করে আসছিল, ‘*কিন্তু তারা সরকারি মসজিদে ঢুকতে পারে না কিংবা সরকারি কবরস্থানে মৃতের দাফনের অনুমতি পায় না। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এখনো বিচ্ছিন্ন, যাদের সাথে কোন ভদ্রলোক মেলামেশা বা খাওয়া-দাওয়া করে না। চণ্ডালদের প্রতি শূদ্রদের আচরণ উচ্চবর্ণের মুসলিমদের বেদেদের প্রতি আচরণের চেয়ে কোন অংশেই কম কঠোর নয়।*’[১৯২]

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলিম সম্প্রদায়ে অন্তর্ভূক্তির পর সামাজিকভাবে একই পর্যায়ে থেকে যায়; এমনকি আজও সামাজিকভাবে তারা জাতিহীন একটি অমর্যাদাশীল গোত্র। তারা তাদের হিন্দু প্রতিপক্ষের চেয়ে কোনো অংশেই ভাল অবস্থায় নেই, বরং অনেকটা খারাপ অবস্থায়। ইসলামে ধর্মান্তর সামগ্রিকভাবে তাদের বর্ণগত দুর্ভোগ উপশম করেনি; বরং ঘটিয়েছে তাদের সামগ্রিক অবস্থার অবনতি, কেননা উচ্চবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিতসহ বর্তমান ভারতের মুসলিমরা অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে হিন্দুদের তুলনায়। তারা নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মানবাধিকার লংঘনেও অধিকতর লিপ্ত হয়, যার মধ্যে রয়েছে নারী অধিকার দমন ও তথাকথিত মর্যাদা রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ড (অনার কিলিং)।

ইসলাম তো ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণের লোকদের সামাজিক ও বৈষয়িক কোনো উন্নতি সাধন করেইনি, বরং তা প্রকৃতপক্ষে ভারতে বর্ণপ্রথার সামগ্রিক অবনতি ঘটিয়েছিল। বর্ণপ্রথা, যদিও তা ঘৃণ্য, তবে সেটা ইসলামপূর্ব ভারতে একটা সামাজিক বাস্তবতা ছিল। তবে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ, যেমন কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ ও ‘নীতিশাস্ত্র’ ইত্যাদি ইঙ্গিত করে যে, এটা কোন বাঁধাধরা বা অপরিবর্তনীয় বিষয় ছিলনা। মধ্য-যুগীয় ভারতের সমাজ-কাঠামো সম্বন্ধে নেহেরু লিখেছেন: ‘*নীতিশাস্ত্রের ভাষ্য অনুযায়ী তা মেধা বা যোগ্যতার জন্য উন্মুক্ত ছিল... মাঝে মাঝে নিম্নবর্ণের লোকেরাও ভাল অবস্থানে পৌঁছে যেতো। শূদ্ররাও রাজা হতো বলে জানা যায়... আরো সচরাচর ঘটনা ছিল একটা গোটা উপগোত্রের সামাজিক স্তরে এক ধাপ উপরে উন্নীত হওয়ার পদ্ধতি।*’ কখনো কখনো উঁচু ও নীচ জাতির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হতো এবং ‘*প্রায়শঃ তারা যৌথভাবে রাজ্যশাসন করেছে ও একে অপরকে মেনে নিয়েছে,*’ লিখেছেন নেহেরু।[১৯৩] তথাপি বাস্তবতা প্রধানত ছিল এরূপ: শীর্ষস্থানীয় দুই শ্রেণী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই শাসন করতো; অন্যেরা খেটে মরতো। এ প্রেক্ষাপটে ভারতে ইসলামের আগমণ, বলেন নেহেরু, ‘*তার শ্রেণী প্রথা, যাতে তখনো পর্যন্ত ছিল নমনীয়তার উপাদান, তা অধিক অনমনীয় ও স্থির করে তোলে।*’[১৯৪]

বিপুল সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুকে নিচের স্তরে নামিয়ে দিয়েও ইসলাম ভারতবর্ষের শ্রেণী প্রথার অবনতি ঘটায়। সারা ভারতে মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অথবা ভয়াবহ করের দাবি মেটাতে না পেরো কর আদায়কারীদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে বিপন্ন হিন্দুদের জঙ্গলে পালিয়ে যাবার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। গিয়াস উদ্দিন বলবনের (বা উলুগ খান বলবন) শাসনামলে (১২৬৫-৮৫) লাখ লাখ হিন্দু – যাদের সহায়-সম্পদ ও বাড়িঘর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করা হয়েছিল এবং পরিবার-পরিজনদেরকে হত্যা করা বা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল – তারা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে রাত্রিকালীন ডাকাতিতে যোগ দিয়েছিল। বারানী লিখেছেন: সুলতান প্রথমে দিল্লি ও তার আশেপাশের জঙ্গলে ও পাহাড়ে পলাতক বিদ্রোহীদেরকে (মুয়াত্তি) নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার সেনাপ্রধানদের নির্দেশ দেন ‘*তাদের পুরুষদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করতে, জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলতে ও সকল বেআইনি কার্যক্রম দমন করতে।*’[১৯৫] বিদ্রোহীদের দমনের এ অভিযানে *এক লক্ষ রাজকীয় সেনা মুয়াত্তিদের হাতে নিহত হয় এবং বিপুল সংখ্যক ‘মুয়াত্তি’ সুলতানের সেনাদের তলোয়ারের খোরাক হয়।*’[১৯৬] অতঃপর সুলতান দিল্লি থেকে বের হন পার্শ্ববর্তী কাম্পিল ও পাট্টিয়ালীর উদ্দেশ্যে, যেখানে সুলতান মুয়াত্তিদেরকে তলোয়ারের ডগায় হত্যা করতে পাঁচ থেকে ছয় মাস সময় কাটান। তারপর সুলতান বাদাউন ও আমরোহা জেলার আশেপাশের দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী বিদ্রোহীদেরকে নির্মূলের উদ্দেশ্যে কাতেহারের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে ‘*বিদ্রোহীদের রক্তের নদী বয়ে যায়; প্রত্যেক জঙ্গলে ও গ্রামে পড়ে থাকে গাদা গাদা মৃতদেহ এবং মৃতদের গলিত লাশের দুর্গন্ধ গঙ্গার কুল পর্যন্ত পৌঁছে যায়,*’ লিখেছেন বারানি।[১৯৭]

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক (১৩২০-২৫) প্রবর্তন করেছিলেন এমন একটা শুল্ক প্রথা, যাতে করে হিন্দু কৃষকরা কেবলমাত্র নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে বেঁচে থাকতে পারে। তার উত্তরসূরী মোহাম্মদ তুঘলক (১৩২৫-৫১) সে করের বোঝা আরো ৫ থেকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করেন। এর ফলে কৃষকরা মারাত্মক দারিদ্র্যের শিকার হয়ে সুলতানের প্রতি তাদের আনুগত্য বর্জন করে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। ফলশ্রুতিতে কৃষিকর্ম স্বভাবতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ও শস্য উৎপাদন হ্রাস পায়। এতে দেশটি সর্বজনীন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এবং ‘*খাদ্যের অভাবে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে,*’ লিখেছেন বারানি।[১৯৮] ‘কারা-জাল’ পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণকৃত বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করতে তিনি সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে বিদ্রোহীরা সেনাদের পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ করে দেয়; ফলে সমগ্র বাহিনী ধ্বংস হয় সে একটিমাত্র আঘাতে; মাত্র

---

[১৯১] Ashraf KM (1935) *Life and Condition of the People of Hindustan (1220-1550 A. D.),* Jaurnal of Asiatic Society of Bengal, Letters, p. 191.

[১৯২] Wise J (1894) *The Muhammadans of Eastern Bengal*, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 63, 3:1, p. 61

[১৯৩] Nehru (1989), p. 132

[১৯৪] Ibid, p. 157

[১৯৫] Elliot and Dawson, Vol. III, p. 105

[১৯৬] Ibid, p. 104-05.

[১৯৭] Ibid, p. 105-106

[১৯৮] Ibid, p. 238

১০ জন বলিষ্ঠ ঘোরসওয়ার কোনক্রমে দিল্লিতে ফিরে যেতে পেরেছিল।[১৯৯] 'গুরুভার কর' ও নির্মম অভিযানে বিনাশকৃত দিল্লির পার্শ্ববর্তী দোয়াব অঞ্চলটির অতিষ্ঠ জনগণ দলে দলে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলে রাজ্যটি বিরান ধ্বংসস্তূপ হয়ে উঠে। এ অবস্থায় সুলতান জঙ্গলে পলাতক লোকদেরকে পশুপাখির মতো শিকার করতে অভিযান চালান: '*সমগ্র রাজ্যটি লুণ্ঠন ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় এবং নিহত হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন মস্তক এনে বারান দুর্গের সামনে ঝুলানো হয়,*' লিখেছেন বারানি।[২০০]

১৬১১ সালে ভারতে আগমনকারী ব্রিটিশ নীল ব্যবসায়ী উইলিয়াম ফিন্স জানান, সম্রাট জাহাঙ্গীর (মৃত্যু ১৬২৮) হাজার হাজার অনুগত সেনাকে নিয়ে প্রত্যেক বছর জঙ্গলে শিকারে বের হতেন এবং সেখানে মাসের পর মাস কাটাতেন। তিনি জঙ্গল কিংবা মরুভূমির বিশাল একটা অঞ্চল ঘেরাও করার নির্দেশ দিতেন এবং '*ঘেরাওকৃত চৌহদ্দির মধ্যে যা কিছু পড়তো, তা ছিল সম্রাটের 'শিকার'। তার অনুচররা এ পরিসীমার মধ্যে মানুষ বা পশু যাই পেত শিকার করে আনতো। একমাত্র সম্রাটের ক্ষমা ব্যতীত কারো জীবন রক্ষার উপায় ছিল না। শিকার করে আনা প্রাণীদের মধ্যে মানুষ থাকলে তার মাংস বিক্রি করে দেওয়া হতো (ক্রেতার অজান্তে) এবং সে অর্থ গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হতো।*'[২০১] স্পষ্টতঃই জাহাঙ্গীরের এ 'শিকার' খেলায় বিপুল সংখ্যক জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষ জীবন হারায়। এরপরও ১৬১৯-২০ সালে জীবিত ধরা পড়েছিল ২০০,০০০ মানুষ, যাদেরকে বিক্রির জন্য ইরানে প্রেরণ করা হয়েছিল।[২০২]

এমনকি উদার ও দয়াবান সম্রাট আকবরের শাসনামলেও বিপুল সংখ্যক হিন্দু জঙ্গলে বসবাস করছিল। 'আকবর নামা' মোতাবেক, তার রাজত্বকালের ২৭তম বছরে তিনি সেনাদেরকে আদেশ দেন যে, '*পাহাড়দূর্গ অধিকারী লোকেরা তাদের দুর্গম আশ্রয়স্থলের নিরাপত্তায় বিশ্বাস করে নির্বিঘ্নে লুণ্ঠন করতে থাকলে*', তাদেরকে প্রথমে সতর্কতা ও শাস্তি প্রদান করবে, এবং '*প্রয়োজন হলে তাদের আবাসকে বিনাশ করবে।*'[২০৩]

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হাজার হাজার, সম্ভবত লাখ লাখ, অমুসলিম স্বাভাবিক সামাজিক জীবন ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। সব শ্রেণীর ও ধর্মের এসব জঙ্গলবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করেছে এবং নাগালের মধ্যে যা কিছু পেয়েছে তাই খেয়ে জীবন বাঁচিয়েছে, যেমন বন্য ফলমূল, পাতা, শস্য ও প্রাণী। সার্বিকভাবে তারা সবাই একত্রে একটা নতুন অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হয়। তাদের পুনরায় সাধারণ সমাজে ফিরে যাওয়ার রাস্তা ছিল না; ফিরে আসতে চাইলেও তারা সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সমাজে তাদের অগ্রহণযোগ্যতার একটা প্রধান কারণ হয়ত ছিল ক্ষুধার তাড়নায় বন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ। একবার মাংস ভক্ষণ করলে তারা সমাজে, বিশেষত উঁচু শ্রেণীর সমাজে, ফিরে আসার যোগ্যতা হারায়। সুতরাং এর ফলে মুসলিম শাসনামলে নিম্নশ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

মুসলিমরা সম্ভবত নিম্নবর্ণ ও জাতিচ্যুতদের একটা অংশকে হিন্দু সমাজ থেকে বের করে আনে, কিন্তু সামাজিকভাবে তাদেরকে পূর্বাবস্থাতেই রেখে দেয়, যদিও এখন মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে। একই সময়ে মুসলিম শাসন বর্ণ-ব্যবস্থাকে করে তুলে অপরিবর্তনশীল ও দৃঢ়, এবং সেই সাথে বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে সামাজিক স্তরের সিঁড়িতে নিচের দিকে ঠেলে দেয়।

ইসলাম জওহর প্রথা সৃষ্টি করে

'জওহর' ছিল মুসলিম হানাদার ও হামলাকারীদের হাতে ধৃত হয়ে যৌন নিপীড়ন ও ক্রীতদাসীত্ব এড়াতে হিন্দু নারীদের স্বেচ্ছায় বিষপানে মৃত্যুবরণের একটি প্রথা। ইসলামপূর্ব যুগে ভারতে এ প্রথা ছিল অনুপস্থিত। ৬৩৪ সালে মুসলিম বাহিনী ভারত সীমান্ত আক্রমণ শুরু করার পর, তাদের সফল অভিযানগুলোতে সম্পদ লুণ্ঠন ছাড়াও নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাসরূপে কব্জা করে নিয়ে যেতে থাকে। মোহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত আক্রমণের পূর্বে মুসলিম লুণ্ঠনকারীরা আটবার লুণ্ঠন ও ক্রীতদাসকরণ অভিযান চালায় ভারত সীমান্তে; ৭১২ সালে সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে কাসিম নবির ঐতিহ্য মোতাবেক পরাজিতদের নারীদেরকে অপহরণ করে যৌনদাসীতে পরিণত করার প্রথাটি আনয়ন করে ভারতের মূল ভূখণ্ডে। সিন্ধুতে তিন বছর বিজয়াভিযান ও শাসনকালে কাসিম কয়েক লক্ষ নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস করেছিল। সুলতান মাহমুদ তার ১০০১-০২ সালের ভারত অভিযানে ৫০০,০০০ বন্দি নারী-শিশুকে ভারত থেকে নিয়ে যান; অন্যান্য অভিযানেও তিনি বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নাগরিককে বন্দি করে নিয়ে যান। কাসিম যখন সিন্ধু দখল করে, তখন বন্দিত্ব বরণ ও যৌন নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে রাজা দাহিরের প্রাসাদস্ত নারীরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন করে। উদার ও বিচক্ষণ বলে খ্যাত সম্রাট আকবরের সময়েও এ প্রবণতা অক্ষুণ্ন থাকে। চিতোর বিজয়ের সময় (১৫৬৮) আকবর যখন নিহত ৮,০০০ রাজপুত সেনার স্ত্রী-কন্যাদেরকে দাসীরূপে বন্দি করার নির্দেশ দেন,[২০৪] তখন প্রাসাদের প্রায় ৮,০০০ নারী মুসলিমদের হাতে অসম্মানিত হওয়া ও যৌনদাসীত্ব এড়াতে 'জওহর' (আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু) বরণ করে। চিতোরে এরূপ তিনটি জওহরের ঘটনা ঘটে: ১৩০৩ সালে আলাউদ্দিন খিলজীর চিতোর আক্রমণে, ১৫৩৫ সালে গুজরাটের বাহাদুর শাহর চিতোর আক্রমণে ও ১৫৬৮ সালে মহান আকবরের চিতোর আক্রমণে। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবস্থা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যখন বহু হিন্দু ও শিখ নারীরা সম্ভ্রম রক্ষার্থে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দিয়েছিল, অন্যেরা দিয়েছিল কুপে ঝাপ বা করেছিল বিষপান, এমনকি আপনজনের হাতে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১৯৯] Ibid, p. 241-42
[২০০] Ibid, p. 242
[২০১] Ibid, Vol. VI, p. 516
[২০২] Levi, p. 283-84
[২০৩] Elliot & Downson, Vol. VI, p. 64
[২০৪] Nizami KA (1989) *Akbar and Religion*, Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, New Delhi, p. 107,383-84

মুসলিম শাসনামলে সতীদাহ প্রথার অবনতি

ভারতে সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে একত্রে জীবিত পুড়িয়ে ফেলার প্রথা ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই চলে আসছিল। মুসলিম শাসন এ অমানবিক প্রথাকে নিষিদ্ধ বা দমন করার কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ইসলাম-ত্যাগী আকবর এ অমানবিক প্রথার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তা নির্মূল করার জন্য কোনো জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। আকবরনামা অনুযায়ী, তিনি কেবল কোনো নারীকে জোরপূর্বক জীবিত দাহ করাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন।[২০৫]

নিঃসন্দেহে ভারতে মুসলিম শাসনামলে 'সতীদাহ' প্রথার বরং আরো অবনতি ঘটেছিল। ইবনে বতুতা এটা একটা ঐচ্ছিক প্রথা ছিল বলে জানান। তিনি লিখেছেন: *'স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবিত স্ত্রীকে তার সাথে দাহ করা তাদের মাঝে প্রশংসার কাজ বলে গণ্য, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক ছিল না। নিজেকে পোড়াতে তাকে জবরদস্তি করা হতো না।'*[২০৬] যাহোক মুসলিম আক্রমণ ও শাসনকালে সতীদাহ প্রথার চর্চা আরো বেড়ে যায়। কারণ ভারত আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে মুসলিমরা চারিদিকে যুদ্ধের যে আগুন ছড়িয়ে দেয়, তাতে তারা বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে হত্যা করে গর্বের কাজ হিসেবে। নিহতদের স্ত্রীরা, যারা ধৃত হয়ে ক্রীতদাসীত্ব বরণ থেকে বেঁচে যেতো, তারা সাধারণত সতীদাহ বরণ করে আত্মোৎসর্গ করতো। এ ব্যাপারে ইবনে বতুতা তার স্ব-চক্ষে দেখা প্রমাণ রেখে গেছেন এভাবে: *'একবার আমজারি শহরে (ধার'এর নিকটস্থ আমঝেরা) আমি তিনজন নারীকে দেখেছি, যাদের স্বামীরা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, এবং যারা নিজেদেরকে দাহ করতে সম্মত হয়েছিল। কীভাবে পোড়ানো বা দাহ করা হয়, তা দেখবার জন্য আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেখানে গিয়েছিলাম।'*[২০৭]

মুসলিম শাসনামলে সতীদাহ বেড়ে যাওয়ার আরো একটি কারণ রয়েছে। হিন্দু ধর্মাচার অনুযায়ী বিধবা বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। কাজেই যাদের স্বামী মারা যেতো তারা তখনো সুন্দরী ও যুবতী বয়সের হলে সাধারণত মুসলিমদের দ্বারা ধর্ষণ, অপহরণ বা ক্রীতদাসীকরণের লক্ষ্যবস্তু হতো। এটা বুঝতে হবে যে, মুসলিমদের দ্বারা হিন্দু নারীদেরকে অপহরণ করা ছিল সচরাচর ঘটনা, বহুক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রি করার জন্য। মালাবর কখনোই মুসলিমদের দ্বারা অধিকৃত হয়নি, এবং সেখানে মপলা মুসলিমের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তথাপি তারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুদেরকে, বিশেষত শিশুদেরকে, অপহরণ করে ইউরোপীয় বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিতো প্রধানত ডাচদের বন্দর কোচিনে।[২০৮] এ মুসলিম-সৃষ্ট বাস্তবতাটি নিঃসন্দেহে বিপুল সংখ্যক বিধবাকে সতীদাহ গ্রহণে বাধ্য করেছিল বা সেটা গ্রহণের জন্য সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেছিল।

ইসলাম বাল্য বিবাহ জোরদার করে

ধর্ষণ ও যৌনদাসী বানানোর জন্য মুসলিমরা হিন্দু নারীদেরকে অপহরণ ও ক্রীতদাসীকরণে লিপ্ত হতো, যা হিন্দুদেরকে তাদের মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিতে উৎসাহিত করে। মুসলিম শাসনে এটা অবশ্যই ভারতে বাল্য বিবাহ প্রথার আরো অবনতি ঘটিয়েছিল। 'কাস্ট অ্যান্ড আউট কাস্ট' গ্রন্থের লেখক ধ্যান গোপাল মুখার্জি দাবি করেন যে, ভারতে অত্যাচারী মুসলিম শাসন হিন্দুদেরকে তাদের কিছু কিছু স্বভাবজাত ভাল ঐতিহ্যকে পরিত্যাগে বাধ্য করে। তার মতে, সাবালিকা হওয়ার আগেই মেয়েদেরকে তরুণ বয়সের বালকদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হতো, যাতে তারা মুসলিম শিকারীদের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। অতএব ভারতে মুসলিম শাসন বাল্যবিবাহকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা অনেক প্রয়াস খাটিয়ে এ ক্ষতিকর প্রথাটি দমন করে।

আজও পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু (ও অন্যান্য অমুসলিম) নারীদের জন্য এটা বাস্তবতা হয়ে রয়েছে, সেখানে তাদের মুসলিম-কর্তৃক উচ্চ হারে অপহরণ ও ধর্ষণ হওয়ার কারণে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণের বিষয়টি ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশে আমার পরিচিত কিছু ধর্মনিরপেক্ষ মনের হিন্দু ও মুসলিম জানান: হিন্দু মেয়েদেরকে, বিশেষত সুন্দরী হলে, অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় অথবা ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলিমদের কবল থেকে রক্ষার করার জন্য। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সংক্রান্ত সংস্থা অনুযায়ী, ২০০৫ সালে প্রায় ৫০ জন হিন্দু ও ২০ জন খ্রিষ্টান বালিকা অপহৃত হয়, যাদের অধিকাংশকেই জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। অমুসলিম বালিকাদেরকে অপহরণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরের পর মুসলিমদের সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার অনুরূপ ঘটনা নিয়মিত ঘটে চলছে ফিলিস্তিন, মিশর প্রভৃতি মুসলিম দেশে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, বিদেশী সরকার, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এবং মানবাধিকার সংস্থাসমূহ যদি মুসলিম সরকারগুলোর উপর মানবাধিকার রক্ষার জন্য চাপ অব্যাহত না রাখতো, তাহলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিম নারীদের ভাগ্য বর্তমানের তুলনায় আরো ভিন্ন হতো। আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রে (সৌদি, সুদান ইত্যাদি) অমুসলিম নারীদের উপর দাসীবৃত্তি ও যৌন-নির্যাতন এখনো জোরের সাথেই বহাল রয়েছে (পরবর্তী অধ্যায় দেখুন)।

ইসলাম ভয়ঙ্কর 'ঠগী' ধর্মগোষ্ঠীর জন্ম দেয়

---

[২০৫] Elliot & Downson, Vol. VI, p. 68-69
[২০৬] Gibb, p. 191-2
[২০৭] Ibid, p. 192
[২০৮] Clarence-Smith WG (2006) *Islam and the Abolition of Slavery*, Oxford University Press, New York, p. 30

ঠগীরা ছিল হিন্দুদেবী ‘কালী’র পুজারী এক ধর্ম সম্প্রদায়। ১৮৩০-এর দশকে ব্রিটিশরা এদের নির্মূল করে। তারা সাধারণত রাত্রিকালে ডাকাতি করতো এবং পথিক বা ভ্রমণকারীদের সবকিছু লুণ্ঠন করে গলাটিপে মেরে ফেলতো। রাত্রি নেমে এলেই তারা ভারতের পথে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক ও অরাজকতা সৃষ্টি করতো। তারা এভাবে সারা ভারতে হাজার হাজার, সম্ভবত লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করে। ব্রিটিশরা চিহ্নিত দস্যুদের ধরে ধরে হত্যা, গুপ্ত অভিযান, অলক্ষ্যে অনুপ্রবেশ, শক্ত পুলিশি তৎপরতা ও আত্মসমর্পণকৃত ঠগীদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদের সহযোগিতা আদায়ের মাধ্যমে ঠগী সম্প্রদায়কে নির্মূল করে।[২০৯]

‘ঠগ’ (ঠগী) নামটির প্রথম খোঁজ পাওয়া যায় জিয়াউদ্দিন বারানীর ‘তাহরিক-ই-ফিরোজশাহী’ গ্রন্থে। বারানী লিখেছেন, সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ শাহ খিলজীর শাসনামলে (১২৯০-৯৬) সুলতান ঠগী সম্প্রদায়ের এক সদস্যকে বন্ধুভাবাপন্ন করে তার খবরের ভিত্তিতে এক হাজার ঠগীকে আটক করেছিলেন। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে লক্ষ্মৌতিতে নির্বাসিত করেন।[২১০] মুসলিম লুণ্ঠনকারীরা ভারতীয় জনগণের উপর আক্রমণ শুরু করার প্রথম পর্যায় থেকেই ঠগী প্রকৃতির দলের উদ্ভব ঘটতে থাকে বলে মনে হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম শাসনামলে হাজার হাজার, লাখ লাখ হিন্দুকে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল ও দুঃসাহসী গুণ্ডা প্রকৃতির ব্যক্তিরা রাজপথে গমনরত গাড়িবহর ও ভ্রমণকারীদের উপর হামলার মাধ্যমে ডাকাতির পেশা গ্রহণ করেছিল। মধ্যযুগের অধিকাংশ ইসলামি ঐতিহাসিক দলিল দুর্ভাগা মানুষদের গহীন বন ও পাহাড়ের গোপন আশ্রয়ে আশ্রয় নেয়ার কথা উল্লেখ করেছে, যাদের কেউ কেউ সড়কপথে ডাকাতিতে লিপ্ত হতো। তাদের সম্পদ লুণ্ঠন ও বাড়িঘর পুড়িয়ে ভস্মিভূত করলে এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কেড়ে নিয়ে গেলে তারা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। এ ছাড়াও অসহনীয় করের বোঝা বহনে অক্ষম সর্বহারাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারা বাধ্য হয় ডাকাতির পেশা গ্রহণ করতে। মুসলিম ইতিহাসবিদ ও শাসকরা এসব লোকদেরকে জঘন্য ‘রাজপথের ডাকাত’ বলে আখ্যায়িত করেছে। এ বেপরোয়া পেশাকে জোরদার করতে এক পর্যায়ে তারা সম্ভবত এর সাথে ধর্মীয় চেতনা-মিশ্রিত করে। মাঝে মাঝে তারা একজন আধ্যাত্মিক হিন্দু ঋষির অধীনে সমবেত হতো।

ইবনে বতুতা জানান, কিছু আরব, কিছু পার্শিয়ান ও তুর্কীদের সমন্বয়ে গঠিত তাদের ২২ ঘোরসওয়ারের বহরটি দুর্ভেদ্য মুলতান পাহাড় থেকে নেমে আসা দুই ঘোরসওয়ারসহ একদল হিন্দু বিদ্রোহী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। ‘‘*আমার সঙ্গীরা ছিল খুবই সাহসী ও সামর্থ্যবান ছিল। আমরা তাদের সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে একজন ঘোরসওয়ারসহ ১২ জনকে হত্যা করে তাদের মস্তক আবু বাখার-এর প্রাসাদে নিয়ে যাই। এ ঘটনায় আমিও তীরবিদ্ধ হয়েছিলাম,*’’ লিখেছেন বতুতা।[২১১] যদিও বতুতা তাদের স্থানীয় নাম সম্পর্কে পরিচিত ছিল না, তবু এটা স্পষ্টতঃই ঠগীদের কাজ ছিল। ১৬১৯-২০ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের জঙ্গলে আশ্রিত দুই লাখ বিদ্রোহীকে আটক করার কথা ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। এসব বিদ্রোহীদের অনেকেই নিশ্চয়ই ঠগীদের পেশায় লিপ্ত ছিল। ১৬১২ থেকে ১৬১৪ সালে ভারত ভ্রমণকারী নিকোলাস উইথিংটন জাহাঙ্গীরের ধনসম্পদের দ্বারা চোখ-ঝলকানী খেলেও সাধারণ জনগণের মাঝে দেখতে পান প্রচণ্ড দারিদ্র্য এবং বাঁচার তাগিদে অনেকে ডাকাতিতে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার দলটি এ রকম একটা ডাকাত দলের হাতে পড়ে। স্পষ্টতঃই তারা ছিল ঠগী। ডাকাতরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ সবই লুট করে নেয়। আর. সি. প্রসাদ বলেনঃ উইদিংটন ভারতীয় ঠগীদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যখন ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষমতার সুদিন।[২১২]

ঠগী সম্প্রদায় অবশ্যই ছিল মুসলিমদের সৃষ্ট, যা ব্রিটিশদের প্রচেষ্টায় দ্রুত নির্মূল হয়। ৬২৯ সালে আরবাঞ্চলে ইসলামের জন্মকালে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে চীন থেকে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন নালন্দায়। ভারতের সাধারণ জনগণ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেনঃ “*আর্থিক ক্ষেত্রে তাদের কোন ছল-চাতুরী নেই এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তারা সুবিবেচক... আচরণে তারা প্রতারক বা বিশ্বাসঘাতক নয় এবং শপথ ও অঙ্গীকারে তারা খুব বিশ্বস্ত... অপরাধের বেলায় সেগুলোর সংখ্যা খুবই কম, যা সামান্যই সমস্যা সৃষ্টি করে।*”[২১৩] মুসলিম হামলাকারীরা শান্তি প্রিয় ও অতি উচ্চতর নীতিবান এ জনগণকে দলে দলে জঙ্গলে ঠেলে দিয়েছিল। ভারতের রাস্তায় রাস্তায় রাত্রিবেলা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ডাকাতি গ্রহণ করা ছাড়া জীবন ধারণের কোনোই উপায় ছিল না তাদের।

ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে ইসলাম যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, এগুলো তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। অন্য দৃষ্টান্তে, যেমন হিউয়েন সাঙ ভারতে ছেলে-মেয়েদেরকে পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখেছিলেন। অংকশাস্ত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠ অর্জন ছিলো ‘দশমিক’ পদ্ধতি, যা আজও আমরা অপরিহার্যরূপে ব্যবহার করছি। ভারতের অংকশাস্ত্রে এ উৎকর্ষের তিন অগ্রপথিক ছিলেন ভাস্করাচার্য, লীলাবতী ও ব্রহ্মগুপ্ত। লীলাবতী ছিলেন মহিলা ও ভাস্করাচার্যের কন্যা।[২১৪] ভেনিসের মার্কো পোলো দু’বার (১২৮৮ ও ১২৯৩ সাল) দক্ষিণ ভারত সফর করেন। সেখানে তিনি রুদ্রমনি দেবী নামে এক স্বনামধন্যা নারীকে দেখতে পান, যিনি ছিলেন তৎকালীন তেলেগু রাজ্যের শাসক। তিনি চল্লিশ বছর রাজ্য শাসন করেছিলেন।[২১৫] অথচ ব্যাপক ক্রীতদাসকরণ, অপহরণ ও ধর্ষণে লিপ্ত মুসলিম হানাদাররা ভারতীয় নারীদেরকে

[২০৯] Thugee, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Thugee.
[২১০] Elliot & Dowson, Vol. III, p. 141
[২১১] Gibb, p. 190-91
[২১২] Prasad RC (1980) *Early Travels in India*, Motilal Banarsidass, New Delhi, p. 261-66
[২১৩] Nehru (1989), p. 123-24
[২১৪] Ibid, p. 132
[২১৫] Ibid, p. 210-11

সামাজিক জীবন থেকে সরিয়ে ঘরের ভিতর আবদ্ধ করে। নেহরু লিখেছেন: ভারতে ইসলামের আগমন '*নারীদের স্বাধীনতা খর্ব করে*', কেননা মুসলিমদের প্রভাবে হিন্দুরাও তাদের নারীদেরকে পর্দার আড়ালে নিয়ে যায়।[২১৬]

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকালে ভারতীয় সভ্যতার সৃজনশীলতা স্তিমিত হয়ে পড়ছিল, যা ঘটতো যে কোন সভ্যতার ক্ষেত্রেই। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার নয়ন-ঝলসানো ঔজ্জ্বল্যও বেশিদিন টিকেনি। '*ভারতও একটা নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। এটা পরিবর্তনহীন ও অপ্রগতিশীল হয়ে পড়ছিল,*' লিখেছেন নেহরু।[২১৭] এ প্রেক্ষাপটে সুলতান মাহমুদের নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত আক্রমণের মাধ্যমে ভারত আগত ইসলামের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে নেহরু লিখেছেন: '*ইসলাম ভারতকে আলোড়িত করে তোলে। এটা প্রগতিশীলতার একটা আবেগ ও জীবনীশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটায় এমন একটা সমাজে, যা পুরোপুরি অপ্রগতিশীল হয়ে পড়ছিল। হিন্দু শিল্পকলা, যা হয়ে পড়ছিল অধঃপতিত ও অসার এবং পুনরাবৃত্তির ভারে ন্যুব্জ, তা উত্তর ভারতে পরিবর্তনের পথ ধরে। একটা নতুন শিল্পের উদ্ভব হয়, যাকে বলা যেতে পারে ইন্দো-মুসলিম, যা ছিল শক্তি ও জীবনীশক্তিতে পূর্ণ। ভারতে প্রাচীন ধাঁচের নির্মাতারা মুসলিমদের আনা নতুন ধারণা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে।*'[২১৮]

ইসলাম ভারতে একটা সভ্যতা-পরিবর্তনকারী জীবনীশক্তি এনেছিল বলে নেহরুর দাবি অতিশয়োক্তিমূলক, যদি না হয় ভিত্তিহীন। আমরা উল্লেখযোগ্য এমন কিছুই দেখি না। সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী আলবেরুনি এ ব্যাপারে নেহরুর বিপরীত অভিমত রেখে গেছেন, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। নেহরু নিজেই বলেন যে, মুসলিম আক্রমণকারীরা তাদের ধর্মের প্রতীকের সাথে সাযুজ্য রেখে যা নির্মাণ করতে আদেশ দিয়েছেন, হিন্দু 'মাস্টারবিল্ডার' বা প্রধান নির্মাণ শিল্পীরা সে মোতাবেক তাদের নিজস্ব মেধা ও বুদ্ধি খাটিয়ে তা নির্মাণ করে দিতো। তদুপরি সেসব বিষয় ও ধারণার অনেকই মুসলিমরা ইসলামপূর্ব পারস্য, মিশরীয় ও বাইজেন্টিয়াম সভ্যতা থেকে দখল বা গ্রহণ করেছিল। অন্যত্র নেহরু নিজেই বলেন যে, বিশালাকৃতির মসজিদ নির্মাণ করার জন্য সুলতান মাহমুদ বিপুল সংখ্যক ভারতীয় স্থপতি ও নির্মাণ শিল্পীকে বন্দি করে গজনীতে নিয়ে যান।[২১৯] স্পষ্টতই মুসলিম আক্রমণকারীরা যা চাইতো, তা কিভাবে গড়তে হয় সেটা জানতো না। নিঃসন্দেহে তারা ভারতীয় মেধা, ভারতীয় শ্রম (হতভাগ্য দাসশ্রমিকদের) এবং ভারতীয় সম্পদ (লাগামহীন লুণ্ঠন ও অসহনীয় করের মাধ্যমে অর্জিত) উদারহস্তে এসব অবান্তর, অকেজো ও মুর্খামিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের পিছনে ঢেলেছিল, যা ভারতীয় জনগণের জন্য কোনো কাজেরই ছিল না। বরঞ্চ এসব প্রতিষ্ঠান যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ ভারতীয়দের উপর উৎপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণের এক একটা শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে কাজ করে।

ভারতীয় সভ্যতা স্থবির ও অচল হয়ে পড়ছিল – এ ব্যাপারে সম্ভবত নেহরু সঠিক। এটা কাউকে এ ধারণা দিতে পারে যে, ভারতীয় সভ্যতা ক্রমশ অস্পষ্ট ও অধপতিত হয়ে পড়েছিল, যার কারণে মুসলিম দখলদাররা আসার সাথে সাথে সহজেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও নানা সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কীভাবে পুনঃযৌবন লাভ ও অগ্রগতি সাধন করা যায়, তা সে ভুলে গিয়েছিল। এমনটি ভাবার কোনো ভিত্তি নেই। মুসলিম আক্রমণকারীদের চাহিদা অনুযায়ী ভারতীয় নির্মাণ শিল্পী, কারিগর ও অঙ্কন শিল্পীরা তথাকথিত ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরূপে জমকালো সব ইমারত ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলো। স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো প্রগতিশীল ধারণা নিয়ে ব্রিটিশরা এদেশে আসার পরপরই অমুসলিম ভারতীয়রা অতি দ্রুত সেগুলোকে মুক্ত হস্তে আলিঙ্গন করে, যা প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতার একটা প্রতীক হয়ে রয়েছে। নৈপুল লিখেছেন: '*হিন্দুরা, বিশেষত বাংলায়, ব্রিটিশদের আনা ইউরোপের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ও জ্ঞানচর্চাকে স্বাগত জানায়। মুসলিমরা তাদের পুরনো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা কাটিয়ে উঠতে না পেরে এক পাশে সরে দাঁড়ায়।*'[২২০]

ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে, মুসলিমরা বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে খুব কম উৎসাহ প্রদর্শন করেছে। ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিমরা আধুনিকতাকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করেছে এবং ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সাথে আদৌ জড়িত হয়নি। তারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চাকে অনৈসলামিক বিবেচনা করে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে। এর ফলশ্রুতিতে তারা স্বভাবতই পিছে পড়ে যায়; আর হিন্দুরা নতুন জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত হয়ে অগ্রগতির পথে ধাবিত হয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ পূর্ব বাংলায় দেশ বিভাগের আগে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার '*শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবই স্থাপিত হয়েছিল হিন্দুদের দ্বারা... এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শতকরা ৯০ ভাগই ছিল হিন্দু।*'[২২১]

১৮৫০ সালের দিকে ব্রিটিশরাজ ভারতের প্রায় সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, যদিও তা ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহি বিদ্রোহে কোনো কোনো অঞ্চলে কিছুটা ব্যাঘাতগ্রস্থ হয়। এ প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশরা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সংহতকরণে সক্রিয় হয় ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তির এ নতুন পরিবেশে অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিকাশ লাভ করে, যাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় কবি ও বিজ্ঞানীরা নোবেল পুরস্কার অর্জনের যোগ্যতা লাভ করে। ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বরা, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্র শেখর, হরগোবিন্দ খোরানা ও আব্দুস সালাম, এবং অন্যান্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান জগতের দীপ্তিমান ব্যক্তিত্ব, যেমন জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বোস, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও

---

২১৬. Ibid, p. 157,149
২১৭. Ibid, p. 208
২১৮. Ibid, p. 209
২১৯. Ibid, p. 155
২২০. Naipaul (1998), p. 247
২২১. Kamra, p. 3

আল্লামা ইকবাল প্রমুখ সবাই এ নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে বিকশিত হন, অনেকেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ভারতীয় সমাজের বিশিষ্ট সব ধর্মীয়, ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক সংস্কারকগণ – যেমন রাজা রামমোহন রায় (মৃত্যু ১৮৩৩), স্বামী বিবেকানন্দ (মৃত্যু ১৯০২) এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (মৃত্যু ১৮৯১) – এরাও ব্রিটিশ-লালিত সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ, সৃজনশীল বৃদ্ধিবৃত্তি ও মুক্তচিন্তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই দ্রুত বিকাশ লাভ করেন। এসব বিষয় স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে, ভারতের উচ্ছল ও সৃজনশীল সভ্যতা মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা নির্মমভাবে অবদমিত ও সকল প্রকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং তা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল প্রথম সুযোগেই বিকশিত হতে।

নিঃসন্দেহে ভারতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারে ব্রিটিশ উদ্যোগের ক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যেও কিছুটা বাঁধা ছিল, কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। সর্বোপরি হিন্দুরা শিঘ্রই উপলব্ধি করে যে, সতীদাহ প্রথা, মেয়ে-শিশু হত্যা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষেধ ও বর্ণপ্রথা, যা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছিল, তা তাদের সমাজের জন্য অগ্রহণযোগ্য এক একটা ব্যাধি। মুসলিম শাসকদের হাতে হাজার হাজার 'ঠগী' নিহত ও বন্দি হওয়া সত্ত্বেও আইন-কানুনহীন ঠগীরা সমগ্র মুসলিম শাসনকালব্যাপী লাগাতারভাবে ভারতের পথে-ঘাটে ঘুরে বেরিয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে তারা শীঘ্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, যুগ যুগ ধরে চলা নিষ্ঠুরতা বিদায় নিয়েছে। তদেরকে নির্মূল করতে নতুন শাসকরা সুসভ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর তারা দ্রুততার সাথে সুস্থ নাগরিক জীবনে ফিরে আসে। তুলনামূলক স্বল্প সময়ের ব্রিটিশ শাসন, যা বিভিন্ন অঞ্চলে ১০০ থেকে ১৯০ বছর স্থিতিশীল ছিল, সে সময়ের মধ্যে তারা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মাঝে তাদের সামাজিক অমর্যাদা ও অসম্মান সম্পর্কে উচ্চ মাত্রার সচেতনতা গড়ে তুলেছিল, যা ছিল মর্যাদাশীল মানুষ হিসেবে তাদের অপ্রাপ্য। এ সচেতনতা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, ১৯৪০'এর দশকে আম্বেদকারের নেতৃত্বে উচ্চ-বর্ণীয় হিন্দুমুক্ত একটি নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে তারা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।[২২২] ওসব সামাজিক ব্যাধির কিছু কিছু, যেমন মেয়ে-শিশু হত্যা, বাল্য বিবাহ ও বর্ণবৈষম্য ইত্যাদি, ভারতীয় সমাজে এখনো কিছু মাত্রায় রয়ে গেছে, তবে আইনগতভাবে তা নিষিদ্ধ। সকল ভারতীয়ের মধ্যে এটা একটা সর্বজনীন উপলব্ধি যে, এগুলো নৈতিকভাবে ভুল ও গ্রহণ-অযোগ্য। ভারতীয় সমাজ থেকে এগুলো দূরীভূত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ধর্মীয় জনসংখ্যার উপর ইসলামের প্রভাব: অতীত ও বর্তমান

মুসলিম শাসনামলে সন্ত্রাস, ক্রীতদাসকরণ ও জবরদস্তিমূলক অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিমদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরের কথা ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ না হলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের ধর্মগত জনসংখ্যার বিভাজন আজ যা দেখা যাচ্ছে, তার থেকে ভিন্নতর হতো। আফগানিস্তান, মিশর, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, ইয়েমেন, তুরস্ক ও সিরিয়ার মতো দেশগুলোতে, যেখানে ইউরোপীয় উপনিবেশীরা কখনোই রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিল না, থাকলেও স্বল্প সময়ের জন্য, সেসব দেশের মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক চিত্র লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট হবে। এটা বিবেচনা করতে হবে যে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনকালেও কয়েক মিলিয়ন শিখ ও হিন্দুকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল।

ভারতকে কার্যকরভাবে ইসলামিকরণ করতে মুসলিম শাসকদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে ফারনান্দ ব্রডেল বলেন: নিষ্ঠুর ও অর্থনৈতিকভাবে অসহনীয় ব্যবস্থা সত্ত্বেও '*ভারত কেবলমাত্র তার ধৈর্য, অতিমানবিক শক্তি ও **বিশাল আকৃতির** কারণে টিকে গেছে।*'[২২৩] প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হানাদাররা কখনোই বিশাল ভারতে একটা পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, যা বিস্তৃতভাবে ভারতের কার্যকর ইসলামিকরণ ব্যাহত করে। হিন্দু সভ্যতা টিকে থাকার কারণ হিসাবে শুধু হিন্দুদের ইসলামবিরোধী প্রতিরোধ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি তাদের ভালবাসাই এককভাবে কাজ করেনি। ভারতে ইসলামি সুলতানাত এমন একটা সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যখন বাগদাদের ইসলামের 'শক্তিকেন্দ্র' পতনোন্মুখ অবস্থায় এবং ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বাগদাদ, মিশর ও স্পেনের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর আসে মঙ্গোলরা, যারা মধ্য এশিয়া ও বাগদাদের মুসলিম ক্ষমতাকে নুড়ি-পাথরে পরিণত করে। ভারতের মুসলিম শাসকরাও বাগদাদ, মিশর ও সমরখন্দের খলিফাদের প্রতি শিথিল আনুগত্য প্রদর্শন করে কেন্দ্রীয় ইসলামি কর্তৃত্ব থেকে মোটামুটি স্বাধীন থাকে। মুসলিম হানাদারদের ভারতে আগমনের সময় একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ইসলামিক শক্তি না থাকায় বিশাল ভারতবর্ষে কার্যকরভাবে মুসলিম কর্তৃত্ব জাহির করা ব্যাহত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তান ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রদেশ ছিল। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ এটাকে স্থায়ী মুসলিম সার্বভৌমত্বের অধীনে নিয়ে আসে। আফগানিস্তানে অদ্যবধি সে মুসলিম কর্তৃত্ব বহাল রয়েছে। সেখানে খুব সহজেই মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যার পরিবর্তনের চিত্রটি যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে। পাকিস্তানেও একই চিত্র বিদ্যমান, যেখানে মুসলিম আক্রমণকারীরা প্রথম ইসলামি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে ও আজ পর্যন্ত ইসলাম শক্তিশালী অবস্থান বহাল রেখেছে। আর ১৯৯৮ সালের পাকিস্তানের লোকগণনায় জনসংখ্যার ৯৬.২৮ শতাংশ ছিল মুসলিম।

কেবলমাত্র সম্রাট আকবরের শাসামলে (১৫৫৬-১৬০৫) দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ (মালাবর, গোয়া ইত্যাদি) ব্যতিত ভারতের অধিকাংশ স্থানে একটা প্রকৃত মুসলিম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আকবর গ্রহণ করেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ নীতি; এমনকি তিনি অসফলভাবে হলেও চেষ্টা করেছেন ইসলামকে দূরীভূত করতে তার নিজের উদ্ভাবিত মিশ্র ধর্মের মাধ্যমে। তার রাজত্বকালে ইসলাম নিঃসন্দেহে অবনতিশীল অবস্থায় পতিত হয়েছিল। আকবরের নীতি তার পুত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭) ও নাতি শাহজাহান (১৬২৭-৫৮)-এর রাজত্বকালে ধীরে ধীরে বিপরীতমুখী

---

[২২২] Bandyopadhyay S (1998) *Changing Borders, Shifting Loyalties: Religion, Caste and the Partition of Bengal in 1947*, Asian Studies Institute, Victoria University of Wellington, New Zealand, p. 4-5.

[২২৩] Braudel, p. 232

হয়ে ইসলামিকরণের দিকে চলে যায়। মাত্র এক শতাব্দী পার না হতেই আওরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬৫৮-১৭০৭) ইসলামিকরণ পুরোদমে ফিরে আসে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তর ভারতের অধিকাংশ মুসলিমদের ধর্মান্তরে আওরঙ্গজেবের শাসনকালই ছিল বড় সহায়ক। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরপরই ব্রিটিশ বণিকরা ভারতে ক্ষমতা সংহত করতে শুরু করে। এর পরিণামে মুসলিমদের দ্বারা হিন্দুদের জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া ও ভারতে ইসলামের ক্রমান্বয়িক প্রসার থেমে যায়। এমনকি আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও সারা ভারতে অবিরাম বিদ্রোহ চলছিল। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম কর্তৃত্ব ভগ্নদশায় পতিত হয়। আওরঙ্গজেবের অর্ধশতাব্দীব্যাপী শাসনাধীনে ভারতের অধিকাংশ স্থানে কিছুটা কার্যকরভাবে ইসলামিকরণ, যা বিশেষত উত্তর ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার বর্তমান কাঠামো তৈরিতে প্রধান অবদান রেখেছিল। সুতরাং এটা সহজেই বোধগম্য হবে যে, ব্রিটিশরা মাঝপথে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ না করলে অব্যাহত মুসলিম শাসন এ উপমহাদেশের মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক চিত্র কতটা পরিবর্তিত করতো।

১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম শাসিত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে জনসংখ্যার ধর্মগত পরিবর্তন ধারণা দিবে যে, কীভাবে একটা বাঁধাহীন বা লাগাতার মুসলিম শাসন উপমহাদেশের সামগ্রিক ধর্মীয় জনসংখ্যার বন্টনে পরিবর্তন ঘটাতো। পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) দেশ ভাগের সময়কার ২৫-৩০ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা এখন হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ শতাংশে; পাকিস্তানে ভারত-ভাগের পর সেখানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল শতকরা ১০ ভাগ, আর ১৯৯৮ সালে তাদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় শতকরা ১.০৬ ভাগে। হ্রাসকৃতদের বিপুল একটা অংশকে হয় জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়, অথবা কাশ্মীরে পাকিস্তানের ব্যর্থতার কারণে ১৯৫০ সালের ও তার পরবর্তী সহিংসতায় বিতাড়িত করা হয়। আজকালও মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যায় যে পাকিস্তানে হিন্দু (খ্রিষ্টানও) মেয়েরা মুসলিমদের দ্বারা নিয়মিত অপহরণের শিকার হচ্ছে। অপহরণ করে মুসলিমরা তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে জোরপূর্বক গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলিম যুবকদের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু অধিকার সংগঠনের মতে, প্রতি বছর প্রায় ৬০০ হিন্দু, শিখ ও খ্রিষ্টানকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।[২২৪] হিন্দুদের উপর এরূপ ও সে সাথে অন্যান্য সামাজিক সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ তাদেরকে হয় ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে কিংবা ভারতে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করে। গত ছয় দশক ধরে এ বাস্তবতাই পাকিস্তানের ধর্মীয় জনসংখ্যা পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, যা উপরে আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসেও একই পরিস্থিতি দায়ী। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইসলামবাদী 'জামায়াত-ই-ইসলামি'র সাথে আঁতাত করে বিজয়ী ইসলামপন্থি 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল'। নির্বাচনের পরপরই বিজয়ী ইসলামপন্থি দল দুটি পরাজিত কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ 'আওয়ামী লীগ' দলকে সমর্থন করার অভিযোগে হিন্দুদের উপর মর্যাদাহানি, হয়রানি, ধর্ষণ ও খুনসহ নানারকম অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ডেইলি স্টার' পত্রিতার এক অনুসন্ধানী তথ্যে বলা হয় যে, একমাত্র ভোলা জেলাতেই ১,০০০ হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। হতভাগিনীদের মধ্যে '*আট বছরের রীতা রাণী ও সত্তর বছর বয়স্কা পারু বালা ছিল।*'[২২৫] এ নির্যাতন-নিপীড়নের ফলে ৫০০,০০০ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।[২২৬]

মুসলিম শাসন ও দারিদ্র্য

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, ভারতে ইসলামের প্রধান অবদান ছিল ভারতীয় অমুসলিমদেরকে ব্যাপক সংখ্যায় হত্যা, বিপুল সংখ্যক হিন্দু নারী ও শিশুকে ক্রীতদাসকরণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইকারী হারে ধ্বংস, অমুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মূল ও এর ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মারাত্মক অবনতি ঘটানো এবং প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে অমুসলিমদেরকে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত করণ। দিল্লিতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার মাত্র নয় দশক পর আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলের (১২৯৬-১৩১৬) প্রথম দিকে সমৃদ্ধ ভারতের হিন্দুদেরকে মুসলিমের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়েছে।

ব্রিটিশ দখল ভারতীয় অমুসলিম জনতার জন্য মুসলিম হানাদার ও শাসক কর্তৃক সংঘটিত আদিম বর্বরতা, ধ্বংসলীলা ও লুণ্ঠন থেকে কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের অর্থনৈতিক দুর্দশার কোনো উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটায়নি, যার লক্ষ্যই ছিল অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ কোষাগার স্ফীত করা। জেভিয়ার কুয়েঙ্গা এস্তেবান হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভারত থেকে ব্রিটেনে বার্ষিক অর্থ-স্থানান্তরের সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,১৪,০০০ পাউন্ড ১৭৮৪-১৭৯২ সালে, যা হ্রাস পেয়ে এসে দাঁড়ায় ৪৭৭,০০০ পাউন্ডে ১৮০৮-১৮১৫ সালে।[২২৭] ব্রিটিশরা মুসলিমদের মতো বাড়িঘর ও মন্দির প্রভৃতি লুণ্ঠন বা ধ্বংসযজ্ঞে জড়িত হয়নি। কিন্তু তারা ভারতের কৃষকদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করে। করের হার ছিল উঁচু মাত্রার, উৎপাদিত পণ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। আলাউদ্দিন খিলজির সময়েও কাগজে-কলমে একই হার ধার্য ছিল, কিন্তু তিনি বাস্তবে আদায় করতেন ৫০ শতাংশ। হিন্দুদের মধ্যে বিদ্রোহ ও আনুগত্যহীনতা রোধকল্পে কৃষকদেরকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত করতেই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করতেন। সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের আমলে করারোপ সবচেয়ে চরম পর্যায়ে

[২২৪] *Pakistani Christians asked to choose between 'conversion' or 'death'*, Christian Today, Australia, 11 Sept 2008; http://au. christiantoday.com/ article/pakistani/4282.htm

[২২৫] *Harrowing tales of depravity*, Daily Star, Dhaka, 10 November 2001.

[২২৬] Lundstrom J (2006) *Rape as Genocide under International Criminal Law, The Case of Bangladesh*, Global Human Rights Defense, Lund University, p. 29-30

[২২৭] Clingingsmith D & Williamson JG (2005) *India's Deindustrialization in the 18th and 19th Centuries*, Harvard University, p. 9

পৌঁছে যায় (১৩২৫-৫১), যা কৃষকদেরকে চরম দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তির সম্মুখীন করে। মুঘল শাসনামলে কোনো কোনো অঞ্চলে করের মাত্রা তিন চতুর্থাংশে পৌঁছে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ আমলে কর-আদায়কারী ভারতীয় জমিদাররা পরিস্থিতির আরো মারাত্মক অবনতি ঘটায়; কেননা নিজস্ব অংশ হিসেবে তারা আরো এক-তৃতীয়াংশ বেশি আদায় করতো। এটা ছিল অমানবিক; কেননা ব্রিটিশরা তাদের আদায়কৃত এক-তৃতীয়াংশ রাজস্বের একটা বড় অংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, অবকাঠামো নির্মাণ ও রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় ব্যয় করতো, কিন্তু জমিদাররা তাদের জন্য আদায়কৃত এক-তৃতীয়াংশের পুরোটাই নিজস্ব পকেটস্থ করতো। তবে জমিদারী প্রথা পরিচালনায় এ ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব অনেকাংশে ব্রিটিশদেরকেই নিতে হবে। এছাড়াও ব্রিটিশরা ব্রিটেনের উদীয়মান শিল্প-কারখানার কাঁচামাল যোগাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল, যেমন নীল, পাট, তুলা ও চা প্রভৃতি চাষ করার জন্য কৃষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করতো। এর ফলে স্থানীয়ভাবে ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। ব্রিটিশ বণিকরা ব্রিটেনে প্রস্তুত সস্তা শিল্পপণ্য এনে ভারতের বাজার ভরে দিয়েও দেশীয় প্রাচীন শিল্পগুলোর জন্য অবনতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা আরো বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দেরকে অভাবগ্রস্ত করে তোলে। তবে এটাও বিবেচনা করতে হবে যে, বিশ্ব অপরিবর্তনীয়ভাবে পুঁজিবাদী শিল্পায়নের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রাচীন শিল্পসমূহ শীঘ্রই ধ্বসে পড়তো।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রিটিশদের ভারত দখল হয়েছিল অনেক কম নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাতের মাধ্যমে। তথাপি তারাও নিষ্ঠুরতার অংশীদার ছিল, বিশেষত ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময়। সিপাহি বিদ্রোহে তাদের নিষ্ঠুরতা ছিল রক্তাক্ত, তবে উভয় পক্ষই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল। কানপুরে নানা সাহেব তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকমূলক কাজ করার পরই ব্রিটিশরা অধিক নির্মম হয়ে উঠে। ১৮৫৭ সালের ৫ই জুলাই প্রায় ২১০ জন ব্রিটিশ নারী ও শিশুকে নানা সাহেবের জিম্মায় রাখা হয় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিতে, কিন্তু তাদেরকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।[২২৮] লক্ষ্ণৌতেও বিদ্রোহীরা নিরীহ নিষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যা ও শ্বেতাঙ্গ নারীদেরকে ধর্ষণ করে। নিষ্পাপ-নিরীহ নারী ও শিশুদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা ব্রিটেনের জনগণকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। ব্রিটিশ সেনারা বিদ্রোহীদের উপর প্রতিশোধ নিতে অতি লজ্জাজনক ও অনানুপাতিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে। তবে মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকদের দ্বারা নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিক, বিশেষত নারী ও শিশুরা, যারা ছিল মুসলিমদের ক্রীতদাসকরণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু, তারা ব্রিটিশদের হাতে খুবই কম দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকালে ব্রিটিশ নিষ্ঠুরতা ছিল নেহাৎই সামান্য; জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ছিল প্রধান ঘটনা, যাতে মাত্র কয়েকশ লোক নিহত হয়েছিল।

ভারতে ইসলামি শাসন ব্রিটিশদের তুলনায় নিঃসন্দেহে ধ্বংসাত্মক ও পঙ্গুকারক ছিল। কিন্তু সমস্ত যুক্তিতর্ক অগ্রাহ্য করে উপমহাদেশের মুসলিম ও বহু বামপন্থি ও মার্ক্সবাদী অমুসলিমরাও ভারতে ইসলামের আবির্ভাবকে একটা বড় আশির্বাদ এবং ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ মনে করেন। তারা বলেন: ইসলাম নাকি সমতা, ন্যায়বিচার, মুক্তি, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল, যা নিয়ে ভারত গর্ব করতে পারে। ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত আরব সাম্রাজ্যবাদকে মহিমান্বিত করতে সম্মানিত মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক এম. এন. রায় 'আরব সাম্রাজ্য'কে মোহাম্মদের স্মরণে একটা জাঁকালো স্মৃতিস্মারক আখ্যায়িত করেছেন।

এ মার্ক্সবাদী মূল্যায়নের বিপরীতে এটা পরিষ্কার যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আরবদের বহির্বিশ্বের অধিকতর উন্নত সভ্যতাকে দেবার মত কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র কবিতা ছাড়া। ওদিকে কবিতাও ইসলামে নিষিদ্ধ। নেহরু, যিনি ইসলামের প্রশংসাকরণে নিজের কথারই বিরোধিতা করেছেন বারংবার, তিনিও এটা বলে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন যে: "*আফগানরা অগ্রগতির কোনো নতুন উপাদান আনেনি; তারা প্রতিনিধিত্ব করেছে একটা পশ্চাদমুখি সামন্ততান্ত্রিক ও গোত্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার।*"[২২৯]

নৈপুল এ মার্ক্সবাদী ধারণাটিকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন: হিন্দু সভ্যতা ইসলামি আক্রমণে 'সন্ত্রাস কবলিত', 'বিক্ষত' ও 'ধ্বংসপ্রাপ্ত' হয়। তিনি লিখেছেন: '*ভারতে ইসলামিক শাসন পরবর্তী খ্রিষ্টান (ব্রিটিশ) শাসনের মতই সর্বনাশা ছিল। খ্রিষ্টানরা একটা সমৃদ্ধিশালী দেশে ব্যাপক দারিদ্র্য সৃষ্টি করেছিল; মুসলিমরা একটা সর্বাধিক সৃজনশীল সংস্কৃতিকে একটা আতঙ্কিত সভ্যতায় পরিণত করেছিল।*'[২৩০]

নৈপুলের মতো নেহরুসহ বামপন্থি ও সমাজতন্ত্রী ইতিহাসবিদরা তাদের ইতিহাস লিখনে ব্রিটিশদের সৃষ্ট দারিদ্র্যের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরেন। সেটা খুব ভাল; কেননা এটা একটা তর্কাতীত সত্য। তবে তাদের লেখায় যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত, তা হলো ভারতে দারিদ্র্যের উপর ইসলামের প্রভাব। দারিদ্র্যের উপর ইসলামি শাসনের প্রভাব কী ছিল?

ভারতের সমৃদ্ধি দেখে মুসলিম হানাদার ও ইতিহাসবিদদের স্তম্ভিত ও হতবাক হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামপূর্ব ভারতের সমৃদ্ধি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ওয়াসাফ তার 'তাজ্জিয়াতুল আমসার' গ্রন্থে (১৩০০ খ্রি:) লিখেছেন: "*দেশটির চমৎকারিত্ব ও বাতাসের কোমলতা এবং তার সম্পদ যেমন মূল্যবান ধাতু, পাথর ও অন্যান্য প্রাচুর্যপূর্ণ উৎপাদন, বর্ণনারও অতীত।*" কাব্যিক ভাষায় তিনি লিখেন: "*যদি দাবি করা হয় যে স্বর্গ ভারতে অবস্থিত, তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ তার সাথে স্বর্গেরও তুলনা হয় না।*"[২৩১] একবার মোহাম্মদ বিন কাসিমের কাছ থেকে এক-পঞ্চমাংশ লুণ্ঠন দ্রব্য গ্রহণ করে হাজ্জাজ এতই বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তিনি '*ঈশ্বরের নিকট নতজানু হয়ে ধন্যবাদ ও*

---

[২২৮] Nehru (1989), p. 414; also *Indian Rebellion of 1857*, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Indian-Rebellion-of-1857
[২২৯] Nehru (1946), p. 261
[২৩০] Outlook India, *V.S. Naipual interview*, 15 November 1999
[২৩১] Elliot & Dawson, Vol. III, p. 29

প্রশংসা জ্ঞাপন করেন, কেননা তিনি বলেন, বাস্তবে তিনি বিশ্বের সকল সম্পদ, ধনরত্ন ও রাজত্ব পেয়ে গেছেন।'[২৩২] **১৩১১** সালে দক্ষিণ ভারত লুণ্ঠন করে ফিরে আসেন মালিক কাফুর। নেহরু জানান তার লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে ছিল '*৫০,০০০ মণ (১ মণ = ৩৭.৩ কেজি) স্বর্ণ, বিপুল পরিমাণ মনি-রত্ন-জহরত ও মুক্তা, ২০,০০০ ঘোড়া ও* **৩১২***টি হাতি।'*[২৩৩] বারানীর লিখেছেন:[২৩৪] মালিক কাফুরের লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, '*দিল্লির বৃদ্ধরা মন্তব্য করে যে, দিল্লিতে এত হাতী আর এত সোনাদানা এর আগে কখনো আনা হয়নি। কেউ এরকম কোনো ঘটনা স্মরণ করতে পারেনি, কিংবা এর মতো কোনো ঘটনা ইতিহাসে লেখাও হয়নি।'*[২৩৫]

ইসলামি হানাদাররা এমনই একটি সমৃদ্ধ দেশে এসে ভয়াবহ লুণ্ঠন, ধ্বংসযজ্ঞ ও শোষণ চালিয়ে জনগণকে চরম দুর্দশা ও দুর্ভোগে পতিত করে। আলাউদ্দিন খিলজী (মৃত্যু **১৩১৬**) কৃষকদেরকে এমনভাবে চুষেছিল যে, তাদেরকে শুধু বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পণ্য-সামগ্রী রেখে বাকি সবটুকু নানা রকম কর হিসেবে লুটে নিতো। আলাউদ্দিন ভারতীয় কৃষকদেরকে এমন দুর্দশায় পতিত করেন যে, মিশরের সুফি সাধক মৌলানা শামসুদ্দিন তুর্ক আনন্দের সঙ্গে লিখেন: '*হিন্দু নারী ও শিশুরা মুসলমানদের দুয়ারে ভিক্ষা করতে বের হয়েছে।'* এমন দুরবস্থার মধ্যে পড়ে অনেক কৃষক কর পরিশোধের তাগিদে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।[২৩৬] এরপর গিয়াস উদ্দিন তুগলকের আমলে শোষণ আরো বাড়ানো হয়, যেন '*হিন্দুদের কাছে এতটা সামান্য পণ্যদ্রব্য রাখা হবে যাতে তারা একদিকে সম্পদের কারণে অহংকারী ও বিদ্রোহী না হয়ে উঠে, অপরদিকে চরম দুর্দশায় খামার ছেড়ে চলে না যায়,'* লিখেছেন বারানি। পরবর্তী সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক কর আরো বাড়িয়ে দেন, যার ফলে কৃষকরা খামার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়; কিন্তু সুলতান জঙ্গল থেকে তাদেরকে বন্যপ্রাণীর মতো শিকার করে আনে। ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যে, মুঘল শাসনের গৌরবময় দিনগুলোতে দয়াশীল হৃদয়ের জাহাঙ্গীর **১৬১৯-২০** সালে দু'লক্ষ জঙ্গলবাসীকে শিকার করে ধরে আনেন। দয়ালু সম্রাট আকবরের শাসনকালে অসংখ্য হিন্দুর পাহাড়-জঙ্গলে জীবন কাটানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার অর্থ দাঁড়ায়: ইসলামের গৌরবময় মুঘল শাসনামলেও সাধারণ ভারতীয়দের মাঝে চরম দারিদ্র্য বিরাজ করছিল।

অমুসলিম কৃষক সম্প্রদায়ের উপর চরম শোষণ জাহাঙ্গীর ও তার পরবর্তী শাসন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, সম্ভবত আকবরের অধীনে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া ব্যতিত। মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক কৃষকদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে চরম দরিদ্রকরণের নীতি সম্পর্কে ফার্নান্দ ব্রডেল লিখেছেন: '*হিন্দুদেরকে যে কর প্রদান করতে হতো তা এতই অসহনীয় ছিল যে, একটা শোচনীয় ফসল উৎপাদনই যথেষ্ট ছিল এমন দুর্ভিক্ষ এবং মহামারি আনতে যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারতো। দিল্লিতে জমকালো প্রাসাদ নির্মাণ ও ভোজনোৎসবসহ বিজয়ীদের প্রাচুর্যের বিপরীতে বিরাজ করতো এমন হতাশাপূর্ণ অবিরাম দারিদ্র্য (সাধারণ জনগণের মাঝে)।'*[২৩৭] শাহজাহান (মৃ. ১৬৫৮) ও আওরঙ্গজেবের (মৃ. ১৭০৭) শাসনামলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ব্রডেল আরো বলেন যে, মুসলিম শাসকরা '*ভারতের সর্বজনীন দারিদ্র্যের উপর তাদের বিলাসিতা প্রতিষ্ঠিত করে'* এবং মুসলিম শাসনামলে ভারত '*ধারাবাহিকভাবে মহামারি ও অবিশ্বাস্য হারে মৃত্যুর'* অভিজ্ঞতায় জর্জরিত হয়।'[২৩৮]

উত্তরাধিকার

ইতিমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইসলাম-পূর্ব ঘৃণ্য 'জাহিলিয়া' ঐতিহ্য মুছে ফেলা মৌলিক ইসলামি মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামপূর্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যাবতীয় ভ্রান্ত ও অকেজো চিহ্ন ও অর্জনসমূহকে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব 'সত্যিকারের বিশ্বাসীদের' উপর ন্যস্ত। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর, লিখেছেন লুইস: '*অতি প্রাচীন ভাষাসমূহ: মিশরীয়, অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলোনীয়, হিট্যাইট, প্রাচীন ফারসি ও অন্যান্যগুলো পরিত্যাগ করা হয় এবং তা প্রাচ্য ইতিহাস পণ্ডিতদের দ্বারা খুঁজে খুঁজে বের করে পাঠোদ্ধার, বিশ্লেষণ ও পুনরুজ্জীবিত না করা পর্যন্ত অজ্ঞাত থেকে যায়... দীর্ঘদিন ধরে এটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের বাহিরের পন্ডিতদের একান্তই একচ্ছত্র প্রয়াস এবং আজও প্রধানত তেমনই রয়ে গেছে।'*[২৩৯] লুইসের সাথে একমত হয়ে ইবনে ওয়ারাক লিখেছেন: '*মিশরীয়, অ্যাসিরীয় ও ইরানী পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞানে একচ্ছত্র আগ্রহ দেখায় ইউরোপীয় ও আমেরিকার পণ্ডিতরা। মানবজাতির গৌরবময় অতীতের একটা বড় অংশ উদ্ধার করে মানবতার কাছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় সেসব উৎসর্গীকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদদের উপর।'*[২৪০]

যাহোক সম্প্রতি মৌলবাদী গোঁড়া মুসলিমরা তাদের নিজস্ব সভ্যতার উদ্ধারকৃত সেসব অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। উদাহরণস্বরূপ মিশরে তারা ইসলামপূর্ব যুগের পিরামিড ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্থাপত্যশিল্প-ভাণ্ডার ধ্বংস করার পথ খুঁজছে। আফগানিস্তানে ধর্মান্ধ তালিবানরা ইতিমধ্যেই ইসলামপূর্ব যুগে নির্মিত বামিয়ান বুদ্ধ মূর্তিটি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। গত তিন দশক ধরে ইরানের মৌলবাদী ইসলামি শাসকরা একটার পর একটা অজুহাত তুলে পদ্ধতিগতভাবে ইসলামপূর্ব যুগের বিখ্যাত সব ঐতিহাসিক পারস্য ঐতিহ্য মুছে ফেলছে। অতীত ঐতিহ্য ধ্বংসের এরূপ অভিযান দিন দিন শক্ত হচ্ছে, যা আগামী দশকগুলোতে নিঃসন্দেহে আরো বিস্তৃত ও জোরদার হবে।

---

২৩২. Sharma, p. 95
২৩৩. Nehru (1989), p. 213; also Ferishtah, Vol. I, p. 204
২৩৪. Barani puts the number of elephants at 612, the amount of gold at 96,000 maunds.
২৩৫. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 204
২৩৬. Lal (1994), p. 128-131
২৩৭. Braudel, p. 232
২৩৮. Ibid, p. 233-34
২৩৯. Lewis (2000), p. 245
২৪০. Ibn Warraq, p. 202

এটা অকাট্য সত্য যে, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মধ্যে পর্তুগিজ ও স্পেনীয়রা উপনিবেশিত জনগণের উপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছিল, যেমন দক্ষিণ আমেরিকায় ও ভারতে পর্তুগিজ-নিয়ন্ত্রিত গোয়ায়। কিন্তু মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসবিদ ও শাসকদের লিখিত দলিল বিবেচনায় আনলে দেখা যায় যে, মুসলিম হানাদাররাও তাদের উপনিবেশিত জনগণের উপর কোন অংশে কম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেনি। তারা ভারতে প্রায় ৮ কোটি স্থানীয় বাসিন্দাকে হত্যা করে, মধ্যপ্রাচ্যে ও মধ্য এশিয়াতে প্রায় সমসংখ্যক মানুষকে, আফ্রিকায় আরও বেশি সংখ্যক এবং ইউরোপেও আরো লোককে। উপনিবেশিত জনগণের উপর নিষ্ঠুরতার বিষয়টি বিবেচনা করলে স্পেনীয় ও পর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টতঃই নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ছিল না। অন্যান্য ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি অস্ট্রেলিয়ার মত ব্যতিক্রম ছাড়া, সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছে।

উপমহাদেশে ইউরোপীয় ও ইসলামি উপনিবেশিক শাসনের কী ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আজ অব্যাহত রয়েছে? ব্রিটিশ-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা, আইন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা, সড়কপথ, রেলপথ ও সেচব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও টেলিযোগাযোগ এবং সে সাথে সকল প্রকার সামাজিক ব্যাধি উচ্ছেদে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা আজকের ভারতে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু ইসলামি শাসনের ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ভারত কী লাভজনক বিষয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে? ভারতীয় মুসলিম বন্ধুরা আমাকে বলে যে, মুসলিমদের আগমনের পূর্বে ভারতে কিছুই ছিল না। তারা বলেঃ '*ইসলাম ভারতকে তাজমহল দিয়েছে, লাল-দুর্গ দিয়েছে।*' '*(ইসলাম) তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী সাম্রাজ্যের বাদশাহকে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সম্মানে তাজমহলের মতো স্মৃতিস্মারক নির্মাণের প্রেরণা দিয়েছিল,*' লিখেছেন ইরফান ইউসুফ।[২৪১] ইসলামপূর্ব ভারতের বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও স্থাপত্যকলার অবস্থান ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এটাও আলোচিত হয়েছে কীভাবে উপনিবেশিত জনগণের রক্ত শোষণ এবং তাদেরই মেধা ও শ্রমের দ্বারা তথাকথিত মহান ইসলামি অবদানমূলক কাজগুলো করা হয়েছিল, যা ছিল মূলত অসার দাম্ভিকতাপূর্ণ অপচয় মাত্র। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, সেসব বোকামিপূর্ণ কাজগুলোর ঐতিহ্য ছাড়াও ভারত আজ একটা মর্যাদাশীল জাতিরূপে পরিচিতি পাবে, কিন্তু ব্রিটিশ-রাজের ঐতিহ্য ছাড়া সেটা পাবে না। নৈপুল পাকিস্তানে ব্রিটিশ ও ইসলামি ঐতিহ্যের ভিন্নতার উপর লিখেছেনঃ

> মুঘলরা দুর্গ, প্রাসাদ, মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করে গেছে। ব্রিটিশরা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দালানকোঠা নির্মাণ করে। লাহোর উভয়ের শাসনামলেই স্মৃতিস্তম্ভে ভরা ছিল। অথচ এটা একটা নির্মম বাস্তবতা যে, যে দেশটি ইসলামকে নিয়ে এতটা মাতামাতি করে, এমনকি নিজেকে মুঘল-শক্তির উত্তরসূরী বলেও দাবি করে, সে দেশটিতে মুঘল স্মৃতিস্তম্ভগুলোই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছেঃ যেমন দুর্গ, শাহজাহানের মসজিদ, শালিমারবাগ, জাহাঙ্গীর ও তার মহীয়সী স্ত্রী নূরজাহানের সমাধিস্তম্ভ... (কিন্তু) ব্রিটিশ প্রশাসনিক দালানকোঠাগুলো এখনো জীবিত। এসব দালানকোঠাগুলো নির্মিত হয়েছিল যেসব প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধারণ করার জন্য, সেগুলোর উপরই দেশটি এখনো কম-বেশী নির্ভরশীল।[২৪২]

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মোহাম্মদ ইকবালের নাতি ওয়ালিদ ইকবাল নৈপুলকে বলেনঃ '*মুঘল যুগে ফিরে গেলে দেখা যাবে তখনকার আইন ছিল একনায়কতান্ত্রিক। ব্রিটিশ প্রদত্ত আদালত এবং ১৮৯৮ ও ১৯০৮ সালের ব্রিটিশ পদ্ধতিগত আইন ইত্যাদিই এখনো দেশটিতে অটুট রয়েছে। এগুলো চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে; কাজেই সেগুলো টিকে রয়েছে।*'[২৪৩]

এর অর্থ এটা নয় যে, এসব ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে আসার জন্য ব্রিটিশ অধিকার বা দখল অপরিহার্য ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতা নিজস্ব সৃজনশীলতা সত্ত্বেও বিদেশী ধারণা আত্মীকরণমুখী ছিল। ইউরোপের রেনেসাঁ (পুনর্জাগরণ) ও ইনলাইটনমেন্ট (আলোকিতকরণ)-এর অগ্রগতি সহজেই ভারতের মাটিকে ঢুকে পড়তো। তবে ভারতে ইসলামি নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকলে তা একটা বাঁধা হয়ে দাঁড়াতো। ব্রিটিশ দখলের প্রাক্কালে ভারতে মুসলিম শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল, যা অনেককেই বিশ্বাসী করে তুলতে পারে যে, হিন্দু ও শিখরা মুসলিমদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। এরূপ একটা সম্ভাবনা ছিল, তবে এটাও বিবেচনায় আনতে হবে যে, বিদেশী হস্তক্ষেপ ব্যতীত বিশ্বের কোথাও মুসলিম শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় নি। এর পূর্বে ভারতে মুসলিম শক্তি ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে বেশ কয়েকবার। আমির তিমুর দিল্লির ইতিমধ্যে-ক্ষয়িষ্ণু ইসলামি শক্তিকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে ফিরে যান; মুসলিমরা কয়েক দশকের মধ্যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শক্তভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। অভ্যন্তরীণ শক্তিতে না হলেও, বিদেশী শক্তির সহায়তায় মুসলিমরা তখনো তাদের ক্ষমতা ধরে থাকতে সক্ষম হতে পারতো। সুফি সাধক শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতো ভারতের ধার্মিক মুসলিমদের ঐকান্তিক আবেদনে সাড়া দিয়ে আহমদ শাহ আবদালী পরপর তিনবার ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করতে ভারতে আসে এবং ১৭৬১ সালে তার শেষ আক্রমণে মারাঠা বিদ্রোহীদেরকে দমন ও নিশ্চিহ্ন করে ফিরে যায়নি কি? এর আগেও ভারতে বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলিমরা বহিঃশক্তির সাহায্য কামনা করেছিল। সে আবেদনে সাড়া দিয়ে বাবর মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসেন ও শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক প্রভাব নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে খারাপতর ছিল। ইসলামি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে তাকালেই এ উপমহাদেশে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের চলমান ঐতিহ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। হিন্দু ভারত স্বাধীনতা লাভের পর প্রগতিশীল ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা আত্মীকরণ করে উত্তরোত্তর সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের উত্তরসূরী পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইসলামের দিকে ফিরে তাকিয়েছে; ফলে পশ্চাদবর্তী হয়েছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ঘৃণার যোগ্য হলে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদও কোনো অংশে কম ঘৃণার যোগ্য নয়।

আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া ও অন্যান্য সাবেক উপনিবেশগুলোর উপর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নেতিবাচক বা বিরূপ প্রভাব তাদের প্রত্যাহারের সাথে মূলত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের পদচিহ্ন আজো মুসলিম-বিজিত দেশগুলোতে দুর্দশা, এমনকি ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, ঘটিয়ে চলছে। ধর্মান্তরিত মুসলিমদের অন্যান্য ধর্মীয় নাগরিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকার ব্যর্থতা, যেমন ভারতে, ইতিমধ্যে

---

[২৪১] Yusuf I, *Violence against women won't stop until men speak out*, New Zealand Herald, 12 Sept. 2008

[২৪২] Naipaul (1998), p. 255-56

[২৪৩] Ibid, p. 256

আলোচিত হয়েছে। ইসলামের এ চলমান ক্ষতিকর প্রভাব কবে শেষ হবে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অপরদিকে ইউরোপীয় উপনিবেশীরা যেখানেই তাদের পদচিহ্ন রেখেছে – যেমন ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে বসতি স্থাপনকারী হিসেবে – সেসব জাতির জন্য তারা একটা আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ হয়ে উঠেছে।

সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের যারা ভারতে ব্রিটিশ ও ইসলামি শাসনের প্রভাব মূল্যায়নে লিপ্ত হন, তাদের ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মানমোহন সিং ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল নেহরুর ভারতের উপর ব্রিটিশ ও ইসলামি শাসনের প্রভাব সম্পর্কিত মন্তব্যে নজর দেওয়া উচিত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫ সালে মানমোহন সিং রীতিভঙ্গকারী এক বক্তব্যে ভারতের উপর ব্রিটিশ প্রভাব সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ব্যক্ত করে বলেন: "*আজ পার হয়ে যাওয়া সময় প্রদত্ত ভারসাম্য ও বাস্তব ধারণা এবং পিছনে ফিরে তাকানোর সুবিধার প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটা দাবি করা সম্ভব যে, ব্রিটেনের সাথে ভারতের অভিজ্ঞতার একটা লাভজনক ফলাফলও ছিল।*" তিনি আরো বলেন: "*আমাদের আইনের শাসন, একটা সাংবিধানিক সরকার, স্বাধীন গণমাধ্যম, একটা পেশাগত সিভিল সার্ভিস, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার – এগুলো সবই উদ্ভব হয় প্রাচীন একটা সভ্যতার সে সময়ের সবচেয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যের সাথে মিলিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে।*"[২৪৪.]

২৪৪. Rediff.com, *British Raj was beneficial: PM*, 9 July 2005; http://us. rediff.com/news/2005/jul/09pm1.htm

অপরদিকে নেহরু, অনেকটা অনিচ্ছুকভাবে, ভারতে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে অনিবার্য সিদ্ধান্তটি টেনে বলেন: ‘*ইসলাম পথ-যাত্রায় কোনো বিশেষ সামাজিক বিপব বয়ে আনেনি, যা জনগণের উপর শোষণ ব্যাপকভাবে রোধ করতে পারতো। তবে মুসলিমদের ক্ষেত্রে শোষণ অনেকটা হ্রাস করেছিল...।*’[২৪৫.] মুসলিম শাসক কর্তৃক সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর শোষণ হ্রাসের এ সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতি নেহরুর শুভ উপলব্ধি সম্ভব হয়েছিল কেবলই অনেক বৃহত্তর অমুসলিম জনগণের রক্ত, হৃদয় ও আত্মার চরম চোষণের ফলশ্রুতিতে।

অধ্যায় - ৭

ইসলামি ক্রীতদাসত্ব

‘*আল্লাহ দুই ব্যক্তির মাঝে আরেকটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন: তাদের একজন ক্ষমতাহীন ও বোবা, যে তার প্রভুর উপর এক ক্লান্তিকর বোঝা; যেভাবেই তাকে চালনা করা হোক না কেনো, সে কোনোই কাজে আসে না: এরূপ মানুষ কি তার মতোই, যিনি ন্যায়বান ও সঠিক পথের অনুসারী?*’ -- (আল্লাহ, কোরান ১৬:৭৬)

‘*(আল্লাহ) যেসব গ্রন্থভুক্ত লোককে ধরে এনেছেন.... এবং তাদের অন্তরে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তার কিছু (সাবালক পুরুষ) লোককে তোমরা হত্যা করেছো, কিছুকে (নারী ও শিশু) করেছো বন্দি।*’ -- (আল্লাহ, কোরান ৩৩:২৬-২৭)

‘*কোরানে লেখা রয়েছে যে, মুসলিমদের কর্তৃত্ব অস্বীকারকারী সকল জাতিই পাপী; এ রকম লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও যুদ্ধে বন্দিদেরকে কৃতদাস বানানো মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার ও দায়িত্ব। এবং এরূপ যুদ্ধে নিহত প্রত্যেক মুসলমানই নিশ্চিত স্বর্গে প্রবেশ করবে।*’ -- (কী অধিকারে বার্বার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার নাবিকদেরকে ক্রীতদাস বানাচ্ছে, সে প্রশ্নের উত্তরে টমাস জেফারসন ও জন অ্যাডামস্‌কে বলেন লন্ডনস্থ ত্রিপোলির রাষ্ট্রদূত আবদ আল-রহমান, ১৭৮৬।)

---

২৪৫. Nehru (1989), p. 145

ক্রীতদাসত্ব হলো একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যাতে ক্রীতদাস নামে কিছু মানুষ প্রভু বা মালিক হিসেবে পরিচিত অপর মানুষের সম্পদে পরিণত হয়। নিজস্ব স্বাধীনতা ও ইচ্ছা বিবর্জিত ক্রীতদাসরা তাদের মালিকের সুবিধা, আরাম-আয়েশ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অনুগত থেকে নিরলস কাজ করবে সেটাই কাম্য। সকল মানবাধিকার বঞ্চিত ক্রীতদাসরা তাদের প্রভুদের শর্তহীন সম্পত্তি। তারা মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র, যাদের মালিককে ছেড়ে চলে যাবার কোনো অধিকার নেই, কাজ করতে অস্বীকার করার উপায় নেই, নেই শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক দাবির অধিকার। সমাজে ক্রীতদাসদের অবস্থান অনেকটা গৃহপালিত পশুর মতো: গরু, ঘোড়া ও অন্যান্য ভারবাহী পশুগুলোকে অর্থনৈতিক সুবিধা, যেমন গাড়ি-টানা ও হালচাষের জন্য যেরূপ কাজে লাগানো হয়, ক্রীতদাসদেরকেও তেমনিভাবে তাদের প্রভুদের লাভ, আরাম-আয়েশ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কাজে লাগানো হয়। দাস-ব্যবসা অন্যান্য বাণিজ্যিক লেনদেনের মতোই ক্রীতদাসকৃত মানুষকে পণ্যরূপে কেনা-বেচার একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বা রীতি। সংক্ষেপে: ক্রীতদাসত্ব হলো সবল কর্তৃক দুর্বলকে শোষণের একটি প্রথা, যার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

ইউরোপীয় শক্তি-কর্তৃক আটলান্টিকের এপার-ওপারে দাস-ব্যবসা এবং আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ক্রীতদাসদের অমানবিক শোষণ ও তাদের উপর অমর্যাদাকর আচরণের জন্য পশ্চিমারা সবার দ্বারাই বড় সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে, বিশেষত মুসলিমদের দ্বারা। মুসলিমরা কথায় কথায় ইউরোপীয় দাস-ব্যবসার দিকে আঙ্গুল তোলে। তারা ঘন ঘন দাবি করে যে, ক্রীতদাসদের শোষণ করেই আমেরিকার মতো দেশগুলো বিপুল সম্পদ-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল, যা আজ তারা ভোগ করে চলছে। আমেরিকায় জন্ম হওয়া এক তরুণ মুসলিম লিখেছে: *'জানেন কি, কীভাবে আমেরিকার দাস-শিকারিরা আফ্রিকায় গিয়ে কালো মানুষগুলোকে ধরে ক্রীতদাসরূপে আমেরিকায় নিয়ে আসে? আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি ওসব ক্রীতদাসদের শ্রমের কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী'* (ব্যক্তিগত যোগাযোগ)। আটলান্টিক পারাপারের ৩৫০ বছরের দাস-বাণিজ্যকে ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ ও নিষ্ঠুরতম ক্রীতদাস ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করে আমেরিকার 'নেশন অব ইসলাম'-এর মিনিস্টার লুইস ফারাহ খান দাবি করেন: *'অনেক শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান জানে না যে, অতীতে আমাদের (কৃষ্ণাঙ্গ) উপর যা কিছু ঘটানো হয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করেই আজ তারা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে।'*[১]

অধিকাংশ মুসলিম ভাবে যে, ইসলামের ইতিহাসে ক্রীতদাসত্বের কোনো চিহ্নই ছিল না। ইসলামে ধর্মান্তরিত এক অস্ট্রেলীয় আদিবাসী রকি ডেভিস বা শহীদ মালিক এ. বি. সি. রেডিও'কে বলেন: *'ইসলাম নয়, খ্রিষ্টান ধর্মই ক্রীতদাসত্বের প্রতিষ্ঠাতা।'*[২] ভারতীয় মুসলিমরা যখন এ উপমহাদেশে প্রচলিত দাসপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করে, তারা কেবলই কীভাবে পর্তুগিজরা গোয়া, কেরালা ও বাংলার সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চল থেকে ভয়াবহ অবস্থায় দাস পরিবহন করতো সেসব লোমহর্ষক কাহিনীর কথা বলে। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের ইতিহাস বইয়ে শেখানো হয়: ইসলামের আগে ছিল দাসপ্রথা ও শোষণ, যা ইসলাম আসার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা ভারতে মুসলিম হানাদার ও শাসক কর্তৃক ব্যাপকভাবে দাসপ্রথাচর্চার কথা কখনোই বলবে না।

ইসলামি শাসনের অধীনে ব্যাপকভাবে চর্চাকৃত দাসপ্রথা (যেমন ভারতে) সম্পর্কে মুসলিমদের এ নীরবতা সম্ভবত তাদের ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলশ্রুতি। ভারতের আধুনিক ইতিহাস লেখায় মুসলিম আক্রমণ ও শাসনকালে সংঘটিত নিষ্ঠুরতাকে ব্যাপকভাবে ঢাকা দেওয়া হয়। ইসলামের ইতিহাসের সঠিক চিত্রটির এরূপ বিকৃতিকরণ মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাপক ক্রীতদাসত্ব ও দাস-ব্যবসা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাকে জোরদার করে ও ভুল ধারণা সৃষ্টি করে। এ পুস্তকের আগাগোড়া বর্ণনায়, দুঃখজনকভাবে হলেও ইসলামের কর্তৃত্বের গোটা ইতিহাসে সর্বত্রই যে দাসপ্রথা একটা বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল তা দেখানো হয়েছে। এর কিছু অনন্য বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যও ছিল, যেমন ব্যাপকহারে উপপত্নীকরণ, খোজাকরণ ও 'গিলমান' চর্চা (নিচে বর্ণিত)।

দাসপ্রথাকে কোরানের অনুমোদন

দাসপ্রথাকে ইসলামে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে নিম্নোক্ত কোরানের আয়াতটি, যার মাধ্যমে আল্লাহ ন্যায়বান ও সত্যপন্থী মুক্ত মানুষ বা প্রভুদেরকে বোবা, অকেজো ও বোঝাস্বরূপ ক্রীতদাসদের থেকে পৃথক করেছেন:

> 'আল্লাহ দুই ব্যক্তির মাঝে আরেকটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন: তাদের একজন ক্ষমতাহীন ও বোবা, যে তার প্রভুর উপর এক ক্লান্তিকর বোঝা; যেভাবেই তাকে চালনা করা হোক না কেনো, সে কোনোই কাজে আসে না: এরূপ মানুষ কি তার মতোই, যিনি ন্যায়বান ও সঠিক পথের অনুসারী? (কোরান ১৬:৭৬)

আল্লাহ ক্রীতদাসদেরকে মর্যাদায় সমঅংশীদার ও তাদের সম্পদের ভাগীদার করে নেয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের সতর্ক করে দেন, পাছে অন্যদের মত ক্রীতদাসদেরকেও একইভাবে ভয় করতে হয়:

> তোমরা কি তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন লোকদেরকে (অর্থাৎ ক্রীতদাস বা বন্দি) আমাদের প্রদত্ত সম্পদের সমঅংশীদারী করবে? তোমরা কি তাদেরকেও সেরূপ ভয় করবে, যেমন ভয় করো পরস্পরকে? (কোরান ৩০:২৮)

---

১. Farra khan L, *What does America and Europe Owe?* Final Call, 2 June 2008

২. ABC Radio, *Aboriginal Da'wah- "Call to Islam"*, 22 March 2006; http://www.abc.net.au/rn/talks/8.30/relrpt/stories/s1597410.htm

এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় মওলানা আবুল আলা মওদুদি ক্রীতদাসদেরকে সম্মান ও ধনসম্পদে সমান গণ্য করাকে ইসলামে সবচেয়ে ঘৃণ্য শিরক বা অংশীদারিত্বের মতো কাজ বলে মনে করেন।[৩] অন্যত্র আল্লাহ স্বয়ং তার স্বর্গীয় পরিকল্পনার অংশরূপেই কম আনুকূল্যপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের চেয়ে কিছু মানুষকে, অর্থাৎ প্রভু বা দাসমালিকদেরকে, বেশি আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন বলে দাবি করেন। তিনি মুসলিমদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে তারা ক্রীতদাসদেরকে তাঁর দেওয়া উপহার বা প্রতিদানে সমান অংশীদার না করে। যারা ক্রীতদাসদেরকে নিজেদের সমান মর্যাদার ভাববে, আল্লাহ তাদেরকে সাবধান করে দেন এটা বলে যে, সেরকম ভাবলে আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে:

> জীবনধারনের নিমিত্তে আল্লাহ তোমাদের কারো কারো উপর অন্যদের তুলনায় অধিক মুক্তহস্তে তাঁর উপহার বা প্রতিদান বর্ষণ করেছেন। অধিক আনুকূল্যপ্রাপ্তরা তাদেরকে দেওয়া সে উপহার তাদের দক্ষিণ হস্তে ধারণকৃতদের (দাসদের) উপর বর্ষণ করবেনা, যাতে তারা এক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হতে পারে। তারা কি আল্লাহর আনুকূল্য অস্বীকার করবে? (কোরান ১৬:৭১)

আল্লাহ শুধু দাসপ্রথাকে অনুমোদনই দেননি, তিনি নারী-দাস বা দাসীদেরকে যৌনসম্ভোগ হিসেবে ব্যবহারের জন্য দাস-মালিকদেরকে স্বর্গীয়ভাবে আশীর্বাদপুষ্টও করেছেন (মুসলিম পুরুষরাই কেবল দাস-মালিক হতে পারে):

> তারা তাদের গোপনাঙ্গকে রক্ষা করবে, তবে তাদের স্ত্রীদের ও দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীনদের (ক্রীতদাসীদের) বাদ দিয়ে–এদের সাথে (যৌন-সহবাসে) দোষের কিছু নেই। (কোরান ২৩:৫-৬)

সুতরাং বন্দি ও ক্রীতদাসদের মধ্যে নারীরা থাকলে মুসলিম পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে যেরূপে যৌনক্রিয়া করে, তাদেরকেও সেরূপে ভোগ করার স্বর্গীয়ভাবে অনুমোদিত অধিকার পেয়েছে। আল্লাহর এ রায় ইসলামে যৌনদাসীত্ব বা উপপত্নী প্রথা প্রতিষ্ঠা করে, যা উপনিবেশ-পূর্ব মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যদিও বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের জন্য একই সময়ে চারজন স্ত্রী রাখার বিধান রয়েছে (কোরান ৪:৩), কিন্তু যৌনদাসী রাখার বেলায় সংখ্যাগত এরূপ কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

আল্লাহ মুসলিমদেরকে যৌনকর্মে ব্যবহারের জন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নারী ক্রীতদাস সংগ্রহের স্বর্গীয় অনুমোদনও দিয়েছেন এভাবে:

> হে নবি! অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের বৈধ করেছি, যাদেরকে তোমরা যৌতুক প্রদান করেছো। এবং যাদেরকে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত দখল করে রেখেছে, তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ যাদেরকে ***যুদ্ধবন্দিরূপে*** তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। (কোরান ৩৩:৫০)

মুসলিমরা আটককৃত ক্রীতদাস নারীদের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে পারে, যদি তারা বিবাহিতও হয়; কিন্তু কোনো বিবাহিত মুক্ত মুসলিম নারীর সঙ্গে নয়:

> তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন নারীরা ব্যতীত যারা ইতিমধ্যে বিবাহিতা, তারা অবশ্যই নিষিদ্ধ... (কোরান ৪:২৪)

কোরানে আরো অনেক আয়াত রয়েছে যাতে ক্রীতদাসের কথা বলা হয়েছে এবং তাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে আটক বা সংগ্রহ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরূপে পবিত্র কোরানে উপস্থাপিত ইসলামি ঈশ্বরের স্বর্গীয় আদেশ অনুযায়ী মুসলিমরা ক্রীতদাস রাখার অনুমোদন প্রাপ্ত। যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তারা ক্রীতদাস যোগাড় করতে পারে, ক্রীতদাসীদের সঙ্গে যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হতে পারে ও অবশ্যই তাদেরকে নিজেদের খুশি মতো কাজে লাগাতে পারে। মুসলিমদের জন্য নারী ক্রীতদাসদের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া তাদের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে যৌনকর্মের মতই বৈধ। প্রকৃতপক্ষে দাসপ্রথা ইসলামে অতি আকাঙ্ক্ষিত একটি স্বর্গীয় প্রথা, কেননা আল্লাহ বহু আয়াতে বারংবার এ 'স্বর্গীয় অধিকার' সম্পর্কে মুসলিমদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

নবির চর্চাকৃত দাসপ্রথার আদর্শ

দাসপ্রথায় লিপ্ত হতে মুসলিমদেরকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিতে আল্লাহ শুধু প্রাণান্তই হননি, কীভাবে অবিশ্বাসীদেরকে দাস করতে হবে সে ব্যাপারে নবি মুহাম্মদকে পরিচালনারও উদ্যোগ নিয়েছেন। যেমন নিচের আয়াতে আল্লাহ বলেন:

> এবং তিনি (আল্লাহ) ধর্মগ্রন্থের সেসব লোকদেরকে (বানু কোরাইজা ইহুদি) বের করে এনেছেন, যারা তাদের ঘাঁটিতে বসে থেকে তাদেরকে (কোরাইশ) সহায়তা করেছিল, এবং আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাদের প্রাণে। *(তাদের) কিছু সংখ্যককে (বয়স্ক পুরুষ) তোমরা বধ করেছো, কিছু সংখ্যককে (নারী ও শিশু) করেছো বন্দি...* (কোরান ৩৩: ২৬-২৭)

এ আয়াতটিতে আল্লাহ বানু কোরাইজা ইহুদিদেরকে নিজস্ব ঘাঁটির মধ্যে বসে থেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মক্কার কোরাইশদেরকে সমর্থন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। এ অবান্তর অভিযোগের ভিত্তিতে আল্লাহ অনুমোদন দেন: ইহুদি গোত্রটির বয়স্ক পুরুষদেরকে হত্যা করতে হবে এবং অবশিষ্ট নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস বানাতে হবে। নবি যথাযথরূপে সে আদেশ পালন করেন এবং তাঁর অনুসারীদের মাঝে ক্রীতদাসকৃত

---

[৩] Famous Islamic scholar Abu Ala Maududi in his interpretation of this verse notes: "*When you do not make your own slaves partners in your wealth, how do you think and believe that Allah will make His creatures partner in His Godhead?*" (Maududi AA, *Towards Understanding the Quran*, Markazi Muktaba Islami Publishers, New Delhi, Vol. VIII). In other words, associating partners with Allah, which is the most abhorrent thing to do in Islam, is tantamount for a man to take his slaves as equal partner.

নারী ও শিশুদেরকে বিতরণ করে দেন ও এক-পঞ্চমাংশ নিজের ভাগ হিসেবে রাখেন। বন্দি নারীদের মধ্যে যারা তরুণী ও সুন্দরী তাদেরকে যৌনদাসী করা হয়। নবি নিজে যৌনদাসী হিসেবে ১৭-বছর-বয়স্কা সুন্দরী রায়হানাকে গ্রহণ করেন, যার স্বামী ও পরিবারের সদস্যরা সে হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছিল, এবং সে রাতেই তিনি তাকে বিছানায় নেন যৌন-সহবাসে লিপ্ত হতে।[৪]

ঐ বছরই খাইবার ও বানু মুস্তালিকের ইহুদিদেরকে আক্রমণ ও পরাজিত করার পর মুহাম্মদ তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাসরূপে উঠিয়ে নিয়ে যান। অন্যান্য অনেক আক্রমণে নবি ও তাঁর অনুসারীরা পরাজিতদের নারী ও শিশুদেরকে একইভাবে ক্রীতদাসরূপে কব্জা করেছিল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়ে পরাজিত করার পর তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাসকরণ মুহাম্মদের যুদ্ধের মডেল বা আদর্শ কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়, যা উপরোক্ত আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন মাত্র। নবি কিছু ক্রীতদাসকে বিক্রি করেছিলেন এবং তাদের কিছু সংখ্যককে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করতেন। নারী বন্দিদের মধ্যে সুন্দরী যুবতীরা যৌনদাসী হতো।

ইসলামি চিন্তা-চেতনায় খাঁটি মুসলিম জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় যেহেতু তাদের কর্ম ও কৃতিত্বে মুহাম্মদের সমকক্ষ হওয়ার প্রয়াস, সে কারণে মুসলিমরা যথার্থরূপেই তাঁর দাসপ্রথা চর্চার এ মডেলকে (ক্রীতদাসকরণ, দাস-বাণিজ্য ও দাস-উপপত্নীকরণ) আঁকড়ে ধরে থেকেছে; এবং এ প্রক্রিয়া পরবর্তী শতাব্দীগুলোত ইসলামিক শাসনাধীনে চিরন্তনরূপে বহাল থাকে। খাইবার বা বানু কুরাইজার সঙ্গে যুদ্ধে মুহাম্মদের আচরণ ক্রীতদাস আটককরণের মানদণ্ডে পরিণত হয়। এবং সেটাই মধ্যযুগের ইসলামি রাজত্বে ক্রীতদাসকরণ, যৌনদাসীত্ব ও দাস-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের জন্য দায়ী। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মুসলিমরা কোরান ও সুন্নতের অনুমোদন-অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইসলামের প্রসার ও শাসন সম্প্রসারণে বিশ্বজয়ের নিমিত্তে পবিত্র ধর্মযুদ্ধের এক লাগামহীন কর্মকাণ্ড শুরু করে। আরবাঞ্চলে ইসলামের বিস্ফোরণ ঘটার সাথে সাথে মুসলিম হানাদাররা পরাজিত অবিশ্বাসীদের নারী ও শিশুদেরকে ব্যাপক সংখ্যায় ক্রীতদাসরূপে আটক করণে দক্ষ হয়ে উঠে।

ইসলামি চিন্তাধারায় (ইতিমধ্যেই উল্লেখিত) ইসলাম-অতীত ও ইসলাম-বহির্ভূত সভ্যতা হলো 'জাহিলিয়া' বা ভ্রান্ত প্রকৃতির, যা ইসলামের আগমনে অকার্যকর ও বাতিল হয়ে গেছে। ইসলাম একমাত্র সত্য-ধর্ম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র মুসলিমরাই প্রকৃত সত্যের অধিকারী। তাদের চিন্তায়, বার্নার্ড লুইস উল্লেখ করেছেন, '*ইসলামের সীমানা ও ধর্মের বাইরের জগতে কেবল বিধর্মী ও বর্বররাই বসবাস করতো। তাদের কেউ কেউ কোনো প্রকারের ধর্ম ও সভ্যতার একটি আভার অধিকারী ছিল; অবশিষ্ট বহু-ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকদেরকে প্রধানত ক্রীতদাসের উৎসরূপে দেখা হয়।*'[৫] মুসলিমরা এত বেশি পরিমাণে মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়েছে যে, দাস-ব্যবসা একটা বিস্ফোরিত ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিণত হয়: মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বাজারগুলো দাসে ভরে উঠে। সুতরাং, লিখেছেন অধ্যাপক লাল: '*ব্যাপকহারে দাস-বাণিজ্যের সৃষ্টি ও মুনাফার উদ্দেশ্যে অন্যান্য ব্যবসার মতো দাস-ব্যবসা চালিত করার কৃতিত্ব ইসলামেরই।*'[৬]

প্রাচীন বিশ্বে দাসপ্রথা

ইসলাম দাসপ্রথার প্রবর্তক নয়; তাতে শুধু ইসলামের একচেটিয়া কর্তৃত্বও ছিল না। খুব সম্ভবত সেই আদিম বর্বরতার যুগে দাসপ্রথার উৎপত্তি হয়েছিল এবং তা লিখিত ইতিহাসের পুরোটা ব্যাপী বিশ্বের প্রধান প্রধান সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। দাসপ্রথা ব্যাবিলোনিয়া এবং মেসোপটেমিয়াতেও প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টান ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে প্রাচীন মিশর, গ্রিস ও রোমেও দাসপ্রথা বিশেষ লক্ষ্যণীয় ছিল। খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে দাসপ্রথা অনুমোদিত ও মধ্যযুগের খ্রিষ্টানজগতে দাসপ্রথা চালু ছিল।

প্রাচীন মিশর: প্রাচীন মিশরে পিরামিড নির্মাণে ক্রীতদাসরা শ্রমিকের কাজ করেছে। বিখ্যাত গ্রিক পরিব্রাজক হেরোডটাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৪-৪২৫ সাল) জানান: গিজার বিখ্যাত পিরামিডটি নির্মাণে প্রায় ১০০,০০০ শ্রমিক ২০ বছর ধরে কাজ করেছিল; মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্যের চিওপ্স নামক ফারাও (শাসনকাল খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৮৯-২৫৬৬ সাল) এটি নির্মাণ করেছিলেন, যা ছিল বিশ্বের প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্যের একটি।[৭] কিংবদন্তির কাহিনী থেকে শোনা এ সংখ্যা স্পষ্টতঃই ছিল অতিরঞ্জিত; তথাপি এ তথ্যটি প্রমাণ করে যে, তৎকালে এরূপ কাজে ব্যাপক সংখ্যায় ক্রীতদাস ব্যবহৃত হতো। মিশরের ফারাওরা যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রীতদাস সংগ্রহ করতেন অথবা বিদেশ থেকে তাদেরকে ক্রয় করতেন। সেসব ক্রীতদাস ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ, ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে তাদেরকে উপহার হিসেবে সেনানায়ক বা যাজকদেরকে দেওয়া হতো।

প্রাচীন গ্রিস: গ্রিসের প্রাচীন নগররাষ্ট্রে, যেমন এথেন্স ও স্পার্টায়, দাসপ্রথা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। স্বাধীন নাগরিক এবং বিদেশীদের পাশাপাশি 'হিলোট' নামক একটি শ্রেণীও বাস করতো গ্রিসে। হিলোটরা ছিল দাসশ্রেণীর, যারা দাসের মতই দায়বদ্ধভাবে কৃষিকাজসহ চাকর-বাকরের মতো কাজ করতো। অনেক পণ্ডিত ধারণা করেন যে, এর ফলে সমাজের উঁচু স্তরের লোকজন ও স্বাধীন নাগরিকরা অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় রত হওয়ার সুযোগ পায় এবং সে কারণেই প্রাচীন গ্রিস বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। গ্রিক কৃষকদের বড় একটা অংশ ভূমির মালিক ছিল না। ফলে উৎপাদিত ফসলের বড় একটা অংশ জমির মালিকদেরকে দিতে হতো। এর ফলে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে দাস হিসেবে সমর্পণ করে 'হিলোট' শ্রেণীতে যুক্ত হতো। জানা যায়, এক সময় এথেন্সে মাত্র ২,১০০ স্বাধীন নাগরিকের বিপরীতে ৪৬০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। স্পার্টার চেয়ে এথেন্সে ক্রীতদাসরা তুলনামূলক ভাল আচরণ পেতো। পরবর্তীকালে ড্রাকো'র সংবিধান (খ্রিঃ পূঃ

৪. Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad*, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p. 461-70
৫. Lewis B (1966) *The Arabs in History*, Oxford University Press, New York, p. 42
৬. Lal KS (1994) *Muslim Slave System in Medieval India*, Aditya Prakashan, New Delhi, p. 6
৭. Ibid, p. 2

৬২১) ও সলোন (জীবনকাল খ্রি: পূ: ৬৩৮-৫৫৮)-এর আইনে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বানানো হয়; ফলে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে। সলোনের ফরমান ঋণের কারণে দাসকরণ নিষিদ্ধ করে। এ সময় ক্রীতদাসরা কিছু মৌলিক অধিকার ভোগের সুযোগ পায় এবং রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা ক্রীতদাসকে মৃত্যুদণ্ডদান নিষিদ্ধ করা হয়।

রোমান সাম্রাজ্য: প্রাচীন রোম প্রজাতন্ত্র ও রোম সাম্রাজ্যের প্রাথমিক যুগে জনসংখ্যার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছিল ক্রীতদাস।[৮] অগাস্টাস সিজারের শাসনামলে (শাসনকাল খ্রি: পূ: ৬৩-১৪) এক দাসমালিক নাকি ৪,০০০ ক্রীতদাস রেখে মারা যান।[৯] খ্রি: পূ: দ্বিতীয় শতাব্দি পর্যন্ত দাসমালিকরা বৈধভাবে ক্রীতদাসকে হত্যা করতে পারতো, যদিও তা ঘটতো খুবই কম। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২ অব্দে কর্নেলিয়ান আইনের মাধ্যমে ক্রীতদাস হত্যা নিষিদ্ধ হয়; ৮২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পেট্রোনিয়ান আইন ক্রীতদাসদেরকে যুদ্ধে ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। সম্রাট ক্লডিয়াসের শাসনকালে (৪১-৫৪ খ্রি:) মালিকের অবহেলার কারণে ক্রীতদাসের মৃত্যু ঘটলে, মালিক খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হতো। বিখ্যাত বক্তা, লেখক, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ ডিয়ো ক্রিসোস্টোম সম্রাট ট্রজানের শাসনামলে (৯৮-১১৭ খ্রি:) দাসপ্রথার নিন্দা করে 'ফোরামে' প্রদত্ত তার দুটি বক্তৃতা (১৪ ও ১৫) উৎসর্গ করেছিলেন। ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় কর্মকতা সেনিকা দ্য এল্ডার (৫৪–৩৯ খ্রি: পূ:) কর্তৃক লিখিত 'দা ক্লিমেন্সিয়া" (১:১৮)'তে লেখা রয়েছে যে, ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর আচরণকারী মালিকদেরকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করা হতো। পরবর্তীকালে সম্রাট হাড্রিয়ান (শাসনকাল ১১৭-১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) কর্নেলিয়ান আইন পুনঃপ্রবর্তন করেন। সম্রাট কারাকালার (শাসনকাল ২১১-২১৭ খ্রিষ্টাব্দ) অধীনে স্টয়িক বা ভোগবিরোধী আইনজীবী আলপিয়ান পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানদেরকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করা অবৈধ করেন। রোমের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য পৌত্তলিক সম্রাট ডিয়োক্লিশিয়ান (শাসনকাল ২৮৪-৩০৫ খ্রিষ্টাব্দ) ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রস্তকে ক্রীতদাসকরণ এবং ঋণগ্রস্ত কে ঋণ পরিশোধের জন্য নিজেকে ক্রীতদাস হিসেবে সমর্পণ করা নিষিদ্ধ করেন। কনস্টানটাইন দ্য গ্রেট (শাসনকাল ৩০৬-৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) ক্রীতদাস বিতরণকালে পরিবারের সদস্যদেরকে বিচ্ছিন্ন করা নিষিদ্ধ করেন। স্পষ্টতঃ খ্রিষ্টানপূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসদের অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছিল।

প্রাচীন চীন: প্রাচীন চীনে ধনী পরিবারগুলো ক্ষেত-খামারের ও বাড়ির চাকর-বাকরের কাজের জন্য ক্রীতদাস রাখতো। সম্রাটরা সাধারণত শত শত, এমনকি হাজার হাজার ক্রীতদাস রাখতেন। অধিকাংশ ক্রীতদাস ছিল ক্রীতদাস মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী। কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস হতো ঋণশোধে ব্যর্থ হয়ে; অন্যেরা ছিল যুদ্ধে আটককৃত বন্দি।

প্রাচীন ভারত: অপর একটি বড় প্রাচীন সভ্যতা ভারতে দাসপ্রথার উল্লেখ খুবই সামান্য। বিখ্যাত গ্রিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস (খ্রি: পূ: ৩৫০-২৯০) – যিনি গ্রিসসহ তার সফর করা অন্যান্য বহু দেশে দাসপ্রথা সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত ছিলেন – তিনি লিখেছেন: '*ভারতীয়রা সবাই স্বাধীন; তাদের কেউ-ই দাস নয়; এমনকি তারা বিদেশীদেরকেও দাস বানায় না; সুতরাং তাদের নিজস্ব দেশীয় লোকদেরকে ক্রীতদাস বানানোর প্রশ্নই উঠে না।*'[১০] একইভাবে মুসলিম ইতিহাসবিদরা, যারা ভারতে ইসলামি ক্রীতদাসকরণের ভুরি-ভুরি বিবরণ লিখে গেছেন, তারাও ইসলামপূর্ব হিন্দু সমাজে দাসপ্রথার কথা উল্লেখ করেননি। তবে প্রাচীন ভারতেও দাসপ্রথা যে কিছু মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, তা অনুমান করা যায়, কেননা ঋগবেদে (প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ) দাসপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বুদ্ধের শিক্ষাসহ অন্যান্য দার্শনিক ও ধর্মীয় সাহিত্যে দাসপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বুদ্ধ (জীবনকাল অনুমান খ্রি: পূ: ৫৬৩-৪৮৩ সাল) তাঁর অনুসারীদেরকে নির্দেশ দেন ক্রীতদাসদেরকে এমন পরিমাণ কাজ দিতে, যা তারা সহজেই করতে পারে। ক্রীতদাসরা অসুস্থ হলে তাদের সেবা-যত্ন করতে তিনি দাসমালিককে উপদেশ দেন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কৌটিল্য (বা চানক্য), যার শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিখ্যাত মৌর্য সাম্রাজ্য (আনুমানিক ৩২০-১০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি দাসমালিক কর্তৃক বিনা কারণে ক্রীতদাসদেরকে শাস্তি দান নিষিদ্ধ করেন; এ নির্দেশ ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র মালিকদেরকে শাস্তি দিতো। মৌর্য বংশের সম্রাট অশোক (শাসনকাল ২৭৩-২৩২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) তার পাথরে খোদাইকৃত ৯ নং অনুশাসনে দাসমালিককে ক্রীতদাসের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বিবেচনাপ্রসূত আচরণ করার উপদেশ দেন।

প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদে ক্রীতদাস উপহার দেওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং শাসকরা উপহারস্বরূপ নারী ক্রীতদাসদেরকে প্রদান করতেন। ভারতে ক্রীতদাসরা শাসকদের প্রাসাদে, অভিজাতদের প্রতিষ্ঠানসমূহে ও ব্রাহ্মণদের ঘরে গৃহ-পরিচারক বা চাকর-বাকরের কাজ করতো। সম্ভবত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ লোকেরা ভারতে ক্রীতদাস হতো।[১১]

তবে এটা বোঝা যায় যে, প্রচীন ভারতে দাসপ্রথার চর্চা ছিল খুবই সামান্য এবং তৎকালীন মিশর, গ্রিস, চীন ও রোমের তুলনায় ভারতে ক্রীতদাসরা অধিকতর মানবিক আচরণ পেত। ক্রীতদাসরা কখনোই বাণিজ্যিক পণ্য বিবেচিত হয়নি ভারতে, সেখানে কখনোই দাস কেনা-বেচার বাজার ছিল না। মুসলিমরা দাস-বাণিজ্য আনয়নের আগে দাস-বাণিজ্য ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোনো অংশ বা বৈশিষ্ট্য ছিল না।

খ্রিষ্টান ধর্মে দাসপ্রথা: নিউ টেস্টামেন্টে দাসপ্রথা সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত, এমনকি অনুমোদিত (ম্যাথিউ ১৮:২৫, মার্ক ১৪:৬৬)। উদাহরণস্বরূপ যিশু ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধের জন্য পরিবারসহ নিজেদেরকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি হওয়ার পরামর্শ দেন (ম্যাথিউ ১৮:২৫)। একইভাবে সেন্ট পলের কয়েকটি শ্লোকে, যেমন ইফ. ৬:৫-৯, কর. ১২:১৩, গল. ৩:২৪ ও কোল. ৩:১১ প্রভৃতি দাসপ্রথা এবং দাস (বাঁধা) ও মুক্ত মানুষের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

---

৮. Slavery, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wikis/Slavery
৯. Lal (1994), p. 3
১০. Ibid, p. 5
১১. Ibid, p. 4

নিউ টেস্টামেন্টের এ অনুমোদনই সম্ভবত অবিশ্বাসীদেরকে (অ-খ্রিষ্টানদেরকে) ক্রীতদাসকরণে খ্রিষ্টানদেরকে উৎসাহিত করেছিল। স্পষ্টতঃ খ্রিষ্টানপূর্ব রোম সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছিল এবং দাসদের অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনস্টানটাইনের খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের পর যখন খ্রিষ্টানরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন পরিস্থিতি পাল্টে যেতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ খ্রিষ্টানপন্থি সম্রাট ফ্লাভিয়াস গ্রাটিয়ানাস (শাসনকাল ৩৭৫-৩৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) এ অনুশাসন জারি করেন যে, ক্রীতদাস তার মালিকের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ করলে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে। ৬৯৪ সালে স্পেনীয় সম্রাট চার্চের চাপে ইহুদিদেরকে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ অথবা ক্রীতদাসত্ব বরণ করার নির্দেশ দেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে চার্চের ফাদার ও পোপরা মধ্যযুগে খ্রিষ্টান জগতে দাসপ্রথার বৈধতা দিতো। আধুনিক যুগের শুরুতে ইউরোপে এ ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার মুখেও তারা দাস-বাণিজ্যের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে। বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন: *'প্রত্যেকেই জানে যে, চার্চগুলো যতদিন পেরেছে সাধ্যমতো দাসপ্রথা বিলুপ্তিকরণের বিরোধিতা করেছে।'*[১২]

ভারতে মুসলিমদের দ্বারা ক্রীতদাসকরণ

মুসলিম দখলদার ও শাসকরা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার যেখানেই গেছে, সেখানেই বিধর্মীদেরকে ব্যাপক হারে ক্রীতদাস বানিয়েছে। এ আলোচনায় মধ্যযুগীয় ভারতে তৎকালীন মুসলিম ঐতিহাসিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ করে যাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুসলিমদের দ্বারা ক্রীতদাসত্ব চর্চার কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরা হবে। আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানে ইসলামিক দাসপ্রথা চর্চা সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হবে।

মোহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক: নবি মুহাম্মদের মৃত্যুর চার বছর পর খলিফা ওমরের শাসনামলে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় সীমান্তীয় থানা অঞ্চলটি আক্রমণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ভারতে ইসলামি হামলার সূচনা হয়। পরবর্তীতে খলিফা ওসমান, আলী ও মুয়াবিয়ার সময়ে এরূপ আরো আটবার লুণ্ঠন অভিযান চালানো হয়। এসব প্রাথমিক আক্রমণে কখনো কখনো লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড ছাড়াও লুণ্ঠনদ্রব্য ও ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু ভারতে ইসলামের স্থায়ী পদাঙ্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়। খলিফা আল-ওয়ালিদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুতে উবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে দু'টো অভিযান প্রেরণ করেন। উভয় অভিযানই চরমভাবে ব্যর্থ হয় অনেক মৃত্যুর মাশুল দিয়ে, নিহত হয় উভয় সেনাপতি। অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হাজ্জাজ এরপর ৬,০০০ সৈন্যের নেতৃত্বে ১৭-বছর-বয়স্ক তারই ভাতিজা ও জামাতা কাসিমকে প্রেরণ করেন। মোহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দেবাল বন্দর জয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামের শক্ত ও স্থায়ী ভিত্তি রচনা করে। বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ আল-বিরাদুরী লিখেছেন: *'দেবাল আক্রমণ করে সেখানে তিনদিন ধরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালানো হয়; মন্দিরের যাজকদের সবাইকে হত্যা করা হয়।'*[১৩] কাসিম ১৭ বছরের অধিক বয়সী পুরুষদেরকে তলোয়ারের ডগায় হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস বানায়। দেবালে কত লোককে বন্দি করা হয়েছিল সে সংখ্যা লিখা হয়নি, তবে তাদের মধ্যে ছিল মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণকারী ৭০০ রমণী, জানায় 'চাচনামা'। লুণ্ঠিত মালামাল ও ক্রীতদাসদের মধ্যে খলিফার এক-পঞ্চমাংশের হিস্যায় ছিল পঁচাত্তর জন কুমারী, যাদেরকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্টদেরকে কাসিম তার সেনাদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়।[১৪]

রাওয়ার আক্রমণে, লিখিত হয়েছে চাচনামায়, *'বন্দিদের গণনা করলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,০০০, যাদের মধ্যে ছিল সেনাধ্যক্ষদের কন্যারা ও একজন ছিল রাজা দাহিরের বোনের মেয়ে।'* বন্দি ও লুণ্ঠিত মালামালের এক-পঞ্চমাংশ হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করা হয়।[১৫] ব্রাহ্মণাবাদ যখন মুসলিম আক্রমণে পতিত হয়, জানায় 'চাচনামা': ৮,০০০ থেকে ২৬,০০০ লোককে নিধন করা হয়; *'এক-পঞ্চমাংশ বন্দিকে আলাদা করে গণনা করা হলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজার; অবশিষ্টদেরকে যোদ্ধাদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়।'*[১৬] তার অর্থ দাঁড়ায়: এ আক্রমণে প্রায় ১০০,০০০ নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস করা হয়েছিল।

খলিফার হিস্যা হিসেবে একবার প্রেরিত লুণ্ঠনদ্রব্য ও ক্রীতদাসদের মধ্যে ছিল ৩০,০০০ নারী ও শিশু এবং নিহত দাহিরের ছিন্ন মস্তক। সেসব বন্দির মধ্যে ছিল সিন্ধুর বিশিষ্ট মর্যাদাবান পরিবারের কিছু তরুণী কন্যা। হাজ্জাজ লুণ্ঠনদ্রব্য ও ক্রীতদাস বহনকারী বহর দামেস্কে খলিফা আল-ওয়ালিদের নিকট পাঠিয়ে দেন। *'সে সময়ের খলিফা যখন চিঠিটি পড়েন'*, লিখেছে চাচনামা: *'তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করেন। তিনি সেনাধ্যক্ষদের কন্যাদের কিছুকে বিক্রি করে দেন এবং কিছু উপহার হিসেবে প্রদান করেন। তিনি রাজা দাহিরের ভগ্নির কন্যাদেরকে যখন দেখেন, তাদের সৌন্দর্য ও মনোহর রূপে এতই অভিভূত হন যে, হতবাক হয়ে আঙ্গুল কামড়াতে থাকেন।'*[১৭]

আল-বিলাদুরী লিখেছেন, মুলতান আক্রমণে বন্দি হওয়া লোকদের মধ্যে *'মন্দিরের পুরোহিতদের সংখ্যাই ছিল ৬ হাজার'*।[১৮] এ সংখ্যাটি আমাদেরকে ধারণা দিতে পারে মুলতান আক্রমণে মোট কত সংখ্যক নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস করা হয়েছিল। কাসিম একই রকমের অভিযান

---

১২. Russell B (1957) *Why I Am Not a Christian*, Simon & Schuster, New York, p. 26

১৩. Elliot HM and Dawson J, *The History of India As Told by the Historians*, Low Price Publications, New Delhi, Vol. I, p. 119-20; Sharma SS (2004) *Califs and Sultans: Religions Idology and Political Praxis*, Rupa & Co, New Delhi, p. 95

১৪. Lal (1994), p. 17

১৫. Elliot & Dawson, Vol. I, p. 173

১৬. Ibid, p. 181

১৭. Sharma, p. 95-96

১৮. Elliot & Dawson, Vol. I, p. 122-23, 203

চালিয়েছিল সেহওয়ান ও ধালিলায়। সংক্ষিপ্ত তিন বছরের (৭১২-১৫) নেহাৎই ছোট কৃতিত্বে কাসিম সম্ভবত সর্বমোট তিন লাখের মতো লোককে ক্রীতদাস বানিয়েছিল।

৭১৫ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে: ৭১৫ সালে কাসিমকে দামেস্কে ডেকে পাঠানোর পর ভারত সীমান্তে মুসলিমদের হত্যাযজ্ঞ ও ক্রীতদাসকরণ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে স্বল্পমাত্রার অভিযান অব্যাহত থাকে। একমাত্র গোঁড়া মুসলিম উমাইয়া শাসক খলিফা ওমরের শাসনামলে (৭১৭-২০) তার সেনাপতি আমরু বিন মুসলিম হিন্দু ভূখণ্ডগুলোর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে পরাজিত করেন। এসব অভিযানে নিঃসন্দেহে বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস কব্জা করা হয়েছিল। খলিফা হাসাম বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে (৭২৪-৪৩) সিন্ধুর সেনাপ্রধান জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান কয়েকটি বিজয় অভিযানে লিপ্ত হন। কিরাজ আক্রমণে তিনি '*আকস্মিকভাবে হানা দিয়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ছাড়াও লুটতরাজ ও লোকজনকে বন্দি করেন।*' উজ্জেন ও বাহারিমাদ আক্রমণে তিনি শহরতলীর বাড়িঘর ভস্মীভূত করেন ও বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন।[১৯] লুণ্ঠিত মালামালের মধ্যে অনিবার্যরূপে থাকতো বন্দিকৃত ক্রীতদাসরা।

৭৫০ খৃষ্টাব্দে গোঁড়ামির ভিত্তিতে আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠার পর খলিফা আল-মনসুর (শাসনকাল ৭৫৫-৭৪) হিন্দু ভূখণ্ডগুলোর বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধের জন্য হাসাম বিন আমরু'কে প্রেরণ করেন। আমরু '*কাশ্মীরকে পদানত করে বহু বন্দি ও ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন*'।[২০] তিনি কান্দাহার ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী অনেক স্থানে আক্রমণ চালান এবং প্রতিটি বিজয়ে অবশ্যই বহু লোককে বন্দি করে নিয়ে যান, যা লিখিত হয়নি।

বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইবনে আসির (আথির) 'কামিল উৎ-তাওয়ারিখ' গ্রন্থে লিখেছেন: খলিফা আল-মাহদির শাসনামলে ৭৭৫ সালে সেনাধ্যক্ষ আব্দুল মালেক ভারতের বিরুদ্ধে একটা বিশাল নৌ-জিহাদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তারা বারাদায় জাহাজ থেকে নেমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের সাথে দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী জয়ী হয়। আসির জানান: '*কিছু সংখ্যক মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়, বাকিদেরকে হত্যা করা হয়। কুড়ি জন মুসলিম এ ধর্মযুদ্ধে প্রাণ হারায়।*'[২১] কতজন বন্দিকে তারা তুলে নিয়ে যায়, তা লিখিত হয়নি।

খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৩৩) সেনাপতি আফিক বিন ঈসা বিদ্রোহী হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। তাদেরকে বন্দি ও হত্যা করার পর জীবিত ২৭,০০০ পুরুষ, নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস করা হয়।[২২] পরবর্তী খলিফা আল-মুতাসিমের আমলে সিন্ধুর গভর্নর আমরান বিন মুসা মুলতান ও কান্দাবিল আক্রমণ ও জয় করেন এবং '*অধিবাসীদেরকে বন্দি করে নিয়ে যান*'।[২৩] ৮৭০ সালের দিকে ইয়াকুব লেইস আর-রুখাজ (আরাকোশিয়া) আক্রমণ করেন এবং ক্রীতদাসকৃত বাসিন্দাদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন।[২৪]

গজনীর হানাদারদের দ্বারা: মোহাম্মদ বিন কাসিমের লুণ্ঠনকার্যের প্রায় তিন শতাব্দী পর সুলতান মাহমুদ উত্তর ভারতে ১৭ বার চরম ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালান (১০০০-২৭)। এসব হামলায় তিনি ব্যাপক গণহত্যা, লুণ্ঠন, বহু মন্দির ধ্বংস ও অগণিত মানুষকে ক্রীতদাস বানান। আল-উতবি লিখেছেন: ১০০১-০২ সালে রাজা জয়পালকে আক্রমণ করলে '*আল্লাহ তাঁর বন্ধুদেরকে এমন বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠনদ্রব্য প্রদান করেন যা সীমাহীন ও বর্ণনার অতীত, এবং সে সঙ্গে **পাঁচ লক্ষ** ক্রীতদাস নারী ও পুরুষ।*' বন্দিদের মধ্যে ছিলেন রাজা জয়পাল নিজে, তার সন্তানরা, নাতিরা ও ভাতিজারা, তার গোষ্ঠির প্রধানবর্গ এবং তার আত্মীয়-স্বজন।[২৫] মাহমুদ তাদেরকে বিক্রির জন্য গজনিতে নিয়ে যান।

আল-উতবি জানান: '*১০১৪ সালে নিন্দুনা (পাঞ্জাবে) আক্রমণের ফলে ক্রীতদাসের এতই প্রাচুর্য হয় যে, তাদের দাম একেবারে সস্তা হয়ে পড়ে। স্বদেশের বিশিষ্ট ও সম্মানিত লোকেরা (গজনীর) সাধারণ দোকানদারের ক্রীতদাস হয়ে অবমানিত হয়।*' পরের বছর থানেসার (হরিয়ানায়) আক্রমণে, জানান ফেরিশতা: মুসলিম বাহিনী '*২০০,০০০ বন্দিকে গজনীতে নিয়ে আসে; এর ফলে রাজধানী গজনীকে ভারতের একটা নগরীর মতো দেখায়। সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের কয়েকজন করে ক্রীতদাস পুরুষ ও বালিকা ছিল।*' ১০১৯ সালের ভারত অভিযান থেকে তিনি ৫৩,০০০ বন্দিকে নিয়ে ফিরেন। মাহমুদের ১৭ বার ভারত আক্রমণের মধ্যে কেবলমাত্র কাশ্মীর অভিযানটি ব্যর্থ হয়েছিল। বিজয়ী অভিযানগুলোতে তিনি লুণ্ঠনের মাধ্যমে প্রচুর মালামাল হস্তগত করেন, যার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ক্রীতদাস অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে তাদের সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয়নি। 'তারিখই আলফি' গ্রন্থটি উল্লেখ করেছে যে, তিনি খলিফার জন্য এক-পঞ্চমাংশ লুণ্ঠন দ্রব্য পৃথক করে রাখতেন, যার মধ্যে ছিল ১৫০,০০০ ক্রীতদাস।[২৬] তার অর্থ দাঁড়ায়, সুলতান মাহমুদ নিদেন পক্ষে ৭৫০,০০০ ক্রীতদাস ধরে এনেছিলেন ভারত থেকে।

সুলতান মাহমুদ (মৃত্যু ১০৩০) পাঞ্জাবে একটা ইসলামি সুলতানাতের প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেন, যেখানে গজনবি রাজবংশ ১১৮৬ সাল পর্যন্ত শাসন চালায়। ১০৩৩ সালে সুলতান মাহমুদের অখ্যাত পুত্র সুলতান মাসুদ-১ '*কাশ্মীরের সুরসুতি দুর্গটি আক্রমণ করেন। সেখানে নারী*

---

[১৯] Ibid, p. 125-26
[২০] Ibid, p. 127
[২১] Ibid, Vol. II, p. 246
[২২] Ibid, p. 247-48
[২৩] Ibid, Vol. I, p. 128
[২৪] Ibid, Vol. II, p. 419
[২৫] Ibid, p. 25-26
[২৬] Lal (1994), p. 19-20

ও শিশু ব্যতীত দুর্গের সমস্ত সেনাকে হত্যা করা হয়। বন্দি নারী ও শিশুদের ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়'।[২৭] ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাসুদ গুরুতর অসুস্থ হলে অঙ্গীকার করেন যে, তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হান্সির বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ চালনা করবেন। সুস্থ হয়ে উঠে তিনি হানসি আক্রমণ ও দখল করেন। এ আক্রমণে, জানান আবুল ফজল বাইহাকি, *'ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোকদেরকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়।'*[২৮]

১০৭৯ খ্রিষ্টাব্দে দুর্বল গজনবি সুলতান ইব্রাহিম পাঞ্জাবের জেলাগুলো আক্রমণ করেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধে উভয়পক্ষেই ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। 'তারিখ-ই আলফি' ও 'তাবাকাত-ই-আকবরী' গ্রন্থদ্বয় জানায়, পরিশেষে তার বাহিনী জয়লাভ করে এবং বিপুল ধনসম্পদ ও ১০০,০০০ ক্রীতদাস কব্জা করে, যাদেরকে গজনীতে প্রেরণ করা হয়।[২৯]

গোরী দখলদারদের দ্বারা: মোহাম্মদ গোরী, যিনি ছিলেন একজন আফগান, তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে ইসলামি আক্রমণের তৃতীয় তরঙ্গ পরিচালনা করে দিল্লিতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (১২০৬)। তার ১১৯৪ সালের বেনারস আক্রমণে, ইবনে আসির লিখেছেন: *'হিন্দু হত্যাকাণ্ড ছিল অগণন; নারী ও শিশু ব্যতীত কাউকে জীবিত রাখা হয়নি। ধরিত্রী আতঙ্কে শিউরে না উঠা পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন থামেনি।'*[৩০] নারী ও শিশুদেরকে যথারীতি ক্রীতদাসরূপে কব্জা করা হয়। তার সেনাধ্যক্ষ কুতুবদ্দিন আইবেক ১১৯৫ সালে গুজরাটের রাজা ভীমকে আক্রমণ করে ২০,০০০ ক্রীতদাস আটক করেন।[৩১] হাসান নিজামী লিখেছেন: ১২০২ সালে তার কালিঞ্জর আক্রমণে *'পঞ্চাশ হাজার মানুষ ক্রীতদাস হয় এবং হিন্দুদের রক্তে সমতলভূমি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।'*[৩২] ১২০৬ সালে মোহাম্মদ গোরী অবাধ্য খোখার বিদ্রোহীদের দমনে অগ্রসর হন; এরা মুলতান অঞ্চলে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিদ্রোহীদেরকে নিধন এতই ব্যাপক ছিল যে, তাদেরকে পোড়ানোর জন্য আগুন জ্বালাবার লোকও ছিল না। নিজামী আরো লিখেছেন: *'অগণিত ক্রীতদাস ও অস্ত্রশস্ত্র বিজয়ীদের হস্তগত হয়।'*[৩৩] সুলতান গোরী ও আইবেকের ক্রীতদাস বানানোর কৃতিত্বের বর্ণনায় 'ফখর-ই-মুদাব্বির' গ্রন্থটি লিখেছে: *'এমনকি গরিব (মুসলিম) বাসিন্দারাও বহু ক্রীতদাসের মালিক বনে যায়।'*[৩৪] ফেরিস্তা জানান: *'মোহাম্মদ গোরী কর্তৃক তিন থেকে চার লক্ষ খোখার ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়।'*[৩৫] এসব ধর্মান্তরকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রীতদাসকরণের মাধ্যমে সাধিত হয়েছিল।

১২০৬ সালে নিজেকে ভারতের প্রথম সুলতান ঘোষণা করে আইবেক হান্সি, মীরাট, দিল্লি, রাঁথাম্বর ও কল (আলিগড়) জয় করেন। তার শাসনকালে (১২০৬-১০) আইবেক অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করে দিল্লি থেকে গুজরাট, লক্ষ্ণৌতি থেকে লাহোর, পর্যন্ত অনেক এলাকা কব্জা করেন। প্রত্যেক বিজয়ে প্রচুর ক্রীতদাস কব্জা করা হয়, যদিও তাদের সংখ্যা লিখিত হয়নি। তবে আইবেকের যুদ্ধে ক্রীতদাস শিকারের বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে ইবনে আসিরের এ দাবিতে যে: '(তিনি) *হিন্দু প্রদেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন... তিনি বহু লোককে হত্যা করেন এবং যুদ্ধবন্দি ও লুণ্ঠন দ্রব্যসহ ফিরে আসেন।'*[৩৬]

একই সময়ে বখতিয়ার খিলজি পূর্ব-ভারতের বিহার ও বাংলায় হত্যাযজ্ঞ ও ক্রীতদাসকরণেপূর্ণ ব্যাপক দখলাভিযান চালান। তিনি কত সংখ্যক লোককে ক্রীতদাস করেছিলেন তারও কোনো তথ্য-দলিল রাখা হয়নি। বখতিয়ার সম্পর্কে ইবনে আসির বলেছেন, অত্যন্ত সাহসী ও উদ্দীপনাপূর্ণ বখতিয়ার মুঙ্গির (বাংলা) ও বিহারে আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক লুটতরাজ করে বিপুল লুণ্ঠিত মালামাল কব্জা করেন এবং অসংখ্য ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও 'মানুষ' (ক্রীতদাস) হস্তগত করেন।[৩৭] ১২০৫ সালে বখতিয়ারের বাংলার লক্ষ্মণসেনকে আক্রমণে, লিখেছেন ইবনে আসির: *'তার সমস্ত কোষাগার, স্ত্রী, পরিচারিকা, সঙ্গী-সাথী ও নারীরা সবাই হানাদারের হস্তগত হয়।'*[৩৮]

কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লিতে স্থায়ী হওয়ার পর ভারতে আটককৃত ক্রীতদাসদেরকে আর দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো না গজনী থেকে আসা সুলতান মাহমুদ ও মোহাম্মদ গোরীর সময়ের মতো। এরপর থেকে বন্দিদেরকে রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কাজে এবং সেনাধ্যক্ষ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সৈনিকদের কাজে লাগানো হতো। বাকি ক্রীতদাসদেরকে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলোতে বিক্রিত করা হতো, যা ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ প্রথম।

সুলতান ইলতুতমিস থেকে বলবনের সময়কালে (১২১০-১২৮৫): পরবর্তী সুলতান ইলতুতমিস (শাসনকাল ১২১০-৩৬) তার শাসনকালের প্রথম কয়েক বছর ক্ষমতা থেকে বহিষ্কৃত মুসলিম তুর্ক প্রতিপক্ষকে দমনে কাটিয়ে দেন। তিনি চেঙ্গিস খানের আক্রমণের ভয়েও ভীত ছিলেন। ক্ষমতা পোক্ত করার পর তিনি ১২২৬ সালে রাঁথাম্বর আক্রমণ করেন। সে আক্রমণে, লিখেছেন মিনহাজ সিরাজ: *'তার*

---

২৭. *History of Punjab: Ghanznivide Dynasty*, http://www.punjabonline. com/servlet/library.history?Action=Page&Param=13
২৮. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 135, 139-40
২৯. Ibid, Vol. V, p. 559-60; Lal (1994), p. 23
৩০. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 251
৩১. Ferishtah MQHS (1829) *History of the Rise of the Mahomedan Power in India*, translated by John Briggs, D.K. Publishers & Distributors (P) Ltd, New Delhi, Vol. I, p. 111
৩২. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 232; also Lal (1994), p. 42
৩৩. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 234-35
৩৪. Lal (1994), p. 44
৩৫. Ibid, p. 43
৩৬. Elliot & Dawson, Vol. II, p. 251
৩৭. Ibid, p. 306
৩৮. Ibid, p. 308-09

অনুসারীদের হাতে বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠনদ্রব্য চলে আসে';[৩৯] স্পষ্টতই লুণ্ঠনদ্রব্যের মধ্যে ছিল ক্রীতদাস। সিরাজ ও ফেরিশতা জানান, ১২৩৪-৩৫ সালের উজ্জেন আক্রমণে তিনি '*অবাধ্য লোকদের নারী ও শিশুদেরকে*' বন্দি করেন।[৪০]

ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর সুলতানের ক্ষমতার দুর্বলতার কারণে ক্রীতদাসকরণ কার্যক্রমে কিছুদিনের জন্য ভাটা পড়ে। ফেরিশতা লিখেছেন: ১২৪৪ সালে উলুগ খান বলবনের নেতৃত্বে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ মুলতানের জুদ পর্বতের গুক্কার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান এবং '*সকল বয়সী ও উভয় লিঙ্গের কয়েক হাজার গুক্কারকে বন্দি করে আনেন।*' [৪১]

১২৪৮ সালে উলুগ খান বলবন কারা আক্রমণ করেন। সিরাজ লিখেছেন: সেখানে তার '*বিধর্মীদেরকে বন্দিকরণ ও আটককৃত মহান রানাদের (হিন্দু যুবরাজ) পোষ্যদের সংখ্যা ছিল অগণন।*' রানা 'দালাকি ওয়া মালাকি'কে আক্রমণে '*তিনি বন্দি ও সে হতভাগার স্ত্রী-পুত্র ও পোষ্যদেরকে নিয়ে আসেন এবং বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত মালামাল কব্জা করেন।*'[৪২] ১২৫২ সালে বলবন মালোয়া'র মহান রানা জাহির দেবকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। সিরাজ লিখেছেন, '*বহু বন্দি বিজয়ীদের হাতে পড়ে।*'[৪৩]

১২৫৩ সালে রাঁথাম্বর আক্রমণ করে বলবন বহু ক্রীতদাস কব্জা করেন এবং ১২৫৯ সালে হরিয়ানা আক্রমণে বহুসংখ্যক নারী-শিশুকে ক্রীতদাস বানান। বলবন কাম্পিল, পাতিয়ালি ও ভোজপুরে দু'বার করে আক্রমণ করেন এবং প্রতিবার বিপুল সংখ্যক নারী-শিশুকে ক্রীতদাস বানান। কাটিহারে আট বছরের উর্ধ্ব-বয়সী বিধর্মীদেরকে পাইকারি হারে হত্যার পর তাদের নারী ও শিশুদের তিনি আটক করে নিয়ে আসেন, লিখেছেন ফেরিশতা। ১২৬০ সালে বলবন রাঁথাম্বর, মেওয়াত ও সিউয়ালিক আক্রমণ করে তার যোদ্ধাদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দেন: যারা একজন জীবিত বন্দিকে আনবে, তারা পাবে দুই তাঙ্খা (রৌপ্য মুদ্রা), আর বিধর্মীদের ছিন্ন-মস্তক আনলে পাবে এক তাঙ্খা। ফেরিশতা লিখেছেন: অচিরেই তার সমীপে তিন থেকে চারশ' জীবিত বন্দি ও ছিন্ন-মস্তক এনে হাজির করা হয়। সুলতান নাসিরুদ্দিনের (মৃত্যু ১২৬৬) অধীনে সেনানায়ক হিসেবে কাজ করার সময় বলবন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে বহু হামলা পরিচালনা করেন। কিন্তু কী পরিমাণ বন্দি তিনি কব্জা করেছিলেন তা লিখিত হয়নি। তবে তিনি যে কী বিপুল পরিমাণ ক্রীতদাস সংগ্রহ করেছিলেন তা অনুমান করা যাবে এ ঘটনা থেকে যে, সুলতান নাসিরুদ্দিন লেখক মিনহাজ সিরাজকে তার খোরাসানবাসী ভগ্নির জন্য চল্লিশ জন ক্রীতদাসকে উপহার দিয়েছিলেন।[৪৪]

বলবন ১২৬৫ সালে ক্ষমতা দখল করে সুলতান হন ও গিয়াসউদ্দিন বলবন নাম ধারণ করেন। পূর্ববর্তী সুলতানের সেনাপতি থাকাকালীন বলবন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তার প্রথম কর্তব্য হয়ে পড়ে হাজার হাজার অবাধ্য হিন্দু বিদ্রোহী বা মুয়াত্তিকে নির্মূল করা। সে অভিযানে তিনি '*বিদ্রোহীদের গ্রামগুলো ধ্বংস, পুরুষদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করার নির্দেশ দেন।*'[৪৫]

খিলজি শাসনকালে: খিলজি (১২৯০-১৩২০) ও তুঘলক (১৩২০-১৪১৩) শাসনামলে ভারতে মুসলিম শাসন বিশাল সেনাবাহিনী ও বিস্তৃত ভূখণ্ড নিয়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আফিফ উল্লেখ করেছেন, সুলতানের ক্ষমতা এ সময় এতই ব্যাপক ছিল যে, '*কারো সাহস ছিল না উচ্চ-বাচ্য করার*'। বহু হিন্দু বিদ্রোহ দমনের জন্য অভিযান চালানোর পাশাপাশি তিনি বিধর্মী অঞ্চলগুলোকে মুসলিম নিয়ন্ত্রণে আনার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়ও বহু অভিযান চালান সেসব অঞ্চলে। এসব অভিযানে তিনি বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য কব্জা করেন, যার মধ্যে ছিল ক্রীতদাস; কিন্তু সে সম্পর্কে লিখিত দলিল খুব কম। সম্ভবত এর কারণ হলো: ক্রীতদাসকরণ ও লুণ্ঠন এসময় একেবারে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সমসাময়িক কালের লেখকদের রেখে যাওয়া সামান্য কিছু প্রামাণ্য দলিল বিবেচনা করলে সে সময়ে ক্রীতদাসকরণের পরিসর সম্পর্কে সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে। খিলজি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দিন খিলজির শাসনকালে (১২৯০-৯৬) হিন্দু বিদ্রোহীদের দমন ও সুলতানাতের সীমানা সম্প্রসারণের নিমিত্তে নির্মম ও নিষ্ঠুর অভিযান শুরু করা হয়। তিনি কাটিহার, রাঁথাম্বর, জেইন, মালোয়া ও গোয়ালিয়রে অভিযান চালান। রাঁথাম্বর ও জেইন অভিযানে তিনি মন্দিরসমূহ বিধ্বস্ত এবং বিপুল লুণ্ঠন ও বন্দি সংগ্রহের মাধ্যমে একটা "স্বর্গের নরক" সৃষ্টি করেন, লিখেছেন আমির খসরু। আমির খসরু আরো লিখেছেন: মালোয়া অভিযান থেকে বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠন দ্রব্য (যার মধ্যে সর্বদা থাকতো ক্রীতদাস) দিল্লিতে আনা হয়।[৪৬]

পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি (শাসনকাল ১২৯৬-১৩১৬) ক্রীতদাসকরণের ক্ষেত্রে আগের সব সুলতানকে ছাড়িয়ে যান। তিনি ১২৯৯ সালে গুজরাটে এক বড় ধরনের অভিযান চালিয়ে সবগুলো বড় বড় শহর ও নগর, যেমন নাহারওয়ালা, আসাভাল, ভানমানথালি, সুরাট, ক্যামবে ও সোমনাথ তছনছ করেন। মুসলিম ইতিহাসবিদ ইসামি ও বারানী জানান: তিনি এ অভিযানে বিপুল পরিমাণে লুণ্ঠিত মালামাল ও উভয় লিঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক বন্দি সংগ্রহ করেন। ওয়াসাফের তথ্য অনুযায়ী, মুসলিম বাহিনী বিপুলসংখ্যক সুন্দরী তরুণীকে বন্দি করে, যার সংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০, এবং সে সঙ্গে উভয় লিঙ্গের শিশুদেরকেও বন্দি করে নিয়ে যায়। ১৩০১ সালে রাঁথাম্বর ও ১৩০৩ সালে চিতোর

---

[৩৯] Ibid, p. 325
[৪০] Lal (1994), p. 44-45
[৪১] Ferishtah, Vol. I, p. 130
[৪২] Elliot & Dawson, Vol. II, p. 348; also Ferishtah, Vol. I, p. 131
[৪৩] Elliot & Dawson, Vol. II, p. 351
[৪৪] Lal (1994), p. 46-48
[৪৫] Elliot & Dawson, Vol. III, p. 105
[৪৬] Lal (1994), p. 48

আক্রমণ করা হয়। চিতোর আক্রমণে ৩০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়েছিল এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মুসলিমরা পরাজিতদের নারী-শিশুকে ক্রীতদাস করে। এ সময় কিছু রাজপুত নারী জওহর বরণ করে আত্মহত্যা করে। ১৩০৫ থেকে ১৩১১ সালের মধ্যে মালোয়া, সেভানা ও জালোর অভিযান করে বিপুল সংখ্যক লোককে বন্দি করা হয়। সুলতান আলাউদ্দিন তার রাজস্থান অভিযানেও বহু ক্রীতদাস আটক করেন। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে ক্রীতদাস ধরা যেন শিশু-খেলার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমির খসরু লিখেছেন: '*তুর্করা তাদের খেয়াল-খুশিমতো যে কোনো হিন্দুকে ধরতে, কিনতে বা বিক্রি করতে পারতো।*' ক্রীতদাসকরণ এতটাই ব্যাপক ছিল যে, সুলতান '*তার ব্যক্তিগত কাজের জন্য ৫০,০০০ হাজার দাস-বালক নিয়োজিত ছিল এবং তার প্রাসাদে ৭০,০০০ ক্রীতদাস কাজ করতো*', জানান আফিফ ও বারানী। বারানী সাক্ষ্য দেন: '*সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালে দিল্লির দাস-বাজারে নতুন নতুন দলে অবিরাম বন্দিদের আনা হতো।*'[৪৭]

তুঘলক শাসনামলে: ১৩২০ সালে তুঘলকরা ক্ষমতা দখল করে। ভারতে সবচেয়ে শিক্ষিত ও জ্ঞানী মুসলিম শাসকদের মধ্যে একজন ছিলেন মোহাম্মদ শাহ তুঘলক (১৩২৫-৫১) এবং সুলতানাত আমলের (১২০৬-১৫২৬) সবচেয়ে শক্তিধর শাসক। তার ক্রীতদাস ধরার কুখ্যাত উদ্দীপনা আলাউদ্দিন খিলজির কৃতিত্বকেও ম্লান করে দিয়েছিল। তার ক্রীতদাস আটক করা সম্বন্ধে শিহাবুদ্দিন আহমদ আব্বাস লিখেছেন: '*সুলতান বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তার অন্তরের উদগ্র বাসনা পূরণে কখনো পিছপা হননি... প্রতিদিন অত্যন্ত সস্তা দরে হাজার হাজার ক্রীতদাস বিক্রি হয়, বন্দিদের সংখ্যা এমনই বিপুল।*' তার কুখ্যাত শাসনামলে ভারতের দূর-দূরান্তে ইসলামি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সুদূর বাংলা ও দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বহু অভিযান পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি চরম নিষ্ঠুরতার সাথে ১৬টি প্রধান প্রধান বিদ্রোহ নিস্তব্ধ করেন। এসব বিজয় ও দমন অভিযানের অনেকগুলোতে বিপুল পরিমান লুণ্ঠিত দ্রব্য কব্জা করেন, যার মধ্যে অনিবার্যরূপেই থাকতো প্রচুর সংখ্যক ক্রীতদাস। ক্রীতদাসের প্রাচুর্য এমন ছিল যে, পরিব্রাজক ইবনে বতুতা যখন দিল্লিতে পৌঁছেন, সুলতান তাকে ১০ জন ক্রীতদাসী উপহার দেন।[৪৮] ইবনে বতুতার নেতৃত্বে সুলতান চীন সম্রাটের নিকট উপঢৌকনসহ এক কূটনৈতিক বহর পাঠান। সে বহরের সঙ্গে ছিল একশ' ফর্সা ক্রীতদাস এবং একশ' হিন্দু নৃত্যশিল্পী ও গায়িকা।[৪৯] সুলতান ইলতুতমিস ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের (মৃত্যু ১৩৮৮) শাসনকালে খলিফা ও শাসকদের নিকট উপহারস্বরূপ ক্রীতদাস প্রেরণ করা ছিল সাধারণ ঘটনা। ইবনে বতুতা লিখেছেন: সুলতান সারা বছর ধরে ক্রীতদাস সংগ্রহ করতেন এবং ইসলামের প্রধান দুই ঈদ-উৎসবের দিন তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিতেন।[৫০] স্পষ্টতই এটা ছিল ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে।

পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (শাসনকাল ১৩৫১-৮৮) ভারতীয়দের প্রতি ছিলেন যথেষ্ট দয়ালু, কারণ তিনিই প্রথম মুসলিমদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয়দেরকে (ধর্মান্তরিত মুসলিম) সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন। তার শাসনাধীনেও বিধর্মীদেরকে ক্রীতদাসকরণ অত্যন্ত জোরের সাথেই চলতে থাকে। আফিফ সাক্ষ্য দেন: তার প্রাসাদে তিনি ১৮০,০০০ তরুণ ক্রীতদাস বালককে সংগ্রহ করেছিলেন।[৫১] পূর্বসূরী মোহাম্মদ তুঘলকের মতোই তিনি সারা বছর হাজার হাজার নারী ও পুরুষ ক্রীতদাস আটক করতেন এবং ঈদ-উৎসবের দিন তাদের বিয়ে দিতেন। আফিফ জানান: ফিরোজ শাহ তুঘলকের অধীনে '*ক্রীতদাসের সংখ্যা অগণিত হয়ে উঠে*' এবং '*দেশের প্রতিটি কেন্দ্রে এ প্রথার (দাসপ্রথার) ভিত্তি মজবুত হয়ে উঠে।*' এর পরপরই সুলতানাতটি ভেঙ্গে কয়েকটি পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়, কিন্তু দেশের প্রতিটি কেন্দ্রে বিধর্মীদেরকে দাসকরণের প্রক্রিয়া স্বাভাবিকরূপে চলতে থাকে, লিখেছেন আফিফ।[৫২]

আমির তিমুরের আক্রমণে: মধ্য এশিয়া থেকে আগত আমির তিমুর একজন 'গাজী' কিংবা 'শহীদ' হওয়ার ইসলামি গৌরব অর্জনের খায়েশে ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হন (১৩৯৮-৯৯)। দিল্লি পৌঁছাবার প্রাক্কালে তিনি ইতিমধ্যে ১০০,০০০ বন্দিকে কব্জা করেছিলেন। দিলি-আক্রমণের পূর্বে তিনি সেসব বন্দিকে নির্বিচারে হত্যা করেন। দিল্লি আক্রমণ থেকে শুরু করে তার রাজধানীতে ফেরা পর্যন্ত পথিমধ্যে তিনি রেখে যান বর্বরতার লোমহর্ষক ও মর্মান্তিক ইতিহাস: হত্যা, ধ্বংসলীলা, লুটতরাজ ও ক্রীতদাসকরণ, যা তিনি তার নিজস্ব স্মৃতিকথা 'মালফুজাত-ই তিমুরী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[৫৩]

১৩৯৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তার দিল্লি আক্রমণে, লিখেছেন তিমুর: '*১৫,০০০ তুর্ক সেনা হত্যা, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়। লুণ্ঠনের মালামাল এতই বিপুল ছিল যে, প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে একশ জন করে পুরুষ, নারী ও শিশুকে ভাগে পেয়েছিল। কারো ভাগেই কুড়ি জনের কম ক্রীতদাস পড়েনি।*' যদি প্রতিটি যোদ্ধা গড়ে ৬০ জন বন্দিকেও পেয়ে থাকে, সেদিন কমপক্ষে ১,০০০,০০০ (১০ লাখ) ক্রীতদাস কব্জা করা হয়েছিল (হিসাবের ভুলক্রমে ইংরেজী সংস্করণে লিখা হয়েছে ১ লাখ)।

তিমুর বর্ণনা করেছেন, মধ্য এশিয়ায় তার রাজধানীতে ফেরার পথে তিনি সেনানায়কদেরকে নির্দেশ দেন যে, পথিমধ্যে প্রত্যেক দুর্গ, শহর ও গ্রামে হানা দিয়ে সমস্ত বিধর্মীকে তরবারির খাদ্যে পরিণত করতে। তার বর্ণনা মতে: '*আমার সাহসী সঙ্গীরা তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা করে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বন্দি করে।*'

৪৭. Ibid, p. 49-51

৪৮. Ibid, p. 51

৪৯. Gibb HAR (2004) *Ibn Battutah: Travels in Asia and Africa*, D.K. Publishers, New Delhi, p. 214

৫০. Lal (1994), p. 51-52

৫১. Elliot & Dawson, III, p. 297

৫২. Lal (1994), p. 53

৫৩. Elliot & Dawson, Vol. III, p. 435-71; Bostom, p. 648-50

কুতিলায় পৌঁছানোর পর তিনি সেখানকার বিধর্মীদেরকে আক্রমণ করেন। তিমুর লিখেছেন: *'সামান্য প্রতিরোধের পর শত্রুরা পলায়ন করে, কিন্তু তাদের অনেকেই আমার সৈনিকদের তলোয়ারের নিচে পড়ে। বিধর্মীদের সকল স্ত্রী ও সন্তানকে বন্দি করা হয়।'*

সামনে অগ্রসর হয়ে গঙ্গা-স্নান উৎসবের সময় গঙ্গাতীরে পৌঁছানোর পর তার যোদ্ধারা *'বহু অবিশ্বাসীকে হত্যা করে এবং যারা পাহাড়ে পালিয়ে যায় তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে।' 'লুণ্ঠনের মালামালের পরিমাণ ও সংখ্যা, যা আমার যোদ্ধাদের হস্তগত হয়, তা সকল গণনা ছাড়িয়ে যায়,'* লিখেছেন তিমুর। লুণ্ঠন দ্রব্যের মধ্যে অবশ্যই ছিল ক্রীতদাস।

তিনি সিউওয়ালিক পৌঁছালে, লিখেছেন তিমুর, *'তাদেরকে দেখেই বিধর্মী 'গাবর'রা পলায়ন করে। ধর্মযোদ্ধারা তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে নিহতদের স্তূপ বানায়।'* অগণিত লুণ্ঠন-দ্রব্য তার বাহিনীর হাতে আসে এবং *'উপত্যকার সমস্ত হিন্দু নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করা হয়।'*

নদীর অপর তীরে রাজা রতন সেন তিমুরের অগ্রসর হওয়ার খবর শুনে তার যোদ্ধাদের নিয়ে ত্রিসর্তর (কাংড়ার) দুর্গের ভিতরে আশ্রয় নেন। তিমুর লিখেছেন: দুর্গটি আক্রমণ করা হলে *'হিন্দুরা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে এবং আমার বিজয়ী যোদ্ধারা তাদেরকে ধাওয়া করলে মাত্র কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠন দ্রব্য কব্জা করে, যা ছিল গণনার অতীত। প্রত্যেকে ১০ থেকে ২০ জন করে ক্রীতদাস পায়।'* এর অর্থ দাঁড়ায়: এ আক্রমণে প্রায় ২ লাখ ২৫ হাজার লোককে ক্রীতদাস বানানো হয় (ভুলক্রমে ইংরেজী সংস্করণে লিখা হয়েছে ২০ থেকে ৩০ হাজার)।

সিউওয়ালিক উপত্যকার অপর অংশে ছিল নগরকোট নামক হিন্দুস্তানের একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। তিমুর উপসংহার টেনেছেন: এ আক্রমণে *'পবিত্র ধর্মযোদ্ধারা মৃতদেহের বিশাল স্তূপ সৃষ্টি করে এবং বিপুল সংখ্যক বন্দিসহ ব্যাপক পরিমাণ লুণ্ঠিত মালামাল ও ক্রীতদাস নিয়ে বিজয়ী বীরেরা অতি উল্লসিত চিত্তে ফিরে যায়।'*

দিল্লি থেকে ফেরার পথে তিমুর হিন্দু দুর্গ, নগরী ও গ্রামে প্রধান পাঁচটি আক্রমণ করেন। এছাড়াও অন্যান্য ছোট ছোট আক্রমণ করা হয়েছিল এবং প্রতিটিতে ক্রীতদাস শিকার করা হয়েছিল। কব্জাকৃত ক্রীতদাসদের আনুমানিক সংখ্যা একমাত্র কাংড়া আক্রমণের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, যা ছিল ২ লাখ ২৫ হাজারের মতো। অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংখ্যায় ক্রীতদাস ধরা হলে তিনি তার ফেরার পথে ১০ থেকে ১৫ লাখ ক্রীতদাস সংগ্রহ করেছিলেন। এর সঙ্গে যদি দিল্লিতে কব্জাকৃত ক্রীতদাসদের যুক্ত করা হয়, তাহলে তিনি অন্তত ২০ থেকে ২৫ লাখ ভারতীয় নাগরিককে ক্রীতদাস বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তার রাজধানীতে। তিনি দিল্লিতে কয়েক হাজার শিল্পী ও কারিগরও বাছাই করেছিলেন তার রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য।[৫৪.]

সৈয়দ ও লোদী শাসনালে (১৪০০-১৫২৫): তিমুরের অভিযানের পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে কত সংখ্যক লোককে ক্রীতদাস বানানো হয়, তা লেখা হয়নি; তবে বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল থেকে ভাসাভাসা আভাস পাওয়া যায় মাত্র।[৫৫.] দিল্লির ক্ষমতা বিধ্বস্ত করে তিমুরের প্রত্যাবর্তনের পর স্বল্প সময়ের জন্য তুঘলকরা ও পরে সৈয়দরা তাদের ক্ষমতা সংহত করতে অনেক অভিযান পরিচালনা করেন। ফেরিশতা লিখেছেন: সুলতান সৈয়দ মুবারকের শাসনামলে (১৪১৩-৩৫) মুসলিম বাহিনী কাটিহার লুণ্ঠন করে ও বহু রাথোর রাজপুতকে ক্রীতদাস বানায় (১৪২২)। ১৪২৩ সালে আলয়ারে বহু মুয়াত্তি বিদ্রোহীকে ও ১৪৩০ সালে হুলকান্তের (গোয়ালিয়রে) রাজার প্রজাদেরকে বন্দি ও ক্রীতদাসরূপে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়।[৫৬.]

১৪৩০ সালে কাবুলের আমির শেখ আলী পাঞ্জাবের শিরহিন্দ ও লাহোর আক্রমণ করেন। ফেরিশতা লিখেছেন: লাহোরে *'গুণে গুণে ৪০,০০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয় ও বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়'*; টুলুম্বায় (মুলতানে) তার বাহিনী *'স্থানটি লুটপাট করে, অস্ত্রবহনে সক্ষম সব পুরুষকে হত্যা করে এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে বন্দি করে নিয়ে যায়।'*[৫৭.]

সৈয়দদের অনুসরণে লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬) সুলতানাতের কর্তৃত্ব পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্রীতদাসকরণ প্রক্রিয়া যথারীতি অব্যাহত রাখে। লোদী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান বাহ্লুল *'ছিলেন এক স্বেচ্ছাচারী লুণ্ঠনকারী এবং বন্দিদেরকে দিয়ে তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন।'* নিমসারের (হারদয় জেলায়) বিরুদ্ধে আক্রমণে তিনি *'সেখানকার বাসিন্দাদের হত্যা ও ক্রীতদাসকরণের মাধ্যমে স্থানটিকে একেবারে জনশূন্য করে ফেলেন।'* তার উত্তরসূরী সিকান্দার লোদী রেওয়া ও গোয়ালিয়র অঞ্চলে একই দৃশ্যের অবতারণা করেন।[৫৮.]

মুঘল শাসনামলে (১৫২৬...): ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে সিকান্দার লোদীকে পরাভূত করার মাধ্যমে আমির তিমুরের গর্বিত উত্তরসূরী জহিরুদ্দিন শাহ বাবর ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তার আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা 'বাবরনামা'য় কোরান থেকে তুলে ধরা আয়াত ও সূত্রের অনুপ্রেরণায় তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ অভিযান চালান বলে বর্ণনা করেছেন। বাবরের শাসনামলে তার ক্রীতদাসকরণের কথা পদ্ধতিগতভাবে লিখিত হয়নি।

বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত তৎকালীন ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য বাজাউর আক্রমণ সম্বন্ধে বাবর লিখেছেন: *'তাদের উপর সাধারণ হত্যাকাণ্ড চালানো হয় এবং তাদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে বন্দি করা হয়। আনুমানিক ৩,০০০ লোকের মৃত্যু ঘটে। (আমি) আদেশ*

---

৫৪. Lal (1994), p. 86
৫৫. Ibid, p. 70-71
৫৬. Feishtah, Vol. I, p. 299-303
৫৭. Ibid, p. 303, 306
৫৮. Lal (1994), p. 86

দিলাম যে, উচ্চস্থানে ছিন্ন-মস্তক দ্বারা একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করা হোক।'[৫৯] একইভাবে তিনি আগ্রায় হিন্দুদের ছিন্ন-মস্তক দিয়ে স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। ১৫২৮ সালে তিনি কনৌজের শত্রুদেরকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন এবং '*তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদেরকে বন্দি করা হয়*'।[৬০] এসব দৃষ্টান্ত ইঙ্গিত করে যে, বাবরের 'জিহাদ' অভিযানগুলোতে নারী-শিশুদেরকে বন্দি ও ক্রীতদাসকরণ ছিল একটা সাধারণ নীতি বা অংশ। 'বাবরনামা'য় উল্লেখ রয়েছে যে, হিন্দুস্তান ও খোরাসানের মধ্যে দু'টো প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল কাবুল ও কান্দাহারে, যেখানে উচ্চ মুনাফায় বিক্রির জন্য ভারত থেকে ক্রীতদাস (বার্দা) ও অন্যান্য পণ্যবোঝাই গাড়ির-বহর আসতো।

বাবরের মৃত্যুর পর (১৫৩০) তার পুত্র হুমায়ুন ও শেরশাহ সূরীর (একজন আফগান) মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে একটা বিক্ষুব্ধ সময় অতিবাহিত হয়। ১৫৬২ সালে বাবরের নাতি ইসলাম-ত্যাগী 'আকবর দ্য গ্রেট' যুদ্ধে পাইকারিহারে নারী-শিশুদের ক্রীতদাসকরণ নিষিদ্ধ করেন।[৬১] তবুও, লিখেছেন মোরল্যাণ্ড, '*আকবরের শাসনকালে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই একটা গ্রাম বা গ্রামগুচ্ছে হানা দিয়ে বাসিন্দাদেরকে ক্রীতদাসরূপে তুলে নিয়ে আসা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।*' এ কারণে সম্রাট আকবর শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাসকরণ নিষিদ্ধ করেন।[৬২] তবে গভীরভাবে প্রোথিত এ কর্মকাণ্ড বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। নিষেধ সত্ত্বেও আকবরের সেনাধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক শাসকরা নিজেদের ইচ্ছামতো অমুসলিমদের বাড়িঘর ও ধনসম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদেরকে ক্রীতদাসকরণ অব্যাহত রাখে। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আকবরের স্বল্পকালীন এক প্রাদেশিক সেনাপতি আব্দুল্লাহ খান উজ্‌বেক ৫০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) নারী ও পুরুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে বিক্রয় করার কৃতিত্বে গর্ব প্রকাশ করেন। এমনকি আকবরও নিজস্ব আইনের অমর্যাদা করে ১৫৬৮ সালে চিতোরের যুদ্ধে নিহত রাজপুত সেনাদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে ক্রীতদাসকরণের নির্দেশ দেন, যারা বিষপানে বা অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়ে তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল। নিষিদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও প্রদেশগুলোতে ক্রীতদাসকরণ অব্যাহত থাকে আকবরের আমলে। মোরল্যাণ্ড লিখেছেন: আকবরের শাসনকালে স্বাভাবিক সময়ে শিশুদেরকে চুরি বা অপহরণ ও বেচা-কেনা করা হতো; বাংলা ছিল এসব অপকর্মে কুখ্যাত, যেখানে তা সবচেয়ে বীভৎসরূপে (ক্রীতদাসদের খোজাকরণ ইত্যাদি) চর্চা করা হতো।[৬৩] এ কারণে আকবর ১৫৭৬ সালে ক্রীতদাসকরণ নিষিদ্ধ আইন পুনরায় জারি করতে বাধ্য হন। তার শাসনকালে ডেলা ভ্যাল তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে জানান: চাকর ও ক্রীতদাসের সংখ্যা এত অগণন ও সস্তা যে, '*প্রত্যেকেই, এমনকি দুর্ভাগা গরিবরাও, বড় বড় পরিবার রাখতো এবং চমৎকার সেবা-সহায়তা পেতো।*'[৬৪] এসব দৃষ্টান্ত মহান আকবরের শাসনামলেও কী মাত্রায় ক্রীতদাসকরণ চলছিল তার একটা স্বচ্ছ ধারণা দেয়।

ক্রীতদাসকরণ পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি ঘটে আকবরের উত্তরসূরী জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) ও শাহজাহানের (১৬২৮-৫৮) শাসনামলে। এ দুই সম্রাটের শাসনকালে গোঁড়ামি ও ইসলামিকরণ ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হয়। জাহাঙ্গীর তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন: বাংলায় রাজস্ব পরিশোধে অপারগ পিতা-মাতারা আপন সন্তানদেরকে খোজা করে গভর্নরকে দিতো রাজস্বের পরিবর্তে। '*এ চর্চা একেবারে সর্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে*', লিখেছেন জাহাঙ্গীর। বেশ কয়েকটি তথ্য-দলিল জানায় যে, জাহাঙ্গীরের পরিষদের উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা সৈয়দ খান চাগতাই একাই ১,২০০ খোজাকৃত ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন।[৬৫] জাহাঙ্গীর শুধুমাত্র ১৬১৯-২০ সালেই ২০০,০০০ বন্দিকৃত ভারতীয় ক্রীতদাসকে বিক্রির জন্য ইরানে পাঠিয়েছিলেন।[৬৬]

পরবর্তী সম্রাট শাহজাহানের অধীনে হিন্দু কৃষকদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছে। মুঘল আমলে ভারত সফরকারী পর্যটক মানরিকে দেখেন: কর আদায়কারী কর্মকর্তারা বিপন্ন ও দরিদ্র কৃষক ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে যেতো, কর আদায়ের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন বাজার ও মেলায় বিক্রি করতে। ফরাসি চিকিৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার, যিনি ভারতে ১২ বছর বসবাস করেন ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, তিনিও এরূপ ঘটনার সত্যতা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি কর প্রদানে অপারগ দুর্ভাগা কৃষকদের সম্পর্কে লিখেছেন: তাদের শিশুদেরকে ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। মানরিকেও একই ঘটনার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।[৬৭] আওরঙ্গজেবের শাসনকাল (১৬৫৮-১৭০৭) হিন্দুদের জন্য ভয়ঙ্কর বিবেচিত। তার শাসনামলে কেবলমাত্র ১৬৫৯ সালেই গোলকুণ্ডা (হায়দরাবাদ) শহরে ২২,০০০ তরুণ বালককে খোজা করা হয়, শাসক ও গভর্নরদেরকে প্রদান কিংবা ক্রীতদাস-বাজারে বিক্রির জন্য।[৬৮]

ইরানের নাদির শাহ ১৭৩৮-৩৯ সালে ভারত আক্রমণ করেন। ব্যাপক নির্মম হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের পর তিনি বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন এবং বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত মালামালসহ তাদেরকে নিয়ে চলে যান। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আফগানিস্তান থেকে আহমাদ শাহ আবদালী তিন-তিন বার ভারত আক্রমণ করেন। 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ' (১৭৬১) বিজয়ী হয়ে তিনি নিহত মারাঠা সেনাদের ২২,০০০

---

৫৯. Babur JS (1975 print) *Baburnama*, trs. AS Beveridge, Sange-Meel Publications, Lahore, p. 370-71

৬০. Ferishtah, Vol. II, p. 38-39

৬১. Nizami KA (1989) *Akbar and Religion*, Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, New Delhi, p. 106

৬২. Moreland WH (1923) *From Akbar to Aurangzeb*, Macmillan, London, p. 92

৬৩. Ibid, p. 92-93

৬৪. Ibid, p. 88-89

৬৫. Lal (1994), p. 116-117

৬৬. Levi S (2002) *Hindus Beyond the Hindu Kush: Indian in the Central Asian Slave Trades*, Journal of the Royal Asiatic Society, 12(3), p. 283-84

৬৭. Lal (1994), p. 58-59

৬৮. Ibid, p. 117

স্ত্রী-সন্তানকে ক্রীতদাসরূপে বন্দি করে নিয়ে যান।[৬৯] ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কুরে ৭,০০০ লোককে ক্রীতদাস করেছিলেন। তাদেরকে অন্যত্র উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।[৭০] যতদিন মুসলিমরা ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব খাটিয়েছে, ততদিন বিধর্মীদেরকে ক্রীতদাসকরণ পুরোদমে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশদের ক্ষমতা সংহত হওয়ার সাথে ক্রীতদাসকরণ কর্মকাণ্ড রুদ্ধ হতে থাকে। ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে যে, এমনকি ১৯৪৭ সালে ভারত-ভাগের সময়ও মুসলিমরা হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ নারীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক মুসলিম বানিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে বিয়ে দেয়; এটা দীর্ঘকালব্যাপী ইসলামি ক্রীতদাসকরণের কিছুটা নমনীয় রূপ মাত্র। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে হামলাকারী পাঠান মুসলিমরা কাশ্মীর থেকে হিন্দু ও শিখ মেয়েদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের ঝেলুম জেলার বাজারে বিক্রি করেছে।[৭১]

উপরোক্ত আলোচনা প্রধানত উত্তর ভারতে মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকদের ক্রীতদাসকরণের খতিয়ান মাত্র। গুজরাট, মালোয়া, জৈনপুর, খন্দেশ, বাংলা ও দক্ষিণাত্যসহ ভারতের দূর-দূরান্তের প্রদেশসমূহ–যেগুলো ছিল কখনো দিল্লির নিয়ন্ত্রণাধীন কখনো স্বাধীন মুসলিম সুলতানাত–সেসব অঞ্চলের সর্বত্রও ক্রীতদাসকরণ উদ্দীপনার সাথে চলতে থাকে। কিন্তু ওসব অঞ্চলে ক্রীতদাসকরণের তথ্য পদ্ধতিগতভাবে লিখিত হয়নি।

অন্যত্র মুসলিমদের দ্বারা দাসকরণ

মুসলিম হানাদার ও শাসকরা সর্বত্রই তাদের হামলার শিকার ও যুদ্ধে পরাজিত বিধর্মীদেরকে বিপুল সংখ্যায় ক্রীতদাসকরণের কাজে লিপ্ত হয়েছে। বিক্রি বা গৃহকর্মে নিয়োগ ও উপপত্নীকরণে নবি মুহাম্মদ কর্তৃক অমুসলিমদেরকে পাইকারিভাবে ক্রীতদাসকরণের অভিষেকের পর তা ক্রমান্বয়ে গতি ও বিস্তার লাভ করে সঠিক পথে পরিচালিত খলিফাগণ (৬৩২-৬৬০) এবং উমাইয়া (৬৬১-৭৫০) ও আব্বাসীয় (৭৫১-১২৫০) শাসনকালের মধ্য দিয়ে ইসলামি ক্ষমতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে।

খলিফা ওমরের নির্দেশে মুসলিম সেনাপতি আমর ৬৪৩ সালে ত্রিপোলি জয় করে খ্রিষ্টান-ইহুদি উভয় ধর্মের নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসেন। নবম শতকের ইতিহাসবিদ আবু খালিফ আল-ভুটুরি জানান: খলিফা ওসমান ৬৫২ সালে পরাভূত নুবিয়ার (সুদান) শাসকদের উপর একটা চুক্তি আরোপ করেন আনুগত্য-কর হিসেবে প্রতিবছর ৩৬০ জন ক্রীতদাস খলিফাকে ও ৪০ জন মিশরের গভর্নরকে পাঠানোর শর্তে।[৭২] ১২৭৬ সাল পর্যন্ত এ চুক্তিটি কার্যকর থাকে। একই ধরণের চুক্তি আরোপ করেছিল উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকরা ট্রানসক্সিয়ানা, সিজিস্তান, আর্মেনিয়া ও ফেজান (আধুনিক উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা)-এর শাসকদের সঙ্গে, যাদেরকে প্রতিবছর নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রীতদাস আনুগত্য-কর হিসেবে প্রদান করতে হতো।[৭৩] উমাইয়া শাসনামলে বিশিষ্ট ইয়েমেনি সেনানায়ক মুসা বিন নুসায়েরকে নবোত্থিত বার্বার বিদ্রোহ দমন ও ইসলামের পরিসর বৃদ্ধির জন্য উত্তর আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় (ইফ্রিকিয়া, ৬৯৮-৭১২)। মুসা সফলভাবে সে বিদ্রোহ দমনকালে ৩০০,০০০ বিধর্মীকে ক্রীতদাস হিসেবে বন্দি করেন। খলিফার এক-পঞ্চমাংশ হিস্যার ৬০,০০০ বন্দিকে দাস-বাজারে বিক্রি করে দিয়ে গৃহিত অর্থ খলিফার কোষাগারে জমা করা হয়। মুসা বন্দিদের মধ্যে থেকে ৩০,০০০-কে তার সেনাবাহিনীতে যুক্ত করেন।[৭৪]

স্পেনে তার চার বছরের অভিযানে (৭১১-১৫) মুসা কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত গোথিক পরিবারগুলো থেকেই ৩০,০০০ অবিবাহিত বালিকাকে আটক করেছিলেন।[৭৫] এ সংখ্যা ছিল ক্রীতদাসকৃত অন্যান্য নারী-শিশুদের থেকে ভিন্ন। ৭৮১ সালে এফিসাস (বর্তমান তুর্কিতে) লুট ও ধ্বংসযজ্ঞে ৭,০০০ গ্রিককে ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ৮৩৮ সালে আমোরিয়াম (তুর্কিতে) দখলে বন্দিকৃত ক্রীতদাসের সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে, খলিফা আল-মুতাসিম তাদেরকে পাঁচ ও দশজনের দলে ভাগ করে নিলামে বিক্রি করার নির্দেশ দেন। থেসালোনিয়া আক্রমণে (গ্রিস, ৯০৩ সাল) ২২,০০০ খ্রিষ্টানকে ক্রীতদাস করে সেনানায়কদের মাঝে ভাগ কিংবা বিক্রি করে দেওয়া হয়। ১০৬৪ সালে আল্প আরসালান-এর জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া ধ্বংসযজ্ঞে বিপুল সংখ্যক লোক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় এবং জীবিত অবশিষ্টদেরকে ক্রীতদাস করা হয়। স্পেনের আলমোহাদ খলিফা ইয়াকুব আল-মনসুর ১১৮৯ সালে লিসবন আক্রমণ করে প্রায় ৩,০০০ নারী-শিশুকে ক্রীতদাস বানান। ১১৯১ সালে তার কর্ডোভাস্থ গভর্নর পর্তুগালের সিলভে আক্রমণ করে ৩,০০০ নারী-শিশুকে ক্রীতদাস বানান।[৭৬]

---

[৬৯] Ibid, p. 155

[৭০] Hasan M (1971) *The History of Tipu Sultan*, Akbar Books, Delhi, p. 361-63

[৭১] Talib, SGS (1991) *Muslim League Attack on Sikhs and Hindus in the Punjab 1947*, Vice of India, Delhi, p. 201

[৭২] Vantini G (1981) *Christianity in the Sudan*, EMI, Bologna, p. 65-67

[৭৩] Ibn Warraq (1995) *Why I am not a Muslim*, Prometheus Books, New York, p. 231

[৭৪] *Umayyad Conquest of North Africa*, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/ wiki/Umayyad_conquest_of_North_Africa

[৭৫] Lal KS (1999) *Theory and Practice of Muslim State in India*, Aditya Prakashan, New Delhi, p 103; Hitti (1961), p. 229-30

[৭৬] Brodman JW (1986) *Ransoming Captives in Crusader Spain: The Order of Merced on the Christian-Islamic Frontier*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, p. 2-3

১১৮৭ সালে ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করে নিয়ে সুলতান সালাহুদ্দিন নগরীর খ্রিষ্টান জনগণকে ক্রীতদাস বানিয়ে বিক্রি করে দেন। ১২৬৮ সালে অ্যান্টিওক দখল করে মামলুক সুলতান আল-জাহির বেইবার (শাসনকাল ১২৬০-৭৭) গ্যারিসনের ১৬,০০০ প্রতিরোধকারী যোদ্ধাকে তলোয়ারের ডগায় হত্যার পর সে স্থানের ১০০,০০০ লোককে ক্রীতদাস বানান। হিট্টি লিখেছেন: *'দাস-বাজার এতই ভরপুর হয়ে উঠে যে, একজন দাস-বালক মাত্র বার দিরহামে ও দাস-বালিকা পাঁচ দিরহামে বিক্রি হয়।'*[৭৭]

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিমরা ক্ষমতাগ্রহণের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে এমন এক স্তরে পৌঁছে দেয় যে, এক শতাব্দী পর পর্তুগিজরা এসে দেখে প্রায় সব মানুষই কোনো না কোনো দাস-মালিকের অধীন; আর মালিকের মধ্যে আরবরা বা আরব-বংশোদ্ভূতরা ছিল শীর্ষ স্থানে। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম শাসকরা একটা ভূখণ্ড দখল করার পর কখনো কখনো গোটা জনসংখ্যাকেই দাস হিসেবে ধরে নিয়ে গেছে। মুসলিম শাসকরা জনসংখ্যার একটা বড় অংশ, যারা পাহাড়ে বাস করতো, তাদের প্রায় সবাইকে হামলা ও ক্রয়ের মাধ্যমে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। মালয় বিজয়ের পর আচেহ্‌র সুলতান ইস্কান্দর মুদা (১৬০৭-৩৬) হাজার হাজার ক্রীতদাসকে তার রাজধানীতে নিয়ে আসেন। ১৫০০ শতাব্দীর দিকে জাভা হয়ে উঠেছিল প্রধান ক্রীতদাস রপ্তানিকারক। গ্রন্থকার রীড জানান, এসব ক্রীতদাসকে *'ইসলামিকরণ মূলক যুদ্ধে'* আটক করা হতো।'[৭৮] ফিলিপিনে স্পেনীয়রা মুসলিম অঞ্চল দখল করে নেওয়ার অবিরাম হুমকি হওয়া সত্ত্বেও সুলু সুলতানাত ১৬৬৫ ও ১৮৭০ সালের মধ্যে মোরো জিহাদী মুসলিমদের হামলার মাধ্যমে স্পেনীয় নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে প্রায় ২৩ লক্ষ ফিলিপিনোকে ক্রীতদাস করে নিয়ে আসে। ১৮৬০ থেকে ১৮৮০'র দশকের শেষদিক পর্যন্ত মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম-শাসিত অঞ্চলে ক্রীতদাসরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে মরক্কোর সুলতান মৌলে ইসমাইল (১৬৭২-১৭২৭) ২৫০,০০০ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের এক বিশাল সামরিক বাহিনী গড়েছিলেন।[৭৯] ১৭২১ সালে মৌলে ইসমাইল এটলাস পর্বতের এক বিদ্রোহী ভূখণ্ডে হামলার নির্দেশ দেন, সেখানকার জনগণ সুলতানকে আনুগত্য-কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে। বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করার পর তাদের সকল সমর্থ পুরুষকে হত্যা করে নারী-শিশুদেরকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়। এর পরপরই তিনি তার পুত্র মৌলে আস-শরীফের নেতৃত্বে ৪০,০০০ শক্তিশালী এক যোদ্ধাবাহিনীকে গুজলান বিদ্রোহী নগরীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, কারণ তারাও আনুগত্য-কর প্রদান বন্ধ করেছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধের মুখে বিদ্রোহীরা জয়ের কোনো আশা নেই দেখে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু মৌলে আস-শরীফ প্রত্যেককে হত্যা করে মস্তক ছিন্ন করার নির্দেশ দেন।[৮০] তাদের নারী ও শিশুদেরকে অনিবার্যরূপেই ক্রীতদাসকরণের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গিনি (আফ্রিকা, বর্তমানে ৮৫ শতাংশ মুসলিম) মুসলিম শাসনাধীনে আসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এ শতকেরই শেষ দিকে *'আপার গিনি উপকূলে এক-এক জন নেতা বা সর্দারের অধীনে ১,০০০ বাসিন্দা অধ্যুষিত 'ক্রীতদাস-নগরী' ছিল।'* ১৮২৩ সালে ইসলামি সিয়েরালিওন ভ্রমণ করতে গিয়ে মেজর লেইং ফালাবা'য় 'ক্রীতদাস নগরী' প্রত্যক্ষ করেন, যা ছিল সালিমা সুসু'র রাজধানী।[৮১] ওসব ক্রীতদাসরা নগরী-প্রধানের কৃষিখামারে কাজ করতো। খ্যাতিমান সুলতান সৈয়দ সাঈদের পূর্ব আফ্রিকার সাম্রাজ্য, যার রাজধানী ছিল জাঞ্জিবার (১৮০৬-৫৬), *'সেটা গড়েছিলেন ক্রীতদাসের উপর ভিত্তি করেই... সেখান থেকে ক্রীতদাসদেরকে উত্তর আফ্রিকা ও পারস্যের বাজারগুলোতে পাঠানো হতো গৃহকর্মে ব্যবহার বা উপপত্নীরূপে বিক্রির জন্য।'*[৮২]

ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল লেখক রোনাল্ড সিগল জানান,[৮৩] সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম বাহিনীতে নিযুক্ত করার জন্য দশ থেকে বার বছর বয়সের বিপুল সংখ্যক আফ্রিকার শিশুকে ধরা হতো ক্রীতদাসরূপে। পারস্য থেকে মিশর, মিশর থেকে মরক্কো, পর্যপ্ত ৫০,০০০ থেকে ২৫০,০০০ হাজারের ক্রীতদাস-বাহিনী ছিল মামুলি ব্যাপার।[৮৪] অটোমান জানিসারি সেনাদেরকে সংগ্রহের মতোই (নিচে আলোচিত) সুলতান মৌলে ইসমাইল কৃষ্ণাঙ্গ-ক্রীতদাস উৎপাদন খামার ও নার্সারি থেকে দশ-বছর-বয়স্ক শিশুদেরকে বাছাই করে খোজা করার পর দুর্ধর্ষ যোদ্ধারূপে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ দিতেন। এসব যোদ্ধাদেরকে বলা হতো 'বোখারী', কেননা তাদেরকে 'সহি বোখারী' স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করানো হতো সুলতানের প্রতি আনুগত্যের নিমিত্তে। উৎকৃষ্ট বোখারীরা হতো সুলতানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী; বাকিদেরকে প্রদেশগুলোতে সামরিক কর্মকাণ্ড পালনে নিযুক্ত করা হতো। রাজধানী মেকনেস রক্ষার জন্য তিনি রাখতেন ২৫,০০০ বোখারী; ৭৫,০০০ মোতায়েন করেছিলেন গ্যারিসন নগরী মাহাল্লায়।[৮৫]

---

৭৭. Hitti PK (2002) *History of the Arab*, Palgrave Macmillan, London, p. 316

৭৮. Reid A (1988) *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, Yale University Press, New Haven, p. 133

৭৯. Lewis B (1994) *Race and Savery in Middle East*, Oxford University Press, Chapter 8, http://www.fordham.edu/halsall/med/ewis 1.html

৮০. Milton G (2004) *White Gold*, Hodder & Stoughton, London, p. 143, 167-71

৮১. Rodney W (1972) In MA Klein & GW Johnson eds., *Perspectives on the African Past*, Little Brown Company, Boston, p. 158

৮২. Gann L (1972) In Ibid, p. 182

৮৩. Segal emphasizes that anti-Semitism is in complete conflict with the amicable relationship Prophet Muhammad had established with Judaism and Christianity. He asserts that there is no historical conflict between Jews and Muslims, although some conflict arose only after the crusades. Such assertions go directly against Prophet's exterminating or exiling the Jews of Medina and Khaybar and his final instruction, while in death-bed, to cleanse Arabia of the Jews and Christians. He also urged his followers to killl the Jews and Christians. He also urged his followers to kill the jews to the last one (Sahih Muslim, 41:6985)

৮৪. Segal R (2002) *Islam's Black Slaves*, Farrar, Straus and Giroux, New York, p. 55

৮৫. Milton, p. 147-150

পল লাভজয়ের হিসাব অনুযায়ী (*ট্রান্সফর্মেশনস ইন শ্লেইভারী*, ১৯৮৩), কেবলমাত্র উনবিংশ শতাব্দীতেই আফ্রিকা ও লোহিত সাগরের উপকূল থেকে ২০ লক্ষ ক্রীতদাসকে মুসলিম বিশ্বে পাঠানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে ৮০ লক্ষ লোক মারা যেয়ে থাকতে পারে, কেননা ক্রীতদাসকরণ অভিযান থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত মৃত্যু হার ছিল ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর হিসাব অনুযায়ী আফ্রিকায় ১,৩০০,০০০ জন (১৩ লাখ) কৃষ্ণাঙ্গকে ক্রীতদাস করা হয়। লাভজয় হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে মোট ১১,৫১২,০০০ জন (১ কোটি ১৫ লক্ষ ১২ হাজার) ক্রীতদাসকে মুসলিম বিশ্বে পাচার করা হয়। অপরদিকে রেইমন্ড মুভি (‘*দ্য আফ্রিকান শ্লেইভ ট্রেইড ফ্রম দ্য ফিফটিন্থ টু দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি*’, ইউনেস্কো, ১৯৭১) মোট সংখ্যা দেখিয়েছেন ১ কোটি ১৪ লক্ষ, যার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আটককৃত ৩০০,০০০ জন ক্রীতদাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[৮৬] মারে গর্ডনের ‘*শ্লেইভারি ইন দ্য আরব ওয়ার্ল্ড*’ গ্রন্থে মুসলিম ক্রীতদাস-শিকারিদের দ্বারা সংগৃহীত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষ। এ সংখ্যা নিউ ওয়ার্ল্ড বা নতুন বিশ্বের (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ) উপনিবেশগুলোতে ইউরোপীয় বণিকদের নিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের সংখ্যার প্রায় সমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুদানের দারফুর থেকে ক্রীতদাস বোঝাই গাড়িবহরগুলোতে এক যাত্রায় ১৮,০০০ থেকে ২০,০০০ ক্রীতদাস কায়রোতে নিয়ে যাওয়া হতো। এমনকি ১৮১৫ সালে ইউরোপ দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করার পর তা বন্ধ করতে মুসলিম সরকারগুলোকে চাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও, ‘১৮৩০ সালে জাঞ্জিবারের সুলতান ৩৭,০০০ ক্রীতদাসের বাৎসরিক পাওনা দাবি করেন; ১৮৭২ সালে সুয়াকিন (আফ্রিকা) হতে ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ ক্রীতদাস আরবাঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে’, লিখেছেন ব্রডেল।[৮৭]

অটোমান দিউশারমি

ইসলামি দাসপ্রথার একটা অতি নিন্দিত ব্যবস্থা হলো অটোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ‘দিউশারমি’ প্রথা, যা অটোমান সুলতান ওরখান প্রবর্তন করেছিলেন ১৩৩০ সালে। এ প্রকল্প অনুযায়ী অটোমান সাম্রাজে বসবাসকারী খ্রিষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিম পরিবারের ৭ থেকে ২০ বছর বয়স্ক বালকদের একটা অংশকে যোগাড় করা হতো। নীতিটির প্রবর্তন সম্বন্ধে বার্নার্ড লুইস ষষ্ঠদশ শতকের অটোমান ইতিহাসবিদ সাদেদ্দীন (হোক্কা ইফেন্দি)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

> ‘খ্যাতিমান রাজা... তার রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে এক আলোচনায় বসেন, যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে অবিশ্বাসীদের সন্তানদের মধ্য থেকে কর্মক্ষম সাহসী ও পরিশ্রমী যুবকদেরকে বাছাই করা হবে; তাদেরকে ইসলাম ধর্মের দ্বারা মর্যাদাবান করা হবে, যা হবে তাদেরকে ধনী ও ধার্মিক করার একটা উপায় এবং অবিশ্বাসীদের শক্তিকেন্দ্র ধ্বংস করার এক মোক্ষম উপায়ও।’[৮৮]

এ পরিকল্পনার অধীনে অটোমান শাসনাধীন গ্রিস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, জর্জিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, বস্‌নিয়া-হার্জেগোভিনা, আর্মেনিয়া ও আলবেনিয়া থেকে অমুসলিম শিশুদেরকে চয়ন করা হতো। নির্দিষ্ট দিনে অমুসলিম পিতাকে (প্রধানত খ্রিষ্টান) একটা নির্দিষ্ট খোলা মাঠে তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে আসতে হতো। মুসলিম নিয়োগ কর্মকর্তারা তাদের মধ্য থেকে স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী ও সুঠাম-দেহী বালকদেরকে বাছাই করতো। ১৪৫৩ সালে সুলতান দ্বিতীয় মেহমেত কনস্টান্টিনোপল (পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুল) জয় করার পর ‘দিউশারমি’ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করে, যে বিষয়ে স্টিফেন ও'শিয়া লিখেছেন: ‘*এ বিজয়ের সূত্র ধরে ফাতিহ্ (বিজয়ী সুলতান) নিষ্ঠুর ‘দিউশারমি’ বা ‘সংগ্রহ’ পদ্ধতিটি সম্প্রসারিত করেন, যার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক খ্রিষ্টান তরুণকে অপহরণ করে রাজধানীতে আনা হতো... কয়েক বছর পর পর মেধাবী বালক সংগ্রহকারী কর্মকর্তারা সৈনিকদের সাথে গ্রামে গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে খেলার সাথী ও জ্ঞাতিদের মধ্য থেকে প্রতিশ্রুতিশীল কৃষক-সন্তানদেরকে বাছাই করে ধরে নিয়ে যেতো।*’[৮৯] ‘দিউশারমি’ প্রথার মাধ্যমে সংগ্রহকৃত শিশুদের সংখ্যার ব্যাপারে ‘*কোনো কোনো পণ্ডিত এ সংখ্যা বছরে ১২,০০০ বলে উল্লেখ করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন ৮,০০০; তবে সম্ভবত গড়ে বছরে কমপক্ষে ১০,০০০ বলে ধরা যেতে পারে।*’[৯০]

এভাবে সংগ্রহকৃত উৎকৃষ্টতর খ্রিষ্টান, ইহুদি ও জিপ্‌সি (বেদুইন) সন্তানদেরকে সুন্নত দিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হতো। অতঃপর সহজেই প্রভাবান্বিত হওয়ার মতো এ তরুণ বয়স থেকেই তাদেরকে জিহাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হতো এবং অটোমান বাহিনীর জ্যানিসারি রেজিমেন্টের অধীনে জিহাদী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ব্যারাকে আবদ্ধ ও বিবাহ-নিষিদ্ধ এসব তরুণের জীবনের শুধু একটাই লক্ষ্য ছিল: অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, কয়েক বছর আগেও যারা ছিল তাদেরই জাতি ও ধর্মের মানুষ।

এ নীতিটি অটোমান শাসকদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠে। মুসলিম শাসকরা খ্রিষ্টান ধর্মের সর্ববৃহৎ ও আকর্ষনীয় কেন্দ্রস্থল কনস্টান্টিনোপল দখলের জন্য খলিফা মুয়াবিয়ার (মৃত্যু ৬৮০) আমল থেকে বারংবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। অতীতে কনস্টান্টিনোপল দখলের অভিযানে বহুবার তারা মারাত্মকভাবে মার খেয়েছিল। পরিশেষে ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে জ্যানিসারিরা কনস্টান্টিনোপলের উপর ভয়ানকভাবে চড়াও হয়ে তা জয় করে ইসলামের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বয়ে আনে। তৎকালীন অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মেহমেত জ্যানিসারিদেরকে তিন দিন ধরে এক-কালীন

---

৮৬. Segal, p. 56-57

৮৭. Braudel F (1995) *A History of Civilization*, trs. Mayne R, Penguin Books, New York, p. 131

৮৮. Lewis B (2000) *The Middle East*, Phoenix, London, p. 109

৮৯. O'Shea S (2006) *Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Mediterranean World*, Walker & company, New York, p. 279

৯০. Ibn Warraq, p. 231

তাদেরই স্বধর্মী লোকদেরকে পাইকারি হারে হত্যা ও নগরীর সর্বত্র লুটতরাজ করার অনুমতি দেন। যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদেরকে ক্রীতদাস করা হয়। পরে বাছ-বাছাইহীনভাবে জ্যানিসারি রেজিমেন্টে সৈনিক নিয়োগ করা হয়, যখন 'দিউশারমি'র অংশরূপে মুসলিমদেরকে, এমনকি অনেক সুফিকেও, জ্যানিসারি বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়। এভাবে ধীরে ধীরে রেজিমেন্টটিতে শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা ভেঙ্গে পড়ে, যার সাথে সাথে ঘটনাক্রমে অটোমান শক্তির পতনেরও সূচনা হয়।

'দিউশারমি' প্রথা এ সত্যটির সাক্ষী হয়ে রয়েছে: কীভাবে ইসলামি বিশ্ব বিধর্মীদেরই শক্তি বা বাহুবলকে তাদের ভূখণ্ড দখলে ব্যবহার করতো! দিউশারমি প্রথাকে অনুকরণ করে সমকালীন ভারতে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (শাসনকাল ১৩৫১-৮৮) একই উপায়ে হিন্দু শিশুদেরকে তার বাহিনীতে নিয়োগ করতেন। তিনি প্রাদেশিক কর্মকর্তা ও সেনাধ্যক্ষদেরকে নির্দেশ দেন উৎকৃষ্ট অমুসলিম তরুণদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে ধরে এনে তার দরবারে পাঠিয়ে দিতে। এ প্রক্রিয়ায় তিনি ১৮০,০০০ তরুণকে ক্রীতদাসরূপে যোগাড় করেছিলেন।[৯১]

দিউশারমি প্রথার সমালোচনা: ১৬৫৬ সালে বিলুপ্ত হওয়া অটোমান 'দিউশারমি' ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রীতদাস সংগ্রহের প্রক্রিয়া ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। তবে গোঁড়া অটোমান শাসকরা, যারা সুন্নি শরীয়া আইন মোতাবেক রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি বিধিবদ্ধ করতেন, 'দিউশারমি' প্রথা প্রণয়নে কোরান ও ইসলামি আইনে তারা যথেষ্ট যৌক্তিকতা ও সমর্থন পান। কোরানের ৮:৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে: '*এবং জেনে রাখো যে, তোমরা যা কিছুই (যুদ্ধে লুণ্ঠিত মালামাল) কব্জা করো, তার এক-পঞ্চমাংশ আলাহর ও তাঁর নবির।*'

যুদ্ধে অর্জিত মালামালের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবির জন্য বরাদ্দ। প্রাথমিক পর্যায়ে এটা যেতো নবি মুহাম্মদ-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত তাঁর উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারে। তাঁর মৃত্যুর পর এ অংশটি যেতো খলিফার রাজকোষে। জিম্মি প্রজাদের নিকট থেকে খলিফা ওমরের ঘোষিত করনীতির অধীনে 'খারাজ' হিসেবে আদায় করা হতো উৎপাদিত পণ্যের কমপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ, যদিও বিশেষ পরিস্থিতিতে অথবা খামখেয়ালি মুসলিম শাসকদের অধীনে প্রায়শই তা আরো উচ্চহারে আদায় করা হতো। যেহেতু অবিশ্বাসীদের নবজাতক শিশুরাও ছিল রাষ্ট্রের এক ধরনের উৎপাদিত সম্পদ, সে সূত্রে পবিত্র ইসলামি আইনে 'দিউশারমি' প্রথা বৈধতা পায়। নবি নিজেই খ্রিষ্টান শিশুদেরকে জোরপূর্বক সংগ্রহ করার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন, যখন তিনি তাগলিব গোত্রকে তাদের সন্তানদেরকে ব্যাপটাইজকরণ নিষিদ্ধ করেন, যার মাধ্যমে সেসব সন্তানরা মুসলিম হিসেবে গৃহিত হয়। পরে খলিফা ওমরও আরেকটি তাগলিব গোত্রকে নির্দেশ দেন তাদের সন্তানদেরকে চিহ্নিত (কব্জিতে 'ক্রস' চিহ্ন প্রদান) না করতে ও তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা না দিতে (অর্থাৎ ব্যাপটাইজ না করতে)।[৯২] এর ফলে, সেসব শিশুরা ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে একটা মাত্র পার্থক্য রয়েছে: 'সংগ্রহ' বা 'দিউশারমি' প্রথার মাধ্যমে অটোমানরা কেড়ে নিতো মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বা তারও কম অমুসলিম সন্তানকে; কিন্তু নবি ও খলিফা ওমর সংগ্রহ করেছিলেন তাগলিব গোত্রদ্বয়ের সমস্ত শিশুকে।

কোরানের এরূপ অনুমোদন ও নবির দৃষ্টান্ত খলিফা ওমর কর্তৃক পালনের পর, সঠিক পথে পরিচালিত খলিফা ওসমান 'দিউশারমি'র মত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিলেন নুবিয়ার খ্রিষ্টানদেরকে আনুগত্য-কর হিসেবে প্রতিবছর কায়রোতে ক্রীতদাস পাঠাতে বাধ্য করে (৬৫২-১২৭৬); একইরকম চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে, যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং 'দিউশারমি' নীতি অটোমানদের আবিষ্কার নয়। অধিকন্তু অটোমানদের প্রবর্তিত এ নীতি অনেক বেশি মানবিক ছিল নবি মুহাম্মদের ক্রীতদাস ধরার নীতির তুলনায়, যা তিনি বানু কোরাইজা, খাইবার ও মুস্তালিক ইহুদি গোত্রের উপর প্রয়োগ করেছিলেন, এবং যার মাধ্যমে তিনি আলহর স্বর্গীয় অনুমোদনে (কোরান ৩৩:২৬-২৭) সমস্ত সাবালক পুরুষকে হত্যা এবং নারি ও শিশুকে ক্রীতদাস করেছিলেন। বহু শতাব্দীব্যাপী ইসলামের বিজয় ও শাসনে 'দিউশারমি'র চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠুর ও বর্বর নবি মুহাম্মদের এ ক্রীতদাসকরণ নীতি সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ক্রীতদাসদের সামাজিক মর্যাদা

ইবনে ওয়ারাকের মতে:

> ইসলামের অধীনে ক্রীতদাসদের আইনগত কোনোই অধিকার নেই; তারা কেবল একটা 'বস্তু' হিসেবে বিবেচিত – তাদের প্রভুদের সম্পদ, যা তারা খেয়াল-খুশিমতো ব্যবহার করতে বা ফেলে দিতে পারে – বিক্রি কিংবা উপহার হিসেবে ইত্যাদি। ক্রীতদাসরা অভিভাবক বা আদালতে সাক্ষী হতে পারে না, এবং তারা যা আয় করবে তা হবে প্রভুর। অমুসলিম ক্রীতদাসদের ইসলামে ধর্মান্তরণও তাকে সরাসরি মুক্ত করবে না। মালিকের জন্য কোনো নারী বা পুরুষ ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।[৯৩]

নিচে দেখা যাবে, শরীয়া আইনে ক্রীতদাসরা সাধারণ সম্পদ ও পণ্যের মধ্যে তালিকাভুক্ত এবং তাদেরকে বিক্রির জন্য বাণিজ্য-আইন ধারার নিয়ম-কানুন ও নির্দেশনা। ক্রীতদাসকে কেনার পর ক্রেতা-মালিক তার মধ্যে কোনোরকম খুঁত খুঁজে পেলে সে মালিক তাকে প্রহার করতে পারে, শরীরে দৃশ্যমান কোনো ক্ষত অথবা দাগ সৃষ্টি না করে। 'ফতোয়া-ই আলমগীরি' মোতবেক, প্রহার ও নির্যাতনের পর ক্রীতদাসের শরীরে যদি কোনো স্থায়ী দাগ না পড়ে, তাহলে ক্রেতা-মালিক পূর্ণ ক্ষতিপূরণসহ সে ক্রীতদাসকে বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দে রচিত হানাফী আইনের সারসংক্ষেপ 'হেদাইয়াহ্' গ্রন্থটি আমাদেরকে তথ্য দেয় যে, মুসলিম সমাজে '*চুরির দায়ে ক্রীতদাসদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা আইন দ্বারা স্বীকৃত একটি সাধারণ নিয়ম ছিল।*' ইসলাম যদিও ক্রীতদাসদের প্রতি ভাল আচরণ করার কথা বলেছে, তবুও মালিক তার ক্রীতদাসকে হত্যা করলে সেটা ইসলামে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে বিবেচিত।[৯৪]

---

৯১. Lal (1994), p. 57-58
৯২. Al-Biladhuri AY (1865) *Kitab Futuh al-Buldan*, Ed. KJ De Geoje, Leiden, p. 181
৯৩. Ibn Warraq, p. 203
৯৪. Lal (1994), p. 148

অবিশ্বাসীদের উপর দখলকারী আক্রমণগুলোতে মুসলিম ধর্মযোদ্ধারা প্রায়শই অস্ত্রবহনে সক্ষম বয়সী সকল পুরুষ-বন্দিকে হত্যা করেছে (কেননা তারা পুনরায় সংগঠিত হয়ে হুমকি সৃষ্টি করতে পারতো) এবং ক্রীতদাস বানিয়েছে সকল নারী-শিশুকে, যাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম গ্রহণ করতে হয়েছে। বন্দিদেরকে হত্যা সম্পর্কে *হেদাইয়াহ্* বলেছে: '*বন্দিদেরকে হত্যার ক্ষেত্রে ইমামের (শাসকের) ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে, কেননা নবি বন্দিদেরকে হত্যা করতেন, এবং তাদেরকে হত্যা তাদের অপকর্ম বা পাপের সমাপ্তি ঘটায়।*' হেদাইয়াহ্ বলে যে, নারী ও শিশু বন্দিরা, যারা কোনো হুমকি নয়, তাদেরকে সাধারণত ক্রীতদাস করা হবে, '*কেননা তাদেরকে ক্রীতদাসকরণ (ইসলামে ধর্মান্তরের জন্যে) তাদের অপকর্মের সুযোগ নিরাময় করে এবং সে সাথে মুসলিমরা একটা সুবিধা অর্জন করে (তাদের শ্রম শোষণ ও মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে)*'।[৯৫] বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন (মৃত্যু ১৪০৬), যিনি অনেক পশ্চিমা পণ্ডিতদের দ্বারাও উচ্চ প্রশংসিত,[৯৬] তিনি মুসলিম বিশ্বে চলমান ক্রীতদাসকরণ পেশাকে ধর্মীয় গৌরবের সাথে বর্ণনা করতঃ লিখেছেন: '*(বন্দিদেরকে) 'যুদ্ধের ঘর' (অমুসলিম বিশ্ব) থেকে 'ইসলামের ঘর'-এ (মুসলিম বিশ্বে) এনে দাসপ্রথা আইনের অধীনে রাখা হয়, যা স্বর্গীয় তত্ত্বাবধানের মধ্যেই নিহিত; দাসকরণের মাধ্যমে আরোগ্যলাভ করে তারা অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প পাকা বিশ্বাসী হয়ে মুসলিম ধর্মে প্রবেশ করে।*'[৯৭] ১১৯৪ সালে বখতিয়ার খিলজির কল (আলিগড়) বিধ্বস্ত করার সময় বন্দিদের মধ্যে যারা 'জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান' ছিল, তারা ধর্মান্তরিত হয়; কিন্তু যারা স্বধর্ম আঁকড়ে থাকে, তাদেরকে হত্যা করা হয় (পূর্বে উল্লেখিত)। এখানে তাদেরকে 'জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান' বলা হয়েছে, যারা তরবারির ভয়ে দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে ক্রীতদাসত্ব বরণ করে নিয়েছিল। 'হেদাইয়াহ্' বলে যে, কোনো যুদ্ধ-বন্দি যদি মুসলিম হয়ে যায়, তথাপি '*তিনি (ইমাম বা শাসক) তাকে আইনসঙ্গতভাবেই ক্রীতদাস বানাতে পারেন, কেননা ক্রীতদাসকরণের কারণ (অর্থাৎ তার অবিশ্বাসী হওয়া) তাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বিদ্যমান ছিল (যুদ্ধ-বন্দি তথা ক্রীতদাস হওয়ার মাধ্যমে)। আটক হওয়ার পূর্বে কোনো অবিশ্বাসী মুসলিম হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার (অর্থাৎ তাকে ক্রীতদাস করা যাবেনা)।*'[৯৮]

ক্রীতদাসদের দুঃখ-দুর্দশা ও ভোগান্তি

অন্যথায় মর্যাদা-সম্পন্ন স্বাধীন মানুষকে গৃহপালিত পশুর মত বোবা-কালা জন্তুতে পরিণত করা নিঃসন্দেহে বড় ধরনের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা, যা তার মর্যাদা ও আত্ম-সম্মান বোধও হরণ করে। তদুপরি মুসলিম বন্দিকারীরা সাধারণত বন্দিদেরকে প্রকাশ্যে চৌরাস্তার মোড়ে কুচকাওয়াজ করানোর মাধ্যমে উপহাস, বিদ্রূপ ও অমর্যাদার পাত্র বানাতো। উদাহরণস্বরূপ, সুলতান মাহমুদ কাবুলের হিন্দু রাজা জয়পালকে ক্রীতদাস করে গজনীতে নিয়ে যান এবং জনসমক্ষে তাঁকে চরম অসম্মানিত করেন। ক্রীতদাস বাজারে যেখানে তাঁকে সাধারণ ক্রীতদাসের মত নিলামে তোলা হয়েছিল, সেখানে তাঁকে '*প্রকাশ্যে প্যারেড করানো হয়, যাতে তাঁর বন্দি সন্তান ও পরাজিত সেনাধ্যক্ষরা এ রকম লজ্জাজনক, বন্দি ও অমর্যাদাকর অবস্থায় তাঁকে দেখতে পায়; সাধারণ ক্রীতদাসের সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে তাঁকে জনসমক্ষে অমর্যাদার পাত্র করা হয়।*'[৯৯] এরূপ চরম অমর্যাদায় বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে তিনি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ইসলামি কর্তৃত্বের শেষকাল পর্যন্তও সর্বত্র ক্রীতদাসদের একইরকম, এমনকি তার চেয়েও খারাপ, ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে। মরক্কোর সুলতান মৌলে ইসমাইল (মৃত্যু ১৭৭২)-এর শাসনকালের শেষ দিকে সমুদ্রপথে ধৃত বাণিজ্যযাত্রী শ্বেতাঙ্গ বন্দিদেরকে উপকূলে ভেড়ার পর শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় উৎসব করে শহর ও রাজধানীর পথে পথে ঘুরানো হতো। তাদেরকে অভিশাপ দিতে ও উপহাস করতে বিপুল সংখ্যক অভব্য ও অভদ্র জনতা এসে জমা হতো, যারা তাদের সঙ্গে সর্ব প্রকারের অমর্যাদাকর ও শত্রুতামূলক আচরণ করতো। এক জাহাজে ধরা পড়া ইংরেজ বন্দি জর্জ এলিয়ট জানায়: যখন তাদেরকে তীরে নেয়া হয়, তখন '*কয়েক শ' অলস ও বদমাস প্রকৃতির লোক এবং অসভ্য তরুণরা*' তাকে ও তার সহকর্মীদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে অসভ্য গালাগাল করে এবং তাদেরকে '*নগরীর বিভিন্ন রাস্তায় ভেড়ার পালের মতো ঘুরানো হয়।*'[১০০]

তবে ক্রীতদাসদেরকে সবচেয়ে অসহনীয় যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো, তা ছিল শারীরিক: যেমন শারীরিক কষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও রোগ ইত্যাদি। আটক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শারীরিক নির্যাতন ও কষ্ট শুরু হতো, যা চলতে থাকতো গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত। গন্তব্য কখনো কখনো হাজার হাজার মাইল দূরের বিদেশী ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল, যেখানে তাদেরকে পশু-পালের মতো দুর্গম পথঘাট পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। সর্বশেষ মালিকের কাছে বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত বন্দিদেরকে শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থায় রাখা হতো। কখনো কখনো একজন ক্রীতদাসের ২০ বার দাস-ব্যবসায়ীদের মধ্যে হাত-বদল হতো।

কীভাবে ক্রীতদাসদের দীর্ঘ ভ্রমণ শুরু হতো তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সুলতান মাহমুদ কর্তৃক রাজা জয়পালকে পরাজিত ও ক্রীতদাসকরণের বর্ণনা থেকে। আল-উতবি জানান: '*তাঁর (জয়পালের) সন্তান ও নাতিপুতি, তাঁর ভাতিজা ও গোত্রের প্রধানবর্গ এবং তাঁর*

---

[৯৫] Hughes TP (1998) *Dictionary of Islam*, Adam Publishers and Distributors, New Delhi, p. 597

[৯৬] British historian Toynbee termed his Muqaddimah as "*undoubtedly the greatest work of its kind that has ever been created by any mind in time or place*". Bernard Lewis in his *The Arabs in History* called him "*the greatest historian of the Arabs and perhaps the greatest historical thinker of the Middle Ages.*"

[৯৭] Lal (1994), p. 41

[৯৮] Hughes, p. 597

[৯৯] Lal (1994), p. 22

[১০০] Milton, p. 65-66

আত্মীয়-স্বজনদেরকে আটক করে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয় এবং সুলতানের সামনে দিয়ে তাদেরকে সাধারণ অপরাধীদের মতো নিয়ে যাওয়া হয়... তাদের কারো কারো হাত পিছনে শক্ত করে বাঁধা ছিল, কাউকে গলা-টিপে ধরা হয়, কাউকে গলায় ধাক্কা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।'[১০১]

স্মরণ রাখতে হবে যে, সুলতান মাহমুদ কখনো কখনো মাসের পর মাস ভারত থেকে পথিমধ্যে লাখ লাখ ক্রীতদাস আটক করতেন। এসব ক্রীতদাসকে একত্রে বেঁধে ভীষণ অসুবিধাজনক ও নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় রাজধানী গজনীতে গরু-ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। ভারতের অভ্যন্তরভাগ থেকে গজনী শত-শত হাজার-হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। আর সেসব ক্রীতদাসের অধিকাংশই ছিল দুর্বল নারী ও শিশু; অথচ তাদেরকে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার মধ্য দিয়ে পাহাড়ি এবরো-থেবরো উঁচুনিচু দুর্গম পথ-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে মাসের পর মাস পায়ে হেঁটে যেতে হতো। তিমুরের ভারত অভিযানের স্থায়ীত্বকাল ছিল চার-পাঁচ মাস (সেপ্টেম্বর ১৩৯৮-জানুয়ারি ১৩৯৯)। দিল্লিতে পৌঁছানোর পূর্বেই পথিমধ্যে তিনি ১০০,০০০ ক্রীতদাস সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্য-এশীয় রাজধানী সমরখন্দে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দিল্লি থেকে ফেরার পথে তিনি আরো ২০ থেকে ২৫ লাখ ক্রীতদাসকে আটক করে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত সমরখন্দে নিয়ে যান।

বন্দি ক্রীতদাসরা যে কী চরম অসহনীয় শারীরিক নিষ্পেষণ, যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের শিকার হতো, এসব দৃষ্টান্ত তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেয়। যারা শারীরিক দুর্বলতা বা অক্ষমতার কারণে সবার সাথে তাল মিলিয়ে এগুতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদেরকে তাল রেখে হাঁটার জন্য অমানবিক ও নিষ্ঠুর প্রহারের শিকার হতে হয়েছে। এমন বিপুল সংখ্যক লোকের জন্য হাজার হাজার মাইলের নিদারুণ দুর্গম পথে যথেষ্ট খাবার ও পানীয়ের নিরাপত্তা খুব কমই ছিল। যারা অসুস্থ হয়ে পড়তো, নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোনো চিকিৎসা বা সেবা-শুশ্রুষার ব্যবস্থা ছিল না। তাদের কেউ চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে বিরান পথ-জঙ্গলে ফেলে রেখে যাওয়া হতো, যেখানে সে একাকী রোগ-যন্ত্রণায় মারা যেত ও বন্যপ্রাণীর খোরাক হতো।

বন্দিদের দুর্ভোগের একটা সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় উলুগ খান বলবন কর্তৃক রাজস্থানের জালরের রাজা কনহরদেবকে আক্রমণের এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে। সে আক্রমণে আটককৃত বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষকে বেঁধে গাদাগাদি করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে পঞ্চদশ শতকের ভারতীয় লেখক প্রবন্ধা লিখেছেন: "*(বালুকাময় রাজস্থান মরুভূমির মাঝে) মাথার উপর আচ্ছাদনহীন অবস্থায় দিনের বেলায় তারা প্রচণ্ড সূর্যতাপ সহ্য করে, আর রাত্রিকালে ভোগ করে খোলা আকাশের নিচে হাড়-কাঁপানো শীত। বাড়িঘর ও মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনা শিশুরা দুঃসহ দুরবস্থায় কাঁদতে থাকে। ইতিমধ্যে পিপাসা ও ক্ষুধার যন্ত্রণায়, এ অবস্থা তাদের কষ্ট-দুর্দশা বাড়িয়ে দেয়। কোনো কোনো বন্দি অসুস্থ, কেউ কেউ উঠতে-বসতে অপারগ। কারো কারো পায়ে জুতা নেই, না আছে পরার মতো কাপড়-চোপড়।*" তিনি আরো লিখেছেন: "*কারো পায়ে লোহার বেড়ি বা শিকল পরানো। প্রত্যেককে স্বজন-পরিজন থেকে আলাদা করে চামড়ার ফিতা দিয়ে বেঁধে গাদাগাদি করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। শিশুদেরকে পিতা-মাতা থেকে, স্ত্রীদেরকে স্বামীদের থেকে, বিচ্ছিন্ন করেছে সর্বনাশা এ নিষ্ঠুর হামলা। শিশু ও বয়স্ক সবাই কষ্ট-যন্ত্রণায় প্রচণ্ডভাবে আর্তচীৎকার করে উঠে শিবিরের সে অংশ থেকে যেখানে তাদেরকে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। তারা ক্রন্দন ও বিলাপ করছিল, তখনো এ আশায় যে, কোনো অলৌকিক শক্তি হয়তো তাদেরকে রক্ষা করবে।*'[১০২]

এটা কেবলমাত্র প্রথম কয়েকদিনের দুর্ভোগের চিত্র। পাঠকদের অনুমান করতে অসুবিধা হবে না যে, ক্রীতদাসদেরকে মাসের পর মাস ধরে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে সুলতান মাহমুদ, মোহাম্মদ গোরী ও আমির তিমুরের বিদেশী রাজধানীতে পৌঁছাতে কী অবর্ণনীয়, দুঃসহ ও ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রেও কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগের একই বা আরো দুর্বহ চিত্র পাওয়া যায়। তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের, এমনকি ভারতের, বাজারগুলোতে দীর্ঘতর পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে যে ভয়ানক কষ্টের শিকার হতে হয়েছে, তা ভাষা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব! বার্বার মুসলিম জলদস্যুদের হাতে ধরা পড়া ইউরোপীয় বন্দিদেরকে যে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হতো, তা আফ্রিকায় আটককৃত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের প্রতি ভয়াবহ আচরণ ও দুর্ভোগের একটা ধারণা দিবে।

উত্তর আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসদের ভোগান্তি: সুলতান মৌলে ইসমাইল ১৬৮৭ সালে যখন ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলস্থ ফ্রান্সের সুরক্ষিত শহর তারোদান্ত দখল করে বাসিন্দাদেরকে তরবারির ডগায় হত্যা করেন, সেখানে ১২০ জন ফরাসিকে ক্রীতদাস হিসেবে কব্জা করা হয়। সুলতানের জন্য শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসরা ছিল অতি লোভনীয় ও মূল্যবান উপহার। বন্দি করার পর তাদেরকে খোঁচাখুঁচি করে উত্তেজিত করা হয় ও অধিক খাদ্যে পুষ্ট ঘোষণা দিয়ে এক সপ্তাহের জন্য খাদ্য দেওয়া বন্ধ রাখা হয়। যখন তারা খাদ্যের জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দেয়, তখন সুলতান আদেশ দেন তাদেরকে লং-মার্চ করিয়ে রাজধানী মেকনেসে নিয়ে যেতে। ক্রীতদাসদের একজন জিন লাদায়ার ফরাসি যাজক ডোমিনিক বুস্নতের কাছে ৩০০ মাইল পথের সে ভয়ঙ্কর যাত্রার বর্ণনা দেন। বেড়ি পড়ানো ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাদেরকে পশু-পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়; তারা দুর্বলকারক অসুস্থতা ও অবসাদ-ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে; তাদের কেউ কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মৃতদের মস্তক ছিন্ন করে জীবিতদেরকে দিয়ে বহন করানো হয়, কেননা রক্ষীরা ভয় পাচ্ছিল যে, সংখ্যায় কমে যাওয়া বন্দিদেরকে বিক্রি করার বা পালিয়ে যেতে দেওয়ার অভিযোগে ভয়ঙ্কর সুলতান তাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারেন।[১০৩]

আটককৃত ক্রীতদাসদেরকে আফ্রিকায় 'মাতামোর' নামে পরিচিত ভূগর্ভস্থ অখ্যাত কারাকক্ষে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত করুণ অবস্থায় গাদাগাদি করে রাখা হতো, প্রত্যেক মাতামোরে ১৫ থেকে ২০ জন করে। তার মধ্যে আলো ও বায়ু চলাচলের একমাত্র উৎস ছিল ছাদে একটা ক্ষুদ্র

[১০১] Lal (1994), p. 22
[১০২] Ibid, p. 54-55
[১০৩] Milton, p. 34

লোহার জাফরি। শীতকালে সে জাফ্‌রি দিয়ে বৃষ্টি পড়ে মেঝেতে বন্যা বইয়ে দিতো। সাপ্তাহিক বাজার বা হাটের দিন তাদেরকে বের করে এনে নিলামে তোলা হতো। বন্দিদেরকে সে জাফরির উপর থেকে ঝোলানো রশি বেয়ে বাইরে আসতে হতো। এসব ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কুঠুরিতেই তাদেরকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতে হতো। বন্দি জার্মেইন মুয়েট সেসব মাতামোরে বসবাসের ভয়াবহ পরিস্থিতির বিষয়ে লিখেছেন: "*ভেজা শীতের মাসগুলোতে মাঝে মাঝে কর্দমাক্ত মেঝে থেকে ময়লা পানি ও আবর্জনা ফুলে-ফেপে উঠতো।*" বছরের ছয় মাসই সেসব কক্ষের মেঝেতে হাটু-পানি বিরাজ করতো, যা বন্দিদের ঘুম হারাম করে দিতো। শোয়ার জন্য ছিল পেরেকের সাথে ঝুলন্ত দড়িতে চাটাইয়ের বিছানা, যার একটা থাকতো আরেকটার উপর। সবার নিচে যারা শুতো, পানি প্রায় তাদের পিঠ স্পর্শ করতো। মাঝে মাঝেই উপরের বিছানার দড়ি ছিঁড়ে নিচের সবাইকে নিয়ে কাদা-পানির মধ্যে পড়ে যেতো এবং সে রাত্রি তাদেরকে বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে দাঁড়িয়েই কাটাতে হতো।

ভূগর্ভস্থ সে কুঠুরিগুলো এতই ছোট ও গাদাগাদি করে ভরা হতো যে, তাদেরকে সবার পা মাঝখানে রেখে বৃত্তাকারে শুতে হতো। মুয়েট লিখেছেন: "*একটা মাটির পাত্র রাখার স্থানটুকু ছাড়া কক্ষের ভিতর একটুও খালি জায়গা থাকতো না যে তারা একটু আরামে থাকবে।*" মুয়েট আরো লিখেছেন: ভেজা গ্রীষ্মকালের দিনগুলোতে মাতামোরগুলোর ভিতরটা মানুষের ঠাসাঠাসির কারণে '*নোংরা, দুর্গন্ধময় ও পোকা-মাকড়ে*' ভরে উঠতো এবং "*সবচেয়ে বেশি অসহ্য হয়ে উঠতো সব ক্রীতদাস যখন ভিতরে আসতো ও সেখানে পোকা-মাকড় জন্মাতো*"; অবস্থা এমন হয়ে উঠতো যে, ভিতরের বাসিন্দাদের জন্য মৃত্যুও আশীর্বাদজনক স্বস্তি ছিল, বলেন মুয়েট।[১০৪]

যুগ যুগ ধরে উত্তর আফ্রিকার ক্রীতদাসদের জন্য এটাই ছিল বসবাসের সাধারণ ব্যবস্থা। প্রায় এক শতাব্দ পূর্বে ১৬২০-এর দশকে আটক হওয়া ব্রিটিশ বন্দি রবার্ট অ্যাডামস্‌ ইংল্যান্ডে তার পিতামাতার কাছে একটি চিঠি পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। চিঠিটিতে তিনি বর্ণনা করেন সুলতান মৌলে জিদানের (রাজত্ব ১৬০৩-২৭) ক্রীতদাস-খোঁয়াড়ের জীবনযাত্রা বা অবস্থার কথা। অ্যাডামস্‌ লিখেন: "*একটা ভূগর্ভস্থ কুঠুরি, যেখানে আমাদের ১৫০ থেকে ২০০ জনকে একত্রে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। একটা ছোট্ট ফোঁকড় ছাড়া ভিতরে আলো আসার কোনো রাস্তা নেই।*" তার চুল ও ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-চোপড়, লিখেন অ্যাডামস্‌, "*কীট ও পোকা-মাকড়ে ভরে গিয়েছে, কিন্তু সেগুলো সরানোর সময় দেওয়া হয়না আমাকে... সেগুলো যেন আমাকে খেয়ে ফেলছে।*"[১০৫]

মাতামোরে গাদাগাদি করে রাখা বন্দিরা খানা-খাদ্য পেতো সামান্য, কখনো কখনো '*রুটি ও পানি ছাড়া আর কিছুই না*'। নিলামের দিন বাজার পর্যন্ত সারাটা পথ তাদেরকে চাবুক দিয়ে প্রহার করতে করতে বন্য জন্তুর মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। নিলাম-বাজারে তাদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে জনতার মধ্য দিয়ে এক ব্যবসায়ী থেকে আরেক ব্যবসায়ীর কাছে নেওয়া হতো। তাদের শক্তি ও কর্মপটুতা পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে লাফ-ঝাঁপ দিতে হতো। তাদের কান ও মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে একটা নিদারুণ লজ্জাজনক ও অমর্যাদাকর দৃশ্যের অবতারণা করা হতো।[১০৬] অথচ এসব হতভাগ্যরা কিছু দিন আগেও ছিল সম্মানিত মুক্ত ও মর্যাদাবান মানুষ।

মালিক বা প্রভুর বাড়িতে বা আওতাধীনে আসার পরও ক্রীতদাসদের ভোগান্তি শেষ হতো না। ১২ বছর বয়সী ব্রিটিশ বালক টমাস পেলোকে ধরা হয়েছিল একটা জাহাজ থেকে; সে সুলতান মৌলে ইসমাইল কর্তৃক ক্রীত হয়ে তার রাজপ্রাসাদে এসে পড়ে (পেলো মারাত্মক ঝুকি নিয়ে পালিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে নিজের কাহিনী বর্ণনা করেছিল)। পেলো ও তার সাথিরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে ১২০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রাজধানীতে পৌঁছুলে প্রাসাদের বাইরে সমবেত শত্রুমনা মুসলিম জনতা, যারা তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য খ্রিষ্টানদেরকে উপহাস ও গালিগালাজ করতে জমা হয়েছিল, তাদের দ্বারা ভয়ানক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাদেরকে প্রাসাদে নেয়ার সময় চিৎকার করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, এমনকি আক্রমণের চেষ্টাও করছিল। সুলতানের রক্ষীদের পাহারা সত্ত্বেও জনতার মধ্যে অনেকেই তাদেরকে ঘুষি ও চাবুক মারতে এবং মাথার চুল উপড়ে দিতে সক্ষম হয়।[১০৭]

রাজপ্রাসাদে পেলোকে প্রাথমিকভাবে সুলতানের বিশাল অস্ত্রাগারে শত শত ইউরোপীয় ক্রীতদাসের সঙ্গে কাজ করতে হয়। অস্ত্র মেরামত ও বিশুদ্ধ চকচকে রাখার জন্য তাকে প্রতিদিন ১৫ ঘণ্টা কাজ করতে হতো। অচিরেই তাকে সুলতানের পুত্র যুবরাজ মৌলে আস্‌-সফার কাছে দেওয়া হয়। খ্রিষ্টান ক্রীতদাসদের প্রতি যুবরাজের ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। পেলো লিখেছে: "*যুবরাজ পেলোকে চরমভাবে প্রহার ও প্রচণ্ড নির্যাতন করতো। তাকে সকাল থেকে রাত্রি অবধি যুবরাজের ধাবমান ঘোড়ার পিছে পিছে অযথা দৌঁড়াতে হতো।*" পরে যুবরাজ তার রীতি মাফিক এ বলে পেলোকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য চাপ দেয় যে, "*ধর্মান্তরিত হলে আমি চড়ার জন্য একটি সুন্দর ঘোড়া পাব এবং আমি তার একজন একান্ত বন্ধু হতে পারবো।*" পেলো সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা না বলতে তাকে অনুরোধ করলে ক্রোধান্বিত আস্‌-সফা বলে: "*তাহলে যে নির্যাতন-নিপীড়ন তোমার উপর আসছে তার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার একগুয়েমি আচরণ সেটাই পাওয়ার যোগ্য।*" এরপর আস্‌-সফা পেলোকে কয়েক মাস একটা কক্ষে আটকে রেখে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতন করে। "*প্রত্যেক দিন আমাকে মারাত্মকরূপে বেত্রাঘাত করা হতো*", লিখেছে পেলো।[১০৮]

এ রকমটা ছিল ইউরোপীয় ক্রীতদাসদের জন্য সাধারণ শাস্তি। বন্দিদের দুই পা রশি দিয়ে বেঁধে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে প্রহার করা হতো। সাধারণত দুই পায়ের পাতায় আঘাত করা হতো। ফাদার বুস্‌নত জানান: সুলতান মৌলে ইসমাইল দু'জন ক্রীতদাসকে ৫০০ ঘা বেত

---

[১০৪] Ibid, p. 66-67
[১০৫] Ibid, p. 20
[১০৬] Ibid, p. 68-69
[১০৭] Ibid, p. 71-72
[১০৮] Ibid, p. 79-80

মারার আদেশ করেন; এর ফলে তাদের একজনের কোমর স্থানচ্যুত হয়ে যায়; অন্যদিন আরেক দফা বেত মেরে স্থানচ্যুত কোমর স্বস্থানে পুনঃস্থাপিত করা হয়।[১০৯]

পেলো লিখেছে: আস্-সফা ব্যক্তিগতভাবে তাকে প্রহার করতো এবং বলতো: "*শেহেদ, শেহেদ। কুনমুরা, কুনমুরা! অর্থাৎ মুর (মুসলিম) হয়ে যা, মুর হয়ে যা।*" এরূপ প্রাত্যহিক প্রহার তার জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে, কেননা প্রতিদিন প্রহারের মাত্রা বাড়তে থাকে। দিনের পর দিন তাকে অভুক্ত রাখা হতো; যেদিন খাবার দিতো, তা হতো শুধুমাত্র রুটি ও পানি। মাসের পর মাস এরূপ দুর্ভোগের পর, লিখেছে পেলো, "*এখন আমার উপর নির্যাতন অসহনীয়ভাবে বেড়ে গেল... হাত-পায়ের মাংস পুড়িয়ে হাড় থেকে পৃথক করা হচ্ছিল, যা স্বেচ্ছাচারীটা আমার উপর চরম নিষ্ঠুরতার সাথে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করতো।*" অর্ধ-ভুখা পেলোর উপর নির্যাতন ও যন্ত্রণা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে, তখন একদিন আস্-সফা আরেকবার তাকে প্রহার করতে এলে, লিখেছে পেলো,"*ঈশ্বরকে ডেকে ক্ষমা করে দিতে বললাম, যিনি জানেন, আমি কখনোই মন থেকে সম্মতি দেই নি।*"[১১০] কয়েক দশক আগে মরক্কোতে আটবার কূটনৈতিক মিশনে আসা জন হ্যারিসন (১৬১০-৩২) লিখেছেন: '*তিনি (সুলতান) কিছু ইংরেজ বালককে জোর করে মূর (মুসলিম) বানিয়েছিলেন।*'[১১১]

ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে ইউরোপীয় ক্রীতদাসদের নির্যাতন শুধু পুরুষদের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না; নারী ক্রীতদাসদেরকেও একইভাবে নির্যাতন করা হতো। বার্বার জলদস্যুরা বার্বাডোসগামী একটি ব্রিটিশ জাহাজে হানা দিয়ে লুটপাট করে ও কর্মচারীদরকে বন্দি করে মৌলে ইসমাইলের প্রাসাদে নিয়ে আসে। বন্দিদের মধ্যে ছিল চার মহিলা, যাদের একজন অবিবাহিতা। ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস ব্রুক্স উল্লেখ করেছেন, উল্লসিত সুলতান সে অবিবাহিতা বন্দিকে প্রলুব্ধ করতে থাকেন খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করার জন্য। সুলতান প্রতিশ্রুতি দেন: "*সে যদি মূর (মুসলিম) ও তার শয্যাসঙ্গিনী হয়, তাহলে সে প্রচুর পুরস্কার পাবে।*" মেয়েটার অস্বীকৃতি সুলতানকে ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং সুলতানের নির্দেশে "*তার খোজা রক্ষীরা তাকে চাবুক দিয়ে পেটাতে থাকে যতক্ষণ না সে মৃতের মতো ঢলে পড়ে।*" এরপর সুলতান তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন এবং পচা রুটি ব্যতীত তাকে আর কিছুই খেতে দেওয়া হয়না। অবশেষে "*হতভাগী তার শরীর সুলতানের কাছে সঁপে দিতে বাধ্য হয়, যদিও এতে তার হৃদয়ের সায় ছিল না,*" লিখেছে ব্রুক্স। এরপর সুলতান তাকে ধুয়েমুছে ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়ে শয্যাসঙ্গিনী করেন। তার আকাঙ্ক্ষা যখন মিটে যায়, লিখেছেন ব্রুক্স: "*তিনি অমানবিকভাবে, অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তার চোখের সামনে থেকে মেয়েটিকে সরে যেতে বাধ্য করেন।*"[১১২]

আরেক ঘটনায় মরক্কোয় নিয়োজিত ব্রিটিশ কূটনীতিক অ্যান্থনী হ্যাটফিল্ড এক আইরিশ মহিলার কথা লিখেছেন, যাকে ১৭১৭ সালে একটা বাণিজ্য-জাহাজ থেকে বন্দি করা হয়েছিল। ধর্মান্তরিত হতে না চাওয়ায় তাকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাকে বাধ্য হতে হয় আত্মসমর্পণ করতে। মুসলিম হওয়ার পর সে সুলতানের হেরেমে স্থান পায়।[১১৩] ১৭২৩ সালে ফাদার জিন দা লা ফেই ও তার ভাই মৌলে ইসমাইলের প্রাসাদস্থ ফরাসি বন্দিদেরকে মুক্ত করে আনার আশায় মরক্কো যান। তিনি এক নারী-বন্দি সম্বন্ধে লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোয় তাকে এমন বর্বরোচিতভাবে নির্যাতন করা হয় যে, সে মরে যায়। "*কৃষ্ণাঙ্গ রক্ষীরা*", লিখেছেন ফাদার জিন, "*মোম জ্বালিয়ে তার স্তনদ্বয় পুড়িয়ে দেয় এবং অশ্লীল-অরুচিকরভাবে তারা শীশা গলিয়ে তার দেহের এমন সব অঙ্গে ঢেলে দেয়, যার নাম উচ্চারণ করা যায় না।*"[১১৪]

পেলোর ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয়ে ফিরে আসা যাক এখন। তার ইসলামিকরণের আনুষ্ঠানিকতার জন্য লিঙ্গত্বকচ্ছেদের বা সুন্নত দেওয়ার আয়োজন করা হয়। লিঙ্গত্বকচ্ছেদের বেদনা উপশম হবার পর আস্-সফা আবার পেলোকে প্রহার করা শুরু করে মুসলিম পোশাক পরতে অস্বীকার করার কারণে। অবশেষে নির্যাতনের চোটে পেলো মুসলিম পোশাক পরতে শুরু করে। এরপরও আস-সফা পেলোকে প্রহার করা অব্যাহত রাখে, এবারে খ্রিষ্টান ধর্ম আঁকড়ে থাকতে জিদ করার কারণে। পেলোর মুসলিম হওয়ার খবর 'ধার্মিক' সুলতানের কানে পৌঁছুলে তিনি উলসিত হন ও পুত্র আস্-সফাকে নির্দেশ দেন পেলোকে মুক্ত করে দিয়ে আরবি শেখাতে একটা মাদ্রাসায় পাঠানোর জন্য। কিন্তু যুবরাজ সুলতানের আদেশ অবজ্ঞা করে তার উপর নির্যাতন অব্যাহত রাখে। যুবরাজের এ ঔদ্ধত্যে ক্রোধান্বিত সুলতান আস্-সফাকে তার সামনে হাজির হতে নির্দেশ দেন। সুলতানের ইঙ্গিতে তার দেহরক্ষীরা যুবরাজকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করে। অবাধ্যতার কারণে সন্তান-সন্ততিদের প্রতি সুলতানের এ আচরণ না ছিল প্রথম বা না শেষ।[১১৫]

তবে সুলতান যে তার বন্দিদের প্রতি খুব দয়াবান ছিলেন, তা নয়। রাজপ্রাসাদের ক্রীতদাসরা ভয়াবহ জীবন যাপন করতো। তাদেরকে রাখা হতো চারিদিকে উঁচু ঢিবি দ্বারা ঘেরাও করা সামরিক জেলখানার মতো একটা আঙ্গিনায়। আঙ্গিনাটা যদিও বড়, কিন্তু তার মধ্যে এত বেশি লোককে রাখা হতো যে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। রাজপ্রাসাদে ক্রীতদাসদের বসবাসের অবস্থা ও তাদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে ব্রিটিশ বন্দি জন ইউলডন বলেন: এটা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বর্বর স্থান। তিনি লিখেছেন, তাকে ও তার ক্রীতদাস সঙ্গীদের "*প্রত্যেককে ঘোড়ার মত কাঁধের সঙ্গে দড়ি লাগিয়ে শীশার গাড়ি টানতে বাধ্য করা হতো।*" তাদেরকে প্রহার করে ও চাবুক মেরে গায়ের চামড়া ব্যথায় জরজর করা হতো। উইলডন বলেন: "*আমাদেরকে কাঁধে করে এমন বড় বড় লোহার ফালি বহন করতে বাধ্য করা হতো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হাঁটু পরিমাণ ময়লা*

[১০৯] Ibid, p. 81
[১১০] Ibid, p. 82
[১১১] Ibid, p. 21
[১১২] Ibid, p. 121
[১১৩] Ibid, p. 173
[১১৪] Ibid, p. 219
[১১৫] Ibid, p. 83-84

কাদার মাঝে কোনোমতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারতাম এবং জায়গাগুলো এতই পিচ্ছিল যে, কাঁধে ভার ছাড়াও খালিহাতে এগুনো আমাদের জন্য কষ্টকর ছিল।"[১১৬.]

সমুদ্রপথে ধৃত হয়ে সুলতানের প্রাসাদে আসা এক ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন জন স্টকার ক্রীতদাসদেরকে দেওয়া জঘন্য খাবারের কথা লিখেছেন। তিনি ইংল্যান্ডে তার এক বন্ধুর কাছে লিখেন: "*কঠোর পরিশ্রমের পর চব্বিশ ঘন্টার জন্য তারা আমাদেরকে একটা ছোট রুটি ও পানি আর ছাড়া কিছুই দেয় না*" এবং "*আমি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় আছি।*" ক্রীতদাসদের থাকার স্থান সম্বন্ধে তিনি লিখেন: "*আমি একেবারে খোলা আকাশের নিচে থাকি, গায়ে ঢাকা দেওয়ার মতো কিছুই নেই এবং আমি যতটা সম্ভব ততটা দুরবস্থার মধ্যে রয়েছি।*" টমাস পেলোর সঙ্গীদেরকে দেওয়া হয়েছিল খড়ের তৈরি ছেঁড়া মাদুর। সেটা বিছিয়ে খালি গায়ে ঠাণ্ডা মাটির উপর শুতে হতো তাদেরকে। গোটা আঙ্গিনায় ছিল মাছি ও তেলাপোকার রাজত্ব। মধ্যগ্রীষ্মের দিনে ক্রীতদাস-খোঁয়াড়গুলো বাতাসশূন্য, আর্দ্র ও প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠতো। "*খোলা ক্রীতদাস-আশ্রমে তাদেরকে পোহাতে হতো গ্রীষ্মকালে গা-পোড়ানো সূর্যের উত্তাপ আর শীতকালে প্রচণ্ড কুয়াশা, তুষার, অতিরিক্ত বৃষ্টি ও ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস,*" লিখেছেন সাইমন ওক্‌লি।[১১৭.]

দৈনন্দিন খাদ্যের বরাদ্দ ছিল ১ আউন্স কালো রুটি ও ১ আউন্স তেল, যা অতিরিক্ত শ্রমে বিধ্বস্ত ও ক্ষুধার্ত ক্রীতদাসদের জন্য ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। রুটিগুলো বানানো হতো একেবারে দুর্গন্ধ বার্লির ময়দা দিয়ে, যা কখনো কখনো "*এমন গন্ধ ছড়াতো যে বমি এসে যেতো ও নাকে তার দুর্গন্ধ সহ্য করা যেতো না,*" লিখেছেন বন্দি ক্যাপ্টেন হোয়াইট হেড। তদুপরি যখন বার্লির মওজুদ শেষ হয়ে যেতো, তখন তাদেরকে কিছুই দেওয়া হতো না। হোয়াইট হেড লিখেছেন: "*একবার আমাদেরকে আট দিনের মধ্যে এক চিলতে রুটিও দেওয়া হয়নি।*"[১১৮.]

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল অসহনীয় কঠোর পরিশ্রম ও নির্যাতন, যা দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত কৃষ্ণাঙ্গ-রক্ষীদের হাতে ক্রীতদাসদেরকে সহ্য করতে হতো। এসব ক্রীতদাস-চালকরা সকালে সূর্য ওঠার আগেই তাদেরকে গরু-ছাগলের মতো বের করে নিয়ে যেতো যার যার কার্যক্ষেত্রে, যেখানে তাদেরকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করতে হতো। তারা বন্দি ক্রীতদাসদের উপর প্রভুত্ব খাটাতো এবং অসহায় হতভাগ্যদেরকে অযথা নির্যাতন ও প্রহার করে এক ধরনের ইতর আনন্দ ভোগ করতো এবং সাধ্যমতো তাদের জীবনকে যতটা সম্ভব দুর্বিষহ ও বিষময় করে তুলতো। তারা মাঝে মাঝে আনন্দের জন্য ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলতো রাত্রিবেলা বাইরে অহেতুক হাঁটতে বা নোংরা কাজ করতে বাধ্য করে। কাজে সামান্য ঢিলা দিলে বা ভুল করলেও তারা ক্রীতদাসদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতো খাবার বন্ধ করে দিয়ে অথবা সর্বদা তাদের কাছে রাখা মুগুর দিয়ে পিটিয়ে। পেলো লিখেছে: তারা পিটানোর সময় শরীরের সেসব অংশ বেছে নিতো যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যথা লাগে। মুয়েট লিখেছেন: কোনো ক্রীতদাস অতিরিক্ত প্রহারের কারণে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়লে ক্রীতদাস-চালকরা তাদেরকে কাজের যোগ্য করে তুলতো "*প্রহার দ্বিগুণ করে, যাতে নতুন প্রহার তাদেরকে পুরানো প্রহারের কথা ভুলিয়ে দিতো।*"[১১৯.]

ক্রীতদাসরা অসুস্থ হয়ে পড়লেও কাজ থেকে রেহাই পেতো না। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিশ্রামের অনুমতি পেতো না, "*যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গ-রক্ষীরা দেখছে যে তারা হাত-পা নাড়াতে পারছে,*" লিখেছেন মুয়েট। অসুস্থ ক্রীতদাসদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, লিখেছেন মুয়েট: "*কোনো ক্রীতদাস তার শরীরে ব্যথা করছে বলে অভিযোগ করলে এক প্রান্তে আখরোটের সমান বোতাম লাগানো একটা লোহার দণ্ড গরম করে হতভাগ্য ক্রীতদাসের শরীরের কয়েকটি অংশ পুড়িয়ে দিতো।*" অসুস্থ হয়ে পড়া ক্রীতদাসদের উপর সুলতানের কোনোরকম কৃপা ছিল না, বরং তিনি তাদেরকে পিটাতেন যথেষ্ট পরিশ্রম না করার অভিযোগে। একবার বহু সংখ্যক ক্রীতদাস অসুস্থ হয়ে পড়ায় নির্মাণ পরিকল্পনা পিছিয়ে পড়লে সুলতানের নির্দেশে কৃষ্ণাঙ্গ-রক্ষীরা অসুস্থ ক্রীতদাসদেরকে টেনে-হেঁচড়ে বের করে এনে সুলতানের সামনে হাজির করে। অসুস্থ ক্রীতদাসরা নিজ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে সুলতান, "*তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সাত জনকে হত্যা করে বিশ্রামাগারটিকে একটা কসাইখানা বানিয়ে ফেলে,*" লিখেছেন ব্রুকস্।[১২০.]

তার দৈনিক নির্মাণক্ষেত্র পরিদর্শনে সুলতান মৌলে ইসমাইল নির্দয় ছিলেন কাজে গাফিলতি বা অবহেলাকারী ক্রীতদাসদের প্রতি কিংবা তাদের কাজের মান তার মনোঃপুত না হলে। একবার ইট কারখানা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি দেখতে পান ইট খুব পাতলা। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ সুলতান তার কালো দেহরক্ষীদের নির্দেশ করেন প্রধান রাজমিস্ত্রির মাথায় ৫০টা ইট ভাঙ্গতে। শাস্তি দেওয়ার পর রক্তাক্ত ক্রীতদাসটিকে জেলখানায় পাঠানো হয়। আরেক ঘটনায় সুলতান নিম্নমানের চুন-বালি-পানির মিশ্রণ তৈরির জন্য কয়েকজন ক্রীতদাসকে অভিযুক্ত করেন। ক্রুদ্ধ সুলতান "*নিজ হাতে একে একে সবার মাথায় আঘাত করে এমন ভয়ানকভাবে ভেঙ্গে দেন যে, স্থানটি রক্তে কসাইয়ের দোকানের মতো হয়ে যায়।*"[১২১.]

সুলতানের প্রাসাদে আরো এক ধরনের ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হতো ক্রীতদাসদেরকে। একবার এক স্পেনীয় ক্রীতদাস সুলতানের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার মাথার টুপি নামাতে ভুলে যায়। ক্রুদ্ধ সুলতান হতভাগ্য ক্রীতদাসটিকে লক্ষ্য করে সাথে সাথে বল্লম ছুঁড়ে মারেন। বেচারা ক্রীতদাসকে তার শরীরের মাংসের মধ্যে বিদ্ধ বর্শাটিকে টেনে বের করে সুলতানের হাতে ফেরৎ দিতে হয় পুনরায় বর্শাটিকে তার পেটে নিক্ষেপ করতে। আরো একটি শাস্তি প্রায়শঃই ক্রীতদাসদেরকে ভোগ করতে হতো, যাকে বলা হতো 'টসিং' বা উর্ধনিক্ষিপ্তকরণ। পেলো লিখেছেন: সুলতানের নির্দেশে "*তিন বা চারজন কৃষ্ণাঙ্গ-রক্ষী মিলে ক্রীতদাসটির উরু ধরে তাদের সাধ্যমতো উপরের দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে*

---

১১৬. Ibid, p. 91-92
১১৭. Ibid, p. 92, 94
১১৮. Ibid, p. 93
১১৯. Ibid, p. 105
১২০. Ibid, p. 96-97
১২১. Ibid, p. 106

দিতো, যাতে তার মাথা উল্টে এসে আগে মাটিতে পড়ে।" এ ভয়ঙ্কর শাস্তিতে কখনো তাদের গর্দান ভেঙ্গে যেতো বা স্কন্ধ স্থানচ্যুত হয়ে যেতো। এরূপ চলতে থাকতো যতক্ষণ না সুলতান থামার নির্দেশ দিতেন।[১২২]

স্বল্পাহার, অপুষ্টি, অতি-শ্রম ও ক্রীতদাস-খোঁয়াড়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভোগা ক্রীতদাসদের জন্য রোগ-বালাই ছিল নিত্য-সঙ্গী। মাঝে মাঝেই হানা দিত প্লেগ। কোনোরকম চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় তারা মারা যেতো বহু সংখ্যায়, বিশেষত যারা ইতিমধ্যে দুর্বল ছিল বা উদরাময়-আমাশয়ে ভুগছিল। মুয়েট লিখেছেন: একটা ঘটনায় একবার প্রতি চার জন ফরাসি ক্রীতদাসের মধ্যে একজন মারা যায়।[১২৩]

রাজপ্রাসাদে একেবারে তুচ্ছ ভুলের কারণেও মৌলে ইসমাইলের ক্রীতদাসদের জন্য মৃত্যু আনতে পারতো। সুলতানের পুত্র মৌলে জিদান, লিখেছে পেলো, "*একবার তার পছন্দের কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসটিকে নিজ হাতে হত্যা করেন,*" কেননা যুবরাজ যখন তার পোষা কবুতরগুলোকে খাওয়াচ্ছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে ক্রীতদাসটির কারণে কবুতর বিরক্ত হয়েছিল। "*(সুলতান) এতই খামখেয়ালী, নিষ্ঠুর ও রক্তক্ষয়ী প্রকৃতির ছিলেন যে, এক ঘন্টার জন্যও কারো জীবনের নিশ্চয়তা ছিল না,*" লিখেছে পেলো।[১২৪]

এর নয় দশক পূর্বে ব্রিটিশ বন্দিদেরকে মুক্ত করার জন্য জন হ্যারিসন সুলতান মৌলে আব্দুল্লাহ্ মালেকের রাজদরবারে (রাজত্ব ১৬২৭-৩১) বারংবার কূটনৈতিক সফরে যান। তার সে ব্যর্থ মিশনে হ্যারিসন ক্রীতদাসদের উপর পরিচালিত নির্যাতন-দুর্ভোগের চিত্র পর্যবেক্ষণ করে লিখেন: "*তিনি (সুলতান) তার উপস্থিতিতে মানুষগুলোকে প্রহার করিয়ে মৃতপ্রায় করতেন... কাউকে কাউকে পায়ের পাতায় পেটানোর পর তাদেরকে কাঁটা ও পাথরের মধ্য দিয়ে উপরে-নিচে দৌঁড়াতে বাধ্য করতেন।*" তিনি আরো লিখেছেন: (সুলতান) তার কিছু ক্রীতদাসকে ছিঁড়ে টুকরো না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়ার পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাবার হুকুম দিতেন এবং কয়েক জনকে জীবিত অবস্থায় টুকরো টুকরো করার নির্দেশ দেন "*তাদের হাত-পায়ের আঙ্গুল গিরায় গিরায় কেটে কেটে, সে সাথে তাদের বাহু, পা ও মস্তক।*" এর কয়েক বছর আগে বন্দি রবার্ট এডামস্ বর্বর জলদস্যুর শহর সালে-তে তার বন্দি-দশা সম্বন্ধে পিতামাতার কাছে লেখেন: "*মালিক সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটা মিলে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় ঘোড়ার মতো এবং আমার পায়ে বাঁধা থাকে ৩৬ পাউন্ড ওজনের এক-একটি শিকল।*"[১২৫]

মুসলিম শাসক বা প্রধানদের হাতে ভোগ করা ক্রীতদাসদের বন্দিত্ব জীবনের এসব দৃষ্টান্ত ও অমানবিক চিত্র আমাদেরকে মোটামুটি ধারণা দিবে মুসলিমদের হাতে বন্দিকৃত দাসরা বিভিন্ন পর্যায়ে কেমন ভোগান্তিতে ভুগতো। এটা একটা ব্যাপকভাবে গৃহীত সত্য যে, আফ্রিকায় মুসলিম দাস-শিকারি ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা ধৃত বন্দিদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ক্রীতদাস-বাজারে পৌঁছার আগেই মারা যেতো। এসব মৃতদের অনেকেই মারা যেতো খোজাকরণ পদ্ধতির কারণে। মুসলিম বিশ্বে বিক্রির লক্ষ্যে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে সর্বজনীনভাবে খোজা করা হতো। সেটা যে কতটা বিশাল দুর্ভোগ ও মানবজীবনহানিকর ছিল তা অচিন্তনীয়। তারা যে শারীরিক ও মানসিক বেদনা, যন্ত্রণা ও মর্মপীড়া ভোগ করেছে, তা এক কথায় অবর্ণনীয়, সম্ভবত কল্পনারও অতীত।

ক্রীতদাসদের ভাগ্য

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মারা যাওয়ার আগে নবি মুহাম্মদ কয়েক হাজার ধর্মান্তরিত মুসলিমকে রেখে যান, যারা হামলা ও লুটপাটমূলক জিহাদে লিপ্ত হতো প্রধানত খাওয়া-পরার সংস্থান জোটাতে ও মুসলিম ভূখণ্ড বিস্তারের লক্ষ্যে। এ অল্পসংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব ও হতবাক-করা জয়ের অভিযান বাস্তবায়ন করে বিশ্বের বিশাল একটা অংশ মুঠোয় নিয়ে আসে। এ প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক পরাজিত বিধর্মীকে ক্রীতদাস বানানো হয়, যাদের বড় একটা অংশ নিজস্ব ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়।

মাত্র ৬,০০০ আরব যোদ্ধা নিয়ে সিন্ধুতে প্রবেশ করে মোহাম্মদ বিন কাসিম এবং মাত্র তিন বছরে প্রায় ৩০০,০০০ ভারতীয় বিধর্মীকে ক্রীতদাস বানায়। একইরূপে মুসা (৬৯৮-৭১২) উত্তর আফ্রিকায় ৩০০,০০০ কৃষ্ণাঙ্গ ও বার্বারকে ক্রীতদাস বানান। সিন্ধুর প্রথম দিককার মুসলিম সম্প্রদায় অল্প সংখ্যক আরব প্রভু ও অধিকাংশ স্থানীয় ক্রীতদাস মুসলিমদের দ্বারা গঠিত ছিল। এ দু'টি মুসলিম গোষ্ঠী মিলে নতুন ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো বা প্রশাসন যন্ত্র গঠন করে। এ বিশাল উদ্যোগ পরিচালনায় তখনকার প্রযুক্তিহীন যুগে বিপুল জনশক্তির প্রয়োজন হতো। ফলে ক্রীতদাসকরণের মাধ্যমে বিধর্মী থেকে ধর্মান্তরকৃত বিপুল সংখ্যক মুসলিমদেরকে নানা কাজকর্মে নিযুক্ত করা হতো: যেমন নারীদেরকে যৌনদাসীরূপে ও পুরুষদেরকে মুসলিম সামরিক বাহিনী সম্প্রসারণে। মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক দলিল 'মাসালিক' জানায়: ভারতে '*এমন কোনো কাজ ছিল না যা ফিরোজ শাহের ক্রীতদাসদের করতে হয়নি।*'[১২৬] শুধু ভারতেই নয়, সর্বত্রই মুসলিম শাসকরা ক্রীতদাসকৃত স্থানীয়দেরকে একইভাবে কাজে লাগিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম শাসকদের অধীনে ক্রীতদাসদেরকে কল্পনা করা যায় প্রায় এমন সকল কাজেই নিযুক্ত করা হতো।[১২৭] বস্তুত ইসলামি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমগ্র কর্মশক্তি ক্রীতদাসদের দ্বারা গঠিত ছিল, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১২২. Ibid, p. 107
১২৩. Ibid, p. 99
১২৪. Ibid, p. 124-25
১২৫. Ibid, p. 16, 20-21
১২৬. Lal (1994), p. 97
১২৭. Reid A (1993) *The Decline of Slavery in Nineteenth-Century Indonesia*, In Klein MA ed., *Breaking the Chains: Slavery, Bondage and Emancipation in Modern Africa and Asia*, University of Wisconsin Press, Madison, p. 68

নির্মাণ ও স্থাপত্য কর্মে নিয়োগ: মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকরা বিজিত দেশগুলোতে প্রধান যে কাজে হাত দিতো সেটা ছিল জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল বিশাল মসজিদ, মিনার, স্তম্ভ ও ইমারত নির্মাণ। সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় বিধর্মীদের ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়ে ইসলামের শক্তি ও মহিমা ঘোষণা করা। *চাচনামা* জানায় যে, কাসিম সিন্ধুতে প্রবেশ করে নির্মাণ কাজের যে উদ্যোগ নেয় সে সম্পর্কে হাজ্জাজকে লিখে জানায়: *'বিধর্মীরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে। পূজার স্থানগুলোতে মসজিদ ও এবাদতের অন্যান্য ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে। বেদি দাঁড় করানো হয়েছে।'*[১২৮] কুতুবুদ্দিন আইবেক কর্তৃক ভারতে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার (১২০৬) এক দশক আগেই ১১৯২ সালের প্রথম দিকে দিল্লিতে নির্মাণ শুরু করা হয় সুদৃশ্য 'কুওয়াতুল ইসলাম" (ইসলামের শক্তি) মসজিদটি। ইবনে বতুতা জানান: *'কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের স্থানে একটি প্রতিমা মন্দির ছিল। শহরটি দখল করার পর একে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়।'*[১২৯] আইবেক ১১৯৯ সালে দিল্লিতে ইসলামি প্রার্থনা বা নামাজের সময় ঘোষণার জন্য জমকালো 'কুতুব মিনার' নির্মাণের কাজ শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শী বতুতা লিখেছেন: *'ইসলামি জগতে কুতুব মিনারের সমতুল্য কিছু নেই।'*[১৩০]

ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই ভারতে এসব বড় বড় নির্মাণ কর্মোদ্যোগ এটাই প্রতীয়মান করে যে, ইসলামের শক্তি ও মহিমা ঘোষণা করা ছিল বিজয়ের আবশ্যকীয় ও মূল লক্ষ্য। বিধর্মীদেরকে সর্বাধিক মর্যাদাহীন ও অবমাননা করার মানসেই বিধ্বস্ত মন্দির, চার্চ ও সিনাগগের যাবতীয় মাল-মসলা ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়েই ইসলামি মসজিদ-মিনারের কাঠামোগুলো নির্মাণ করা হতো। একটি ফার্সি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, 'কুওয়াতুল ইসলাম' মসজিদটি নির্মাণে ধ্বংসকৃত ২৭টি হিন্দু ও জৈন মন্দিরের সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল।[১৩১] অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ কুতুব মিনার নির্মাণেও একইভাবে বিধর্মী ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করার কথা জানান। 'কুতুব মিনার' নির্মাণে, তিনি লিখেছেন: *'পাথরে খোদাইকৃত মূর্তিগুলো (হিন্দু দেব-দেবী প্রভৃতির) বিকৃত করা হয় অথবা উল্টিয়ে উপরের দিক নিচে দিয়ে তাদেরকে গোপন করা হয়েছে।'*[১৩২]

ভারতের মুসলিম হানাদাররা জমকালো সব মসজিদ, মিনার, নগরদুর্গ ও সমাধি-স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করে ধর্মীয় তাৎপর্যের জন্য। পরবর্তীকালে সারা ভারতব্যাপী এর সাথে তারা যুক্ত করে জমকালো বিশাল বিশাল প্রাসাদ ও অন্যান্য ইমারত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব নির্মাণ কাজ অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হতো। অতিশয় উল্লাসে জিয়াউদ্দিন বারানী আমাদেরকে জানান: সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে দুই-তিন দিনের মধ্যে একটা প্রাসাদ নির্মাণ করা যেতো; আর একটা নগর দুর্গ নির্মাণে লাগতো দুই সপ্তাহ। যদিও এটা অতিরঞ্জিত কথা, তথাপি এ তথ্য থেকে বুঝা যায় যে, এসব ব্যাপক ও বিশাল উদ্যোগের পিছনে বিপুল সংখ্যক লোক, যারা অবশ্যই ছিল ক্রীতদাস শ্রমিক, নিয়োগ করা হতো; এবং সে প্রযুক্তিবিহীন যুগে সেসব নির্মাণকর্ম যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করার জন্য তাদের উপর অমানুষিক চাপ দেওয়া হতো। সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, সুলতান আলাউদ্দিন ৭০,০০০ ক্রীতদাস একত্র করেছিলেন, যারা লাগাতারভাবে তার নির্মাণ কাজে নিযুক্ত থাকতো। *কুওয়াতুল ইসলাম* মসজিদ ও *কুতুব মিনার* ছিল বিশাল উদ্যোগ ও কর্ম-প্রয়াসের দৃষ্টান্ত, কেননা ধ্বংসকৃত মন্দিরের সাজ-সরঞ্জাম অতি সাবধানে খুলে পুনঃব্যবহার করা কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। নিজামী লিখেছেন: মন্দিরগুলো ভাঙ্গার জন্য হাতি ব্যবহার করা হতো, যার এক একটা পাথর সরাতে ৫০০ মানুষের প্রয়োজন হতো। অধিকাংশ সাবধানী কাজ মানব-হস্ত দিয়েই করা হতো এবং সেজন্যে বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস অবশ্যই নিয়োগ করা হয়েছিল।[১৩৩]

এছাড়াও নতুন নতুন শহর, প্রাসাদ ও ধর্মীয় কাঠামো নির্মাণে বিরাম থাকতো খুবই কম। প্রায়শই যখন নতুন সুলতান সিংহাসনে আসীন হতেন – যেটা ঘটতো ঘন ঘন বিরামহীন বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কারণে, যা ভারতে ইসলামি শাসনের একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল – সে নতুন সুলতান নিজস্ব স্মৃতি রেখে যেতে নতুন শহর ও প্রাসাদ নির্মাণে ব্রতী হতো। ইলতুতমিসের পুরনো নগরী ত্যাগ করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (শাসনকাল ১২৬৫-৮৫) দিল্লিতে নির্মাণ করেন বিখ্যাত কাছর-ই-লাল (রেড ফোর্ট) রাজপ্রাসাদটি; একইভাবে সুলতান কায়কোবাদ কিলুঘারি শহরটি নির্মাণ করেন। ইবনে বতুতার ভাষায়: *'রাজার প্রাসাদ তার মৃত্যুর সাথে সাথে পরিত্যক্ত ও বিরান হবে এবং পরবর্তী রাজা নিজের জন্য আরেকটি নতুন প্রাসাদ গড়ে তুলবে – এটা হলো তাদের প্রথা।'*[১৩৪] তিনি দিল্লি সম্পর্কে লিখেন: *'বিভিন্ন সুলতানদের নির্মিত সন্নিহিত চারটি নগরীর সমন্বয়ে গঠিত হলো 'দিল্লি', যা সমগ্র মুসলিম প্রাচ্যের বৃহত্তম নগরী।'*[১৩৫]

অধিকন্তু ঘিঞ্জি নগরীগুলোতে আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না থাকায় দ্রুত অপরিচ্ছন্ন হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তো এবং তদস্থলে নতুন শহর গড়া হতো। বতুতা ও বাবর দুজনেই আর্দ্র পরিবেশের কারণে পুরনো শহর ভেঙ্গে বা ধ্বংস করে নতুন শহর গড়ার কথা লিখেছেন। সেজন্য নতুন শহরে স্থানান্তরের প্রয়োজন পড়ে, যেখানে সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম থাকবে। বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাসকৃত হিন্দুরাই ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা এবং নতুন শহরগুলো নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হতো, মূলত মুসলিমদের বসবাসের জন্য। ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, সুলতান ফিরোজ তুঘলক তার কাজের জন্য ১৮০,০০০ ক্রীতদাস একত্র করেছিলেন। অধ্যাপক লালের হিসাব

---

[১২৮] Sharma, p. 95

[১২৯] Gibb, p. 195

[১৩০] Ibid

[১৩১] Watson F and Hiro D (1979) *India: A Concise History*, Thames & Hudson, Inida, p. 96

[১৩২] Lal (1994), p. 84

[১৩৩] Ibid, p. 84-85

[১৩৪] Ibid, p. 86, 88

[১৩৫] Gibb, p. 194-95

মতে, এদের মধ্যে রাজমিস্ত্রি ও স্থপতিকর্মীদের ১২,০০০ ক্রীতদাস কেবল পাথর কাটার কাজেই সম্ভবত নিয়োজিত ছিল। বাবর লিখেছেন: '*আগ্রায় আমার নির্মাণ-কাজে মাত্র ৬৮০ জন লোক দৈনিক কাজ করতো। অপরদিকে আগ্রা, সিক্রী, বিয়ানা, ডুলপুর, গোয়ালিয়র ও কুলিতে (আলিগড়) আমার নির্মাণ কাজে ১৪৯১ জন পাথর কাটার লোক দৈনন্দিন কাজ করতো। একইভাবে হিন্দুস্তানে কাজ করছে অগণিত সংখ্যক প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মী ও শিল্পী।*'[১৩৬]

পুরো ইসলামি শাসন জুড়ে ভারতে মুসলিম শাসকরা নির্মাণ করেছেন বিশাল বিশাল মসজিদ, স্মৃতিস্তম্ভ, সমাধিস্তম্ভ, নগরদুর্গ, অট্টালিকা ও নগরী; শুধু নির্মাণই নয়, সেগুলোর মেরামতও করেছেন। তর্কাতীতভাবে ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম অবদান হলো বিশাল বিশাল স্থাপত্য ও স্মৃতিস্তম্ভ, যেগুলোর দ্যুতি আজও ভারতে আগত বিশ্বের সকল অঞ্চলের পর্যটকদেরকে বিস্মিত করে, আকৃষ্ট করে সকলকে। এবং এগুলোর সবই তৎকালে ক্রীতদাসকৃত ভারতীয়দের অবদান, যারা অগণ্য সংখ্যায় সেসব স্মৃতিস্মারক নির্মাণে সকল স্তরে বিনা শর্তে তাদের শ্রম ও দক্ষতা প্রয়োগ করতো, আর তাদের পিছনে মুসলিম প্রভুরা চাবুক হাতে নিরন্তর নিষ্ঠুর পাহারায় রত থাকতো।

মুসলিম বিশ্বের অন্যত্রও চমৎকার আকার-প্রকৃতির প্রাসাদ, স্মৃতিস্তম্ভ ও নগর নির্মাণে অনুরূপ কর্মকাণ্ড বিদ্যমান ছিল। মরক্কোয় পূর্ববর্তী শাসকরা গড়ে তুলেছিলেন চোখ-ধাঁধানো অট্টালিকা ও স্মৃতিস্তম্ভ সম্বলিত রাজধানী ফেজ, রাবাত ও মারাক্কেশে। সুলতান মৌলে ইসমাইল যখন ১৬৭২ সালে ক্ষমতা দখল করেন, তিনি মেক্‌নেসে একটা নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন, যা আকার ও চমৎকারিত্বে তৎকালীন বিশ্বের সকল বৃহৎ নগরীকে ছাড়িয়ে যাবে। তিনি সেখানকার সমস্ত বাড়িঘর ও দালান-কোঠা ভেঙ্গে বিশাল এক এলাকা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন, যেখানে তিনি নির্মাণ করেছিলেন হতবাক-করা, চোখ-ধাঁধাঁনো নিজস্ব প্রাসাদ, যার দেওয়াল বিস্তৃত ছিল বহু মাইল। মেক্‌নেসের প্রাসাদ-নগরীটিতে নির্মাণ করা হয়েছিল '*পরস্পরের সাথে যুক্ত সুবিন্যস্ত প্রাসাদরাজি, যেগুলো চতুর্দিকে পাহাড় ও উপত্যকার মাঝ দিয়ে একের পর এক সীমাহীনভাবে বিস্তৃত ছিল। সেখানে ছিল বিরাট আঙ্গিনা, সারিবদ্ধ গ্যালারি, মসজিদ ও প্রমোদকানন। তিনি (সুলতান) একটা বিশাল মূর হেরেম ও সেসঙ্গে আস্তাবল ও অস্ত্রাগার, ঝর্ণা, পুকুর ও অন্যান্য অহেতুক জিনিস নির্মাণের নির্দেশ দেন।*'[১৩৭]

সুলতান মৌলে ইসমাইল রাজা চতুর্দশ লুই-এর ভার্সাই'তে অবস্থিত ইউরোপের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদের চেয়ে বড় একটি প্রাসাদনগরী গড়ে তোলার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। বাস্তবে তিনি ভার্সাই রাজপ্রাসাদের চেয়ে অনেক বড় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলেন। সুলতান মৌলে ইসমাইলের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর ও ইংরেজ বন্দিদেরকে মুক্ত করার জন্য কমোডর চার্লস স্টুয়ার্ট-এর নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ কূটনীতিক তার প্রাসাদে যান। তারা প্রাসাদটিকে ইউরোপের যে কোনো অট্টালিকার চেয়ে অনেক বৃহৎ দেখতে পান; এমনকি রাজা চতুর্দশ লুই-এর বৃহত্তম ও অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী প্রাসাদটিও এর চেয়ে অনেক ছোট মনে হয়েছিল তাদের কাছে। সবচেয়ে অবাককারী অট্টালিকাটি ছিল 'আল-মনসুর প্রাসাদ', যা ছিল ১৫০ ফুট উঁচু ও উজ্জ্বল-সবুজ টাইল দ্বারা অলঙ্কারিত কুড়িটি প্যাভিলিয়নে সুসজ্জিত করা।[১৩৮]

সুলতানের প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল শুধু ইউরোপীয় ক্রীতদাসদের দ্বারাই, যাদেরকে সহায়তা করে স্থানীয় ক্রীতদাসকৃত অপরাধীরা। প্রাসাদটির পরিধি ছিল চার মাইল ও দেওয়াল ২৫ ফুট চওড়া। উইনডাস জানান: "*প্রাসাদটি নির্মাণে প্রতিদিন ৩০,০০০ মানুষ ও ১০,০০০ গাধা নিয়োজিত ছিল।*" প্রতিদিন সকালে এসে সুলতান কাজ পরিদর্শন করতেন ও সারাদিনের কাজের ধারণা দিতেন। ক্রীতদাসরা যথাসময়ে বরাদ্দ কাজ সমাপ্ত করার জন্য সতর্ক একাগ্রতার সাথে কাজ করতো। একটা প্রকল্প শেষ করতে না করতেই তিনি আরেকটি হাতে নিতেন। নির্মাণ কাজের মাত্রা এতই ব্যাপক ছিল যে, "*আরব বা বিদেশী, পৌত্তলিক কিংবা মুসলিম – কোনো সরকারের অধীনেই এমন সুদৃশ্য প্রাসাদ দেখা যায়নি,*" লিখেছেন মরক্কোর ইতিহাসবিদ এজ-জায়ানি। কেবলমাত্র প্রাসাদটির কেল্লা পাহারা দেওয়ার জন্যই ১২,০০০ সৈনিকের প্রয়োজন হতো।[১৩৯]

সুলতান মৌলে ইসমাইলের প্রাসাদে নির্মাণ কাজেও কোনো বিরাম ছিল না। সমাপ্তকৃত নির্মাণ কাজে কদাচিৎ সন্তুষ্ট সুলতান তা পুরোপুরি ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়ার নির্দেশ দিতেন। ক্রীতদাসদেরকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য তিনি প্রাসাদের ১২ মাইল দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলে তা পুনরায় নির্মাণের নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন: "*আমার রয়েছে ইঁদুর (ক্রীতদাস) ভর্তি একটা থলি; আমি থলিটা যদি নাড়া-চাড়া না করতে থাকি তাহলে তারা সেটা কেটে বের হয়ে যাবে।*"[১৪০]

সুলতান মৌলে ইসমাইলের উত্তরসূরী মৌলে আব্দাল্লাহ্ পিতার মতোই নিষ্ঠুর ছিলেন। ক্রীতদাসদেরকে কঠোর পরিশ্রমে ব্যস্ত রাখার জন্য তার পিতার নির্মিত অবাক-করা সব প্রাসাদ, যা ছিল 'মেক্‌নেসের গৌরব ও আনন্দ', সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে সেখানে নতুন প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দেন তার ইউরোপীয় ক্রীতদাসদেরকে। কাজের সময় ক্রীতদাসদের চরমতম দুর্ভোগ হতো, এমনকি কাজ করতে করতে তারা মারা গেলে, তিনি এক ধরণের কুশ্রী আনন্দ পেতেন। ফরাসি নাগরিক আঁদ্রিয়ান দা ম্যানল্ট লিখেছেন: "*ক্রীতদাসরা কাজ করার সময় তার একটা আনন্দজনক কাজ ছিল, ধ্বসে পড়তে যাচ্ছে এমন দেয়ালের নিচে অনেকগুলো ক্রীতদাসকে বসিয়ে রাখা এবং দেখা, কিভাবে তারা সে ধ্বংসস্তরপের তলে পড়ে প্রাণ হারায়।*" পেলো লিখেছেন: "*তিনি তার ক্রীতদাসদের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম ও ভয়াবহ আচরণ করতেন।*"[১৪১]

---

১৩৬. Lal (1994), p. 88
১৩৭. Milton, p. 100-01
১৩৮. Ibid, p. 102
১৩৯. Ibid, p. 104-05
১৪০. Ibid
১৪১. Ibid, p. 240-41

সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি: সামরিক বাহিনী ছিল আরেকটা প্রধান প্রকল্প যাতে ক্রীতদাসদেরকে বড় সংখ্যায় নিযুক্ত করা হতো। উত্তর আফ্রিকায় মুসা ৩০,০০০ ক্রীতদাসকে তার সেনাবাহিনীতে যুক্ত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সুলতান মৌলে ইসমাইল ২৫০,০০০ ক্রীতদাসে গড়া একটি শক্তিশালী কৃষ্ণাঙ্গ-বাহিনী রাখতেন। মরক্কো, মিশর ও পারস্যে সে আমলে ৫০,০০০ থেকে ২৫০,০০০ ক্রীতদাস দ্বারা গঠিত মুসলিম সেনবাহিনী স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটানো সে ভয়ঙ্কর জ্যানিসারি বাহিনী নীরেট ক্রীতদাসদের দ্বারাই গঠিত ছিল। দিল্লির প্রথম দাস সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ গোরীর ক্রীতদাস। ১২৯০ সাল পর্যন্ত দিল্লির সব সুলতানই ছিলেন ক্রীতদাস। তাদের সেনাবাহিনীও প্রধানত বহির্দেশ থেকে আনা ক্রীতদাস দ্বারা গঠিত ছিল।

অনেক মুসলিম ও অমুসলিম ইতিহাসবিদ ও লেখক মুসলিম শাসক-কর্তৃক সেনাবাহিনীতে ক্রীতদাসদেরকে নিয়োগকরণের এ নীতিকে এক মহৎ কাজ ও ক্রীতদাস মুক্তকরণ প্রক্রিয়া বলে গর্ব করেন। তাদের যুক্তি হলো: এরূপ মহৎ কাজ ক্রীতদাসদেরকেও সামরিক বাহিনীর উচ্চপদে পৌঁছানোর সুযোগ দেয়, এমনকি তারা শাসকও হয়ে যেতো। এটা সত্য যে, অনেক ক্রীতদাসই সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে আসীন হয়েছে; কেউ কেউ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসক-পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত মুসলিম শাসকদের বদান্যতার ফল ছিল না, বরঞ্চ সেটা ছিল নিজ স্বার্থে তাদের একটা প্রয়োজন বা বাধ্যকতা: যেমন বিজয় অব্যাহত রাখতে, রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে ও পরাজিতদের কাছ থেকে আরো বেশি লুণ্ঠিত মালামাল, ক্রীতদাস ও রাজস্ব সংগ্রহের খাতিরে। এটা কাজ করতো তাদের বর্বরতা, নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা এবং বিধর্মীদেরকে হত্যা ও ক্রীতদাসকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার হাতিয়ার হিসেবে। প্রত্যেকটি ক্রীতদাসের ক্ষমতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতকরণ চরম নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও হাজার হাজার, লাখ লাখ নিরীহ মানুষের জীবন ধ্বংসের পথ তৈরি করেছে। প্রত্যেক ক্রীতদাস, যারা সাধারণ এক সৈনিক বা যোদ্ধা হয়েছে, তারা কয়েকজন থেকে বহু নিষ্পাপ জীবন ধ্বংস করেছে।

৬,০০০ আরব যোদ্ধা নিয়ে দেবাল অধিকারের পর (৭১২) মোহাম্মদ বিন কাসিম তার বাহিনী সম্প্রসারিত না করে সামনে এগুতে পারেনি। সুতরাং এক-একটা নগরী দখলের পর তার সেনাবাহিনী সংহত ও সম্প্রসারণের জন্য তাকে সময় নিতে হয়েছে। সম্ভবত ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে শর্তহীনভাবে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করতে হয়েছিল তাকে (অন্ততঃ উত্তর আফ্রিকায় সেনাধ্যক্ষ মুসা সে প্রক্রিয়ায় তার সেনাবাহিনী সম্প্রসারিত করেছিলেন)।[১৪২] সামরিক শক্তি সম্প্রসারণের পর সে ইতিমধ্যে বিজিত ভূখণ্ডগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে নতুন বিজয় অভিযানে। সিন্ধুতে আসার পর কাসিম প্রায় অর্ধ-ডজন বড় ধরনের অভিযান চালায়। তার বাহিনী উত্তরোত্তর বেড়ে দাঁড়ায় ৫০,০০০ সৈনিকে। নতুন সংযোজিত যোদ্ধাদের বিশেষ একটা অংশ সম্ভবত এসেছিল বন্দিকৃত ভারতীয় ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে। বারানী লিখিত '*রাজাই সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনীই রাজা*' উক্তিটি লুণ্ঠনকারী মুসলিম শাসন ও বিজয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় গুরুত্বের কথা প্রতীয়মান করে। সুতরাং সেনাবাহিনীতে ক্রীতদাসদেরকে নিয়োগকরণ প্রক্রিয়া তাদের প্রতি মুসলিম শাসকদের আনুকূল্য প্রদর্শন ছিল না, বরং তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিম শাসকদের জন্য সেটা ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত কিংবা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কোনো মহানুভবতা দেখানোর কাজ ছিল না; বরং সেটা ছিল নিজেদেরই (শাসকদেরই) ভাগ্য গড়ার বা বর্ধিতকরণের জন্য বাধ্যবাধকতা। সর্বোপরি সামরিক বাহিনীতে ক্রীতদাসদের অন্তর্ভুক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ফসল ছিল না, বরং ছিল বাধ্যকতা। আর সেনাবাহিনীতে নিয়োগকৃত প্রত্যেক ক্রীতদাস বহু নিরীহ অমুসলিমের জীবন ধ্বংস ও তাদেরকে নিষ্ঠুরতার শিকারে পরিণত করার পথ খুলে দিয়েছিল, যারা নিকট অতীতে ছিল তাদেরই স্বধর্মী।

৭৩২ সালে ফ্রান্সে টুরের যুদ্ধে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতিসহ মুসলিমরা পরাজিত হলে ইসলামি বিজয়ের জোয়ার কিছুটা অবদমিত হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর জিহাদী জোশ সম্ভবত কমে যাচ্ছিল। বিশাল ভূখণ্ড বিজয় ও বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ আহরণের পর আরব ও পারস্য সেনারা সম্ভবত রক্ত-ঝরা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা, যা তাদের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিল। এ সময় উত্তর আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও বার্বার ক্রীতদাসরা একটা বিশাল মুসলিম বাহিনী গঠন করে, যারা ইউরোপে জিহাদী অভিযান অব্যাহত রাখে। ইসলামি সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে মুসলিম শাসকরা পেয়ে যায় তুর্কি জনগোষ্ঠীকে, যাদের ছিল যুদ্ধ ও রক্তপাতে অশেষ উদ্দীপনা। আব্বসীয় খলিফারা, বিশেষত খলিফা আল-মুতাসিম (৮৩৩-৪২), বিপুল সংখ্যায় তুর্কীকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা শুরু করেন, অবসাদগ্রস্ত আরব ও পারস্য সেনাদেরকে সরাতে। সেনাবাহিনীতে নিয়োগকৃত এসব তুর্কির অধিকাংশই ছিল ক্রীতদাস, যাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে বন্দি করা হয়েছিল; সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করতে তাদেরকে দিউশারমির মতো প্রক্রিয়ায় যোগাড় করেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পরবর্তী খলিফারাও এ প্রবণতা অব্যাহত রাখেন; ফলে তুর্কিরা মুসলিম সেনাবাহিনীতে মূল শক্তি হয়ে উঠে এবং আরব ও পারস্যদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়।

শক্তিধর তুর্কি সেনানায়কদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ করে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। প্রথম স্বাধীন তুর্কি রাজত্ব শুরু হয় ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে। ইসলামি সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে আল্পতাগীন নামে এক তুর্কি ক্রীতদাস শাসক, যিনি ছিলেন ট্রানসক্সিয়ানা, খোরাসান ও বোখারার পারস্য শাসক (সামানিদ বংশ) আহমদ বিন ইসমাইলের (মৃ. ৯০৭) ক্রয় করা ক্রীতদাস। সামরিক দক্ষতার কারণে সামানিদ গভর্ণর আব্দুল মালিক (৯৫৪-৬১) আল্পতাগীনকে ৫০০টি গ্রাম ও ২,০০০ ক্রীতদাস সেনার দায়িত্বে নিয়োগ করেন। আল্পতাগীন পরে গজনীতে এক স্বাধীন শাসকে পরিণত হন। তিনি সবুক্তাগীন নামে আরেক তুর্কি ক্রীতদাসকে ক্রয় করেছিলেন, যিনি আল্পতাগীনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুযোগ গ্রহণ করেন। আল-উত্বি লিখেছেন: সবুক্তাগীন ধর্মযুদ্ধের নামে হিন্দুস্তানের অভ্যন্তরে বারবার হানা দেয়। যাহোক সবুক্তাগীনের পুত্র ছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনী, যিনি ভারতের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেন। এর প্রায় দেড় শতাব্দী পরে আরেক ক্রীতদাস সুলতান, সুলতান মোহাম্মদ গোরী ভারতীয় স্বাধীনতা ও

১৪২. Large numbers of volunteer Jihadists from the Islamic world, seeing new opportunities for engaging in holy war against the infidels, also poured into Sindh to join Qasim's army.

স্বার্বভৌমত্বের উপর সর্বশেষ আঘাত হেনে দিল্লিতে মুসলিম সুলতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। গজনীতে অবস্থানকৃত সুলতান গোরীর মৃত্যুর পর সেনাপতি পদে উন্নীত তার তুর্কি ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবেক নিজেকে দিল্লির প্রথম সুলতান ঘোষণা করেন। প্রথম দিকে দিল্লির সুলতানদের সেনাবাহিনী পরিচালনা প্রধানত বিদেশী বংশোদ্ভূত ক্রীতদাসদের দ্বারাই গঠিত ছিল। বিভিন্ন বিদেশী জাতীয়তার তুর্কি, পারস্য, সেল্‌জুক, ওঘুস (ইরাকে বসবাসকারী তুর্কি), আফগান ও খিলজি'দেরকে ব্যাপক সংখ্যায় ক্রয় করে গজনী ও গোরীয় বাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। সুলতান ইলতুতমিসের কন্যা সুলতানা রাজিয়ার (শাসনকাল ১২৩৬-৪০) বাহিনীতে আবিসিনিয়া থেকে কিনে আনা কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসরা ছিল প্রধান শক্তি।

খিলজি শাসনের সময় (১২৯০-১৩২০) ভারতে প্রথম বারের মতো অক্রীতদাস বা মুক্ত ব্যক্তি শাসক পদে ক্ষমতাসীন হয়। এ সময় ক্রীতদাস করে জবরদস্তিমূলকভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত ভারতীয়রাও সামরিক বাহিনীতে আসা শুরু করে। এর ফলে গোঁড়া মুসলিমরা বিরক্ত হয়। তারা সেনাবাহিনীতে ম্লেচ্ছ বা হীন জাতীয় ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তিকে ঘৃণা করতো। কিন্তু এ সময় মোঙ্গলরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করে আসছিল। তাদেরকে প্রতিরোধ করতে সুলতানের শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং ভারতীয় মুসলিম ক্রীতদাসদেরকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠে। অধিকন্তু খিলজিরা ক্ষমতা দখল করেছিল তুর্কিদেরকে বিতাড়িত করে, যারা অবিরাম বিদ্রোহ করে আসছিল। অতএব আনুগত্যের বিষয়টি চিন্তা করেও খিলজিরা সেনাবাহিনীতে ব্যাপকভাবে তুর্কিদের নিয়োগ করতে পারতো না। পরে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (শাসনকাল ১৩৫১-৮৮) ইসলামে ধর্মান্তরিত মোঙ্গলদের আক্রমণের গন্ধ পেলে (১৩৯৮ সালে সত্যি সত্যি তিমুরের বর্বর আক্রমণ ঘটে) তারও বিশাল বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে ভারতীয়রা সর্বপ্রথম মুসলিম সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি পায়। বিধর্মী থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমদেরকে সেনাবাহিনীতে অক্তর্ভুক্তির ব্যাপারে একই প্রকারের বিরোধিতা ছিল অন্যান্য স্থানেও। মিশরে স্থানীয় কপ্‌টিক খ্রিষ্টান, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

ভারতীয় যোদ্ধাদের ভূমিকা: সেনাবাহিনীতে ভারতীয় যোদ্ধারা (অধিকাংশই ধর্মান্তরিত ক্রীতদাস) 'পাইক' নামে পরিচিত ছিল। সাধারণত অত্যন্ত নিম্নপদে তাদেরকে নিয়োগ করা হতো পদাতিক-সেনা হিসেবে। যুদ্ধে ধৃত ক্রীতদাস কিংবা আনুগত্য-উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে তাদেরকে বাছাই করা হতো। শেষ দিকে কিছু হিন্দুও জীবনধারণের তাগিদে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। পাইকরা সব ধরনের টুকিটাকি কাজে নিয়োজিত হতো, যেমন হাতি ও ঘোড়া দেখাশোনা করা। ঘোড়-সওয়ার বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কাজেও তারা নিয়োজিত হতো। ভারতে মুসলিম সুলতান ও সম্রাটরা বিশাল সেনাবাহিনী রাখতেন। মোরল্যান্ড উল্লেখ করেছেন যে, আকবরের শাসনামলে *"যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধকারী একজন মুঘল যোদ্ধার দুই থেকে তিনজন করে চাকর থাকতো।"*[১৪৩] স্বাভাবিকভাবেই, শেষের দিকে ভারতের মুসলিম সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কাজে অসংখ্য ক্রীতদাস নিয়োগ করা হতো। সামরিক অভিযানকালে পাইকরা সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়ার জন্য ঝোপ-জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করতো। বিশ্রাম নিতে থামলে বা গন্তব্যে পৌঁছুলে পাইকরা শিবির স্থাপন করতো, তাঁবু খাটাতো। আমির খসরু লিখেছেন: কখনো কখনো সর্বোচ্চ ১২,৫৪৬ গজ পরিধি জুড়ে শিবির স্থাপন করা হতো।[১৪৪]

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-পক্ষের প্রাথমিক আক্রমণ সামাল দিতে পাইকদেরকে সম্মুখভাগে মোতায়েন করা হতো। আল্‌কালকাসিন্দি 'সুভ-উল-আসা' গ্রন্থে লিখেছেন: *'সম্মুখভাগের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে তারা পালাতে পারতো না। কারণ তাদের ডানে-বাঁয়ে থাকতো ঘোড়া এবং পিছনে হাতি, যাতে কেউ দৌড়ে পালাতে না পারে।'* পর্তুগিজ রাজকর্মচারী ডুয়ার্ত বারবোসা (১৫১৮) তার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণীতে লিখেছেন: *'পাইকরা তলোয়ার, ছোরা ও তীর-ধনুক বহন করতো। তারা ছিল অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজ এবং তাদের ধনুকগুলো ইংল্যান্ডের ধনুকের মতো বড় আকারের। তারা অধিকাংশই হিন্দু।'* তবে কিছু ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দু ধর্মান্তরিত মুসলিম ক্রীতদাসও, যেমন মালিক কাফুর, মালিক নায়েক, সরঙ্গ খান, বাহাদুর নাহার, শাইখা খোখার ও মাল্লু খান প্রমুখ সেনারা অবশ্য ক্ষমতার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন তাদের সামরিক শৌর্য ও সুলতানের প্রতি আনুগত্যের কৃতিত্বে।[১৪৫]

মোটকথা: সেনাবাহিনীতে ভারতীয় ক্রীতদাসরা যোদ্ধা বা সৈনিকদের চাকর-বাকর, আস্তাবলে ঘোড়া-হাতির তত্ত্বাবধায়ক, যুদ্ধের সম্মুখভাগে ছোরা-তলোয়ার ও তীর-ধনুক হাতে পদাতিকভাবে শত্রুর ভয়ঙ্কর প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করাসহ সব রকমের টুকিটাকি কাজ করতো।

অন্যত্রও স্থানীয় সৈনিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রবণতা ছিল। প্রাথমিক যুগে সেনাবাহিনীর বাইরে রাখার পর যখন ইসলামে ধর্মান্তরিত কপ্‌টিকদের নিয়োগ করা অনিবার্য হয়ে উঠে, *'তখন তাদেরকে পদাতিক বাহিনীর দলে তালিকাভুক্ত করা হতো। সেনাবাহিনী বিজয় লাভ করলে তারা যুদ্ধের লুণ্ঠিত মালামালের হিস্যারূপে ঘোরসওয়ার যোদ্ধার অর্ধেক পেতো।'*[১৪৬] মরক্কোতে ইসলামে ধর্মান্তরিত ইউরোপীয় বন্দিরা ছিল ক্রীতদাসদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত। ভয়ঙ্কর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার জন্য তাদেরকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণে তাদেরকে সম্মুখভাগে নেতৃত্ব দিতে হতো এবং শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা করা

---

[১৪৩] Moreland WH (1923) *From Akbar to Aurangzeb*, Macmillan, London, p. 88

[১৪৪] Lal (1994), p. 89-93

[১৪৫] Ibid

[১৪৬] Tagher J (1998) *Christians in Muslim Egypt: A Historical study of the Relation Between Copts and Muslims from 610 to 1922*, Trs. Makar RN, Oros Verlag, Altenberge, p. 18

থেকে তাদের পালাবার কোনো পথ ছিল না। যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করলে বা পালানোর পথ খুঁজলে তাদেরকে কেটে টুকরা টুকরা করা হতো।[১৪৭.]

রাজকীয় কারখানায় নিয়োগ: ব্যাপকহারে ক্রীতদাস নিয়োগের আরেকটি ক্ষেত্র ছিল রাজকীয় কারখানা। গোটা সুলতানাত ও মুঘল শাসনামলে ভারতে রাজকীয় কারখানাসমূহে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হতো। রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের যাবতীয় জিনিসপত্র এসব কারখানায় তৈরি করা হতো: যেমন স্বর্ণ, রূপা ও তামার নানারকম অলঙ্কারাদি, অন্যান্য ধাতুর জিনিসপত্র; বস্ত্র, সুগন্ধি, বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র, চামড়ার দ্রব্যাদি, কাপড়-চোপড়, ঘোড়ার ও উটের গদি এবং হাতির পিঠের চাদর ইত্যাদি।[১৪৮.] এসব কারখানা চালানোর জন্য হাজার হাজার ক্রীতদাসকে কারিগর শিল্পী বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। উচ্চপদস্থ আমির বা খানরা এগুলোর পর্যবেক্ষণে থাকতো। এসব কারখানাগুলোতে কাজ করার জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১২,০০০ ক্রীতদাস নিয়োগ করেছিলেন। সুলতান বা সম্রাট, তাদের সেনানায়ক, যোদ্ধা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় উন্নত মানসম্পন্ন ও সুন্দর জিনিসপত্র তৈরি করতো তারা। এছাড়াও তারা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রপাতি, বিদেশী রাজা বা প্রভুর জন্য প্রেরিতব্য উপহার-সামগ্রী অত্যন্ত যত্নের সাথে তৈরি করতো। কমোডর স্টুয়ার্ড ও তার সঙ্গীরা মরক্কোতে সুলতান মৌলে ইসমাইলের কারখানা পরিদর্শন করে দেখতে পান: "*কারখানাগুলো কাজে ব্যস্ত বয়স্ক লোক ও বালকে ভরা। তারা তৈরি করছে ঘোড়ার গদি, বন্দুকের কুঁদা, তরবারির খাপ ও অন্যান্য বস্তু।*"[১৪৯.]

রাজপ্রাসাদ ও দরবারে নিয়োগ: রাজকীয় প্রাসাদ ও দরবারে ক্রীতদাস নিয়োগের নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক লাল (সংক্ষেপিত)।[১৫০.] রাজদরবারের বিভিন্ন বিভাগে বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস নিয়োগ করা হতো। তাদের মধ্যে বড় একটা সংখ্যা কাজ করতো গুপ্তচর হিসেবে। হাজার হাজার ক্রীতদাস নিয়োজিত হতো রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজস্ব বিভাগে ও সরকারি সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ডাক বিভাগে। প্রাসাদেও বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস নিয়োজিত হতো। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের হেরেমে ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ নারী (স্ত্রী ও উপপত্নীরা) থাকতো এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য কয়েকজন থেকে বহু সংখ্যক 'বাঁদী' (ক্রীতদাস নারী) থাকতো পরিচর্যা করার জন্য। তাদের স্ত্রী ও উপপত্নীরা পৃথক পৃথক কামরায় থাকতো এবং তাদের পাহারায় থাকতো পর্যায়ক্রমে নারীরক্ষী, খোজাকৃত রক্ষী ও দারোয়ান।

ঢোল, ট্রামপেট বা ভেরী ও বাঁশি বাজানোর জন্যও ক্রীতদাসদের বড় একটা দল নিয়োজিত থাকতো। রাজকীয় ব্যক্তিত্বদের পাখা টেনে বাতাস করা ও মশা তাড়ানোর জন্যও ক্রীতদাসরা সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতো। শিহাবুদ্দিন আল-ওমারী লিখেছেন, সুলতান মোহাম্মদ শাহ তুঘলকের (মৃত্যু ১৩৫১) সেবায়:

> 'ছিল ১,২০০ চিকিৎসক; ১০,০০০ বাজ পাখিওয়ালা, যারা ঘোড়ায় চড়ে পাখি শিকার খেলার জন্য প্রশিক্ষিত পাখি বহন করতো; পাখি ধরার জন্য ৩০০ ক্রীতদাস এগিয়ে গিয়ে শিকারের টোপ রাখতো; শিকারে তিনি যখন বের হতেন তখন তার সাথে থাকতো ৩,০০০ নবিশ; তার খাবার সঙ্গী ছিল ৫০০ লোক। তিনি পোষণ করতেন ১,২০০ সঙ্গীত-শিল্পী; এছাড়াও প্রায় ১,০০০ ক্রীতদাস সঙ্গীত-শিল্পী যারা গান শেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতো; এবং আরবি, ফারসি ও ভারতীয় ভাষার ১,০০০ কবি। রাজকীয় রন্ধনশালায় যোগান দেওয়ার জন্য প্রতিদিন ২,৫০০ ষাঁড়, ২,০০০ ভেড়া ও অন্যান্য প্রাণী জবাই করা হতো।'

এমন বিশাল কর্মকাণ্ডে ও রাজপ্রাসাদের অন্যসব টুকিটাকি কাজে কত সংখ্যক ক্রীতদাস দৈনন্দিন প্রয়োজন হতো তা লেখা হয়নি, তবে সেটা অনুমান করা অসম্ভব নয়। আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুক, শিকার, বন্দুক-ছোঁড়া, কবুতর উড়ানো ও এরূপ কাজে বহু ক্রীতদাস নিয়োজিত হতো। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সংগ্রহে ৫০,০০০ কবুতর-বালক ছিল। মোরল্যান্ড লিখেছেন: ব্যাঙ ও মাকড়শা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীকে লড়াই শেখানোর জন্য ক্রীতদাস নিয়োগ করা হতো। সম্রাট হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বী শের শাহ যদিও তেমন শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত শাসক ছিলেন না, তথাপি তার ডাক যোগাযোগের জন্যই নিযুক্ত ছিল ৩,৪০০ ঘোড়া এবং তার আস্তাবলে ছিল প্রায় ৫,০০০ হাতি। প্রতিটি হাতিকে দেখ-ভাল করার জন্য সাতজন করে ক্রীতদাস নিয়োজিত থাকতো। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন: ইংল্যান্ড থেকে উপহার হিসেবে আনা তার এক একটি কুকুরকে দেখাশোনা করার জন্য চার জন করে ক্রীতদাস ছিল। ওদিকে আহমেদ বেন নাসিরি জানান: মরক্কোর সুলতান মৌলে ইসমাইলের আস্তাবলে প্রায় ১২,০০০ ঘোড়া ছিল এবং প্রতি ১০টি ঘোড়া দেখাশোনা করার জন্য দুইজন করে ক্রীতদাস নিয়োজিত থাকতো।[১৫১.] সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হারেম-রক্ষক হিসেবে কাজ করা পেলো জানায়: সুলতান মৌলে ইসমাইলের বিশাল হারেমে ৪,০০০ উপপত্নী ও স্ত্রী ছিল।[১৫২.] স্পষ্টতই হারেম পাহারার জন্য বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস নিয়োজিত থাকতো।

গৃহস্থালি ও কৃষিকর্মে নিয়োগ: রাজকীয় প্রাসাদের কাজে হাজার হাজার ক্রীতদাস নিয়োজিত থাকতো। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, প্রাদেশিক গভর্নররা ও উচ্চপদস্থ সেনারা তাদের স্ব-স্ব দরবার ও গৃহস্থালির কাজে শত শত, এমনকি হাজার হাজার, ক্রীতদাস নিয়োগ করতো। সম্রাট জাহাঙ্গীরের এক কর্মকর্তাই রাখতেন ১,২০০ খোজা ক্রীতদাস। যুদ্ধাভিযান থেকে মুসলিম যোদ্ধারা তাদের অংশ হিসেবে অনেক ক্রীতদাস পেতো। তাদের কিছু অংশকে বিক্রি করে দিয়ে বাকিদেরকে গৃহস্থালির, গৃহের বাইরের ও অন্যান্য কাজকর্মে নিয়োগ করা হতো মালিকদের সবরকম আরাম-আয়েশের নিমিত্তে।

---

১৪৭. Milton, p. 135-36
১৪৮. Lal (1994), p. 96-99
১৪৯. Milton, p. 186
১৫০. Lal (1994), p. 99-102
১৫১. Milton, p. 132
১৫২. Ibid, p. 120

'ওমরের সন্ধি'তে বিধৃত ইসলামি আইন অনুযায়ী অমুসলিমরা মুসলিম মালিকানাধীন ক্রীতদাস ক্রয় করতে পারতো না। অতএব মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোতে কেবলমাত্র মুসলিমরাই বৈধভাবে ক্রীতদাস কিনতে পারতো। ইসলামের প্রাথমিককালে সম্ভবত এ নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হতো। ইসলামের প্রাথমিক দশক ও শতাব্দীগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল কম। অপরদিকে তাদের বিজয়ের দ্রুততর সাফল্যের কারণে বিক্রির উদ্দেশ্যে আনীত ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ক্রীতদাসের এ অতিরিক্ত সরবরাহে এমনকি একেবারে সাধারণ মুসলিমও অনেক ক্রীতদাসের মালিক হতো, যে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কোনো কোনো অভিযানে বন্দির সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে, তাদেরকে দলবদ্ধভাবে বিক্রি করতে হতো, যেমনটা করেছিলেন খলিফা আল-মুতাসিম ৮৩৮ সালে।

একেবারে সাধারণ দরিদ্র মুসলিম মালিকদের গৃহস্থালিতেও কয়েকজন থেকে বহু ক্রীতদাস কী কাজ করতো? স্পষ্টতই তাদেরকে নিয়োজিত করা হতো কল্পনাসাধ্য সকল শ্রমে ও টুকিটাকি কাজে: সকল প্রকার গৃহকর্ম ও দৈহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজনমূলক যে কোনো কাজে, যেমন পশু চরানো, বাড়ির পিছনের আঙ্গিনায় ও ক্ষেত-খামারের কাজে। এরূপে ক্রীতদাসরা বিনামূল্যে মালিকদের জন্য আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং ভোগ-বিলাসের জীবনযাপনে সক্ষম করতে সর্বোপরি প্রয়াস করতো। লুইস জানান: '*ক্রীতদাসরা, যাদের অধিকাংশই আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ, অর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহে নিযুক্ত হতো ব্যাপক সংখ্যায়। ইসলামের আদিকাল থেকে দক্ষিণ ইরাকের লবণক্ষেত্রগুলো নিষ্কাষনের কাজে বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস নিয়োগ করা হতো। দুরবস্থার কারণে তারা ধারাবাহিকভাবে বিদ্রোহ করে। মিশরের মধ্যাঞ্চল, সুদানের স্বর্ণখনি ও সাহারার লবণখনিগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে নিয়োগ করা হতো।*'[১৫৩] সিগল যোগ করেন: '*তারা খানা-খন্দক খনন করতো, জলাশয়ের পানি নিষ্কাষন করতো, লবণক্ষেতের আবরণ পরিষ্কার করতো। তারা খামারে ইক্ষু ও তুলার চাষ করতো, এবং তাদেরকে গাদাগাদি করে রাখা হতো শিবিরে, প্রতিটিতে ৫০০ থেকে ৫,০০০ জন করে।*'[১৫৪] ক্রীতদাসরা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ শুরু করলে মুসলিম শাসকরা পরে কোনো বিশেষ প্রকল্পে ব্যাপক সংখ্যায় ক্রীতদাস সমাবিষ্ট করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ইসলামি গিনি ও সিয়েরালিওনে ক্রীতদাস শহরগুলোর মালিকরা ক্রীতদাসদেরকে কৃষি খামারে কাজ করাতো।[১৫৫] পূর্ব-আফ্রিকায় সুলতান সাঈদ সাইয়িদের (মৃত্যু ১৮৫৬) ক্রীতদাসরা জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপের বিরাট বিরাট লবঙ্গ খামারে কাজ করতো।[১৫৬] সিগল নেহেমিয়া লেব্‌টসিওনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, '*পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চলীয় মরক্কোর বর্ধনশীল কৃষি-খামারে ক্রীতদাসের খুব চাহিদা ছিল।*' উনবিংশ শতাব্দে, বলেন সিগল: '*তুলার দাম যখন খুব চড়া ছিল এবং সুদান থেকে ক্রীতদাস সরবরাহের ছিল প্রাচুর্য, তখন তারা মিশরে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়; অপরদিকে বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস পূর্ব-আফ্রিকার উপকূলে শস্য উৎপাদনে এবং জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপে লবঙ্গ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।*'[১৫৭] উনবিংশ শতাব্দে প্রায় ৭৬৯,০০০ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপে আরবদের খামারে নিয়োজিত ছিল; সে সাথে ৯৫,০০০ ক্রীতদাসকে পূর্ব-আফ্রিকা থেকে শুধুমাত্র মাস্কারেমি দ্বীপপুঞ্জের আরব খামারে পাঠানো হয়।[১৫৮]

যৌনদাসত্ব ও উপপত্নী প্রথা

নারী ক্রীতদাসরা সাধারণত গৃহপরিচারিকা ও বাড়ির আঙিনার কাজকর্মে নিয়োজিত হতো; আর সুন্দরী তরুণী ক্রীতদাসীকে মালিকের যৌন আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করতে হতো। এরূপে তারা শুধু শারীরিক শ্রম ও মালিকের যৌন লিপ্সাই মেটাতো না, নতুন সন্তান উৎপাদনের দ্বারা মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধিও ঘটাতো। যৌনদাসত্ব ইসলামে আদৌ তুচ্ছ বিষয় ছিল না। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোরানে বারংবার মুসলিমদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর চর্চার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদর্শন করেছেন। নবি মুহাম্মদ কমপক্ষে তিনজন ক্রীতদাস-বালিকাকে তার উপপত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, যেমন বানু মুস্তালিক গোত্রের জুয়াইরিয়া (বুখারী ৩:৪৬:৭১৭), বানু কোরায়জা গোত্রের রায়হানা এবং মুহাম্মদের হুমকিপত্র পাওয়ার পর মিশরের গভর্নর কর্তৃক তাঁকে শান্ত করণের নিমিত্তে প্রেরিত মারিয়া। নবি বন্দিদের হিস্যা হিসেবে প্রাপ্ত তাঁর অংশ থেকেও ক্রীতদাস বালিকাদেরকে উপপত্নী হিসেবে রাখার জন্য তাঁর অনুসারীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এক দৃষ্টান্তে তিনি আলি (তাঁর জামাতা ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা), ওসমান বিন আফফান (তাঁর জামাতা ও তৃতীয় খলিফা) এবং ওমর ইবনে খাত্তাবকে (তাঁর শশুর ও দ্বিতীয় খলিফা) একজন করে ক্রীতদাস-বালিকা দিয়েছিলেন।[১৫৯] কোরানের ২৩:৫-৬ আয়াতের আলোকে দাসপ্রথার ব্যাখ্যায় ইসলামি পণ্ডিত আবুল আলা মওদুদী (মৃত্যু ১৯৭৯) লিখেছেন:

> গোপনাঙ্গ রক্ষার সাধারণ বা সর্বজনীন আদেশ থেকে দুই প্রকারের নারীকে বাদ রাখা হয়েছে: (ক) স্ত্রীগণ, (খ) আইনগত বা বৈধভাবে কারো অধিকারে থাকা নারী অর্থাৎ ক্রীতদাস-বালিকা। এরূপে আয়াতটিতে (কোরানে ২৩:৫-৬) স্পষ্টরূপে আইন করা হয়েছে যে, একজন মুসলিম তার স্ত্রীর মতোই তার ক্রীতদাসীর সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, অধিকার বা মালিকানার ভিত্তিতে, বিবাহের ভিত্তিতে নয়। বিবাহের শর্ত থাকলে ক্রীতদাস-বালিকাও স্ত্রীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখের প্রয়োজন পড়তো না।[১৬০]

---

১৫৩. Lewis (2000), p. 209
১৫৪. Segal, p. 42
১৫৫. Rodney W (1972) In MA Klein & GW Johnson eds., p. 158
১৫৬. Gann L (1972) In Ibid, p. 182
১৫৭. Ibid, p. 44-45
১৫৮. Ibid, p. 60-61
১৫৯. Ibn Ishaq, p. 592-93; Al-Tabari, Vol. IX, p. 29
১৬০. Maududi SAA, *The Meaning of the Quran,Islamic Publications*, Lahore, Vol. III, p. 241, note 7

ইসলামে যৌনদাসী প্রথার সংযোজন ও তার উপরোক্ত উদ্দেশ্যে সম্পর্কে 'হেদাইয়াহ্' বলেঃ নারী-ক্রীতদাস রাখার লক্ষ্য হলো, '*সহবাস ও সন্তান উৎপাদন।*'[১৬১] কাজেই নারী-ক্রীতদাস ক্রয়ের ক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা, নিয়মিত ঋতু ও সন্তান-ধারণ ক্ষমতার উপস্থিতি ইত্যাদি ছিল বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। 'হেদাইয়াহ্' অনুসারে, নারী ক্রীতদাসের মুখে ও বগলে দুর্গন্ধ থাকলে তা সে ক্রুটিপূর্ণ বিবেচিত। স্পষ্টতই এর কারণ হল চুম্বন, আদর ও যৌন-সহবাসের জন্য সে যথার্থ নয়। কিন্তু পুরুষ ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে এগুলো ক্রুটি নয়। 'হেদাইয়াহ্' আরো নির্দিষ্ট করেছে যে, একজন নারী-দাসীর দু'জন মালিক থাকলে সে যার সাথে যৌন-সম্পর্ক গড়ে তুলবে, তার সম্পদ বলে গণ্য হবে।[১৬২] ফতোয়া-ই-আলমগীরি নির্দিষ্ট করেছে যে, যদি কোনো নারী-ক্রীতদাসের স্তন খুব বড় বা যোনি খুব ঢিলা ও প্রশস্ত হয়, ক্রেতার অধিকার রয়েছে তাকে ফেরৎ দিয়ে মূল্য ফিরিয়ে নেওয়ার। স্পষ্টতই এর কারণ ছিল যে, মালিক এরূপ নারীর সঙ্গে যৌনমিলনে তার আশানুরূপ আনন্দ ও সন্তুষ্টি পেতো না। অনুরূপভাবে ক্রেতা তার কেনা ক্রীতদাসীকে ফেরৎ দিতে পারতো সে কুমারী বা অক্ষতযোনির কিনা তার ভিত্তিতে।[১৬৩]

নবি মুহাম্মদের সময়েই নারী-ক্রীতদাস বাছাইয়ের এরূপ প্রক্রিয়া শুরু হয়। নবির অভ্যাস ছিল নিজের জন্য অল্প বয়সের অনন্যা সুন্দরী বন্দি নারীকে পছন্দ করার। খাইবারে নিজের জন্য কিনানার স্ত্রী সাফিয়াকে তিনি পছন্দ করেন, যখন শুনতে পান যে সাফিয়া ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী এক বালিকা এবং একমাত্র নবির উপযুক্ত। এভাবে তিনি তাঁর জিহাদী সহচর দাহিয়াকে বঞ্চিত বা আশাহত করেন, প্রথমত যার ভাগে পড়েছিল সাফিয়া।[১৬৪] আরেক দৃষ্টান্তে, হাওয়াজিন গোত্রের আটক নারী বন্দিদেরকে নবি তাঁর জিহাদী সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার পর গোত্রটি তাদের নারীদেরকে ফেরৎ নেওয়ার জন্য প্রতিনিধি পাঠায় নবির কাছে। তিনি ছয়টি করে উটের বিনিময়ে প্রত্যেক বন্দি-নারীকে মুক্ত করতে রাজী হন। তাঁর শিষ্য উইয়ানা বিন হিসন তার ভাগে পড়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক সুন্দরী নারীকে ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে। তার আশা ছিল যে তার বিনিময় মূল্য হবে আরো বেশি। তা দেখে মুহাম্মদের আরেক অনুসারী জুবায়ের আবু সুরাদ মহিলাটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য উইয়ানাকে বুঝায়: '*তার মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা ও তার স্তনযুগল ঝুলে পড়া; সে পোয়াতি হবে না ও তার দুগ্ধে পুষ্টি নেই।*' উইয়ানা এ ব্যাপারে নবির আরেক সাহাবা আল-আকরার কাছে অভিযোগ করলে আল-আকরা তাকে বুঝায়: '*আল্লাহর কসম! তুমি না পেয়েছো তাকে কুমারীরূপে তার পরিপূর্ণ যৌবনে, না মধ্যবয়সের সুঠাম-শারীরিক অবস্থায়।*'[১৬৫]

যৌনকর্মে নারী-ক্রীতদাসের ব্যবহার কোরান, সুন্নত ও শরীয়তে সুস্পষ্টরূপে অনুমোদিত, যা ছিল ইসলামের সমগ্র ইতিহাসব্যাপী ব্যাপকভাবে চর্চিত একটি প্রথা। সুতরাং ইসলামিক আইনবেত্তা, ইমাম ও পণ্ডিতবর্গ এ প্রথাকে লজ্জাহীনভাবে প্রকাশ্য অনুমোদন দিয়েছে আধুনিককালেও। মুহাম্মদের সময় থেকে লুণ্ঠিত মালামালের ভাগ পাওয়ার প্রলোভন ছাড়াও যৌনদাসীরূপে ব্যবহারের জন্য নারীদেরকে বন্দি করার লোভ মুসলিম জিহাদীদেরকে পবিত্র ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপকরূপে কাজ করেছে; কেননা ইসলামি আইন অনুযায়ী হত্যাকারীরা নিহতদের স্ত্রী-সন্তান ও সম্পদের মালিক হবে। স্যার উইলিয়াম মুইর মনে করেনঃ ইসলামে যৌনদাসীর অনুমোদন থাকায় '*নারীদেরকে বন্দি করার আশা যুদ্ধের প্রলোভনরূপে কাজ করেছে, যারা বৈধ উপপত্নীরূপে গণ্য হবে 'তাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীনরূপে'।*'[১৬৬]

মুহাম্মদের নিজস্ব উপপত্নী বা যৌনদাসিত্ব চর্চার সুত্রে পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজে তা ব্যাপকভাবে চর্চিত প্রথায় পরিণত হয়, কেননা বন্দিদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। মুসলিম জনগণ কতজন যৌনদাসী রাখতে পারবে, ইসলামি আইনে তার কোনো সীমা নেই। সুতরাং লিখেছেন টমাস হিউজেস: '*একজন মুসলিম কতজন ক্রীতদাস-বালিকার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে, তার আদৌ কোনো সীমা নেই। এ সীমাহীন যৌন-লিপ্ততাকে পবিত্রকরণ করার কারণে অসভ্য জাতিগুলোর মাঝে ইসলাম ধর্ম এতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে, এবং মুসলিম সমাজে দাসপ্রথাকে এতটা জনপ্রিয় করে তুলেছে।*'[১৬৭] লুইস লিখেছেন: '*এরূপে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের নারী-ক্রীতদাসীদেরকে বিপুল সংখ্যায় যোগাড় করে উপপত্নী কিংবা শ্রমিক-দাসীরূপে ব্যবহার করার জন্য মুসলিম বিশ্বের হারেমগুলো ভরে তোলা হয়। কিন্তু এ দু'টি কাজের মধ্যে সর্বদা পরিষ্কার কোনো ভিন্নতা ছিল না। কিছু ক্রীতদাসীকে প্রমোদ-শিল্পী, যেমন গায়িকা, নৃত্যশিল্পী ও বাদ্যকর হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।*'[১৬৮] এ সত্যতা সম্পর্কে রোনাল্ড সিগল বলেন: '*বহুসংখ্যক নারী-ক্রীতদাস প্রয়োজন হতো বাদ্যকর, গায়িকা ও নাচনেওয়ালি বানানোর জন্য। গৃহস্থালির কাজের জন্য অনেক নারী-ক্রীতদাসকে ক্রয় করা হতো, অনেককে ক্রয় করা হতো উপপত্নীরূপে ব্যবহারের জন্য। শাসকদের হেরেমে অসংখ্য ক্রীতদাসী থাকতো। কর্ডোভার মুসলিম খলিফা তৃতীয় আবদ আল-রহমান (মৃত্যু ৯৬১)-এর হেরেমে ৬,০০০ উপপত্নী আর কায়রোর ফাতেমী রাজপ্রাসাদের হারেমে এর দ্বিগুণেরও বেশি উপপত্নী ছিল।*'[১৬৯] ভারতের মুসলিম শাসকরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। এমনকি বিজ্ঞ সম্রাট আকবরের হারেমেও ছিল ৫,০০০ নারী; এদিকে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের প্রত্যেকের হারেমে ছিল ৫,০০০ থেকে ৬,০০০। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুলতান মৌলে ইসমাইলের হারেমে ছিল ৪,০০০ স্ত্রী ও উপপত্নী।

---

[১৬১] Lal (1994), p. 142
[১৬২] Ibid, p. 145, 147
[১৬৩] Ibid, p. 145
[১৬৪] Ibn Ishaq, p. 511; Muir, p. 377
[১৬৫] Ibn Ishaq, p. 593
[১৬৬] Muir W (1894) *The Life of Mahomet*, London, p. 74, notes; also Quran 4:3
[১৬৭] Huges, p. 600
[১৬৮] Lewis (2000), p. 209
[১৬৯] Segal, p. 39

স্পষ্টতই আফ্রিকা থেকে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারত – সর্বত্রই মুসলিম শাসকরা হাজার হাজার যৌনদাসী যোগাড় করেছিলেন। ইসলামের সুবর্ণ যুগে রাজদরবারের কর্মকর্তা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, উচ্চপদস্থ সেনা ও প্রাদেশিক গভর্নররা ডজন-ডজন থেকে শত-শত এমনকি হাজার-হাজার ক্রীতদাস রেখেছে। মুসলিম ইতিহাসবিদদের লেখা অনুযায়ী এমনকি দরিদ্র মুসলিম গৃহস্থ বা সাধারণ দোকানদারও অনেক সংখ্যায় ক্রীতদাস রাখতো। সাধারণত যুবতী নারী-ক্রীতদাসদের সবত্রই তাদের মালিকদের চাহিদামতো যৌনক্ষুধা মেটাতে হতো। এটা প্রতীয়মান হয় যে, উপপত্নীরূপে রাখার জন্য নারীদেরকে বন্দি করা ক্রীতদাস-শিকারমূলক ইসলামি জিহাদের প্রধান আকর্ষণ বা লক্ষ্য ছিল; কেননা আফ্রিকা থেকে মুসলিম বিশ্বে বিক্রির জন্য প্রেরিত ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের বিপরীতে ছিল দু'জন নারী। অথচ নতুন বিশ্বে (আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ইউরোপীয়দের দ্বারা পাচারকৃত ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রতি একজন নারীর বিপরীতে ছিল দু'জন পুরুষ।

নারীর প্রতি মুসলিমদের কামাচ্ছন্নতা ও যৌন-লিপ্ততার বিষয়টি প্রকটভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে ভারতে বসবাসকারী নিকোলাও ম্যানুকসি'র। তিনি দেখতে পান: '*সব পুরুষ মুসলমানই নারীপ্রিয়, যাদের প্রধান বিনোদন ও প্রায় একমাত্র আনন্দ হলো নারী।*'[১৭০] সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে (১৬০৫-২৭) ভারত সফরকারী ডাচ নাগরিক ফ্রান্সিসকো পেলসায়ের্ত হেরেমে মুসলিম শাসক ও সম্ভ্রান্তদের যৌন-লিপ্ততা সম্বন্ধে লিখেছেন:

> 'প্রত্যেক রাতে আমির নির্দিষ্ট স্ত্রীর কাছে বা 'মহলে' গমন করেন; সেখানে তিনি তার স্ত্রী ও দাসীদের কাছ থেকে উষ্ণ স্বাগতম পান, যে উদ্দেশ্যে তারা সেজেছিলো। যদি গরমের দিন হয়, তারা তার শরীর চন্দনের গুড়া ও গোলাপজল দিয়ে মর্দন করে দেয়। ধীরে ধীরে পাখার বাতাস চলে। তার স্ত্রী সর্বদা পাশে বসে থাকে আর কিছু ক্রীতদাসী প্রভুর হাত-পা ঘষে, কয়েকজন পাশে বসে গান গায় বা বাজনা বাজায় ও নৃত্য করে কিংবা অন্যান্য আনন্দ-বিনোদন দেয়। অতঃপর যদি উপস্থিত কোনো সুন্দরী ক্রীতদাসীকে তার ভাল লাগে, তাকে ডেকে নিয়ে তিনি উপভোগ করেন। অসন্তোষ প্রকাশে অক্ষম বা সাহসহীন তার স্ত্রী মনের ভিতরে রাগে ফুলতে থাকে, পরে সে ঐ ক্রীতদাসীর উপর তার আক্রোশ প্রকাশ করবে।'[১৭১]

তবে স্ত্রী হেরেম থেকে কখনোই এরূপ সুন্দরী ক্রীতদাসীদেরকে বহিষ্কার করতে পারতো না, কেননা তাকে মুক্ত করার ক্ষমতা ছিল একমাত্র মালিকের (তার স্বামীর) হাতে। মরক্কোয় সুলতান মৌলে ইসমাইলের প্রাসাদের ডাচ ক্রীতদাসী মারিয়া তার মিতেলেন হেরেমে ক্রীতদাস-বালিকা ও উপপত্নীদের নিয়ে সুলতানের যৌন-প্রমোদে লিপ্ততার চাক্ষুস বিবরণ রেখে গেছেন। মারিয়া লিখেছেন: '*আমি সুলতানের কক্ষে তার সামনে ছিলাম, যেখানে তিনি অন্তত পঞ্চাশজন নারীর সাথে শয্যা গ্রহণ করেছেন... যারা মুখমণ্ডল রং করা ও দেবীর সাজে সজ্জিতা অসাধারণ সুন্দরী; তাদের প্রত্যেকের হাতে নানা বাদ্যযন্ত্র।*' মারিয়া যোগ করেন: '*তারা বাদ্য বাজালো ও গান করলো, এমন সুশ্রাব্য সুর-সঙ্গীত, যার মতো এত সুন্দর গান আমি কখনোই শুনিনি।*'[১৭২]

সংক্ষেপে: ক্রীতদাসী উপপত্নী বা যৌনদাসী প্রথা, যা মূলত সবচেয়ে অমর্যাদাকর ও অমানবিক পতিতাবৃত্তির সমতুল্য, তা আধুনিক যুগ পর্যন্তও ইসলামি রীতি ও প্রথায় বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। অটোমান সুলতানরা ১৯২১ সালে সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি পর্যন্ত সুন্দরী নারীতে পরিপূর্ণ হারেম বলবত রেখেছেন। ভারতবর্ষে মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা প্রথম বিজিত সিন্ধুর বাহাওয়ালপুর রাজ্যটি ১৯৫৪ সালে বিলুপ্ত হয়ে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে এর সর্বশেষ নবাব তার হারেমে রেখেছিলেন ৩৯০ জন নারী। নবাব বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যৌন-অক্ষম হয়ে পড়লে তার বিপুল সংখ্যক উপপত্নী ও স্ত্রীর যৌন-চাহিদা মেটাতে সব রকমের উপকরণ ব্যবহার করতেন। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যখন তার প্রাসাদ দখল করে, তারা তার সংগৃহীত প্রায় ছয়শ' 'ডিলডো' বা যৌন-উপকরণ পায়, যার কিছু ছিল মাটির তৈরি, কিছু ইংল্যান্ড থেকে আনা ব্যাটারি-চালিত। এ ঘটনা ঢাকতে সেনাবাহিনী গর্ত খুঁড়ে সেগুলোকে চাপা দেয়।[১৭৩] আজও আরব বাদশাহরা নিজ নিজ প্রাসাদে বড় আকারের হারেম রেখে চলেছেন।

খোজা ও গেলেমান

ইসলামি ক্রীতদাসত্বের আরেকটি নিষ্ঠুরতম, অমানবিক ও চরম অমর্যাদাকর বিষয় ছিল পুরুষ বন্দিদেরকে ব্যাপকহারে খোজাকরণ, যে বিষয়ে ইতিহাসবিদ ও সমালোচকদের নজর পড়েছে খুবই কম। ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম সমাজে খোজাকরণ আধুনিক যুগ পর্যন্ত সামান্যই বিরোধিতার মুখে পড়েছে। মানব শরীরের অঙ্গহানি ইসলামে নিষিদ্ধ এ যুক্তিতে মুসলিমরা সাধারণত ইহুদি কিংবা অন্য অমুসলিমদেরক দিয়ে খোজাকরণের কাজ করিয়ে নিতো (এটা একেবারেই ভণ্ডামি, কেননা নবি মোহাম্মদের আমল থেকেই মুসলিম সমাজে বিপুল সংখ্যায় নিরীহ মানুষের শিরোচ্ছেদ সাধারণ ব্যাপার হিসেবে চালু থাকে এবং কোনো কোনো অপরাধে হাত-পা কেটে ফেলা ইসলামে স্বর্গীয় দণ্ড)। অধিকন্তু খোজাদেরকে ব্যবহার করা আল্লাহ-কর্তৃক সুস্পষ্টরূপে অনুমোদিত, কেননা কোরান মুসলিম নারীদেরকে তাদের শরীর নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সম্মুখে ছাড়া অন্য সবার সামনে আলখিল্লা দ্বারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছে; সেসব ব্যক্তিরা হলো: '*তাদের স্বামী বা পিতা, তাদের স্বামীর পিতা বা তাদের পুত্র, তাদের স্বামীর পুত্র বা তাদের ভ্রাতা, বা তাদের ভাইয়ের বা ভগ্নির পুত্র, বা তাদের নারী বা দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন নারী, অথবা* ***পুরুষ চাকর যাদের কোনো চাহিদা নেই (যৌন-প্রয়োজনে নারীদের)...***' (কোরান ২৪:৩১)। একটা হাদিসেও বলা হয়েছে যে, নবি

---

[১৭০] Manucci N (1906) *Storia do Mogor*, trs. Irvine W, Hohn Murray, London, Vol. II, p. 240.

[১৭১] Lal (1994), p. 169-70

[১৭২] Milton, p. 120

[১৭৩] Naipaul VS (1998) *Beyond Belief: The Islamic Incursions among the Converted Peoples*, Random House, New York, p. 332

মোহাম্মদ নিজেও উপহার হিসেবে এক খোজা ক্রীতদাস গ্রহণ করেছিলেন, যদিও আনুশাসনিক সুন্নত তালিকা থেকে সেটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।[১৭৪.]

সাধারণত খোজাকৃত সুন্দর স্বাস্থ্যবান ক্রীতদাস-বালকদের খুব চাহিদা ছিল মুসলিম শাসক ও সম্ভ্রান্তদের মাঝে প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথম কারণ: মুসলিম হেরেম ও গৃহে থাকতো কয়েকজন থেকে হাজার হাজার স্ত্রী ও উপপত্নী, যারা স্বামী বা মালিকের সাথে যৌন-সঙ্গমের সুযোগ পেতো খুবই কম। ফলে সেসব নারীর অধিকাংশের যৌনাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যেতো। সে সাথে তাদের স্বামী বা মালিকের বহু নারীর সাথে যৌন-সংসর্গে লিপ্ততা মেনে নিতে বাধ্য হওয়ায় তাদের মাঝে থাকতো ঈর্ষা ও আক্রোশ। এরূপ অবস্থায় হেরেমে বা গৃহে পুরুষ ক্রীতদাস রাখা স্বামী বা মালিকের জন্য ছিল উদ্বেগের বিষয়, কেননা যৌন অতৃপ্ত ও ঈর্ষাপূর্ণ ওসব নারীরা পুরুষ ক্রীতদাসদের সঙ্গে সহজেই যৌবনসঙ্গমে প্রলুব্ধ হতে পারতো। অন্য পুরুষের প্রতি হেরেমের নারীদের আকর্ষণ ছিল অত্যাধিক ও সাধারণ ঘটনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তার এক প্রিয় স্ত্রীর অনুরোধে সুলতান মৌলে ইসমাইল খোজা-না-করা পেলোকে আশ্চর্যজনকভাবে কিছু সময়ের জন্য তার হেরেমের রক্ষী নিয়োগ করলে তার স্ত্রীরা পেলোর প্রতি প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করতে থাকে। কিন্তু সুলতান জানতে পারলে যে ভয়ানক পরিণাম হবে, সে ব্যাপারে সজাগ পেলো লিখেছে: '*আমি ভাবলাম আমার সকল কাজে আমাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সতর্ক থাকতে হবে।*'[১৭৫.]

সুতরাং মালিকদের – বিশেষত শাসক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যারা বড় বড় হেরেম রাখতো – তাদের জন্য পুরুষত্বধারী ক্রীতদাসের পরিবর্তে খোজাকৃত ক্রীতদাস রাখা নিরাপদ ছিল। কাজেই আশ্চর্যের কিছু নেই যে, 'হেরেম' শব্দটি এসেছে 'হারাম' থেকে, যার অর্থ 'নিষিদ্ধ', আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে 'নাগাল-বহির্ভূত' (পর-পুরুষদের)।

কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে সাধারণভাবে খোজা করা হতো '*এ ধারণার ভিত্তিতে যে কৃষ্ণাঙ্গদের যৌনক্ষুধা ছিল অত্যাধিক ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য*', জানান জন লাফিন।[১৭৬.] ভারত থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত সর্বত্রই খোজাদেরকে বিশেষত নিয়োজিত করা হতো হেরেমের পাহারায়। তারা অন্তঃপুরে নারী ও পুরুষদের চলাচলের উপর নজর রাখতো এবং হেরেমের নারীদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে, বিশেষত মালিকের প্রতি (যৌন-বিষয়ে) বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে, গুপ্তচরবৃত্তি করতো। বিশাল বিশাল হেরেম, যা সম্ভবত ছিল মধ্যযুগীয় ইসলামি সাম্রাজ্যে সর্ববৃহৎ রাজকীয় বিভাগ, তা দেখাশোনার জন্য হাজার হাজার খোজাকৃত লোকের প্রয়োজন হতো।

দ্বিতীয় কারণ: পরিবার বা সন্তান-সন্ততির প্রত্যাশাহীন এসব খোজা মানুষগুলো অসহায় বৃদ্ধবয়সে দেখাশোনার জন্য একটুখানি আনুকুল্য লাভের আশায় মালিকের প্রতি পরম বিশ্বস্ততা ও উৎসর্গ প্রদর্শন করতো। পরন্তু যৌন-তাড়নাবিহীন খোজাকৃত ক্রীতদাসরা সাধারণত যৌন-উন্মাদনাযুক্ত ইসলামি সংস্কৃতিতে সহজেই একাগ্রভাবে কাজে মনোযোগ দিতে পারতো।

খোজা ক্রীতদাসদের অত্যাধিক চাহিদার তৃতীয় কারণটি ছিল শাসক, সেনাধ্যক্ষ ও সম্ভ্রান্তদের সমকামীতার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা। ইন্দ্রিয়গত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য রাখা খোজাদেরকে বলা হতো 'গেলেমান' (বা 'গিলমান'), যারা সাধারণত ছিল সুদর্শন বালক। তারা '*উৎকৃষ্ট ও আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিত থাকতো এবং নারীদের মতো করে তাদের দেহকে সুন্দর করে রাখতো ও সুগন্ধী মাখতো।*' গেলেমানের ধারণা পাওয়া যায় কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতে, যাতে বেহেস্তে পুরুষ-সঙ্গদানকারী বা গেলেমান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

- 'যেমন করে মুক্তা সুরক্ষিত, তেমনি সর্বদা তাদের (বেহেস্তবাসীদের) পাশে থাকবে উৎসর্গীকৃত পুরুষ যুবা-চাকর (সুদর্শন)।' (কোরান ৫২:২)
- 'সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে অমর যুবারা গামলা ও জগ সহ, এবং স্বর্গীয় ঝর্ণার সুধাপূর্ণ পেয়ালা হাতে।' (কোরান ৫৬:১৭-১৮)

আনোয়ার শেখ তার নিবন্ধ '*ইসলামিক মোরালিটি*'তে গেলেমানের বর্ণনা প্রদান করেছেন এভাবে: '*স্বর্গের বর্ণনা বিলাসপূর্ণ জীবন, যেখানে বাস করে 'হুরী' ও 'গিলমান'। হুরী হলো প্রশস্ত বাঁকা-চোখ ও স্ফীতস্তন বিশিষ্ট অনিন্দ্য-সুন্দরী চিরকুমারী তরুণী। আর গেলেমান হলো মুক্তার মতো সুন্দর, বুটিদার সবুজ সিল্কের পোশাক পরিহিত ও রূপার হার দ্বারা অলঙ্কৃত চিরতরুণ অমর বালক।*'[১৭৭.]

গেলেমান চর্চা আজো কট্টর ইসলামি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের অংশবিশেষে ব্যাপক চর্চিত হচ্ছে। মুসলিম সমাজে গেলেমান চর্চার ধারণাটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত নবি মুহাম্মদের সময়ে আরব সমাজে চলমান ব্যাপক সমকামিতার চর্চা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। পারস্যেও সমকামিতার প্রচলন ছিল। হিট্টি জানান:

'*আমরা আল-রশিদের শাসনামলে গেলেমানের কথা শুনি, কিন্তু এটা স্পষ্টতই খলিফা আল-আমিনের শাসনামল, যিনি পারস্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণে যৌন সম্পর্কে আরব-বিশ্বে গেলেমান প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেন। তার এক বিচারক সম্পর্কিত দলিল জানায় তিনি এরূপ চারশ' তরুণকে ব্যবহার করতেন। কবিরাও তাদের এরূপ বিকৃত যৌনাবেগ প্রকাশ্যে প্রদর্শন এবং তাদের লেখায় দাড়িহীন তরুণ বালকদের প্রতি প্রণয়গাঁথা রচনা করতেও কুণ্ঠিত হননি।*'[১৭৮.]

---

১৭৪. Pellar Ch, Lambton AKS and Orhonlu C (1978) *Khasi, In The Encyclopaedia of Islam*, E J Brill ed., Leiden Vol. IV, p. 1089
১৭৫. Milton, p. 126
১৭৬. Segal, p. 52
১৭৭. Shaikh A, *Islamic Morality*, http://iranpoliticsclub.net/islam/islamic-morality/index.htm
১৭৮. Hitti PK (1948) *The Arabs: A Short History*, Macmillan, London, p. 99

কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকেই খোজা করা হয়নি, বরং তা প্রয়োগ করা হয়েছে সকল জাতি বা বর্ণের উপর, হোক সে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ, ভারতের বাদামি বা পিঙ্গল, মধ্য-এশিয়ার হরিদ্রাভ অথবা ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ। সিগল উল্লেখ করেছেন, মধ্যযুগে প্রাগ ও ভার্দুন শ্বেতাঙ্গদের খোজাকরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। অপরদিকে কাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্তী খারাজন পরিণত হয় মধ্য-এশীয়দের খোজাকরণ কেন্দ্রে। শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসদের আরেকটি খোজাকরণ কেন্দ্র ছিল ইসলামি শাসনাধীন স্পেন। দশম শতাব্দীর শুরুতে খলিফা আল-মুক্তাদির (৯০৮-৯৩৭) তার বাগদাদ রাজপ্রাসাদে প্রায় ১১,০০০ খোজার সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল ৭,০০০ কৃষ্ণাঙ্গ ও ৪,০০০ শ্বেতাঙ্গ (গ্রিক)।[১৭৯]

ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যে, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে বাংলায় ক্রীতদাসদেরকে ব্যাপকহারে খোজা করা হতো, যা গোটা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। মনে হয় যে, ১২০৫ সালে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বিজয়ের পর থেকেই বাংলা হয়ে উঠে খোজা সরবরাহের জন্য ক্রীতদাসকরণের এক প্রধান উৎস। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুবলাই খানের দরবার থেকে ভেনিসে ফেরার পথে মার্কোপোলা ভারত সফর করেন। এসময় তিনি বাংলাকে খোজা সরবরাহের একটা বড় উৎসরূপে দেখতে পান। সুলতানাত যুগের শেষ দিকে (১২০৬-১৫২৬) দুয়ার্ত বার্বোসা ও মুঘল যুগে (১৫২৬-১৮৫৭) ফ্রাঁসোয়া পিরার্দ ও বাংলাকে খোজাকৃত ক্রীতদাস সরবরাহের অন্যতম কেন্দ্ররূপে দেখতে পান। *আইন-ই-আকবরী* (সংকলন ১৫৯০-এর দশকে) গ্রন্থও এর সত্যতা প্রতিপন্ন করে।[১৮০] আওরঙ্গজেবের সময়ে ১৬৫৯ সালেই গোলকুণ্ডাতে প্রায় ২২,০০০ বালককে পুরুষত্বহীন করা হয়। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তার উচ্চ-কর্মকর্তা সাইদ খান চাকতাই ১,২০০ খোজার মালিক ছিলেন; এমনকি দয়াবান আকবরও বিপুল সংখ্যক খোজা নিয়োগ করেছিলেন। আকবরের হেরেমে, লিখেছে *আইন-ই-আকবরী*: '*৫,০০০ মহিলা ছিল, যাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কক্ষ ছিল... তাদেরকে পর্যায়ক্রমে নারীরক্ষী, খোজারক্ষী, রাজপুত ও দারোয়ান পাহারা দিতো।*'[১৮১]

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তার ব্যক্তিগত কাজের জন্য ৫০,০০০ তরুণ বালককে নিয়োজিত করেছিলেন; আর মোহাম্মদ তুঘলকের ছিল ২০,০০০ এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের ছিল ৪০,০০০ এরূপ বালক। সব বা অধিকাংশ সেসব বালকই ছিল খোজাকৃত। আলাউদ্দিনের বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুরও ছিলেন খোজা। সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক খিলজির একান্ত প্রিয় সেনাপতি খসরু খান, যিনি ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানকে হত্যা করে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সিংহাসন দখল করেছিলেন, তিনিও ছিলেন খোজা। মধ্যযুগের ইতিহাসবেত্তাগণ, যেমন মুহাম্মদ ফেরিশতা, খোন্দামির, মিনহাজ সিরাজ ও জিয়াউদ্দিন বারানী প্রমুখরা অন্যান্য বিশিষ্ট সুলতান যেমন মাহমুদ গজনী, কুতুবুদ্দিন আইবেক ও সিকান্দর লোদীদের সুদর্শন তরুণ বালকদের প্রতি কামাচ্ছন্নতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সিকান্দর লোদী একদা গর্ব করে বলেছিলেন: '*আমি আমার কোনো ক্রীতদাসকে পালকিতে*[১৮২] *চড়ে বসিয়েআদেশ করলে আমার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাকে কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যাবে।*'[১৮৩] সুলতান মাহমুদ তার প্রিয় সুদর্শন সেনাপতি হিন্দু তিলকের প্রতি মোহাচ্ছন্ন ছিলেন।[১৮৪]

মুসলিম বিশ্বে খোজাদের চাহিদা পূরণের জন্য নজিরবিহীনভাবে পুরুষ বন্দিদেরকে খোজা করা হতো। মুসলিমরাই সর্বপ্রথম এমন ব্যাপকহারে পুরুষ বন্দিকে পুরুষত্বহীন বা খোজা করার প্রক্রিয়া শুরু করে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ পুরুষ বন্দি, বিশেষত যারা আফ্রিকায় ধৃত হয়েছিল, তাদেরকে খোজা করা হয়েছিল। ৩৫০ বছরের 'ট্রান্স-আটলান্টিক শ্লেইভ ট্রেড'-এ নতুন বিশ্বে (ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমরিকা) এক কোটি ১০ লাখ আফ্রিকান ক্রীতদাস পাচার করা হয়েছিল; পক্ষান্তরে তেরশ' বছরের ইসলামের কর্তৃত্বকালে তার চেয়েও বেশী সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গকে ক্রীতদাসের শিকল পড়িয়ে পাঠানো হয়েছিল মুসলিম বিশ্বের মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, ভারত, ইসলামি স্পেন ও অটোম্যান ইউরোপে। স্পষ্টত মুসলিম বিশ্বে প্রেরিত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের সব বা অতি উচ্চ অংশকে খোজা করা হয়েছিল, যার কারণে এসব অঞ্চলে তারা উল্লেখযোগ্য বংশধর ('ডায়াসপোরা') রেখে যেতে ব্যর্থ হয়।

ইসলামি ক্রীতদাসত্বের নিদারুণ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়া ইউরোপীয়, ভারতীয়, মধ্য-এশীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ বিধর্মীর ভাগ্যও অনেকটা একইরকম ছিল। ১২৮০-র দশকে মার্কোপোলো ও ১৫০০-র দশকে দুয়ার্ত বার্বোসা স্বচক্ষে ভারতে বিপুল সংখ্যায় খোজাকরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। একই প্রক্রিয়া চলে সম্রাট আকবর (মৃত্যু ১৬০৫), জাহাঙ্গীর (মৃত্যু ১৬২৮) ও আওরঙ্গজেবের (মৃত্যু ১৭০৭) শাসনামলে। সুতরাং ভারতে গোটা মুসলিম শাসনামলে খোজাকরণ ছিল একটা প্রচলিত নিয়ম। সম্ভবত এটা ইতিপূর্বে উল্লেখিত ভারতের জনসংখ্যা ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ২০ কোটি থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ কোটিতেহ্রাসকরণে একটা বড় অবদান রেখেছিল।

ইসলামি দাস-ব্যবসা

ইসলামের আবির্ভাবে দাসপ্রথা এক নজিরবিহীন মাত্রায় উন্নীত হয়। সমগ্র ইসলামি বিশ্বে ক্রীতদাসরা একটা স্বাভাবিক পণ্যে পরিণত হয় এবং দাস-ব্যবসা পরিণত হয় সাধারণ ব্যবসায়িক উদ্যোগে। আগেই বলা হয়েছে, শরীয়া আইন ক্রীতদাসকে সাধারণ সম্পদ অথবা পণ্যের শ্রেণীতে স্থান দিয়ে তাদের শারীরিক যোগ্যতা অনুযায়ী দাম নির্ধারণের নিয়ম চালু করেছে। এছাড়া দাম নির্ধারণে যৌন আকর্ষণ ও অন্যান্য বিষয়কে

---

[১৭৯] Segal, p. 40-41; Hitti (2002), p. 276

[১৮০] Moreland, p. 93, note 1

[১৮১] Ibid, p. 87-88

[১৮২] Palanquins were used for carrying the women, especially the newly-married brides, in medieval India.

[১৮৩] Lal (1994), p. 106-09

[১৮৪] Elliot & Dawson, Vol. II, p. 127-29

বেশি গুরুত্ব দিওয়া হয়েছে। 'ফতোয়া-ই-আলমগীরি' নারী-ক্রীতদাস ক্রয়ের বিধান নির্দিষ্ট করেছে অতিবৃহৎ স্তন, অতি প্রশস্ত যোনি অথবা অক্ষত কুমারী কিনা সে ভিত্তিতে। উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে, এসব বিধান নবির হাদিস ও তাঁর সম্মানিত অনুসারীদের দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত।

ইসলামি দাস-ব্যবসার উৎপত্তি: ইসলামি ক্রীতদাস ব্যবসা শুরু হয় অস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয়ের নিমিত্তে নবি-কর্তৃক ক্রীতদাস হিসেবে ধৃত বানু কোরাইজার কিছু নারীকে নাজদ-এ বিক্রি করে দেওয়ার মাধ্যমে। একান্তভাবে আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত নবি মুহাম্মদ ও তার সদ্য গড়ে উঠা মদীনার মুসলিম সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে বাণিজ্য-কাফেলা ও বিধর্মী সম্প্রদায়ের উপর হানা দিয়ে ডাকাতি ও লুটতরাজে, যা পরিণামে তাদের জীবনধারণের প্রধান উপায়ে পরিণত হয়। এসব অভিযানে তারা পুনঃপুনঃ ক্রীতদাস ধরতে থাকে, বিশেষত নারী ও শিশুদেরকে। সে সময় আরবে দাস-ব্যবসা তেমন বিস্তৃত ছিল না। সদ্য উদীয়মান মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বন্দিকৃত ক্রীতদাসদেরকে খোলাবাজারে বিক্রি করাও নিরাপদ ছিল না। এ পরিস্থিতিতে নবি ক্রীতদাস বিক্রয়ের বিকল্পস্বরূপ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যে বন্দিদের বিনিময়ে তাদের পরিবারের নিকট থেকে মুক্তিপণ দাবি করেন। নাখলার হামলা, বদরের যুদ্ধ ও অন্যান্য অভিযানের বন্দিদের ক্ষেত্রে এরূপে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে নবি অর্থভাণ্ডার স্ফীত করেন। মুহাম্মদ হাওয়াজিন গোত্রের প্রতিজন বন্দি নারীর মুক্তিপণরূপে ছয়টি করে উট আদায় করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে খলিফা ওমর ঘোষণা করেন যে, মুসলিম-মালিকানাধীন ক্রীতদাস অমুসলিমরা ক্রয় করতে পারবে না। এর অর্থ হলো: এরপর বন্দিকৃত কাউকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে নেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়, পাছে তারা অমুসলিমদের হাতে পড়ে। এরপর থেকে তাদেরকে শুধু মুসলিমরাই কিনতে পারতো, যা নিশ্চিত করে যে, বন্দিরা কেবলমাত্র ইসলামের সীমার মধ্যেই থাকবে। এর ফলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

বিক্রির জন্য ক্রীতদাস আটক: উত্তর আফ্রিকায় ধৃত ৩০০,০০০ ক্রীতদাসের মধ্য থেকে মুসা খলিফার অংশের ৬০,০০০-কে বিক্রি করে দেন। অবশিষ্টদের ৩০,০০০-কে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়; বাকিদেরকে তিনি তার যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন, যারা তাদের অংশের কিছু সংখ্যককে বিক্রি করে দিতে পারে। ইবনে খালদুন (মৃত্যু ১৪০৬) তার নিজ চোখে দেখা মিশরীয় দাস-ব্যবসার বিবরণে লিখেন: '*দাস-ব্যবসায়ীরা তাদেরকে দলবদ্ধভাবে মিশরে আনে এবং সরকারি ক্রেতারা তাদেরকে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য সারিবদ্ধভাবে প্রদর্শণের পর দাম হাঁকায় প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি।*'[১৮৫] সিন্ধুতে কাসিমের তিন বছরব্যাপী অভিযানে আনুমানিক ৩০০,০০০ ভারতীয়কে ক্রীতদাস করা হয়েছিল, যার এক-পঞ্চমাংশকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দামেস্কে খলিফার নিকট। খলিফা সম্ভ্রান্ত ও রাজকীয় পরিবারের সুন্দরী যুবতীদেরকে তার হেরেমের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিছু সংখ্যককে দরবারের সম্ভ্রান্তদেরকে উপহার দেন; অনেককে তার রাজদরবারের নানা কাজে নিয়োগ করেন, এবং বাকি অংশকে অর্থভাণ্ডার বৃদ্ধিকরণের জন্য বিক্রি করে দেন।

খলিফা আল-মুতাসিম (মৃত্যু ৮৪২) ছিলেন ইসলামের 'সুবর্ণ যুগ' আনয়নের এক আলোকায়নকৃত অগ্র-পুরুষ। তিনি ৮৩৮ সালে আমোরিয়াম দখলের পর ৫ ও ১০ জনের দল করে ক্রীতদাস বিক্রি করেন। সুলতান মাহমুদ ভারতে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস ধরে গজনীতে পাঠাতেন বিক্রির জন্য। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি উয়াইহিন্দ থেকে ১০০২ সালে ৫০০,০০০; ১০১৫ সালে থানেসার থেকে ২০০,০০০; এবং ১০১৯ সালের অভিযান থেকে ৫৩,০০০ ক্রীতদাসকে ধরে নিয়ে যান। অধ্যাপক লালের হিসাব মতে, ভারতে তার অভিযানের মাধ্যমে হ্রাসকৃত ২০ লাখ লোকের একটা বড় অংশকে বন্দিরূপে নিয়ে যাওয়া হয়; অবশিষ্টদেরকে হত্যা করা হয়। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোহাম্মদ গোরী ক্রীতদাসকরণের মাধ্যমে ৩০০,০০০ থেকে ৪০০,০০০ খোখারকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। সুলতান মাহমুদ ও মোহাম্মদ গোরী উভয়েই বন্দিদেরকে গজনীতে নিয়ে যেতেন বিক্রি করার জন্য। আল-উতবি লিখেছেন: সুলতান মাহমুদের সময় গজনী দাস কেনা-বেচার এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়, যেখানে '*ক্রীতদাস ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন নগরী থেকে ব্যবসায়ীরা আসে, যার ফলে মাওয়ারুন্নাহর, ইরাক ও খোরাসান ক্রীতদাসে ভরে উঠেছিল।*'[১৮৬] ক্রীতদাস বিক্রির প্রথম ধাপের অর্থ চলে যেত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। এরপর দাস-ব্যবসায়ীরা মুসলিম বিশ্বের দাসবাজারগুলোতে সেসব ক্রীতদাসের বেচা-কেনা অব্যাহত রাখে।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে সরাসরি মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর ভারতের বিশাল পটভূমিতে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সুযোগ ও ক্ষমতা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। ফলে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ক্রীতদাসকরণের মাত্রা ও শিকারকৃত দাসের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায় সম্রাট আকবর-কর্তৃক যুদ্ধে ক্রীতদাসকরণ নিষিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত, যদিও আকবরের সে নিষেধাজ্ঞা কার্যকরকরণ তেমন সফল ছিল না। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর ক্রীতদাসকরণ ধীরে ধীরে পুনর্জাগরিত হয় এবং ধর্মান্ধ ও গোঁড়া সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছে। ১৭৫৭ সালে থেকে ব্রিটিশ শাসনক্ষমতা সংহত হওয়ার সাথে সাথে ক্রীতদাসকরণ ও দাসপ্রথা দ্রুত ভারত থেকে অপসৃত হয়।

দিল্লিতে সুলতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ক্রীতদাসদেরকে বিদেশের বাজারে প্রেরণের পরিবর্তে প্রধানত ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারেই সরবরাহ করা হতো। ফলে অবশ্যই মুসলিম-অধিকৃত ভারতীয় অংশের সর্বত্র ক্রীতদাস কেনা-বেচার বাজার ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে। আমির খসরু সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে (১২৯৬-১৩১৬) লিখেছে: '*তুর্কিরা যখন খুশি কোনো হিন্দুকে আটক, ক্রয় বা বিক্রি করতে পারতো।*' এ ক্রীতদাস কেনা-বেচা অবশ্যই দাস-বাজারে সম্পন্ন হতো। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলতান আলাউদ্দিনের সময়ে দিল্লির ক্রীতদাস বাজারগুলোতে অবিরাম নতুন নতুন বন্দির দল এসে পৌঁছুতো। সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের সময়ে (মৃত্যু ১৩৫১) ইবনে বতুতা দিলির দাস-বাজারে ব্যাপক ক্রীতদাস সরবরাহের কারণে ক্রীতদাসদের মূল্য সস্তা হয়ে গিয়েছে দেখতে পান। শিহাবুদ্দিন আহমদ আব্বাস

[১৮৫] Lal (1994), p. 124

[১৮৬] Ibid, p. 121

লিখেছেন: '*মোহাম্মদ তুঘলকের শাসনকালে হাজার হাজার ক্রীতদাস নিম্নদরে বিক্রি হতো।*'[১৮৭] মানরিকে ও বার্নিয়ার সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬২৮-১৭০৭) প্রত্যক্ষ করেন যে, কর-আদায়কারীরা কর-পরিশোধে-ব্যর্থ দুস্থ কৃষকদেরকে তাদের নারী-সন্ত ানসহ ধরে নিয়ে যাচ্ছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করার জন্য।

ক্রীতদাসের মূল্য: ক্রীতদাসদেরকে কত দামে বিক্রি করা হতো, তা অধিকাংশ দৃষ্টান্তে উল্লেখ করা হয়নি। ভারতীয় ক্রীতদাসদের দাম সম্পর্কে অধ্যাপক লাল কিছু তথ্য সংক্ষেপিত করেছেন।[১৮৮] তার তথ্যমতে: '*সুলতান মাহমুদ রাজা জয়পালের মুক্তিপণ হিসেবে ২০০,০০০ সোনার দিনার এবং ২৫০টি হাতি আদায় করেন এবং সে সঙ্গে জয়পালের গলার হারটিও খুলে নেন, যার মূল্য ছিল ২০০,০০০ স্বর্ণ দিনার।*' আল-উতবি জানান: ১০১৯ সালে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারত থেকে আনা ৫৩,০০০ ক্রীতদাসের এক-একজনকে মাত্র দুই থেকে দশ দিরহামে বিক্রি করা হয়। হাসান নিজামী লিখেছেন: '*হিন্দুদের উপর মোহাম্মদ গোরী ও কুতুবুদ্দিন আইবেকের সল্ট রেঞ্জ অঞ্চলে যৌথ আক্রমণে এত বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস ধৃত হয় যে, এক দিনার দামে পাঁচজন হিন্দু বন্দিকে ক্রয় করা হয়।*'

ভারতে দাস-ব্যবসা এমন বিশিষ্ট একটি ব্যবসায়িক পেশায় পরিণত হয় যে, কোনো কোনো শাসক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে দাস-বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলে ভারতীয় বাজার ক্রীতদাসে ভরপুর ছিল। তিনি উপপত্নী করার উপযুক্ত সুন্দরী বালিকার মূল্য নির্ধারণ করেন ২০ থেকে ৩০, এমনকি ৪০ তাঙ্খা (১০ তাঙ্খা = ১ স্বর্ণ মুদ্রা)। আর পুরুষ ক্রীতদাসদের মূল্য ধরা হয় ১০০ থেকে ২০০ তাঙ্খা। সুদর্শন বালকরা বিক্রি হতো ২০ থেকে ৪০ তাঙ্খায়। আর যাদের চাহিদা কম ছিলো, তারা বিক্রি হতো ৭ থেকে ৮ তাঙ্খায়। শিশু ক্রীতদাসদের মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ৭০ থেকে ৮০ তাঙ্খায়।[১৮৯] পাইকারি মূল্য নির্ধারণের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তবে যখন বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস ধরা পড়তো, তখন চাহিদা ও সরবরাহের সর্বজনীন নিয়মই কাজ করতো এবং ইচ্ছা করলেও নির্দিষ্ট উচ্চমূল্য ধরে রাখা সম্ভব হতো না। যখন সরবরাহ কম হতো, তখন দাম স্বভাবতই বেড়ে যেতো। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দাস-দাসী, যেমন রাজকীয় বা সম্ভ্রান্ত বংশজাত, তরুণ বয়স, অসাধারণ সুন্দর কিংবা অতি উচ্চ সামরিক সামর্থ্যপূর্ণ বন্দিরা ১,০০০ থেকে ২,০০০ তাঙ্খা পর্যন্ত উচ্চমূল্যে বিক্রি হতো। জানা যায়: কবি বদর শাহ 'গুল চেহরা' (গোলাপমুখী) নামের এক ক্রীতদাসীকে ৯০০ তাঙ্খায় কিনেছিলেন। অপরদিকে বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুরকে বলা হতো 'হাজার দিনারী', কারণ তাকে 'এক হাজার' দিনার মূল্যে কেনা হয়েছিল।

সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর পরবর্তী সুলতানগণও ক্রীতদাসদের বাজার-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে চলেন। সুলতান মোহাম্মদ শাহ তুঘলকের শাসনকালে (১৩২৫-৫১) ক্রীতদাস ধরার পরিমাণ ছিল প্রচুর এবং তাদের দাম এতই সস্তা হয়ে যায় যে, '*দিল্লির বাজারে গৃহকর্মের জন্য নিয়োজিত তরুণী ক্রীতদাসী বালিকার মূল্য ৮ তাঙ্খার বেশি হতো না। গৃহকর্ম ও উপপত্নী উভয় কাজের উপযুক্ত ক্রীতদাসীরা প্রায় ১৫ তাঙ্খায় বিক্রি হতো।*' ইবনে বতুতা বাংলায় এক স্বর্ণমুদ্রা (দশ তাঙ্খা) দামে এক সুন্দরী ক্রীতদাসী ক্রয় করেছিলেন; আর তার সহচর এক ক্রীতদাসীকে কিনেছিল দুই স্বর্ণমুদ্রায়।

মুসলিম সুলতানরা তাদের ভ্রষ্ট জীবনের যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করতে হাজার হাজার উপপত্নীর সমাবেশ ঘটিয়ে বিশাল বিশাল হেরেম রাখা ছাড়াও বহু 'গিলমান' রাখতেন। বারানী লিখেছেন: '*এর ফলে সুন্দরী বালিকা ও দাড়িহীন বালক দুর্লভ পণ্যে পরিণত হয় এবং তাদের মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০ তাঙ্কায়, কখনো কখনো এক হাজার থেকে দুই হাজার তাঙ্খায়*। আল-ওমারী সাক্ষ্য দেন: '*ক্রীতদাসদের কম মূল্য সত্ত্বেও, সুন্দরী ভারতীয় যুবতীরা ২,০০০ তাঙ্খা, এমনকি তারও বেশি দামে বিক্রি হতো।*' এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলা হয়: '*এসব তরুণী বালিকা সৌন্দর্যে ও ব্যবহারে ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।*'

মেধাবী ও বিলাসিতার বস্তুরূপে বিবেচিত বিদেশ থেকে আনা ক্রীতদাসদের উচ্চ চাহিদা ছিল ভারতে এবং তাদেরকে আনা হতে থাকে ভারতের বাজারে। তাদের দামও ছিল খুব বেশী। নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের বিদেশী ক্রীতদাসদেরকে উচ্চ-দামে কেনা হতো বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগের জন্য, যেমন সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে, উপপত্নী হিসেবে কিংবা হেরেমের নারীদের উপর নজর রাখার কাজে ইত্যাদি। আওরঙ্গজেব হেরেমের রক্ষী হিসেবে তাতার ও উজ্বেক ক্রীতদাসী কিনতেন তাদের যুদ্ধবাজ স্বভাব ও দক্ষতার কারণে, আর পূর্ব-ইউরোপীয় এক নারী ছিল তার যৌনদাসী। সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক মার্জিত রুচিসম্পন্ন দুই সাহসী তুর্কি ক্রীতদাসকে ১০০,০০০ জিতল (২,০০০ তাঙ্খা) দামে, আর সুলতান ইলতুতমিস জনৈক কমরুদ্দিন তিমুর খানকে ৫০,০০০ জিতল দিয়ে কিনেছিলেন।[১৯০]

মরক্কোতে সুলতান মৌলে ইসমাইল ১৭১৫ সালে টমাস পেলো ও তার সঙ্গীদেরকে বন্দিকারী মুসলিম জলদস্যুদের কাছ থেকে মাথা-প্রতি ১৫ পাউন্ড দামে কিনেছিলেন। তবে খোলাবাজারে সাধারণ শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসরা বিক্রি হতো ৩০ থেকে ৩৫ পাউন্ড দামে, আর কিশোর বালক জনপ্রতি ৪০ পাউন্ডে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও দুর্বল শরীরের দাসরা বিক্রি হতো কম দামে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহুদি ব্যবসায়ীরা বন্দিদের মূল্য ১৫ থেকে ৭৫ পাউন্ডে উঠিয়ে দিতো।[১৯১] এর প্রায় ৭০ বছর আগে ব্রিটিশ সরকার যখন ইংরেজ বন্দিদেরকে ক্রয় করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ী এডমুন্ড কেইসনকে আলজিয়ার্সে পাঠায়, সুলতানের প্রাসাদে আটককৃত প্রতি পুরুষ ক্রীতদাসের জন্য তাকে ৩৮ পাউন্ড

---

[১৮৭] Ibid, p. 51

[১৮৮] Ibid, p. 120-27

[১৮৯] Child-slaves brought such high prices, because they could serve the master for their whole life and that they could be handled easily and moulded into whatever the master wanted, particularly to groom them to be ruthless soldiers for waging Jihad against the infidels (like Janissaries).

[১৯০] Lal (1994), p. 130-35

[১৯১] Miton, p. 69-70, 77

দিতে হয়।[১৯২] কিন্তু নারীবন্দিদেরকে মুক্ত করতে খুবই চড়া মূল্য দিতে হয় তাকে: সারাহ রিপ্লির জন্য ৮০০ পাউন্ড, এ্যালিস হোইসের জন্য ১,১০০ পাউন্ড ও মেরী ব্রাস্টারের জন্য ১৩৯২ পাউন্ড।[১৯৩] সর্বদা প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ থাকা কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের মূল্য স্বাভাবিকভাবেই কম ছিল। ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে গাম্বিয়ার উপকূলে ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায়ীরা তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে কিনতো জনপ্রতি ৩.৪ পাউন্ড দামে; অন্যদিকে দেশের ভেতরের দাস-ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিজনকে এক থেকে তিন পাউন্ড দরে কিনে আনতো, যা নির্ভর করতো উপকূল থেকে দূরত্বের উপর।[১৯৪]

আন্তর্জাতিক ইসলামি দাস-ব্যবসা: সমগ্র ইসলামি বিশ্বে দাস-ব্যবসা ছিল একটা বিশিষ্ট ব্যবসা-উদ্যোগ। ভারত, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য (বাগদাদ ও দামাস্কাস) ছাড়াও মধ্য-এশিয়ার খোরাসান, গজনী ও সমরখন্দ ছিল দাস-ব্যবসার বিশিষ্ট কেন্দ্র। সম্রাট বাবর (মৃত্যু ১৫৩০) কাবুল ও কান্দাহারে দু'টি বিশিষ্ট দাস-বাণিজ্যকেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ভারত থেকে বাণিজ্যবহর আসতো দাসসহ। একইভাবে খোরাসান, রুম (ইস্তাম্বুল), ইরাক ও চীন থেকে বাণিজ্য-কাফেলা আসতো কাবুলে।

ভারতের মুসলিম শাসকদের কাছে ইসলামি তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য ও ট্রানসক্সিয়ানা থেকে ব্যবসায়ীরা আসতো সেসব দেশ থেকে ক্রীতদাস সরবরাহ করার প্রস্তাব নিয়ে। ভারতীয় মুসলিম শাসকরাও দেশের বাইরে ব্যবসায়ীদেরকে পাঠাতেন বিদেশী ক্রীতদাস ক্রয়ের জন্য, যা ছিল অতি আকাঙ্ক্ষিত পণ্য। সুলতান ইলতুতমিস একবার বিদেশী ক্রীতদাস ক্রয়ের জন্য সমরখন্দ, বুখারা ও তিরমিযে ব্যবসায়ীদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। তারা সুলতানের জন্য ১০০ জন ক্রীতদাস ক্রয় করে এনেছিল, যার মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বলবন, যিনি ১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা দখল করে সুলতান হন। ভারতে উজ্‌বেকিস্তান ও তাতারিস্তান থেকেও ক্রীতদাস আসতো। স্থানীয় বা স্বদেশী লোকদের দ্বারা বিদ্রোহমূলক উত্থান এড়াতে ভারতের মুসলিম শাসকরা সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত করার জন্য বহু সংখ্যায় বিদেশী ক্রীতদাস ক্রয় করতেন। এমনকি সম্রাট আকবর যদিও তার রাজসভায় সর্বপ্রথম হিন্দুদেরকে নিয়োগের পথ খুলে দেন, তথাপি তার দরবারেও বিদেশীরা ছিল প্রধান জনশক্তি। আকবর কর্তৃক রাজকার্যে নিয়োগকৃতদের ৭০ শতাংশই বিদেশী বংশোদ্ভূত ছিল বলে জানান তার মন্ত্রী আবুল ফজল। অবশিষ্ট ৩০ শতাংশের অর্ধেকেরও বেশি ছিল মুসলিম, বাকিরা হিন্দু।[১৯৫]

মুসলিম বিশ্বে দাস-ব্যবসার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বার্নার্ড লুইস লিখেছেন:[১৯৬]

> ইসলামি বিশ্বের ক্রীতদাসদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা হতো। প্রাথমিক যুগে ক্রীতদাসরা এসেছে প্রধানত নতুন নতুন বিজিত দেশ থেকে – যেমন ফারটাইল ক্রিসেন্ট (পশ্চিম-এশীয় মেসোপোটেমিয়া ও লেভান্ট অঞ্চল) ও মিশর থেকে, ইরান ও উত্তর আফ্রিকা থেকে, মধ্য এশিয়া, ভারত ও স্পেন থেকে... দেশজয় ও সে সাথে বন্দিকৃত ক্রীতদাস সরবরাহ যখন হ্রাস পায়, তখন ক্রীতদাস বাজারের চাহিদা মেটাতে বেশি বেশি করে তাদেরকে আমদানি করা হয় সীমান্তের বাইরে থেকে। ভারত, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকেও কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস আনা হতো, যারা ছিল প্রধানত বিশেষজ্ঞ ও কারিগর, কোনো না কোনো শিল্পকলা বা কার্যে। অদক্ষ ক্রীতদাসদের অধিকাংশই আসতো ইসলামি বিশ্বের ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ থেকে, – শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসরা ইউরোপ ও ইউরেশিয়ার স্টেপ (সমভূমি) অঞ্চল থেকে, আর কৃষ্ণাঙ্গরা আসতো সাহারার দক্ষিণস্থ আফ্রিকার অঞ্চল থেকে।
>
> ইসলামি বিশ্বে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে আনা হতো কয়েকটি পথে। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে সাহারা মরুভূমি পার হয়ে মরক্কো ও তিউনিশিয়াতে, চাদ থেকে মরুভূমি পার হয়ে লিবিয়ায়, পূর্ব-আফ্রিকা থেকে নীল নদের ভাটিতে মিশরে এবং লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর পার হয়ে আরব ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে। সমভূমি অঞ্চল থেকে তুর্কি ক্রীতদাসদের বাজারজাত করা হতো সমরখন্দ ও অন্যান্য মুসলিম মধ্য-এশীয় নগরীগুলোতে, এবং সেখান থেকে তাদেরকে পাচার করা হতো ইরান, ফারটাইল ক্রিসেন্ট এবং তার ওপারে। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠা ককেশীয়দেরকে আনা হতো কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে এবং বাজারজাত করা হতো প্রধানত আলেপ্পো ও মসুলে।

সিগল জানান: মুসলিম দাস-ব্যবসায়ীরা ছয়টি প্রধান পথ ধরে লোহিত সাগরের উপকূল থেকে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করে মধ্যপ্রাচ্যে ক্রীতদাস নিয়ে আসতো। পূর্ব-আফ্রিকার ক্রীতদাসদেরকে দলে দলে এনে জড়ো করা হতো ভারত মহাসাগর পার হয়ে। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র উনবিংশ শতাব্দীতেই ১,২০০,০০০ (বার লক্ষ) ক্রীতদাস মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলোতে চলে আসে সাহারা মরুভূমি পার হয়ে, আর ৪৫০,০০০ লোহিত সাগর এবং ৪৪২,০০০ আসে পূর্ব-আফ্রিকার উপকূলীয় বন্দরগুলো থেকে। আফ্রিকার বাজারগুলোর দাস-ব্যবসা সম্পর্কে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন সিগল, যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

> ১৫৭০-এর দশকে মিশর সফররত এক ফরাসি নাগরিক কায়রোতে বাজারের দিনে বিক্রির জন্য আনা হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গকে দেখতে পান। ১৬৬৫-৬৬ সালে এক স্পেনীয়/বেলজীয় পর্যটক ফাদার অ্যান্টোনিও গঞ্জালেস একদিনে কায়রোর বাজারে বিক্রির জন্য সমবেত ৮০০ থেকে ১০০০ ক্রীতদাস দেখতে পান। ১৭৯৬ সালে এক ব্রিটিশ পর্যটক লিখেছেন, তিনি দারফুর থেকে ৫,০০০ ক্রীতদাসের একটি বহরকে যেতে দেখেন। ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশ ভাইস কন্সুল ফেজ্জানের মারজুকে ২৩৮৪ জন ক্রীতদাসের (উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায়) পৌঁছানোর কথা লিখেছেন।[১৯৭]

---

[১৯২] At this time, an ordinary London shopkeeper earned £10 a year, while wealthy merchants made £40 at best.
[১৯৩] Milton, p. 27
[১৯৪] Curtin PD (1993) *The Tropical Atlantic of the Slave Trade in Islamic & European Expansion*, in M Adas ed. (1993) *Islam & European Expansion*, Temple University Press, Philadelphia, p. 174
[১৯৫] Moreland WH (1995) *India at the Death of Akbar*, Low Price Publication, New Delhi, p. 69-70
[১৯৬] Lewis (1994), op cit
[১৯৭] Segal, p. 59

ইউরোপীয় ক্রীতদাস

ইউরোপ থেকে মুসলিম বিশ্বে আগত ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে লুইস লিখেছেন:

> ইউরোপেও গুরুত্বপূর্ণ দাস-বাণিজ্য ছিল, যাদের মধ্যে ছিল মুসলিম, ইহুদি, পৌত্তলিক, এমনকি গোঁড়া খ্রিষ্টান ক্রীতদাস। সাধারণত 'সাকালিবা' (অর্থাৎ ক্রীতদাস) নামে পরিচিত মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় ক্রীতদাসদেরকে আমদানি করা হতো প্রধান তিনটি পথ দিয়ে: স্থলপথে ফ্রান্স ও স্পেনের ভিতর দিয়ে, ক্রিমিয়া হয়ে পূর্ব-ইউরোপ থেকে এবং সমুদ্রপথে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে। তারা সবাই নয় কিন্তু অধিকাংশই ছিল স্লাভ ক্রীতদাস। তাদের কিছু সংখ্যককে মুসলিম নৌদস্যুরা ইউরোপীয় উপকূলে, বিশেষত ডালমাশিয়ান অঞ্চলে হানা দিয়ে ধরে আনতো। অধিকাংশই সরবরাহ হতো ইউরোপীয়, বিশেষত ভেনিসের বণিকদের দ্বারা, যারা স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম বাজারগুলোতে তাদের বহর পাঠাতো।

ইউরোপীয় ক্রীতদাসদের বিশেষ চাহিদা ছিল যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহারের জন্য, রাজকীয় সেনাবাহিনী ও প্রাসাদসমূহে কাজ করার জন্য, এবং মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও লিবিয়ার ধনীদের বাড়িঘর ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য। জাইলস্ মিল্টনের 'হোয়াইট গোল্ড' ও রবার্ট ডেভিসের 'ক্রিশ্চিয়ান শ্লেইভস্, মুসলিম মাস্টার্স' গ্রন্থদ্বয় অনুযায়ী, ১৫৩০ সাল থেকে দীর্ঘ তিন শতাব্দব্যাপী উত্তর আফ্রিকার মুসলিম জলদস্যুরা সিসিলি থেকে কর্নওয়াল পর্যন্ত ইউরোপীয় উপকূলের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম এবং ইউরোপীয় জাহাজগুলোতে হানা দিতে থাকে এবং ১৫ লাখেরও বেশি ইউরোপীয়কে ক্রীতদাস করে (যার মধ্যে ছিল আমেরিকার নাবিকও)। এ ক্রীতদাসকরণ সম্পর্কে মানবতাবাদী ব্রিটিশ লেখক ক্রীস্টোফার হিচেন্স আক্ষেপমূলক জিজ্ঞাসার সুরে লিখেছেন: '*কজন জানে যে, ১৫৩০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইসলামি উত্তর আফ্রিকায় সম্ভবত দেড় মিলিয়ন (১৫ লাখ) ইউরোপীয় ও আমেরিকানকে ক্রীতদাস করা হয়েছিল; আয়ার্ল্যান্ডের বাল্টিমোর শহরের লোকেদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল? এক রাত্রিতে মুসলিম জলদুস্যুরা হানা দিয়ে সবাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।*'[১৯৮]

বার্বার মুসলিম জলদস্যুরা উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় জলপথ দিয়ে যাওয়া বাণিজ্য-জাহাজে হানা দিয়ে ইউরোপীয়দেরকে অপহরণ করতো। তারা আটলান্টিকের ইউরোপীয় উপকূলীয় মৎস্যজীবী গ্রাম ও শহরগুলোতে গিয়ে হানা দিয়ে ব্যাপক লুটতরাজ করে ও বাসিন্দাদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসতো। ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের উপকূলীয় গ্রাম ও শহরগুলো তাদের আঘাতে সবচেয়ে বেশী জর্জরিত হয়। মুসলিম ক্রীতদাস শিকারি হানাদাররা এমনকি আরো দূরবর্তী ব্রিটেন, আয়ারাল্যান্ড ও আইসল্যান্ডেও হানা দিয়ে গ্রাম ও শহরের বাসিন্দাদের অপহরণ করতো।

জিহাদি মুসলিম হানাদাররা ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে নেপলসের অদূরবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় ইশ্চিয়া দ্বীপে হানা দিয়ে লুটপাট করার পর ৪,০০০ বাসিন্দাকে আটক করে নিয়ে যায় এবং সিসিলির উত্তর উপকূলের অদূরে লিপারি দ্বীপের ৯,০০০ বাসিন্দাকে ক্রীতদাস করে।[১৯৯] ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তুরগুত রাইস নামের এক তুর্কি জলদস্যুপ্রধান গ্রানাডার (স্পেন) উপকূলীয় বসতিগুলোতে হানা দিয়ে লুণ্ঠন করার পর ৪,০০০ বাসিন্দাকে ক্রীতদাস হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে বার্বার জলদস্যুরা ব্রিস্টল চ্যানেলের লান্ড দ্বীপ দখল করে সেখানে ইসলামের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। এ ঘাঁটি থেকে তারা আশেপাশের গ্রাম ও শহরগুলোতে হামলা করে লুটপাট ও দাঙ্গাহাঙ্গামার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা করে। মিল্টন জানান: দিনের পর দিন তারা নিরীহ-নিরস্ত্র জেলেদের বসতবাটির উপর হানা দিয়ে বাসিন্দাদেরকে বন্দি ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ১৬২৫ সালের সে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের শেষে প্লাইমাউথের মেয়র হিসাব করে জানান: '*তারা ১,০০০ মাছ ধরার নৌকা ধ্বংস করে এবং সহস্রাধিক গ্রামবাসীকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রির জন্য ধরে নিয়ে যায়।*'[২০০] ১৬০৯ থেকে ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বার্বার জলদস্যুরা '*প্রায় ৪৬৬টি ইংরেজ বাণিজ্য-জাহাজ আটক করে।*'

ইসলামে ধর্মান্তরিত জনৈক ইউরোপীয় মুরাদ রাইস পরবর্তীকালে মরক্কোর অদূরে উপকূলীয় জলদস্যু বন্দর-শহর সালে'র বার্বার জলদস্যুদের নেতা হয়েছিল। ১৬২৭ সালে সে এক লুটতরাজ ও ক্রীতদাসকরণ অভিযানে আইসল্যান্ডে যায়। রিকইয়াভিকে নোঙ্গর ফেলে তার বাহিনী শহরটিকে তছনছ করে এবং ৪০০ পুরুষ, নারী ও শিশুকে ধরে নিয়ে এসে আলজিয়ার্সে বিক্রি করে দেয়। ১৬৩৭ সালে ২০০ সদস্যের এক রাহাজান জলদস্যুর দল নিয়ে সে আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে নৌ-অভিযান চালায় এবং বাল্টিমোর গ্রামের বাড়িঘর তছনছ ও লুটপাট করে এবং ২৩৭ জন নারী-পুরুষ ও শিশুকে ধরে নিয়ে যায় আলজিয়ার্সে।[২০১]

মুসলিম জলদস্যুদের বর্বর ক্রীতদাস শিকারমূলক অভিযান ইউরোপকে মারাত্মকভাবে জর্জরিত করেছিল। ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যান্ডকে তাদের হাজার হাজার জাহাজ হারাতে হয়েছিল জলদস্যুদের সেসব হামলায়, যা তাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত স্পেন ও ইতালির দীর্ঘ উপকূল প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত থাকে এবং সেখানকার মৎস্য শিল্প দৃশ্যত ধ্বংস হয়ে যায়।

পল বায়েপলার্স তার '*হোয়াইট শ্লেইভস, আফ্রিকান মাস্টার্স: অ্যান অ্যান্থোলজি অব আমেরিকান বার্বারি ক্যাপটিভিটি ন্যারেটিভস*' গ্রন্থে উত্তর আফ্রিকায় ধৃত ৯ জন আমেরিকান বন্দির লেখা কতকগুলো নিবন্ধ একত্রিত করেছেন। সে গ্রন্থ অনুসারে, ১৬২০ সালে কেবলমাত্র আলজিয়ার্সেই ২০,০০০-এরও বেশি খ্রিষ্টান শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস ছিল। ১৬৩০ সালে এ সংখ্যা স্ফীত হয়ে ৩০,০০০ পুরুষ ও ২,০০০ নারীতে

---

[১৯৮] Hitchens C (2007) *Jefferson Versus the Muslim Pirates*, City Journal, Spring Issue

[১৯৯] Povoledo E (2003) *The Mysteries and Majesties of the Aeolian Islands*, International Herald Tribune, 26 September.

[২০০] Milton, p. 11

[২০১] Milton, p. 13-14; Lewis B (1993) *Islam and the West*, Oxford University Press, New York, p. 74

গিয়ে ঠেকে। আহমেদ এজ্জায়ানি লিখেছেন: 'সুলতান মৌলে ইসমাইলের প্রাসাদে যে কোনো সময়ে কমপক্ষে ২৫,০০০ শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস থাকতো। ১৫৫০ থেকে ১৭৩০ সালের মধ্যে আলজিয়ার্সে ২৫,০০০ শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস সর্বদাই থেকেছে। কোনো কোনো বিশেষ সময়ে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেতো। একই সময়কালে তিউনিস ও ত্রিপোলিতে কমপক্ষে ৭,৫০০ জন করে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস থাকতো। বার্বারি জলদস্যুরা দীর্ঘ তিন শতাব্দেরও বেশি সময় ধরে প্রতি বছর গড়ে ৫,০০০ করে ইউরোপীয়কে ক্রীতদাস করেছিল।[২০২]

বার্বারি মুসলিম আফ্রিকায় সবচেয়ে বিখ্যাত যে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ক্রীতদাস হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বিখ্যাত মহাকাব্য 'ডন কুইকজোট'-এর লেখক মিগুয়েল ডি সারভান্ডিস। বার্বারি জলদস্যুদের দ্বারা ১৫৭৫ সালে তিনি বন্দি হন এবং পরে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করা হয়। ১৩৫০ সালের দিকে অটোমানদের ইউরোপে অনুপ্রবেশ এবং পরবর্তীতে ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করায় ইউরোপীয় সীমান্ত থেকে অবারিত ক্রীতদাস সরবরাহের দুয়ার খুলে যায়। ১৬৮৩ সালে অটোমান বাহিনীর ইউরোপ বিজয়ের সর্বশেষ প্রয়াস ব্যর্থ হলেও, ভিয়েনা গেট থেকে ফেরার পথে তারা ৮০,০০০ শেতাঙ্গকে বন্দি করে নিয়ে আসে।[২০৩] ক্রিমিয়া, বলকান অঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়ার সমভূমি অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক ক্রীতদাস ইসলামি বিশ্বের বাজারগুলোতে ঢুকে পড়ে। বি. ডি. ডেভিস দুঃখ করে বলেন: '*তাতার ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের অন্যান্য লোকেরা (মুসলিম) লাখ লাখ ইউক্রেনীয়, জর্জিয়, সার্কাসিয়ান, আর্মেনীয়, বুলগেরীয়, স্লাভ ও তুর্কিদেরকে ধরে এনে বিক্রি করে দিয়েছিল, যা কারো নজরেই পড়েনি।*'[২০৪]

১৪৬৮ ও ১৬৯৪ সালের মধ্যে ক্রিমিয়ার তাতাররা ১,৭৫০,০০০ ইউক্রেনীয়, পোল ও রুশকে ক্রীতদাস হিসেবে শিকার করে এনে বিক্রয় করে দেয়।[২০৫] আরেক হিসাব অনুযায়ী, ১৪৫০ ও ১৭০০ সালের মধ্যে ক্রিমিয়ার তাতাররা কিছু সার্কাসিয়ানসহ প্রতি বছর ১০,০০০ করে ক্রীতদাস ধরে এনে (অর্থাৎ সর্বমোট প্রায় পঁচিশ লাখ) অটোম্যান সাম্রাজ্যে রপ্তানি করে।[২০৬] ক্রীতদাস শিকারি তাতার খানরা ১৪৬৩ সালে পোল্যান্ড থেকে ১৮,০০০, ১৪৯৮ সালে লভোভ থেকে ১০০,০০০, ১৫১৫ সালে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে ৬০,০০০, ১৫১৬ সালে গ্যালিসিয়া থেকে ৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০, ১৫২১ সালে মস্কো থেকে ৮০০,০০০, ১৫৫৫ সালে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে ২০০,০০০, ১৫৭১ সালে মস্কো থেকে ১০০,০০০, ১৬১২ সালে পোল্যান্ড থেকে ১০০,০০০, ১৬৫৪ সালে ইউক্রেন থেকে ৩০০,০০০, ১৬৭৬ সালে ভ্যালিনিয়া থেকে ৪০০,০০০ এবং ১৬৯৪ সালে পোল্যান্ড থেকে হাজার হাজার ক্রীতদাস নিয়ে ফিরে যায়। এসব বড় বড় শিকার-অভিযান ছাড়াও, তারা একই সময়ে আরো বহু জিহাদ-অভিযান পরিচালনা করে হাজার হাজার ক্রীতদাস বানায়।[২০৭] তাতারদের দ্বারা ক্রীতদাসকরণের সংখ্যাটি এ প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে যে, সে সময় তাতারস্থানের মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০,০০০-এর মতো।[২০৮]

ভাইকিং দাস-ব্যবসা ও মুসলিম সম্পৃক্ততা

ইসলামের জন্মের পর সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম আক্রমণকারী ও শাসকরা অগণিত সংখ্যক বিধর্মীকে ক্রীতদাসকরণের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে দাস-বাণিজ্যকে একটা বৃহৎ ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিণত করে। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে 'ভাইকিং' নামে একদল অমুসলিম দাস-শিকারির উত্থান ঘটে। ভাইকিংরা ছিল উত্তর ইউরোপীয় স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলো (সুইডেন, ডেনমার্ক) থেকে উদ্ভব হওয়া, যারা অষ্টম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে নিষ্ঠুর হানাদার রাহাজানে পরিণত হয়। তথাকথিত 'বর্বর' জার্মান জাতির এসব লোক ব্রিটিশ দ্বীপ ও ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের উপকূল ও রাশিয়ার ভলগা নদী বরাবর দূরপ্রাচ্যে হামলা ও জলদস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। লম্বা জাহাজের জন্য খ্যাত ভাইকিংরা দীর্ঘ তিন শতাব্দীরও বেশি সময় ইউরোপের মূল ভূখন্ড, আয়ারল্যান্ড, নরম্যান্ডি, শেটল্যান্ড, ওরকনি এবং ফারো দ্বীপপুঞ্জ, আইসল্যান্ড, গ্রীনল্যান্ড ও নিউফাইল্যান্ডের উপকূল ও নদীর তীর বরাবর বসতি স্থাপন করে। তারা দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকায় এবং পূর্বে রাশিয়া ও কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে যায় লুণ্ঠনকারী, ব্যবসায়ী কিংবা ভাড়াটিয়া বাহিনীরূপে। এরিক দ্য রেড-এর উত্তরসূরী লেফ এরিকসন-এর অধীনে ভাইকিংরা ১০ম শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকায় অভিযান চালিয়ে বর্তমান কানাডায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দশম ও একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোতে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রবর্তন হওয়ার সাথে ভাইকিং হামলা হ্রাস পায়।[২০৯] ৭৯৩ ও ১০৬৬ সালের মধ্যবর্তীকালীন ভাইকিংদের উত্থানের ও কর্তৃত্বের সময়কাল সাধারণত 'ভাইকিং যুগ' নামে পরিচিত।

ইউরোপের উপকূল বরাবর বসবাসকারী নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় পরিবার ও সম্প্রদায়ের উপর বর্বর হামলার মাধ্যমে বয়স্কদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করে ক্রীতদাসরূপে বিক্রির পেশায় লিপ্ত হওয়ার কারণে ভাইকিংরা চরমভাবে নিন্দিত হয়েছে। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, ভাইকিংদের উত্থান ও বিস্তারের প্রধান কারণ ছিল অতিরিক্ত জনসংখ্যা, প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও জলবায়ুর পরিবর্তন এবং সে সঙ্গে ৭৮৫

---

২০২. Milton, p. 99, 217-72
২০৩. Erdem YH (1996) *Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise*, 1800-1909, Macmillan, London, p. 30
২০৪. Lal (1994), p. 132
২০৫. Fisher AW (1972) *Muscovy and the Black Sea Slave Trade*, in Canadian-America Slavic Studies, 6(4), p. 577-83, 592-93
২০৬. Inalcik H (1997) *An Economic and Social History of the Ottoman Empire*, 1300-1600, Cambridge University Press, Vol. I, p. 285; Fisher, p. 583-84
২০৭. Bostom AG (2005) *The Legacy of Jihad*, Prometheus Books, New York, p. 679-81
২০৮. Williams BG (2001) *The Crimean Tatars: The Diaspora Experience and the Forging of a Nation*, E J Brill, Lieden, p. 69-72
২০৯. *Viking*, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Vikings

খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট শার্লামেন কতৃক ফ্রিজিয়ান জাহাজবহর ধ্বংসের পর বাণিজ্যিক ধারাবাহিকতা ও মধ্য-ইউরোপ থেকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় পণ্য প্রবাহ ভঙ্গ ।

কিন্তু ভাইকিংদেরকে ক্রীতদাস-বাণিজ্যে জড়িতকরণে ইসলাম যে ইন্ধন যুগিয়েছিল সে বিষয়টি ঐতিহাসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে খুবই কম । ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে টুরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে ইউরোপীয় সীমান্তে ইসলামিক বিজয় থেমে যায় । এমনকি তাদেরকে ইতিমধ্যে দখলকৃত কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় । অতঃপর মুসলিম বিশ্বের হেরেমগুলোতে উপপত্নীরূপে অতি চাহিদার ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ নারীদের ক্রীতদাসকরণ ব্যাপকহারে হ্রাস পায় ।

যুদ্ধ ও হামলার মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ যৌনদাসী কব্জা করার প্রক্রিয়ায় এভাবে ভাটা পড়লে মুসলিম বিশ্বে তাদের বিরামহীন ও মোহাবিষ্ট চাহিদা পূরণের বিকল্পরূপে ক্রীতদাস হিসেবে তাদেরকে কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয় । ভয়ঙ্কর উম্মত্ত ভাইকিং দস্যুদের উত্থানকালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পশম ব্যবসায়ীরা রাশিয়ার বুলগার ভলগায় অবস্থিত ইউরোপ-আরব বাণিজ্যকেন্দ্রে পৌঁছে যায় । এখানে মুসলিম বিশ্বের ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা ইসলামি হেরেমগুলোতে শ্বেতাঙ্গ নারীদের প্রচুর চাহিদার কথা জানতে পারে । অতঃপর হিংস্র ও বর্বর ভাইকিংরা মুসলিম বণিকদের কাছে বিক্রির জন্য শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী যুবতীদেরকে শিকার করে আনার পেশায় লিপ্ত হয় । এতে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের ক্রীতদাস বাণিজ্যের পথ খুলে যায় । খুব শীঘ্রই স্পেন হয়েও শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস সরবরাহের পথ উন্মুক্ত হয় । উত্তর ইউরোপে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রসারের সাথে ভাইকিং দাস-বাণিজ্য ক্রমশ স্তিমিত হতে হতে বন্ধ হয়ে যায় ।

ভাইকিং দাস-বাণিজ্য সর্বোতোভাবে নিন্দিত হয়েছে । কিন্তু ভাইকিংদেরকে এ ঘৃণিত পেশায় লিপ্তকরণে ইসলাম যে বড় ইন্ধন যুগিয়েছিল সে ব্যাপারে আদৌ কিছুই বলা হয় না । ভাইকিংরা যে জঘন্য অপরাধগুলো করেছিল, তা ক্ষমাহীন । তবে ভাইকিংদের ক্রীতদাসী-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ থেকে ইসলামকে পৃথক করাও অসম্ভব, কেননা ভাইকিংরা প্রধানত শ্বেতাঙ্গ নারীদেরকে হরণ করতো পুরোপুরিই মুসলিম বিশ্বের অবিরাম চাহিদা পূরণে সরবরাহ করতে ।

'ভাইকিং যুগ' শেষ হলেও ইসলামি বিশ্বে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস সরবরাহ শেষ হয়ে যায়নি । ভাইকিং দাস-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার পর মুসলিম ক্রীতদাস শিকারিরাই ভাইকিংদের স্থান দখল করে এবং মুসলিম বিশ্বের চাহিদা পূরণে ইউরোপে ধীরে ধীরে শ্বেতাঙ্গ নারী আটকের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় । ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে অটোমান তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপলকে পাশ কাটিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে এবং বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া দখল করার মাধ্যমে নতুন জিহাদী অভিযান শুরু করে । এ ঘটনায় স্বয়ং মুসলিমদের দ্বারা ব্যাপক সংখ্যায় শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস ধরার প্রক্রিয়া নতুন করে সূচিত হয় । ১৪৩০ সালে তুর্কিরা গ্রিসের থেসালোনিকো আক্রমণ করে ৭,০০০ শ্বেতাঙ্গকে ক্রীতদাস করে; অপরদিকে ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ গ্রিসের মিথোনে হানা দিয়ে লুণ্ঠন করে এবং নগরীর দশ বছরের উর্ধবয়সী সকল পুরুষকে হত্যা করে নারী ও শিশুকে বন্দি করে আনে ।[২১০] পারস্যের শাসক শাহ তাহমাস্প (মৃত্যু ১৫৭৬) ১৫৫৩ সালে জর্জিয়া আক্রমণ করে ৩০,০০০-এর বেশি নারী-শিশুকে ক্রীতদাস করে । জর্জিয়ায় তার ১৫৫১ সালের অভিযানে গাজীরা পুরুষদেরকে হত্যা করে তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে বন্দি করে । জর্জিয়ার বিরুদ্ধে সুলতান ১৫৪০ ও ১৫৪৬ সালে আরো দু'টো সফল অভিযান পরিচালনা করেন । এ দুই অভিযানে কত লোককে ক্রীতদাস করা হয়েছিল তা লেখা হয়নি ।[২১১] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত অটোমান ও পারস্যের সাফাভিদরা ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বহু হামলা চালায় । ১৬৮৩ সালে ভিয়েনা অবরোধকালে পরাজয় ও ব্যাপক ক্ষতি স্বীকার সত্ত্বেও অটোমান তুর্কিরা ৮০,০০০ বন্দিকে ধরে নিয়ে আসে । এটা পরিষ্কার যে, তাদের সব অভিযানেই বিপুল সংখ্যায় ক্রীতদাস আটক করা হতো ।

ইতিমধ্যে তাতার খানরা পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব-ইউরোপ ও রাশিয়ায় অসংখ্য ধর্মযুদ্ধের অভিযান (রাজিয়া) পরিচালনা করে । সেসব অভিযানে তারা হাজার হাজার, এমনকি লাখ লাখ, শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস আটক করে নিয়ে আসে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । উত্তর আফ্রিকার বার্বার জলদস্যুরা ১৫৩০ ও ১৭৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপীয় উপকূলীয় নগরী সিসিলি থেকে কর্নওয়াল পর্যন্ত ও সমুদ্রপথের জাহাজে অব্যাহতভাবে হানা দিয়ে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস আটকের মাধ্যমে দশ লাখ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ-নারীকে ক্রীতদাস বানায় । ১৮২০ সাল পর্যন্ত বার্বার জলদস্যুরা শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস শিকার অব্যাহত রাখে ।

ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায় ইসলামি সহায়তা

ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায়ীরা আটলান্টিক পারাপারের দাস-ব্যবসা পরিচালনা করেছিল, যার মাধ্যমে আফ্রিকা থেকে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস স্থানান্তরিত করা হয়েছিল নতুন বিশ্বে । পশ্চিমারা নিজেরাসহ সর্বত্র মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ ইউরোপীয় দাস-ব্যবসার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছে । অথচ ইসলামি দাস-বাণিজ্যের বিষয়টি মূলত স্পর্শহীন, অব্যক্ত এবং কিছুটা বিস্মৃতও রয়ে গেছে ।

নতুন বিশ্বে ইউরোপীয় দাস সরবরাহ শুরু হয় ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রোম সম্রাট পঞ্চম চার্লস কর্তৃক ইউরোপকে ক্রীতদাস ব্যবসায় জড়িত হওয়ার অনুমোদন দেওয়ার পর । ইউরোপীয়দের মধ্যে কুখ্যাত পর্তুগিজ ও স্পেনীয়রা প্রথম এ লাভজনক দাস-ব্যবসার উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে । তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডাচ ও পরে ফরাসিরাও এ ব্যবসায় নেমে পড়ে । ১৬৩১ সালে ব্রিটেনের রাজা প্রথম চার্লস দাস-ব্যবসার অনুমোদন দেন এবং তার পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ১৬৭২ সালে রাজকীয় সনদে সে অনুমোদন পুনপ্রবর্তন করেন ।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ আফ্রিকান ক্রীতদাস নতুন বিশ্বে স্থানান্তরিত হয়েছিল । এর মধ্যে আনুমানিক ৪০ লাখ (৩৫.৪ শতাংশ) ক্রীতদাস যায় পর্তুগিজ-নিয়ন্ত্রিত ব্রাজিলে, ২৫ লাখ (২২.১ শতাংশ) যায় দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার স্পেন-নিয়ন্ত্রিত

---

[২১০] Bostom, p. 613, 619

[২১১] Ibid, p. 620-21

উপনিবেশগুলোতে, ২০ লাখ (১৭.৭ শতাংশ) যায় ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে (অধিকাংশই জ্যামাইকায়), ১৬ লাখ (১৪.১ শতাংশ) যায় ফরাসি ওয়েস্ট ইন্ডিজে, ৫ লাখ (৪.৪ শতাংশ) ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজে, এবং বাকি ৫ লাখ যায় উত্তর আমেরিকায়।[২১২]

বিলুপ্তকরণ: মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ের প্রত্যয়ে ঘটিত ফরাসি বিপ্লবে ক্রীতদাসদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো চিন্তা-ভাবনা না থাকলেও পরবর্তীতে তা ফরাসি সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসদের আইনগত মুক্তির পথ উন্মোচিত করে ১৭৯৪ সালে। ১৭৯০ সালের দিকে ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ড তাদের নিজস্ব দাস-বাণিজ্য বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সংসদ সদস্য উইলিয়াম উইলবারফোর্স ১৭৮৭ সালে ক্রীতদাস-বাণিজ্য অবদমিত করার জন্য প্রচারণা শুরু করেন। তার এ প্রচারণার জের ধরে পরবর্তীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা বিলুপ্তির জন্য এক প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে উঠে। এর কুড়ি বছর পর ১৮০৭ সালে ব্রিটিশ 'হাউস অব কমন্স' দাস-ব্যবসা বিলুপ্ত করে একটা বিল পাস করে ২৮০-১৬ ভোটের বিরাট ব্যবধানে, যা দাসপ্রথার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানে। পরে ১৮০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার বিদেশী জাহাজসহ সন্দেহভাজন ক্রীতদাসবহনকারী জাহাজগুলোতে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তার নৌবাহিনী মোতায়েন করে। ব্রিটিশ সরকার মুসলিম বিশ্বে দাসপ্রথা বন্ধের জন্য পারস্য, তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম সরকারের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতাও চালায়।

১৮১০ সালে ব্রিটিশ সরকার দাস-ব্যবসায় লিপ্তকারীদের জন্য ১৪ বছরের কঠোর পরিশ্রমের সাজা নির্ধারণ করে। ১৮১৪ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি অব ইউরোপ'-এ ক্রীতদাস-বাণিজ্য বিলুপ্তির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্রিটেন আলাপ-আলোচনার সূচনা করে, যার ফলশ্রুতিতে ১৮১৫ সালের ৯ই জুন সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি এরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৮২৫ সালে ব্রিটেন দাস-ব্যবসায় সহযোগিতা করাকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধরূপে নির্ধারণ করে। দাস-ব্যবসা বিরোধী আন্দোলনের উজ্জ্বলতম মুহূর্তটি আসে ১৮৩৩ সালে, যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দাসপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় ৭০০,০০০ ক্রীতদাসের সবাইকে মুক্ত করে দেয়। ফ্রান্স ব্রিটেনের অনুসরণে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ক্রীতদাসদের মুক্ত করে। একই সময় ডাচ উপনিবেশীরাও সে পথ অনুসরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ক্রীতদাসদের মুক্ত করে ১৮৬৫ সালে।

ইসলামের সহায়তা: মানবতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত অমানবিক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির এ অপরাধের জন্য ইউরোপীয় দাস-ব্যবসাকে অবশ্যই নিন্দা করতে হবে। মুসলিমরা অতি গর্বভরে নিজেদের গুণকীর্তনে উন্মুখ হয় এটা বলে যে, তাদের ইতিহাস দাসপ্রথাবিহীন, নিখুঁত। বাস্তবে এমনকি ইউরোপীয় দাস-ব্যবসাতেও মুসলিমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ও আর্থিকভাবে পুরস্কৃত ভূমিকা। কিন্তু মুসলিমদের মাঝে এ ব্যাপারে রয়েছে এক অদ্ভুত নীরবতা। এমনকি পশ্চিমাসহ অমুসলিম পণ্ডিতরাও আটলান্টিক বরাবর দাস-ব্যবসার ব্যাপারে ইসলামের সহযোগিতামূলক ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় নীরব।

আটলান্টিক পারাপারের ক্রীতদাস-বাণিজ্যে ইসলামের পরোক্ষ ভূমিকা এ বাস্তবতার উপর অবস্থিত যে, ইউরোপীয়রা এ কাজে লিপ্ত হওয়ার বহু শতাব্দী পূর্বেই বিশাল মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিমরা দাস-ব্যবসার একটা স্থায়ী ও উচ্ছল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হলো: ইসলামি ক্রীতদাসকরণ ও দাস-বাণিজ্যের দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্ঠুর শিকার ছিল ইউরোপীয়রাও। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের উপর মুসলিম আক্রমণ দিয়ে তা শুরু হয় (প্রকৃতপক্ষে তারও আগে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলোতে আক্রমণের মাধ্যমে) এবং চলতে থাকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব পর্যন্ত। মুসলিম বিশ্বের শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস, বিশেষত উপপত্নী হিসেবে তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য হামলার মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ নারী ও শিশুদেরকে অপহরণে ভাইকিংরাও ছিল মুসলিমদের সঙ্গী। সর্বশেষ অটোমান সুলতানের হেরেমেও ছিল এক ব্রিটিশ বন্দিনী, যাকে মুক্ত করে ব্রিটেনে আনা হয় তুরস্ক থেকে সুলতানকে বিতাড়িত করার পর। বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়দেরকে ক্রীতদাসকরণ ও বিক্রির এক দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম শিকারে পরিণত করার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকেও খাটো করে দেখার উপায় নেই। এটা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে, দাসপ্রথা, যা ছিল মুসলিমদের দ্বারা আরোপিত তাদের জীবনের নিষ্ঠুর নিত্য-সঙ্গী, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইউরোপীয়রা দীর্ঘ নয় শতাব্দব্যাপী ইসলামি ক্রীতদাসকরণ ও দাস-বাণিজ্যের ভয়াবহ শিকার হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত নিজেরাও সে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আটলান্টিক পারাপারের দাস-বাণিজ্যে মুসলিমদের সরাসরি ভূমিকা হলো: এতে সবচেয়ে অমানবিক ও নিষ্ঠুর ভূমিকাটি পালন করেছিল প্রধানত মুসলিম হানাদার ও ব্যবসায়ীরা, যারা আফ্রিকায় ক্রীতদাস সংগ্রহে লিপ্ত হতো। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা প্রধানত মুসলিম দাস-শিকারিদের নিকট থেকে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে ক্রয় করে নতুন বিশ্বে স্থানান্তর করতো। ইউরোপীয়রা যখন দাস-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, সে সময় মুসলিমরা ছিল আফ্রিকায় ক্রীতদাস শিকারে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাস্টার বা প্রভু। তারাই ছিল ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায়ীদের জন্য সদা-প্রস্তুত সরবরাহকারী। ইউরোপীয় বণিকরা অবস্থান করতো আফ্রিকার উপকূলভাগের ক্রয়কেন্দ্রগুলোতে, আর মুসলিম দাস-শিকারি ও ফড়িয়ারা দেশের অভ্যন্তরভাগ থেকে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে ধরে উপকূলে অবস্থিত ইউরোপীয় বণিকদের ক্রয়-কেন্দ্রে নিয়ে এসে বিক্রি করতো।

ইউরোপীয় বণিকরা মুসলিম ব্যবসায়ীদের হাত এড়িয়ে বড়জোর ২০ শতাংশ ক্রীতদাসকে কিনে থাকতে পারে। তবে এ ক্রীতদাস-সংগ্রহ কোনোরূপ সহিংস হামলা কিংবা অপহরণের মাধ্যমে করতো না তারা, বরং অমুসলিম মালিকদের মাধ্যমে কিংবা পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত বিক্রির মাধ্যমে (তাদের কিছু সংখ্যক অমুসলিম ক্রীতদাস-শিকারী দ্বারা ধৃত হয়ে থাকতে পারে, যারা মুসলিমদের দেখাদেখি এ পেশায় যোগ দিয়েছিল)। সাহারা মরুভূমির ঠিক দক্ষিণে পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল ও অ্যাঙ্গোলা অঞ্চল ছিল অনাবৃষ্টির জন্য কুখ্যাত। মাঝে মাঝেই দুই থেকে তিন বছর লাগাতার বৃষ্টিহীন থাকতো এ অঞ্চলটি। যখন এরূপ ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দিতো, তখন অভুক্ত মৃত্যুর মুখে পতিত জনগণ বেঁচে থাকার তাগিদে সে অঞ্চল থেকে পালিয়ে যেতো এবং '*নিজেদেরকে বা পরিবারের সদস্যদের*

[২১২] Hammond P (2004) *The Scourge of Slavery*, in Christian Action Magazine, Vol. 4

বিক্রি করে দিতো বণিকদের কাছে', জানান কার্টিন। ১৭৪৬ থেকে ১৭৫৪ সাল পর্যন্ত সেনেগাল ধারাবাহিকভাবে অনাবৃষ্টি ও শস্য উৎপাদনহীনতার ভয়ঙ্কর দুর্ভোগের শিকার হয়; ফলে দেশটিতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ের মাত্রাও অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কার্টিন লিখেছেন: '*ফরাসিরা ১৭৫৪ সালে সেনেগাল থেকে এযাবতকালের সর্বাধিক সংখ্যক ক্রীতদাস রপ্তানি করেছিল।*'[২১৩]

ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায়ীরা আফ্রিকায় মুসলিম ক্রীতদাস-শিকারি ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রায় ৮০ শতাংশ ক্রীতদাস সংগ্রহ করে। মুসলিম যোদ্ধারা ইসলামি বিশ্বে ক্রীতদাসের চাহিদা মেটাতে আফ্রিকাকে একটা ক্রীতদাস শিকার ও প্রজনন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছিল, যা পরে ইউরোপীয় বণিকদের জন্য একটা সাপ্লাই-হাউস বা সরবরাহক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। সাঈদ সাইয়িদ নামক ওমানের এক যুবরাজ ছিলেন মাস্কাটস্থ দাস-শিকারের নেতা, যার দাস-ব্যবসায় লালবাতি জ্বালায় ব্রিটিশরা। এরপর তিনি মাস্কাট বন্দরের জলদস্যুদেরকে সাথে নিয়ে পূর্ব-আফ্রিকায় যাত্রা করেন এবং ১৮০৬ সালে জাঞ্জিবার দ্বীপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রীতদাস ধরার জন্য পূর্ব-উপকূলের এ ঘাঁটি থেকে তিনি আরব হানাদারদেরকে নিয়ে স্থলভাগের গভীরে প্রবেশ করে সূদূর উগাণ্ডা ও কংগো পর্যন্ত পৌঁছে যান।[২১৪] এরূপে তিনি তার খ্যাতনামা 'ক্রীতদাস সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব-আফ্রিকায়। কার্টিন লিখেছেন, আফ্রিকায় ক্রীতদাস-শিকারি দলগুলোর সদস্যসংখ্যা থাকতো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন। তারা দলে দলে ভাগ হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে প্রবেশ করে '*গরু চুরি ও মানুষ অপহরণ করতো, চেষ্টা করতো একজন বা ছোট দলকে ধরার, যেমন গ্রামের কূপে পানি আনতে যাওয়ার পথে নারী বা অন্যান্যদেরকে, যারা নিজেদেরকে ঐ মুহূর্তে রক্ষা করতে অপারগ ছিল।*' এসব গুণ্ডাদল যদিও প্রয়োজন হলে লড়াই করতে পারতো, তবে তারা লড়াই এড়াতে চুপিচুপি ক্রীতদাসকে ধরে দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে দূরের বাজারে বিক্রির করে দিতো।[২১৫] নতুন বিশ্বে ক্রীতদাসের নতুন বাজার খুলে গেলে আফ্রিকার সেসব মুসলিম ক্রীতদাস-শিকারি ও দাস-ব্যবসায়ীদের জন্য সেটা খুব লাভজনক আশীর্বাদ হয়ে উঠে।

ইসলামি দাসপ্রথার অস্বীকৃতি

অধিকাংশ মুসলিমের কাছে কেবলমাত্র আটলান্টিক বরাবর ক্রীতদাস পারাপারই ছিল বিশ্বে একমাত্র দাস-ব্যবসা, যার নিন্দায় তারা খুবই সোচ্চার। মুসলিম বিশ্বে ইসলামের শুরু থেকে বিংশ শতাব্দ পর্যন্ত (বস্তুত অদ্যাবধি) যে ব্যাপক ও বর্বর দাসপ্রথার চর্চা চলে, তাদের ধারণায় তা কখনোই ঘটেনি। তাদের মাঝে এমন উপলব্ধির মূল কারণ নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। কিছু মুসলিম, যারা এ ব্যাপারে অবহিত, তাদের সামনে যখন অনস্বীকার্য তথ্য-প্রমাণ হাজির করা হয়, তারাও চিরাচরিত অস্বীকৃতির পথটি গ্রহণ করে নানা অজুহাতে। তারা মুসলিম বিশ্বের ব্যাপক বিস্তৃত দাসপ্রথা সম্পর্কে অনস্বীকার্য সত্যের মোকাবেলা করতে সাধারণত দু'টো যুক্তি খাড়া করে। প্রথম: *ইসলামে দাসপ্রথা আদৌ অনুমোদিত নয়; মুসলিম বিশ্বে ঘটিত তার চর্চা ইসলামের অপব্যবহার ও অমর্যাদার ফল মাত্র*। দ্বিতীয় অজুহাতটি আসে অধিক জ্ঞাত মুসলিমদের কাছ থেকে, যারা ইসলামে দাসপ্রথার অনুমোদন ও মুসলিম বিশ্বে তার ব্যাপক চর্চাকে অস্বীকার করতে ব্যর্থ হয়ে মেনে নেয় যে, ইসলামে দাসপ্রথা স্বীকৃত, তবে একটা সীমিত মাত্রায়, কেননা সে সময়ে (অর্থাৎ ইসলামের উদ্ভবকালে) দাসপ্রথা ব্যাপক প্রচলিত ছিল। অতঃপর তারা কোরানের কিছু আয়াত ও হাদিসের বয়ান হাজির করে দাবি করে: '*ইসলামই দাসপ্রথা উচ্ছেদের প্রথম নজির স্থাপন করে।*'

ইসলামে দাসপ্রথা চর্চার অস্বীকৃতিতে উপরোক্ত প্রথম যুক্তিটি অনিবার্যরূপেই আসে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের কাছ থেকে যারা ইসলামে দাসপ্রথার অনুমোদন এবং তাতে নবি মুহাম্মদের লিপ্ত হওয়া, তাঁর দাস-ব্যবসা চর্চা ও উপপত্নী রাখা বিষয়ক ধর্মীয় বিধান ও ইতিহাস সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। দ্বিতীয় যুক্তি প্রদানকারী দলটি অত্যন্ত সুচিন্তিতরূপে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কোরান ও সুন্নতের কিছু যুক্তি তুলে ধরে, যা এক্ষেত্রে আলোচনা করা প্রয়োজন। তারা সাধারণত কোরান থেকে যেসব উদ্ধৃতিগুলো দেয়, তা হলো:

১. কোরানের ৪:৩৬ নং আয়াত এতিম, মাতাপিতা, পথচারী ও ক্রীতদাসদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের তাগিদ দিয়েছে মুসলিমদেরকে।
২. ৯:৬০ নং আয়াতটি বাধ্যতামূলক দানের, অর্থাৎ যাকাতের, অংশ-বিশেষ হিসেবে দাসমুক্তির নির্দেশ দেয়।
৩. ২৪:৩৩ নং আয়াতটি মালিকদেরকে উপদেশ দেয় ভাল আচরণকারী ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য লিখিত শর্ত নির্ধারণ করে দিতে।
৪. ৫:৯২ ও ১৮:৩ নং আয়াতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রীতদাস মুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।
৫. ৫:৯২ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, অনিচ্ছাকৃত মানুষ হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মুসলিমদের উচিত বিশ্বাসী ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া।

এসব উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আহমদ আলওয়াদ সিকাইঞ্জা দাসপ্রথা সম্পর্কে কোরানের অনুমোদনের ব্যাখ্যারূপে বলেন: এটা '*নৈতিক প্রকৃতির একটা প্রশস্ত ও সাধারণ প্রস্তাবনা মাত্র, কোনো সুনির্দিষ্ট আইনগত বিধান নয়।*'[২১৬] একই ভঙ্গিতে বিখ্যাত পাকিস্তানি পণ্ডিত ও কবি মোহাম্মদ ইকবাল (মৃত্যু ১৯৩৮) ইসলামে দাসপ্রথাকে প্রকৃত দাসত্ববিহীন একটি শুভ প্রথারূপে আখ্যা দেন।[২১৭] তিনি লিখেছেন:

---

২১৩. Curtin, in M. Adas ed., p. 172-73,
২১৪. Gavin, R J (1972) In MA Klein & GW Johnson eds., p. 178
২১৫. Curtin, in M. Adas ed., p. 177-79
২১৬. *Islam and slavery*, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/ wiki/Islam _and_Slavery.
২১৭. Iqbal M (2002) *Islam as a Moral and Political Ideal*, in Modernist Islam, 1840-1940: A sourcebook, C Kurzman ed., Oxford University Press, London, p. 307-8

'(নবি মুহাম্মদ) সমতার নীতি ঘোষণা করেন, এবং যদিও প্রত্যেক সংস্কারকের মতোই তিনি পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দাসপ্রথাকে নামে-মাত্র মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু চুপিসারে তিনি দাসপ্রথাকে সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত করেন। প্রকৃত সত্য হলো, ইসলামে দাসপ্রথা একটি নাম মাত্র।'

আরো জোরালো কৈফিয়তদাতারা এরূপ উচ্চতর দাবি উপস্থাপন করেন যে, ইসলাম সুস্পষ্টরূপে ও সুনির্দিষ্টভাবে মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ ধরা, তাদেরকে ক্রীতদাস করা বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছে। নবি মুহাম্মদের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে তারা তাদের অবস্থান পোক্ত করতে চান: '*বিচারের দিন তিন ধরনের মানুষের বিরুদ্ধে আমি নিজে ফরিয়াদি হবো। তাদের মধ্যে থাকবে সে ব্যক্তি, যে মুক্ত মানুষকে ক্রীতদাস বানাবে, অতঃপর তাকে বিক্রি করবে ও সে অর্থ খাবে।*'[২১৮] সৈয়দ আমির আলী (মৃত্যু ১৯২৮) ছিলেন এক ইসলামি পণ্ডিত, যার লেখা পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন: '*মহান নবির উপর আরোপিত (ক্রীতদাসত্ব চর্চার) কলঙ্ক মিথ্যা প্রমাণ করতে*' মুসলিমদের উচিত বিশ্ব থেকে দাসপ্রথার অন্ধকার অধ্যায় মুছে ফেলা, '*সুস্পষ্ট ভাষায় এ ঘোষণা দিয়ে যে, দাসপ্রথা তাদের ধর্মে নিন্দিত ও তাদের আইনে প্রত্যাখ্যাত*'।[২১৯] এসব মুসলিম কৈফিয়ৎদাতাদের সাথে সুর মিলিয়ে বার্নার্ড লুইস যুক্তি দেখান: '*প্রাথমিক যুগ থেকেই ইসলামি আইন ও চর্চায় স্বাধীন বা মুক্ত মানুষকে ক্রীতদাসকরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধে বিজিত বা বন্দিদের মাঝেই শুধু এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ ছিল।*'[২২০]

ইসলাম আদিম দাসপ্রথা নির্দিষ্টরূপে নিষিদ্ধ করেছে বলে যেসব পণ্ডিত দাবি করেন, তাদের উচিত কোরানের ১৬:৭১, ১৬:৭৬ ও ৩০:২৮ নং আয়াতে সন্নিবেশিত আল্লাহর বাণীগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া, যাতে আল্লাহ মানবজাতিকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রভু ও ক্রীতদাস শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তাঁর আশীর্বাদ হিসেবে ও তাঁর স্বর্গীয় পরিকল্পনার অংশরূপে। ইকবাল ও আমির আলীর মতো কপট যুক্তিদানকারীদের এ বাস্তবতার দিকে নজর দেওয়া উচিত যে, ইসলামি নবিত্বের মিশন গ্রহণ করার পূর্বে মুহাম্মদের কোনো ক্রীতদাস ছিল না; অথচ ইসলামের নবি হিসেবে মৃত্যুর সময় তিনি বহু ক্রীতদাস ও কয়েকজন উপপত্নীর মালিক ছিলেন, যাদের অধিকাংশই তিনি কব্জা করেছিলেন নিরীহ জনগোষ্ঠির উপর নিষ্ঠুর ও নির্মম হামলার মাধ্যমে। সিকাইঞ্জার এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ইসলামি চিন্তাধারায় কোরান হলো সকল বিষয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার চূড়ান্ত বক্তব্য; সুতরাং কোরান যেটা অনুমোদন করে, সেটা ইসলামি সমাজে চিরন্তন আইন। কোরান সম্পর্কে ইসলামের এ মৌলিক অবস্থান সিকাইঞ্জার এ দাবির বিরোধিতা করে যে, দাসপ্রথা ইসলামে কোনো 'সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন নয়'। বাস্তবে ইসলামে দাসপ্রথা একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান, যা আল্লাহ পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করেছেন ও নবি মুহাম্মদ তা ব্যাপকভাবে চর্চা করে গেছেন, এবং যা পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবুও মৌলিকভাবে সমান অধিকারের দাবিদার মানুষকে আল্লাহ-কর্তৃক 'প্রভু ও দাস' শ্রেণীতে বিভক্ত করাকে সিকাইঞ্জার যুক্তিতে 'নৈতিক প্রকৃতির' প্রস্তাবনা আখ্যা দেওয়া বিবেকহীন ও ক্ষমার অযোগ্য। অধিকন্তু নারীদেরকে যৌনদাসীতে পরিণত করার জন্য সহিংসতার মাধ্যমে তাদেরকে ক্রীতদাসকরণের কোরানের পুনঃপুনঃ অনুমোদন আরো গর্হিত।

উপমহাদেশের আরেক পণ্ডিত গোলাম আহমদ পারভেজও (মৃত্যু ১৯৮৩) ইসলামে ক্রীতদাস চর্চার বিষয়ে নানা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। কোরানের আয়াতে (৪:৩, ৩০:২৮, ১৬:৭১, ৭০:২৯, ২৩:৬) ক্রীতদাসদের লক্ষ্য করে লিখিত '*যারা তোমার দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন*' বাক্যটিকে, তিনি বলেন, অতীতকাল হিসেবে পড়া উচিত এভাবে: '*যারা তোমার মালিকানাধীন ছিল*'। এভাবে তিনি দেখাতে চান যে, দাসপ্রথার চর্চা আগে বিদ্যমান ছিল এবং '*কোরান ভবিষ্যতে তা চর্চার পথ বন্ধ করে দিয়েছে*'।[২২১]

নবি মুহাম্মদ মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হন ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে, যখন তাঁর ধর্মে দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০০ থেকে ২৫০ জন – মক্কা ও মদীনার ধর্মান্তরিতদেরকে যোগ করে। এ স্বল্পসংখ্যক অনুসারীর ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে তিনি একটি হানাদার রাহাজান দল গঠন করেন, প্রথমত মক্কার বাণিজ্যবহরে হামলা করে সবকিছু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাগালের মধ্যে আসা পৌত্তলিক, ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উপর হামলার মাত্রা বাড়িয়ে দেন লুটপাট ও ক্রীতদাস আটকের লক্ষ্যে। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে নবির মৃত্যুর পর মুসলিমদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে বিধর্মীদের উপর এ শর্তহীন যুদ্ধ আরো জোরেশোরে চলতে থাকে। তারা ব্যাপক মাত্রায় যুদ্ধাভিযান শুরু করে এবং পরিশেষে বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি পারস্য, বাইজেন্টিয়াম ও ভারতকে পদানত করে। তারা তলোয়ারের ডগায় লাখ লাখ মানুষ নিধন করা ছাড়াও এক-একটি যুদ্ধাভিযানে হাজার হাজার, এমনকি লাখ লাখ, বিধর্মীকে ক্রীতদাস বানায়।

ইসলামের আবির্ভাবকালে নবি মুহাম্মদের অধীনে মাত্র কয়েক শ' যুদ্ধবাজ আরব বেদুইন নিয়ে গঠিত হানাদার জিহাদি দলটি অবশিষ্ট মানবজাতিকে বশীভূত ও ক্রীতদাসকরণের অভিপ্রায়ে নিঃশর্ত ও নিরন্তর যুদ্ধ ঘোষণা করে। বার্নার্ড লুইসের মতো যারা ভাবে যে, '*ইসলাম স্বাধীন মানুষকে ক্রীতদাসকরণ সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ বা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ*' করেছে, তাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে, ইসলাম তার জন্মলগ্নে মাত্র কয়েকশ' বেদুইন আরব লুণ্ঠনকারীর হাতে বিশ্বের সমস্ত নারী-পুরুষকে শর্তহীনভাবে বশীভূতকরণ ও ক্রীতদাসকরণের ঘোষণা দিয়েছিল। সুতরাং ক্রীতদাসকরণ সম্পর্কিত ইসলামি আইন 'দাসপ্রথাকে সীমাবদ্ধকরণ' প্রকৃতির নয়, বরং দাসপ্রথাকে যথাসম্ভব উচ্চস্তরে উন্নীত ও প্রসারিত করার স্বর্গীয় বিধান, যা মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন। এবং ইসলামের ধর্মযোদ্ধারা এ স্বর্গীয় আদেশ অত্যুচ্চ আত্মবিশ্বাস ও একাগ্রতার সাথে কার্যকর করেছে, যার সাক্ষী ইসলামের ইতিহাস নিজে। যে কোনো পরিমাপেই ইসলামে দাসপ্রথার অনুমোদন ছিল মুক্ত মানুষের আত্মমর্যাদা ও নৈতিকতার উপর চরম আঘাত।

---

[২১৮] Muhammad S (2004) *Social Justice in Islam*, Anmol Publications Pvt Ltd, New Delhi, p. 40

[২১৯] Ali SA (1891) *The Life and Teachings of Muhammed*, WH Allen, London, p. 380

[২২০] Lal (1994), p. 206

[২২১] Parwez GA (1989) *Islam, a Challenge to Religion*, Islamic Book Service, New Delhi, p. 345-46

ইসলামে ক্রীতদাসদের প্রতি মানবিক আচরণ

এটা সত্য যে, ইসলাম ক্রীতদাসদের প্রতি মানবীয় আচরণ করার জন্য মুসলিমদেরকে তাগিদ দিয়েছে। কোরানের উপরোক্ত আয়াত মুসলিমদেরকে কয়েকটি কারণে ক্রীতদাস মুক্তকরণে উৎসাহিত করেছে, যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলিমকে (বিধর্মীকে নয়) হত্যার দায়মোচনের উপায় হিসেবে। ইসলামে ক্রীতদাস মুক্তিকে দেখা হয় দয়াশীলতা বা পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে। এসব যুক্তির ভিত্তিতে ইসলামের কৈফিয়তদাতারা দাবি করে: '*এটা বলা ঠিক নয় যে, ইসলাম দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করেছে বা দাসপ্রথার জন্য ইসলাম দায়ী। বরং সত্য হলো: ইসলামই প্রথম ধর্ম, যা দাসপ্রথা বিলুপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল*' (ব্যক্তিগত যোগাযোগ)। এই শিবিরে যোগ দিয়ে পেনসিলভেইনিয়া স্টেইট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জোনাথন ব্রোকোপ লিখেছেন:

> অন্যান্য সংস্কৃতি ক্রীতদাসের ক্ষতি করতে মালিকের অধিকার সীমাবদ্ধ করেছে, কিন্তু খুব কম সংস্কৃতিই মালিককে ক্রীতদাসের প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দেয়; আর ক্রীতদাসরা যে সমাজের দুর্বল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা সুরক্ষা পাওয়ার দাবিদার – এরূপ বিধান কোরানের বাইরে কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব, কোরানের অনন্য অবদান পাওয়া যায় সমাজে ক্রীতদাসদের অবস্থান ও ক্রীতদাসদের প্রতি সমাজের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের মধ্যে, যা সে সময়ে ছিল সম্ভবত ক্রীতদাস প্রথার *সবচেয়ে প্রগতিশীল বিধান*।[২২২]

ক্রীতদাসদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাদেরকে মুক্ত করার বিষয়ে ইসলামের নির্দেশে নতুন কিছু নেই। উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর আগে বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদেরকে ক্রীতদাসদের প্রতি ভাল আচরণ করতে ও তাদেরকে দিয়ে অতিরিক্ত কাজ না করাতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এথেন্সে গ্রিক রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক সংস্কারক সোলোন (আনুমানিক ৬৩৮-৫৫৮ খ্রি. পূ.) ঋণের কারণে ক্রীতদাসকরণ চর্চা বিলুপ্ত করে অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন, যখন ঋণগ্রস্ততার জন্য ঋণীকে ক্রীতদাস করা ছিল ক্রীতদাসের বড় উৎস।

ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর আগে গ্রিসে দাসমুক্তির চর্চা প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দ ও তার পরবর্তীকালের পাথরে খোদাইকৃত লিখনে ক্রীতদাস মুক্তির প্রমাণ রয়েছে গ্রিসে। তৎকালে সম্ভবত স্বেচ্ছাকৃতভাবে দাস মুক্ত করতো মালিকরা (প্রধানত পুরুষ মালিক; হেলেনিক যুগ থেকে নারী মালিকও)। স্বাধীনতার বিনিময়পণ স্বরূপ ক্রীতদাসরা তাদের সঞ্চয় ব্যবহার করতে পারতো, অথবা বন্ধু কিংবা মালিকের নিকট থেকে ঋণ নিতে পারতো।[২২৩]

সুতরাং ইসলামে নির্দেশিত ক্রীতদাসদের সাথে ভাল আচরণ করা বা তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়ে কোনো নতুনত্ব নেই। হাজার বছর আগে গ্রিসে এরূপ মহানুভবতার চর্চা ছিল। ইসলামের প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে সোলোন এথেন্সে ক্রীতদাসকরণের সবচেয়ে বড় উপায়টি নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমনকি আরবাঞ্চলেও মুহাম্মদের জীবনকালে বা তার আগে ক্রীতদাস মুক্ত করার চর্চা অনুপস্থিত ছিল না, নিম্নোক্ত হাদিসটি যার প্রমাণ বহন করে (বোখারী ৩:৪৬:৭১৫):

> হিসাম জানান: আমার পিতা আমাকে বলেন যে, হাকিম বিন হিজাম ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার (জাহেলিয়া) যুগে একশ' ক্রীতদাস মুক্ত করেছিল এবং একশ' উট জবাই করেছিল (সেগুলোর মাংস সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে)। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি পুনরায় একশ' উট জবাই করেন ও একশ' ক্রীতদাসকে মুক্তি দেন। হাকিম বলেন, আমি আল্লাহর নবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, '*হে আল্লাহর নবি, আমি অজ্ঞতার যুগে যেসব ভাল কাজ করতাম, আমার বিবেচনায় তখন তা সঠিক ছিল, সেগুলোর কী হবে বলে আপনি মনে করেন?*' আল্লাহর নবি জবাব দেন, '*তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো তোমার সেসব ভাল কাজগুলো সঙ্গে নিয়েই।*'

কাজেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বেও সপ্তম শতাব্দীর আরব সমাজে ক্রীতদাসদের প্রতি ভাল আচরণ ও ক্রীতদাস মুক্ত করার প্রচলন অবশ্যই ছিল। মুহাম্মদ নিজেও ইসলাম প্রচার শুরু করার ১৫ বছর পূর্বে পৌত্তলিক থাকাকালীন তাঁর একমাত্র ক্রীতদাস জায়েদকে মুক্ত করে দেন; এমনকি তিনি জায়েদকে পোষ্যপুত্র হিসেবেও গ্রহণ করেন। পৌত্তলিক মুহাম্মদের এ বদান্যতা ও মনুষ্যোচিত আচরণ স্পষ্টতই ইসলামপূর্ব আরব সমাজে বিদ্যমান প্রথা ও সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। সুতরাং দাসপ্রথায় ইসলাম বা মুহাম্মদ নতুন কোনো মানবিক বিষয় সংযোজন করেনি।

ইসলাম দাসপ্রথার প্রসার ঘটায়

ইসলাম দাসপ্রথার প্রবর্তন করেনি, বরং বহুকাল ধরে প্রচলিত প্রথাকে প্রসারিত হস্তে আলিঙ্গন করে একে অনন্তকালের জন্য স্বর্গীয় বৈধতা প্রদান করে এবং এর চর্চাকে নজিরবিহীন মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। ইসলাম দাসপ্রথার দরজা বন্ধ করে কিংবা এর অবলুপ্তিতে প্রথম পদক্ষেপ নেয়, এমন দাবি উত্থাপন করা নিতান্তই ভিত্তিহীন প্রয়াস। কোরানে আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে তাঁর স্বর্গীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বারংবার দাসপ্রথার অনুমোদন ব্যক্ত করেছেন। ইসলামের বিধানে বিশ্বে যতদিন মানবজাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন দাসপ্রথা চলতে থাকবে। শুধু তাই নয়, ইসলাম তার জন্মলগ্নেই দাসপ্রথা চর্চা প্রসারিত করেছিল, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আরো জঘন্য অবস্থায় উপনীত হয়।

নবি মুহাম্মদ বানু কোরাইজা, খাইবার ও বানু মুস্তালিক (বোখারী ৩:৩৬:৭১৭) গোত্রের পুরুষদেরকে নিধন করার পর তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস বানিয়েছিলেন। যতদিন পর্যন্ত না পশ্চিমা'রা দাসপ্রথায় নিজস্ব সম্পৃক্ততা ছিন্ন করে মুসলিমদের রাগ, হতাশা, এমনকি

---

[২২২] Brockopp JE (2005) *Slaves and Slavery,* in *The Encyclopedia of the Qur' an,* McAuliffe JD et al. ed., EJ Brill, Leiden, Vol. 5, p. 56-60

[২২৩] *Slavery in Ancient Greece*, Wikipedia, http://en.wikipedia. org/wiki/Slavery-in-Ancient-Greece

প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বে দাসপ্রথা চর্চা নিষিদ্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, ততদিন যুগের পর যুগ ধরে মুসলিম ধর্মযোদ্ধারা নবির এ দৃষ্টান্তকে আদর্শ কার্যপ্রণালিরূপে অব্যাহত রাখে।

নবি কীভাবে বানু কোরাইজা, মুস্তালিক ও খাইবারের ইহুদিদেরকে হত্যার পর তাদের নারী-শিশুকে ক্রীতদাস বানিয়েছিলেন, সে বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। মুহাম্মদের জীবনকালে আরব উপদ্বীপে এমন জঘন্য নিষ্ঠুরতম ও বর্বর ঘটনা আর ঘটেনি। ইসলামের ইতিহাস জানায় যে, বারাকাত নামে এক আবিসিনীয় বালিকা ছিল মুহাম্মদের পিতার একমাত্র ক্রীতদাসী; সে যুগে মক্কার বড় বড় নেতাদের ডজন ডজন ক্রীতদাস রাখার তথ্য পাওয়া যায় না। নবির প্রথম স্ত্রী খাদিজার বড় ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও জায়েদ ছিল তার একমাত্র ক্রীতদাস, বিয়ের পর যাকে তিনি উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন মুহাম্মদকে। তখনো পৌত্তলিক মুহাম্মদ জায়েদের ক্রীতদাসত্ব মোচন করে দিয়ে তাকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

পৌত্তলিক জীবনের পরবর্তী ১৫ বছর মুহাম্মদের কোনোই ক্রীতদাস ছিল না। অথচ গিয়াসউদ্দিন মোহাম্মদ খোন্দামিরের ‘রাউজাত-উস-সাফা’র তালিকা অনুযায়ী, মুসলিম ও ইসলামের নবিরূপে জীবনের পরবর্তী ২৩ বছরে মুহাম্মদ ৫৯ জন ক্রীতদাস ও ৩৮ জন চাকরের মালিক হন। মুহাম্মদের অন্তরঙ্গ সাহাবা জুবায়ের মৃত্যুর সময় ১,০০০ ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন।[২২৪]

পৌত্তলিক অবস্থায় মুহাম্মদ ও সম্ভবত জুবায়ের কোনো ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন না। কিন্তু ইসলামে প্রবেশের পর তাঁরা গণ্ডা-গণ্ডা থেকে হাজার সংখ্যক ক্রীতদাসের মালিক হন। এসব উদাহরণ এটা স্পষ্ট করে তোলে যে, দাসপ্রথা বিলুপ্তির পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে ইসলামের নবি ও অন্তরঙ্গ সাথীরা নিজেরাই আরবে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় দাসপ্রথাকে উন্নীত করেছিলেন। ব্যাপকহারে ক্রীতদাস আটকের জন্য ইসলাম একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বর্বর পন্থারও সূচনা করে, অবশ্য স্বর্গীয় অনুমোদনের ছত্রছায়ায়, যেরূপ ঘটনা ইসলামপূর্ব তৎকালীন আরবে দেখা যায়নি।

দাসপ্রথা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ

ইসলামে দাসপ্রথা চর্চার ব্যাপক অস্তিত্বের অস্বীকৃতি এবং দাসপ্রথা বিলুপ্তিতে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি সত্ত্বেও, ইসলামে দাসপ্রথা তর্কাতীতভাবে স্বর্গীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত একটি প্রথা, যা মানবজাতি অবলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকবে। ইসলামি মতবাদ অনুযায়ী, দাসপ্রথা আল্লাহর অনন্তকালীন পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যা মানবজাতির প্রতি তার স্বর্গীয় অনুকম্পা। ইসলামি আইনের সকল শাখা, শরীয়ত ও গোটা ইতিহাসব্যাপী সকল ইসলামি পণ্ডিত দ্ব্যর্থহীনভাবে গর্বের সঙ্গে দাসপ্রথাকে ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণ ও প্রচার করে গেছেন। মুসলিমরা যখন আফ্রিকাকে ক্রীতদাস শিকার ও প্রজননের খামারে রূপান্তরিত করেছিল, তখন বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন বিধর্মীদেরকে এরূপে ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণকে উল্লসিতচিত্তে গ্রহণ করেন। লুইস লিখেছেন: ক্রীতদাস প্রথার চর্চায় ‘*মুসলিমরা ধর্মীয় গ্রন্থ, আইন (শরীয়ত) ও ঐতিহ্য (সুন্নত) দ্বারা অনুমোদিত একটা বিধান প্রতিপালন করছিল; এবং এটা তাদের দৃষ্টিতে এমন একটি বিধান ছিল, যা মুসলিম জীবনের সামাজিক অবকাঠামো রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল।*’[২২৫] হিউজেস যথার্থই বলেন: ‘*(ইসলামে) বিবাহ আইন, বিক্রয় আইন ও উত্তরাধিকার আইনের সঙ্গে দাসপ্রথা পরস্পর বিজড়িত এবং এর বিলুপ্তি মুহাম্মদী বা ইসলামি বিধানের একেবারে গোড়ায় আঘাত হানবে।*’[২২৬]

মুসলিমদের দ্বারা আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদেরকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণকে ইবনে খালদুন ন্যায়সঙ্গত ভাবতেন, কেননা, তার মতে, ‘*তাদের প্রকৃতি ছিল অনেকটা বোবা পশুর মতো।*’[২২৭] মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখায় ক্রীতদাসকরণ, বিশেষত তথাকথিত বর্বর কৃষ্ণাঙ্গদেরকে, একটা গর্বের বিষয় হয়ে উঠে। তারা এটাকে একটা মহানুভবতার কাজ বলেও মনে করতো, যা সেসব অসভ্য মানুষগুলোকে তাদের বর্বর প্রকৃতি ও পাপপূর্ণ ধর্ম থেকে মুক্ত করে ইসলামের সত্য-ধর্মে ও সুসভ্য জগতে আনয়ন করতো। ধার্মিক ইসলামি চিন্তাবিদদের এরূপ চিন্তা-চেতনা সম্বন্ধে আর্নল্ড লিখেছেন: ‘*...ধার্মিক মন ক্রীতদাসকরণকে ঈশ্বর-কর্তৃক তাদেরকে ধর্মের পথে পরিচালনারূপে দেখে।*’[২২৮]

নীল নদের উজানের দেশগুলো থেকে নিগ্রোদেরকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাস বানিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হতো। তাদেরকে গণহারে খোজা করে দূর-দেশে স্থানান্তর করা হতো, এবং সে প্রক্রিয়ায় তাদের অধিকাংশই (৮০-৯০ শতাংশ) প্রাণ হারাতো। আটলান্টিক পার হয়ে যাদেরকে নতুন বিশ্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রে ‘*উপকূলের কেন্দ্রগুলোতে নিয়ে যাবার পথে, সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার পূর্বে অপেক্ষার সময় ও আমেরিকায় যাওয়ার পথে সমুদ্রে ৩০-৫০ শতাংশ প্রাণ হারায়।*’ ইউরোপীয় বণিকদের হাতে পরার পর, নতুন বিশ্বে গমনকারী ক্রীতদাসদের মাঝে মৃত্যুর হার ছিল ১০ শতাংশের মতো।[২২৯]

ইসলামি চিন্তা-চেতনায় বিপুলহারে বন্দিদের এ দুঃখজনক মৃত্যু বা ধ্বংসকেও দেখা হতো মহানুভবতা ও ঈশ্বরের অনুকম্পারূপে, যে বিষয়ে আর্নল্ড লিখেছেন: ‘*তাদের আকস্মিক দুর্ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর তাদেরকে দর্শন দিয়েছেন। তারা বলতে পারে ‘এটা ছিল তাঁর অনুকম্পা’,*

---

২২৪. Lal (1994), p. 13
২২৫. Lal (1994), p. 175
২২৬. Hughes, p. 600
২২৭. Lal (1994), p. 80
২২৮. Ibid
২২৯. Curtin, in M Adas ed., p. 182

যেহেতু তারা রক্ষাকারী ধর্মে প্রবেশ করেছে।'[২৩০] আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদেরকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক ধর্মীয় মানসিকতার পশ্চিমা ইতিহাসবিদরাও মুসলিম চিন্তা-চেতনার এ সুর প্রতিধ্বনিত করেন। বার্নার্ড লুইস পশ্চিমাদের সে চেতনা তুলে ধরেন এভাবে:

> 'দাসপ্রথা মানবজাতির জন্য স্বর্গীয় আশীর্বাদ, যার মাধ্যমে পৌত্তলিক ও বর্বর মানুষরা ইসলামে ও সভ্যতায় আনীত হয়েছিল... প্রাচ্যে দাসপ্রথার চর্চা হাজার হাজার মানুষের উপর (মানবিকভাবে) উন্নতকরণমূলক প্রভাব রেখেছে; এবং এর জন্য লাখ-লাখ মানবাত্মাকে এ পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে হবে আদিম বন্যদের মতো, বন্য জানোয়ারের চেয়ে সামান্য ভাল অবস্থায় (অর্থাৎ ক্রীতদাস হিসেবে)। এটা অন্তত তাদেরকে মানুষে পরিণত করেছে, অর্থপূর্ণ মানুষও।'[২৩১]

এরূপ স্বর্গীয় অনুমোদন, প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রেরণা, কৃষ্ণাঙ্গদেরকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণে আফ্রিকার আরব মুসলিমদেরকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, '*তারা নিজেদেরকে পুরোপুরি বাণিজ্যে ও ক্রীতদাস শিকারে উৎসর্গ করেছিল*', এবং এজন্য জনগণ তাদেরকে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরূপে ঘৃণা ও ভয় করতো, লিখেছেন আর্নল্ড।[২৩২] ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরক্কোতে সুলতান মৌলে ইসমাইলের (মৃত্যু ১৭২৭) ক্রীতদাস উৎপাদনের খামার ছিল। আফ্রিকার সুদান অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস উৎপাদনের খামার বিদ্যমান থাকে উনবিংশ শতাব্দীতেও। কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস বিক্রির জন্য গরু-ভেড়ার মতো সেসব খামারে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের জন্ম দেওয়া হতো। গোরী শাসক আবু আল-হারিথ মোহাম্মদ ইবনে আহমদের জন্য ৯৮২ সালে লিখিত পারস্য ভৌগলিক পাণ্ডুলিপি 'হুদুদ-আল-আলম' সুদান সম্পর্কে লিখেছে: '*এর চেয়ে কোনো অঞ্চল অধিক জনবহুল ছিল না। ব্যবসায়ীরা সেখানে শিশুদের চুরি করে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। তারা তাদেরকে খোজা করে মিশরে নিয়ে বিক্রি করতো।*' দাসপ্রথা এমন এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যে, উক্ত দলিলে লিখিত আছে, '*তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা একে অপরের সন্তানকে চুরি করতো এবং দাসব্যবসায়ীরা এলে তাদের কাছে বিক্রি করে দিতো।*'[২৩৩]

মুসলিমরা আফ্রিকার সমাজে দাসপ্রথাকে এমন গভীর ও ব্যাপকভাবে বিজড়িত করে দিয়েছিল যে, ইউরোপীয়রা, বিশেষ করে ইউরোপীয় মিশনারিরা, তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে ক্রীতদাসরা তাদের ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নেয়ার ঝুঁকি বা পরীক্ষা গ্রহণের চেয়ে পূর্বতন মালিকের অধীনে থেকে যাওয়াই শ্রেয় মনে করতো। মধ্য-আফ্রিকায় ব্রিটিশদের প্রথম তিন বছরের শাসনের উপর এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়: দাসব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে '*শ্বেতাঙ্গদের কাছে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ধরণের সভ্যতার মতো, যা নিগ্রো মানসিকতায় গ্রহণ করে নেওয়া অনেক সহজ।*'[২৩৪] আফ্রিকায় ক্রীতদাসকরণ এমন ব্যাপকতর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, বি. ডি. ডেভিস দু:খ করে বলেন: '*আফ্রিকা শব্দটি দাসপ্রথার সমার্থক হয়ে উঠেছিল, যার কারণে বিশ্ব তাতার ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলীয় অন্যান্য মুসলিমদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ ইউক্রেনীয়, জর্জীয়, সার্কাসীয়, আর্মেনীয়, বুলগেরীয়, স্লাভ ও তুর্কি জনগণকে বিক্রির বিষয়টি বেমালুম ভুলে যায়।*'[২৩৫] দশম শতাব্দীতে ভলগা তীরের বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে মুসলিম ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে চাহিদার ও মূল্যবান যে পণ্যটি আমদানি করতো তা ছিল শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস, যাদেরকে কেনা হতো সাধারণত ভাইকিংদের কাছ থেকে।

ইসলামি দাসপ্রথার বিশেষ নিষ্ঠুরতা

ইসলামি দাসপ্রথার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও নির্মম দিকটি ছিল পুরুষ বন্দিদেরকে খোজাকরণ। আফ্রিকায় বন্দিকৃত অধিকাংশ ক্রীতদাসকে মুসলিম বিশ্বে বিক্রির আগে পুরুষত্বহীন করা হতো। ভারতেও মুসলিম শাসনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষ বন্দিদেরকে ব্যাপকহারে খোজা করা হয়েছিল, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এমনকি শীর্ষ জেনারেল বা সেনাপতি, যেমন মালিক কাফুর এবং খসরু খানও ছিলেন খোজা। এটা প্রমাণ করে যে, ভারতেও খোজাকরণ ঘটতো ব্যাপক মাত্রায়। ইউরোপীয় ক্রীতদাসদেরকেও ব্যাপকহারে খোজা করা হতো।

স্পষ্টত খোজাকরণের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর দিকটি ছিল পুরুষের সবচেয়ে মৌলিক পরিচয় ও সম্পদ – অর্থাৎ তার পুরুষত্ব – হরণ করা, যা নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল। অথচ খোজাকরণ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় নির্মমতা ছিল, অপারেশনের সময় ব্যাপক সংখ্যায় ক্রীতদাসদের মৃত্যু। কোয়েনরাড এলস্ট জানান: '*বাস্তবিকপক্ষে ইসলামি সভ্যতা নজিরবিহীন মাত্রায় খোজাকরণ চর্চা করেছিল। আফ্রিকার বেশ কয়েকটি নগরী ছিল খোজাকরণের কারখানা। তারা ছিল খুব দামি পণ্য, কেননা অপারেশনের পর শতকরা মাত্র ২৫ জন বেঁচে থাকতো।*'[২৩৬] অধিকন্তু মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, কখনো কখনো হাজার মাইল দূরত্বে, স্থানান্তরের সময় পথিমধ্যে প্রাণ হারায় বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস। এটা নিঃসন্দেহে ছিল ইসলামি ক্রীতদাসপ্রথা চর্চার আরেকটি বড় নির্মমতা। ক্রীতদাস ধরা বা শিকারের সময়ও বহু লোক প্রাণ হারাতো বা আহত হতো। কমান্ডার ভি. এল. ক্যামেরন লিখেছেন, মধ্য আফ্রিকায় ইসলামি ক্রীতদাস-শিকারিরা পিছে ফেলে রেখে যেত:

---

২৩০. Arnold TW (1999) *The Preaching of Islam*, Kitab Bhavan, Delhi, p. 416-17
২৩১. Lal (1994), p. 60
২৩২. Arnold, p. 172-73, 345-46
২৩৩. Lal (1994), p. 133
২৩৪. Gann, In MA Klein & GW Johnson eds., p. 196
২৩৫. Lal (1994), p. 61
২৩৬. Elst K (1993) *Indigenous Indians: Agastya to Ambedkar*, Voice of India, New Delhi, p. 375

ভস্মীভূত গ্রাম, মানুষের লাশ ও শস্যের ধ্বংসচিত্র। এসব হামলায় জীবনহানি হতো অগণ্য, যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা প্রদান করা অসম্ভব। ব্রিটিশ অনুসন্ধানী বার্টন হিসাব করেছেন যে, তার দেখা এক বহরের পঞ্চান্ন জন নারীকে ধরার জন্য ব্যবসায়ীরা কমপক্ষে দশটি গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছিল, যার প্রত্যক গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল একশ' থেকে দুইশ'। তাদের অধিকাংশই আক্রমণে ধ্বংস হয়, অথবা দুর্ভিক্ষে মারা যায়।[২৩৭]

ক্রীতদাসদের মৃত্যুর ব্যাপকতা সম্বন্ধে সিগল লিখেছেন:

ইসলামি কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস-বাণিজ্যের গাণিতিক হিসাব সংগ্রহ, গুদামজাত ও স্থানান্তরকালে নিধনকৃত বা হারানো সেসব নারী-পুরুষ ও শিশুদের জীবনকে উপেক্ষা করতে পারবে না। উনবিংশ শতকের শেষ দিকের এক লেখক মনে করেন যে, দাসত্বের জন্য একজন বন্দির পিছনে জনসংখ্যার দশটি জীবনের হানি হয়ে থাকতে পারে – যার মধ্যে ছিল গ্রামগুলোতে হামলায় প্রতিরোধকারীদের মৃত্যু, তৎসম্পৃক্ত দুর্ভিক্ষে নারী-শিশুদের মৃত্যু, এবং শিশু, বৃদ্ধ ও দুস্থদের আটককারীদের সাথে সমতালে চলতে অক্ষমতার কারণে মৃত্যু, অথবা বৈরী অবস্থার মুখে পথিমধ্যে মৃত্যু, কিংবা চরমতম দুর্দশায় পতিত হয়ে মৃত্যু।[২৩৮]

সিগল ক্রীতদাসদের স্থানান্তরকালে ব্যাপক প্রাণহানির বেশ কিছু ঘটনা সংগ্রহ করেছেন:[২৩৯] *অনুসন্ধানী হেনরিখ বার্থ লিখেছেন, তার বন্ধু বরনুর উজির বশিরের এক ক্রীতদাস-বহর হজ্ব মৌসুমে মক্কায় যাবার পথে পর্বতের ভয়ানক ঠাণ্ডায় পতিত হলে এক রাতেই বহরটির চল্লিশ জন প্রাণ হারায়; জনৈক ব্রিটিশ অনুসন্ধানী ১০০টি মানব কঙ্কাল দেখতে পান যারা ত্রিপোলি যাওয়ার পথে একটা ক্রীতদাস-বহর থেকে মারা গিয়েছিল। ব্রিটিশ অনুসন্ধানী রিচার্ড ল্যান্ডার পশ্চিম আফ্রিকায় ৩০ জনের একদল ক্রীতদাসকে দেখতে পান, যারা সবাই গুটি-বসন্তে আক্রান্ত এবং গরুর চামড়া-পাকানো ফিতায় তাদের সবার গলা একে অপরের সঙ্গে বাঁধা; পূর্ব-আফ্রিকা উপকূলের একটি ক্রীতদাসবাহী বহরের ৩,০০০ ক্রীতদাসের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই মরে যায় দুর্ভিক্ষে, রোগে ও খুন হয়ে; নুবিয়ার মরুভূমিতে ২,০০০ ক্রীতাদাসবাহী একটি বহরের সবাই মৃত্যুবরণ করে।*

বিভিন্ন হিসাব মতে মুসলিমরা আফ্রিকায় ১ কোটি ১০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ২০ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষ-শিশুকে ক্রীতদাস করেছিল। ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ক্রীতদাস যেহেতু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই প্রাণ হারায়, সুতরাং এটা কল্পনা করা কঠিন নয় যে, বর্বর ইসলামি দাসপ্রথা চর্চার কারণে কী বিপুল সংখ্যক নিষ্পাপ মানবজীবনকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। রোনাল্ড সিগল ইসলামের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও ক্রীতদাসকৃত কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা প্রায় ১১ মিলিয়ন বলে উল্লেখ করেন এবং সেই সাথে মোট ৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ মুসলিম ক্রীতদাস-শিকারি ও ব্যবসায়ীদের হাতে মৃত্যুবরণ করে, বা মুসলিম বিশ্বে ক্রীতদাসরূপে জীবনপাত করে। উপস্থাপিত এ তথ্য অনুযায়ী, নিঃসন্দেহে ইসলামি দাসপ্রথার চর্চা মানবজাতির উপর নেমে আসা বৃহত্তম ট্রাজেডি বা নির্মম ঘটনাগুলোর একটি।

দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণ ও ইসলামি প্রতিরোধ

ইসলামে দাসপ্রথা স্পষ্টতই স্বর্গীয়ভাবে অনুমোদিত একটি রীতি বা প্রতিষ্ঠান। সর্বকালে এর চর্চা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর তাত্ত্বিকভাবে ন্যস্ত। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণের প্রচারণা স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম বিশ্বে প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হয়; এমনকি আজ অবধি মুসলিম বিশ্বে দাসপ্রথা উচ্ছেদ-অভিযান পুরোপুরি সফল হয়নি। দাসপ্রথা এখনো কোনো না কোনো আকারে মৌরিতানিয়া, সুদান ও সৌদি আরবে চলমান।

ইউরোপীয় জাতিগুলো ১৮১৫ সালে দাস-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করেছে। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশরা দাসপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়। অথচ একই শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্ব এ পেশাকে অব্যাহত রেখে আফ্রিকায় প্রায় ২০ লাখ কৃষ্ণাঙ্গকে ক্রীতদাস করে এবং সে প্রক্রিয়ায় সম্ভবত ৮০ লাখ জীবন ধ্বংস হয়। মুসলিম বিশ্বে দাসপ্রথা বন্ধ করণে পশ্চিমা দেশগুলোর সক্রিয় প্রচেষ্টা সত্ত্বে সেটা ঘটে। ১৭৫৭ সাল থেকে ভারত যখন ধীরে ধীরে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, তখন মুসলিমদের দ্বারা ভারতীয় বিধর্মীদেরকে ক্রীতদাসকরণ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি শুরু হয়। ১৮৪৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করতঃ 'ইন্ডিয়ান শ্লেইভারি অ্যাক্ট ৫' পাস করলে ভারতে দাসপ্রথা পরিশেষে বিলুপ্ত হয়। এ বিলটি পাসের প্রাক্কালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে মালিকরা ২,০০০ করে ক্রীতদাস রাখছিল।[২৪০]

পশ্চিমা শাসনের আওতার বাইরে থাকা আফগানিস্তানে তখনো বিধর্মীদেরকে ব্যাপকহারে ক্রীতদাসকরণ চলছিল। আলেক্সান্ডার গার্ডনার, যিনি ১৮১৯ সাল থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত মধ্য-এশিয়ার সর্বত্র ভ্রমণ করেন, তিনি আফগানিস্তানের 'কাফিরিস্তান' প্রদেশে তখনো চলমান ক্রীতদাস-শিকার ও দাস-ব্যবসার এক প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি দেখেন: কুন্দুজের সুলতান বল্‌খ ও বোখারার বাজারগুলোতে ক্রীতদাস সরবরাহের জন্য অবিরাম হামলা, লুটতরাজ ও ক্রীতদাস আটক কর্মকাণ্ড চালিয়ে কাফিরিস্তানকে '*দারিদ্র্য ও দুর্দশার চরমে নিয়ে ঠেকিয়েছেন।*' গার্ডনার আরো লিখেন: '*সেখানে এ চরম দুর্দশার মূলে ছিলেন কুন্দুজ-প্রধান, যিনি তার বিপর্যস্ত প্রজাদের লুণ্ঠন করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না; প্রতিবছর দেশটিতে অক্সাসের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালাতেন এবং 'চাপ্পাও' বা রাত্রিকালীন হামলায় তার সেনারা যাদেরকেই পারতো*

---

২৩৭. Cameron CVL (1877) *Accross Africa*, Dalty, Isbister & Co., London, Vol. II, p. 137-38

২৩৮. Segal, p. 62

২৩৯. Ibid, p. 63-64

২৪০. Moreland (1995), p. 90

ধরে নিয়ে আসতো। ধৃতদের মধ্যে থেকে সুলতান ও তার আমাত্যবর্গ সবচেয়ে ভালগুলোকে বেছে নেওয়ার পর বাকিদেরকে তুর্কিস্তানের বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রয় করা হতো।'[২৪১.]

উনবিংশ শতাব্দে ইসলামের কেন্দ্রস্থল মক্কায় এমন কোনো পরিবার ছিল না, যারা উপপত্নীসহ ক্রীতদাসের মালিক ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৮৭০-৮০'র দশকে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মুসলিম-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জনসংখ্যার ৬ শতাংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ ছিল ক্রীতদাস।

উত্তর আফ্রিকায় ইসলামি দাসত্বের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সংগ্রাম

১৫৩০-এর দশক থেকে শুরু করে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত বার্বারি উত্তর আফ্রিকার জলদস্যুরা ইউরোপীয় জাহাজ এবং দ্বীপ ও উপকূলের গ্রামগুলো থেকে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস ধরা অব্যাহত রাখে। তাদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর মার্কিন জাহাজ এবং তাদের কর্মচারীরাও বার্বারি জলদস্যুদের শিকার হয়ে ক্রীতদাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়। এ পর্বে উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে ক্রীতদাসকরণের বিরুদ্ধে দেশ দু'টির সংগ্রামের উপর আলোকপাত করা হবে।

ব্রিটিশ সংগ্রাম

১৬২০ সালের দিকে উত্তর আফ্রিকায় ক্রীতদাস হিসেবে ধৃত ব্রিটিশ নাবিকদের প্রায় ২,০০০ স্ত্রী সেখানে তাদের স্বামীদের দীর্ঘদিন ধরে চলা চরম দুর্দশা এবং নিষ্ঠুরতম বন্দি ও দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত করতে সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্য হাতে হাত মিলিয়ে এক জোরালো সংগ্রাম শুরু করে। তারা সরকারকে জানায়, তাদের স্বামীদের অনুপস্থিতির কারণে তাদেরকে এমন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাতে হচ্ছে যে, তাদের নিরীহ গরিব শিশুরা খাদ্যাভাবে ও বাঁচার অন্যান্য উপকরণের অভাবে নিশ্চিত মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে।[২৪২.]

প্রায় এক শতাব্দী যাবত তাদের জাহাজ, বন্দর ও গ্রামগুলো উত্তর আফ্রিকার বার্বার জলদস্যুদের হাতে বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনের রাজা প্রথম চার্লস ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই এ বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি তরুণ পর্যটক জন হ্যারিসনকে উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন ব্রিটিশ বন্দিদেরকে মুক্ত ও ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজ আক্রমণের বিরুদ্ধে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করতে। রাজা কুটিল, চতুর ও ধূর্ত সুলতান মৌলে জিদানকে সম্বোধন করে একটা চিঠিও দেন। কিন্তু মৌলে জিদানের সাথে আলোচনায় কোনো ফল না পাওয়ার সম্ভাবনায় তিনি হ্যারিসনকে এ পরামর্শও দেন যে, তিনি জলদস্যু বন্দর 'সালে'র দস্যু-নেতা, যিনি মাঝে মাঝে সুলতানকে অগ্রাহ্য করতেন, তার সাথে সরাসরি আলোচনা করলে ভাল ফল পেতে পারেন।

জন হ্যারিসন সালে'র জলদস্যুদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৬২৫ সালের গ্রীষ্মে খালি পায়ে এক মুসলিম তাপসের ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রীর পোশাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাধ্য যাত্রায় নেমে পড়েন। সালে'তে পৌঁছানোর পর তিনি শহরের ক্রীতদাস-শিকারিদের ধর্মীয় নেতা সিদি মোহাম্মদ এল-আইয়াকির সঙ্গে যোগাযাগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। সিদি মোহাম্মদ ছিলেন এক কৌশলী আধ্যাত্মসাধক (মারাবোত বা সুফি সাধক), যিনি নিজে ৭,৬০০ খ্রিষ্টান হত্যার কারণ ছিলেন বলে গর্ব করতেন। তিনি ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত করে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, যদি স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে হামলায় ব্রিটেন তাকে সহযোগিতা করতে রাজী হয়। তিনি ভারী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহেরও দাবি করেন, যার মধ্যে ছিল ১৪টি কামান এবং প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক ও গোলার দাবি। তিনি তার কিছু অকেজো কামান ইংল্যান্ডে নিয়ে মেরামত করে দেওয়ার কথাও বলেন। হ্যারিসন ব্রিটেনের রাজা ও তার গুপ্ত কাউন্সিলের সাথে এসব শর্ত নিয়ে আলোচনার জন্য লন্ডনে ফিরে আসেন। হ্যারিসন সিদি মোহাম্মদের দাবির চেয়ে কিছু কম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুনরায় সালেতে ফিরে স্পেনীয়দের উপর আক্রমণে তাকে সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। ফলে সিদি মোহাম্মদ তার গোপন কুঠুরি থেকে ১৯০ জন ব্রিটিশ বন্দিকে মুক্ত করে দেন, যদিও হ্যারিসন তার কাছ থেকে ২,০০০ বন্দির মুক্তি আশা করছিলেন। পরে হ্যারিসন বুঝতে পারেন যে, সেখানে বন্দিকৃতদের অনেকেই প্লেগে মারা গেছে এবং বাকিদেরকে সুলতানের নিকট কিংবা উত্তর আফ্রিকার অন্যত্র বিক্রি করা হয়েছে।[২৪৩.]

১৬২৭ সালের গ্রীষ্মে জন হ্যারিসন মুক্ত বন্দিদের নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। উত্তর আফ্রিকায় কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি মোট আটবার সুলতান মৌলে আব্দুল্লাহ মালেকের (রা. ১৬২৭-৩১) দরবারে যান, কিন্তু সুলতানের প্রাসাদে আটককৃত ব্রিটিশ ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হন। ওদিকে সিদি মোহাম্মদ অবশ্য কিছুদিন পরই চুক্তি ভেঙ্গে ফেলেন, কেননা ক্রীতদাস শিকারের উপর চরমভাবে নির্ভরশীল তার দস্যুরা বুঝায় যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের চাহিদার চেয়ে কম অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে এবং স্পেনীয়দের উপর আক্রমণে এগিয়ে আসছে না। তারা পুনরায় ব্রিটিশ জাহাজের উপর বেশ জোরেশোরে হামলা চালায় এবং শীঘ্রই ২৭ জন নারীসহ ১,২০০ ব্রিটিশ নাবিককে আটক করে।

ব্রিটিশ রাজা এতে ধৈর্যহীন হয়ে পড়েন। ১৬৩৭ সালে তিনি ক্যাপ্টেন উইলিয়াম রেইন্সবারার নেতৃত্বে ছয়টি যুদ্ধ জাহাজের একটি বহর প্রেরণ করেন জলদস্যুদের ঘাঁটি সালে'কে কামান দেগে ধুলিস্মাৎ করে দিতে। এক মাসের সমুদ্র যাত্রার পর তিনি সালে'তে পৌঁছেন, যখন জলদস্যুরা ইংল্যান্ডের উপকূলে দস্যুতা-অভিযান চালানোর জন্য তাদের জাহাজগুলোকে কেবলমাত্র প্রস্তুত করেছে। জলদস্যুদের অধীনে বিপুল

[২৪১.] Lal (1994), p. 8
[২৪২.] Milton, p. 17
[২৪৩.] Ibid, p. 17-20

সংখ্যক জাহাজের বিশাল বহর দেখে ইংরেজ বহর হতবাক হয়ে যায়। সালে'র নতুন শাসক জলদস্যু জাহাজগুলোকে '*ইংল্যান্ডের উপকূল থেকে নারী-পুরুষ-শিশুকে বিছানা থেকে তুলে আনার*' নির্দেশ দিয়েছিল।[২৪৪.]

সামনে ভয়াবহ এক যুদ্ধ অপেক্ষমান দেখে রেইন্সবারা সালে'র আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করেন এবং জানতে পান যে, সেখানে দু'টো দলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে। এক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সিদি মোহাম্মদ এবং অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ বেন আলী এল-কাস্‌রি, যিনি সালে'র একটা অংশের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং ৩২৮ জন ব্রিটিশ নাগরিককে বন্দি করে রেখেছেন। সম্ভাব্য ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে রেইন্সবারা সালে'র দুই প্রতিদ্বন্দ্বির পারস্পারিক শত্রুতাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আব্দুল্লাহর হাতে আটক সকল ব্রিটিশ বন্দিদের মুক্তি ও সিদি মোহাম্মদের সঙ্গে একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের প্রত্যাশায় সিদি মোহাম্মদের কাছে এল-কাস্‌রির বিরুদ্ধে যৌথ-আক্রমণের প্রস্তাব করেন। বিদ্রোহী এল-কাস্‌রির ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উন্মুখ সিদি মোহাম্মদ এ প্রস্তাবে রাজি হন। রেইন্সবারা এল-কাস্‌রির ঘাঁটিতে ঝর্ণার মতো ভারী কামান নিক্ষেপ শুরু করেন। ফলে কাস্‌রির প্রায় সবকিছু ধ্বংস হয় ও বহুলোক হতাহত হয়। অতঃপর রেইন্সবারা তার কামান জলদস্যুদের জাহাজগুলোর দিকে তাক করে কাস্‌রির অনেকগুলো জাহাজ ডুবিয়ে দেন। ইতিমধ্যে সিদি মোহাম্মদ তার ২০,০০০ হাজার যোদ্ধা নিয়ে কাস্‌রির ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করে। তিন সপ্তাহ কামান-গোলা বর্ষণের পর এল-কাস্‌রিসহ বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে এবং ব্রিটিশ বন্দিদেরকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়। এভাবে এল-কাস্‌রির বিদ্রোহ-ঘাঁটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এবং সিদি মোহাম্মদের নিকট থেকে ইংলিশ জাহাজ ও গ্রামগুলোতে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার পেয়ে রেইন্সবারা ১৬৩৭ সালের শুরুতে মুক্ত করা ২৩০ জন ব্রিটিশ ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন।

ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে রেইন্সবারাকে বীরসুলভ সম্বর্ধনা জানানো হয়। সালে'র জলদস্যুদের ভীতি চিরতরে অবসান হয়েছে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় ইংল্যান্ডে। এ বিশ্বাসটা শক্ত হয় একই সময়ে মরক্কোর সুলতান মোহাম্মেদ এস-শেখ এস-শেগীরের (রা. ১৬৩৬-৫৫) সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে, যিনি তার প্রজাদেরকে ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে আটক, ক্রয় ও ক্রীতদাসরূপে রাখা নিষিদ্ধ করতে সম্মত হন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রিটিশদের এ মোহ ভেঙ্গে যায় যখন সুলতান এ অজুহাতে চুক্তিটি ছুঁড়ে ফেলে দেন যে, ব্রিটিশ সরকার মরক্কোর বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সালে'র জলদস্যুরাও তাদের আক্রমণ পুনরায় শুরু করে দেয়। ১৬৪৩ সালের মধ্যে বহু ব্রিটিশ জাহাজ লুণ্ঠিত ও তাদের কর্মচারীরা বন্দি হয়। ১৬৪০-এর দশকের মধ্যে ৩,০০০ ব্রিটিশ নাগরিক বার্বার ক্রীতদাস শিকারিদের হাতে আটক হয়।[২৪৫.]

১৬৪৬ সালে ব্রিটিশ ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থসহ বণিক এডমুন্ড কেইসনকে পাঠানো হয় আলজিয়ার্সে। তিনি সেখানে ৭৫০ জন ব্রিটিশ বন্দিকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হন, যদিও এর চেয়ে বেশি সংখ্যক ব্রিটিশ বন্দিকে ইতিমধ্যে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল (যারা কখনোই মুক্তি পায়নি; ধর্মত্যাগের কারণে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছাও পোষণ করেনি)। কেইসন প্রত্যেক পুরুষ বন্দির জন্য ৩৮ পাউন্ড ও মাত্র তিনজন নারী বন্দির জন্য ৮০০, ১১০০ ও ১৩৯২ পাউন্ড প্রদান করেন। তার হাতের নগদ অর্থ ফুরিয়ে গেলে অনেক বন্দিকে পিছনে ফেলে রেখে মাত্র ২৪৪ জনকে নিয়ে দেশে ফিরেন।

এরপর থেকে বার্বারি জলদস্যুরা সাগরে তাদের ক্রীতদাস-শিকার আরো জোরদার করে। তারা সুদূর নরওয়ে ও নিউফাউল্যান্ডের জাহাজ আক্রমণের মাধ্যমে তাদের আক্রমণ কার্যক্রমের পরিসীমা বাড়িয়ে দেয়। তারা ক্রীতদাস হিসেবে রাশিয়া ও গ্রিসের নাগরিক এবং সে সাথে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদেরকেও বন্দি করতো। স্পেন ও ইতালি ছিল তাদের আক্রমণের সবচেয়ে জঘন্য শিকার, যার সাথে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পর্তুগাল হতে থাকে বড় শিকার। ১৬৭২ সালে খ্যাতনামা সুলতান মৌলে ইসমাইল ক্ষমতা সংহত করার পর তিনি ক্রীতদাস শিকারের কার্যক্রম প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেন ইউরোপীয় শাসকদেরকে অবদমিত রাখা ও তাদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে।

রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিনকে বিয়ের পর ১৬৬১ সালে পর্তুগাল ব্রিটেনের কাছে তাঞ্জিয়ার ঘাঁটিটি হস্তান্তর করে। ব্রিটিশ সরকার জিব্রাল্টার প্রণালি বরাবর অবস্থিত তাঞ্জিয়ারকে বার্বারি জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত ও নির্মূল করার জন্য ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করে। ১৬৭৭ সালে সুলতান মৌলে ইসমাইল তার ক্রীতদাস শিকারের পথ পরিষ্কার করতে তাঞ্জিয়ার ঘাঁটিটি দখলের নির্দেশ দেন। সুলতানের সেনাপতি কাইদ ওমর পাঁচ বছর ধরে ২,০০০ ব্রিটিশ সেনা অধিকৃত সে গ্যারিসন-নগরীটি অবরোধ করে রাখে কিন্তু দখল করতে ব্যর্থ হন। ১৬৭৭ সালে আরেক দফা আক্রমণে কাইদ ওমর আটজন ব্রিটিশ প্রতিরোধকারী ও পরবর্তী এক হামলায় ৫৭ জনকে আটক করতে সমর্থ হন। ১৬৮০ সালে কাইদ ওমরের বাহিনী ব্রিটিশ গ্যারিসনটি দখলের অভিপ্রায় নিয়ে আবারো জোর আক্রমণ করলে যথাসময়ে একটি ব্রিটিশ সহায্যকারী বাহিনী এসে কাইদ ওমরের বাহিনীকে চরম মার দিয়ে অবরোধ তুলে পালাতে বাধ্য করে।[২৪৬.]

এর পরপরই (ডিসেম্বর ১৬৮০) রাজা দ্বিতীয় চার্লস স্যার জেইম্‌স লেস্‌লির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন তাঞ্জিয়ার অবরোধে আটককৃত ব্রিটিশ সেনাদেরকে মুক্ত করে আনতে। লন্ডন থেকে সুলতানকে পাঠানো উপহার পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছিল দেখে, সুলতানের কাছে সে বিলম্বের খবর পৌঁছে দিতে স্যার লেস্‌লি কর্নেল পার্সি কার্ক'কে প্রেরণ করেন। কূটনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন ভীরু ও মদ্যপ কর্নেল কার্ক ভীতিকর সুলতানের দর্শন পেয়ে অভিভূত হয়ে যান। কুটিল মৌলে ইসমাইল কর্তৃক প্রদর্শিত অভিনন্দন, আতিথেয়তা ও ছলনায় মুগ্ধ কর্নেল কার্ক নিজের

২৪৪. Ibid, p. 22-23

২৪৫. Ibid, p. 23-6

২৪৬. Ibid, p. 28, 37-28

আসল ভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে নিজেই আলোচনা শুরু করে দেন। শান্তিচুক্তির কথা উপস্থাপন করলে সুলতান চার বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি পরিবর্তে দশটি বড় কামান দাবি করেন। সাদাসিদা কর্নেল তার শর্ত শুধু মেনেই নেননি, বরং '*প্রতিশ্রুতি দেন তার যা যা ঘাটতি, তা পূরণ করতে সহযোগিতা দেওয়ার।*' বার্তাবাহক হিসেবে এসে কূটনীতিকের কাজে হাত দিয়ে কর্নেল কার্ক শুধু তার ভূমিকাই ভঙ্গ করেননি, তিনি সুলতানের প্রাসাদে আটককৃত প্রায় ৩০০ ব্রিটিশ বন্দির কথা বেমালুম ভুলে যান। অথচ তার সে কূটনৈতিক সফলতায় অতি উৎফুল্ল কার্ক ইংল্যান্ডে লিখে পাঠান: '*আমি বিশ্বকে জানাতে চাই যে, আমি এক সদয় রাজা ও ন্যায়বান সেনাপতির সাক্ষাত পেয়েছি।*'[২৪৭]

অবশেষে, সুলতানের জন্য প্রেরিত উপঢৌকনসামগ্রী জিব্রাল্টারে এসে পৌঁছুলে স্যার লেস্‌লি সুলতানের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি যখন ব্রিটিশ বন্দিদেরকে মুক্তির বিষয়টি উত্থাপন করেন, তখন সে বিষয়ে আলোচনায় অনুৎসাহী সুলতান আলোচনা ত্যাগ করে তার সেনাপতি কাইদ ওমরকে একটা অস্ত্র-বিরতি স্বাক্ষরের নির্দেশ দেন। বন্দিদেরকে মুক্ত করতে অনিচ্ছুক সুলতান তাঞ্জিয়ার গ্যারিসন অবরোধকালে আটককৃত সেনাদের মধ্য থেকে ৭০ জনকে নিতান্তই নিস্পৃহভাবে মুক্ত করতে সম্মত হন। কিন্তু বিনিময়ে এমন উচ্চ-মূল্য দাবি করেন যে লেস্‌লিকে খালি হাতে দেশে ফিরতে হয়।

এরপর সুলতান ইংরেজ বন্দিদেরকে মুক্তির শর্তাবলি আলোচনার পূর্ণ-ক্ষমতা দিয়ে রাষ্ট্রদূত কাইদ মোহাম্মদ বিন হাদ্দু ওত্তার'কে লন্ডনে পাঠান। লন্ডনে সুলতানের দূত-দলকে কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আতিথেয়তায় রাখা হয়। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ব্যাপক আলোচনার পর অবশেষে একটা যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রত্যেক বন্দির মুক্তির জন্য ২০০ স্পেনীয় ডলার প্রদান করবে ব্রিটিশ সরকার এবং সুলতানের জলদস্যুরা ব্রিটিশ উপকূলের গ্রামগুলোতে হামলা বন্ধ করবে; ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজে হামলার ব্যাপারে কোনো শর্তের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু খামখেয়ালী সুলতান এ চুক্তিটি অনুমোদন না করে ব্রিটিশ রাজের চিঠির উত্তরে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি শান্ত হবেন '*তাঞ্জিয়ার দখল করে মূর'দের দিয়ে ঘাঁটিটি ভরে তোলার পরই*'। ব্রিটিশ রাজার চিঠিতে লিখা ব্রিটিশ জাহাজে আক্রমণের ব্যাপারে আলোচনার প্রশ্নে সুলতান লিখেন: '*তার কোনোই প্রয়োজন নেই আমাদের*' এবং জলদস্যুরা তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখবে। দীর্ঘদিনের আলোচনার এ ব্যর্থতায় হতাশ রাজা শেষ পর্যন্ত তাঞ্জিয়ার গ্যারিসনের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাঞ্জিয়ার ঘাঁটির মাধ্যমে মুসলিম জলদস্যুদের আক্রমণ-লুণ্ঠন থামাতে ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার পরের বছর গ্যারিসনটি খালি করে দেয়।[২৪৮] রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বাকি রাজত্বকালব্যাপী আটককৃত ব্রিটিশ নাগরিকরা সুলতান মৌলে ইসমাইলের গোপন কুঠুরিতে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে থাকে। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় চার্লস সিংহাসনে আরোহন করেই বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তান্বিত ও উৎসাহী হন। পাঁচ বছরের দীর্ঘসূত্রী আলাপ-আলোচনার পর সুলতান বন্দিদেরকে মুক্তি দিতে সম্মত হন ১৫,০০০ পাউন্ড ও ১,২০০ ব্যারেল গান-পাউডারের বিনিময়ে। মরক্কোতে মুক্তিপণ বহনকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন জর্জ ডেলাভাল লিখেন: '*গান-পাউডার দিয়ে জাহাজ এমন ভর্তি ছিল যে, তা বিস্ফোরিত হয়ে ডুবে মরার অবিরাম ভয়ে থাকতাম আমরা।*' ডেলাভালের পৌঁছানোর পর সুলতান চুক্তির শর্ত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করলে ডেলাভাল বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থ হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন। পরিশেষে সুলতান ব্রিটিশ ক্রীতদাসদের ৩০ জনকে নিজের কাছে রেখে ১৯৪ জনকে মুক্ত করেন। পরে ১৭০২ সালে রাণী অ্যান সিংহাসনে আরোহন করে কিউটায় স্পেনীয় ঘাঁটির উপর মরক্কোর আক্রমণে ব্রিটেনের সহযোগিতার আভাস দিলে সুলতান বাকি ব্রিটিশ বন্দিদেরকে হঠাৎ মুক্ত করে দেন। ১৫০ বছরের মধ্যে এই প্রথম ব্রিটিশ বন্দিশূন্য হয় মরক্কোর রাজপ্রাসাদ। এর কিছুকাল পরেই সালে'র জলদস্যুরা আক্রমণে নেমে পড়ে, স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে সুলতানের আক্রমণে যোগ দিতে রাণীর উদাসীনতা প্রদর্শনের কারণে। ফলে ব্রিটিশ বন্দিরা আবার দলে দলে আসতে শুরু করে সুলতানের রাজপ্রাসাদে।[২৪৯]

বিপুল পরিমাণ উপঢৌকনের প্রতিশ্রুতিতে সুলতান মৌলে ইসমাইল ও রাণী অ্যানের মাঝে আরো একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৭১৪ সালে। ঐ বছরের গ্রীষ্মে রাণীর মৃত্যু হওয়ায় উপঢৌকন প্রেরণে বিলম্ব হলে সুলতান তার ক্রীতদাস শিকারিদেরকে পুনরায় সমুদ্রে পাঠান। নিঃসন্তান রাণী অ্যানের মৃত্যুর পর জার্মান বংশোদ্ভূত হ্যানোভারের শাসক রাজা প্রথম জর্জকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি শুরুতে মরক্কোস্থ ব্রিটিশ বন্দিদের চরম দুর্দশার ব্যাপারে একটুও উৎসাহ দেখাননি। ১৭১৭ সালে বন্দিকৃত ব্রিটিশ নাবিকদের স্ত্রী ও বিধবারা রাজার নিকট অত্যন্ত আবেগপূর্ণ এক আবেদনে তাদের বন্দি স্বামীদের মুক্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আকুতি জানায়। তাতেও রাজা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোশেফ এডিশন এ কঠিন দায়িত্বটি নিজ কাঁধে তুলে নেন। মাত্র কয়েক মাস আগেই এডমিরাল চার্লস্‌ কর্ণওয়াল সুলতানের প্রাসাদ থেকে খালি হাতে ফিরে এসেছিলেন, কারণ সুলতান একটা স্থায়ী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর ও ব্রিটিশ বন্দিদেরকে মুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

১৭১৭ সালের মে মাসে এক দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ক্যাপ্টেন কোনিঙ্গবি নরবুরি'র নেতৃত্বে উচ্চ-পর্যায়ের এক প্রতিনিধিদলকে পাঠানো হয় মরক্কোতে। ব্রিটিশ নাবিকদেরকে অব্যাহতভাবে আটক করা ও পূর্ব-স্বাক্ষরিত সকল শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করায় ক্রুদ্ধ নরবুরি এ স্পর্শকাতর আলোচনার জন্য ছিলেন খুবই উদ্ধত, এবং সুলতানের প্রতি তিনি এক ধরনের অগ্রাহ্য ও ঘৃণার ভাব দেখান। ইংল্যান্ড থেকে আনা যথেষ্ট পরিমাণ উপঢৌকনের আশায় সুলতান মৌলে ইসমাইল প্রথম সাক্ষাতে অনেকটা বন্ধু-সুলভ মনোভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু নরবুরি সুলতানের কাছে '*ক্রীতদাসদের মুক্তি দাবি করেন এটা বলে যে, তাদেরকে মুক্ত না করলে তিনি কোনোই শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করবেন না, তাদের*

২৪৭. Ibid, p. 39-41
২৪৮. Ibid, p. 39-41
২৪৯. Ibid, p. 49-50

সমস্ত সমুদ্রবন্দর অবরোধ ও বাণিজ্য ধ্বংস করে ফেলবেন, এবং এরূপ আরো হুমকি।'[২৫০] বিদেশী প্রতিনিধিদের প্রতি অবজ্ঞামূলক ব্যবহার প্রদর্শনে অভ্যস্ত সুলতান এমন ধামকির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং নরবুরির মিশন ফলপ্রসু হয়নি। কিন্তু সুলতান মরক্কোতে একজন ব্রিটিশ কনসুল গ্রহণে রাজী হন। মার্চেন্ট এ্যান্টনি হ্যাটফিল্ডকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি বন্দিদেরকে মুক্তির জন্য কয়েক বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেও সফলতা পেতে ব্যর্থ হন।

হ্যাটফিল্ড ১৭১৭ সাল থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া জলদস্যুদের তৎপরতা সম্পর্কে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহ করে সে ব্যাপারে লন্ডনকে নিয়মিত অবহিত করেন। গোয়েন্দাদের দ্বারা বিপদ-সংকেত পেয়ে কমোডর চালর্স স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে আরেকটি কূটনৈতিক মিশন পাঠানো হয় ১৭২০ সালে। মরক্কোর খামখেয়ালী ও উদ্ধত শাসকের সাথে আলোচনার দক্ষতা ও যথার্থ কূটনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল স্টুয়ার্টের। তিনি প্রথমে উত্তর মরক্কোর তেতোয়ান প্রদেশে সুলতানের গভর্নর পাশা হ্যামেতের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অতঃপর তিনি সুলতানের দরবারে যান, যেখানে তার প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সুলতানকে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন প্রদানের বিনিময়ে। ইংল্যান্ড ও উপনিবেশিক আমেরিকার ২৯৩ জন ক্রীতদাস মুক্ত হয়।[২৫১]

এ চুক্তির পরও সুলতান ও তার দস্যুবাহিনী খুব বেশি দিন তাদের লুণ্ঠন তৎপরতা থেকে বিরত থাকেনি। ১৭২৬ সালের মধ্যে জলদস্যুরা আরো অনেক ব্রিটিশ জাহাজ লুণ্ঠন করে বন্দিদেরকে রাজধানী মেকনেসে সুলতানের প্রাসাদে প্রেরণ করে। পরের বছর (১৭২৭) সুলতান মৌলে ইসমাইল মারা গেলে দেশে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা শুরু হয়। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা চলাকালীন গুন্ডাবাহিনীর, বিশেষ করে জলদস্যুদের, তৎপরতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পেতো। এর ফলে আলজিয়ার্স, তিউনিস ও মেকনেসের ক্রীতদাস খোয়াড়গুলো বন্দিতে ভরে উঠে। ১৭৪৬ সালে 'ইনস্পেক্টর' নামক ব্রিটিশ জাহাজটি জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় এবং বেঁচে যাওয়া ৮৭ জন কর্মচারিকে বন্দি করা হয়। সে জাহাজের এক বন্দি টমাস ট্রটল লিখেছেন: *'বিরাট একটা শেকল দিয়ে আমাদের গলার চারদিক বেড় দিয়ে বাঁধা হয়; এক শেকলে কুড়ি জন করে বাঁধা হয়।'* ব্রিটিশ সরকার ১৭৫১ সালে মেকনেসের রাজপ্রাসাদ থেকে কয়েকবার বন্দিদেরকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। কিন্তু মরক্কোর সুলতান ফরাসি, স্পেনীয়, পর্তুগিজ, ইতালীয় ও ডাচ প্রভৃতি জাতীয়তার বন্দিদেরকে কম খুবই মুক্ত করতেন। অবশেষে অনেকটা মানবিক ও কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট সিদি মোহাম্মদ সিংহাসন দখল করেন ১৭৫৭ সালে। তিনি ছিলেন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিশ্বাস করতেন যে, মরক্কোর বিধ্বস্ত অর্থনীতি ভালভাবে সংস্কার জলদস্যুতা ও ক্রীতদাসত্বের উপর নির্ভর না করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে করা সম্ভব। সে মোতাবেক তিনি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকে ধ্বংস করেন। ১৭৫৭ সালে তিনি ডেনমার্কের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল ইউরোপীয় দেশের সাথে শান্তিচুক্তি করেন, যারা ইতিপূর্বে বার্বারি জলদস্যুদের শিকার হয়েছিল।[২৫২]

বহু বছর ধরে মরক্কোর উপকূলের ভয়ঙ্কর জলদস্যুতা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল, যদিও আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার জাহাজ লুণ্ঠন-কার্য অব্যাহত রাখে। ১৭৯০ সালে সুলতান সিদি মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী ও পুত্র মৌলে সোলায়মান পিতার স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো অনুমোদন করা সত্ত্বেও ইউরোপীয় জাহাজ আক্রমণে সালে'র জলদস্যুদেরকে উৎসাহিত করেন। তবে ইতিমধ্যে সালে ও উত্তর আফ্রিকার অন্যত্র বার্বার জলদস্যুদের স্বর্ণযুগের অবসানের দিন ঘনিয়ে আসছিল। ব্রিটেন ও আমেরিকা শতাব্দির পর শতাব্দিব্যাপী নিষ্ক্রিয়তা, শান্ত ও আপোষকরণ এবং মুক্তিপণ প্রদানের পরও যন্ত্রণার অবসান হচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার জলদস্যুতা চিরকালের জন্য অবসানের লক্ষ্যে সামরিক শক্তির দ্বারা পাল্টা আঘাতের সিদ্ধান্ত নেয়।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উপরে বর্ণিত বার্বার জলদস্যুতা ও ক্রীতদাসকরণের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সংগ্রাম উত্তর আফ্রিকায় তাদেরকে সামগ্রিক সংগ্রামের একটা অংশ মাত্র। ত্রিপোলি ও আলজিয়ার্সেও একই প্রকারের সংগ্রাম করতে হয়েছে তাদেরকে।

মার্কিন সংগ্রাম ও পাল্টা আক্রমণ

উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজও বার্বারি জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনের শিকার হয়। ১৬৪৬ সালে মার্কিন জাহাজ ও তার কর্মচারিরা প্রথমবারের মতো সালে'র জলদস্যুদের হাতে আটক হয়। ১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকান জাহাজ ছিল ব্রিটিশ প্রতিরক্ষাধীন। উত্তর আফ্রিকার গুপ্ত খোয়াড়গুলো থেকে ব্রিটিশ বন্দিদের মুক্তির সাথে আমেরিকান বন্দিরাও মুক্তি পেতো। ১৭৭৬ সালে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা প্রত্যাহার করা হলে মার্কিন জাহাজগুলো বার্বারি জলদসুদের সরাসরি হামলার লক্ষ্য হয়। ১৭৮৪ সালে মরক্কো ও আলজিয়ার্সের মুসলিম জলদস্যুরা তিনটি মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজ আটক করে কর্মচারিদেরকে ক্রীতদাস বানায়। দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার পর ৬০,০০০ ডলার মুক্তিপণ দিয়ে বন্দিদেরকে মুক্ত করা হয়। কিন্তু আলজিরীয় জলদস্যুরা যাদেরকে আটক করেছিল, তাদের ছিল দুর্ভাগ্য; তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল ক্রীতদাসরূপে।

এরূপ বেআইনি কর্মকাণ্ডে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ মার্কিন কূটনীতিক টমাস জেফারসন ও জন এডাম্স এ বিষয়টি আলোচনার জন্য ১৭৮৫ সালে লন্ডনে ত্রিপোলির রাষ্ট্রদূত আবদ আল-রহমানের সাথে সাক্ষাত করেন। তারা জানতে চান কোন্ অধিকারে বার্বারি রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার জাহাজে হামলা করে যাত্রী ও কর্মচারিদেরকে ক্রীতদাস বানাচ্ছে? আল-রহমান তাদেরকে জানান: "*কোরানে লেখা রয়েছে যে, মুসলিমদের কর্তৃত্ব অস্বীকারকারী সকল জাতিই পাপী; এ রকম লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও যুদ্ধে বন্দিদেরকে ক্রীতদাস বানানো মুসলিমদের ধর্মীয়*

[২৫০] Ibid, p. 116
[২৫১] Ibid, p. 172-95
[২৫২] Ibid, p. 269-70

অধিকার ও দায়িত্ব। এবং এরূপ যুদ্ধে নিহত প্রত্যেক মুসলমানই নিশ্চিত স্বর্গে প্রবেশ করবে।'[২৫৩] আক্রমণ এড়াতে রাষ্ট্রদূত আল-রহমান আনুগত্য কর দাবি করেন এবং নিজের কমিশন বা ঘুষ চান।

সে মুহূর্ত থেকেই টমাস জেফারসন ক্রীতদাসকরণের এ বর্বর কর্মকাণ্ড চিরতরে নির্মূল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রপথ নিরাপদ করতে যুদ্ধের অঙ্গীকার করেন। প্যারিসে তার কূটনৈতিক দায়িত্বে অবস্থানকালে ইউরোপীয় ও আমেরিকার বাণিজ্য-জাহাজে বার্বারি লুণ্ঠনের অবসানকল্পে একটি আমেরিকান-ইউরোপীয় নৌ-শক্তি গড়ে তোলার প্রয়াস করে ব্যর্থ হন। তিনি নিজ দেশ থেকেও এ প্রস্তাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন; জন এডামসও তার প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। অন্যদের মত এডামস ওসব নাছোরবান্দা দস্যু-যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে কর দিয়ে তাদেরকে ঠাণ্ডা করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বাণিজ্য-জাহাজ আক্রান্ত হওয়া ইউরোপীয় দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের ব্যাপারে এডামসের মতামত চাওয়া হলে তিনি জেফারসনকে লিখেন: '*ধারণাটা অতি সাহসী ও পুরোপুরি সম্মানজনক, তবে চিরদিনের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, আদৌ তাদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে পারি না আমরা।*'[২৫৪]

ইতিমধ্যে আমেরিকান জাহাজ লুণ্ঠন ও কর্মচারিদেরকে ক্রীতদাসকরণ যথারীতি চলে আসছিল অব্যাহতভাবে। ১৭৮৫ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে ১৩০ জন মার্কিন নাবিককে আটক করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কূটনীতিক জোয়েল বার্লো, যোশেফ ডোনাল্ডসন ও রিচার্ড ও'ব্রায়ানকে ১৭৯৫ সালে উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন, যারা আমেরিকার জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য কর দিতে সম্মত হয়ে আলজিয়ার্স, তিউনিস ও ত্রিপোলির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে সফল হন। আলজিয়ার্স সেখানে আটককৃত ৮৩ জন আমেরিকার নাবিককেও মুক্ত করে দেয়। জন এডামসের রাষ্ট্রপতিত্বকালেও (১৭৯৭-১৮০১) আমেরিকা কর দেওয়া অব্যাহত রাখে, যা বাড়তে বাড়তে জাতীয় বাজেটের শতকরা ১০ ভাগে পৌঁছে।

অমর্যাদাকর বশ্যতা কর প্রদান ও সে সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার গুপ্ত-খোয়াড়গুলোতে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসদের শিহরণমূলক দুর্ভোগের কাহিনীর প্রকাশ ধীরে ধীরে অবমাননাকর মুক্তিপণ প্রদানের বিরুদ্ধে ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে জনমত জোরদার করতে থাকে। ১৮০১ সালে জেফারসন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ত্রিপোলির পাশা ইউসুফ কারমানলি বশ্যতা কর দিতে বিলম্বের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দুটো মার্কিন জাহাজ আটক করে বাড়তি কর দাবি করেন। একে অনুসরণ করে অন্যান্য বার্বারি রাষ্ট্রও বাড়তি করের দাবি তোলে। জেফারসন বার্বারি রাষ্ট্রগুলোকে এভাবে অমর্যাদাকর কর প্রদানের বিরোধী ছিলেন আগা-গোড়া। ১৭৮৪ সালের প্রথম দিকে তিনি কংগ্রেসম্যান (পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ১৮১৭-২৫) জেমস্ মনরো'কে বলেছিলেন: '*একটা সমতাভিত্তিক চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া কি ভাল নয়? যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে কেন আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? যদি আমাদের নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে হয়, তাহলে আমাদের নৌশক্তিকে শক্তিশালী করতে হবে।*'[২৫৫]

১৬ বছর পূর্বের ত্রিপোলির রাষ্ট্রদূতের কথা না-ভুলা নতুন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসকে না জানিয়েই বার্বারি উত্তর আফ্রিকায় নৌবহর প্রেরণ করেন। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ত্রিপোলি ১৮০১ সালের মে মাসে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; পরের বছর মরক্কোও সে পথে অগ্রসর হয়। সংঘর্ষে অচিরেই আমেরিকা একটা বড় ধাক্কা খায়, যখন ত্রিপোলি মার্কিন ফ্রিগেট 'ফিলাডেলফিয়া' আটক করে। কিন্তু এডোয়ার্ড প্রেবল ও স্টিফেন ডেকাতুর ত্রিপোলি বন্দরের উপর এক বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়ে আটককৃত জাহাজটি ধ্বংস করে ফেলেন এবং নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেন। এ খবর ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয় ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে যে: *বিশ্বমঞ্চে নতুন এক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে।*

ইতিমধ্যে তিউনিসে আমেরিকার কনসুল ইউলিয়াম ইটন ত্রিপোলীর পাশা ইউসুফ কারমানলির নির্বাসিত ভাই হাদিম'কে ত্রিপোলির ক্ষমতায় আমেরিকার মনোনয়নের প্রস্তাব দেন। তার প্রস্তাবটি আমেরিকাতে রাজনৈতিক পর্যায়ে সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু ইটন তার সে পরিকল্পনা চালিয়ে যান। ১৮০৫ সালে তিনি নৌ-সেনাদের ছোট একটা দল ও অনিয়মিত একটি বাহিনী নিয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে মিশর থেকে ত্রিপোলিতে পাড়ি জমান। তারা দারনা নগরীর বিরাট সামরিক ঘাঁটিটির উপর আকস্মিক হানা দিয়ে গ্যারিসন নগরীটিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। পাশার বাহিনীর বিরুদ্ধে ইটনের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধটি বন্ধের লক্ষ্যে জেফারসন ও কারমানলি এক সমঝোতায় পৌঁছেন। যুদ্ধ বিরতির শর্ত হিসেবে মুক্তিপণ প্রদানের বিনিময়ে ত্রিপোলী 'ফিলাডেলফিয়া'র কর্মচারিদেরকে মুক্ত করবে, তবে ভবিষ্যতে আমেরিকা আর কখনো মুক্তিপণ প্রদান করবে না। এ চুক্তিটি স্বাক্ষরে ইটনের দুঃসাহসিক কাজ একটা বড় ভূমিকা রেখেছিল বলে জানান জেফারসন। কিন্তু দুঃসাহসী ও আপোষহীন ইটন চুক্তিটিকে আমেরিকাকে বেচে দেওয়ার সমতুল্য বলে নিন্দা করেন।

১৮১২ সালে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ অ্যাংলো-আমেরিকান বৈরিতার সুযোগ নিয়ে আলজিয়ার্সের নতুন পাশা হাজ্বী আলী ১৭৯৫ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিটিকে অপর্যাপ্ত আখ্যায়িত করে আমেরিকার কর প্রদান প্রত্যাখ্যান করেন। আলজিরীয় জলদস্যুরা আবার আমেরিকার জাহাজ আটক করা শুরু করে। 'ঘেন্ট চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যকার সংঘর্ষ শেষ হলে প্রেসিডেন্ট

---

[২৫৩] Berube CG and Rodgaard JA (2005) *A Call to the Sea: Captain Charles Stewart of the USS Constitution*, Potomac Books Inc., Dulles, p. 22

[২৫৪] Ibid.

[২৫৫] Ibid.

জেমস্ ম্যাডিসন কংগ্রেসকে আলজিয়ার্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান জানান। জলদস্যুতা সমস্যার চির-সমাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে ম্যাডিসন **১৮১৫** সালের ৩রা মার্চ আবারো স্টিফেন ডেকাতুরের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। মার্কিন বাহিনী তৎকালীন শাসক দেই ওমর পাশার নৌবহরকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে তার বিশাল পোতাশ্রয় আমেরিকার সশস্ত্র নৌবহর দিয়ে ভরে ফেলে এবং হাজার হাজার লোককে বন্দি করে। দেই ওমর আত্মসমর্পণ করেন এবং অনিচ্ছুকভাবে ডেকাতুর-নির্দেশিত শর্তের এক চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হন। চুক্তিটির শর্ত অনুযায়ী আলজিরিয়া ও মার্কিন বন্দি বিনিময় করা হবে, এবং বশ্যতাকর ও মুক্তিপণ দাবি চিরতরে বন্ধ করা হবে। সবচেয়ে শক্তিশালী এ বার্বারি রাষ্ট্রটিকে পরাজিত করে ডেকাতুর তার বাহিনী নিয়ে পাড়ি জমান তিউনিস ও ত্রিপোলিতে এবং সেখানকার শাসকদেরকেও একই রকমের চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। ডেকাতুর ত্রিপোলিতে পাশা কারমানলির গুপ্ত কক্ষে আটক সকল ইউরোপীয় বন্দিকেও মুক্ত করেন। উত্তর আফ্রিকায় নৌবাহিনী প্রেরণের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসনের বক্তব্য ছিল: '*আমেরিকার নীতি হলো, যুদ্ধের চেয়ে শান্তি শ্রেয়; বশ্যতাকরের চেয়ে যুদ্ধ শ্রেয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন কারো সাথে যুদ্ধ চায় না, তেমনি কারো নিকট থেকে শান্তিও কিনবে না*' – যা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে এক নতুন পন্থার উদ্বোধনী ঘোষণা।[২৫৬]

ব্রিটিশ নেতৃত্বে ইউরোপীয় পাল্টা আক্রমণ

১৮১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্বারি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে তার হিসাব-নিকাশের নিষ্পত্তি ঘটায় – যে বছরে ইউরোপীয় দেশগুলো যৌথভাবে দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইউরোপীয় জাহাজগুলোতে বার্বারি জলদস্যুদের লুণ্ঠন-কর্ম অব্যাহত তাকে। উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকার দুঃসাহসিক ও সফল অভিযানে (**১৮০১-০৫, ১৮১৫**) ইউরোপে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, একই পন্থা অবলম্বনের ব্যাপক ডাক উঠে। নেপোলিয়নের যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর **১৮১৪** সালে একটা শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য যখন ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপীয় রাজা ও মন্ত্রীরা মিলিত হন, তখন বার্বারি জলদস্যু সঙ্কটের সামরিক সমাধানের ঘোর-পক্ষপাতী ব্রিটেনের স্যার সিডনী স্মিথ উত্তর আফ্রিকার শাসকদের সঙ্গে সামরিক মুকাবিলার আবেদন জানান। তিনি সে কংগ্রেসটিকে বলেন: '*এ লজ্জাজনক দাসত্ব শুধুমাত্র মানবতার জন্যই গর্হিত নয়, তা ব্যবসা-বাণিজ্যকেও চরমভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে।*'

স্যার স্মিথের জোরালো নিবেদন কয়েক শতাব্দী ধরে চলমান অবমাননাকর ও বাণিজ্যিকভাবে পঙ্গুকারী এ সমস্যাটির প্রতি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। ব্রিটেন 'ইউরোপিয়ান ট্রিটি'তে দাসপ্রথা ও দাস-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করার শর্ত সংযোজন করতে সমর্থ হয়। ভিয়েনা কংগ্রেস সকল প্রকার ও আকারের দাসপ্রথা চর্চাকে নিন্দা করে একটা প্রস্তাব পাস করে। কিন্তু বার্বারি রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তবে শীঘ্রই স্যার স্মিথের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আকুল আহ্বানের সমর্থন আসতে থাকে ইউরোপের সবখান থেকে, যারা সবাই এ ঘৃণ্য শত্রুর দ্বারা ভয়ঙ্কর দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল অতীতে এবং তখনো হচ্ছিল। মাত্র কয়েক মাস আগে ঘটিত আলজিয়ার্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফলতা থেকে তারা ইঙ্গিত ও অনুপ্রেরণা নিচ্ছিল। ব্রিটেন উত্তর আফ্রিকায় দুর্ভোগের খুব বড় শিকার ছিল না মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন ও ব্রিটিশ বন্দিদেরকে মুক্ত করে আনতে পারার কারণে। সে সূত্রে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো ব্রিটেনের সমালোচনা করে '*জলদস্যুদের বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার জন্য, কেননা তার বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিরা আক্রান্ত হলে, তা ব্রিটিনের জন্য ফায়দা লাভের সুযোগ করে দিতো।*'[২৫৭]

এরূপ সমালোচনায় বিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসপ্রথা বিলুপ্তকরণের প্রবক্তা ব্রিটেন এখন শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসত্বের সমাপ্তি টানারও সিদ্ধান্ত নেয়। **১৮১৫** সালে ব্রিটিশ সরকার স্যার এডোয়ার্ড পেলোর নেতৃত্বে ইউরোপীয় জাহাজ ও নাগরিকদেরকে আটককরণ বন্ধে বার্বারি রাষ্ট্রগুলোকে বাধ্য করার লক্ষ্যে এক বিশাল নৌবহর উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করে। বশ্যতাকর দেওয়ার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার বলে: '*যদি শক্তি প্রয়োগই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে, তবে আমরা এটা জেনে সান্ত্বনা পাব যে, আমরা মানবতার জন্য পবিত্র দায়িত্বে যুদ্ধ করছি।*'[২৫৮]

১৮১৫ সালের শেষ দিকে আলজিয়ার্সের সাগরে তার নৌবহর নিয়ে উপস্থিত হয়ে স্যার পেলো ওমর পাশার নিকট এক আপোষহীন বার্তা পাঠান এক ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ, সকল ইউরোপীয় ক্রীতদাসদের মুক্তি এবং চিরতরে ইউরোপীয় জাহাজ ও ক্রীতদাস আটক পরিত্যাগের শর্তে। এর আগের মার্কিন আক্রমণের পর সম্ভাব্য ইউরোপীয় আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে ওমর পাশা তার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে জোরদার ও সবল যোদ্ধাদের নিয়োগ করে তার বাহিনীকে শক্তিশালী করেছিলেন। পাশার তরফ থেকে কোনো উত্তর না এলে স্যার পেলো যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ বহরের পাশে ৬টি ডাচ জাহাজের এক বহর যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আলজিয়ার্সের উপর প্রচণ্ড বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে। ফলে শহরটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ওমর পাশার বাহিনী জোর প্রতিরোধ প্রদর্শন করে পাল্টা আক্রমণ করে। এতে ব্রিটিশ পক্ষেও যথেষ্ট হতাহত ও ক্ষতিসাধন হয়। স্যার পেলো এবার নজর দেন বন্দরে নোঙ্গর করা জলদস্যুতার জন্য ব্যবহৃত জাহাজগুলোর দিকে। ওসব জাহাজে অগ্নিবোমা ও ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে সবগুলোকে জ্বালিয়ে দেন। পরদিন সকালের মধ্যে নগরী ও জলদস্যু জাহাজগুলো একেবারে বিদ্ধস্ত হয়ে যায়। ব্রিটিশ পক্ষে **১৪১** জন যোদ্ধা নিহত ও ৭৮ জন আহত হয়; শত্রুপক্ষে নিহত হয়েছিল ২,০০০। পরদিন ভোরে ওমর পাশা ধ্বংসের দৃশ্য জরিপ করে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষের সব শর্ত মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। চুক্তির শর্তের মধ্যে ছিল: সমস্ত ইউরোপীয় বন্দির মুক্তি ও ইউরোপীয়দেরকে ক্রীতদাসকরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের হাতে মারাত্মকরূপে মার খাওয়া বার্বারি রাষ্ট্রগুলো ব্রিটিশ ও মার্কিন জাহাজ আক্রমণ বন্ধ রাখলেও অন্যান্য দেশগুলোর জাহাজের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে; যেমন ফরাসি জাহাজ এরপরও লাগাতার আক্রমণের শিকার হতে থাকে। ফলে ফরাসি

---

[২৫৬] Hirchens, op cit
[২৫৭] Milton, p. 272
[২৫৮] Ibid.

সরকারও নিজস্ব সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়। বার্বারি বন্দরসমূহ ধ্বংস করার জন্য ১৮১৯ সালে একটা যৌথ অ্যাংলো-ফরাসি নৌবাহিনী বার্বারি উপকূলে আসে। বার্বারি জলদস্যুদের লুণ্ঠন চিরতরে খতম করে দেওয়ার লক্ষ্যে ও উত্তর আফ্রিকায় নির্মম নির্যাতনের শিকার খ্রিষ্টানদের মুক্ত করতে ফ্রান্স ১৮৩০ সালে আলজিয়ার্স দখল করে নিয়ে বার্বারি ক্রীতদাস শিকারের চির-সমাপ্তি ঘটায়।

অটোমানদের দাসপ্রথা নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধ

পশ্চিমাদের চাপে অটোমান সরকার ১৮৫৫ সালে তার সাম্রাজ্যে দাস-বাণিজ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। স্বর্গীয় প্রথার এ নিষিদ্ধকরণ প্রচণ্ড গণ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে হেজাজ ও সুদানে। আল্লাহ অনুমোদিত এ প্রথা পশ্চিমাদের নির্দেশে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে – এ অভিযোগের অস্ত্র ধারণ করে সৌদি অঞ্চলের ইসলামের কেন্দ্রস্থল হেজাজের জনগণ অটোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। হেজাজের উলেমা প্রধান শেখ জামাল অটোমানদের দাস-বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণ এবং তাদের দ্বারা গৃহীত অন্যান্য খ্রিষ্টান-অনুপ্রাণিত অনৈসলামিক সংস্কারের বিরুদ্ধে এক 'ফতোয়া' জারি করেন। ফতোয়ায় বলা হয়: '*দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা শরীয়তি আইনের বিরোধী। ওসব প্রস্তাবনার কারণে তুর্কিরা নাস্তিক হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের রক্ত বাজেয়াপ্ত ও তাদের সন্তানদেরকে ক্রীতদাস করা বৈধ।*'[২৫৯]

হেজাজে উদ্ভূত এ জিহাদি বিদ্রোহ এক বছরের মধ্যে দমন করতে সমর্থ হয় অটোমানরা। তবে বিদ্রোহটি ও তার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত ফতোয়াটি কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে সমর্থ হয়। অটোমান সরকার ইসলামের এ কেন্দ্রস্থলটিকে আল্লাহ-অনুমোদিত দাসপ্রথা নিষিদ্ধের বাইরে রেখে এক ছাড়পত্র ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে অটোমান সুলতানের প্রধান মুফতি আরেফ ইফেন্দি মক্কার কাজি, মুফতি, উলেমা, শরীফ, ইমাম ও প্রচারকদের নিকট লিখিত এক পত্রে দাসপ্রথা নিষিদ্ধকরণ ও অন্যান্য অটোমান সংস্কারকে 'কলঙ্ক-রটনাকারী গুজব' বলে আখ্যায়িত করে লিখেন: '*আমাদের কানে এসেছে এবং আমাদের কাছ নিশ্চিত বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইহকালের জন্য লালায়িত কিছু ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যক্তি অদ্ভুত মিথ্যার জন্ম দিয়ে প্রচার করছে যে, সর্বোচ্চ অটোমান রাষ্ট্র (সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন) নারী ও পুরুষের ক্রীতদাসত্ব নিষিদ্ধ করেছে, যা সর্বৈব কুৎসামূলক মিথ্যা রটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।*'[২৬০]

দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণে অটোমান মিশরীয় প্রয়াসও বাঁধার সম্মুখীন হয় সুদানে, যে অঞ্চলটি যুগের পর যুগ মুসলিম ক্রীতদাস শিকারি ও ব্যবসায়ীদের উর্বরক্ষেত্ররূপে কাজ করে এসেছে। রুডলফ পিটার্স জানান: '*ক্রীতদাস-ব্যবসা দমনের জন্য ইউরোপীয় শক্তি মিশর সরকারকে বাধ্য করলে সুদানিদের মাঝে অসন্তোষ বেড়ে যায়*' – যে অসন্তোষ কেবলমাত্র বস্তুগত কারণে ছিলনা, ধর্মীয় কারণেও। '*ইসলাম যেহেতু দাসপ্রথাকে অনুমোদন করে, সেহেতু অধিকাংশ মুসলিম এতে ক্ষতির কিছু দেখেনি। বিশেষত ইউরোপীয়দের কথায় মিশর সরকারের দাসপ্রথা দমনের চেষ্টাকে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সমতুল্য হিসেবে দেখে,*' লিখেছেন পিটার্স।[২৬১] এর ফলে সুফি নেতা মোহাম্মদ আহম্মদ (মৃত্যু ১৮৮৫) অটোমান ও মিশরীয় প্রশাসন এবং তাদের পশ্চিমা মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেন। সংক্ষুব্ধ দাস-ব্যবসায়ী ও সুফি-সাধকরা তাদের নিজ-নিজ বাহিনী নিয়ে সে জিহাদী আন্দোলনে যোগ দেয়।[২৬২]

হেজাজে দাসপ্রথা নিষিদ্ধকরণে অটোমান ব্যর্থতায় সৌদি আরবে আরো ১০৭ বছর দাসপ্রথা ও দাস-ব্যবসা বৈধ থাকে। ১৯৬০ সালে লর্ড শ্যাকল্টন ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডস'কে জানান: আফ্রিকার মুসলিম হজ্ব-যাত্রীরা 'ক্রীতদাসদেরকে জীবন্ত ট্রাভেলার চেক' হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে মক্কায় বিক্রি করার জন্য।[২৬৩] সৌদি আরব ও ইয়েমেন দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ করে ১৯৬২ সালে, ব্রিটেন-কর্তৃক দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণার ১৫৫ বছর পর। আর মৌরিতানিয়া দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ করে ১৯৮০ সালে। আর এ নিষিদ্ধকরণ সম্ভবপর হয় আন্তর্জাতিক চাপের মুখে, প্রধানত পশ্চিমা চাপে, যদিও সে নিষেধাজ্ঞা আংশিক সফল হয়েছে মাত্র।

মুসলিম দেশে দাসপ্রথার অব্যাহত চর্চা ও পুনর্জাগরণ

আজ পর্যন্ত দাসপ্রথা সৌদি আরব, সুদান ও মৌরিতানিয়ায় নানা আকারে অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি রয়টার '*স্লেইভারি স্টিল এক্জিস্ট ইন মৌরিতানিয়া*' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে:

> তারা শৃঙ্খল পরে না, প্রভুদের কোনো চিহ্ন দ্বারা তারা চিহ্নিত নয়, কিন্তু মৌরিতানিয়ায় এখনো ক্রীতদাস রয়েছে। সাহারার রৌদ্র-তপ্ত বালিয়াড়ির মধ্যে তারা উট-ছাগলের পাল চড়িয়ে বেড়ায়, কিংবা নোয়াকোচটের ধনাঢ্যদের কার্পেট বিছানো ভিলায় তারা গরম পুদিনার চা পরিবেশন করে অতিথিদেরকে। মৌরিতানিয়ার ক্রীতদাসরা তাদের মালিকদের জন্য কাজ করে; প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা মালিক-পরিবারের অস্থাবর সম্পত্তির মতো কাটিয়ে দিচ্ছে... তাদের সংখ্যা হাজার হাজার হতে পারে বলে দাবি করে দাসপ্রথা-বিরোধীরা। ক্রীতদাস হিসেবে জন্ম-গ্রহণকারী বুবাকার মেসোদ, যে বর্তমানে দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনের কর্মী, সে রয়টারকে বলে: '*এটা যেন ভেড়া-ছাগল রাখার মত। কোনো নারী ক্রীতদাসী হলে তার সন্তানরাও ক্রীতদাস।*'[২৬৪]

---

২৫৯. Lewis B (2002) *What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response*, Phoenix, London, p. 102-3
২৬০. Ibid, p. 103
২৬১. Peters, R (1979) *Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History*, Mouton Publishers, The Hague, p. 64
২৬২. Ibid, p. 64-65
২৬৩. Lal (1994), p. 176
২৬৪. Fletcher P, *Slavery still exists in Mauritania*, Reuters, 21 March 2007

দাস-চর্চা সৌদি আরবেও অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু এ পবিত্র ইসলামি রাজ্যটি চরম গোপনীয় প্রকৃতির হওয়ায় ভিতরে সংঘটিত খুব কম তথ্যই বাইরে প্রকাশ পায়। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন ও শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি গরিব দেশগুলো থেকে লাখ লাখ যুবতী নারী, যারা সৌদি আরবে শেখদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে যায়, তারা মূলত গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে ক্রীতদাসত্বের জীবন কাটায়। তাদের অধিকাংশই কোরান-অনুমোদিত উপপত্নীরূপে মালিকের যৌন-সম্ভোগের পণ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সৌদি থেকে আসা কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক পি.এইচ.ডি.'র ছাত্র হামাইদান আল-তুর্কি ২০০৬ সালে যাকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় তার ইন্দোনেশীয় গৃহ-পরিচারিকাকে যৌন-নির্যাতনের অপরাধে, (তিনি) যৌন-নির্যাতনের অভিযোগটি প্রত্যাখান করে বলেন: '*এটা ঐতিহ্যগত একটা মুসলিম আচরণ*', যৌন নির্যাতন নয়।[২৬৫] সৌদিতে বিদেশী গৃহ-পরিচারিকাদের অপব্যবহার সম্পর্কে 'হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ' রিপোর্ট করেছে যে:

> আমাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া কিছু নারী-শ্রমিক সৌদি পুরুষ মালিকের হাতে ধর্ষণ ও যৌন-হয়রানির কারণে তখনো যন্ত্রণাকাতর ছিল, যারা ক্রুদ্ধ না হয়ে ও কান্নায় ভেঙ্গে না পড়ে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করতে পারেনি। নিজ দেশে অবাধ চলাফেরায় অভ্যস্ত এসব নারী ও অন্যান্যরা আমাদের কাছে বর্ণনা করে কীভাবে রিয়াদ, জেদ্দা, মদীনা ও দাম্মাম-এ তালা লাগানো দরজার মধ্যেকার কারখানা, বাড়ি ও গণ-আবাসের মতো জায়গায় তাদেরকে কারারুদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়। জোরপূর্বক চার-দেয়ালের ভিতর আবদ্ধ এবং নিঃসঙ্গ বসবাসকারী এসব মহিলার জন্য কোনোরূপ সাহায্য চাওয়া, পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া, হয়রানি ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি, এবং আইনগত সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ চাওয়া একেবারেই দুস্কর।[২৬৬]

নারগিস বেগম নামের ২৬ বছরের এক বাংলাদেশী যুবতী বৈরুতে গৃহ-পরিচারিকা হিসেবে কাজ করার সময় তার মালিকের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক, শেকল ও চামরার বেল্ট দিয়ে পিটানি, গরম লৌহদণ্ড দিয়ে শরীরে ছেকা ও সে সাথে ধর্ষণের শিকার হয়। '*আমি সেখানে যেসব গৃহকর্মী বাংলাদেশী মেয়েদের সাথে কথা বলেছি তাদের ৯৫ শতাংশই ধর্ষিত হয়েছে, কিন্তু ভয়ের কারণে তারা তাদের পরিবারের কাউকে তা বলে না,*' বলেছে নারগিস।[1] সৌদিতে বিদেশী গৃহ-চারিকাদের উৎপীড়ণ-নির্যাতন আরো খারাপ।

১৯৯৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখে: "*কোনো সন্দেহ নেই যে, আরবের ধনাঢ্য প্রাসাদগুলোতে হাজার হাজার ক্রীতদাস আজও কাজ করে যাচ্ছে।*" বৃদ্ধ-বয়সী ধনী সৌদি শেখরা প্রায়শঃই মালয়েশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মিশর ও অন্যান্য দরিদ্র দেশে ভ্রমণে যায় অল্প-বয়সী সুন্দরী বালিকাদেরকে বিয়ে করার জন্য। তারা গরিব পিতামাতাকে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে যুবতী কন্যাদেরকে সৌদিতে নিয়ে আসে, যেখানে তারা ক্রীতদাসীসুলভ জীবনযাপন করে।

***সুদানে দাসপ্রথার পুনরুজ্জীবন*:** সুদান (নুবিয়া) ইসলামি দাসপ্রথার সবচেয়ে জঘন্যতম শিকার। মুসলিম দাসপ্রথা সুদানে আঘাত হানে ইসলামের একবোরে প্রাথমিককাল থেকে। খলিফা উসমান আরোপিত চুক্তি অনুযায়ী ৬৫২ থেকে ১২৭৬ সাল পর্যন্ত সুদান বার্ষিক আনুগত্য-কর হিসেবে ৪০০ করে ক্রীতদাস পাঠাতে বাধ্য হয়েছে। দশম শতাব্দীর প্রামাণিক দলিল 'হুদুদ আল-আলম' অনুযায়ী, ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলো থেকেই সুদান মুসলিম দাস-শিকারিদের উর্বর-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, যা আজও সে রকমই রয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে সুদানে ক্রীতদাস মুক্তকরণ কর্মসূচিতে নিযুক্ত জন ইবনার আরব মিলিশিয়া ও সরকারের-সমর্থনপুষ্ট পপুলার ডিফেন্স ফোর্স (পি.ডি.এফ.) কর্তৃক খ্রিষ্টান, সর্বেশ্বরবাদি, এমনকি মুসলিম কৃষ্ণাঙ্গ সুদানি নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাসকরণের এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়েছে: ক্রীতদাসকৃত নারীদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং তাদেরকে সাধারণত যৌনদাসীরূপে ব্যবহার করা হয়। আর ছোট শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে জিহাদীরূপে গড়ে তোলা হয় তাদের পূর্বতন স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ইবনার ১,৭৮৩ জন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসকে মুক্ত করেন ১৯৯৯ সালে; অপরদিকে তার সংগঠন 'ক্রিশ্চিয়ান সলিডারিটি ইন্টারন্যাশনাল' ১৯৪৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মুক্ত করে ১৫,৪৪৭ জন ক্রিতদাসকে।[২৬৭] সুদানে ক্রীতদাসকরণ ও দাস-বাণিজ্য কার্যকরভাবে বন্ধে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারও (১৮৯৯-১৯৫৬) ব্যর্থ ছিল। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত ১৯৪৭ সালের এক স্মারকে উল্লেখ করা হয়: '*১৯২০-এর দশকের শেষদিকে চলমান ইথিওপিয়ার ক্রীতদাসদের একটা বিস্তৃত ব্যবসার কথা উন্মোচিত হয়ে পড়ে; এখনো সেখানে মাঝে মাঝেই অপহরণ করে হতভাগ্যদেরকে দ্রুত দূরবর্তী উত্তরাঞ্চলীয় যাযাবরদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।*'[২৬৮]

আরো জঘন্য ঘটনা হলো: ১৯৮০'র দশক থেকে সরকার সমর্থিত ইসলামি পুনর্জাগরণ সাথে সুদানে সহিংস ক্রীতদাসকরণ পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। ১৯৮৩ সালে প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী'র নেতৃত্বাধীন ইসলামপন্থি সুদানি সরকার ইসলামবাদি নেতা ড. হাসান আল-তুরাবির প্ররোচনায় কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিষ্টান ও সর্বেশ্বরবাদী (অ্যানিমিস্ট) অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদানের সঙ্গে আরব-প্রধান উত্তরের একত্রীকরণ ঘোষণা দেয়, যার ফলে দক্ষিণের দীর্ঘকালের স্বায়ত্তশাসন বাতিল হয়ে যায়। সরকার সারা সুদানব্যাপী ঢালাওভাবে শরীয়তী আইন চালু করে। সরকারের লক্ষ্য ছিল জিহাদের মাধ্যমে বহুধর্মী ও বহুজাতিক পুরো সুদানকে একটি আরব-প্রভাবাধীন ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করা।

প্রতিবাদে অমুসলিম-প্রধান দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহীরা 'সুদান পিপলস লিবারেশন আর্মি (এস.পি.এল.)' নামে একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে কর্নেল জন গারাঙ-এর নেতৃত্বে। এর প্রতিউত্তরে ইসলামপন্থী সরকার আরব গোত্রীয় বেসামরিক বাহিনীকে (মিলিশিয়া) সশস্ত্র করতে থাকে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-সজ্জিত বাকারা নামে পরিচিত এ সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনী বিদ্রোহী ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের বিরুদ্ধে সরকারের

---

[২৬৫] *US Urged to Review Saudi Student's Case*, Arab News, Riyadh, 28 March 2008

[২৬৬] Human Rights Watch, E*xploitation and Abuse of Migrant Workers in Saudi Arabia*, http://hrw.org/mideast/saudi/labor/

[1] *Nail torture case shines light on Asia's migrant maids*, Dawn.com, 24 Sept. 2010

[২৬৭] Eibner J (1999) *My Career Redeeming Slaves*, Middle East Quarterly, December Issue

[২৬৮] Henderson KDD (1965) *Sudan Republic*, Ernest Benn, London, p. 197

যুদ্ধ-প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সরকার-সমর্থিত এ রাহাজান দলগুলো গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে বয়স্কদেরকে হত্যা করে, নারী ও শিশুদেরকে অপহরণ করে, গরু-ছাগল ও শস্য লুটপাট করে এবং অবশিষ্ট সবকিছু পুড়িয়ে দেয়। ১৯৮৫ সালে ইসলামপন্থী সরকার উৎখাত হওয়ার পর কিছুদিনের জন্য এসব জঘন্য কর্মকাণ্ডের বিরতি ছিল। কিন্তু ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তুরাবির শ্যালক ও আরেক ইসলামবাদী সাদিক আল-মাহদি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর পুনরায় জিহাদ জাগরিত হয়। আরব মিলিশিয়াদের আক্রমণ এবার ঠাণ্ডা মাথায় সুচিন্তিতভাবে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক হত্যার মিশনে পরিণত হয়; সে সাথে একই গতিতে চলে নারী ও শিশুদেরকে অপহরণ করে ক্রীতদাসকরণের পালা।[২৬৯]

১৯৮৯ সালে আল-তুরাবি ও '*ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট* (এন.আই.এফ.)'-এর জেনারেল উমর আল বশিরের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান (কু)-এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর আরব মিলিশিয়াদের ক্রীতদাস-শিকার তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। প্রেসিডেন্ট আল বশিরের স্বেচ্ছাচারী ইসলামবাদী সরকার বিদ্রোহী ও তাদের শুভাকামীদের বিরুদ্ধে জিহাদ-অভিযানের কার্যকারক হিসেবে 'পি.ডি.এফ.' নামে একটি সশস্ত্র-বাহিনী গঠন করে। পি.ডি.এফ. হানাদারদের হামলার সবচেয়ে শোচনীয় শিকার হয় দক্ষিণ-পশ্চিমের বাহর আল-গাজাল প্রদেশগুলোর 'দিনকা' জনগণ ও দক্ষিণাঞ্চলীয় কর্ডোফান অঞ্চলের 'নুবা' উপজাতির লোকেরা। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণের নুবা পার্বত্য অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গদেরকে এক ইসলামি ফতোয়া জারি করে ইসলামত্যাগী বলে ঘোষণা করা হয় বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে। জাতিসংঘের বিশেষ দূত গ্যাস্পার বিরো জানান, ফতোয়াটির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ:[২৭০]

> কোনো বিদ্রোহী, যে আগে মুসলিম ছিল, সে এখন ধর্মত্যাগী (মুর্তাদ) হয়ে গেছে; এবং অমুসলিমরা হলো অবিশ্বাসী, যারা ইসলামের প্রসারে প্রাচীরের মতো বাঁধা; ইসলাম এদের উভয়কেই হত্যার স্বাধীনতা প্রদান করেছে।

১৯৯৮ সালে নিয়মিত সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট পি.ডি.এফ. বাহর আল-গাজালের দিনকা জনগণের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ও নির্মম ক্রীতদাস শিকার হামলার অভিযানে লিপ্ত হয়। হামলায় ৩০০,০০০ মানুষ গৃহহীন হয় এবং অজ্ঞাত সংখ্যক লোককে হত্যা ও ক্রীতদাস করা হয়। সান্তিনো দেং নামক প্রাদেশিক সরকারের এক উপদেষ্টা দাবি করেন: এসব হামলায় ইসলামি মিলিশিয়ারা বাবানুসায় (পশ্চিম কর্ডোফান) ৫০,০০০ দিনকা শিশুকে বন্দি করে। ইউনিসেফ-এর এক রিপোর্টে দাবি করা হয় যে, পি.ডি.এফ. ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২০৬৪ জনকে ক্রীতদাস বানায় ও ১৮১ জনকে হত্যা করে।[২৭১] সুদানের চলতি ক্রীতদাসত্ব চর্চার উপর জন ইবনার হিসাব দেন যে, ১৯৯৯ সালে সেখানে প্রায় ১০০,০০০ গৃহস্থালি-ক্রীতদাস ছিল।[২৭২] ক্রীতদাসত্ব-বিরোধী এ্যান্টি-শ্লেইভারি সংগঠনটি এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে: ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সুদানে প্রায় ১৪,০০০ লোক অপহরণপূর্বক ক্রীতদাসত্বের শিকার হয়।[২৭৩]

এর চেয়েও শোচনীয় অবস্থা আসছিল, এবারে দারফুরে। ২০০৪ সালে সুদান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব 'জানজাবিদ' মিলিশিয়া বিদ্রোহী ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের বিরুদ্ধে চরম নিষ্ঠুরতাপূর্ণ এক জিহাদ-অভিযান শুরু করে। সুদানে সরকারি মদদপুষ্ট জিহাদে ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে। ২০০৪ সালে দারফুরে শুরু হওয়া নতুন জিহাদ অভিযানে জাতিসংঘ নিহতের সংখ্যা নিরূপণ করে আনুমানিক ৩০০,০০০; কিন্তু জাতিসংঘের সাবেক আন্ডারসেক্রেটারি জেনারেলের মতে এ সংখ্যা ৪০০,০০০ লাখের কম নয়।[২৭৪] দারফুরে প্রায় ২৫ লাখ লোক গৃহহীন এবং অজ্ঞাত সংখ্যককে সম্ভবত ক্রীতদাস করা হয়েছে। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত প্রেসিডেন্ট আল বশিরকে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে মদদ দানের অপরাধে অভিযুক্ত করে।[২৭৫]

১৯৪৯ সালে ইতিহাসবিদ ত্রিমিংঘাম লক্ষ্য করেন: জীবনযাপনে যুগ যুগ ধরে ক্রীতদাস-শিকারের উপর নির্ভরশীল বাকারা আরবরা উপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় যাদের জীবন কঠিন হয়ে পড়েছিল তারা '*এখনও সে চর্চায় লিপ্ত হতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।*'[২৭৬] ১৯৫৬ সালে বিধর্মী ব্রিটিশ শাসকরা সুদান থেকে চলে যাওয়ার পর আরবরা ধীরে ধীরে ফিরে আসে তাদের হারানো সে প্রাচীন পেশায়, যার জন্য তারা হন্যে হয়ে ফিরছিল: *তাদের আল্লাহ-অনুমোদিত ক্রীতদাস শিকার ও কেনাবেচার পেশায়।*

পাশ্চাত্যে মুসলিমদের দাসপ্রথা চর্চার আনয়ন

এটা একটা আশংকাজনক সত্য যে, মুসলিমরা, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা মুসলিমরা, পাশ্চাত্যে দাসপ্রথা চর্চার ছাপ আমদানি করছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে কয়েকটি সৌদি ও সুদানি পরিবারের উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যারা তাদের গৃহকর্মীনিদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল, যা আইনি ব্যবস্থা পর্যন্ত গড়ায়। উপরে উল্লেখিত 'ক্রীতদাসত্ব-বিরোধী প্রামাণ্য দলিল' অনুযায়ী, মেনদি নাজের নাম্নী জনৈক সাবেক ক্রীতদাসী, যে সম্প্রতি '*শ্লেইভ: মাই ট্রু স্টোরি*' শিরোনামে তার আত্মজীবনী প্রকাশ করেছে, ১৯৯২ তাকে সালে সুদানের

[২৬৯] Metz HC ed. (1992) *Sudan: A Country Study*, Library of Congress, Washington DC, 4th ed., p. 257
[২৭০] David Littman (1996) *The U.N. Finds Slavery in the Sudan*, Middle East Quarterly, September Issue.
[২৭১] Inter Press Service (Khartoum), July 24, 1998.
[২৭২] Eibner, op cit
[২৭৩] Anti-Slavery, *Mende Nazer: From Slavery to Freedom*, October 2003
[২৭৪] Lederer, EM, *UN Says Darfur Conflict Worsening, with Perhaps 300,000 Dead*, Associated Press, 22 April 2008
[২৭৫] Walker P and Sturcke J, *Darfur genocide charges for Sudanes president Omar al-Bashir*, Guardian, 14 July 2008
[২৭৬] Trimingham JS (1949) *Islam in the Sudan*, Oxford University Press, London, p. 29

নুবা পর্বত থেকে আটক করা হয়েছিল। প্রথম সে খার্তুমে এক ধনাঢ্য আরব পরিবারে ক্রীতদাসরূপে কাজ করে, তারপর লন্ডনে এক সুদানি কূটনীতিকের গৃহে। সেখান থেকে সে ২০০২ সালে পলায়ন করে ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় চায়। অন্যদিকে ২০০৩ সালে 'ন্যাশনাল রিভিউ' প্রকাশিত এক প্রতিবেদন জানায়:[২৭৭.]

> পাঁচ বছর আগে তিন ফিলিপিনো গৃহপরিচারিকার প্রতি দুরাচারের কারণে বাদশাহ ফাহদের ভগ্নিসহ সৌদি রাজপরিবারের তিন সদস্য লন্ডনে জড়িয়ে পড়ে এক কলঙ্কজনক ঘটনায়। উক্ত ফিলিপিনো মহিলারা সৌদি রাজপরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করে এ অভিযোগে যে, তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়, ক্ষুধার্ত রাখা হয় ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা হয় লন্ডনে সৌদিদের বাড়িতে। ফিলিপিনোরা বলেঃ মাঝে মাঝে তাদেরকে চিলেকোঠায় তালাবদ্ধ করে রাখা হয়, উচ্ছিষ্ট খাবার দেওয়া হয় এবং মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেও চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌদিদের বাসায় গৃহপরিচারিকাদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে প্রতিবেদনটি লিখেছে:

> সৌদিদের জন্য কাজ করা অধিকাংশ গৃহকর্মীর পরিস্থিতির সাতটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ পাসপোর্ট আটককরণ, এককভাবে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন, অতি দীর্ঘ শ্রমসময়, চিকিৎসা প্রদানে অস্বীকৃতি, মৌখিক ও মাঝে মাঝে শারীরিক নির্যাতন, এবং কারাতুল্য পরিবেশ। আমরা যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করেছে, যদিও তাদের কেউ কেউ প্রথমে সৌদি আরবে কাজ করেছিল। যারা উভয় দেশে কাজ করেছে, তারা জানায়ঃ আমেরিকাতে আনার পর তাদের অবস্থার কোনোই উন্নতি হয়নি।

উপসংহার

আজ মুসলিম বিশ্বে চলমান দাসপ্রথা চর্চার অবশিষ্টাংশ গোটা ইসলামের ইতিহাসব্যাপী সংঘটিত চর্চার তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ, যা ঘটে নবি মুহাম্মদের জীবনকাল থেকেই এবং চলমান থাকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। আর মুসলিম দেশগুলোতে দাসপ্রথা সীমিতকরণে নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত ভূমিকা রাখে বহির্বিশ্বের চাপ, বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলো ও জাতিসংঘ ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গোঁড়া ও ধর্মান্ধ ইসলামি জঙ্গিবাদের উত্থানের চলমান জোয়ার, যা ইসলামি শাসন কায়েম ও মধ্যযুগীয় ইসলামি খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ব দখল করতে চায়, তা একটা বড় উদ্বেগের বিষয়। ২০০৬ সালে এক ডেনিশ পত্রিকায় নবি মুহাম্মদের কার্টুন ছাপার প্রতিবাদে লন্ডনে মুসলিমদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে এক প্রতিবাদকারী চিৎকার করে বলেঃ চল ডেনমার্ক আক্রমণ করি এবং '*তাদের নারীদেরকে যুদ্ধের লুণ্ঠনদ্রব্য (মালে গণিমত) বানাই।*' আরেকজন চিৎকার করে উঠেঃ '*খাইবারের ইহুদিদের মতো শিক্ষা দাও।*'[২৭৮.] দাসপ্রথা ও ইসলামে সংঘটিত ক্রীতদাসকরণের ওসব ঐতিহাসিক ঘটনা যতই লজ্জাজনক হোক না কেন, আজও সেসব ঘটনা অনুপ্রাণিত ও গর্বিত করে ধার্মিক মুসলিমদেরকে, যাদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্যে বসবাসকারী।

১৯৯৯ সালে সুদান সরকার সে দেশে চলমান দাসপ্রথাকে সমর্থন এবং ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করণে যুক্তি উপস্থাপন করে জাতিসংঘে। ১৯৯৯ সালের ২৩শে মার্চ সুদানের বিদ্রোহী নেতা জন গারাঙ জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই কমিশনার মেরী রবিনসনের কাছে সরকারি মদদে সহিংস জিহাদ ও ক্রীতদাসকরণ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেন। এর উত্তরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদিক আল-মাহদি (১৯৮৬-৮৯) রবিনসনের নিকট সুদান সরকারের সে ভয়ঙ্কর দুষ্কর্মে সহায়তার একটা ধর্মীয় ভিত্তি তুলে ধরে এক চিঠিতে লেখেন:[২৭৯.]

> জিহাদের ঐতিহ্যগত ধারণা বিশ্বের দু'টো অঞ্চলে বিভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: একটি শান্তির অঞ্চল, অপরটি যুদ্ধের। জিহাদ ধর্মীয় কারণে যুদ্ধ সূচনার দাবি করে... এটা সত্য যে, সরকার (এন.আই.এফ) সুদানে দাসপ্রথা প্রবর্তনে কোনো আইন জারি করেনি। কিন্তু জিহাদের ঐতিহ্যগত ধারণা দাসকরণের অনুমোদন দেয় জিহাদের একটা আনুষঙ্গিক দ্রব্য (বাই-প্রোডাক্ট) হিসেবে।

সুতরাং বিশ্বব্যাপী উদয়নশীল বিপ্লবী ইসলামপন্থি আন্দোলন যদি তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়, ইসলামি দাসপ্রথার পবিত্র প্রতিষ্ঠানটি আবারো বিশ্বমঞ্চে তার অতীত গৌরব নিয়ে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

---

২৭৭. Joel Mowbray, *Maids, Slaves and Prisoners: To be employed in a Saudi home-forced servitude of women in Saudi Arabia and in homes of Saudis in US*, National Review, 24 Feb. 2003

২৭৮. *Chilling Islamic Demonstration of Cartoons*, London, http://video. google, com/ videoplay? docid=574545628662575243, accessed on 20 July 2008

২৭৯. *Letter from Sadiq Al-Mahdi to Mary Robinson, U.N. High Commissioner for Human Rights* (Section III: War Crimes), Mar. 24, 1999.

অধ্যায় - ৮

শেষ কথা

এ বইটিতে সুস্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ-রচিত কোরানের ঐশীবাণী অনুযায়ী জিহাদ মতবাদটি আহ্বান জানায়: ১) জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণের, বিশেষত পৌত্তলিক শ্রেণীর অবিশ্বাসীদেরকে, ২) বিশ্বব্যাপী ইসলামি সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার, যার একটা অখণ্ড উদ্দেশ্য হবে অমুসলিম প্রজাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ, ৩) দাসত্ব চর্চার, যার অংশ থাকবে দাস-ব্যবসা ও যৌনদাসীত্ব। জিহাদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর এ স্বর্গীয় নির্দেশাবলী ইসলামের নবি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করে গেছেন। জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে তিনি তলোয়ারের হুমকিতে আরবাঞ্চলের ঈশ্বরবাদীদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন; আরবে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তিনি গণহারে ইহুদিদের হত্যা ও বিতাড়িত করেন; এবং দাস-বৃত্তি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি বিপুল সংখ্যক ইহুদি ও বহু-ঈশ্বরবাদী নারী-শিশুকে ক্রীতদাস করেন যুদ্ধের মাধ্যমে। ক্রীতদাসরূপে বন্দিকৃত নারীদের মধ্য থেকে নবি মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা সুন্দরী যুবতীদেরকে যৌনদাসী বা উপপত্নীরূপে ব্যবহার করতেন। তিনি কিছু কব্জাকৃত ক্রীতদাস মহিলাকে বিক্রিও করেছিলেন। এরপর মুসলিম খলিফা ও সুলতানরা নবির জিহাদি কার্যক্রমের এসব আদর্শিক নমুনা গ্রহণ ও বর্ধিত করে মুসলিম বিশ্ব দাসপ্রথাকে ব্যাপক পরিসরে উন্নীত করে।

জিহাদসহ কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ অবশ্যই চিরকাল বহাল থাকবে। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ যদি মানা হয়, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ ও দাসপ্রথা চিরকাল চলতে থাকবে। জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে, তা এমন সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যখন আর কোনো অমুসলিম অবশিষ্ট থাকবে না পৃথিবীতে। তবে ধরিত্রীর সব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও কিছু বিদ্রোহী মুসলিম ধর্ম-ত্যাগের মাধ্যমে পুনরায় অবিশ্বাসী হবে। সুতরাং কৌশলগতভাবে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরের ইসলামিক প্রথা পৃথিবী শেষ হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হবে না। দাসপ্রথার ক্ষেত্রে, সেটাও কোনোদিন বন্ধ হবে না, গোটা বিশ্ব ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে গেলেও। যারা ইসলাম ত্যাগ করতে থাকবে, তারা হত্যা ও ক্রীতদাসকরণের বৈধ লক্ষ্যবস্তু হবে। এছাড়াও ইসলামি আইন বলে যে, যেসব বিধর্মী যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা ক্রীতদাসই থেকে যাবে। ক্রীতদাসদের সন্তান-সন্ততিরাও হবে ক্রীতদাস। এরূপে দাসপ্রথা আল্লাহর স্বর্গীয় রীতি হিসেবে যুগের পর যুগ ধরে মানবতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে থাকবে। ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের কথা ধরলে, অনন্তকাল স্থায়ী বিশ্ব-পর্যায়ে ইসলামিক শাসন কায়েম করাই তো আল্লাহর, তথা জিহাদের, প্রধান লক্ষ্য।

একটি মাত্র ব্যক্তি, নবি মুহাম্মদ, আলাহ-রচিত জিহাদের নির্দেশ গ্রহণ করে গত চৌদ্দশ' বছরে এর বাস্তবায়নে এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। নবি মুহাম্মদ ও তাঁর উত্তরসূরীরা মৃত্যুর মুখে পতিত করে ক্রীতদাসকরণ ও মারাত্মক অর্থনৈতিক দুর্ভোগ ও শোষণের শিকার করার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, বিধর্মীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে। আজ মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১শ' ৪০ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশি। এটা এখন যথেষ্ট স্পষ্ট যে, বিংশ শতাব্দের মধ্যবর্তীকাল পর্যন্তও মুসলিমরা ব্যাপক মাত্রায় দাস-বাণিজ্য ও যৌনদাসীত্ব সহ দাসপ্রথার চর্চা করেছে। এবং অবশ্য ইসলামিক রাজত্ব বা সাম্রাজ্যবাদ, যা কোনো কোনো স্থানে ইসলামের প্রায় গোড়াতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা অন্যান্য স্থানের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান প্রভৃতি স্থানে চিরায়ত হয়ে থাকবে।

রেনেসাঁর সময় থেকে শুরু করে সামরিক শক্তিতে ইসলামি বিশ্বকে অতিক্রম করে ক্রমান্বয়িক উত্থানের পর খ্রিষ্টান ইউরোপ আল্লাহর জিহাদ কৌশলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে আশীর্বাদিতকরণে বিশ্ব পরিমন্ডলে একটা অখণ্ড ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বানচালকারীর ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ তিন-তিনবার আল্লাহর পরিকল্পনা ভঙ্গকারীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে: প্রথমত ৭৩২ সালে 'টুরের যুদ্ধে' এবং দুইবার অটোমানদের বিরুদ্ধে ভিয়েনার দ্বারগোড়ায় (*গেটস অব ভিয়েনা*, ১৫২৭ ও ১৬৮৩)। শুধু তাই নয়, যুগ যুগ, এমনকি শতাব্দের পর শতাব্দ, ধরে উজ্জীবিত জিহাদী জোশে মুসলিমরা যেসব ভুখণ্ড দখল করেছিল ইউরোপ তার অধিকাংশই ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর স্বর্গীয় পরিকল্পনার উপর আরো বড় আঘাত হানে। ওদিকে ইউরোপীয়রা ইরান ও তুরস্কের মত মুসলিম দেশগুলো সরাসরি দখল না করলেও সেসব দেশে তারা তাদের মনোপুতঃ প্রতিনিধি-শাসকদের বসিয়ে দেয়।

ইসলামি সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে আল্লাহর জিহাদি কর্মকাণ্ড নানাভাবে ভীষণ ব্যাঘাতগ্রস্ত হয়। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব খর্ব ও তার অধিকতর বিস্তারই রোধ করেনি, তারা জিহাদী কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য উপকরণ, যেমন জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ, ক্রীতদাসকরণ, দাস-বাণিজ্য ও যৌনদাসীত্ব চর্চা ইত্যাদির মূলোৎপাটনও করে প্রায় সম্পূর্ণরূপে। ইসলামের কেন্দ্রীয় ধর্মতত্ব জিহাদ অনেকটা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা পরিশেষে যখন নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়ে চলে যায়, তখন ইতিপূর্বে আল্লাহর অভিষিক্ত জিহাদীদের রক্তে ও বীরত্বে দখলকৃত ভূখণ্ডের বেশ কিছু অংশ স্থানীয় আদিবাসী বিধর্মীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ভারত। এটা ছিল ইসলামের ভীষণ বড় একটা ক্ষতি।

তবে কোনো মরণশীল ইহলৌকিক শক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহর চিরন্তন পরিকল্পনাকে আদৌও নিয়ন্ত্রণে রাখতে বা বিলুপ্ত করতে পারে কি! বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দখলদাররা তাদের উপনিবেশিক শাসন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আল্লাহর অভিষিক্ত জিহাদীরা তাদের বিরুদ্ধে

জিহাদী জোশ কার্যকর রাখে। অপরদিকে ইউরোপীয়রা চলে গেলেও আবার সৃষ্টি করেছে অন্যান্য কৌশল ও শাসন-ব্যবস্থা, যেমন আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, দাসপ্রথা বিলুপ্তি ও এরূপ আরো বহু বিষয়, যা ইসলামের দ্রুত অগ্রগতির নিমিত্তে জিহাদী আদর্শের বাস্তবায়নের পথে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয়রা বিশেষত অভিজাত মুসলিম পরিবার থেকে বহু মুসলিম ছাত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ দেয়। এটা খুব ভাল কথা ছিল যদি তারা পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য শক্তিশালী শাস্ত্র নির্মাণের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কৌশল আয়ত্ব করে ফিরতো ইউরোপ থেকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ফিরে আসে ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার, নারীবাদিতা ও এরূপ আরো অনেক অনৈসলামিক ধারণা-চেতনা মাথায় নিয়ে, যা জিহাদের মৌলিক মতবাদের পুরোপুরি বিরোধী। দুই বৃহত্তম মুসলিম শক্তি ইরান ও তুরস্ক ওসব অনৈসলামিক বিদেশী ভাবধারার ক্রীতদাসে পরিণত হয় এবং স্বর্গীয় জিহাদ মতবাদ ও কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করে ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ।

কিন্তু কোরান বলেঃ আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় কূটকৌশলি, যিনি মানুষের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ার ক্ষমতা ও চাতুর্যের অধিকারী। আল্লাহ বলেনঃ *'নিশ্চয়ই তারা (বিধর্মীরা) ফন্দি আঁটবে এবং আমিও ফন্দি আঁটবো'* (কোরান ৮৬:১৫-১৬)। যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে সতর্ক করে দিতে কোরান বলেঃ *'সব কিছুতেই সবচেয়ে বড় ফন্দি (মাস্টার-প্ল্যানিং) হলো আলাহর'* (কোরান ১৩:৪২)। আলাহর মাস্টার-প্ল্যানিং বাস্তবায়নে ইরানের পশ্চিমা মোহাচ্ছন্ন শাসকরা মহান আয়াতুল্লাহর দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে; তুরস্কের কামালপন্থি ধর্মনিরপেক্ষবাদীরাও খুব শীঘ্রই বিতাড়িত হওয়ার পথে। গত তিন দশক ধরে ইরানে জিহাদ পুরোদমে সক্রিয় রয়েছে। অপরদিকে তুরস্কে ধীরে ধীরে জিহাদ তার অবস্থান শক্ত করছে।

ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরভাবে অবদমিত করে রাখা উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জিহাদি জোশ ভারত-বিভক্তির সময় (১৯৪৬-৪৮) বাঁধা-বন্ধনহীন ভাবে ক্ষেপে উঠে। জিহাদি জোশে চাঙ্গা মুসলিমরা মৃত্যুর মুখে পতিত করে কয়েক মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) শিখ ও হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করে, এবং সেসাথে হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ যুবতীকে ক্রীতদাসরূপে অপহরণ করে। এমনকি আজও সেরূপ কর্মকাণ্ড কোনো না কোনো প্রকারে অব্যাহত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানে প্রতিবছর শত শত হিন্দু, শিখ ও খ্রিস্টানকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে এবং অপহরণের মাধ্যমে বহু যুবতী নারীকে ক্রীতদাসী করা হচ্ছে। তারা কোনোরূপ প্রতিরোধের চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠে তাদের জন্যঃ সহিংতা বা নানা সামাজিক চাপের মুখে-হিংসতা তাদেরকে ভিটামাটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, যা তাদের সম্প্রদায়কে সংখ্যাগতভাবে দ্রুত হ্রাস করছে। এরূপ জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিশর, লেবানন, ফিলিস্তিন ও প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে কার্যকর রয়েছে।

দাসপ্রথা চর্চার ক্ষেত্রে আগেই বলা হয়েছে যে, সৌদি আরবে তার চর্চা এখনো কোনো না কোনো আকারে অব্যাহত রয়েছে। দাসপ্রথা ব্যাপক আকারে চর্চিত হচ্ছে মৌরিতানিয়ায়। আর সুদানে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝিতে ইসলামপন্থিরা দেশটির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কব্জা করার পর দাসপ্রথা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। নানা কৌশলে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদও বিস্তৃত হচ্ছে, যেমন কসোভোর মত নতুন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে। ইসলামি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনের একই রকম বিস্তার ঘটতে যাচ্ছে কাশ্মীর, মিন্দানাও ও দক্ষিণ থাইল্যান্ডসহ আরো অনেক স্থানে। জিহাদী মতবাদ তার অবিচ্ছেদ্য উপকরণ, তথা জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও দাসপ্রথা সম্বলিত একটি চিরায়ত স্বর্গীয় মতবাদ। এবং আজ পর্যন্ত এটা তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রেখে চলেছে।

সংক্ষেপে, আল্লাহর স্বর্গীয় মতবাদ জিহাদ তার অবিচ্ছেদ্য সকল উপকরণ নিয়ে আজও জীবিত ও বহাল তবিয়তে রয়েছে। সকল জৌলুষে পরিপূর্ণ স্বর্ণোজ্জ্বল জিহাদের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। প্রাথমিক যুগ থেকে ইসলামি কর্তৃত্বের অতীত দিনে আল্লাহ তাঁর অভিষিক্ত জিহাদীদেরকে বিধর্মীদের ধনভাণ্ডার ও সম্পদে আশীর্বাদিত করেন অত্যন্ত দুরূহ যুদ্ধে বহু ফেরেশতা পাঠিয়ে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত সাহায্যকারী ফেরেশতারা যখন বিধর্মীদের দ্বারা আবিষ্কৃত অতি ক্ষমতাশীল অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে পড়ে, আল্লাহ তখন আসেন নতুন সাহায্য নিয়েঃ কালো সোনা, যা বিপুল পরিমাণে অনেক ইসলামি রাষ্ট্রের ভূগর্ভতলে সংরক্ষিত রয়েছে–প্রধানত সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক ও ইরানে। বিশ্বের চাকা ঘোরাতে এ কালো সোনার প্রয়োজন এতই প্রবল যে, ইসলামি দেশগুলোর দ্বারা নেতৃত্বাকারী এ পণ্যের উৎপাদকদের হাতে পাশ্চাত্যসহ সারা পৃথিবী আজ জিম্মি। ১৯৭০-এর দশকে এ তরল সোনার আকাশ-চুম্বি দাম বাড়তি সেসব মুসলিম দেশকে, বিশেষত সৌদি আরবকে, রাতারাতি ধন-সম্পদে ফাঁপিয়ে তোলে, যা তারা অতীতে কখনোই লুণ্ঠনকারী জিহাদের মাধ্যমে অর্জন করতে পারেনি।

ইসলামের জন্মস্থানের আশীর্বাদপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সৌদি আরব আল্লাহর অপার অনুগ্রহ থেকে অর্জিত বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঢালছে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিশুদ্ধতা বিস্তার ও আনয়নে। ইসলামের প্রকৃত মতবাদে মুসলিমদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য পাশ্চাত্যসহ বিশ্বব্যাপী মাদ্রাসা ও মসজিদ গড়ে তোলা হয়েছে ব্যাঙের ছাতার মতো। আগেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, মুহাম্মদের নবিত্ব-কর্মজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ মদীনাস্থ অধ্যায়ের ভিত্তিতে, *সহিংস জিহাদই হলো ইসলামের কেন্দ্রীয় মতবাদ ও প্রাণশক্তি*। মুসলিমরা ইসলামের এ অপরিহার্য উপাদানকে খুব উন্মুখভাবেই গলাধকরণ করে চলছে আজ। ওসামা বিন লাদেন তার পিতার সৌদি তেল-ব্যবসা থেকে আয়কৃত বিপুল পরিমাণ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত তার হিস্যা অতি উদারহস্তে বিনিয়োগ করেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে সমুজ্জ্বল করতে। আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নবির সাহসী ভাবমূর্তিতে জিহাদ শুরু করে তিনি সত্যি-সত্যি ঘুমন্ত মুসলিম মনকে জাগিয়ে তুলেছেন, সত্যিকার মুসলিম কী সেটা অনুধাবন করতে। তার জিহাদের ডাকে সারা দিয়ে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য আল-কায়েদা-মনা জিহাদি দল জন্ম নিয়েছে ব্যাঙের ছাতার মতো, এমনকি বিধর্মী-অধ্যুষিত ভারত, চীন, রাশিয়া এবং পাশ্চাত্যেও।

জিহাদ পুনরায় আশ্চর্য গতিতে এগিয়ে চলছে, আসন্ন দশকগুলোতে যা আরো জোরদার হবে। দুই পন্থায় জিহাদের প্রচারণা চলছে আজঃ সহিংস ও অহিংস বা মৃদু। তবে এ দুই ধরনের জিহাদের লক্ষ্য একইঃ বিশ্বব্যাপী আল্লাহর আইন শরীয়ত সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ, যার অঙ্গীভূত হবে

জিম্মিকরণ, দাসত্ব ও জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ। সহিংস জিহাদকে বাগ মানানো সম্ভব, কিন্তু অহিংস প্রকৃতির জিহাদ–যা পরিচালিত হচ্ছে সীমাহীনভাবে সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে বিশেষত বিধর্মী-অধ্যুষিত দেশগুলোতে জনসংখ্যার প্লাবন ঘটানোর মাধ্যমে–তাকে রুখা কঠিন হবে। আগামী কয়েক দশকে ভারত, রাশিয়া ও ইউরোপ সম্ভবত জিহাদিদের প্রকৃত ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হবে, তা সহিংসই হোক কিংবা অহিংস।

বিবেকবান মানুষের কাছে যতই হাস্যকর ও অন্যায় বিবেচিত হোক না কেন, জিহাদ কোনো না কোনো আকারে আগামী দশকগুলোতে বিশ্বমঞ্চে ভয়ানক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পথে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য জাহান খান এক দাঙ্গাকারী মুসলিম জনতার নেতৃত্ব দেওয়ায় সময় হিন্দু ও শিখদেরকে উদ্দেশ্যে বলেন: '*এখন এটা মুসলিম রাজ। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখন শাসক, হিন্দুরা রায়ত (কৃষক)। শিখদেরকেও পাকিস্তানের পতাকা উড়াতে হবে... তাদেরকে ভূমিকর (খারাজ) ও অন্যান্য খাজনা (জিজিয়া প্রভৃতি) দিতে হবে।*'[১] পাকিস্তানি ইসলামি পণ্ডিত ও তানজিম-ই-ইসলামি'র প্রতিষ্ঠাতা ড. ইসরার আহমেদ,[২] ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে বলেন:[৩]

> আমরা বলেছি (অমুসলিমদেরকে): '*মুসলিম হয়ে যাও ও সমান অধিকার ভোগ কর, নতুবা তাদেরকে আমাদের শাসনাধীনে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বাস করতে হবে। সেটা না মানলে আসো খোলা ময়দানে এবং তলোয়ারই এ বিষয়ের সমাধা করুক।*'

ফিলিস্তিনে এক হামাস নেতা ও বেথ্‌লেহেম সিটি কাউন্সিলের সদস্য হাসান এল-মাসালমেহ্‌ ২০০৬ সালে অমুসলিমদের উপর বৈষম্যমূলক 'জিজিয়া' কর আরোপের দাবি জানান। তার দাবি ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এল-মাসালমেহ্‌ প্রতিজ্ঞা করেন: '*হামাসে আমাদের অভিপ্রায়, একদিন এ কর কার্যকর করবোই।*'[৪]

এমনকি প্রগতিশীল আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র বলে বিশেষ খ্যাত মালয়েশিয়ায়ও মুসলিম নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক সুবিধা বরাদ্ধ রয়েছে, যা আধুনিককালের 'জিম্মি' ও 'জিজিয়া' প্রথার সামিল। ২০০৬ সালে দেশটির সংখ্যালঘু অমুসলিমরা দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক যাবত চালু থাকা রাষ্ট্র-চালিত মদদপ্রাপ্ত এরূপ বর্ণবাদ বা বৈষম্য উচ্ছেদের আহ্বান জানায়। উত্তরে ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে ক্ষমতাসীন দলের বার্ষিক সম্মেলনে নেতা-কর্মীরা চীৎকার করে দাবি জানায় অমুসলিম নাগরিকদের উপর মুসলিমদের বিশেষ সুবিধা অব্যাহত রাখতে হবে। আবেগী বক্তৃতায় কিছু প্রতিনিধি মুসলিমদের উচ্চতর অধিকার রক্ষায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে এবং রক্তদানেও অঙ্গীকার করেন। দলের যুবনেতা তার বক্তৃতা প্রদানকালে একটা তরবারি (কিরিচ) উঁচিয়ে অমুসলিমদের সতর্ক করে দেন সম-অধিকার দাবির বিরুদ্ধে।

মুসলিম বিশ্বে মৌলবাদী ও উগ্রপন্থি ইসলামি আন্দোলন দ্রুত গতিতে জোরদার হচ্ছে। অপরদিকে পাশ্চাত্যেও শরীয়া আইন তিলে তিলে বৈধ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন দেখায় বিষয় যে, জিহাদের কেন্দ্রীয় নীতি জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও ক্রীতদাসপ্রথা এবং সে সঙ্গে অমুসলিমদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও তাদেরকে সামাজিকভাবে পঙ্গুকরণ তার মধ্যযুগীয় অতীত গৌরব নিয়ে পুনরায় বিশ্ব মঞ্চে আবির্ভূত হয় কি না।

Bibliography

---

[১] Khosla GD (1989) *Stern Reckoning: A Survey of Events Leading Up To and Following the Partition of India*, Oxford University Press, Delhi, p. 159

[২] Dr Israr Amhed is a well-known figure in Pakistan, India, the Middle East and North America for his efforts in drawing the attention of Muslims toward the teachings and wisdom of the Holy Quran. He has a daily show on Mumbai-based Peace TV, a platform for moderate preachers of Islam, which reaches hundreds of millions of people in Asia, Europe, Africa, Australia and North America.

[৩] Dr Israr Ahmed: http://in.youtube.com/watch?V = ZJ7B VG71Pc & feature = related; accessed 14 October 2008

[৪] Weiner, op cit.

- *Abu Dawud, Sunan*; trans. A Hasan, Kitab Bhavan, New Delhi, 2007, Vols. 1–3
- Adas M ed. (1993) *Islam & European Expansion*, Temple University Press, Philadelphia
- Ahmed A (1964) *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment*, Clarendon Press, Oxford
- Al-Attas SN (1963) *Some Aspects of Sufism as Understood and Practice Among the Malays*, S Gordon ed., Malaysian Sociological Research Institute Ltd., Singapore
- Ali SA (1891) *The Life and Teachings of Muhammed*, WH Allen, London
- Al-Tabari (1988) *The History of Al-Tabari*, State University of New York Press, New York, Vols. 6–10
- Al-Thaalibi I (1968) *Lata'if Al-Ma'arif. The Book of Curious and Entertaining Information*, ed. CE Bosworth, Edinburgh University Press
- Ambedkar BR (1979–98) *Writings and Speeches* , Government of Maharashtra, Mumbai
- Armstrong K (1991) *Muhammad: A Attempt to Understand Islam*, Gollanz, London
- Arnold T and Guillaume A eds. (1965) *The Legacies of Islam*, Oxford University Press, London
- Arnold TW (1896) *The Preaching of Islam*, A. Constable & Co., London
- Ashraf KM (1935) *Life and Conditions of the People of Hindustan*, Calcutta
- Banninga JJ (1923) *The Moplah Rebellion of 1921*, in *Moslem World* 13
- Basham AL (2000) *The Wonder That Was India*, South Asia Books, Columbia
- Batabyal R (2005) *Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali*, 1943–47, SAGE Publications
- Bernier F (1934) *Travels in the Mogul Empire (1656-1668)*, Revised Smith VA, Oxford
- Berube CG & Rodgaard JA (2005) *A Call to the Sea: Captain Charles Stewart of the USS Constitution*, Potomac Books Inc., Dulles
- Bodley RVC (1970) *The Messenger: The Life of Muhammad*, Greenwood Press Reprint
- Bostom AG (2005) *The Legacy of Jihad*, Prometheus Books, New York
- Braudel F (1995) *A History of Civilizations*, Translated by Mayne R, Penguin Books, New York
- Brockopp JE (2005) *Slaves and Slavery, in The Encyclopedia of the Qur'ān*, McAuliffe JD et al. ed., EJ Brill, Leiden
- Brodman JW (1986) *Ransoming Captives in Crusader Spain: The Order of Merced on the Christian-Islamic Frontier*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia
- *Bukhari, Sahih*; trans. MM Khan, Kitab Bhavan, New Delhi, 1987, Vols. 1–9
- Chadurah HM (1991) *Tarikh-Kashmir*, ed. and trans. R Bano, Bhavna Prakashan, Delhi
- Clarence-Smith WG (2006) *Islam and the Abolition of Slavery*, Oxford University Press, New York
- Collins L & Lapierre D (1975) *Freedom at Midnight*, Avon, New York
- Copland I (1998) *The Further Shore of Partition: Ethnic Cleansing in Rajasthan 1947, Past and Present*, Oxford, 160
- Crone P and Cook M (1977) *Hagarism: The Making of the Islamic World*, Cambridge University Press, Cambridge
- Durant W (1999) *The Story of Civilization: Our Oriental Heritage*, MJF Books, New York
- Eaton RM (1978) *Sufis of Bijapur 1300–1700*, Princeton University Press, Princeton
- Eaton RM (2000) *Essays on Islam and Indian History*, Oxford University Press, New Delhi
- Eliot HM & Dawson J, *The History of India As Told By Its Own Historians*, Low Price Publications, New Delhi, Vols. 1–8
- Elst K (1993) *Negationism in India*, Voice of India, New Delhi
- Endress G (1988) *An Introduction to Islam*, trs. C Hillenbrand, Columbia University Press, New York
- Erdem YH (1996) *Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise, 1800–1909*, Macmillan, London
- Esin E (1963) *Mecca the Blessed, Medina the Radiant*, Elek, London
- Ferishta MK (1997) *History of the Rise of the Mahomedan Power in India*, translated by John Briggs, Low Price Publication, New Delhi, Vols. I–IV
- Fisher AW (1972) *Muscovy and the Black Sea Slave Trade, in Canadian-American Slavic Studies*, 6(4)
- Fregosi P (1998) *Jihad in the West*, Prometheus Books, New York
- Ghosh SC (2000) *The History of Education in Medieval India 1192-1757*, Originals, New Delhi
- Gibb HAR (2004) *Ibn Battutah: Travels in Asia and Africa*, D K Publishers, New Delhi
- Goel SR (1996) *Story of Islamic Imperialism in India*, South Asia Books, Columbia (MO)
- Goldziher I (1967) *Muslim Studies*, trs. CR Barber and SM Stern, London
- Goldziher I (1981) *Introduction to Islamic Theology and Law*, Trs. Andras & Ruth Hamori, Princeton
- Habibullah, ABM (1976) *The Foundations of Muslim Rule in India*, Central Book Depot, Allahabad
- Haig W (1958) *Cambridge History of India*, Cambridge University Press, Delhi
- Hasan M (1971) *The History of Tipu Sultan*, Aakar Books, New Delhi

- Hitti PK (1961) *The Near East in History*, D. Van Nostrand Company Inc., New York
- Hitti, PK (1948) *The Arabs : A Short History*, Macmillan, London
- Hughes TP (1998) *Dictionary of Islam*, Adam Publishers and Distributors, New Delhi
- Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad*, (trs. A Guillaume), Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint
- Ibn Sa'd AAM, *Kitab al-Tabaqat*, Trans. S. Moinul Haq, Kitab Bhavan, New Delhi, 1972 print
- Ibn Warraq (1995) *Why I am not a Muslim*, Prometheus Books, New York
- Inalcik H (1997) *An Economic and Social History of the Ottoman empire, 1300-1600*, Cambridge University Press
- Iqbal M (2002) *Islam as a Moral and Political Ideal, in Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook*, C Kurzman ed., Oxford University Press, London
- Johnson L (2001) *Complete Idiot Guide Hinduism*, Alpha Books, New York
- Jones JP (1915) *India: Its Life and Thought*, The Macmillan Company, New York
- Kamra AJ (2000) *The Prolonged Partition and Its Pogroms*, Voice of India, New Delhi
- Khan Y (2007) *The Great Partition: The Making of India and Pakistan*, Yale University Press, Yale
- Khosla GD (1989) *Stern Reckoning: A Survey of Events Leading Up To and Following the Partition of India*, Oxford University Press, New Delhi
- Lahiri PC (1964) *India Partitioned and Minorities in Pakistan*, Writers' Forum, Calcutta
- Lal KS (1973) *Growth of Muslim Population in Medieval India*, Aditya Prakashan, New Delhi
- Lal KS (1992) *The Legacy of Muslim Rule in India*, Aditya Prakashan, New Delhi
- Lal KS (1994) *Muslim Slave System in Medieval India*, Aditya Prakashan, New Delhi
- Lal KS (1995) *Growth of Scheduled Tribes and Castes in Medieval India*, Aditya Prakashan, New Delhi
- Lal KS (1999) *Theory and Practice of Muslim State in India*, Aditya Prakashan, New Delhi
- Levi (2002) *Hindus Beyond the Hindu Kush: Indian in the Central Asian Slave Trades*, Journal of the Royal Asiatic Society, 12(3)
- Lewis (1994) *Race and Slavery in the Middle East*, Oxford University Press, New York
- Lewis B (1966) *The Arabs in History*, Oxford University Press, New York
- Lewis B (1993) *Islam and the West*, Oxford University Press, New York
- Lewis B (2000) *The Middle East*, Phoenix, London
- Lewis B (2002) *What Went Wrong:Impact and Middle Eastern Response*, Phoenix, London
- Lundström J (2006) *Rape as Genocide under International Criminal Law, The Case of Bangladesh*, Global Human Rights Defence, Lund University
- MA Klein & GW Johnson eds. (1972) *Perspectives on the African Past*, Little Brown Company, Boston
- Maimonides M (1952) *Moses Maimonides' Epistle to Yemen: The Arabic Original and the Three Hebrew Versions*, ed. AS Halkin and trans. B Cohen, American Academy for Jewish Research, New York.
- Majumdar RC ed. (1973) *The Mughal Empire*, in *The History and Culture of the Indian People*, Bombay
- Manucci N (1906) *Storia do Mogor*, trs. Irvine W, Hohn Murray, London
- Maududi AA (1993) *Towards Understanding the Quran*, trs. Ansari ZI, Markazi Maktaba Islamic Publishers, New Delhi
- Maududi SAA, *The Meaning of the Quran*, Islamic Publications, Lahore
- Menon VP (1957) *The Transfer of Power*, Orient Longman, New Delhi
- Milton G (2004) *White Gold*, Hodder & Stoughton, London
- Moreland WH (1923) *From Akbar to Aurangzeb*, Macmillan, London
- Moreland WH (1995) *India at the Death of Akbar*, Low Price Publications, New Delhi
- Muhammad S (2004) *Social Justice in Islam*, Anmol Publications Pvt Ltd, New Delhi
- Muir W (1894) *The Life of Mahomet*, Voice of India, New Delhi
- *Muslim, Sahih*; trans. AH Siddiqi, Kitab Bhavan, New Delhi, 2004 imprint, Vols. 1–4
- Naipaul VS (1977) *India: A Wounded Civilization*, Alfred A Knopf Inc., New York
- Naipaul VS (1981) *Among the Believers: An Islamic Journey*, Alfred A Knopf, New York
- Naipaul VS (1998) *Beyond Belief: The Islamic Incursions among the Converted Peoples*, Random House, New York
- Nehru J (1989) *Glimpses of World History*, Oxford University Press, New Delhi
- Nehru J (1946) *The Discovery of India*, Oxford University Press, New Delhi
- Nizami KA (1989) *Akbar and Religion*, Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, New Delhi
- Nizami KA (1991a) *The Life and Times of Shaikh Nizamuddin Auliya*, New Delhi
- Nizami KA (1991b) *The Life and Times of Shaikh Nasiruddin Chiragh-I Delhi*, New Delhi
- O'Leary DL (1923) *Islam at the Cross Roads*, E. P. Dutton and Co, New York

- O'Shea S (2006) *Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Mediterranean World*, Walker & Company, New York
- Owen S (1987) *From Mahmud Ghazni to the Disintegration of Mughal Empire*, Kanishka Publishing House, New Delhi
- Ozcan A (1977) *Pan Islamism, Indian Muslims, the Ottomans & Britain (1877-1924)*, Brill, Leiden
- Parwez GA (1989) *Islam, a Challenge to Religion*, Islamic Book Service, New Delhi
- Pellat Ch, Lambton AKS and Orhonlu C (1978) *'Khasi,' The Encyclopaedia of Islam*, E J Brill ed., Leiden
- Pipes D (1983) *In the Path of God*, Basic Books, New York
- Pipes D (2003) *Militant Islam Reaches America*, WW Norton, New York
- Prasad RC (1980) *Early Travels in India*, Motilal Banarsidass, India
- Pundit KN trs. (1991) *A Chronicle of Medieval Kashmir*, Firma KLM Pvt Ltd, Calcutta
- Rabbi KF (1895) *The Origins of the Musalmans of Bengal*, Calcutta
- Reid A (1983) *Introduction: Slavery and Bondage in Southeast Asian History, in Slavery Bondage and Dependency in Southeast Asia*, Anthony Reid ed., University of Queensland Press, St. Lucia
- Reid A (1988) *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, Yale University Press, New Haven
- Reid A (1993) *The Decline of Slavery in Nineteenth-Century Indonesia, in Breaking the Chains: Slavery, Bondage and Emancipation in Modern Africa and Asia*, Klein MA ed., University of Wisconsin Press, Madison
- Rizvi SAA (1978) *A History of Sufism in India*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi
- Rizvi SAA (1993) *The Wonder That Was India*, Rupa & Co., New Delhi
- Robinson F (2000) *Islam and Muslim History in South Asia*, Oxford University Press, New Delhi
- Rodinson M (1976) *Muhammad*, trs. Anne Carter, Penguin, Harmondsworth
- Roy Choudhury ML (1951) *The State and Religion in Mughal India*, Indian Publicity Society, Calcutta
- Rudolph P (1979) *Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History*, Mouton Publishers, The Hague
- Runciman S (1990) *The Fall of Constantinople, 1453*, Cambridge University Press, London
- Russell B (1957) *Why I Am Not a Christian*, Simon & Schuster, New York
- Sachau EC (1993) *Alberuni's India*, Low Price Publications, New Delhi
- Said EW (1997) *Islam and the West In Covering Islam: How the Media and Experts Determine How We See the Rest of the World*, Vintage, London
- Sarkar J (1992) *Shivaji and His Times*, Orient Longham, Mumbai
- Saunders TB (1997) *The Essays of Arthur Schopenhauer: Book I : Wisdom of Life*, De Young Press
- Segal R (2002) *Islam's Black Slaves*, Farrar, Straus and Giroux, New York
- Shaikh A (1998) *Islam: The Arab Imperialism*, The Principality Publishers, Cardiff
- Sharma SS (2004) *Caliphs and Sultans: Religious Ideology and Political Praxis*, Rupa & Co, New Delhi
- Sherwani LA ed. (1977) *Speeches, Writings, and Statements of Iqbal*, Iqbal Academy, Lahore
- Smith VA (1958) *The Oxford History of India*, Oxford University Press, London
- Sobhy as-Saleh (1983) *Mabaheth Fi 'Ulum al- Qur'an*, Dar al-'Ilm Lel-Malayeen, Beirut
- Swarup R (2000) *On Hinduism Reviews and Reflections*, Voice of India, New Delhi
- Tagher J (1998) *Christians in Muslim Egypt: A Historical Study of the Relations between Copts and Muslims from 640 to 1922*, trs. Makar RN, Oros Verlag, Altenberge
- Talib SGS (1991) *Muslim League Attack on Sikhs and Hindus in the Punjab 1947* (compilation), Voice of India, New Delhi
- *The Quran*, Translations by Yusuf Ali A, Pickthal M and Shakir MH; available at http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/
- Triton AS (1970) *The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects*, Frank Cass & Co Ltd, London
- Umaruddin M (2003) *The Ethical Philosophy of Al-Ghazzali*, Adam Publishers & Distributors, New Delhi
- Van Nieuwenhuijze CAO (1958) *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia*, W. van Hoeve Ltd, The Hague
- Waddy C (1976) *The Muslim Mind*, Longman Group Ltd., London
- Walker B (2002) *Foundations of Islam*, Rupa & Co, New Delhi
- Warren JF (1981) *The Sulu Zone 1768-1898: The Dynamics of the External Slave Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State*, Singapore University Press, Singapore
- Watt WM (1961) *Islam and the Integration of Society*, Routledge & Kegan Paul; London
- Watt WM (2004) *Muhammad in Medina*, Oxford University Press, Karachi
- Widjojoatmodjo RA (1942) *Islam in the Netherlands East Indies*, In *The Far Eastern Quarterly*, 2 (1), November
- Williams BG (2001) *The Crimean Tatars: The Diaspora Experience and the Forging of a Nation*, E J Brill, Lieden
- Zwemer SM (1907) *Islam: A Challenge to Faith*, Student Volunteer Movement, New York

বাংলা অনুবাদের ভূমিকা

ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস হচ্ছে জিহাদ। এ জিহাদের মাধ্যমে মদিনা থেকে তার বিজয়ী রূপে আত্মপ্রকাশ, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা। জিহাদের তাৎপর্য বাস্তবে হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মের নামে যুদ্ধ এবং আরব আধিপত্য ও সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ। জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আরব রাষ্ট্রের প্রসারের সঙ্গে ঘটেছে ধর্মের নামে পাইকারীভাবে পরের সম্পদ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন ও আত্মসাৎকরণ, নারী ধর্ষণ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে 'কাফের' বা 'সত্য প্রত্যাখ্যনকারী' আখ্যায়িত করে আক্রমণ ও পরাজিত করে বন্দি ও দাসকরণ। এভাবে ইসলামে ধর্মের নামে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, আরব সাম্রাজ্যবাদ এবং দাস ব্যবস্থার যে ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার গড়ে উঠেছে তাকে এ গ্রন্থে লেখক অজস্র তথ্যের সাহায্যে উদ্ঘাটিত করেছেন।

জিহাদের উপর বিপুলভাবে তথ্যসমৃদ্ধ এ অসাধারণ গ্রন্থটি M. A. Khan-এর লেখা Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery নামক ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। যেহেতু জিহাদের সঙ্গে ইসলাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং বাঙালি পাঠকদের নিকট জিহাদকে আলাদাভাবে ইসলাম শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয় না সেহেতু গ্রন্থের নাম অনুবাদের সময় ইসলামি জিহাদ নামকরণ না করে শুধু জিহাদ করা হয়েছে।

আমার ধারণা এ অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ উপলব্ধিতে বিপুলভাবে সহায়তা করে বাঙালি জাতির জাগরণ ও উত্থানে উল্লেখ্য ভূমিকা রাখবে।

শামসুজ্জোহা মানিক
সহ-লেখক, আর্যজন ও সিন্ধু সভ্যতা
সম্পাদক, বঙ্গরাষ্ট্র (www.bangarashtra.org
& www.bangarashtra.net)